শ্রীশ্রী৺রাধে

সাহিত্য

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY
No. 2009
UNIVERSITY OF CALCUTTA

মাসিক পত্র

সপ্তম খণ্ড

(সন ১৩২৮ সালের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক হইতে ১৩২৩ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়ান প্রেস,—২য় নং বিডন ষ্ট্রীট, ইটালি, কলিকাতা হইতে
শ্রীকেদারনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

P29473

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচি

১। আলোচনা

অতি মানুষের মূল্য ৯৬১
অধ্যাপক রমেশ ও বাষ্টবীমা ৫৭৮
আত্ম-প্রতিষ্ঠা ৬৭৫
আত্ম-রক্ষা ৭৭৩
আমাদের অবস্থা ৯৭৫
আমাদের চিন্তাপ্রণালী ১১২
আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের রসবোধ ৪৮৫
আমাদের বিচারবুদ্ধি ৯৬৫
আমাদের ভবিষ্যৎ ৩৯১
আমুর্ব্বেদের সমাদর ৪৮৮
আবাহন ১০৫৭
ইতালীয় সাহিত্য ১০৫৮
উড়িষ্যায় সাহিত্য সাধনার পন্থা ... ১১২
কলেজ পত্রিকা ৭
কর্ম্মীর অভিমান ৬৭৩
কর্ম্মীর নীরবতা ৫৮৯
কর্ম্মক্ষেত্রে বিহার ও উৎকল ৭৮১
কাশীধামে শুভানুষ্ঠান ১০৬
কুমারী মণ্টেসরীর শিক্ষা-প্রণালী ২৯১
কৃষি বিদ্যালয় ১০০
কৃষি সমস্যা ৩৮৯
কংগ্রেসে আমাদের লাভ ২৮৯
চরিত্র গঠনের উপায় ৪৮৭
চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ৯৯
চুক্তিবদ্ধ "কুলী" ৮
জগতের একজন পরলোকগত সুসন্তান ১০
জাতীয় বিশ্বাস ৪৮১
জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় ৪৯৩
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ ৪৯৪
ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষাবিস্তার ৪৯১
দরিদ্রের ক্রন্দন ৮,১৯৭
দারিদ্র্য-নিবারণ ২০৪
দেশ কি চায় ৬৮২
দেশাত্মবোধ ৬৭৯
দেশের অভাব ও ধনবিজ্ঞান ৬৭৭
দেশীয় পত্রিকার প্রকৃতি ৮৭৮
দেশীয় পরলোকগত বন্ধু কটন ১০৪
দেশীয় রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিকশিক্ষা ... ১০২
ধার পণ্ডিতের কর্ত্তব্য ৯৮৮
ধনশাস্ত্র ১০৮৩
ধনশাস্ত্রের আলোচনা ১০৬১
ধনশাস্ত্র এবং ধনসম্পর্কিত বাস্তবজীবনের বিভিন্নতা ... ১০৬১
নাট্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৪৯৫
নারী নিগ্রহ ৭৭১
পণ্ডিত রজনীকান্ত ৮৭৭
পরলোকগত নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর ১০৮
পরলোকগত ফেরোজশাহ মেটা ... ১০৫
পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী ... ৫৮৮
পল্লী-সমাজে চিকিৎসার ব্যবস্থা ২৯০
পারিপার্শ্বিক ১৯৩
পূর্ব্বকথা ৭৭০
প্রত্নতত্ত্ববিদের বৃহত্তর ক্ষেত্র ১০৭১
প্রবন্ধ সমস্যা ৭৭২
প্রাচীন আমেরিকায় হিন্দুপ্রভাব ... ৪৯১
প্রেততত্ত্ব ৫৮০
বঙ্গভাষার প্রকৃতি ২৬১
বঙ্গসাহিত্যে দুর্ব্বলতা ৩৮৮
বঙ্গবাসীর ভাবীসেবক ৫৯০
বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের অপচয় ... ৩৯৯

বঙ্গের বাহিরে মাতৃভাষার অর্চ্চনা ৮৭৬
বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায় ৭৮২
বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষণীয় বিষয়… ৮৭২
বর্ত্তমান ব্রহ্মের বৈষয়িক অবস্থা ৬৮৪
বাঙ্গালার সাহিত্য সংসার ৬৮০
বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎযুগ… ৮৭৩
বিজয়া দশমী ১
বিজ্ঞানচর্চ্চা ১২৫
বিদ্যালয়ের আকর্ষণ ৫৮৩
বিদ্যালয়ে বিপ্লব ৪৮২
বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি ১২৬
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা… ১২৮
ব্যবসায়ে জাপানীর সাধনা ২২৫
ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ৮৬৫
ব্যক্তির প্রভুত্ব ৫৭৩
ব্যক্তির দারিদ্র ৫৭২
ব্যর্থতা ও হাস্যরস ৬৮৪
ব্যাঙ্কের কাজ ১০৬০
ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য ২৭৪
ভারত ও জাপান ৪২৪
ভারতের সঙ্গীতকলা ২০৬
ভারতবর্ষে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা… ১০১
ভারতবাসীর আয়ু: … ৯৭
মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ৫৭৭
মনুষ্যত্বের শিক্ষা ৯৯১
মন্দিরে প্রবেশ ৭৬১
মানবের অমরতা ১০৬৮
ম্যালেরিয়ার প্রাচীনতা ৩৯৭
যুদ্ধের কারণ ২০৪
যুদ্ধের পর আমাদের বৈষয়িক অবস্থা ৮৭৫
রঙ্গমঞ্চ ও সামাজিক জীবন ৪৮৪
রঞ্জনশিল্পের ভারতীয় উপাদান ৮৭১
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপরীত্যের কারণ ৭৭৭
শিক্ষাপ্রচারে প্রতিবন্ধকতা ২৯৫
শেষ জিজ্ঞাসা ৭৭৩
সমাজ শাসন ১২
সমাজের গতি কোন্ দিকে ৬৮৬
সমাজ সেবক ৮৬৭
সন্তোষলব্ধি ১০৪
সন্ন্যাস ও ব্যবসায় ২৯৩
সচিত্র পত্র ৭৭৮
সাগরের ডাক ৫৮৭
সাধারণের উন্নতি ১১০
সামাজিক উন্নতির অন্তরায় ৫৮৫
সাহিত্যের দুর্দ্দিন ৭৬৯
সাহিত্যে দুর্নীতি ৩
সাহিত্য পরিচয় ৯৯৬
সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র ৮৬৯
সাহিত্যের সমাজসেবা ৪
সাহিত্য-সম্মিলনের কাজ ৯৬৬
সাহিত্যে সংরক্ষণ-নীতি ১০৭
সাহিত্য বিস্তারে মুসলমান সম্প্রদায় ১০৭০
সেবা ও শিক্ষা ৯৬৩
স্বদেশীর অদূরদর্শিতা ৩৯২
স্বাধীনতার শিক্ষা ২০৬
স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় ৩৯৬
স্নেহের বন্ধন ৬৭৩
হাস্যরস ও জাতীয়তা ২৯৪
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিকশিক্ষা দান ৩৯৪
হিন্দুর একত্ববোধ ৬৮৩
হিন্দুর গৃহে দুরবস্থা ৭৮৩
হিন্দুর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ৫৮৪
হিন্দু পরিবারে ছাত্রাবাস ৯৬৯
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ৩৮৫
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুত্ব ৩৮৬
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুর ঐক্য ৩৮৭
হিন্দুর বৈষয়িক সাধনা ৫৮২
হিন্দুর ভবিষ্যৎ সংসার ৮৭৯
হেতমপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ৮৬৬

প্রবন্ধ

অন্নকাঙ্গাল (পদ্য)—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী ২২৯
অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৫৯৩,৭১৪
আসামপ্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তক—শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯
আত্মতত্ত্ব —শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৩১০৩
আহ্বান (পদ্য)—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬৬৮
উদ্ভাবি—৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ১১৮
উপলখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী ২৪৫
এক সপ্তাহে অঙ্ক জ্ঞাপন—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ, ১৬৭
একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্ব—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বি, এল, ৬১৩
এসিয়ার মাঞ্চেষ্টার—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ৪১১
কবিবর হেমচন্দ্র ও তাঁহার অন্তঃ প্রকৃতি—শ্রীঅম্বিকন দাস ২৪৮
কর্ম্মভূমি (গান)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৫০
কর্ম্মের আহ্বান (পদ্য)—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৮২
কাক (পদ্য)—শ্রীকালিদাস রায় ৭২৩
কার্য্য কারণ তত্ত্ব—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৩৫১
কৃষি রসায়ন—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ ৪৩৮
ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটি কয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়—ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৩৫২,১৪২,২৭৪,৩৬৬,৪৬৬
ক্ষয়রোগ নিবারণ সম্বন্ধে দু'একটী কথা—জনৈক ভুক্তভোগী ৫৭০
ক্ষুদ্র পূজা—শ্রীতারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৩০
গতি বা স্থিতি—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, ১৩৭
চকল (পদ্য)—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী ৬০৮
চীনা কবিদের প্রকৃতি-নিষ্ঠা—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ, ৯৭৭
জগদ্বিভ্যবাদ—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৪২৫
জনসাধারণের শিক্ষা—শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫০
জড় জগতের জাতি ভেদ বা ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র খেলা—শ্রীতারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫২০
জড় ও শক্তি তত্ত্ব—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৯০১,১০১৮
জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্ব—শ্রীরামতারণ রায় ৫৫৪
জন্মভূমি স্তোত্র—মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১১৪০
জন্মান্তরবাদ—শ্রীজীবনকালী রায় ১০৪৪
জীবাভিব্যক্তিবাদ—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৭২৩
জ্যোতিষ চর্চ্চার ফলে মানব ও ব্রহ্মের ধারণা—শ্রীতারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৩৪

ডোম্‌বাইলের চিঠে ঐতিহাসিকের কথায় ফিরে না—শ্রীহরিদাস পালিত ২২০
তাজা ভারতের ধর্ম ও দর্শন—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ৮৯৪
দর্শন ও বিজ্ঞান—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ২৪৪
দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস—শ্রীসেবাব্রতিকু জীবন ৭০২,৮১৬,৯৩০,১০০৪,১১২৭
দেশীয় বৈষম্য ওপাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১১৪৫
দৃশ্যকাব্য—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল ১১৩
ধরণীর আকৃতিবিপর্যয়—শ্রীতারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০৯
নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার ৭১২
নাইট্রোজেন ও তাহার আবর্তন ক্রিয়া—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গুপ্ত ৬২৮
নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস্—শ্রীযুক্ত আমেরিকাপ্রবাসী ৬৫
নিত্যলীলা—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ৭২৪
পরমাণুবাদ—শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী ৫১০
পল্লীকথা—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৮৩৩
পল্লীজীবন—শ্রীজলধর সেন ১২১
পল্লীরাণী (পদ্য)—শ্রীকালীকৃষ্ণসিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ৮১৫
পল্লী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বি, এ, (আমেরিকা) ... ১০৭৩
পুষা কৃষিকলেজের রেশম বিভাগে পরীক্ষিত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত—শ্রীমন্মথনাথ দে ৭৫
পুণ্ড্র জাতির ইতিহাস—শ্রীহরিদাস পালিত ৮৮১,৯৮৯,১০৯৭
পুণ্যক্ষেত্র ৺কালীক্ষেত্র—শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫১
পো-চুইয়ের বীণাওয়ালী—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ১০৩০
প্রকাশের আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী এম্, এ, বি, এল ১০৮০
প্রজার দুঃখ—শ্রীরাখালরাজ রায়
প্রণাম (পদ্য)—শ্রীকালিদাস রায়
প্রার্থনা (পদ্য)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
প্রতিভা ও যোগানন্দ—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন —
প্রাচীন ইজিপ্তের সহিত ভারতীয় ভাবের সৌসাদৃশ্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...
ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্য—শ্রীবিনয়কুমার সরকার
ফরাসী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী—শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার
বঙ্গে বাল্য-জীবন—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
বঙ্গে বাল্য-জীবন—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ত্তমান জগৎ (আটলান্টিকবক্ষে)—শ্রীবিনয়কুমার সরকার
বর্দ্ধমান মেলার মেলার বিবরণ—শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী
বিবাহ—শ্রীমাধব চন্দ্র সাকাল
বীরভূমের বিবিধ প্রসঙ্গ—শ্রীঃরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ...

ভক্তিপুষ্প (পদ্য)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম—শ্রীনবীন চন্দ্র দাস
ভারতলক্ষ্মী (পদ্য)—শ্রীকালিদাস রায় বি. এ,
ভারতীয় মুসলমান রাজাগণের সাহিত্য সেবা ও শিক্ষা বিস্তার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ৮৩৬,৯৪৮,১০৩৫,১০৮৪
ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্য সেবা ও শিক্ষা বিস্তার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম,এ, বি,এল,পি, আর,এস.
ভিখারী (পদ্য)—শ্রীযশোদানন্দন ঘোষ
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন রহস্য—শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলসূত্র (পদ্য)—শ্রীকালিদাস রায়
মহিম্নস্তব—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ
মার্কিনরাষ্ট্রের কেডারেল কেন্দ্র—শ্রীবিনয়কুমার সরকার
মিলন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু
মোসন পিকচার—শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ
যক্ষ্মারোগে কয়েকটী বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহচিকিৎসা —ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৬৫৩,৮২৭
যুগধর্ম্ম—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু ... ২২৪
রবির রবি (পদ্য)—শ্রীকালিদাস রায় ২১৩
রাজসাহীর প্রাচীন বৎকিঞ্চিৎ—শ্রীনৃত্যগোপাল রায় ২৬৭
রাজা রামচন্দ্র দেব—শ্রীঅঘোর নাথ বসু কবিশেখর ৬২০
রঙ্গিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ৬৮৯
রংপুরে নবম উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কৃষি বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি, আর, এস্ ৬৯২
লণ্ডনে সমাজ সেবা—শ্রীসেবা ভিক্ষু ১২৮
শঙ্খের জন্মকথা (পদ্য)—শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক ৮০৩
শিক্ষার পঙ্গুত্ব—শ্রীযগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ (আমেরিকা) ১৬৩
শিক্ষার মোহ ও ব্যবসার বিভীষিকা—শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী ৫৪৬
শ্রাদ্ধে স্মৃতি—শ্রীশশিভূষণ পাল ২৮১
শ্রীকৃষ্ণের সংসার—৺অমূল্যকৃষ্ণ ভাগবত ভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ৩৩
ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়-সাহিত্যিক মণ্ডল—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী ১১০৫
সমাজ-প্রসঙ্গ-পথপ্রথা—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯৭
সাগরের ডাক (নাটক)—শ্রীসুধীরনাথ সাহিড়ী ৫০৫
সাহিত্য পরিচয় ৩৭১, ৪৭৪, ৬৪৮, ৭৬৫, ১০৫৩, ১১৪৫
সাহিত্য প্রচার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৮৪

সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পল্লাবলী—শ্রীআব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—শ্রীকামিনী নাথ রায়
স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী—শ্রীবিনয়কুমার সরকার।
স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট—শ্রীহরিদাস পালিত
স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট—শ্রীহরিদাস পালিত
স্ত্রীজাতির শিক্ষাসমস্যা—শ্রীঅকিঞ্চন দাস
হংসদূত—শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ

মফঃস্বলের বাণী

অন্নসমস্যা ৮৬০
আত্মনীতি ৩৮০
আমাদের কর্ত্তব্য ৪৭৮
আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ৮৬১
আমাদের করণীয় ৮৬২
আমাদের ছাত্রবর্গ ও বিচারপতি উড্রফ ২৫৪
আর ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা ১১৪৯
আর কত বাকী ১১৫০
ইউরোপীয় যুদ্ধপরবর্ত্তী ইতালি বিষয়ে বাঙ্গালার কি ক্ষতি করিয়াছে ৩৮৩
এ যে শ্রাবন নয় পাবন ২৩
খাইতে দাও ৮৭
খাইব কি ১১৪৭
জাতীয় জীবন ২১
জীবিকার্জ্জনে শিক্ষা ২৫৬
তথাপি গাহিব আশার গান ৫৭৪
তুলসীর উপ ২৮৪
দেশীয় সংবাদপত্র ও গভর্ণমেণ্ট ৫৭৫
দেশব্যাপী অন্নকষ্ট... ৭৬৭
পল্লী প্রসঙ্গ ৩৭৭,৭৬৬
পল্লীবেদনা ২৭৮
পল্লীসেবার অন্তরায় ও উপায় ৪৭৭
পল্লীসমস্যা ৬৬৯
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ৪৭৯
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ২৮২
বর্ত্তমান শিল্পসমস্যা
বরপণের ঔষধ
বঙ্গে দুর্ভিক্ষ
বঙ্গের নব শিল্প জাগরণ ও স্বদেশী ব্রত
বঙ্গে ম্যালেরিয়া ও তৎ-প্রতিকারে দেশবাসীর কর্ত্তব্য ৩৭৩
বঙ্গে ম্যালেরিয়া ৪৭৬
বঙ্গের স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া ৬৭১
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ৬৬১
বাঙ্গালায় এত রোগ কেন ? ২৫৩
বাঙ্গালীর কি হইল ? ১০০৫
ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ১২১
বিসর্জ্জন ১১৪৬
ব্যাধি প্রপীড়িত পল্লীর শোচনীয় অবস্থা ও পল্লীবাসীর প্রার্থনা ২৮১
ভারতে অশিক্ষিতের সংখ্যা ৪৭৯
ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় ভাবের অন্তর্দ্ধান ৮৫৬
ভারতে শিক্ষা সমস্যা ২৫৭
মধ্যবিত্তের অবস্থা ও তাহার প্রতিকার ৩৭৬
মানবের লক্ষ্য ৯০
ম্যালেরিয়া ৫৭৩
মুষ্টিযোগ ৯৫
রেশম শিল্প ৬৬৩
শিক্ষার উদ্দেশ্য ৮৫৮

শিক্ষা ও তাহার আদর্শ	৫১২	স্বদেশীব্রত	৩৮
স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার আদর্শ	৫৭১	সাধের ঘুমঘোর	৩৮১
সৌন্দর্য্য সাধনা	৮৪	সাধ্যাস ছাব্বিশ	৩৬৭

গৃহস্থ

"চাহ, চাহ, মতিমান, কেন দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া যায় !
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ !
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে ?
বিধাতার পুণ্যদানে—কলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার ?
একি —একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত !
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি ?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, বৈশাখ	সপ্তম সংখ্যা।

আলোচনা

১। মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা নিতান্তই Theoretical বা অব্যবহারিক। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নহে। মনস্তত্ত্ব আজ কাল একটা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইতেছে। যেমন রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে সেইরূপ মনস্তত্ত্বেরও ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে।

মনস্তত্ত্বের বিষয় আমাদের চিত্তের বৃত্তি-ধারা। আজকালকার মনস্তাত্ত্বিকগণের অনেকেই মনকে একটা ধারা বা স্রোতের সহিত তুলনা করেন। এখন এই ধারার যে একটা নিয়ম আছে, এই স্রোতের গতির যে দিক্ নির্ণয় হইতে পারে তাহা আমাদের দৈনিক জীবনের কাজের মধ্যে আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু সাধারণ লোকে যাহা ভুলিয়া যায়

বৈজ্ঞানিক তাহা তুচ্ছ করিতে পারেন না। কাজেই মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। মনস্তত্ত্ব, চিত্তের ধারার নিয়ম ও গতি নির্ণয় করে।

আমাদের জীবনের কাজে অনেক সময়ই আমরা অন্যের মনের অবস্থা নির্ণয়ে ব্যাপৃত থাকি। পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের মনের অবস্থা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত; ব্যবহারজীবিগণ বিচারক কি করিবেন তাহা জানিবার জন্য আকুল হন; ব্যবসায় ক্রেতৃগণের ও ক্রেতৃগণ বিক্রেতার মনের গতি বুঝিবার জন্য নিরন্তরই প্রয়াসী। এক কথায় আমরা জীবনের দৈনিক কাজের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই অপরের মনের ভাব বুঝিতে ব্যস্ত থাকি।

মনস্তত্ত্ব যদি কি নিয়মে মনের ধারা বহিয়া চলে তাহা নির্ণয় করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের দৈনিক কাজের যে সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজকাল মনস্তত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে আমরা মানুষের মনের নিয়ম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাজেই ব্যবসায়, বিচারালয়, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই নিয়মের প্রয়োগের অবসর ঘটিয়াছে। আইনের দিক্ হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি। শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির পূর্ব্বে মানুষের শরীরে কতখানি সামর্থ্য তাহা না বুঝিয়াই বিচারালয়ে তাহার শাস্তি বিধান করা হইত। ফলে অনেকে বিচারকের অভিপ্রায়াতিরিক্ত শাস্তি পাইত। কারণ যে শাস্তি একজনের পক্ষে কম অপরের পক্ষে হয়ত তাহা অসহ্য। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া বিচার করাতেও আজকাল সেইরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। কারণ শরীরের শক্তির বা সহন ক্ষমতার যেমন একটা সীমা আছে মনেরও সেইরূপ। একজনের পক্ষে যাহা লঘু দণ্ড অপরের পক্ষে তাহা অসহ্য হইতে পারে। অথচ ডাক্তার যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও তৎপর তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় মনোবৈজ্ঞানিককে সেরূপ করিতে অবসর দেওয়া হয় না।

আজকাল মনস্তত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশে মনোবৈজ্ঞানিককে চিত্ত পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। বিচারালয়, ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসা—সকল বিভাগেই মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

অধ্যাপক রয়েস ও রাষ্ট্র বীমা

অধ্যাপক রয়েসের নাম দর্শনজগতে সুপরিচিত। আর্থান্ দার্শনিক ফিকটে যে চিন্তার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন রয়েস ও তাঁহার সহযোগী মুনষ্টারবার্গ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য একতত্ত্ববাদিগণের মধ্যে (Absolutist) রয়েসের স্থান অতি উচ্চে। দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও রয়েসের গবেষণায় বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়াছে। সাহিত্য ও গণিত বিষয়ে তিনি নানারূপ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল খ্রীষ্টধর্ম্মের মর্ম্মব্যাখ্যার জন্য দার্শনিক সম্প্রদায়ে যে আলোচনা চলিয়াছে রয়েস সে দিকেও তাঁর প্রতিভার আলোক বিস্তারে পরাঙ্মুখ হন নাই।

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রারম্ভে যখন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই যুদ্ধের চিরনির্ব্বাসনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন, দার্শনিক

রয়েলও নির্ব্বাক থাকিতে পারেন নাই। তিনি এক রাষ্ট্র বীমা প্রণালী দ্বারা শান্তি-রক্ষার দুষ্কারিতার প্রতিবিধান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রবীমার মূলতত্ত্ব রয়েসের দার্শনিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রয়েসের মতে ব্যক্তির জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যষ্টির উপর নির্ভর করে। কেবল বাহ্য অর্থের সহিত সংকর্ষেই জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, কেবল বস্তুর উপর বল প্রয়োগেই কর্ম্ম হয় না। বাহ্য অর্থের সংকর্ষ জনিত চিত্তবৃত্তির মর্ম্ম যদি ব্যষ্টির চিত্তবৃত্তিতে পরিণত না হয় তাহা হইলে ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞান বলা যায় না। কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগের মূলে যে চিত্তবৃত্তি আছে তাহা ব্যষ্টির জ্ঞান হইতে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসা চাই। কাজেই জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলে একটা ত্রিক Triadic সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেবল যুগলের সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না।

কেবল জ্ঞান ও কর্ম্ম বলিয়া নয়; রয়েসের মতে যুগল সম্বন্ধ (Dyadic relation) মাত্রেই স্থিতির অভাব। এ সম্বন্ধ অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। দম্পতীর প্রেম যেমন অপত্য স্নেহে দৃঢ়ীকৃত হয় যুগল সম্বন্ধ মাত্রই সেইরূপ একটী তৃতীয়ের সমাগমে দৃঢ়ীকৃত হয়। এই ত্রয়ীর সম্মিলনেই জগতের কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিত্তি।

এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ যুগলের সম্বন্ধেই আবদ্ধ রহিয়াছে। যদিও Triple Entente Triple alliance প্রভৃতির কথা আমরা অহরহঃ শুনিতে পাইতেছি তথাপি তাহাদের মিলনভূমি প্রকৃতপক্ষে দুই এর মধ্যেই আবদ্ধ। যে ত্রিক সম্বন্ধ বহুকে এক সূত্রে গ্রথিত করে তাহা অন্তরাষ্ট্রিক ব্যাপারে দুর্লভ। এই জন্যই এই মহাবিপ্লবের সূচনা।

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ত্রিক সম্বন্ধ স্থাপনের একটী প্রধান উপায়ই হইতেছে অন্তরাষ্ট্রিক বীমা। আজ কালকার সামাজিক চিন্তা অর্থনীতি দ্বারা চালিত হইতেছে। যাহা বৈষয়িক ব্যাপারের উন্নতিজনক নয়, যাহার মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ নাই তাহাকে লোকে Idle বা Smere speculation বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কাজেই অন্তরাষ্ট্রিক মিলনের ভিত্তি ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই জন্য রয়েস প্রস্তাব করেন যে সকল দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া একটী বীমা কোম্পানী স্থাপন করুন। এই কোম্পানীর অংশ বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন। অর্থাৎ লোকে যেমন Life insurance করে, গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ Life insurace করিবেন। হেগ কনফারেন্স আজ কাল কেবল রাষ্ট্র সমূহের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হইয়া রহিয়াছে, এই বীমাসমবায়ের দ্বারা তাহার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে।

এই Insurance সমবায়ের মূলধন যেরূপ প্রতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইবে, সেইরূপ সকল দেশেরই ব্যবসায় সাহায্যে নিযুক্ত হইবে। ইহার লাভের অংশ, যদি কোনও দেশে কোনও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় (যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি), তাহা হইলে সেই দেশের লোকের জন্য আংশিক ভাবে ব্যয়িত হইবে। ইহা ব্যতীত যদি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে যে দেশ প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহার অংশ বাজেয়াপ্ত হইবে ও এই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের (যেমন বেলজিয়মের) প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণে ব্যয়িত হইবে।

অনেকে বলিবেন যে এরূপ বীমা সমবায় স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু আজ কালকার সকল বীমা কোম্পানীই প্রায় অন্তরাষ্ট্রিক হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত বীমা প্রণালী অসম্ভব বিবেচনা করিবার কারণ নাই। অনেকে বলিবেন যে ইহাতে যুদ্ধ নিবারণের কোন আশাই নাই। একথা হয় ত সত্য। কিন্তু এইরূপ একটী সমবায় স্থাপিত হইলে অন্তরাষ্ট্রিক সম্বন্ধ যে দৃঢ়ীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

**
*

প্রেততত্ত্ব বা Psychical Research

মানুষ শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাহার জীবনকে এত ভালবাসে যে জীবন হানির সম্ভাবনায় সে নিতান্ত আকুল হইয়া উঠে। এই আকুলতার জন্যই মৃত্যুর পরপারে একটী নবজীবন লাভের আশা মানুষের মনে স্বভাবতঃই স্থান পায়। আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী, সুখ দুঃখের স্মৃতি, কর্ম্মের বন্ধন —এ সকল যেন দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এইগুলির দ্বারাই একজন মানুষকে আর একজন হইতে মানুষ বলিয়া জানা যায়। মনস্তত্ত্বের হিসাবে এইগুলিই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

মৃত্যুর পর যাহাতে নিজের এই ব্যক্তিত্ব না হারাইয়া যায় তাহার জন্য লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইহার উপর আবার আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে এই ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব জ্ঞানের একটা প্রবল আশা মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। মনে হয় আমি যাহাকে ভাল বাসি সে যদি মৃত্যুর পরে আবার জন্ম লাভ করিয়া থাকে তবে আমার দুঃখের তীব্রতা যেন কিছু হ্রাস হয়। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষার উপরই প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি না। এই প্রশ্নের সমাধান তিন প্রকারে হইতে পারে। প্রথমে আমরা দার্শনিক গবেষণা দ্বারা স্থির করিতে পারি যে জগতের প্রকৃতি অনুসারে মৃত্যুর উপর জীবন জয়লাভ না করিয়াই পারে না। কেবল বিশ্বের নিয়মেই এই যে প্রাণ কখনও নষ্ট হইতে পারে না; কখনও প্রকাশ কখনও অপ্রকাশ থাকিতে পারে মাত্র। কিন্তু জীবনস্রোতের চিরন্তন প্রবাহের বোধ নাই। ইহাকে তত্ত্বমূলক (Metaphysical) প্রমাণ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জগতের কতকগুলি ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রেতজীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। আমাদের একটা নৈতিক জীবন আছে। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ ন্যায় অন্যায় এই সকল লইয়াই আমাদের জীবন। এখন এই গুলির মর্ম্ম বুঝিতে হইলেই হয়ত প্রেতজীবন মানিয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রমাণকে ব্যাখ্যামূলক প্রমাণ (Explanatory postulation) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে প্রত্যক্ষতঃই প্রেতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা স্থানে ভূতের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন প্রেতগণ দৃশ্যতঃ উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া থাকে। লোকের মনে প্রেতাবির্ভাবের কথাও এদেশে অনেক শুনা যায়। ইহা ছাড়া প্রেতগণ নানারূপে medium এর মধ্য দিয়া নিজেদের অস্তিত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে বলিয়াও শোনা গিয়াছে। ইহাকে

প্রত্যক্ষমূলক যাইতে পারে।

Psychical Research Society এই প্রত্যক্ষমূলক বিচার দ্বারাই প্রেততত্ত্ব প্রমাণে প্রয়াসী। এই সমাজের কার্য্য প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে আরম্ভ হয়। বিলাতের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এই সভার সভ্য। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ধার্ম্মিক, সকলেই প্রেততত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই জন্য অনেকেই মনে করেন যে, যখন এতগুলি বড়লোক এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন তখন ইহা বোধ হয় প্রমাণের যোগ্য। অনেক সময়ে সভ্যগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেততত্ত্বে নিজের বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন—যেমন আজকাল Sir Oliver Lodge. এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, প্রেততত্ত্বে সংশয় করিবার আর কোনও কারণ নাই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ছোট বড় সকলেরই কতকগুলি খেয়াল থাকিতে পারে। কয়েকজন বড় লোক একটা বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন বলিয়াই যে সে বিষয়টী প্রমাণ সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে তাহার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে যে তাঁহারা ও ব্যাপারটীকে অবসর যাপনের একটা উপায় মাত্র বলিয়া মনে করেন; হয়ত তাঁহারাও জনসাধারণের মত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বশে বৈজ্ঞানিক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া একদেশদর্শী হইয়া পড়েন।

দ্বিতীয়তঃ দুই একজন বড়লোক একটা কথা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে সেটা ঠিক হইবে এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। Sir Oliver Lodge বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। পদার্থ বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়। একথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু সে জন্য যে তিনি ধর্ম্ম, দর্শন, বা মনস্তত্ত্বেও অদ্বিতীয় হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। এ সব বিষয়ে তাঁহার মত সাধারণের মত অপেক্ষা বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক নাও হইতে পারে। তিনি পদার্থ বিদ্যায় একজন বলিয়া সেই প্রতিপত্তির বলে তাঁহার অন্য মত গুলিকেও অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

তৃতীয়তঃ প্রমাণ দ্বারা আমরা যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি বিজ্ঞান হিসাবে প্রেতত্বকে ততটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। প্রমাণিত বিষয়কে বিশ্বাস বা শাস্ত্রোক্ত তথ্যের সহিত মিলিত করিয়া বর্দ্ধিত কলেবর করিয়া তুলিলে চলিবে না। অবশ্য আমরা একটা বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য একটা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের কোনও প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান প্রতিপাদিত সত্য ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সত্যকে বিকৃত করা নিতান্ত দোষাবহ।

আমাদের দেশে সকলেই আজকাল Psychical Research এর ফল গুলিকে উপপাদিত বলিয়া গ্রহণ করেন। আমরা বলিতেছি না যে Psychical research এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু কেবল authority'র উপর নির্ভর করিয়া কোনও তথ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৪। হিন্দুর বৈষয়িক সাধনা

জগতের কাছে ভারতের সম্মান তাহার দর্শনের জন্য। অধ্যাত্মরাজ্যে তাহার সাধনা এবং উন্নতি জগতের অন্যান্য জাতি-পুঞ্জ অপেক্ষা ঢের বেশী, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুস্থানে হিন্দুদের মানসিক এবং নৈতিক ক্ষমতার প্রাচুর্য্যকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই দিকে হিন্দুদের যেমন উন্নতি দেখা যায়, বৈষয়িক ব্যাপারে তেমনি তাহাদের অজ্ঞতা এবং অবনতি বড়ই হাস্যজনক। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি বৈষয়িক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আগে যেখানে বৈষয়িক প্রচেষ্টা বা উন্নতির চিহ্ন দেখা যায় নাই, পরে সেখানে মানসিক উন্নতি সম্ভাবিত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের স্থল কি কেবল এই ভারতবর্ষ? বস্তুতঃ অমন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। হিন্দুদের বহির্জ্জগতের প্রচেষ্টা কোন্ কোন্ আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই ধারণা করিয়া বসা যুক্তি সঙ্গত নহে। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বুঝিতে গিয়া তাহার মুনি ঋষি, ভিক্ষু সন্ন্যাসী, ধর্ম্ম সংস্থাপক এবং সাহিত্যসেবী, তাহার অমর সাহিত্য তাহার প্রকৃতির দিকে শুধু নজর দিলে চলিবে না, তাহার বীর এবং যোদ্ধা, তাহার রাষ্ট্রনীতিবিদ্ তাহার রাজমন্ত্রী এবং তাহার প্রসিদ্ধ কর্ম্মীবৃন্দের দিকেও নজর দিতে হইবে, কারণ তাঁহারাই দেশের বৈষয়িক অবস্থাকে এমন অগ্রসর করিতে পারিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দুর সাধনা অব্যাহত এবং প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল এবং এমন একটি শাসন-প্রণালী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল যাহার চরম ফল—সৌখ্য এবং শুপ্তবংশের অসাধারণ সমৃদ্ধি শক্তি। ভারতীয় ইতিহাসে কপিল এবং বুদ্ধ, পাণিনি এবং কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য এবং চৈতন্য যেমন প্রসিদ্ধ, চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত, অশোক এবং সমুদ্রগুপ্ত, চরক এবং সুশ্রুতও তেমনি প্রসিদ্ধ।

আমাদের মনে হয়, হিন্দুর সাহিত্য হইতে হিন্দুর জ্ঞানগরিমা প্রকাশ বা প্রমাণ করিবার দরকার আর এখন বেশী কিছু নাই। এখন তাহা হইতে হিন্দুর কর্ম্মচেষ্টা কতবিধ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার সময় আসিয়াছে। হিন্দু-চিন্তা বহির্ম্মুখে কি কি পদার্থে কি কি প্রণালীতে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিয়া হিন্দুর প্রাকৃত বিজ্ঞানের একটি সর্ব্বাঙ্গীন বিবরণ প্রকাশ করা এখন আবশ্যক।

আশার কথা এইদিকে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ ভেষজশাস্ত্রে, অস্ত্রবিদ্যায়, শারীরবিদ্যায়, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে, কলাবিদ্যায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রশিল্পে, ধাতুবিজ্ঞানে, ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যায় এবং রঞ্জনশিল্প প্রভৃতিতে কিরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমরা ইতিমধ্যেই তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, হিন্দুর রসায়নশাস্ত্র ও তৎপরীক্ষিত ফলরাশি, হিন্দুর হস্তগলিত যন্ত্রে নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার প্রাচীন জগতে বিস্তৃতিলাভ

করিয়াছিল এবং প্রাচীন বাণিজ্যে সিন্ধুর স্থান অতি উচ্চে ছিল। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই তাহার করায়ত্ত ছিল এবং তাহার উদ্ভাবিত অর্ণবযান প্রাচীন সভ্যতার একটি চরম আদর্শ। কিন্তু তবু এখনও আমাদের অনেক জানিবার আছে,—বাস্তবিকতে শুধু গৌরব-লাভের জন্য নহে, আমাদের মধ্যে কর্ম্মশক্তির বীজ নিহিত আছে এই বোধটা জাগাইবার জন্য। আমরা অধ্যাত্মরাজ্যে বড়, আমরা কর্ম্মরাজ্যেও ছোট নহি, এই জ্ঞান না থাকিলে আমরা কেবলমাত্র আলস্যের প্রশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব—আমরা কখনই কর্ম্মে নামিতে সাহস পাইব না।

* *
*

৫। বিদ্যালয়ের আকর্ষণ

শ্রদ্ধা ভক্তি আমাদের মনে যে পরিমাণে আছে সেরূপ অন্য দেশীয়দের নাই এইরূপ আমরা মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের হৃদয়ের সেই মহা সম্বল আজকাল আমরা কতখানি হারাইয়াছি। যে পাশ্চাত্যদিগকে আমরা শ্রদ্ধাশূন্য, অর্থান্বেষী ও স্বার্থপর বলিয়া সর্ব্বদা বিদ্রূপের চক্ষে দেখি তাহারা যে এই বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা আজকাল কত উচ্চে তাহা তাহাদের প্রতিকার্য্যে ধরা পড়ে। তাহারা অর্থান্বেষী হইতে পারে তাহা হইলেও অস্বীকার করার উপায় নাই যে অন্ততঃ তাহারা অর্থকেও শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখে—কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যদি অন্ততঃ সেই পরিমাণ শ্রদ্ধাও থাকিত তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত হইতাম। একটী জিনিষ হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মী ছাত্রগণের জীবনে যে বীজ রোপিত হয়, তাহাই ভবিষ্যতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত দেশীয় কর্ম্মজীবনকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই ভবিষ্যতের আশা দেশের একমাত্র সম্বল, আমাদের ছাত্রগণের জীবনে এরূপ কোন মহা বৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছে কি যাহার শ্যাম পল্লবচ্ছায়ার সুশীতল ও শান্তিময় স্পর্শে দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র নন্দনের মহিমাময় দীপ্তি ধারণ করিবে? আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর নানাপ্রকার দোষ থাকিতে পারে—কিন্তু সে গুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি, শিক্ষামন্দির গুলি, প্রতিবৎসর যাহার হস্তে শত শত জীবন গঠনের ভার ন্যস্ত হইতেছে, তাহারা কোন দিন ছাত্র-হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষামন্দির ত্যাগ করিয়া আমাদের ছাত্রগণ মনে করে যে তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। আমাদের এরূপ কোন বন্দোবস্তও নাই যাহা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষামন্দিরের সহিত ছাত্রগণের সমস্ত সমস্ত জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজ করিতে পারে। যাহার নিকট হইতে নানাপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবনব্রতে প্রবৃত্ত হই—আমরা তাহার নিকট হইতে দূরে গেলেই তাহার কথা ভুলিয়া যাই ইহা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় আর কোথায়? আমাদের প্রকৃতিগত বহু দিবসের সেই মহা বৃক্ষের মূল যে উপযুক্ত আদর্শ ও আশ্রয় অভাবে ক্রমে উৎপাটিত হইতে চলিয়াছে তাহার দিকে কি বিশ্ববিদ্যালয় বা

শিক্ষা মন্দিরগুলি মনোযোগ দিবেন না? পুণ্যাত্মা তারকনাথ ও দেশপূজ্য সার রাসবিহারীর ন্যায় আত্মত্যাগী যাহাতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সন্তানই হন ইহার জন্য কি কোন নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হইবে না? আমাদের সেই প্রাচীন গুরু-গৃহের ভক্তিবিনত ছাত্রজীবনের সহিত আধুনিক এই ছাত্র জীবনের কি ভীষণ অসামঞ্জস্য। আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক অনুকরণ করিতেছি—আমাদের সমস্ত শিক্ষামন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ই তদ্দেশীয় আদর্শের উপর সংস্থাপিত। কিন্তু পাশ্চাত্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহাদের সন্তানগণের যে জীবনব্যাপী সুদৃঢ় বন্ধন নানা উপায়ে সংরক্ষিত হয় তাহার অনুকরণ ত আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই করেন নাই। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত—শিক্ষা-মন্দিরের সহিত সমস্ত শ্রদ্ধার বন্ধন তাহার ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া আসে। আমাদের ছাত্রজীবনের এই মহা অভাব পরিপূর্ণ করিয়া যাহাতে ছাত্রগণকে প্রকৃত মানুষ করা হয় তাহার দিকে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

* *
*

৬। হিন্দুর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি

ভারত তুমি চিরদিনই মুক্তির জন্য পাগল। মুক্তি কোথায়, মুক্তি কেমন করিয়া হয়, মুক্তির ফলাফল কিরূপ তাহা তুমি জান কি? তুমি না জানিলে চাহিবেই বা কেন। মুক্তি পাতে চাই জ্ঞান, চাই কর্ম্ম আর চাই ভক্তি। জ্ঞানে শ্রদ্ধা, কর্ম্মে শ্রদ্ধা, ভক্তিতে শ্রদ্ধা না থাকিলে লোক মুক্ত হয় না, মুক্তি পায় না। তারপর মুক্তি চায় প্রাণী মাত্রেই, কেহ আজ চাহিতেছে কাল মুক্ত হইয়া যাইতেছে, আজ যে চেতন কাল সে আহার নিদ্রার অধীন থাকিয়াও জড় হইয়া যাইতেছে। তুমি আজ চেতন তুমি জগৎকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি রাখ, তোমার আপন পর জ্ঞান আছে তুমি উপকারীর উপকারের কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিবার দাবী রাখ তাই তুমি মুক্তির জন্য, মুক্তির পথ না পাইয়াও সন্ধান অদৃশ্য হইলেও বলিতেছ মুক্তি চাই, চাইই। মুক্তির ফল চিরশান্তি। সে শান্তির বার্ত্তা তোমায় আমায় কে দিল? তুমি আমি তার খবর ত দূরে থাক পাতা বই পড়িয়া পাই নাই তবে কেন আমরা আজ না হউক দশ দিন পরেই মুক্তি চাই। যেখানে বিশ্বমানবের অশান্ত অতৃপ্ত হৃদয় পৌঁছিতে চায়, বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন, গিরি গুহা ভেদ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া সেই এক পথ চায় কে সে সন্ধানী? জানিবে আইস; আমরা হিন্দু—ভক্তি গঙ্গাজলে স্নান করিব, শুদ্ধ চিত্ত হইব তাহার পর জ্ঞানের তিলক ললাটে ধারণ করিয়া কর্ম্মময় জপ করিব। পারিবে? এস মুক্তির সন্ধান আমি তোমায় দিব। তোমার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ খেলিতেছে তুমি তাহাতেই কূল পাইবে। তোমার তরঙ্গ আরও বাড়িয়া উঠুক তুমি উন্মাদ হও তবে তুমি জানিতে পারিবে তোমাদের শিরায় শিরায় যাঁহাদের শোণিতের পবিত্র বিন্দু প্রবাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের কূলে গিয়া প্রচণ্ডাঘাতে প্রতিহত হইতেছে তাঁহারাই মুক্তির সন্ধানী—তাঁহারাই তোমার আমার পূর্ব্ব পুরুষ পিতা পিতামহ। তাঁহারাই জননী ভারতকে শোণিত করিতে যাইয়া যখন অবিনশ্বর পদার্থের সন্ধানে তন্ময় হইয়া

ছিলেন অসংখ্য রত্নরাজি আহরণ করিয়াও যখন তৃপ্ত হইলেন না, কেবল অশান্তি, আরও চাই—'নেতি', যুগযুগান্ত বাহিয়া গেল তবুও 'নেতি', তখনই সন্ধান মিলিল; তখন তাঁহারা ভারতকে এক নবীনরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৈ তুমি ত অতৃপ্ত নও, তোমার হৃদয় ত নবীনরূপ দেখিতে চায় না, তুমি স্বল্প জ্ঞান লইয়া কি করিয়া মুক্তির দ্বারে দাঁড়াইবে?

তার পর তোমার কর্ম্মেও ত নিষ্ঠা দেখিতেছি না। তুমি সাধকের সাধনা, ত্যাগীর ত্যাগ দেখিয়া একবারও ত ফিরিয়া চাহ না। তোমার হৃদয় কি প্রত্যহ নূতন কিছুই দেখে না? তুমি মুক্তির সন্ধান চাও—সুতরাং তোমাকে অনেক করিতে হইবে, তুমি কর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হও। জগৎকে তোমার পদানত করিতে হইবে, পর্ব্বতকে উঠাইয়া সাগর করিতে হইবে, চন্দ্র সূর্য্যের পথ ঘুরাইয়া তোমাকে নূতন পথ বাহির করিতে হইবে। জগৎকে নূতন সন্ধান দিতে হইবে। বসিয়া থাকিলে মুক্তি লাভ হয় না। তোমার পদরাপে পরিবর্ত্তনপ্রার্থী সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে? সে শক্তি আছে? বিস্মিত হইও না। তোমারই সব।

তারপর আর একটা কথা বলিব। তোমার মুক্তিলাভের শেষ উপায় ভক্তি। তুমি মুক্তি চাহিতেছ—এস, তোমার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন পড়িবে, অনেক মায়া মমতা, স্নেহের মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইবে, তুমি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া হাসিয়া প্রাণ দিতেছ তাহারা আকুল আর্ত্তনাদে ধরণী প্লাবিত করিবে, তুমি "হৃদয় গলিবে না, চরণ টলিবে না কাহারো আকুল ক্রন্দনে" বলিতে বলিতে আপন পথে চলিয়া যাইবে। তুমি ভক্তিতে মুক্তি চাও, তোমায় কর্ম্মশিবির ভূমিকা টানিতে হইবে; দাস্যভাবে তোমার অহেতুকী ভক্তি জাগ্রত হইলে তবে তুমি মুক্তির সন্ধান পাইবে। তুমি কেবল মুক্তি চাহিয়াছ উপায় চাও নাই। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছ তাই জ্ঞানবাণী অনেক দূরে রহিয়াছে। এখন তোমার সম্মুখে দুইটী পথ আছে একটী বাছিয়া লও হয় কর্ম্ম না হয় ভক্তি। তুমি যে ভাবেই ভাবুক হও না কেন তাহাতেই বিশ্বময়ীর বিরাট সত্তা অনুভব করিতে পারিবে। তখন তুমি "প্রতিকণ জড়জীবে" তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে তোমার মুক্তির পথ সেই খানেই আরম্ভ হইবে।

তুমি বল আমি ভারতবাসী আমি মুক্ত, প্রার্থী আমি মুক্ত, আমিই মুক্তি দাতা। তুমি বিস্মিত হইও না, তুমি চিরদিন একই ভাবে আছ তাই শত শত দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ভোগে তৃপ্ত হইয়াও তুমি চাহিতেছ মুক্তি, তুমি চাহিতেছ চিরশান্তি। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখ তোমার সম্মুখে কত আবর্জ্জনা পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার পিছনে কত আকর্ষণ রহিয়াছে, তোমার ভ্রাতা ভগিনী প্রতিবেশী বিদেশী সকলের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে এক করিয়া লও। থাকুক তোমার পথে শত শত বাধাবিঘ্ন, পিছনে শত আকর্ষণ, থাকুক কুসংস্কার, অজ্ঞতা অর্ব্বাচীনতা। তুমি জ্ঞানী হইয়া 'নেতি' না বল, তোমার বৈরাগ্য আজ শতমুখী সমাজকে শান্ত করিতে না পারুক তাহাতে দুঃখ কি? তুমি সম্মুখে অসম্পাদিত, পরিত্যক্ত, বাতুলতাময় কর্ম্মগুলিকে ধরিয়া লও, তারপর ভিল ভিল করিয়া পড়িতে পড়িতে দহিতে দহিতে যখন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখনও তোমার লক্ষ্য, আশা মুক্তির দিকেই থাকিবে। যুগ যুগান্তের সন্ধানলাভ করিয়া সকলকে সঙ্গে লও, মুক্তির উপায় সকলকে বলিয়া দাও। তোমার আশা সকল দিকে ধ্বনিত হউক—আমরা মুক্তি চাই।

* *
*

৭। সামাজিক উন্নতির অন্তরায়

সমাজে ধর্ম্ম হিসাবে একই উপাস্যের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসক থাকেন; তাঁহাদের মতবাদ, আচার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ থাকেন গোঁড়া রক্ষণশীল আবার কেহ বা গোঁড়া

উদারনৈতিক। সেইরূপ রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি নানাদিকেও বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন নিয়ম প্রণালীর প্রবর্তন দেখিতে পাই। নিয়ম-প্রবর্তন বেশ ভাল বলিয়াই মনে করি কারণ ইহাতে বিভিন্ন হৃদয়ের উচ্চভাব ও মস্তিষ্কের প্রখরতা প্রকাশ পায়। মানব-সমাজ যে ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে তাহা সমাজে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির অভ্যুত্থানেই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সমাজেও সম্প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সকল চিন্তাপ্রণালী মাত্রই যে তাহাদের উদ্ভাবনার ফল তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

নব্য ভাবুকদিগের অন্যতম এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, আমরা সুদূর অতীতের স্মৃতি, আমাদের পিতৃপিতামহগণের কীর্ত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই হীনবল হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে আলস্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা তাঁহাদের ধ্বজা উড়াইয়া বড় হইতে চাহিতেছি, জাতীয় উন্নতির এইগুলিই অন্যতম অন্তরায়।

কিন্তু তাই কি ঠিক? যাহারা কর্ম্মী প্রকৃতই কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত, যাহারা স্বদেশসেবক প্রকৃতই জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, যাঁহারা আপনাদের অশন বসনের ব্যবস্থা আপনারাই করিতে চায়, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে উজ্জীবন করিতে চায় তাহারা কি অতীতের স্মৃতি কিম্বা পিতৃপিতামহের যশোগান করিয়া জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত করিতে পারে? পিতৃপিতামহগণের যশোগানে কি জাতীয় চরিত্র অবনত হয়, জাতীয় উন্নতির প্রতিকূলে কি তাই? যে জাতি অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া অক্ষম হয় হীনবল হয় সে জাতি একটা জাতি নহে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে অচিরে লুপ্ত হওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য। সে জাতি সংসারের পক্ষে, উন্নতিশীল জগতের নিকট, এক স্তূপ আবর্জ্জনা, রাশি রাশি দুগ্ধভাণ্ডে একবিন্দু গোমূত্র সদৃশ। আমাদের সমাজকে উঠাইতে যাইয়া যাঁহারা এই চিন্তাপ্রণালী প্রচার করেন তাঁহাদের এই চিন্তা শক্তি অন্যের নিকট হইতে ধার করা বলিয়াই ধারণা হয়। যাঁহাদের অতীত নাই, যাহাদের প্রাচীন ইতিহাসে কোন গৌরবের ভূমিকা নাই, যাঁহারা অতীতের সৃষ্টি করিতে যাইয়া বর্ত্তমানেরই যশোগান করেন তাঁহারাই এই বাণীর উদ্ভাবক। জগতের কোন জাতি অতীত চায় না একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। কাহারও লাখ লাখ বৎসর পূর্ব্ব হইতে অতীতের সুমধুর ঝঙ্কারে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হইতেছেন আবার কাহারও বা অতীতের গৌরবইতিহাসের পৃষ্ঠায় বদ্ধ হইবার জন্য এইমাত্র ধরা দিতেছে। তারপর আমরা বলিতে চাই সমাজের যে অংশ এই বাণী প্রচার করিতেছেন তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা এখনও মতবাদই প্রচার করিতেছেন।

আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতিকে গাঢ়-তমিস্রাপূর্ণ কাল্পনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করিতে যাইয়া বক্তা দেখিলেন তাঁহার যুক্তিতে আমরা বাঙ্গালী ভারতবাসী মোহিত হইয়াছি। এই সম্মোহন যতই আমাদিগকে আঘাত দিতেছিল ততই আমরা দ্বিগুণ হিসাবে নীচে নামিতেছিলাম। একটা ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিত্বের নিন্দা করিতে থাকিলে তাহার অধঃপতনের সূচনা দেখা যায় আর একটা জাতি যাহার সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে একমাত্র সান্ত্বনা তাহার বংশগৌরব ও পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি, তাহাই যদি লুপ্ত হইতে যায় তবে তাহার আর কি থাকিল? নিজেদের আর কি আছে? আপন বলিবার শুধু এক অতীতের স্মৃতি। আমাদের নব্যসম্প্রদায় যেন অতীতের কাহিনী স্মরণে ভীত না হন। আমরা যদি অতীতের স্মৃতিতে বিভোর হইতাম, অতীতের কাহিনী গুলিকে হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অন্যরূপ হইত— আমরা মানুষ হইতে পারিতাম। যাঁহারা অতীত কাহিনী স্মরণকে জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল মনে করেন, এবং যাঁহারা অতীতের

স্মৃতিতে তন্ময় হন নাই, তাঁহারা উভয়েই এখনও কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতভাবে প্রবেশ করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না।

অতীতের স্মৃতিকে ভয় করিবার কিছুই নাই। জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ঠিক তাহার বিপরীত আচরণে। আমরা জটিল সভ্যতার ধরণ ধারণগুলি লইয়া জাতীয় উন্নতির অনুকূলে দাঁড়াইতে চাহি কিন্তু আমাদের জাতীয় সভ্যতাভাণ্ডারে কতটুকু জাতিত্ব আছে? মারাঠি, পাঞ্জাবী, তামিলী, হিন্দুস্থানী, প্রভৃতি সকলেরই একটা জাতিত্ব বোধ আছে, স্বতন্ত্রভাবে আমাদেরও আছে, নাই সেখানে যেখানে মারাঠি, দ্রাবিড়ী, তামিলী, হিন্দুস্থানী ও আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী আসীন।

নব্য ভারতের উন্নতির প্রবর্ত্তক যদি আমরা বাঙ্গালীই হই যদি সমুদায় ভারতবাসী আমাদের দ্বারাই মহান কর্ত্তব্য সাধিত হইবে আশা করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব আমরা এত শীঘ্র শীঘ্র পরাহুবাদ ও পরমুখনিগত বাণীগুলি সত্যরূপে গ্রহণ করিতেছি যে, আমাদের দ্বারা বিষম অনিষ্টও সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাঁহারা কিছুই করিবেন না কোন নূতন চিন্তা যাঁহাদের দ্বারা প্রসূত হইবে না তাঁহারা শুধু আমাদের অতীতের স্মৃতি স্মরণ করুন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুন। ইহাই তাঁহাদের কাজ, ইহাই আমাদের জীবনসাধনার অন্যতম উপায় হউক।

* *
*

৮। সাগরের ডাক

তিনটি জিনিষের সন্নিচয়ে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ মানুষের লীলা, দ্বিতীয়তঃ বাহ্য ঘটনা ও কার্য্যের সমাবেশ, তৃতীয়তঃ একটী ভাবের উন্মেষ। এই তিনটীর মধ্যে যে কোনটী নাটকের মুখ্য বিষয় ও মূলগত হইতে পারে। এই গুলির এক একটীর প্রাধান্য অনুসারে নাটকের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের লীলা যেখানে ঘটনা ও ভাবের সৃষ্টি করে, সেখানে নায়ক নায়িকার Temperament হইতেই plot ও ideal এর সৃষ্টি হয় তাহার উদাহরণ নাট্য-সাহিত্যে দুর্লভ নহে। Hamlet কে এই শ্রেণীর নাটক বলা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার বাহ্য ঘটনার সমাবেশেই নাটকের প্রাণ সৃষ্টি হয়। Plot এই নায়ক নায়িকার চরিত্রের ও আদর্শের গতি নির্ণয় করে। Shakespear এর Comedy of Errors কে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া নাটক আর এক রকম আকার ধারণ করিতে পারে। নাটকের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা ভাব বা আদর্শ থাকে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর নাটকে এই ভাব ঘটনার সমাবেশ ও মানব প্রকৃতির স্ফুরণের ফল বা কার্য্যমাত্র। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রকারের নাটকে ভাবের দ্বারাই মানবচরিত্রের লীলা ও ঘটনার সমাবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। Character ও plot যেন এই আদর্শের এই ভাবের আত্মবিকাশের ভাষা মাত্র। Browning এর Paracelsus এই প্রকারের নাটক। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সাগরের ডাককেও আমরা এই শ্রেণীতে ফেলিতে চাই। নাটকের নায়ক মধু অনন্তের পিপাসায় আত্মহারা হইয়া কার্য্যের উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। অনন্তকে অনন্ত সাগরকে হয় কূপবাপীতে পরিণত করে না হয় কেবল মাত্র কাল্পনিক ও ক্ষণিক অনুভূতির বিষয় মনে করে। মধু চান অপরোক্ষ অনুভূতি, সাক্ষাৎকার। তাই তিনি "পতী পাড়া" হইতে নূতন বন্দরে, চলিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখিলেন যে সাগরকে কেবলমাত্র একটা কবির কল্পনাতে পরিণত করা হইয়াছে। তাই মধু পথে বাহির হইলেন। এই পথে চলাটা ধর্ম্মপিপাসার Dialectic movement—আঁধারে আলোতে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় জীবনটা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। প্রতি নিমেষেই আশার স্মৃতি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই প্রতিপদে সাগরের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আবার যেখান

হইতেছে যে এই পিপাসার শান্তি নিজে নিজে হয় না। এমন একজন চাই যে হাতে হাত দিয়া কণ্টক সঙ্কুল সরণে পিপাসুকে তার বাঞ্ছিত সাগরের দিকে লইয়া যাইবে। এমন একটা হৃদয় আবশ্যক যে নিজের বলে অপরের ক্ষীণ প্রাণকে বলীয়ান করিয়া তুলিবে। ইহা ছাড়া মানবের প্রাণ একক এত দূর পথ বাহিয়া চলিতে পারে না। এই যুগলের সন্ধানই চলিতেছে হিন্দুর গুরুবাদ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুগলের যুগলত্ব থাকে না। প্রাণে প্রাণ মিশিয়া যায়, হৃদয়ে হৃদয় লীন হয়; পরে যখন সাগরের ভীষণ মধুর নির্ঘোষ মনের দ্বারে আসিয়া আঘাত করে তখন যেন শুরুশিষ্য একত্র মিশিয়া অনন্তের পানে ছুটিয়া চলে।

কিন্তু এইখানেই পথের শেষ নয়। যে পথ বাহিয়া সাগরের মুখে যাওয়া যায় স্নান তৃপ্ত প্রাণ আবার সেই পথ বাহিয়া ফিরিয়া আসে। তখন আঁধার মধুর গোধূলির আলোয় হাসিয়া উঠে, পথের তৃণ ধূলা ফুল হইয়া ফুটে, সংসারের পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা অর্চ্চনার ধূপগন্ধে আমোদিত হয়। এইরূপে সাগরও "উল্টাডাঙা"তেও করুণার স্রোত প্রবাহিত করিল।

দর্শনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই গতিটাই Dialectic। ইহা সুপরিচিত Hegelian Dialectic নয়। ইহার গতি অন্যরূপ —প্রতিপদেই একটা Antithesis আসিয়া Thesisকে চূর্ণিত করে না। আজকাল আমাদের দেশের বইগুলি এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সব গুলিতেই আমরা এই Dialectic পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাসগুপ্তার "বসন্ত প্রয়াণ" ও "ত্রিবেণী সঙ্গম" ও "সাগরের ডাক", সর্ব্বত্রই আমরা জীবনের এই নূতন গতির পরিচয় পাইতেছি। আশা করি কোনও দার্শনিক এই গতির Logic আমাদের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিবেন।

"সাগরের ডাক" এর মূলগত ভাব জীবনের এই অভিনব আদর্শ। এই আদর্শই নানা মূর্ত্তিতে নানা পথে আত্মবিকাশ করিয়াছে ও নাটিকার Character ও Plot এর সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "রাজা"র নায়ক নায়িকাদের যেমন একটা realistic প্রকৃতি আছে, তাহাদিগকে যেমন কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা আদর্শের নাম বা প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইবার কারণ নাই, "সাগরের ডাক" সম্বন্ধে আমরা সে কথা বলিতে পারি না। ইহার নায়ক রক্তমাংসের মানুষের মত মোটেই ব্যবহার করে না। একটীও অবান্তর কথা বলে না। কাজেই যদি লেখকের ভাষা চাতুর্য্যের একটুও অভাব হইত তবে দুই এক জায়গায় পড়িয়া মনে হইত যেন কেবল কতকগুলি বক্তৃতা একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা সমালোচনা শেষ করিব। বইখানি পড়িয়াই বুঝা যায় যে লেখক কি বলিতে চান তাহা তাঁহার মনে অতি স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান। যদি তাহা না হইত যদি লেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাবটী ফুটিয়া উঠিত তবে বোধ হয় উপরোক্ত দোষটী মোটেই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু ভাবটীই সেই সঙ্গে অপরিস্ফুট থাকিয়া যাইত। লেখক তাঁহার অসাধারণ শব্দ নির্ব্বাচন ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় পুস্তক খানির যদি অপর কোনও দোষ থাকে তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন।

* *
*

৯। পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী

বাঙ্গালা দেশে অনেক কর্ম্মী আছেন, কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহাদের নাম যশ বেশী। হয়ত তাঁহারা চোকা চোকা ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন বা লিখিতে পারেন—হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির আড়ম্বর তাঁহাদের আছে—হয়ত আভিজাত্যের মর্য্যাদাও তাঁহাদের থাকিতে পারে। সেই জন্য তাঁহাদের চারিপাশে একটা মোহের সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া একটা হৈ চৈ ব্যাপারের অভিনয় করে।

কিন্তু আমরা কর্ম্মী অপেক্ষা কর্ম্মকেই বেশী শ্রদ্ধা করিতে চাই। আমরা দেখিতে চাই কর্ম্মই কর্ম্মীকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে—কর্ম্মের কেহই বিকৃত হইতে বিকৃততর হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু কর্ম্মীর নাম যশ নহে। এই ভাবে নিজেকে আড়ালে রাখিয়া যিনি কর্ম্ম ধারাকে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারেন, আমরা তাঁহারই মধ্যে ভারতীয় কর্ম্মবীরের সাধনা পরিস্ফুট দেখিয়া থাকি নিজের নামধাম নিজের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস খোঁজ করিবার ভার ভবিষ্যৎ বংশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে ফেলিয়া যিনি তাঁহার কর্ম্মকে লোকচক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত রাখিয়া যাইতে পারেন তিনিই ভারতের সন্তান।

পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবনে আমরা এই ভারতীয় কর্ম্মসাধনার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। উচ্চ উপাধি ধন সম্পদ বা অদ্ভুত সাহিত্য-প্রতিভা প্রভৃতি যে সকল বাজার গরম করিবার গুণ, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল, অনুরাগ ছিল আর ছিল তাঁহার বিপুল পরিশ্রম করিবার শক্তি। সে সমস্তই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-প্রচার-অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-রচনায় রস পাইয়া থাকেন অনেকেই, সাহিত্য-প্রচার বা প্রচার-ক্ষেত্র নির্ম্মাণে রস উপভোগ অনেকেই করিতে চাহেন না বা পারেন না। কিন্তু ব্যোমকেশ সেই রস-উপভোগ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। ভুল করিলে চলিবে না সাহিত্য-অনুরাগ কেবলমাত্র লেখকেরই সম্পত্তি। পাঠক এবং প্রচারক উভয়েই তাহার অধিকারী, অতএব এ উভয়কে সাহিত্যের আসর হইতে বাদ দিলে চলে না। ব্যোমকেশকেও সেই জন্য আমরা সাহিত্যসেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা, তাহার শ্রীবৃদ্ধি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানে ব্যোমকেশ সেই সেবার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ জানেন এই সেবাধর্ম্ম পালনে তিনি কতখানি আন্তরিকতা, কতখানি নিঃস্বার্থপরতা, কতখানি ত্যাগ স্বীকার দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাহিরের লোক তাহা জানে না!—তাহারা কর্ম্মফল দেখিয়াছে কিন্তু তাহার পশ্চাতে কর্ম্মীকে দেখিতে পায় নাই—ইহাই ব্যোমকেশের বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্যোমকেশ চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্ম্ম রহিল। দেশবাসী সেই কর্ম্মকে প্রীতির চোখে না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না। কর্ম্মী তাঁহাদিগের নিকটে কোন প্রতিদানই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, কিন্তু কর্ম্মীর প্রতি তাঁহাদিগের একটা কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা সেই কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড ঋণের ভার ক্ষুদ্র পরিবারের স্কন্ধে চাপাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এই ঋণ হইতে মুক্তি দিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, একথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

**
*

১০। কর্ম্মীর নীরবতা।

একজনকে আদর্শ রাখিয়াই তাঁহার অধীনে শত শত সেবক কর্ম্মী গঠিত হইতে থাকে। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী হইতে চাহেন, তাঁহারা যখন তখন নিজেদের আন্তরিকতা, অসার বাগ্মিতা প্রকাশ করেন না। কর্ম্মিগণকে সর্ব্বদাই সংযত সংহত হইয়া আদর্শ ব্যক্তির আদেশ পালন করিতে হয়। যিনি আদর্শ ব্যক্তির নিকট নিজ প্রাধান্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন, তাঁহার দ্বারা সময়ে বিপদ ঘটিতে পারে। যখনই তাঁহার ব্যক্তিত্বে আঘাত পড়িবে তখনই তিনি সে নীচ প্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে ছাড়িবেন না। এই জন্যই আমাদের সমাজ সেবায় অন্ত নীরব কর্ম্মীর সর্ব্বদা প্রয়োজন। কর্ম্মীর নীরবতা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্য্য কলাপের অনুশীলন দ্বারাই আসে। কর্ম্মীকে সংযত করিবার জন্য আদর্শ পুরুষকে বিভিন্নরূপ শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত করিতে হয়।

নীরব সেবক-কর্ম্মীর দ্বারাই সাম্প্রদায়িক মতবাদ পুষ্টিলাভ করে ও তাহার দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন ও রামকৃষ্ণের সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নীরব কর্ম্মী দেখিয়াছি এবং তাহাদের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য আজও সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁহাদের চরিত্রের পরিচয় রহিয়াছে, তাঁহারা গুরুসমীপে নীরবতা পালন দ্বারাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গুরুসমীপে আত্মসমর্পন ব্যতীত নীরবতার ভাব আসে না। আত্মসমর্পন করা গুরু শিষ্য উভয়ের উপরেই নির্ভর করে। গুরু বা আদর্শ পুরুষের কোন দিনই ইচ্ছা নয় যে কর্ম্মীকে চাপিয়া রাখিয়া আপন কৃতিত্ব জাহির করেন। সেবকের কৃতিত্বেই তাঁহার কৃতিত্ব; সেবকের শান্তিতেই তাঁহার শান্তি।

সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন শ্রেণীর কর্ম্মী দেখা যায়—এক শ্রেণী নামে সেবক কিন্তু আপন কৃতিত্ব প্রচারে উৎসুক, দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। আর এক শ্রেণী আছে তাহারা নিঃস্বার্থভাবে যে কোন কাজ করিতে পারে। ইহাদের নিজেদের কোন ব্যক্তিত্ব নাই। ইহারা Blind follower বা অবিবেচক কর্ম্মী হইলেও সাম্প্রদায়িক অনিষ্টের কোন হেতু নহে। তারপর যাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তাঁহারা আপন বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রখরতা জাহির করেন না। দাম্ভিকতা দ্বারা আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উদ্বেগ তাঁহাদের নাই। নিঃস্বার্থভাবে সাম্প্রদায়িক কাজ কর্ম্মের বিধান করিতে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাইবার প্রয়োজন তাহাতিরিক্ত তাঁহারা প্রকাশ করেন না, সর্ব্বদাই আদর্শ পুরুষের আজ্ঞাপালনই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া "যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই সমাজের জন্য আপনাকে তাঁহারা বিলাইয়া দিতে থাকেন।

বিনা বিচারে বিনা তর্কে, কোন যুক্তির আশ্রয় না লইয়া যখন কর্ম্মী আদর্শ-পুরুষের ভিতর দিয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যকে ধরিতে চায়, তখন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুরুর আদেশে আপন উজ্জ্বল বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইতে দেখিয়াও কোন রূপ অপ্রসন্নতা প্রকাশ করে না। ইহাতেই তাহার আত্মার প্রশস্তি। গুরুর মাহাত্ম্য সাম্প্রদায়িক কর্ম্ম প্রণালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করে। এইরূপ কর্ম্মীর দ্বারাই সমাজে নূতন আলোক আসে, একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা করে।

কর্ম্মবীর হনুমান ও অর্জ্জুন এই দাস্যভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উভয়েই ব্যক্তিত্বের আদর্শ, মূর্ত্তিমান প্রলয় কিন্তু তবুও সংযত, আপনাদের উপাস্যের কাছে দিনাতিদীন, ইহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য বিকাশের কারণ। কর্ম্মীর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মসমর্পন দ্বারা নীরবতা অর্জ্জনের প্রয়োজন। সমাজ-গঠন, রাষ্ট্রগঠন বিভিন্ন কর্ম্ম প্রণালীর প্রবর্ত্তন কর্ম্মীর ব্যক্তিত্বেরই উপর নির্ভর করে। জ্ঞানে হউক, কর্ম্মে হউক, আর ভক্তিতেই হউক, চাই নীরবতা, চাই দাস্যভাব। আমরা প্রমাণ করিতে চাই কর্ম্মীর নীরবতা সমাজ জীবনের ভিত্তি। আমরা চাই শত ভ্রান্তি শত অন্যায় দেখিয়াও সে গুলিকে মঙ্গলের দীপ শিখা বলিয়া বরণ করিতে। আমরা চাই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে।

* *
*

১১। বঙ্গবাণীর ভাবীসেবক

বাঙ্গালা সাহিত্যের রঙ্গভূমে নামিয়া আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেই হোতারূপে দেখিতে পাইতেছি। মুসলমানগণ ভিন্নদেশ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিলেও সম্প্রতি আপনাদের ভ্রম-সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া নানাধিক বাহির হইতেছেন। মহম্মদীয় সম্প্রদায়কগণের পরিচালিত ২।৪ খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রই মাতৃভাষার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই কেবল মাত্র মুসলমান লেখকদিগের দ্বারাই একখানি মাসিক পত্র চলিতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের আরবিক ও পারসিক

সাহিত্যের দিকেই তাকাইয়া রহেন নাই, অথবা ভারতের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় কেবল মাত্র মুসলমানগণের রণহুঙ্কারের দ্বারাই পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্যের পরিচয় দিতেছেন না। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি তাঁহারা মাতৃভাষার একনিষ্ঠ শক্তিমান সেবক। তাঁহারা আমাদের উন্নতির জন্য কোন নূতন চিন্তা বা পরিকল্পনা খাড়া করিতে না পারিলেও বিভিন্নভাবে আপনাদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী পারসিক সাহিত্যের অনুবাদ দ্বারা বঙ্গভাষার পুষ্টি তাঁহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। গ্রাম্য মুসলমান কবিগণও মাতৃভাষার সেবায় নিরত।

আমরা এক কবি মধুসূদন ব্যতীত বঙ্গীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি না দেখিলেও তাঁহারা যে বাঙ্গালী জাতি এইটা আমরা তাঁহাদের কথোপকথনের ও চালচলনের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছি।

এতদিন সংস্কৃত সাহিত্য ম্যাক্সমূলার প্রমুখ আর্য্যাণ পণ্ডিতগণেরই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞানের রক্ষণ ও বিপুল প্রচার এই সকল আর্য্যাণ পণ্ডিতগণেরই চেষ্টার ফল। আজ বাঙ্গালা সাহিত্য আর্য্যাণ, ইংলিশ আমেরিক ও জাপানীদিগের পঠনীয় বিষয় হইয়াছে; এবং আমরা আশাকরি অনতিদূর ভবিষ্যতেই দেখিতে পাইব, চীন জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন, হার্ভার্ড ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালা সাহিত্য অন্যতম পঠনীয় বিষয় রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

খাঁটী ইউরোপীয়গণও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশীয় খ্রীষ্টান বা ইউরেশিয়ানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন। তাঁহারা যেন এ দেশে থাকিয়াও ইহার মধ্যে নাই বলিয়াই মনে হয়। ইউরেশিয়ানগণ ইউরোপীয় রক্তসংমিশ্রণের ফল হইলেও একমাত্র ইংরেজী ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশের বিভিন্ন সহরে ও পল্লীতে আপনাদের 'টোলা' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; আপনাদের ধর্ম্ম ভাষা ও সমাজ লইয়া এক অংশে পড়িয়া রহিয়াছেন। বিলাত যে তাঁহাদের মাতৃভূমি নয়, বিলাতের সূচ্যগ্র ভূমিও যে তাঁহাদের জন্য পড়িয়া রহে নাই, বিলাতের সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর নাগরিকও যে তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপবেশন করিতে নারাজ এক কথায় কোন ইউরেশিয়ানের স্বার্থ যে বিলাতের কাহারও স্বার্থের সহিত নিয়ন্ত্রিত নয় এ ধারণা ইউরেশিয়ানগণ এবং যে কোন বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই করিতে পারেন।

আমরা সকল বাঙ্গালী যেখানে সমবেত, যেখানে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধর্ম্মের হইয়াও শুধু বঙ্গবাণীর, আরাধনার কালে এক, তখন ইউরেশিয়ানগণ পৃথক্ থাকিলে চলিবে কেন? বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গলার ফল শস্য, ভারতের জলবায়ুতে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সমভাগে ভাগী। যুগযুগান্তের কত ধর্ম্মের উত্থান পতনের চিহ্ন ভারতের বুকে রহিয়াছে; হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক বন্ধনের ফলে তাহার নিজেরই যে যথেষ্ট শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে কি সে কি মাতৃসেবায় পৃথক্ ডাক আনিতে পারে? আজ সবলকেই ত আপনার পাশে টানিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সেবক যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন সেবা চিরদিনই তাহার উপাসনা গ্রহণ করিতে বাধ্য। ইউরেশিয়ানগণ পুরুষানুক্রমে এই দেশে বাস করিতেছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি লাভালাভ পাইয়াছি? বলিতে গেলে এইমাত্র পাই—তাঁহারা দীর্ঘকাল এইদেশে বাস করিয়াও আমাদের সহিত আত্মীয়তা পরিশূন্য। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির হইয়াও ইংরেজী ভাষার সেবক। বাঙ্গালাভাষাকে এই সুদীর্ঘকাল তাঁহারা আপন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অশন বসনে আমাদের অংশীদার, যাঁহারা বঙ্গের সৌরবে গৌরবান্বিত, আমাদের নিকটপ্রতিবেশী, ভবিষ্য সুখদুঃখে সহানুভূতির

আশ্রয়, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের নিকট আর অনাদৃত থাকিলে চলিবে কেন?

বিদেশী জাতিসমূহের অপেক্ষা নানা প্রকার সুবিধালাভ সত্ত্বেও তাঁহারা যদি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় বীতশ্রদ্ধ হন এবং জাতীয়তার একমাত্র ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে ইচ্ছুক না হন তাহা হইলে সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। হয় ইহা আমাদের চেষ্টার অভাব অথবা তাঁহাদের এক প্রকার পৌঁড়ামির ফল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য এক বা দুই পুরুষেই তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল বিস্তৃতি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি তাঁহারা বাঙ্গালার স্বার্থের সঙ্গে আপনাদের স্বার্থ সম্পর্ক তুলনা করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করা তাঁহাদের কতদূর কর্ত্তব্য। বুঝিতে পারিবেন, যে দেশে তাঁহাদের জন্মমৃত্যু সেই দেশের ভাষাকে মাতৃভাষার মত পূজা না করিলে তাঁহাদের ক্ষতির ভাগটাই বেশী।

হয়ত তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার সেবা গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একথা নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে কখনই পৃথক থাকিতে পারিবেন না। একদিন না একদিন তাঁহারা নিজের অবস্থা ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং সেইদিন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন ভাষার ঐক্য-বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা এ দেশ হইতে কতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমরা তাঁহাদিগকে বঙ্গবাণীর আরাধনার জন্য এখন হইতেই আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ আহ্বান হয়ত অনেকের কাছে এখন হাস্যকর বলিয়াই বোধ হইবে, হয়ত ইহা লইয়া খানিকটা বাকবিতণ্ডাও চলিতে পারে। তবু আমরা তাঁহাদিগকে ডাক দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি না। তাঁহারা কি এই ডাকে কর্ণপাত করিবেন না?

অভিব্যক্তি বাদ

(Theory of Evolution)

ভূতাভিব্যক্তি বাদ

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

পরমাণুবাদ বিশ্বব্যাপার ব্যাখ্যানের চরম সিদ্ধান্ত (final theory) হইতে পারে না। পরমাণু অবিনশ্বর মৌলিক পদার্থ নহে। কোন একটা ইন্দ্রিয়ের অতীব অসীম পদার্থের বিকৃতি বা পরিণাম ব্যতীত ইহারা আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ বহু মৌলিক সত্তার স্বীকার দার্শনিকতার অনুকূল নহে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিদ্যাই বৈচিত্র্যকে ঐক্যে পরিণত করিবার চেষ্টা মাত্র। পরমাণুর মৌলিকত্ব স্বীকারে বস্তুতঃ বহুত্ববাদ আসিয়া পড়ে। এই বহুত্ববাদ বিজ্ঞান রাজ্যেও আদৃত নহে। দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। দেখিতে পাওয়া যায় বটে আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, চৌম্বক ধর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু পরীক্ষা করিলে প্রতীত হয়, এই বিভিন্নতার মূলদেশে এক ঐক্য বিরাজমান। প্রতীত হয়, এই দৃশ্যমান বিভিন্নতাই গৌণ বা আগন্তুক; ইহার অন্তস্তলে এক মহা একতা (identity) সুপ্তায়িত। সমস্ত পার্থিব গুণবৈষম্য পরিমাণবৈষম্য হইতে সমুদ্ভূত। আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, চুম্বকশক্তি প্রভৃতি পদার্থকে একরূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত করা যায়। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে ইহারা সকলেই এক মৌলিক তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরমাণুরূপী অসংখ্য ভৌতিক কণাগুলি সেই মূল প্রকৃতির বিকৃতি।

এই মূল প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনি নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রীক দার্শনিক থেলস্ অনুমান করিলেন, অপই জগতের মূল প্রকৃতি। জাগতিক সর্ব্ব বস্তুই সেই অপের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। এই অপ (humid element) সম্পূর্ণ জড় ধর্ম্মী নহে একেবারে চিন্ময়ও নহে। অপ সংকোচন প্রসারণ এই দুইটি ধর্ম্মবিশিষ্ট।

হিরাক্লিটাস ভাবিলেন তাহা নহে। তেজই বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব। সমস্তই তেজ পদার্থের বিকৃতি। উহাতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, উহাতেই সকল বস্তুর বিলয়। কিন্তু এই তেজ আমাদের চির-পরিচিত অগ্নি নহে। ইহা এক অদ্বিতীয়, অনির্দ্দেশ্য মূলতত্ত্ব।

অম্বদ্দেশীয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি কপিল মনে করিলেন, জগতের মূলতত্ত্ব দুইটি,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তন্মধ্যে পুরুষ বহু, নির্গুণ, নির্লিপ্ত এবং নিষ্ক্রিয়; আর প্রকৃতি এক, অপরিচ্ছিন্ন,

নির্ব্বিশেষ পদার্থ। ইহাই সমস্ত দ্রব্যের মূলীভূত উপাদান। তাঁহার মতে—

"প্রকৃতি পুরুষয়োরণ্যৎ সর্ব্বমনিত্যং।

প্রকৃতি কাহাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে কপিল বলেন,—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

এই প্রকৃতি "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং।"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে পরমাণু প্রভৃতি প্রকৃতি ও পুরুষের বহির্ভূত হওয়ায়, অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহা "অমূলং মূলং" নহে; অর্থাৎ তাহা জগতের মূলতত্ত্ব হইতে পারে না।

সাংখ্যকার কপিল পরিণামবাদী—সৎকার্য্যবাদী। তাঁহার মতে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অর্থাৎ জগতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সৎপদার্থেরও বিনাশ হয় না। শক্তির আবির্ভাব তিরোভাব অবলম্বন করিয়াই আমরা বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে যাহা কার্য্য তাহা কারণেরই ব্যক্তাবস্থা; এবং যাহা বিনাশ তাহা কারণেরই স্বরূপপ্রাপ্তি। তাই তিনি বলিয়াছেন, "নাশঃ কারণলয়ঃ। অর্থাৎ নাশ অর্থ, কারণে লয় প্রাপ্তি।

এই খানেই কপিলের সহিত গৌতম-কণাদের বিরোধ। তাঁহারা আরম্ভবাদী, অসৎকার্য্যবাদী। তাঁহাদের মতে কার্য্য কারণঅতিরিক্ত অভিনব পদার্থ, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কারণ সমবায়ে তাহার আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। কারণকলাপের মিলনের পূর্ব্বে যদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে কারণকলাপের প্রয়োজন কি? কপিল বলেন, প্রয়োজন আছে। কারণের পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও সূক্ষ্মরূপে—অব্যক্তরূপে—বিদ্যমান থাকে; তখন উহা কারণের আত্মভূত অবস্থায় থাকে; কারণকলাপের সাহায্যে তাহা ব্যক্ত ভাবাপন্ন হয় এই মাত্র।

মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন:—

প্রভবতি নহি কুম্ভোঽবিদ্যমানো মৃদস্তৈঃ
প্রভবতু সিকতাভ্যো বাময়ো বারিণো বা।
নহি ভবতি চ তাভ্যাং সর্ব্বথা কামি তস্মাদ্
যত উদয়তি যোঽর্থোঽস্ত্যাত্র তস্য স্বভাবঃ।
অন্যথা বিপরীতং স্যাৎ কার্য্য কারণ লক্ষণম্
নিয়তং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বতঃ। ১

কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে কপিল ও গৌতম যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছেন তাহা উভয়ের পক্ষেই ভিন্ন ভিন্ন। কপিল যাহাকে কার্য্য বলিতেছেন গৌতম তাহাকে কার্য্য বলিতেছেন না, অথবা তিনি যে ভাবে কার্য্যকে দেখিতেছেন, গৌতম সে ভাবে কার্য্যকে দেখিতেছেন না। উপাদানের দিক হইতে দেখিলে কপিলের কথাই সত্য, আবার পরিবর্ত্তনের দিক হইতে দেখিলে গৌতম-কণাদের কথাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণের একটা অভিনব অবস্থা (mode) কপিলও অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং এ অবস্থাটী যে আগন্তুক, তাহাও স্বীকার্য্য। এই অবস্থাই প্রতিবাদির কার্য্য। সুতরাং এখানে বিবাদের স্থল কোথায় তাহা বুঝা যাইতেছে না। ঘটরূপ অবস্থা নিশ্চিতই মৃত্তিকাবস্থা হইতে বিভিন্ন। গৌতম কণাদ বলেন উহাই প্রকৃত পক্ষে কার্য্য। কপিল

১। সর্ব্বদর্শন সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ—চূণাবাদ-বিচার ৫১২—৫১৩।

বলেন ঐ অভিনব অবস্থাটি যাহার তাহাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তদ্বিরূপিত বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না। অথবা তাঁহার মতে এক অবস্থা অন্য অবস্থার আবরণ; ঘটের যেটা কারণ অবস্থা তাহা ঘটরূপের আবরণ; এই আবরণ উন্মুক্ত হইলেই ঘটরূপের প্রকাশ অবধারিত। কিন্তু এ তর্কও বিচারসহ নহে। আবৃত অবস্থা ও মুক্তাবস্থা উভয় বিভিন্ন। সেই প্রকার কারণ অবস্থা ও কার্য্য অবস্থাও বিভিন্ন। সুতরাং কার্য্য অবস্থার সম্বন্ধে সৎকার্য্যবাদ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন "শক্তস্য শক্য করণাৎ" অর্থাৎ কারণে শক্তিরূপে যাহার সত্তা নাই, কার্য্যরূপে তাহার আবির্ভাব হইতে পারে না একথা খুবই সত্য বলিয়া বোধ হয়। গৌতম কণাদ বোধ হয় তাহাই অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত। তাই বোধ হয় কপিলের সহিত তাঁহাদের বিবাদ।

কপিল কার্য্যকে আবির্ভাবের পূর্ব্বে কারণাত্মক বা অব্যক্ত বা শক্তিরূপে স্বীকার করেন। যদিও ব্যক্ত অবস্থা অব্যক্ত অবস্থা হইতে বিভিন্ন, তথাপি এই ব্যক্ত অবস্থাটা ঐ অব্যক্ত অবস্থারই অভিব্যক্তি; ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। গৌতম কণাদ হয়ত মনে করেন ঐ ব্যক্ত অবস্থাটা পূর্ব্বাবস্থার —শক্তি-অবস্থার অভিব্যক্তি নহে, পরন্তু একান্ত অসতের আবির্ভাব। তাই এই বিবাদের সূত্রপাত।

আমাদের বিবেচনায় কপিলের কথাই সত্য। কার্য্যকে আবির্ভাবের পূর্ব্বে একান্ত অসৎ (non-existent) বলিয়া স্বীকার করিলে আকস্মিক বাদ আসিয়া পড়ে। মৃত্তিকায় ঘটশক্তি আছে বলিয়াই তাহা হইতে ঘটের আবির্ভাব সম্ভাবনীয়। যদি সে শক্তি অস্বীকৃত হয়, তবে মৃত্তিকার ন্যায় সিকতা, বারি প্রভৃতি হইতে ঘটের আবির্ভাব কে নিবারণ করিবে? মৃত্তিকায় ঘটশক্তির যেমন অভাব, সিকতায়, জলেও ঘটশক্তির তেমনি অভাব, অথচ মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি নিয়মিত, অন্য হইতে নহে, ইহার তাৎপর্য্য কি? আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি একান্ত অসৎই হয়, তবে অসত্তা নির্ব্বিশেষে, একই কারণ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভাবনীয় হউক। বটবীজে বটজাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, বদাল জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না, এমন কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব

"উপাদান নিয়মাৎ"

"সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ।"

অনুমান করা যায়, কার্য্য শক্তিরই ব্যক্ত অবস্থা,—অসতের উৎপত্তি নহে। এবং ঐ শক্তিকে ব্যবহার দশায়—কার্য্য দশায় আনিবার জন্যই—কারণের প্রয়োজন।

একথে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, সেটা কি? সে স্থলে কারণে ত তাবৎ কার্য্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই; শক্তিই বা আছে কেমন করিয়া জানা যাইবে? হাইড্রজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়, ইহা বিজ্ঞানের পরিজ্ঞাত সত্য। কিন্তু এই দুইটি পদার্থে জলীয়ত্বের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

অতএব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে। এই নূতন পদার্থের ধর্ম্ম তাহার অবয়ব পদার্থের ধর্ম্মের সহিত একতাপন্ন নহে; পরন্তু তদ্বিলক্ষণ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাই মূল পদার্থ অন্তর্হিত হইয়া নূতন পদার্থরূপে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত Huxley বলেন :—

When hydrogen and oxygen are mixed in a certain proportion, and the electric spark passed through them, they disappear, and a quantity of water, equal in weight to the sum of their weights, appears in their place. There is not the slightest purity between the passive and active powers of the oxygen and hydrogen which have given rise to it. Nevertheless we do not hesitate to believe that in some way or another, the properties of the water result from the properties of the component elements of the water....Does any body quite comprehend the modus operandi of an electric spark, which traverses a mixture of oxygen and hydrogen ? *

Huxleyর উদ্ধৃত বাক্যে আমরা দেখিতে পাই রাসায়নিক সংমিশ্রণে মৌলিক উপাদানের তিরোভাব ও নূতন পদার্থের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সংমিশ্রণ-সঞ্চারিণী তড়িচ্ছক্তির কি সামর্থ্য—কি প্রভাব তাহা কে বলিবে ? বাস্তবিক ভাবিতে গেলে এই রাসায়নিক সংমিশ্রণ ব্যাপারটি একটি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। ইহা একটা অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাভেদ মাত্র। সাধারণ সংমিশ্রণের সহিত ইহার পার্থক্য এই মাত্র যে, তাহা বুদ্ধিগম্য ; ইহা বুদ্ধির অগম্য। তাহা পরিজ্ঞাত ; ইহা চিরাজ্ঞাত। হইতে পারে যে প্রচ্ছন্ন জলীয়ত্ব ধর্ম্ম ঐ সংমিশ্রণের ফলে ব্যক্তভাবাপন্ন হয়, কেবল তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগে তাহা ব্যবহার দশায় আনীত হইয়াছে। এবং ঐ শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাহা হইতে ঐ জলীয়ত্ব ধর্ম্ম কদাচ নিষ্কৃষ্ট হইতে পারে না। মহামতি Huxley সেই কথাই ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। তবে তিনি জড়বাদের সমর্থনে ঐ প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক একবার যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুদ্ভূত পদার্থের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে উপাদান পদার্থের তিরোভাব ঘটে, এই সিদ্ধান্তই জড়ের অনশ্বরত্ব বিঘাতক। রাসায়নিকের মতে Oxygen ও Hydrogen রাসায়নিক সংমিশ্রণে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে তদুভয়ের সমান পরিমাণে জলীয়ত্বের আবির্ভাব হয়। এই আগন্তুক পদার্থ সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই আগন্তুক পদার্থের সহিত ঐ দুই পদার্থের কেবল মাত্র পরিমাণগত সাম্য ব্যতীত আর কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কোন এক বস্তুর স্থলে তৎপরিমাণানুরূপ অন্য বস্তুর পরিমাণ পাইলেই পূর্ব্ব বস্তু যে অবিনশ্বর তাহা সপ্রমাণ হয় কি প্রকারে ? 'ক'এর পরিমাণ 'খ' এর পরিমাণের তুল্য হইলে কি (অজ্ঞাতগুণ বৈপরীত্য সত্ত্বেও) 'ক' 'খ' হইয়া যায় ?

* Physical basis of life.

এ সম্বন্ধে একজন মার্কিনকের তর্ক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন :—১

"For example it the same substance which is—now carbon, oxygen and hydrogen; now, these united in vegetable tissue; now, after being eaten and assimilated, animal tissue and finally carbon, oxygen, and hydrogen again. Mere experience, uninformed by the apriori laws of the understanding could only lead us to the conclusion that, at each of these changes, the previous substance was annihilated, and the new one created. Yet we instinctively and instantly reject this conclusion. Why? The chemist says, because we find by experiment that one of the accidents, namely, the aggregate weight, remains unchanged.

Be it so: what then? This would only prove that, whatever number or amount perishes, the same amount of substance is created anew, not necessarily that the same numerical or identical essence persists or endures. Besides, why infer identity from the one accident, weight, which persists in amount, rather than difference from the many others, volume, colour, texture, consistency, chemical affinity &c. which undergo great change?

"The atomistic view assumes that when in iron-oxyde, for example, all the sensible properties both of iron and oxygen have vanished, iron and oxygen are nevertheless there but now manifest other properties. We are so used to their assumption that it is hard for us to feel its oddity, nay, even its absurdity, when however, reflect that all we know in a given kind of matter is its properties, we realize that the assertion that the matter is still there but without any of those properties, not far removed from nonsense. —W. Ostwald.

বাস্তবিক ঐ প্রকারে গুণবিশেষের সাম্য লইয়া বস্তুদ্বয়ের অভিন্নত্ব (identity) প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিষয়। এক সের স্বর্ণ যদি এক সের লৌহের সমান হয়, তবে স্বর্ণ—লৌহ, এ যুক্তিও যেমন অসার, জলের পরিমাণ ঐ দুই ভূতের পরিমাণের সহিত সমান, অতএব ঐ দুই পদার্থ জল হইতে অভিন্ন, এ যুক্তিও তেমনি অসঙ্গত। বিশেষতঃ ভারীত্বও বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ নহে, একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। একটিমাত্র আগন্তুক গুণের সমতাদ্বারা পদার্থদ্বয়ের অভিন্নত্ব বা অনন্যত্ব কোনপ্রকারেই অনুমিত হইতে

১ Modern Philosophy by F. Bowen. p. 214.

P2947 3

পারে না। যদি পারে, তাহা হইলে অন্যান্য গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা তাহাদের বিভিন্নত্ব অনুমিত না হইবে কেন? Kearl Pearson বলেন :—

"Or again, table is probably a bad one, we will break it up and burn it and so the blackboard will be converted into various gases and same ashes. What has now become of it? Size and shape, temperature and colour, hardness and strength have all gone. It is true that the chemist asserts that, if we could completely collect the gases and ashes, one sense impression at least, that of weight, would remain the same in these and the original blackboard. But can we define sameness to consist in the phenomena of some one sub group of sense-impressions not-withstanding the divergence of the majority! * * * If the gases and ashes could be collected! They have, indeed, been scattered to the winds and in course of time may be absorbed by other vegetable life, ultimately perhaps to reappear as other blackboards, or even in legs of mutton." *

পক্ষান্তরে, উক্তস্থলে বস্তুদ্বয়ের ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে জড়ের অনশ্বরত্ব বাধিত হয়। প্রতি রাসায়নিক সংমিশ্রণে পূর্ব্ব বস্তুর একান্ত নাশে ও অভিনব বস্তুর সৃষ্টি হয়, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ জলীয়ত্ব একটী গুণ। গুণ পদার্থ বস্তুনিহিত (must be predicated of a substance)। কিন্তু উক্তস্থলে বস্তু মাত্র দুইটি Hydrogen ও oxygen। অতএব ঐ জলীয়ত্ব গুণটি উহাদেরই গুণ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সংমিশ্রণ বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা সম্বন্ধ বোধক। তাহা কোন বস্তু (substance) নহে; সুতরাং গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। স্পেন্সর সাহেব তাঁহার Absolute Monism নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—

Combination is a term employed to indicate the relations existent between the ingredients of a body; and so is not a real existence at all. But property can be predicated only of a subsistent entity. How can, then, that which is a logical, i.e., fictitious, fact, have and manifest any affection at all? অতএব জলীয়ত্ব যদি ঐ বাস্তবীয় পদার্থদ্বয়েরই গুণ বা ধর্ম্ম হইল, তাহা হইলে সাংখ্যের "শক্তস্য শক্য করণাৎ" এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ রাসায়নিকসংযোগ যে একটা বিশেষ সংমিশ্রন (a peculiar combination) তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিব? সাধারণ সংযোগই হউক আর বিশেষ সংযোগই হউক —সংমিশ্রণ ব্যাপারে সমবেত ভূতসূক্ষ্মের পরিস্পন্দ ও গতির তারতম্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। রাসায়নিক সংযোগে

* Grammer of Science. p. 85.

ইহার অতিরিক্ত কি আর কিছু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? রাসায়নিকসংযোগে ভূতসূক্ষ্মের যে গতি বা স্পন্দন তাহারই বা বিশেষত্ব কোথায়? যে স্পন্দন, যে চাঞ্চল্য, যে প্রকার গতি, বৈজ্ঞানিকের চিত্ত পরিচিত সেখানেও সেই তাণ্ডব, সেই স্পন্দন, বা সেই চাঞ্চল্য। তবে তাহার বিশেষত্বটা কি? কেবল ফল-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া এবং তাহার কোন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদানে অশক্ত হইয়াই (জগৎকে প্রতারিত করিবার জন্য?) বৈজ্ঞানিকেরা ঐ মিশ্রণকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষত্বটা যে কোথায় তাহার সন্ধান কেহ বলিতে পারেন নাই। সাধারণ ও তথাকথিত বিশেষ সংমিশ্রণে যখন কেবল এক স্পন্দমান পরমাণুপুঞ্জের সত্তা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তখন সংমিশ্রণকে সাধারণ ও বিশেষ ভেদে দ্বিধা কল্পনা করাও সর্ব্বথা অন্যায়।

চতুর্থতঃ কারণ যদি কার্য্য উৎপাদনে অসমর্থ (incompetent) হয়, তবে কার্য্যোৎপত্তিই অসম্ভব। এবং কারণ যদি কার্য্যজননে শক্ত হয় তবে কার্য্যের শক্তিরূপত্বও সিদ্ধ হয়। আবার কার্য্যে কারণ অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত ধর্ম্ম স্বীকার করিলে অনিমিত্ততঃ ভাবোৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয়। ইহা স্ববিরোধী।*

কেহ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন; পরিমাণ সাম্যই কেবল বস্তুর অভিন্নতার কারণ না হইতে পারে; কিন্তু যখন তাপ প্রয়োগে ঐ জলকে বাষ্পীভূত করা যায়, তখন ত উহার পূর্ব্বোপাদানই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং বস্তুর বিলোপ কদাচ হয় না—ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়,—তাহা হইলে আগন্তুক পদার্থকে তাহার উপাদান হইতে বিশিষ্ট করিবার তাৎপর্য্য কি? যদি উভয় অবস্থায় বস্তু অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে তাহার অভিনবত্বই বা কোথায়? এবং তাপপ্রয়োগে জলকে বাষ্পীভূত করিয়া যদি আবার সমপরিমাণে হাইড্রজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়, তাহা যে নূতন হাইড্রজেন ও অক্সিজেন নহে তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বর হইতে অহরহঃ এই প্রকার সৃষ্টিই হয়ত হইয়া থাকে।

গুণভেদ লইয়াই বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়; কিন্তু কোন বস্তুই কেবলমাত্র একটি গুণের আশ্রয় হয় না। যেখানে ঐ গুণভেদের আধিক্য দৃষ্ট হয়, সেখানে অভেদ কল্পনাই সঙ্গত; তাই বলা হইয়াছে রাসায়নিক মিশ্রণ সম্ভূত পদার্থ নূতন; কিন্তু উহার ওজন উপাদানের ওজনের সহিত সমান, তাই বলা হইল—উভয় অভিন্ন। একই বস্তু এক সময়ে অপর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন এ সিদ্ধান্ত কি সমীচীন? যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

সাংখ্যকার বলেন—"পরিণাম স্বভাবাহি গুণা না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ প্রকৃতি নিত্য প্রসবধর্ম্মিণী। ক্ষণমাত্রও অপরিণত অবস্থায় থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি যদি সর্ব্বদাই পরিণামস্বভাবা, তবে প্রলয়কালে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব না হয় কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা

---

* অসতো ন তবেদ্ ভাবো ন ভবো বিদ্যতে সতঃ।
কার্য্যসা, যাবিকঃ কিঞ্চিৎ কার্য্যে ভবে নিমিত্তকঃ। লেখক।

বলেন—প্রকৃতির পরিণাম বিবিধ—সদৃশ (similar) ও বিসদৃশ (dissimilar)। অথবা অনুলোম ও বিলোম। প্রলয়কালে অনুলোম-ক্রমে ও সৃষ্টিকালে বিলোমক্রমে প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা পরিণাম হয়। অনুলোমক্রমে যখন তাহার পরিণাম আরম্ভ হয়, তখন পদার্থপুঞ্জ ক্রমশঃ সাম্যাবস্থাপন্ন হইতে থাকে। পরে প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। বিলোম-ক্রমে আবার এই প্রকৃতি ব্যাকৃত হইয়া বিশ্ববৈচিত্র্য রচনা করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে প্রকৃতির এই বিবিধ পরিণামে চৈতন্যের অপেক্ষা আছে কি না? সাংখ্যমতে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ মীমাংসা দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যেরা একবার বলেন প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃই হয়, কোন চৈতন্যের অপেক্ষা করে না :—

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য।
স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ।

কিন্তু আবার তাঁহারা একথাও বলেন যে প্রকৃতি পরতন্ত্রা—পরাধীনা। "প্রকৃতি নিব-ন্ধনা চেৎ ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্।" অর্থাৎ প্রকৃতি নিবন্ধনই যদি আত্মার বন্ধন বল, তাহাও নহে, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্রা—স্বতন্ত্রা নহে। এস্থলে প্রকৃতিকে পরতন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে।

পুনশ্চ সাংখ্যেরা বলেন—প্রকৃতি অচেতন বলিয়া অন্ধস্থানীয়; পুরুষ নিষ্ক্রিয় বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। কিন্তু তথাপি পরস্পরের মিলনে বিশ্ববৈচিত্র্য রচিত হয়।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের এবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ দুষ্কর। প্রকৃতিকে অন্ধস্থানীয় বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার চলচ্ছক্তি আছে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অচেতনের চলচ্ছক্তি থাকে কি প্রকারে? সেই প্রকার পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া পঙ্গুস্থানীয় ধরিয়া লওয়া হই-য়াছে। অথচ তাহার পরিচালকত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে নিষ্ক্রিয় বলিয়া পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইতে পারে না; অচেতন বলিয়া প্রকৃতি স্বয়ংও চলিতে পারে না। অতএব উভয়ের মিলনে যে কার্য্যারম্ভ হইবে সে দুরাশা মাত্র। †

সাংখ্যেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কেননা অন্যথা বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার মীমাংসা হয় না। পুরুষ যদি এক হইত, তবে একজনের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হইত; একজনের বন্ধন থাকিলে কেহই মুক্ত হইতে পারিত না। এক আত্মা সর্ব্বদেহস্থিত নহে বলিয়াই এক সময়ে সকলের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিও দেখা যায় না। অন্যথা একজনের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সকলেরই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দৃষ্ট হইত। অতএব

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।
জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং ॥

সাংখ্যকারের এ কথাও যে সপ্রমান তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার মতে পুরুষ বহু হইলেও সসীম নহে। প্রত্যেক পুরুষই অনন্ত, অনাদি। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষই অন্যান্য যাবতীয় দেহে বিদ্যমান। তবে এক পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অন্যান্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি না হয় কেন? এবং ঐ পুরুষের বন্ধমোক্ষে অন্যান্য ব্যক্তির বন্ধমোক্ষ না হয় কেন? অদৃষ্ট বৈচিত্র্য দ্বারাও এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, এক পুরুষের যাহা অদৃষ্ট, তাহা সর্ব্ব পুরুষেরই

† তথা প্রধানস্যাচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চৌদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধিবৈকল্যাদ্যাৎ সম্বন্ধোপপত্তিঃ।"
• বেদান্ত দর্শন—শাঃ ভাঃ ২।২।৭

অদৃষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি এক পুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভাবনীয়, সকল পুরুষের পক্ষেই তাহা সম্ভাবনীয় হয়। আত্মাকে অবচ্ছিন্ন—পরিচ্ছিন্ন—সসীম না বলিলে সাংখ্যমতেও এ সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া যায় না।

যাহা হউক এই পুরুষ পদার্থটা কি প্রকার? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—"জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ" অর্থাৎ যাহা জড় বিলক্ষণ (other than matter) এবং জড়ের প্রকাশক (percipient of matter) তাহাই পুরুষ। ইহা চিদ্রূপ বা চৈতন্যস্বরূপ (spirit)।

এই পুরুষ দেহাদি
বিলক্ষণ :—

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ।

সাংখ্যকার প্রকৃতিবাদী হইলেও চৈতন্যকে কখনও জড়ের পরিণাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বরং তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।"

যাহা হউক, এক্ষণে একটু বিশেষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ পরীক্ষা করা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি সাংখ্যমতে প্রকৃতি সত্ত্ব রজস্তমের সাম্যাবস্থা (state of equilibrium of the three gunas)। কিন্তু সাম্যাবস্থা কাহাকে বলে? না, যে অবস্থায় বিরোধী শক্তিপুঞ্জ প্রত্যেকেই তুল্যবল। একটি অপরটি অপেক্ষা প্রবলতর নহে। এখানে উক্ত গুণত্রয় যে অবস্থায় প্রত্যেকেই তুল্যবলবিশিষ্ট কেহ অপরাপেক্ষা প্রবলতর নহে, সেই অবস্থার নামই প্রকৃতি। কিন্তু কথা হইতেছে প্রকৃতি অবস্থায় সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ব্যতীত পরিণাম উৎপন্ন হয় কি প্রকারে? গুণত্রয় ত সমভাবাপন্ন, কেহ কাহাকে পরাভব করিয়া স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারে না। সুতরাং কোন অন্তর শক্তি দ্বারা এই সাম্যভাবের বিক্ষোভ অসম্ভব। তবে এ সাম্যভাব বিক্ষুব্ধ হইবে কি প্রকারে? অবশ্যই কোন বাহ্যশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এই বাহ্যশক্তিই প্রকৃতির ক্ষোভয়িত্রী। মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন—(১)

বাহ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাদ্গুণ বৈষম্য নিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ। ..... বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবাদৈব বৈষম্যং ভজেরন্, ভজমানা বা নিমিত্তাভাবা বিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যত এবাদ্যমনবস্থারোঽপি দোষঃ।

প্রকৃতি অচেতন হইলেও তাহার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ক্ষীরাদির ন্যায়। সাংখ্যাচার্য্যদিগের এ উক্তিও সমর্থন যোগ্য নহে। নিমিত্তাভাবে অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই অচেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। তর্ককেশরী মহামতি শঙ্কর বলেন :—তদ্যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানমপ্যচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। নৈতৎ সাধুচ্যতে। যতস্তত্রাপি পয়োঽম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনুমীয়তে উভয়-

(১) বেদান্তদর্শন। শাঃ ভাঃ ২।২।৯—১

যদি প্রসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্তাদর্শনাৎ। • • • তস্মাৎ সাধ্যলক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োঽম্বু বদিত্যনুপপন্নাম্নঃ চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ বৎস চোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমাণত্বাৎ। ন চাদৃষ্টোহপ্যাত্মস্থ মনপেক্ষা নিয়তদৃষ্ট্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ তদ্বদনয়া। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্রোপদর্শিতং।

পুনশ্চ (২) সাংখ্যানাং ত্রয়োগুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং নতু তদ্ব্যতিরেকেন প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্বাহ্যমপেক্ষমবস্থিতমস্তি. পুরুষস্তূদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি, অতোঽনপেক্ষং প্রধানং অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যেতদযুক্তং ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্তপ্রবৃত্তৌ ন বিরুধ্যেতে।"

ইত্যাদি যুক্তি বলে শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে চিরকাল সাম্যভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের সেই সাম্যভাব বিনষ্ট করিতে হইলে যতটা শক্তির প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতির বাহিরে এক পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নাই; সে পুরুষও উদাসীন। সুতরাং এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গের কোন হেতু পাওয়া যাইতেছে না। অথচ এই সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ না হইলেও সৃষ্ট্যাদি সম্ভবে না। সাংখ্যদর্শনে এ সমস্যার মীমাংসা নাই।

আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে সাংখ্যের প্রকৃতি কদাচ মূল কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যের প্রকৃতি গুণত্রয়ের একটা অবস্থা condition মাত্র। অবস্থা একটা বিশেষ ধর্ম্ম এবং উহা দ্রব্য আশ্রিত। সুতরাং গুণত্রয়ই—মৌলিক দ্রব্য, সাম্যভাব তাহাদের একটা আগন্তুক অবস্থা মাত্র। কিন্তু সাংখ্যেরা এই অবস্থাকেই দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। অবস্থার বস্তুঅতিরিক্ত সত্তা অসিদ্ধ। অতএব প্রকৃতির বা প্রধানের স্বাতন্ত্র্যই অসিদ্ধ। যাহার স্বাতন্ত্র্য অসিদ্ধ, তাহাকে "অমূলং মূলং" বলা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ এই সাম্যাবস্থা যখন অনিত্য, তখন প্রকৃতিকে নিত্যই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে গুণত্রয়ের সত্তাকে মৌলিক সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে একত্ববাদ (monism) পরিত্যাগ করিয়া বহুত্ববাদ গ্রহণ করিতে হয়। বহুত্ববাদ কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের অনভিপ্রেত।

সাংখ্যাচার্য্যেরা যাহাকে গুণ বলেন, বুঝিতে হইবে, তাহা ন্যায়-বৈশেষিকের গুণ নহে। ন্যায়-বৈশেষিকের মতে গুণ দ্রব্যাশ্রিত ধর্ম্ম (property)। সাংখ্যাচার্য্যেরা 'গুণত্রয়' বলিতে কোন ধর্ম্মবিশেষকে বুঝেন না। পরন্তু ঐ গুণত্রয় তিনটি বস্তু। গুণের ন্যায় (রজ্জুর ন্যায়) পুরুষকে বন্ধন করে বলিয়া ঐ দ্রব্যত্রয়ের নাম হইয়াছে 'গুণ'। অতএব এক প্রকৃতির স্থানে আমরা তিনটি বস্তুকে জগতের নিদান বা মূলরূপে পাইতেছি। সাংখ্যকার স্পষ্টতঃ বলিতেছেন সত্ত্বরজতম প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে; পরন্তু উহারাই প্রকৃতির রূপ বা স্বরূপ। • কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

(২) ঐ—ঐ ঐ ২।২।৩-৪

• সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।
সাংখ্যদর্শন ৬ষ্ঠ অ, ৪০।

উহাদের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই উভয় উক্তিরও কোন সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না প্রকৃতির ঐ ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার করিলে, প্রকৃতির স্বাবয়বত্বও দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। আরও একটি বিষয় বিচার্য্য। সাংখ্যের প্রকৃতি অপরিচ্ছিন্ন—অখণ্ড—অসীম। তাহার যে এই পরিণাম, তাহা কি আংশিক না সার্ব্বত্রিক? আংশিক হইতে পারেনা, কেন না, যাহা অসীম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, অংশ বিশেষই তাহার অসিদ্ধ। আর যদি অংশ বিশেষই স্বীকৃত হয়, তবে উহার এক অংশ অপর অংশ হইতে বিভিন্ন হইবে কোন ধর্ম্ম লইয়া? বস্তুতঃ এবম্বিধ পদার্থের অংশাবচ্ছেদ দুর্নিরূপ্য। যে কারণে অংশ বিশেষের পরিণাম ঘটিবে, সে কারণে অপর অংশেও পরিবর্ত্তন ঘটা উচিত। এমন কারণ বিশেষও দৃষ্ট হয় না, যাহা অংশাবচ্ছেদেই ক্রিয়াশীল তাহা অন্যান্য অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অংশ বিশেষেই পরিবর্ত্তন ঘটায়। এবং অংশ বা প্রদেশ বিশেষ স্বীকার করিলে প্রকৃতির অখণ্ডতা ও অপরিচ্ছিন্নতা রক্ষায় থাকে না। যাহা নিরবয়ব (not composed of atoms) তাহার অংশ কল্পনাও অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে যদি প্রকৃতির কৃৎস্ন পরিণাম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সসীম পদার্থের খণ্ড সসীম পরিণাম দুর্ব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে। অসীম বস্তুর সসীম বিকার, ইহা স্বীকারে অসীম বস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব ব্যাহত হয়। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহা প্রতীত হইতে পারে।

উপরি উক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা সাংখ্যকারের স্বীকৃত স্বতন্ত্র জগদুপাদানীভূত প্রকৃতির বা প্রধানের সত্তা সদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে শঙ্করাচার্য্য মনীষা বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নিরপেক্ষ প্রধান বা প্রকৃতি স্বতঃ পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া এই বিশ্ববৈচিত্র্য রচনায় অশক্ত। চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যকারিত্ব থাকিতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্তির প্রবর্ত্তকরূপে কোন সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যপুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এবং যাহাকে সাংখ্যাচার্য্যেরা স্বতন্ত্র প্রকৃতি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, সে প্রকৃতি যথার্থতঃ স্বতন্ত্র বস্তু নহে; পরন্তু তাহা ঐশীশক্তির সংজ্ঞাভেদ মাত্র। তিনি বলেনঃ—

সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা বিদ্যা কল্পিতে নামরূপে তদ্ব্যাকৃত্বা ত্র্যাত্মনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যতে। (১) পুনশ্চ: "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক" ইতি চ তস্যা এবাবয়বাৎ, ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাস্যামস্ত্যেষায়ত ইতি শক্যতে বক্তুং। (২)

অতীতকালে অস্মদ্দেশে অভিব্যক্তিবাদ কি প্রকারে প্রচারিত হইয়াছিল ও তাহার বিরুদ্ধে কি প্রকার যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হইয়াছিল ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বর্ত্তমান যুগের নবালোকোদ্ভাসিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রপাত পুষ্পিতবাণীবহুল অভিব্যক্তিবাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

শুরুগম্ভীর গবেষণাগর্ব্বিত পাশ্চাত্য জগতে অভিব্যক্তিবাদ প্রধান প্রধান মনীষাসম্পন্ন

(১) বেঃ সূঃ ভাঃ—২ অঃ ১ পাঃ ১৪।
(২) বেঃ সূঃ ভাঃ—১ অঃ ৪ র্থ পাঃ ১।

ব্যক্তিবর্গ অনুমোদিত। মহামতি ডারবিন (Darwin) ও তদনুযায়ে জ্ঞানবীর হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) জগতে অভিব্যক্তিবাদের বিখ্যাত প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। আমরা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই শেষোক্ত ব্যক্তির মতামতই আলোচনা করিব। সাংখ্যাচার্য্যেরা যেমন একটা অবিশেষ অপরিচ্ছিন্ন দুর্বিজ্ঞেয় পদার্থ (প্রকৃতি) হইতে এই নানা বৈচিত্র্য বিশিষ্ট জগতের বিকাশ বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, স্পেনসারও সেই প্রকার একটা অবিশেষ অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া বৈচিত্র্যময় হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে এই অবিশেষের বিচিত্রভাবে বিকাশ বা রূপান্তরই অভিব্যক্তি "(transformation of the homogeneous into the heterogeneous)" এবং এই অভিব্যক্তির পশ্চাতে একটা অচিন্ত্য অজ্ঞেয় অসীম শক্তি বিরাজ করিতেছে—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। বলিতে কি, প্রত্যেক দৃশ্য বা ব্যক্ত পদার্থই সেই অজ্ঞেয় শক্তির পরিণাম—ব্যাকৃত অবস্থা বা অভিব্যক্তি। লক্ষ্য রাখিতে হইবে অভিব্যক্তি বস্তুর আভ্যন্তরিণ শক্তির ক্রিয়াজনিত ফল এবং ইহাতে বস্তুর অনবচ্ছিন্নতার (continuity) ব্যাঘাত হয় না। *

মহাত্মা স্পেনসার অভিব্যক্তির যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই।

"Evolution is a continuous change from indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeneity of structure and function, through successive differentiations and integrations." (লেখক Hudson প্রণীত "An Introduction to the Philosophy of Herbert speneer" নামক গ্রন্থ হইতে এই লক্ষণটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্পেনসারের স্বয়ং প্রদত্ত সংজ্ঞা না হইতে পারে।)

যাহা হউক। গণিতশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ Kirkman ব্যঙ্গচ্ছলে এই সংজ্ঞার যে সরলভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, পাঠকের কৌতূহল নিবারণ জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। Kirkman এর অনুবাদ এই :—

"Evolution is a change from a nohowish, untalkaboutable, all-alikeness to a somehowish and ingeneral talkaboutable, not-all-alikeness, by continuous somethingelseifications and sticktogetherations."

Kirkman এবম্বিধ অনুবাদ দ্বারা অভিব্যক্তি শব্দটার দুর্ব্বোধ্যতাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে স্পেনসারের সংজ্ঞাকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

ক্রমাগত ব্যাকৃতি ও সংহতির মধ্য দিয়া কোন অনির্ব্বাচ্য অনবচ্ছিন্ন অবিশেষ পদার্থের যে বিশিষ্ট, পরস্পরান্বিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ক্রিয়া শক্তির বৈচিত্র্যময় বিকাশ, তাহাই অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ। অতি সংক্ষেপে ইহা "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" এই মাত্র বলিতে পারা যায়।

* "Evolution is the Progress of being in continuity by development from within, under external conditions conducive to advance."—Calderwood's Vocabulary of Philosophy.

স্থাবর জগতেই হউক বা অস্থাবর জগতেই হউক—সর্ব্বত্রই এই অভিব্যক্তি নিয়মের প্রসার রহিয়াছে। আণুবীক্ষণিক একটি বীজ হইতে অভিব্যক্তি নিয়মেই বিরাট বিশাল পাদপ আবির্ভূত হয়; অণুপরিমাণ জৈবিক বীজ হইতে এই নিয়মক্রমেই নানাকায়ীয় প্রাণীর উৎপত্তি। স্পেনসার বলেন :—

"The investigations of Wolf, Goethe, and Von Baer, have established the truth that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage, every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in structure and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between two parts of this substance, or as the phenomenon called in physiological language, a differentiation."

পুনশ্চ :—"An entire history of any thing must include its appearance out of the imperceptible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form or leaves off with it in a concrete form, is incomplete. • • • • The change from a diffused imperceptible state to a concentrated, perceptible state is an integration of matter and concomitant dissipation of motion and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant dissipation of matter."

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটা হংস ডিম্ব গ্রহণ করিব। এই অণ্ডটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উহার সমস্ত অংশটা একই প্রকার। উহার অংশ বিশেষের সহিত অপর অংশের রাসায়নিক গুণ বা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই (uniform throughout, both in structure and chemical composition)। ক্রমশঃ, বাহ্য তাপাদির সাহায্যে, ঐ "অব্যাকৃত" (undifferentiated) নিত্য হইতে অংশগত বৈলক্ষণ্য, পরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য আবির্ভূত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে একটা নির্ব্বিশেষ অব্যাকৃত পদার্থ হইতে ক্রমে ক্রমে নানা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট প্রাণীপুঞ্জের আবির্ভাব।

ইত্যাদি দৃষ্টান্তবলে স্পেনসার মনে করেন, বোধ হয় নীহারিকাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা। এই নীহারিকা (nebula) পরমাণুপুঞ্জের প্রকীর্ণ অবস্থা। উহা ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বে উহা অণুত্বভেদশূন্য ছিল—উষ্ণত্ব ও অন্যান্য জড়ীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমভাব (homogeneous) ছিল। ক্রমশঃ তাপাপক্ষয়ে (dissipation of heat) উহা নিবিড়তাপন্ন (integrated) হইয়া এই বৈচিত্র্যের আরম্ভ করিয়াছে। কোন

কারণ বশতঃ এই সাম্যাবস্থা প্রকীর্ণ নীহারিকা রাশির বাহ্য ও আন্তর ঘনত্বে ও তাপে বৈষম্য উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে এই নির্ব্বিশেষ পদার্থে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বৈষম্য ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক্ষণে, এই প্রকার পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর যখন জগতের সর্ব্বত্র নিরন্তর দৃষ্টি গোচর হয়, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"কেন এই প্রকার হয়; এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক কি? ("why this continuous metamorphosis?) এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের নিদান (rationale) কি? মহাত্মা স্পেন্সার এ সম্বন্ধে যথোচিত চিন্তা করিয়া ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন—কোন বৃহত্তর নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই প্রকৃতির পরিণাম কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বৃহত্তর নিয়মটি আর কিছুই নহে—অবিশেষের অস্থায়ীত্বভাবত্ব (Instability of the homogeneous) কিন্তু বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন এ নিয়মটিও মূল নিয়মরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না; ইহা হইতেও বৃহত্তর কোন নিয়ম অবশ্যই থাকিবে। এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, শক্তির অবিনশ্বরত্বই (persistence of force) সেই নৈসর্গিক নিয়ম। অবিশেষের অস্থায়ীত্ব বা পরিণামিত্বভাবত্ব নিয়ম এই শক্তিনিত্যত্ব নিয়মেরই কলাঘাত সিদ্ধান্ত (corollary)। অতএব স্পেনসারের মতে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের ন্যায়, নির্ব্বিশেষ পদার্থ বা প্রকৃতি কদাচ এক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে পারে না; সে সর্ব্বদাই অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে (the condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium)। যদি বল কেন? তাহার উত্তর—যেহেতু শক্তি নিত্য। শক্তি যেহেতু নিত্য—অবিনশ্বর, সেই হেতু প্রকৃতি নিয়তপরিণাম স্বভাব। কেবল ইহাই নহে। যাহা একান্ত নির্ব্বিশেষ তাহাই সাম্যচ্যুতি প্রবণ এবং যাহা অল্প পরিমাণে নির্ব্বিশেষ তাহা তদপেক্ষা অল্পতর নির্ব্বিশেষে পরিবর্ত্তনশীল (The absolutely homogeneous must lose its equilibrium and the relative homogeneous must lapse into the less homogeneous—First Principles p. 429)

এতক্ষণ আমরা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্পেনসারের মূলসূত্রগুলি কি কি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি লইয়া একটু বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, স্পেনসার প্রভৃত অভিব্যক্তিবাদের সত্তা হইতে নীহারিকাকে মৌলিক তথ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, নীহারিকা একটা নির্ব্বাচ্য নির্দ্দিষ্ট সবিশেষ পদার্থ। তাঁহার মতে অনির্ব্বাচ্য অবিশেষ পদার্থই নির্ব্বাচ্য অবিশেষ পদার্থে পরিণত বা ব্যাকৃত হয়। নীহারিকা বলিলেই পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব ও একটা বিশেষ মূর্ত্তি ও সংস্থান, ও একটা নির্দ্দিষ্ট স্বভাব সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং নীহারিকা মূল প্রকৃতি স্থানীয় হইতে পারে না। উহার পূর্ব্বে প্রকৃতির আরও কত পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিবে? যাহা হউক যদি বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট গুণান্বিত পদার্থ মাত্রই কার্য্য হয়, তবে নীহারিকাও কার্য্য, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Flint বলেন—The solar system could only

have been evolved out of its nebulous state into that which it now presents if the nebula possessed a certain size, mass, form and constitution—if it was neither too rare nor too dense, neither too fluid nor too tenacious if its atoms were all numbered, elements all weighed, constituents all disposed in due relation to each other—that is to say, only if the nebula was, in reality, as much a system of order, for which intelligence alone could account, as the worlds which have been evolved from it. The origin of the nebula thus presents itself to the reason as a problem which demands solution no less than the origin of the planets. All the properties and laws of the nebula require to be accounted for. What origin are we to give to them? It must be either reason or unreason. We may go back as far as we please, but at every step and stage of the regress we find ourselves confronted with the same question—the same alternative. *

আরও একটু বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আজকাল পরমাণুকেও মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পরমাণুর মৌলিকত্বই যখন প্রতিপন্ন নহে, তখন তাহার একটা প্রকীর্ণ অবস্থা একটা সন্নিবেশ (নীহারিকা) কি প্রকার মৌলিক পদার্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? প্রথমতঃ প্রকৃতি হইতে ভূতের অভিব্যক্তি না হইলে—পরমাণুর অভিব্যক্তি না হইলে—নীহারিকার উৎপত্তিই অসিদ্ধ হয়। অতএব স্পেনসার নীহারিকাকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করায় অবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার মতে যখন জড়পদার্থ কোন অজ্ঞেয় অনন্ত শক্তির বিকাশ, তখন নীহারিকা যে একটি কার্য্য তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

* Theism by Prof. Flint pp. 191-192. Also see. Naturalism and Agnosticism vol. I. p 224.

চঞ্চল

কি বিপুল বিপর্য্যয়-স্রোত !
প্রতি দণ্ড মরি যায়
পরদণ্ড-ঘাতে,
মুহূর্ত্তের নবীনতা
হয় পুরাতন
মুহূর্ত্ত যেতে না যেতে !
অদ্যকার দিন
কল্য কার চিতাভস্মে
লভিছে জনম—
নিদারুণ একিচঞ্চলতা !

কহ সবে এই কি জীবন ?
চির বিপর্য্যয়-ধাপ
চলিয়াছে নামি
অনাদি অসীম কালে,
সুখদুঃখ বর্ণ-আঁকা,
সুবিপুল সমারোহে,
অদ্ভুত আঁধারে !—
অহেতুক বেগ যার
নদীর সমান,
বল দেখি—সেই কি জীবন ?

নমি তারে, সে যে অন্ধগতি !
জন্ম জরা মৃত্যু নিয়ে
তারি সৃষ্টি-লীলা
চলিয়াছে অবিরাম ;
বহু রূপ মাঝে
বিরাজিছে তারি রূপ
আনন্দ-চপল !
জীবন—জীবন বটে,
ভুল নাহি তায়,—
গতি-বেগ ! নমি তার পায় ।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী ।

ধরণীর আকৃতি বিপর্য্যয়

সরল রেখার আদি ও অন্ত থাকে কিন্তু রেখাটি চক্রাকার হইলেই উহা অনন্ত হইয়া পড়ে। আদি অন্ত বিহীন কাণ্ড মাত্রই তাই একটা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সত্যত্রেতা-দ্বাপরকলির পর প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে পুনরায় সত্য যুগাদির আরম্ভ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে সুখানি দুঃখানি চ; সৃষ্টি প্রক্রিয়া—নেবুলা হইতে সূর্য্যাদির সৃষ্টি এবং অন্তে পুনরায় উহাদের নেবুলার আকারে পরিণতি এইরূপ একটা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল আদি—অন্ত বিহীন কাণ্ড।

পৃথিবীর আকৃতি বিপর্য্যয়ও এইরূপ আর একটি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার বা সৃষ্টি পুষ্টি প্রলয়ের পৌনঃপুনিক অভিনয় কাহিনী মাত্র।

পৃথিবী তাহার ঘন ত্রিভুজাকৃতি হারাইয়া পুনঃ পুনঃ বর্ত্তুলাকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং কিছুকাল পরে জলবিম্ববৎ উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ভূপৃষ্ঠে একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘন ত্রিভুজাকারের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপ প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ চলিতেছে।

এই খণ্ড প্রলয় ফলে ধরণীর আকৃতি বিপর্য্যয়ের ইতিহাসটা একটু আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীর ইতিহাস চারিটি প্রধানযুগে বিভক্ত—উহাদের নাম, The archaeozoic, The Palaeozoic, The Mesozoic and The Kainozoic অথবা (i) প্রাগৈতিহাসিক, (ii) প্রাচীন, (iii) মধ্য এবং (iv) আধুনিক এই চারিযুগ (৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, প্রাচীনযুগের প্রাচীনতম পর্ব্বতগুলি বড়ই কোঁচকান ধরণের দেখিতে। পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত কোন কোন পর্ব্বত ঐরূপ কোঁচকান এবং আরও নবীন স্তরগুলি প্রায়ই অনতিনিম্ন সমতল ক্ষেত্রের আকারে বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহার কারণ কি? দেখা যায় আপেলের মত কোন পাতলা খোসা বিশিষ্ট ফল শুষ্ক হইবার সময় উহার খোসাটি প্রায় সর্ব্বাংশেই কোঁচকাইয়া যায়। কিন্তু একটি কমলালেবুর পুরুখোসা ওভাবে সর্ব্বাংশে কোঁচকায় না, স্থানে স্থানে মাত্র যেন চেপ্টা হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই মনে হয়, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় ভূপৃষ্ঠটি পরবর্ত্তীকালের তুলনায় পাতলা থাকায় ঐ সময়ে সঞ্জাত পর্ব্বতগুলি পৃথিবীর সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া ঐরূপ কোঁচকানো বা ভাঙ্গাচুরা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নবীনতর স্তর গুলিও ঐ ভাবে বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীর উত্তপ্তাবস্থায় তাপক্ষয় এবং সঙ্কোচন ক্রিয়াও দ্রুততর বেগে সিদ্ধ হইত, সুতরাং বর্ত্তুলাকার ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘন ত্রিভুজাকার প্রাপ্তি কালে ভূপৃষ্ঠের উপর খণ্ডপ্রলয় কাণ্ডটাও ভীষণতর ভাবে সংঘটিত হইত। এই কারণেও প্রাচীনতম পর্ব্বতগুলি এত অধিক ভাঙ্গাচুরা আকারের দেখিতে হইয়াছে।

পৃথিবীর স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া এক একবার আগ্নেয় গিরির

অগ্ন্যুৎপাতের যুগ গিয়াছে এবং তাহার পর কিছুকাল শান্তভাবে কাটিয়াছে। সহজেই মনে হয়, বর্ত্তুলাকারটি ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘন ত্রিভুজের আকার পাইবার সময় এইরূপ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং পুনরায় ধীরে ধীরে বর্ত্তুলাকার উপস্থিত হইয়া অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠটি সহসা ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সময়টি শান্তভাবে কাটে।

Archaeozoic বা প্রাগৈতিহাসিক যুগটি এইরূপ পৃথিবী ব্যাপিয়া আগ্নেয়গিরির উপদ্রবের যুগ; bombrian উপযুগে শান্তভাবটা সুস্পষ্ট; Ordovician উপযুগে আগ্নেয়গিরি গুলি পুনরায় সজাগ; Silurian উপযুগে আবার শান্ত ভাব; Devonian উপযুগে আবার অগ্ন্যুৎপাতজনিত খণ্ড প্রলয় এই ভাবে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ধাতুময় ভূগর্ভটি, ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা একটু দ্রুততর বেগে সঙ্কুচিত হইতেছে; ফলে ভূপৃষ্ঠটি ধীরে ধীরে একটি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকৃতি হইয়া কাল সহকারে স্বদেহের সঙ্কোচন প্রভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ভাঙ্গিয়া পড়িবার সময় উহার কতক অংশ উৎক্ষিপ্ত কিয়দংশবা অধঃক্ষিপ্ত হইতেছে। অধঃক্ষিপ্ত অংশ সমুদ্রের চাপে, নীচেকার অত্যুষ্ণ ও দ্রবীভূত প্রস্তর স্তর ফাটল মুখে বাহির হইয়া পড়িয়া আগ্নেয়যুগ সমূহের সূচনা করে।

পৃথিবী যে খুব বেশী পরিমাণে সঙ্কুচিতা হইয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন না। প্রথমাবধি পৃথিবীর আয়তন কতকটা কমিয়া গিয়াছে। নির্ণয়ের উপায় নাই, তথাপি এইটুকু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন এক সময়ে ভূপৃষ্ঠটি বর্ত্তমান কালের উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ সহ সমতলভাবে অবস্থিত ছিল এবং উহার কোন কোন অংশ গভীরতম সমুদ্রের তলদেশ রূপে পরিণত হইয়াছে তাহা হইলেও এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে ভূপৃষ্ঠটি দশ বার মাইল মাত্র বসিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, ইহার তুলনায় দশ বার মাইল গণনার যোগ্যই নহে। তা না হউক, এইটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, উচ্চতার ঐ সামান্যরূপ বা উহা অপেক্ষাও অনেক অল্প পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটিলেই, অনেক মহাদেশ, মহাসাগর গর্ভে তলাইয়া যায়। সুতরাং পৃথিবী চিরবর্ত্তুলাকার থাকুন, বা, কখন ঘন ত্রিভুজাকার প্রাপ্ত না হউন তাঁহার আয়তন সঙ্কোচের যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতেই ভূপৃষ্ঠে খণ্ডপ্রলয় ঘটিতে বাধা নাই।

ভূপৃষ্ঠের যে অংশ বসিয়া গিয়াছে তাহাই সমুদ্রের তলদেশ, উচ্চ অংশটি স্থল। ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া অথবা উহার পার্শ্বস্থ ভূমি অধঃক্ষিপ্ত হইয়া স্থল ভাগ সমূহ বিরচিত হইয়াছে।

আমরা মনে করি, জলধি জল সদাই চঞ্চল, স্থলভাগ কেমন কঠিন ও নিশ্চল। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও সদা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। ভূপৃষ্ঠ নিয়তই মৃদুভাবে স্পন্দিত এবং কোথাও বা সামান্যভাবে উৎক্ষিপ্ত কোথাও বা অধঃপতিত হইতেছে। ভূপৃষ্ঠের এইরূপ স্পন্দন বা সূক্ষ্মগতি হেতু, পৃথিবীর উত্তর মেরুপ্রান্ত স্থির থাকিতে পারে না, একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ মধ্যে বিচরণশীল রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, তুলাদণ্ডের পাত্রদ্বয়ের উত্থান পতনের ন্যায় ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে অধিক মাত্রায় তুষার বা বারিপাত হইলে তার বৈষম্য হেতু নিকটবর্ত্তী অংশের উত্থান পতনাদি হইয়া ঐরূপ ঘটে।

প্রফেসর Milne, সিস্‌মোগ্রাফ নামক যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছেন, বর্ষাকালে একটু

অধিক পরিমাণে বারিপাত হইলে ভারতের পশ্চিম অংশ ভাসিয়া যায়। Sir George Darwin বলেন, জোয়ারের সময় জলরাশির আধিক্য হইলে সেই ভাবেই English channel এর তলদেশ একটু বসিয়া যায় এবং ভাঁটার সময় জলের ভার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পুনরায় উত্থিত হয়। প্রফেসর Hecker সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন, সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে স্থলের উপর জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া উহা কি পরিমাণে উত্থিত বা পতিত হয় নির্ণয় করা অসম্ভব নহে।

ফলতঃ মাধ্যাকর্ষণ এবং নিয়ত আবর্ত্তন হেতু ভূপৃষ্ঠ যে বর্ত্তুলাকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপ নানা কারণে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জল ও স্থলের অবস্থান বিপর্য্যয় ঘটিয়া বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর আকৃতিও নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে।

এই পরিবর্ত্তনটা কিরূপ, বুঝাইতে গিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর সেই অতি প্রাচীন কালের যে সমস্ত মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সে গুলির কিন্তু পরস্পরের সহিত মিল নাই। যাহা হউক পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও এইরূপ নানা মুনির নানামত হইলেও, পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ খুব কম এবং পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধেও, কোন কোন বিষয়ে অমিলের ন্যায় অনেক বিষয়ে আবার মিলও আছে।

পরিবর্ত্তনের প্রকৃতিটা মোটামুটি এইরূপ। এখন যেখানে মহাদেশ এবং সমুদ্র তাহার অধিকাংশ মহাসাগরের অন্তর্ভূক্ত এবং এখন যেখানে মহাসাগর কোন সময় তথায় মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। ভূস্তরগুলিতে পরিদৃষ্ট জীব উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সমূহের প্রকৃতি এবং মহাসমুদ্রের অগভীর অংশ সমূহ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিয়া উহা অবধারিত হয়।

পৃথিবী যখন ত্রিভুজাকার প্রাপ্ত হইবার সময় প্রতিবারই যে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং দক্ষিণে সূচ্যগ্র হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কোনবারে দক্ষিণে বিস্তৃত ও উত্তরে সূচ্যগ্র হইলে, জল ও স্থলে কি ভাবে সংস্থান বিপর্য্যয় ঘটিবে মনে মনে কল্পনা করা কঠিন নহে। ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথা স্থানেই রহিবে কেবল উহাদের উন্নত অবনত অংশের বিপর্য্যয় ঘটিবে; অধিকাংশ স্থল ভাগ দক্ষিণে, দক্ষিণ মেরুস্থিত মহাসমুদ্রকে অঙ্গুরীয়কের আকারে বেষ্টন করিয়া রহিবে; উত্তরার্দ্ধে, এই সমস্ত জল ও স্থলভাগের বিপরীতাধীভাবে উত্তর মেরুতে একটি মহাদেশ এবং অধিকাংশ উত্তরার্দ্ধ ভূভাগ মহাসমুদ্ররূপে দেখা দিবে। পণ্ডিতগণ, প্রস্তরীভূত কঙ্কালাদি দেখিয়া বিভিন্ন উপযুগে পৃথিবীর যে সব মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মোটের উপর উক্ত নিয়মের যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত Bailey Willis মহোদয়, উত্তর আমেরিকাকে Cambrian উপযুগে প্রধানতঃ স্থলময় কিন্তু Silurian উপযুগে উহার অধিকাংশই জলময়রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রফেসর Frech Ordovician উপযুগে পৃথিবীর যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে জল ও স্থলভাগ বর্ত্তমান কালের তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশই তখন সলিলময় এবং ইহার বিপরীত-

বাদীভাবে এখন কার ভারত মহাসাগর তখন এক মহাদেশরূপে বিরাজিত এবং আফ্রিকা ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়া সহ সংযুক্ত। দক্ষিণ আমেরিকা তখন দক্ষিণদিকের পরিবর্ত্তে উত্তরদিকে সুস্থাগ্র। পৃথিবী তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণে বিস্তৃত ও উত্তরে সুস্থাগ্র একটি ঘন ত্রিভুজের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Cerleoniferous উপযুগের শেষ সময়ে এবং Permian উপযুগের আরম্ভ কালে ধরণী আবার এইরূপ আকার পাইয়াছিলেন। দক্ষিণার্দ্ধে ঐ সময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া ব্যাপিয়া একটি মহাদেশ বিরাজিত ছিল। ভারতের Gondwona প্রস্তরাবলীর নামানুসারে পণ্ডিতগণ এই অধুনা বিলুপ্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের নাম দিয়াছেন Gondwanaland এই সমস্থলে Glossopteris নামক fern জাতীয় উদ্ভিদ্ বিশেষের অস্তিত্ব দেখিয়া ইহাদের পূর্ব্বসংযোগ সূচিত হয়। এই গাছটি, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, রুশিয়া, আফ্রিকা ও ব্রাজিলে পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু রুশিয়া ব্যতীত আর কোন উত্তর ভাগস্থ দেশ সমূহে লক্ষিত হয় না। এইরূপ উত্তরভাগস্থিত দেশ সমূহে Calamites জাতীয় আর এক-রূপ গাছ প্রস্তরীভূত হইয়া বিস্তর স্তরের (কোল কয়লার) সৃষ্টি করিয়াছে; এই শেষোক্ত বৃক্ষটি দক্ষিণাঞ্চলে দৃষ্ট হয় না, কেবল আফ্রিকার একটি স্থলে পূর্ব্বোক্ত Glossopteris উদ্ভিদসহ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায় এই দুই জাতীয় গাছ একই সময়ে বিদ্যমান ছিল। Frech সাহেবের মতে এই সময় উত্তরমেরুতে একটি মহাদেশ ছিল; উত্তর আমেরিকা ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল এবং উত্তরমহাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশ অবধি আর একটি মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। পঞ্জোয়ানা মহাদেশটি উত্তরআমেরিকা হইতে পূর্ব্বভাগে অবস্থিত এবং দক্ষিণ মেরু প্রদেশে মহাসমুদ্র বিরাজিত ছিল। এই যুগে কর্ডিলেরিয়া বৃটিশদ্বীপের উত্তরাংশসহ সংযুক্ত ছিল।

Mesozoic যুগে, নূতন একভাবে খণ্ড প্রলয় আরম্ভ হইল। এই সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র, মহাসমুদ্রগুলি ধীরে ধীরে অগভীর হইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং আয়তনে বাড়িয়া উঠিয়া স্থলভাগগুলি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সমুদ্রের তলভূমি ধীরে ধীরে উত্থিত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবী তাহার ঘন ত্রিভুজাকার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বর্ত্তুলাকার প্রাপ্ত হওয়ায় ঐরূপ ঘটিতে থাকে।

যথারীতি বর্ত্তুলাকারের অবসান ঘটিল, পৃথিবীব্যাপী আবার এক খণ্ডপ্রলয় দেখা দিল। উত্তরে স্থলভাগ বসিয়া গিয়া এই সময়েই সম্ভবতঃ উত্তরমহাসমুদ্র এবং উত্তর আটলান্টিক্ মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। গ্রীণলাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ড অবধি ভূখণ্ড এই সময় আগ্নেয়গিরির উপদ্রবে উপদ্রুত ছিল।

কিছুকাল একটু ধীর স্থির ভাবে কাটিবার পর, Miocene উপযুগে পুনরায় পর্ব্বত সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পৃথিবীদেহে এই সময়ে ওঁাজ পড়া ধরণের যে স্পন্দন আরম্ভ হয়, উহার ফলে আল্পস্ এবং হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস্ এবং জাপান হইতে নবজিলাণ্ড অবধি বিস্তৃত একটি পর্ব্বতশ্রেণী একটু ভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই সময়েই উদ্ভূত। এই শেষোক্ত

পর্ব্বতশ্রেণীরই সংযোগবিশেষ বর্ত্তমান কালে কতকগুলি দ্বীপরূপে পরিণত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে মালার ন্যায় আকারে অবস্থিত। *

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্ব

ভূমিকা

বাহ্য দৃশ্যমান জগৎ আহা কি সুন্দর! লতা পাতা ফুল ফল শোভিত নানাবিধ বিহঙ্গম-কূজিত শত শত নির্ঝরিণী বিনাদিত মানবের আবাসভূমি আহা কি প্রীতিপ্রদ। ভীমকায় বিমানস্পর্শী ভূধর, অনন্ত বিস্তার অতলস্পর্শী জলধি, বিপুল শস্যশ্যামল প্রান্তর, উপবন-বিভূষিত পল্লীশ্রেণী, বিমল শোভাধার নাগরিক নিকেতন সমূহ—এ চিত্রপট কি উজ্জ্বল কি মনঃপ্রাণোন্মাদকারী, কি ভক্তি প্রীতি বিস্ময়াধার।

জগতে অনিয়ম ও নিয়ম

এই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমময়, এই কঠিন-তরল-বাষ্পীয় পদার্থরাজীসম্বলিত এই নদী-পর্ব্বতবনোদ্যাননগরপ্রান্তর চিহ্নিত পরিদৃশ্যমান, সংখ্যাতীত সৃষ্টি পর্য্যায় প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত নীতি বিগর্হিত স্তূপে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত নহে কি? পদার্থের সংখ্যা নাই, পরিমাণের বিচার নাই, বিস্তারের নিয়ম নাই; কোথায় অত্যধিক সলিল কোথায় বা বারিবিন্দু হীন, কোথায় অত্যধিক শীত কোথায় বা অতিমাত্র গ্রীষ্ম, কোন প্রদেশে অখণ্ডস্থান তদ্রূপ মানব নাই, কুত্রাপি অসংখ্য মানব তদ্রূপ স্থান নাই যেমন রুষ রাজ্য ও চীন।

আবার নিয়মেরই বা অভাব কই? জল স্থল—স্থান বিভাগ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্—পদার্থ বিভাগ; মানব পশু পক্ষী সরীসৃপ জলচর কীট পতঙ্গ—জীব বিভাগ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ,—প্রাণবিভাগ এইরূপ কত সাধারণ স্থূল বিভাগে বর্ত্তমান-স্থূল বিভাগ পুনরায় সূক্ষ্ম বিভাগে বিভক্ত সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ভাগ বিভাগ উপ-বিভাগে বিভাজ্য। মানব মণ্ডলী—ককেসিয়, সেমেটিক, মঙ্গলীয়, নিগ্রো, মালয় প্রভৃতি স্থূল বিভাগে বিভক্ত; ককেসীয় পুনর্ব্বার আর্য্য, ইরান, হেলেন, লাটীন। স্লাভ, টিউটন, কেল্ট প্রভৃতি উপবিভাগে বিভক্ত; এবং এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার যে কত সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগ উপবিভাগে বিভাজ্য তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। কেবলমাত্র মানবের নয় প্রত্যেক পদার্থের এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম ভাগ বিভাগ উপবিভাগ শ্রেণী বর্ত্তমান। তবে কে বলিতে পারে জগত অনিয়ন্ত্রিত?

নিয়মের মধ্যে অনিয়ম

পুনর্ব্বার একি? পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই—ভাগ ভাগই নহে, বিভাগ বিভাগই নয়, উপবিভাগ উপবিভাগ নয়; সকলই ভ্রম-

* The Making of the Earth নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

মাত্র। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ভাগ করিলাম—ক্ষিতিতে কি অপ্ নাই? অপে কি ক্ষিতি নাই? তেজে কি বায়ু নাই? বায়ুতে কি ব্যোম নাই? রাসায়নিকশাস্ত্র বিপরীত প্রমাণ করিতেছে। তজ্জন্য পুনরায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে—ব্যোম হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। কঠিন, তরল, বাষ্পীয়—পদার্থ বিভাগ করিলাম। বিভাগ কোথায়? তাপ ও ভারমাত্র বিভিন্ন, পদার্থতে তারতম্য কই? কঠিন—শীতল ও ন-ভার তরল; বাষ্প—উষ্ণ ও স্বল্পভার তরল; কঠিন নিয়ম ভেদে তরল ও তরল নিয়মভেদে বাষ্প আকার ধারণ করে। অতএব পদার্থ পদার্থই রহিল, বিভাগ নিয়ম ভেদমাত্র। চেতন, উদ্ভিদ্ অচেতন—বস্তু বিভাগ করিলাম; বিভাগের সূক্ষ্ম মধ্য রেখা নির্দ্দেশ কর; দিনমান ও রাত্রিকালের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম প্রকৃত সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের ন্যায় উহাও চিরন্তন মানব-মস্তিষ্কের অগোচর। সম্পূর্ণ চৈতন্য সম্পন্নের মধ্যেও অণুপ্রমাণ অচৈতন্য বিদ্যমান (যেমন মানবদেহে কেশ-নখ-নখাদি), প্রকৃত অচৈতন্যেও বিন্দু প্রমাণ চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি দেখা যায় (যেমন পার্শ্বতাবৃদ্ধি, মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, আভ্যন্তরিণ উত্তাপ), কখন উদ্ভিদ জীব-ধর্ম্মাবলম্বী (যেমন মাংসাশী বৃক্ষ), কোথায় সচেতন অচেতন গুণাক্রান্ত (যেমন কম্পাস-বৃক্ষ প্রভৃতি) কোথায় একজাতি অন্যজাতিতে পরিণত হইতেছে (যেমন শুটীপোকা, প্রবাল-দ্বীপ, প্রভৃতি) অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবিভাগের পার্থক্য থাকে না; একভাগ অজ্ঞাতসারে ক্রমে অপরভাগে পরিণত হইতেছে, এক বিভাগ ক্রমশঃ অপর বিভাগ হইয়া পড়িতেছে—মূলে এক সূক্ষ্ম সূত্র যেন সর্ব্ব ভাগ বিভাগের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। তাই দার্শনিকগণও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—জীবদেহে চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? পঞ্চভূতের কোন অংশও পৃথক্ ভাবে চৈতন্য সম্পন্ন নহে; অচিনব কোন বস্তু কিরূপে জন্মিতে পারে? তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে অচৈতন্য অংশের মধ্যেও চেতনাংশ নিদ্রিত ভাবে ছিল, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগে চৈতন্য স্ফূরিত হইয়াছে মাত্র; কিম্বা, অপর দিকে এক চৈতন্য হইতে সকলই ক্রমান্বয়ে বিকসিত হইয়াছে। "There is in Nature only a single thinking thing, which is expressed in an infinitude of ideas corresponding to the infinitude of things that are in Nature (Spinoza).

বিভিন্নতা ও একত্ব

একপক্ষে সকলই বিভিন্ন, অন্য পক্ষে সকলই এক। মানব—এক নামধেয় এক জীব, মানবে আবার কত জাতি। এক জাতিস্থ সকলে কোন সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া তাহারা একজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, আবার তাহারা কোন স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া অন্যজাতি মানব হইতে তাহাদিগের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইতেছে; পুনর্ব্বার দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র গুণাক্রান্ত জাতির মধ্যেও কোন সাধারণ গুণ বিদ্যমান আছে, বলিয়া তাহারা সকলে কোন এক বৃহত্তর জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে সাধারণ ও স্বতন্ত্রগুণ প্রত্যেক ভাগ বিভাগ উপবিভাগের মূলে লক্ষিত হয়।

"The universal or permanent qualities are the primary ones and the variable or peculiar qualities

are the secondary ones. Primary qualities are 'extension' and motion; Secondary qualities are colour 'etc' (Merrie's Introduction to philosophy.

কয়েকটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। উদ্ভিদ্—বৃক্ষজাতি—আম্রবৃক্ষ—নানাজাতীয় আম্রবৃক্ষ। এক এক জাতীয় আম্রবৃক্ষ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে, পুনরায় সাধারণ আম্রবৃক্ষও রক্ষা করিতেছে। এক্ষণে অধিকতর মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে পাই—এক জাতীয় আম্রের নানা বৃক্ষ পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে, এমন কি এক বৃক্ষের নানা ফল, নানা পত্র প্রত্যেকে অন্য হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে; কোনও দুইটী ফল বা পত্র সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ আকার গঠন গুণে সম্পূর্ণ একরূপ হইতে পারে না। কি বিভিন্নতা! তদ্রূপ দেড়শত কোটি মানবের মধ্যেও এমন দুইটী মানব পাওয়া যায় না, যাহারা আকৃতি প্রকৃতি ব্যবহার ও কার্য্যগত সর্ব্বতোভাবে একরূপ বরং বিভিন্নতা স্পষ্ট ও সুদূরগত। বাস্তবিক, মানব আকৃতিগত যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিগতও কোন ক্রমে তদপেক্ষা ন্যূন বিভিন্ন নয়; সেইজন্যই বোধ হয় পণ্ডিতগণ আকৃতি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিসদৃশ সম্বন্ধ বিচার করিয়া সামুদ্রিক শাস্ত্রাদি অবধারণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র আকৃতি প্রকৃতি কেন? প্রত্যেক মানবের ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যায় সূক্ষ্মাংশেও বিশেষত্ব বিদ্যমান—কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্পর্শশক্তি পর্য্যন্ত মানবে মানবে প্রকৃত এক নহে। এমন কি আমি নিজ হস্তে একশত, একশত কেন? এক সহস্র বা ততোধিক "ক" এই অক্ষরটী যদি লিখি, আমার কোনও দুইটী "ক" অক্ষর অবিকল এক প্রকারের হইবে না, অথচ সকল গুলিকেই অপরে "ক" অক্ষর বলিবে ও এমন কি অন্যান্য অক্ষরের সহিত কথায় লিখিত হইলে আমার হস্তাক্ষরের "ক"—অক্ষরও বলিবে সন্দেহ নাই। এইক্ষণে, যদি একজন নির্দ্দিষ্ট লোক একটী নির্দ্দিষ্ট কথা বারম্বার উচ্চারণ করে, তাহার কোনও দুইটী উচ্চারণ সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইবে না। এ বিষয়ে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। সত্য, আমরা স্থূল আকৃত্যাদি বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট বিভিন্নতা দর্শন করি সূক্ষ্ম বিষয়ে তদ্রূপ করি না—তজ্জন্যই সন্দেহের উদ্রেক হয়। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের (Jevons প্রভৃতি) সম্ভাবনা বাদ মতে (Theory of Probability) বিচার করিলেও দেখা যায় এক হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, বিভিন্ন অংশ সংখ্যায় যত অধিক হইবে, তাহাদিগের কোন এক ভাবে পুনর্মিলন হওয়ার সম্ভাবনাও ততোধিক অল্প। আমাদিগের কণ্ঠস্বরের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন পর্দ্দার সংখ্যা স্বরোদয় শাস্ত্রে এত অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে যে, তাহাদের সকলের একভাবে সম্পূর্ণরূপে পুনর্মিলন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। বিকট দার্শনিক মতেও সর্ব্বতোভাবে সমান দুইটী ঘটনা যেরূপ কাল পৌর্ব্বাপর্য্যে কাল্পনিকভাবে ও তাহারা দৃশ্য জগতে পরস্পর চির বিচ্ছিন্ন, কখনই এক হইতে পারে না; কারণ যাহাকে বিভিন্নভাবে নির্দ্দেশ বা চিন্তা বা অনুভব করা যায় তাহাই বিভিন্ন। অর্থাৎ যদি একান্তই বল, আমার দুইটী কথার উচ্চারণ অবিকল এক প্রকার হইয়াছে, বিকট দার্শনিক মতে আমি বলিব কখনই না, অন্ততঃ দুইটী উচ্চারণের মধ্যে সময়ের বিভিন্নতা আছে

ইহাতেও তাহারা বিভিন্ন ; তদ্রূপ হস্তলিখিত "ক"—অক্ষর গুলি অন্ততঃ স্থান বিষয়ে বিভিন্ন।

এরূপ বিকট দার্শনিক মত সুদূরে পরিত্যাগ করিলেও, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে আকৃতি প্রকৃতি, গুণ ও কার্য্যগত অনুভবনীয় বিভিন্নতা সচরাচর বিদ্যমান্। এইরূপ বিভিন্নতার বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে আমার অনেক সময় মনে হয় ;—হয়ত তুমি তোমার এক পদার্থের যে ভাব উপলব্ধি করিতেছ, আমি আমার সেই ইন্দ্রিয়ে সেই পদার্থের ঠিক সেই গুণের উপলব্ধি করিতেছি না ; বোধ হয় যদি আমি তোমার কিম্বা তুমি আমার অন্তরে একদিন প্রবিষ্ট হইতে পারিতে বা পারিতাম, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা নিষ্কলিত হইতে পারিত. তাহা হইলে তোমার "কাল" রং ; ও আমার "কাল" রং ; প্রকৃত স্বতন্ত্র কি না বুঝা যাইত,কিন্তু তুমি আজীবন যে পদার্থের যে রূপকে 'কাল' বলিলে. বিভিন্ন হইলেও আমিও সেই পদার্থের সেই রূপকেই তোমার 'কাল' বলিয়া ধারণা ও প্রকাশ করিলাম। অতএব তোমার 'কাল' আমি জানিলাম না বা আমার 'কাল' ও তুমি জানিলে না, অথচ, পদার্থগত রূপভেদে নামের সামঞ্জস্যও নষ্ট হইল না।

বিভিন্নতা ও একত্বের সম্বন্ধ

তাহা হইলে বিভিন্নতার কি চূড়ান্ত! বিচ্ছিন্নতার একশেষ! তবে কি আমরা বিচিত্র বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি গুণ ক্রিয়া সম্বলিত সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত? তবে কি আমরা একজাতীয় এক মণ্ডলী এক সমাজভুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে এরূপ নূতন নূতন জীব? প্রকৃতপক্ষে, আমাদিগের কেবল আমাদিগের কেন! সকল ভাগ, বিভাগ, উপবিভাগের সাধারণ একত্ব গুণ সংখ্যা অপেক্ষা স্বতন্ত্র বিভিন্ন গুণসংখ্যাই অধিক। তথাপি সাধারণ গুণমাত্রেই স্থূল, বৃহৎ, সুস্পষ্ট, নিয়মিত ও বিস্তৃত, স্বতন্ত্র গুণমাত্রেই সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, অস্পষ্ট, অনায়ত্ত ও অনিয়মিত। স্থূল দুই হস্ত, দুই পদ এক মুণ্ডোদর প্রভৃতি সাধারণ গুণবিশিষ্ট জীব মানব, সূক্ষ্ম নাসিকা, চক্ষু, কপালের গঠনপ্রণালীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি, লোক। এই সাধারণ গুণাবলীই বহু প্রিয়পাত্র, বন্ধনহেতুও পরার্থ ; এই স্বতন্ত্র গুণাবলীই প্রিয়তম, স্বাধীনেচ্ছু, স্বার্থ। মানবমাত্রেই এই পরার্থ ও স্বার্থ সম্বলিত স্বভাব বর্ত্তমান থাকায় দার্শনিকদিগের বাক্ বিতণ্ডার বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ হইয়াছে ; তজ্জন্য পরসুখ কি আত্মসুখ (Altruistic or Egoistic Hedonism) অধিকতর বাঞ্ছনীয় তাহার বিচার করিতে অনেক মনীষী বহুকাল ক্ষেপণ করিয়াছেন।

সাধারণ ও স্বতন্ত্র গুণ

তথাপি একত্ব-কারক সাধারণ গুণগ্রাম উর্দ্ধমূলী, বহুত্বোৎপাদক স্বতন্ত্রগুণরাজী নিম্নপ্রসারণশালী—একত্ব উর্দ্ধে, বহুত্ব নিম্নে ; একত্বে দৃষ্টি পড়িলে বহুত্ব আবরিত হয় ; বহুত্ব স্বল্পদৃষ্টি, একত্ব দূরদৃষ্টি ; বহুত্ব প্রথম জ্ঞান, একত্ব পশ্চাৎ বিচার। এক্ষণে একত্বের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। জীব, উদ্ভিদ্, অচেতন—পদার্থ-বিভাগ হইয়াছে। ইহারা পরস্পর কি ভিন্ন? জীব অচেতনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অচেতন উদ্ভিদে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীব নিশ্বাস দ্বারা দেহস্থ অঙ্গারাম্ল বায়ুতে প্রেরণ করিয়া প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুর শুদ্ধ অংশমান লইল, উদ্ভিদ্ পত্রের দ্বারা বায়ুস্থ অঙ্গারাম্ল হইতে অঙ্গার লইয়া নিজ পুষ্টিসাধনু

করিল ও শুষ্ক অন্নপান রাখিয়া বায়ুকে পরিদূষিত করিল, জীব নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত দেহের অন্নায় সেই উদ্ভিদ্ ভোজনে পরিপূরণ করিল। জীবে, বায়ুতে, উদ্ভিদে কি সুন্দর বিচারসঙ্গত নিয়মিত আদান প্রদান চলিতেছে! সামান্যাতিসামান্য হইতে মহদপি মহত্তরে এরূপ ঐক্যতা দেখিয়া মানববুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে। জড়, সমচেতন, চেতন বিভিন্নকারী শক্তিগণ মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যে ফল প্রসব করিতেছে। পত্র বহন করিল, কর আহরণ করিয়া বৃন্তকে দিল, দন্ত ও জিহ্বা চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিল, উদর নিষ্পেষণ ও সকলের সমভাবে উপকার সাধন করিল। এই বিভিন্ন মতগী সমষ্টিতে ক্রমে একভাব ধারণ করিতেছে।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় সৃষ্টিপ্রবাহে একই মূলমন্ত্র সঞ্চারিত—নিম্নে বিচ্ছিন্নতা, উপরে একতা। স্বয়ং পৃথিবী বিচ্ছিন্ন, নিম্নগতি কক্ষযুক্ত, নির্দ্দিষ্টগতি কক্ষ-সম্বলিত চন্দ্রোপগ্রহাবিত বহুগ্রহ বর্ত্তমান এই গ্রহ সকল সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘূর্ণায়মান, সূর্য্যের ন্যায় আবার বহু বিভিন্ন নক্ষত্র-সূর্য্য বর্ত্তমান, এই সৌরমণ্ডল আবার বোধ হয় কোন মহাসূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল কক্ষে প্রধাবিত, নিম্নে বহুত্ব, উর্দ্ধে একত্ব—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সত্তা।

বহুত্ব হইতে একত্ব

আমাদের জ্ঞানোন্মেষ রাজ্যেও বহুত্ব প্রথম, একত্ব পশ্চাৎ। একত্ব ভিন্ন সকলই বহুত্ব। জন্ম হইতেই আমরা বিষমভাবে প্রক্ষিপ্ত—আত্মা ও জগৎ, আমি ও তুমি, দিবা ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকার, স্ত্রী ও পুরুষ, হাস্য ও ক্রন্দন, সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু,—ইন্দ্রিয়োন্মেষই বিপরীত ভাবাবলম্বনে। আমাদের অন্ধ-করণেও সময়ে সময়ে কাহারা দুইজনে কথাবার্ত্তা কহে বিষমভাবের বিশ্লেষণেই নিত্য চতুরত্ব, বহুত্ব সন্দেহ নাই। দিবারাত্রির পর সন্ধ্যা, ভূতভবিষ্যতের পর বর্ত্তমান, আমি তুমির পর তিনি, শীত গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তৎপরে শরৎ হেমন্ত বসন্ত অনুমান করা যায়।

একত্বের উদ্ভব

একত্বের উদ্ভব বিচারবলে প্রথমতঃ বহুত্বের সমষ্টিজ্ঞানে দিবারাত্রিতে মোট দিবস, ঋতুসমষ্টিতে বর্ষ, ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমষ্টি কাল প্রভৃতি। এইরূপে বহুবিষয়ের সাধারণ গুণাবলম্বনে শব্দবিদ্ পণ্ডিতগণ গুণবাচক নাম বা বিশেষণপদের উৎপত্তি নির্ণয় করেন এবং ভাগ বিভাগাদির সংজ্ঞাও এবম্প্রকারে উৎপন্ন

দ্বিতীয়তঃ একত্বভাব জগতের আবর্ত্তন অনুধাবনে উৎপন্ন হয়। এই বিষয়টী একটু বিশদভাবে বুঝান আবশ্যক। সূর্য্যমণ্ডল, গ্রহমণ্ডল, উপগ্রহমণ্ডল সকলেই নিজে নিজে বিঘূর্ণিত, অবিরত বিচলিত, স্বতঃ চিরচঞ্চল; প্রথম দর্শনে, স্বল্পদর্শনে তাহারা অনিয়মিত, সুযোদর্শনে দূরদর্শনে সকলে নিয়ন্ত্রিত, চাঞ্চল্য সত্ত্বেও পুনঃ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত, সমষ্টিজ্ঞানে গুণে অবিচলিত। পৃথিবীতে পুনরায় আবর্ত্তন—সমুদ্রসলিল রবিকরে মেঘাকারে শূন্যমার্গে উত্থিত, মেঘ জলাকারে স্থলে সিঞ্চিত, স্থলস্থ জল অবিরত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত, সমুদ্র হৃতজল পুনঃপ্রাপ্ত সেইরূপ, পূর্ণিমা-অমাবস্যা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা; শীত গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম-শীত; বীজ-অঙ্কুর-পল্লব-শাখা-ফুল-ফল-বীজ। এইরূপ ঘুরি ঘুরি আবর্ত্তন পরম্পরা অচেতন-সমচেতন-সচেতন সর্ব্ববিধ পদার্থে সমভাবে পরিস্ফুট, অন্তরাজ্যে

অদৃষ্টচক্র পর্য্যন্ত কৌমার-যৌবন জরা, ক্ষয়-বৃদ্ধি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তনে নিয়ত বিঘূর্ণিত।

এক্ষণে এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা যায়,—এই মহান্ পার্থিব ও গুণময় জগতের অসংখ্য বিবর্ত্তনের সাধারণ গুণই এক একটী কেন্দ্র ও স্বতন্ত্রগুণ এক একটী বৃত্তরেখা, এই বৃত্তরেখায় এক একটী বিন্দু আবার আপর ক্ষুদ্রতর বৃত্তের কেন্দ্র, প্রত্যেক বৃত্ত-কেন্দ্র উত্তরোত্তর বৃহত্তর বৃত্ত-কেন্দ্রের উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ সূত্রার্থ

বহুবিচারিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা তদ্বৎ এক একটী মহাবাক্য চিরন্তন দার্শনিক ভাবুক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মানস-সাগর আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটী কোন একটী ধর্ম্মবিশ্বাসের নিজস্ব চিহ্নমাত্র হইতে পারে না। ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটী চরম স্বতঃসিদ্ধ মাত্র। এই মহাবাক্যের অর্থ ঈশ্বর শঙ্করাচার্য্য হইতে আচার্য্য কেশব সেন পর্য্যন্ত মনস্বিগণ বহুবিধ ভাবে ধারণা করিয়া গিয়াছেন। এই মহীয়সী সৃষ্টি, এই বহু অবয়ব, এই ভূতপদার্থ দৃশ্যপট, দার্শনিকদিগের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম ও অধ্যাসভাষ্য সকলই বিলুপ্ত, শেষ মহাবিলোপ—কিছুই থাকে না,—জগৎ আত্মার স্বপ্ন, আত্মাই ব্রহ্ম, অখণ্ডচৈতন্যরস ব্রহ্ম অজ্ঞানোপহিত হইয়া জীবাত্মারূপে জগৎ স্বপ্ন দেখিতেছে—ইহাই একমেবাদ্বিতীয়মের এক অর্থ। ইহার বিপরীত নানাভাবে Deism, Theism, Pantheism, Polytheism সকলই হইতে পারে। বহুগুণাবলম্বী সমষ্টি জগৎ বা "তুমি" এবং "আমি" এই দুই পুনরায় সমষ্টিভূত হইয়া এক "সে" (ব্রহ্মত্বে) পরিণত হয়; তখন "সে" ভিন্ন আর কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই Positive Philosopher Compt's "The Etro Supre'me," "The Grand Etro."

অন্যভাবে। এই চিরঘূর্ণায়মান ব্রহ্মাণ্ড যে এক মহানীতির বশবর্ত্তী হইয়া মহাবেগে এক ভীষণ কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাতে কি কোন শব্দ উত্থিত হইতেছে না? এই পৃথিবী ভীষণবেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং নিজেও চক্রনেমীবৎ বিঘূর্ণিত, প্রত্যেক গ্রহ ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত, এমন কি, স্বয়ং সূর্য্যও কোন এক অতিদূরবর্ত্তী কেন্দ্র ধারণ করিয়া এক মহা ভীষণ বিবর্ত্তন কার্য্যে রত। স্বয়ং পৃথিবীতে প্রত্যেক মানব-পশু-পক্ষী নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে লইতেছে, আহার বিহার কার্য্যাদি করিতেছে বাক্য-শব্দাদি করিতেছে, প্রত্যেক উদ্ভিদ বা অচেতন বায়ু জল তাড়নে সর্ব্বদা কম্পিত, ঘর্ষিত, শব্দিত। সমস্ত মিশ্রিত হইয়া কি কোনও এক অবর্ণনীয় শব্দ হইতেছে না? কে জানে? মানব ক্ষণমাত্রও এ শব্দের বিরামাবস্থা উপলব্ধি করে নাই, তজ্জন্য হয়ত কিছুই বুঝে না; আমরা কর্ণ বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে শারীরিক শ্বাসপ্রশ্বাস ধমনীর গতি প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিতে পাই—ইহাকে চলিত কথা "রাবণের চুলীর" অবিরাম শব্দ বলে; পণ্ডিতগণও বলেন, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে অবিরল ওঙ্কার বা হংস বা সোঽহং ধ্বনি হইতেছে। সেইরূপ জগৎব্রহ্মাণ্ডও কি ঐরূপ কোন অব্যক্ত মহাওঙ্কার ধ্বনিতে চির ঘূর্ণায়মান? সত্য সত্যই কি স-রব শব্দে ঘূর্ণিত হইতেছে? শব্দ কি? বিজ্ঞান বলে—নিয়মিত স্পন্দন (vibraton)। জগতও ত নিয়মিতভাবে

স্পন্দিত (বিবর্ত্তিত) হইতেছে, কেন তবে শব্দ হইবে না? বায়ুতে শব্দ বহন করে, উৎপাদন করে না; বায়ুহীন স্থানের শব্দ নীরব শব্দ। হইতে পারে, আমাদিগের কর্ণ যেরূপ অতি সূক্ষ্ম পিপীলিকাদির অস্তথা প্রমাণিত রব গ্রহণে অসমর্থ, হয়ত সেইরূপ মহা ওঙ্কারধ্বনির ভীষণ রব গ্রহণেও নিরপেক্ষ; হইতে পারে সে মহাওঙ্কার ধ্বনি নীরব শব্দ, বায়ুহীন স্থানের স্পন্দন সম্ভূত রব। কিন্তু তথাপি,

* * * *

"To Reason's ears they all rejoice
And speak a glorious voice."

* * *

Addison

কিবা তায়, ঘোরে যদি গভীর নীরবে
আঁধারেতে ভূমণ্ডল-চতুর্দ্দিকে সবে;
প্রকৃত নিধন, কিম্বা কোন কণ্ঠস্বর,
প্রদীপ্ত জ্যোতিষ মাঝে নহেক গোচর?
বিচার শ্রবণে তারা আনন্দিত কত!
সুমহৎ স্বরে গান করে অবিরত;
জ্বলিতে জ্বলিতে তারা করিছে প্রচার,
'নির্দ্দিষ্ট যে করে মোরা তাহা বিধাতার'।

বাস্তবিকপক্ষে, শব্দ আকাশভূতের কর্ম্ম, বায়ুহীন স্থানেও শব্দ সম্ভব; তজ্জন্যই আর্য্য দর্শন বলিয়াছে;—

"অনাদি নিধন শব্দ অর্থের সহায় নিত্য, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান্ থাকে, উচ্চারণে ব্যক্ত এবং উচ্চারণের পরেও ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য হইয়া বর্ত্তমান থাকে; শব্দ মনুষ্য করে না, কণ্ঠধ্বনিতে শব্দ সঙ্কেত করা হয় মাত্র।" (বেদান্ত দর্শন)

একত্ব ও বহুত্বের মর্ম্ম

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টির নিয়মিত স্পন্দন, মহাওঙ্কার রব প্রভৃতি একত্রীভূত হইয়া আত্মার অন্তরে এক মহা চৈতন্য কেন্দ্রের বিষয় আগরিত করিতেছে; সেই মহা চৈতন্য কেন্দ্র স্ফুরিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া দ্বিতীয় স্তরের বহু চৈতন্যকেন্দ্র সকল উৎপন্ন করিয়াছে, দ্বিতীয় স্তরের এক একটী আবার তৃতীয় স্তরের অসংখ্য চৈতন্য কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে; এই নিয়মে ক্রমে আমি, তুমি, তিনি, প্রত্যেক নর, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ্ অচেতন প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চৈতন্য-কেন্দ্র; মানবের অহং মমত্ব, পারিবিক সংস্কার (Instinct), মহাত্মভব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর নবাবিষ্কৃত উদ্ভিদের অনুভব শক্তি, পার্থিব মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের ধর্ম্ম (Inertia) এক এক চৈতন্য-কেন্দ্রের উপলব্ধি মাত্র। অতএব সমষ্টি এক-চৈতন্য ব্যষ্টি বহু-চৈতন্য।

তুলনা

মনোবিজ্ঞান বিচারেও মনস্বিগণ প্রধানতঃ দুইটী পথ অবলম্বন করিয়া, বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে আগমন, কিম্বা, অন্তর্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগতে গমন করেন; এ দুই পথই এক—বিপরীত মুখে বিচরণ করা মাত্র—উভয়ই এক সত্যদৃশ্য প্রদর্শন করায়। প্রাচী পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ প্রথম পথ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ বহুত্ব হইতে একত্ব নির্দ্ধারণ করেন (Induction); প্রতীচী পণ্ডিতগণ স্বভাবত দ্বিতীয় পথ গ্রহণে সমুৎসুক অর্থাৎ একত্ব হইতে বহুত্ব ধারণ করেন (Deduction)। প্রথমটী বহুত্বে একত্ব দর্শন ও দ্বিতীয়টী একত্বে বহুত্ব দর্শন; একটি সাধারণ লক্ষণ সমূহের সমষ্টি অনুভব, অপরটি স্বতন্ত্রগুণ সকলের ব্যষ্টি বিচার; একটী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ, অন্যটি খ্রীষ্টীয় মহম্মদীয় ধর্ম্মের বীজ। উভয় পদ্ধতির সামঞ্জস্যে একমাত্র সত্যই উপলব্ধি হয়।

উপসংহার

"এক" গণিতশাস্ত্রের প্রথম সংখ্যা, একই যাবতীয় সংখ্যায় সাধারণরূপে বিরাজমান অর্থাৎ যাবতীয় সংখ্যা এক হইতে উৎপন্ন ও একদ্বারা বিভাজ্য। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশমাধ্যায়স্থ "অক্ষরাণা মকারোঽস্মি" প্রভৃতি শ্রীভগবদ্বাক্যের তুলনায় আমরা অনুভব করিতে পারি,—

— "সংখ্যানামেকসংখ্যোঽস্মি"

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

রাজা রামচন্দ্র দেব

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন সার্দ্ধশত বর্ষ মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে রামচন্দ্র নামধেয় অনেকগুলি হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেই রাজাদিগের মধ্যে বেনাপোল-কাগজ-পুকুরিয়া, ছত্রভোগ ও চন্দ্রদ্বীপ এই তিন স্থানের তিনজন রাজাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাগজ-পুকুরিয়ার রাজা রামচন্দ্রের কথা, আমরা 'জীবন্ত-সমাধি' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে, 'ভারতবর্ষ' ও 'মানসী' মাসিক পত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। ছত্রভোগরাজ রামচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে, সামন্তরাজরূপে, দক্ষিণে সীমান্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন ছত্রভোগে গিয়া, শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অভিলাষী হন অথচ উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ীয় পাতসাহ হুসেন সাহের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকায়, তাঁহার উড়িষ্যা গমন (অবশ্যই লৌকিক আচারে) সম্ভবপর ছিল না, তখন রামচন্দ্র নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তাঁহার গমনে সহায়তা করিয়াছিলেন – তাঁহাকে নৌকাযোগে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছত্রভোগরাজ রামচন্দ্রের সম্বন্ধেও আজ আমরা কোনও কথা বলিব না। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রও আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহেন। আজ আমরা রামচন্দ্র নামধারী অপর এক নৃপতির, অন্য এক লুপ্তপ্রায় হিন্দু রাজার লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

উল্লিখিত রামচন্দ্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন ব্রাহ্মণবংশীয় এবং শেষোক্ত দুইজন কায়স্থ কুলসম্ভূত আর চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ব্যতীত অপর তিনজনই খাঁ উপাধিধারী। সেকালে মুসলমান সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা সুবাদারগণ, অধীন কর্ম্মচারী ও অনুগত ভূম্যধিকারীদিগকে খাঁ উপাধিদানে পুরস্কৃত করিতেন এবং সময়ে সময়ে সেই উপাধির সহিত ভূমিবৃত্তি বা জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক শাসনাধিকারীও করিয়া দিতেন। আমাদের আলোচ্য রামচন্দ্রও সেইরূপ একজন খাঁ উপাধিধারী ভূম্যধিকারী। তবে তিনি যে কোনও পাতসাহ বা নবাব সরকার হইতে খাঁ উপাধির সহিত জমিদারী পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এজন্য অনুমান হয়, তিনি

স্বীয় বুদ্ধি নৈপুণ্যে বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া, রাজোচিত প্রতিষ্ঠা প্রতাপের অধিকারী হইয়াছিলেন, আর তাঁহার গুণমুগ্ধ মুসলমান সুবাদার তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া, খাঁ উপাধি দানে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও লোকের মুখে এরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণনগরের মটুকরাজার পিতামহ, রাজা রামচন্দ্রের পিতামহকে, ব্রাহ্মণনগর রাজ্য হইতে বজ্রদহ (বর্ত্তমান বাজদিয়া বা বাজভিহি) ও বারবাজার নামক দুই খানি গ্রাম ভূমিবৃত্তিরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন আর রামচন্দ্র সেই গ্রামদ্বয় অবলম্বনে এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একথার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইহা জনসাধারণের মনঃকল্পিত একটা কিংবদন্তী মাত্র। মটুকরাজার পিতা পিতামহাদি কোনও পিতৃপুরুষই যে ব্রাহ্মণনগরে, এমন কি, যশোহর জিলার কোনও অংশেই কখনও রাজত্ব করেন নাই, অপিতু মটুকরাজাই যে ব্রাহ্মণনগরের সংস্থাপক, দূরবর্ত্তী পিতৃরাজ্য হইতে আসিয়া তিনিই যে এখানে বন পরিষ্কারান্তে নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভারতবর্ষে 'রাজা চন্দ্রকেতু' প্রবন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি এবং 'ব্রাহ্মণনগরের মটুকরাজা' নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিব। তবে মটুকরাজার সহিত রাজা রামচন্দ্রের যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল আর সেই বন্ধুত্ব বিধি পালন, তাঁহার সাহায্য করিতে গিয়াই যে তাঁহার পতন হইয়াছিল তাহাতে মতদ্বৈধতা নাই। গাজী সাহেব মটুক রাজকে দমন করিতে গিয়া যখন দেখিলেন যে মহাবলশালী রাজা রামচন্দ্র তাঁহার প্রধান সহায়, রামচন্দ্রের দমন ব্যতীত তাঁহার দমন কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নহে, তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্য সাধনেই বদ্ধপরিকর হইলেন। সামান্য সূত্র ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন আর সেই যুদ্ধের ফলে রাজা রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হইল, তাঁহার সমস্ত রাজ্য সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেল। গাজী সাহেবের সহিত এই যুদ্ধ ব্যতীত রাজা রামচন্দ্রের সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই অধুনা কালগর্ভে বিলীন, বিস্মৃতির অন্ধতমসে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব মাত্র সেই যুদ্ধ কথা বিবৃত করিয়াই আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী শেষ করিতে হইবে।

রামচন্দ্রের কথা বলিতে হইলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গাজী সাহেবের কথাও বলিতে হয়। নচেৎ প্রবন্ধের সমীচীনতা নষ্ট হয় এবং রামচন্দ্রের বিবরণও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এজন্য আমরা অগ্রে গাজী সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, পরে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব। গাজী কাহার পুত্র, কোন্ স্থানের অধিবাসী এবং কোথা হইতে কোন্ সময়ে যে তিনি ব্রাহ্মণনগরে ও রামরাজার রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিশদ বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এ অঞ্চলের নানা জনে, নানা প্রকারে তাঁহার পরিচয় প্রদান করে। কেহ কেহ তাঁহাকে গোরা গাজী এবং কেহ বা হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ উল্লেখে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অবাস্তব অলৌকিক কথার প্রচার করিয়া থাকেন। 'কালু গাজী ও চম্পাবতী' নামক কেতাবে তিনি বিরাট নগরের রাজা সেকেন্দর সাহের পুত্র বলিয়া•

অভিহিত হইয়াছেন। সম্প্রতি আবার একজন প্রবন্ধলেখক আর্য্যাবর্ত্ত মাসিকপত্রে উক্ত কেতাব অবলম্বনে মটুকরাজার বিবরণ লিখিতে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে আর এক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিজলীর সেকেন্দার পলোয়ানকে বিরাট নগরের সেকেন্দর সাহ ও গাজীকে তাঁহার পুত্র স্থির করিয়া তাঁহার জন্মকাল ১৪৮০ এবং মটুক রাজার রাজ্য নাশের কাল ১৫৩০ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাগুক্ত জনরবের ন্যায় তাহার এই সিদ্ধান্তেরও কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব, গোরা গাজী ও পীর গোরাচাঁদ যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, পরন্তু তিনজনই যে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি এবং পৃথক সময়ে পৃথক স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন আর গাজী সাহেবের সহিত হিজলীর সেকেন্দর পলোয়ানেরও যে কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাহা সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। আমরা এস্থলে কেবল গাজী সাহেবের কথাই বলিব। তিনি যখন মটুক রাজা ও রামরাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে তাঁহাদের সমকালবর্ত্তী আর তাঁহাদের একজনের সময় নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহার সময়ও যে সহজে নির্ণীত হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কার্য্যও বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। এ দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকই একথা অবগত আছেন যে, মটুক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র কামদেব গাজী সাহেবের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং 'ঠাকুরপর সাহেব' নামে পরিচিত হইয়া, চারঘাট গ্রামের হরিদাস সাহাকে স্বীয় শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করেন। হরিদাস সাহা 'হরে শুঁড়ী' নামেই এদেশে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং মধ্য বঙ্গের অন্যতম ধনাঢ্যতম ধার্ম্মিক রাজস্ব বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। সেই হরিদাসের সহিত যশোহরের কায়স্থ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ব্যাপার এদেশের একটী সর্ব্বজনবিদিত স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, ইহার প্রতিকূলে এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই প্রচারিত বা লিখিত হয় নাই। সুতরাং ঠাকুরপর সাহেব যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন আর তাঁহার পিতা মটুক রাজা, মটুক রাজার বন্ধু রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গাজী সাহেব যে তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ মোগল সম্রাট আকবর সাহের শাসন কালের শেষাংশ হইতে জাহাঙ্গীরের শাসন কালের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত কয়েক বর্ষের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এ অবস্থায় হুমায়ুনের শাসনকালকে গাজী সাহেব কর্ত্তৃক মটুক রাজার এবং প্রকারান্তরে রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য নাশের সময় বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তারপর গাজী সাহেবের জন্মকাল যদি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ প্রাচীন বয়সে, ৫৩।৫৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সেরূপ উৎসাহ সহকারে দুইজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ করাও যেন, তাঁহার পক্ষে, অনেকটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য হইয়া পড়ে। এই সকল কারণ বশতঃ আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধ লেখকের সমস্ত সিদ্ধান্ত, প্রচলিত জনরবের ন্যায়, অপ্রামাণ্য, অমূলক বলিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।

গাজীসাহেব কোন্ সেকেন্দর সাহের পুত্র এবং তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা এদেশে মাত্র চারিজন প্রসিদ্ধ সেকেন্দরের দর্শন পাই—হিজলীর সেকেন্দর পলোয়ান, লোদী-বংশীয় দিল্লীশ্বর সেকেন্দর লোদী, বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহ এবং শূরবংশীয় সেকেন্দর সাহ শূর। এই চারি জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সেকেন্দর সাহ শূর গাজী সাহেবের অনেকটা নিকটবর্ত্তী কিন্তু তাঁহাকেও তাঁহার পিতা বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তাঁহার সময়েই মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক বা পীরগণ বঙ্গদেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থে আগমন করেন। সুতরাং তাঁহাকে বিরাট নগরের সেকেন্দর আর গাজীসাহেবকে তাঁহার পুত্র ও পীরদিগের একতম বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে, লুপ্ত-প্রায় ঐতিহ্য তথ্যের একটা নূতন অধ্যায়ের আবিষ্কার করা যাইত কিন্তু তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ গাজী বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহের অনেক উত্তর-বর্ত্তী। কেহ কেহ তাঁহাকে সেকেন্দর নামা কোনও ধনী আমীরের পোষ্যপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও কোনও লোকের মুখে আবার এরূপ কথাও শুনা যায় যে, তিনি আদৌ ব্রাহ্মণ ছিলেন, শেষে বঙ্গ-দেশাগত পীরদিগের কোনও শিষ্য বা প্রশিষ্যের নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পীর পদবাচ্য হইয়া উঠেন। এ অঞ্চলের অনেক প্রবীণ মুসলমানও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। 'কালু গাজী ও চম্পাবতী' নামক পুস্তকেও যেন ইহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতী বা সুভদ্রার সহিত গাজীর বিবাহ হইলে, তাহা যে অশাস্ত্রীয় হইবে না, উক্ত পুস্তকের লেখক, গাজীর সহিত গঙ্গাদেবীর শোণিত সম্পর্কের উল্লেখে, তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গাজী ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলিবার কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। সুতরাং গাজীকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গাজীসাহেবের মূল বাসভূমি সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেতাবে সেই স্থান বিরাট নগর নামে উক্ত হইলেও, দিল্লী ও আগরার নামও অনেকে করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন না, তিনি যে 'ফকিরী' লইয়া বাকইপুর সব-ডিভিজানের অন্তর্গত ঘুটুরী গ্রামে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, বহু অনুসন্ধানে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। ঘুটুরী বাকইপুরের চৌধুরী উপাধিধারী সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ ভূম্যধিকারীদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। এখন সেখানে গাজীর বাসভবন না থাকিলেও তাঁহার বাস্তভিটার উপরে, তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট একটী 'দরগা' আছে। শুনা যায়, উহা উক্ত চৌধুরী বাবুদের ব্যয়ে ও যত্নে নির্ম্মিত। দরগার নিকটে প্রতিবৎসর অঘ্রাণ মাসীর দিনে মেলা বসিয়া ২।১২৫ দিবস স্থায়ী হয় এবং তাহাতে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এইরূপ প্রচার যে, মেলার সময়ে চৌধুরী মহাশয়েরাই সর্ব্বাগ্রে গাজীর দরগায় পূজা ও বলি প্রদান করেন এবং তাঁহারা পূজাদি না করিলে, কেহই সেই কার্য্যের অধিকারী হইতে পারে না। দরগার

সম্মুখে 'গাজীর পুকুর' নামে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই, অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির আশায়, গাজীর নামে 'সিন্নি ভাষায়।' আর সেই ভাসমান সিন্নি বা বাতসার বিশেষ প্রকার গতি প্রকৃতি অনুসারে আপন আপন মঙ্গলামঙ্গল স্থির করিয়া লয়। জনসাধারণের বিশ্বাস—জলাশয়টী দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও, কেহই নাকি উহার পরপারে লোষ্ট্র নিক্ষেপে সমর্থ হয় না। ঘুটুরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা গাজীর দরগা ও পুকুরের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম ও ভক্তি প্রদর্শন করে এবং রোগাদি 'অসুসার' নিবারণের জন্য, গাজীর উদ্দেশে স্তুতিমিনতি আর তাঁহার দরগা ও পুকুরে 'চাঙ্গত' ও 'সিন্নি মানসা' করিয়া থাকে।

ঘুটুরী গাজী সাহেবের বাসস্থান হইলেও, সুন্দরবনই যে তাঁহার লীলাভূমি তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের আশ্রয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ও দৈবশক্তির সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল আর সেই শক্তি প্রতিষ্ঠার সাহায্যেই তিনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া দুই জন প্রবল প্রতাপ হিন্দুরাজাকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গাজীসাহেব সন্ন্যাসব্রত লইয়া, ফকির হইয়া, কেন যে নরহত্যারূপ কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করা সহজ নহে। আমরা বহু আয়াস স্বীকারে উহার যে কারণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহা 'ব্রাহ্মণ নগরের মটুক রাজা' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এখন রাজা রামচন্দ্রের যথা সংগৃহীত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

রাজা রামচন্দ্র কায়স্থ সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল মুড়াগাছা গ্রামে। সেখানে তাঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্রের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ, হরি নারায়ণ দেব এবং হরিনারায়ণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ, পুরুষোত্তম নারায়ণ দেব হিন্দু ও মুসলমান রাজ-সরকারে উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রভূত মান মর্য্যাদা ও বিষয় বিভব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পৌত্র, কি কারণে জানা যায় না, পৈতৃক বাস্তু ভিটার উপরে বীতশ্রদ্ধ হন এবং মুড়াগাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশোহর জিলার যশোহর নগরের কিঞ্চিৎ দূরে, কোনও সুপ্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে প্রান্তরমধ্যে গিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে সেই পল্লীগ্রামের সুরম্য হর্ম্ম্যমালায়, অসংখ্য দেব মন্দিরে এবং সুপরিসর পথ, সুরচিত উদ্যান ও সুদীর্ঘ সরোবর পরম্পরায় নগরে পরিণত হয় আর পরিশেষে স্থানটী সুসমৃদ্ধ বিপণির নামানুসারে 'বার বাজার' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু সেই বারবাজার নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামচন্দ্র কি তাঁহার কোনও পিতৃপুরুষ তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। অধুনা রামচন্দ্রের যে সব বংশধর খুলনা জিলার নলডাঙ্গা ও গঙ্গানন্দপুর গ্রামে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের বংশ বিবরণের জ্ঞান, এবিষয়েও কোন সঠীক কথা বলিতে পারেন না। তবে কলিকাতা সভাবাজারের দেব উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ রাজারা যে তাঁহাদের জ্ঞাতি তাহা দৃঢ়তা সহকারেই

প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে, রামচন্দ্রের উপরি বর্ণিত পিতৃপুরুষ, পুরুষোত্তম দেবের পৌত্র, স্ব ইচ্ছায় স্বীয় বাসস্থান মুড়াগাছা ত্যাগ করেন নাই, মটুক রাজার একজন পূর্ব্বপুরুষ, প্রভূত ভূমি-জমা ও ধান্যের লোভে প্রলুব্ধ করিয়া, তাঁহাকে এখানে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও যে, ভূমিবৃত্তিদানের ন্যায়, অলীক তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

রামচন্দ্রের বাসস্থান সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে যশোহরের নিকটবর্ত্তী রাজদিয়া (প্রাচীন বজ্রহট) গ্রামের অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজদিয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী পরিখাতুল্য গভীর খাতই সেরূপ মত প্রকাশের কারণ বলিয়া বোধ হয়। খাতটীর বর্ত্তুলবৎ আকৃতি, দূর-বিস্তৃতি ও গভীরতার বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই ধারণা হয়, যেন উহার মধ্যে প্রাচীর-পরিরক্ষিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা বর্ত্তমান ছিল আর সেই অট্টালিকায় কোনও রাজ-প্রতিম ভূম্যধিকারী বহু পরিজনসহ বসবাস করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খাতের ভিতর বাহির কোনও স্থানেই প্রাসাদ ও প্রাচীরাদির কোনও নিদর্শন, এমন কি, একখানি ইষ্টক পর্য্যন্তও পরিদৃষ্ট হয় না। কোনও হিন্দু রাজার বাসস্থান হইলে, নিকটে দুই চারিটী বিলুপ্তপ্রায় বৃহৎ জলাশয় (মজাদীঘি) এবং দুই একটী দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু তাহা যখন নাই, রাজভবন থাকার কোনও চিহ্নই যখন কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন কি বিশ্বাসে রাজদিয়াকে রামরাজার বাসস্থান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে? কেতাবে রামরাজার রাজধানীকে 'ছাপাই নগর' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ছাপাই বলিয়া কোনও নগর যশোহর জিলায় নাই, কখনও ছিল বলিয়াও শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়—ছাপাই বারবাজারেরই নামান্তর অথবা কেবল মাত্র কেতাবের লেখকই উহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন আর সেই বারবাজারই রাজা রামচন্দ্রের প্রকৃত রাজধানী। বারবাজারের বর্ত্তমান অবস্থা ও উহার পারিপার্শ্বিক চিহ্নাদি দর্শন করিলে স্পষ্টই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেখানে এখনও, রাজার বাস্তুভিটার সহিত, 'রাম-রাজার দীঘি' নামা অনেকগুলি গভীর ও বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের মুখে প্রকাশ—'বার-বাজার পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। উহার মধ্যভাগে রামরাজার ইষ্টক রচিত বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ও তাহার চারিদিকে চারিটী প্রকাণ্ড শিব মন্দির বিরাজ করিত। রাজ-ধানীতে অষ্টাধিক শতসংখ্যক বাপী এবং প্রত্যেক বাপীতটে এক একটী শিবমন্দির ও অন্নসত্র বহু অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল। অতিথিশালায় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আগন্তুক মাত্রকেই অন্ন পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করা হইত।' রাজার অতিথিসেবার কথা মুসল-মানলেখকও স্বীকার করিয়াছেন। 'কালু-গাজী ও চম্পাবতী' কেতাবে দেখিতে পাই—

"ছাপাই নগরের রাজা শ্রীরাম নামেতে।
শুনিনু যে অন্নদান করে নানামতে॥
গরীব এতিম আর দরিদ্র সবায়।
অন্নদানে সবাকারে তোষেন সদায়॥"

রাজবাড়ীর বর্ণনায় পুথি বলিতেছে—

"স্বর্গের তুলনা পুরী দেখিতে সুন্দর।"

এই সকল কিম্বদন্তী ও প্রমাণের সাহায্যে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, বারবাজারেই রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তিনি যেমন ঐশ্বর্য্যশালী তেমনই পরোপকারী, প্রজাবৎসল ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। বারবাজারে এখনও তাঁহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। একটী কৃষ্ণ-প্রস্তর সমন্বিত প্রকাণ্ড ও চূড়াহীন ভগ্ন শিব মন্দির অদ্যাপি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দিরের আকৃতি সুন্দর গঠন ও শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। উহার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ প্রায় তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক পার্শ্বের পরিমাণ বিংশতি হস্ত, ভিত্তির পরিসর কিঞ্চিদূন তিন হস্ত কিন্তু উচ্চতা ষষ্টি হস্তেরও অনেক অধিক বলিয়া বোধ হয়। আকবর-জাহাঙ্গীরের সময়ে বঙ্গ দেশের স্থাপত্যশিল্প যে কতদূর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহা এই মন্দিরের দ্বারা অনেকটা বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যত্নাভাবে ক্রমশঃই ইহার বিনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া যাইতেছে।

উপরি বর্ণিত বিবরণ ব্যতীত রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজধানী সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই সুতরাং এখন আমরা তাঁহার জীবনের প্রধান ও শেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াই পাঠকগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিব। রামচন্দ্রের বিনাশসাধনই যখন গাজী সাহেবের সঙ্কল্প হইল, তখন তিনি তদনুরূপ কার্য্যসাধনে কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি সুন্দরবন হইতে এক দল সেনা লইয়া আসিয়া, সহসা অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রামচন্দ্র স্বীয় বীর পুত্রের সাহায্যে অনতিকাল মধ্যেই, তাহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গাজীসাহেব পরাস্ত হইয়াও নিরস্ত বা ভীত হইলেন না, বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, পুনরায়, যুদ্ধসজ্জা করিলেন এবার তিনি তাঁহার সুন্দরবন সেনার উপরে নির্ভর না করিয়া, নিকটবর্ত্তী মোগলদিগের সহায়তা লইলেন। গাজীর অমানুষী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মৌড়ীর সুবাদারের এক সেনাপতিও স্বীয় সেনাবল লইয়া, তাঁহার পক্ষে যোগ দিলেন। গাজী সেই সেনাপতিকে স্থলপথে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া, নিজে স্বসৈন্যে নৌকারোহণে বারবাজার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, রামচন্দ্র সেনাপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই, রাজধানী হইতে তিন চারি ক্রোশ অগ্রসর হইয়া, পথিমধ্যেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। এদিকে গাজীসাহেব সুযোগ বুঝিয়া স্থলপথে আসিয়া, সহসা তাঁহার নগর আক্রমণ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুই দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইলে, রামচন্দ্র নগর রক্ষায় সমর্থ হইবেন না আর তজ্জন্য অতি সহজেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু রামচন্দ্রের পুত্র তাঁহার অন্তরায় হইলেন। রাজা নগর ত্যাগ করিলেও রাজকুমার তাঁহার অনুগামী হন নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া নগর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত সেনাসহ সহসা গাজীসাহেবকে নগর বেষ্টন করিতে দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণনগরে ও শেষে যুদ্ধনিরত পিতার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উদ্বেগের অবসান হইল না। পাছে মটুক রাজার সহায়তা প্রাপ্তির কি

পিতার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তিনি গাজীর হস্তে পরাজিত ও সপরিবারে নিহত হন, এই আশঙ্কায় স্বীয় শিশুপুত্র কমলনারায়ণকে অপরাপর পরিজনদিগের সহিত স্থানান্তরিত করিলেন—বারদাকার হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বোধখানা গ্রামে তাঁহাদের এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং সমস্ত সেনা একত্র করিয়া গাজীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

রাজপুত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গাজীর সঙ্কল্প আপাততঃ ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হইলেন না। বার বার বিপুল বলে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র দূতমুখে পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়াই ভীমবেগে মুসলমান সেনাপতির উপরে আপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার সেনাদলকে বিশৃঙ্খল ও ইতস্ততঃ বিতাড়িত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতি তাঁহার তথাবিধ আকস্মিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলেও পরাস্ত হন নাই সুতরাং তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই স্বীয় সেনাদিগকে একত্র সমাবিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তীরবেগে তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং রামচন্দ্র নগরে প্রবেশ করিবা মাত্রই তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন রামচন্দ্র ভীত হইলেন না; কিন্তু পুত্রের সাহায্যার্থে নদীর দিকে যথাপ্রয়োজন সেনা পাঠাইয়া দিয়া, বিশেষ বীরত্ব ও সাবধানতা সহকারে সেনাপতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নগরের দুইদিকে, একক্রমে পাঁচ দিবসকাল ঘোর যুদ্ধ চলিল। উভয়দলে বহু সেনা হতাহত হইল—হিন্দু ও মুসলমান সেনার রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, রণভূমি কর্দ্দমাক্ত, প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না, কোনও পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিল না। গাজী সাহেব রাজা রামচন্দ্রের ও তাঁহার পুত্রের রণ-নৈপুণ্য ও পরাক্রম দেখিয়া চমৎ পাইলেন এবং যুদ্ধের পরিণাম ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, এইরূপ ভাবে আর দুই দিবস যুদ্ধ চলিলেই তাঁহার পরাজয় ঘটিবে, তিনি সসৈন্যে রাজা রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইবেন। তখন তিনি আপনার প্রিয় শিষ্য বা অনুচর কালুসাহার সহিত যুক্তি করিয়া, ছয়দিন নিশীথরাত্রে নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। নগর ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নি শত শত লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া প্রসারিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত বাটীঘরবাড়ী গ্রাস করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র পুত্রের সহিত সসৈন্যে সেই অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশাল রাজ্য, বিপুল ধন-সম্পদ ও সমস্ত শক্তি-প্রতিপত্তি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। যশোহর জিলার কোনও কোন অংশের অধিবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, তাঁহারা গাজী প্রদত্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথমে রাজা রামচন্দ্র ও শেষে তাঁহার পুত্র মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালুগাজী ও চম্পাবতী কেতাবে অগ্নির কথাই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এই যুদ্ধে যটুক রাজা যে কেন রাজা রামচন্দ্রের সহায়তা করেন নাই তাহা বুঝিতে

পারা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি যথা সময়ে যুদ্ধের সংবাদ পান নাই। তারপর যখন তাঁহার নিকটে সংবাদ পঁহুছিল আর তিনি 'ব্যস্ত সমস্ত' হইয়া, প্রভূত সেনাসহ নিজের এক পুত্রকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দিলেন, তখন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, মুসলমানেরা সপুত্র রাজা রামচন্দ্রকে নিহত করিয়া বারবাজার অধিকার করিয়া লইয়াছে। রাজকুমার ভৈরব নদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই ক্ষুণ্ণমনে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। যদি আর এক দিবস পূর্ব্বে তিনি বারবাজারে আসিয়া পঁহুছিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমস্ত অবস্থারই পরিবর্ত্তন ঘটিত—রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার বীরপুত্র অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহাদের বিশাল রাজ্যেরও বিলোপ ঘটিত না। কিন্তু সমস্তই বিধির বিধান সবই ভগবানের খেলা।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

নাইট্রোজেন ও তাহার আবর্ত্তন ক্রিয়া

বিংশশতাব্দীর এই বিরাট মহাসমরের সময় নাইট্রোজেনের ধ্বংসকরী ভয়াবহ কার্য্য ক্ষমতা দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ নাইট্রোজেনকে Inert বা অপ্রক্রিয়াশীল বলিয়া সচরাচর বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন ইহা আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, তখন আর কেহ ইহাকে অদ্ভুত শক্তিশালী না বলিয়া থাকিতে পারে না। এমন কি আজকাল ইহা যে সমুদয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলে ইহাকে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রলয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত Explosive বা বিস্ফোরকপদার্থ যুদ্ধ এবং ধ্বংস কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমুদয়ের মধ্যেই নাইট্রিক এসিড্ বা নাইট্রেট অনিবার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত নাইট্রেটই চিলীপ্রদেশের বিরাট খনি হইতে উত্তোলিত করিয়া এবং পরে 'নাইটার' বা পটাসিয়াম নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত করা হইত। কিন্তু আজকাল নাইটারের প্রয়োজনীয়তা এতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে চিলীর সুবিশাল খনিও তাহা সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিস্ফোরক পদার্থে তাহার ব্যবহারই এই অভাবের একটী প্রধান কারণ। এ অবস্থায় প্রকৃতির সুবিশাল ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেনকে মানুষের আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক কল্পনা চলিতেছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ আজ কাল নানা উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিয়া নাইটার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যাহা হউক সে সমুদয় পরে বিবৃত হইবে।

যাবতীয় সজীব পদার্থ এবং জীবের শরীর হইতে যে মলমূত্র প্রভৃতি বহির্গত হয়, তন্মধ্যে নাইট্রোজেনের অবস্থিতির কথা বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। যখন কোন জৈবিক পদার্থ Bacteria বা এক প্রকার জীবাণুর সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন নাইট্রোজেনের কতকাংশ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা শোষণ করিয়া লিলে তাহা হইতে বৃক্ষাদি ইহাকে শোষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। জীবগণের নাইট্রোজেনের হজম করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষলতাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং বৃক্ষলতাদিও আবার ইহাকে বায়ুমণ্ডল হইতে টানিয়া আনিতে পারে না। নাইট্রোজেন সাধারণতঃ মৃত্তিকাস্তরে পটেসিয়াম, সোডিয়াম অথবা অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। মাটীর সহিত বিভিন্ন রকমের Becteria বা জীবাণু থাকে, ইহারা নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থকে নাইট্রেট এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত করিয়া থাকে। তখন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, কিন্তু সেখানে ইহার স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। ইহা বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের (Electric discharge) সংস্পর্শে আসিয়া নাইট্রিক অম্লাইডে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিজলের সহিত ভূমিতে পড়িয়া আবার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির জন্য এত অধিক নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় যে এই নাইট্রোজেন কিছুতেই তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। এই জন্যই জমির মধ্যে নাইট্রোজেনঘটিত নানা প্রকার সার প্রয়োগ করিয়া কৃষকগণ জমির উর্ব্বরা-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

নাইট্রোজেনের উপরি উক্ত রূপ অদ্ভুত অবস্থা বিবর্ত্তন আরও সুন্দররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। আজ হয়ত নাইট্রোজেন পরমাণু দুর্ব্বার দেহস্থ সূক্ষ্ম কোষগুলিতে (Cells) অবস্থান করিতেছে আবার কাল হয়ত তাহা কোন প্রাণী শরীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে তাহা প্রাণীর মলমূত্র হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধ পথে উঠিয়া বিদ্যুৎ সংস্পর্শে অক্সিজেন গ্যাসের সহিত মিশিয়া গেল এবং নিজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিয়া আবার নিম্নগামী হইতে বাধ্য হইল এ যেন কলুর বলদের মত অবিরত বৃত্তাকার পথে ঘুরিতেছে।

এই ত গেল নাইট্রোজেন কিরূপে প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি করে। এইরূপে ইহা অনন্তকাল ধরিয়া প্রকৃতির দাসত্ব করিয়া আসিতেছে এবং এই দাসত্ব—মোচন করিতে যে চেষ্টা করে নাই এই কথা বলিলে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের একটী প্রকৃতিগত গুণকে অস্বীকার করা হয়। বহুদিনের দাসত্বফলে তাহার জীবনীশক্তি এমনই অসারতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে এক সূক্ষ্ম শৃঙ্খল উন্মোচিত হইতে না হইতেই বৈজ্ঞানিকের সুদৃঢ় শৃঙ্খল তাহার পায়ে পড়িয়াছে ইহা হইতে তাহার আর কিছুতেই রক্ষা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নাইট্রোজেন জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮৭৩ খৃঃ আমেরিকার চিলী ও পেরু প্রদেশের পটেসিয়াম নাইট্রেট মাটীর নীচে প্রায় ৫৫০০০০০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে প্রতিবর্গ মাইলে

১০ লক্ষ টন নাইটার আছে। কিন্তু প্রতি বৎসর তাহা এত প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইতেছে যে অনেকেই বলিতে লাগিলেন এক শতাব্দীতে সমস্ত নাইটার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তদবধি তখন হইতে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টায় কোন কোন বৈজ্ঞানিকের চিত্তচঞ্চল হইয়া উঠে। এবং কৃত্রিম উপায়ে অথচ স্বল্প ব্যয়ে যাহাতে নাইটার পাওয়া যাইতে পারে সে চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাধনা সিদ্ধ হইল। প্রধানতঃ এ পর্য্যন্ত তিনটী উপায়ে অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় নাইট্রোজেন প্রস্তুত হইয়া থাকে তন্মধ্যে শেষোক্তটীই আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

১। কেলসিয়াম কারবাইড জলীয় বাষ্পের সহিত নাইট্রোজেনে উত্তপ্ত করিলে ইহা কেলসিয়াম সিনেমাইডে পরিণত হয়।

২। হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন এই দুইটী মৌলিক পদার্থ হইতে এমোনিয়া প্রস্তুত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া তাহাকে জলে অথবা ক্ষারের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিলে উহা শোষিত হইয়া যায়।

প্রিষ্টলি J. Priestly দেখিলেন যে বায়ুর মধ্যদিয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে কোন দ্রাবক পদার্থ (acid) উৎপন্ন হয় এবং বলিলেন যে উহা কারবণিক এসিডই হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎপরে কেভেণ্ডিস (১৭৮৫) প্রমাণ করিলেন যে উক্ত প্রক্রিয়া হইতে উৎপন্ন পদার্থ নাইট্রিক এসিড।

খুব উচ্চ তাপমানে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন একত্র করিলে নাইট্রিকঅক্সাইড্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই উত্তাপের যতই বৃদ্ধি করা যায়, নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণও তত অধিক হইয়া থাকে। সমান আয়তনে (Equal volume) উক্ত দুইটী পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ বর্দ্ধিত করিলে যে পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড্ প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

তাপমান	১৯১১°	২০৩৩°	২১৯৪°	৩০০০	৩২০০°
নাইট্রিক অক্সাইড	·০৭	·৬৪	·৯৯৭	৪·৫	৫·০

আজকাল আবার বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মানুষের আয়ত্তাধীনে আনিবার নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যদিয়া যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়—তখন এই দুইটী গ্যাস একত্রিত হইয়া এমোনিয়া উৎপাদন করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিপরীত ক্রিয়া (Reversible reaction) হয় বলিয়া উৎপন্ন এমোনিয়ার পরিমাণ অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বাহির হইতে উক্ত দুইটি গ্যাসের উপর অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করিলে উৎপন্ন গ্যাসের (এমোনিয়া) পরিমাণও অধিক হইতে দেখা যায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হাবার' সামান্য এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত অধিক চাপ প্রয়োগ করিয়া (at 185 atmospheres pressure) প্রতি ঘণ্টায় ৯০ গ্রাম তরল এমোনিয়া প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজকাল জার্ম্মাণীর লাডুইগ্‌সাফেন নগরে Badiche Anilinu. Soda-Febrik নামক কোম্পানি বিপুল পরিমাণে উক্ত উপায়ে বায়ুমণ্ডল

হইতে এমোনিয়া এবং তাহা হইতে জমিতে ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুত করিতেছে।

এসিয়া ভূখণ্ডের প্রধানতঃ ভারতবর্ষ পারস্য এবং আরব প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশ সমূহের নগর ও গ্রামের মলমূত্র আবর্জ্জনা প্রভৃতি বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার সুবন্দোবস্ত না থাকায় অধিকাংশ স্থলেই উহা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এজন্য মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আবর্জ্জনার উপর ক্রিয়া করিয়া তাহা হইতে নাইট্রোজেন উৎপাদন করিয়া থাকে। এই মৃত্তিকা অনেকবার জলে ধৌত করিলে ইহার কতকাংশ জলে গলিয়া যায়, পরে এই জল জ্বাল দিলে পটেসিয়াম ও কেলসিয়াম নাইট্রেট প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। গঙ্গানদীর নিকটবর্ত্তী ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পটেসিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ বেঙ্গল সল্‌পিটার নামে পরিচিত। এই নাইটার জমিতে সারস্বরূপে অথবা বারুদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে যখন ইউরোপের রাজন্যবর্গের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তখন বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য ফ্রান্সে নাইটারের বিশেষ অভাব ঘটে এই জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া রাখা হইত। তন্মধ্যে মলমূত্র আবর্জ্জনা, ছাই প্রভৃতি স্তূপাকারে রাখা হইত। ইহার উপরে বৃষ্টির জল যাহাতে পড়িতে না পারে, তজ্জন্য উপরিভাগে টিনের শেড্ নির্ম্মিত হইত। পরে এক প্রকার জলের সাহায্যে আবর্জ্জনাস্তূপের উপর সর্ব্বদা মৃদু ছড়াইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে কিছু দিন চলিলে নাইটারের সারাংশ তাহার উপরে দেখা দিতে আরম্ভ করিত। ইহাকে সময় মত অপসারিত করিয়া এবং জলে গলাইয়া উত্তাপের সাহায্যে বিশুদ্ধ নাইটার প্রস্তুত করা হইত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্তগুপ্ত।

মোসন পিক্‌চার

কএক বৎসর পূর্ব্বেও মোসন পিক্‌চার (Motion Picture) ছেলে খেলা ব্যতীত আর কিছুই ছিল বলিয়া বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা এখন জগতের একটী প্রধান বাণিজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখন আর মোসন পিক্‌চারখানি চলিত ছবি বলিয়া লোকে দেখিতে চায় না; দশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে খালি ছবি নড়ে, ছবিতে ঘায় ও মারামারি করে প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিবার জন্যই ইহা দেখিত, কিন্তু এখন ইহা যতই পুরাণ হইয়া আসিতেছে, ততই লোকে আর ছবি নড়া দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। এই সমস্ত কথা ভাবিয়াই মোসন পিক্‌চার প্রস্তুতকারকেরা ইহা কি প্রকারে একটী বাণিজ্যে পরিণত করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল, তাহারই ফলে আধুনিক মোসন পিক্‌চারের সৃষ্টি হইয়াছে।

আধুনিক সময়ে জগতের যত বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে মোসন পিক্‌চার

বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান কারণ ইহা মানুষ মারিবার কল নহে, ইহা জনহিতকর, শিক্ষা-প্রদায়ক ও আনন্দদায়ক এক মাত্র।

ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ ইহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাই ইহার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ইহার বাণিজ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের আহারের সংস্থান হইতেছে ও কোটী কোটী টাকার মূলধন খাটিতেছে। ইহার ব্যবহার আজকাল অধিকাংশ জনহিতকর কার্য্যেই হইতেছে। ইহাই আমাদের চক্ষের সামনে দেশদেশান্তরে কি হইতেছে তাহা দেখাইয়া থাকে, ইহাই দেশে কি হওয়া উচিত কি না হওয়া উচিত আমাদিগকে শিখাইয়া থাকে। নাটক ও যাত্রা কেবল মেকি জিনিষ দেখায়; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত জিনিষ আমাদের চক্ষের সামনে আনয়ন করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইতিহাস ভূগোল, সামাজিক রীতিনীতি, পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, ইহাই আমাদের চক্ষের সামনে আনয়ন করিয়া থাকে। বোধ হয় অধিকাংশ লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছা, কিন্তু দেশস্থ লোকের পক্ষে অপর দেশে গমন করা কিম্বা পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সকলের পক্ষেই মোসন পিক্‌চার দেখিয়া শিক্ষা করা সম্ভবপর ও আমোদজনক, ইহাতে দুই ফল হয় আনন্দ ও শিক্ষা। ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও ইহার প্রচলন হইতেছে, ইতিহাস, বিজ্ঞান, Anthropology, Hygeine প্রভৃতি ইহার সাহায্যেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, পুস্তক পাঠ অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফল হইয়া থাকে, কারণ আমোদজনক সেই জন্যই অধিক মনোনিবেশ করিয়া ছেলে মেয়েরা দেখে সেই জন্যই সহজে মনে রাখিতে পারে; চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটিলে, বোধ হয় তাহা চিরকাল মনে থাকিবে, কিন্তু পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করিলে, অনেক সময় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বক্তৃতার দ্বারা যাহা না হয় মোসন পিক্‌চারে তাহা হইয়া থাকে। সেদিন একটী ড্রামা দেখিলাম যাহার নাম "What England Expects," এই ড্রামাটীর মতলব বোধ হয় দুই কথায় বর্ণনা করা যাইতে পারে, যে, সমস্ত ইংরাজরাজের প্রজাদের স্বদেশের জন্য জীবন দেওয়া উচিত ও এই যুদ্ধের সময় সকলের ধন-জীবন দ্বারা দেশকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই ড্রামাটি কেবল স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রণীত হইয়াছে, তাহা নহে, কোম্পানির পয়সা কামাইবারও ইচ্ছা ইহা প্রণয়নের কারণ। ইহা এমন ভাবে ঔপন্যাসিক করিয়া লেখা হইয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপরের মনেও স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া থাকে। ইহা বিনা পয়সায় দেখান হয় না, লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া দেখে, কারণ ইহাতে এমন ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে যে, ইহাতে লোকের মনে স্বদেশপ্রেমও আনয়ন করেই, পরন্তু অত্যন্ত আনন্দও দিয়া থাকে। এ ছবি আমেরিকাতেও দেখান হইতেছে। আমেরিকার লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া ইহা কেন দেখে? তাহাদের Englandএর জন্য স্বদেশপ্রেমিক হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই। আমেরিকায় সর্ব্বদেশের লোক বাস করে, ইহার ঔপন্যাসিক ও নাটকীয় সৌন্দর্য্য দিবার জন্যই এদেশের লোক ইহা দেখিয়া থাকে। আর একটী এই প্রকারের ছবি দেখিয়াছি তাহার নাম "Englands' Menace," ইহাতে German Spy' হইতে সতর্ক হইবার জন্য

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকাতেও এই প্রকারের Public opinion বানাইবার গল্প (picture story) তৈয়ারী হইয়া থাকে; "Silent plea" বলিয়া একটী drama দেখিলাম; ইহা বিধবা মাতাদের সাহায্যের জন্য লোকের sentiment প্রস্তুত করিবার জন্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাও একটী খুব সুন্দর dramatic story ইহাতে দেখান হইয়াছে যে বিধবাদের স্বামী মরিবার পর ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করিতে ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না, তাই ছেলে মেয়েরা অসৎ পথে যাইয়া আপনাদের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। ছেলে মেয়েই দেশের আশাস্থল, গল্পটিকে এমনভাবে হৃদয়স্পর্শী করা হইয়াছে যে, ইহাতে লোকের উৎসাহ না জাগিয়া পারে না। কেমন করিয়া দুইলোকেরা প্রলোভন দ্বারা ভুলাইয়া গরীব মেয়েদের অসৎপথে আনয়ন করে, ইত্যাদির picture story ও বানাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। আবার দেশের ইতিহাস, ভাল ভাল উপন্যাস, নাটক, শাস্ত্র প্রভৃতিও দেখান হইয়া থাকে। লোকে প্রকৃত নাটক হইতে মোসন পিক্‌চার দেখিতে ভাল বাসে, তাই অনেক বড় বড় ও ভাল ভাল Theatre এখন মোসন পিক্‌চারে পরিণত হইতেছে। আরও ইহা অতি সস্তা সকলেই দেখিতে পারে।

আমেরিকাতে প্রায় প্রতি গ্রামেই মোসন পিক্‌চার show আছে, যাহাকে সাধারণ ভাষায় নিকেল show বলা হইয়া থাকে। কারণ ইহা দেখিতে কেবলমাত্র এক নিকেল (পাঁচ সেণ্ট) খরচা হয়। এখানে কপার অর্থাৎ সেণ্টের বিশেষ চলন নাই, পাঁচ সেণ্ট এক নিকেলই সবচেয়ে কম দামের, আমাদের দেশে ইহা এক আনায় দেখান যাইতে পারে। নিকেল থিয়েটারে একঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার অর্থাৎ চার হইতে আট রিল্ ছবি দেখান হইয়া থাকে, এই সমস্ত থিয়েটার দিন দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। বড় বড় সহরে সপ্তাহে দুইবার কিম্বা তিনবার প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হয়। এই কারণে Manufacturerদেরও সংবাদপত্রের ন্যায়, ইহা সময় মত বাহির করিতে হয়। সমস্ত কোম্পানিরই সংবাদপত্রের ন্যায় চলিত ছবি বাহির হইবার একটী নির্দ্ধারিত দিন থাকে; সেই নির্দ্ধারিত দিবসে প্রস্তুতকারকেরা রেণ্টারের নিকট ইহা প্রেরণ করিয়া থাকে, renterরা আবার ইহা থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট পাঠায়। Censor থাকাতে কোন প্রকারের অশ্লীল কিম্বা যে সমস্ত ছবিতে কোমল হৃদয়ে খারাপ অথবা সমাজে অহিতকর ভাব আনয়ন করে তাহা দেখাইতে দেওয়া হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কেবল চলিত ছবি দেখিবার কৌতূহল হইতেই লোকে ইহা দেখিত। যতই ইহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের কৌতূহল মিটিয়া আসিতে লাগিল; তাই ড্রামা প্রভৃতি লইবার জন্য প্রস্তুতকারকের Stage প্রভৃতি বানাইতে হইল; প্রস্তুত করিবার জন্য Deirector, গল্প লিখিবার জন্য লেখক প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে হইল। Stageএ খালি ভিতরের দৃশ্য লওয়া হইয়া থাকে, বহির্দৃশ্য সকল গল্প লিখিত স্থানে যাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় অনেক কোম্পানিকে কেবল বহির্দৃশ্য লইবার জন্য অন্য দেশে

যাইতে হয়। অনেক সময় স্বদেশেই মেকি (artificial) দৃশ্য বানাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় প্রকৃত দৃশ্য দেখাইবার জন্য অনেক বড় বড় বাড়ী আলান হইয়া থাকে। মনে করুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছবি লইতে হইবে, এ ছবি আমরা কলিকাতায় বসিয়া লইলে প্রকৃত হইবে না; ইহা পানিপথের নিকটবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য ঐতিহাসিকগণ যে স্থানকে কুরুক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই স্থানে যাইয়া লইলে প্রকৃত ছবি হইবে। অবশ্য ঘরের মধ্যের সিন্‌সেট প্রভৃতি আমরা যেখানে সেখানে বসিয়া architect দ্বারা বানাইয়া লইতে পারি। ইহাও যতদূর সম্ভব তৎকালীন শিল্পের ন্যায় করিতে হইবে যে ভাল imitate করিতে পারে তাহাকেই ভাল director বলা যায়। এমন বানাইতে হইবে যে সাধারণ জনমণ্ডলী কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না যে ইহা বানান। যেমন এখানে যুদ্ধের ছবি লওয়া হয়, দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে, যুদ্ধে যে সমস্ত Machinery ব্যবহৃত হয়, ইহাতেও সে সমস্ত প্রকৃত Machinery ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যুদ্ধে যেমন লোক মরে কিম্বা ঘোড়া মরে ইহাতেও তাহা হয়, প্রকৃতপক্ষে একজনও মরে না, লোকে দেখিয়া মনে করে সত্য সত্যই মরিতেছে। ঘোড়া শিক্ষিত থাকে সোয়ার সমেত মাটিতে পড়িয়া যায়, এমন আশ্চর্য্যভাবে করে যে সময় সময় দর্শকদের অনেককে ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিতেও দেখা যায়।

অনেক সময় প্রকৃত ঘটনা হইতে প্রকৃত ব্যক্তি লইয়া ছবি লওয়া হয়, এদেশে এ সমস্ত ছবির অনেক দাম, লোকে খুব আদর করে, সম্প্রতি এই প্রকারের একটী ছবি লওয়া হইতেছে। ইজিপ্তের (Egypt) খাদিব একজন আমেরিকান actressকে বিবাহ করে। তাহার মুসলমান হারাম (Harem) ভাল না লাগাতে, সেখান হইতে পালাইয়া আসে। এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া এখন ছবি লওয়া হইতেছে; এই স্ত্রীলোকটী কি প্রকারে পালায় এবং সেখানে কি প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়াছে তাহার সত্য মিথ্যা করিয়া গল্প লিখিয়াছে, সেই গল্পই এখন ছবিতে পরিণত করা হইতেছে। ইনিই অনেক actor হইতে বাছিয়া খাদিবের চেহারাযুক্ত একটী actorকে খাদিব বানাইয়াছেন। Motion Picture actorকে মানানসই করাও একটী কঠিন কাজ, কারণ actor যে পাঠ লইবে, তাহাকে ঠিক সেই লোকের মত দেখান চাই। এই ছবিতে আমাদের সুরেন গুহ Special directorএর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কাজ মুসলমানদের রীতি নীতি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখান ও সমস্ত সেট্ Egyptian artএর মত হইতেছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অবশ্য প্রকৃত ঘটনা সব সময় ঠিক রাখা যায় না, লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বাড়ান কমান হইয়া থাকে। আমি একটী ছবিতে কার্য্য করিতেছি ইহার নাম "Raja's Vow" ইহা ভারতবর্ষের ছবি, আমারও সুরেন বাবুর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, ইহাতে হিন্দু রাজাদের মধ্যেই দেখান হইয়াছে, যদিও তাঁহাদিগকে আধুনিক কাল হিসাবে অশিক্ষিত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। Motion Picture Industry শিখিবার জন্যই আমরা কার্য্য করিয়া থাকি।

এখানে oriental ছবি বানাইতে বড় বেশী খরচা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এ

সমস্ত ছবি লইলে ত্রিশাংশ কমে বানান যাইতে পারে। কারণ এখানে মজুরের খরচ অনেক বেশী, আমাদের দেশীয় বাজার প্রভৃতি বানাইতে অনেক খরচ হয়, হাতী কিম্বা অন্য জানোয়ার প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অনেক খরচ, একটী হাতীর ভাড়া এখানে পাঁচ শত ডলার অর্থাৎ পনর শত টাকারও অধিক রোজ দিতে হয়। উটের ভাড়া এক শত ডলার, অর্থাৎ তিন শত টাকারও অধিক। আমাদের দেশীয় রাজার পোষাক বানাইতে শত শত ডলার খরচ হইয়া থাকে যদিও ইহা মেকি পদার্থ দ্বারা বানান হইয়া থাকে। এ জন্য মজুরের মজুরি রোজ তিন ডলার অর্থাৎ নয় টাকারও উপর; আমাদের দেশে আট আনা রোজে মজুর সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট

(রাঢ় খণ্ড)

উত্তর বর্দ্ধমান

(১)

বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই নদী, খাল, বিলের সংখ্যাধিক্য নাই। স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি পল্লী ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থান আছে যথায় নদী খাল বা বিল নাই। যাহাও বা আছে নাম মাত্র। ফাল্গুন মাসেই তথায় জলাভাব ঘটে। রাঢ়ভূমির মধ্যে বহু কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বিদ্যমান রহিয়াছে—রাঢ়বাসীরা উহাদিগকে "কাঁদোড়" বলে।

বর্ষাকালে কৃষিক্ষেত্রের বা বনভূমির জলধারাই 'কাঁদোড়ে'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে; গ্রাম বা পল্লীর পয়ঃ প্রণালীর জল গড়াইয়া গিয়া কাঁদোড়ে পড়ে। ইহাতেই কাঁদোড়ে জল-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বর্ষার ধারার বিরাম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদোড়ের প্রবাহ কমিতে থাকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে অনেক কাঁদোড় একেবারে জলহীন হইয়া পড়ে।

গ্রাম, পল্লী এবং কৃষিভূমির জলপ্রবাহ কাঁদোড়ে পড়ে, সেইজন্য ঐ সকল স্থান হইতে নিম্নভূমির উপর দিয়া কাঁদোড় খাত বিস্তমান থাকে। কোন কোন 'কাঁদোড়' "চোরাট" জলধারায় পুষ্ট হইয়া বৎসরের প্রায় সকল মাসেই ন্যূনাধিক জলে বিদ্যমান থাকে।

খড়ী (খড়্গেশ্বরী) নদীও এই প্রকারের একটি বড় কাঁদোড়। কাঁদোড়ে বাঁধ দিয়া পল্লীবাসীরা শস্যক্ষেত্রে আবশ্যকমত জল-গ্রহণের বন্দোবস্ত করে। একটি কাঁদোড়ের বহুস্থানে এই প্রকারের বাঁধ পড়ে। চোরাট জল ও ক্ষেত্রের জল অথবা কাঁদোড় প্রবাহের অতিরিক্ত জল দ্বারা বাঁধের মধ্যবর্ত্তী অংশে প্রচুর জল জমে।

পূর্ব্বে যখন দামোদরের বামকূলে বাঁধ পড়ে নাই, তখন খড়ী নদীর মত বহু কাঁদোড় বর্ষা-কালে দামোদর হইতে জল পাইত; দামোদর স্ফীত হইলে ঐ প্রকারের কাঁদোড় ও বহু শাখা-

নদী দ্বারা দামোদরের প্রবাহ ছুটিয়া, মূল প্রবাহকে শান্ত করিয়া দিত। দেশের অনিষ্ট না হইয়া ইষ্ট হইত।

দামোদর হইতে এই রকমের অনেক নদী পূর্ব্বে রাঢ়ের একাংশে বিদ্যমান ছিল—বর্ত্তমানে তন্মধ্যের একটি বাঁকানদী। বাঁকার মত অনেকগুলি ছিল—যেমন "খাদুড়" একটি।

এই প্রকারের কাঁদোড় ও নদী দ্বারা দেশের দুইটি উপকার হইত।

(১) কৃষিভূমি বর্ষে বর্ষে নূতন 'পলিমাটি' দ্বারা উর্ব্বর হইত। খাল, বিল, কাঁদোড় ও নদীতে জলধারা বহিত, প্রচুর মৎস্য জন্মিত, এবং কৃষিক্ষেত্রে আদৌ জলাভাব হইত না। বর্দ্ধমান লক্ষ্মীর মন্দির ছিল।

(২) বন্যার জলে কৃষিক্ষেত্রগুলি প্লাবিত হইত—নূতন পলি পড়িয়া, মাঠের আবদ্ধ জল বহিয়া যাইত বলিয়া এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। ম্যালেরিয়ার নামও দেশের লোকে জানিত না।

একদিকে 'দামোদর,' অন্যদিকে 'অজয়' মধ্যে উহাদের শাখা ও কাঁদোড় সমূহ এই ভূভাগকে জালবৎ জলপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের 'কর্ড' ও লুপলাইন দিয়া এবং নবপ্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথ দিয়া একবার ভ্রমণ করিলেই ঐ সকল অসংখ্য জল-প্রবাহের চিহ্ন দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে কাটোয়া রেলপথে পর্য্যটন করিলেও উহাদের অস্তিত্বের নিদর্শন উজ্জ্বল ভাবেই দৃষ্ট হইবে। ভাগীরথীর জলধারাই বহু শাখানদী দ্বারা প্রবাহিত হইত।

এই কারণে বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ স্বর্গের নন্দনকাননবৎ সুন্দর ছিল। বর্ত্তমানে সে সৌন্দর্য্য আর নাই। কেন নাই? এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার বহুব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। "বঙ্গবাসী" বর্দ্ধমানের এই দুঃখের কথা যতবার যত রকমে বলিয়াছেন—এমন আর কেহ বলেন নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলরাস্তা রক্ষার জন্য যখন বাঁধ বাঁধা হইল তাহার পরেই দেশের এই অবস্থা হইয়াছে। দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল খাল বা নদীর সম্বন্ধ ছিল তাহা লুপ্ত হওয়াতেই, সেই সকল জলস্রোত মজিয়া গিয়া জলজ উদ্ভিদ-দামে পূর্ণ হইয়া যায়। দেশের কৃষি-ক্ষেত্রগুলি আর পলি মাটি দ্বারা উর্ব্বর হইতে পাইল না। পচা জল বাহির হইতে পারিল না। মৎস্য বংশ বৃদ্ধি হইল না। কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব দেখা দিল। ষোল আনা ফসলের স্থানে বারআনা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিল। পতিত পরআবাদী জমিগুলির ঘাস পূর্ব্বের ন্যায় জন্মিল না।

ব্যাণ্ডেল হইতে বর্দ্ধমান ও শুকরা, কাটোয়া ও কালনা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিলে খাল, বিল, নদী ও কাঁদোড়ের বর্ত্তমান চিত্র দর্শনে দুঃখিত হইতে হয়। সকল জলস্রোতগুলি মজিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে উহাদের গর্ভদেশে কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। কোন কোন অংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, পঁচাশ বৎসরের মধ্যেই এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে—সুদূর ভবিষ্যতে যে আরও কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পদব্রজে পল্লীগুলি পরিভ্রমণ করিলে আরও ভীষণ চিত্র ভ্রমণকারীর নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইবে। এক ক্রোশের মধ্যে এই প্রকার মরা বা মজা নদী বা খালের এবং কাঁদোড় কোথাও তিনটি কোথাও দুইটির অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবেই হইবে।

আর দেখা যাইবে মাঠে ও পল্লীমধ্যে এবং পার্শ্বে অসংখ্য পুষ্করিণী ছোট বড় ও মধ্যম আকারের জলাশয়ে একান্তর পল্লীমধ্যস্থ মাঠগুলি সুশোভিত, পুকুরের পাড়ে একাধিক অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ শীতল ছায়া প্রদান করিতেছে। সে কালের পল্লীবাসীরা পুণ্য কামনায় জলাশয় খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, মুক্তি বাসনায় মাঠের মধ্যে অশ্বত্থাদি তরুবর রোপণ ও প্রতিষ্ঠা করিতেন। পথক্লান্ত শ্রান্ত পথিক পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল জল পান করিয়া বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিত এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ দিত। "কোন্ ভাগ্যবান পুষ্করিণী ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে রে! তাহার স্বর্গবাস হউক।"

প্রতিষ্ঠাতৃগণের কৃতকার্য্যের এবং পুণ্যের ফলে বর্ত্তমান স্বার্থবাগীশ পল্লীবাসী তৃষ্ণার্থী ও কৃষককুলের আজিও অন্নসংস্থান হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। নিঃস্বার্থ দানই প্রকৃত পুণ্য। পুণ্য মানসে যে দান করা হয় তাহাই নিঃস্বার্থ দান।

বর্ত্তমানকালে পল্লী মধ্যে এবং পল্লী বেষ্টনীর পার্শ্বে যে সকল দীঘি, সায়ের, পুকুর ও গড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতেই পল্লীবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক জলের সঙ্কুলান হইতেছে। স্নান, পান ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য যত জলের প্রয়োজন তাহা ঐ সকল জলাশয় প্রদান করে।

প্রাচীন পল্লীবাসীর সুকৃতি নিবন্ধন বর্ত্তমান আকৃতি মানবের এখন জলাভাব হয় নাই, কেবলমাত্র জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অধিকাংশ পল্লীভবনে জলাভাব উপস্থিত হইবে, তাহার সূত্রপাত ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বপুরুষগণ স্ব স্ব সংসারযাত্রা বিলাসহীন ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া, দেশের ও দশের উপকারার্থ পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তাঁহারা জীবকুলের কল্যাণার্থে ত্রিপ্রান্তর মাঠে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেই জলাশয়ের জলোত্তোলন দ্বারা এখন কৃষিক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা হয়। সেইজন্য মাঠের ধান গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তাহা না হইলে বড় বড় মাঠগুলি উষর মরুতুল্য হইয়া পড়িত।

শুনিতে পাই বর্ত্তমান কালের নরনারী, পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী, চতুর এবং বিদ্বান; সেকালের লোকেরা বিদ্যাহীন না হইলেও মূর্খ ছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তখন একটিও ছিল না! না থাকিবারই কথা—কারণ তাঁহারা বাবুগিরির ধার ধারিতেন না দশের ও দেশের উপকারই একমাত্র কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় বলিয়াই মনে করিতেন। উহাই তখনকার বিজ্ঞান ছিল।

তাঁহারা মাঠে ঘাটে পল্লীতে যে সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে এখন আমরা জীবিত রহিয়াছি; তত্রাচ সেই প্রাণতুল্য জলাশয়ের আবর্জ্জনা, দল, শ্যাম, পানা আমরা পরিষ্কার করি না—জলাশয়গুলি 'ভরাট' হইয়া 'মজিয়া' উঠিয়াছে, পূর্ব্বে জলাশয়ে যে পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকিত, এখন তাহার 'সিকি' আন্দাজ থাকিতেছে না, চক্ষের সম্মুখে নিয়ত দেখিতেছি জলকষ্ট অনুভব করিতেছি।

তত্রাচ এখন এমন একটি স্বদেশ প্রেমিক দেখিতেছি না যে তিনি মাঠের ভরাট ও

মজা পুকুরটির সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!—যাঁহার অর্থবল আছে তিনিও মাঠের ভরাট জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রস্তুত নহেন। অথবা দশের মধ্যে মিশিয়া, দশকে বুঝাইয়া, দশের সাহায্যে নিজে কর্ম্মী হইয়া অন্ততঃ জীবনে একটী পুষ্করিণীরও পঙ্কোদ্ধার করিয়া যাইবেন। তাঁহার কর্ম্মই না হয়, দেশের মধ্যে আদর্শ গঠন করুক।

বহুতোষা মাঠের পুকুর গুলির—'ছেচ' লইয়া দ্বন্দ্ব, বর্ত্তমানে ঘন ঘন হইতেছে; কাহার ছেচ অগ্রে, কাহার পশ্চাতে, কে 'ছেচ' পায় না, আর কেই বা 'আওনা' পায় আর কেই বা পায় না। এই সকল ব্যাপার লইয়া, মাথা ফাটাফাটী হয়, দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, মোকদ্দমা মামলা হয়, ঘরের সঞ্চিত অর্থ অথবা জমি জমা বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ—মোকদ্দমায় জলের মত ব্যয় করা হয়।

অর্থক্ষয়, বলক্ষয়, কালক্ষয় ত হয়ই, তদুপরি মনঃকষ্ট ও মিত্রভ্রষ্ট হইতে হয়। গ্রামে পক্ষাপক্ষ ভাব আসে, দলাদলি হয়—একটা বিবাদ হইতে দশটা বিবাদের সাক্ষাৎলাভ হয়। তত্রাচ মাঠের পুকুরের সংস্কার করার আগ্রহ নাই। লক্ষ্মী সেইজন্য আমাদের প্রতি নিগ্রহ করিতেছেন। লক্ষ্মীর অনুগ্রহ কি করিয়া নিগ্রহে পরিণত হয় তাহা ঐ দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

শুনা যায় মাঠের পুকুর খনের, তাহার সংস্কার করিয়া লাভ নাই—লাভ আছে কি নাই কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব উপস্থিত হইলেই ত বুঝা যাইতেছে। তখন জলের জন্য সেই ভরাট ও মজা পুকুরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইতে হয় কেন? তখন পুকুর খনিয়া মনে পড়ে—নইলে যান মরে। তখন ত স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে—ঐ পুকুরে আমার স্বার্থ কত বড়!

পূর্ব্বে এক একটি মেঠো পুকুরের জলে সেই মাঠের জমিগুলি আবাদ হইত আজো জলাভাব হইত না। বর্ষার জল প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত এখন কেবল থাকে না। জমির কদর ও মূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মাঠের পুকুরের 'ছেচ' বিদ্যমানতা। যে জমির 'ছেচ' নাই—তাহার নাম "আকাশ মোহানী।" তাহার আদর নাই। তত্রাচ বুঝিতে পারিতেছি না, পুকুরে স্বার্থ আছে কি নাই!

মেঠো পুকুর খনন করিতে হয় নাই—তজ্জন্য অর্থ ও সময় নষ্ট হয় নাই—পুণ্যবানেরা আমাদের জন্য তাহা করিয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পুণ্যের ফলে সুখী রহিয়াছি। সেই পুণ্যবানগণের কল্যাণেই কেবল আমাদের অকল্যাণ হয় নাই। আমরা কিন্তু এমন কিছু করিয়া যাইতেছি না যাহাতে ভাবীবংশধরগণের কল্যাণ হইবে; তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের জন্য প্রস্তুত করিয়াই আমরা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণার্থ উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। সুতরাং মেঠো পুকুরের পঙ্কোদ্ধারে আমাদের স্বার্থ নাই!!—নিঃস্বার্থ!!

সেই কোন্ কালে কে বা কাহারা মাঠের পুকুরগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন, এতকাল তাহাতেই চলিল—ক্রমশঃ অচল হইয়া আসিতেছে—এখন গ্রামের মধ্যে ভাল মন্দ লোকও আছেন কিন্তু তাঁহাদের ত চেষ্টা করা উচিত—যে যাঁহাদের খোনে এলাকে সেইখানের পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করা 'মোহান'টি মজবুত করিয়া বাঁধা। তাহা ত

হয়ই না কিন্তু পুকুরের পাড়ের ধারেই যাহাদের ক্ষেত, বৎসর বৎসর তাঁহারা 'পাড়' কাটিয়া জমি বাড়াইয়া লইতেছেন—লইতে জানেন, নষ্ট করিতে জানেন, কিন্তু যাহাল রাখিতে বা যাহাল করিতে চাহেন না বা জানেন না—উহার বেলাই উদাসীন হন।

ক্রমশঃ দেশালে পিঠ লাগিতেছে। শুনিতে পাই তাঁহারা বলেন,—"আর তেমন ফসল হয় না—ধরিত্রী শক্ত হরণ করিতেছেন।" এখন প্রায়ই 'কেতারী' (কার্ত্তিক মাসের জলাভাব) তে টান পড়িতেছে—'চট্‌কা' তে কি ধান হয়—'ঝুলুতে' পারে না—বেড়ে শিষ বাহির হয় না। শেষে জলাভাবে 'বস্যা' মেরে যায়। আড়ে পাতে মন্দ হয় না, কিন্তু কেতারীর টানে দশ আনা হয় ছ' আনা 'আগড়া' পড়ে। 'তোমা' মেরে যায়।

পূর্ব্বকালে 'কেতারী' হইত, জলকষ্টও হইত—সেইজন্য মাঠের ধান রক্ষা করিবার জন্য মাঠে পুকুর কাটাইতেন—গ্রামের লোকে বড়লোককে উপরোধ অনুরোধ করিয়া কাটাইয়া লইতেন। ধর্ম্মের উপরোধ রক্ষা করিতেও মহাজন ও জমিদারগণ একটা না একটা পুকুর দিতেন এই রকমে—ধীরে ধীরে কানে কানে অনেকগুলি পুকুর মাঠের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

এখনকার যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন গ্রামের পুকুরেরই পঙ্কোদ্ধার হয় না, সংস্কার হয় না—তাহাতে আবার নূতন পুকুর কাটান হইবে! মাঠের পুকুরের কথা ত বহু দূরের কথা। কাজেই দেশে ঘন ঘন 'অজন্মা' হইতেছে। শুনিতে পাই কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল—তখনকার মধুপুর, দেওঘর, ঘানবাদের কাজ বর্দ্ধমানেই হইত।

মরা নদী, খাল বিল কাঁদোড়ের অবস্থা শোচনীয় হইলে দেশের মাঠের পুকুর মজিয়া উঠিলে—এক মাত্র পানীয় জলের নির্ম্মলতা বিদূরিত হইল। সেই সময় হইতেই জ্বর, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি পল্লীবাসে মৌরসি পাট্টা লইল।

ক্রমশঃই দেশের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে কেন? চিকিৎসকের অভাবে নহে, ঔষধের অভাবে নহে,—কেবল নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

পল্লী মধ্যে যত গুলি পুকুর, গড়ে আছে—প্রায় সকল গুলিই দল দামে পূর্ণ। 'এঁদো' হইয়া পড়িয়াছে—গড়ের চারিদিকে বাঁশবন ও গাছ গাছালিতে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। গাছের পাতা পচিয়া জল ভট্ ভট্ করিতেছে—সকল গড়ের জলই দুর্গন্ধময়। বাড়ীর পচাজল—নর্দ্দমার জল ঐ সকল গড়েতেই জমা হয়—গড়ের ধারে ধারে 'ছুতোহাড়ী' ও কচুবন, জলে পানা কলমী ও চেকাপাকের লতায় ছাইয়া আছে।

এই রকমের নরকগুলি, পল্লীর পাড়ার মধ্যে এক বা একাধিক বিদ্যমান। কচি ছেলের 'শুয়ের ন্যাড়ো' ঐ গড়ের ধারের বন বনের মধ্যেই ফেলা হয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঐ সকল গড়ের ধারেই 'বাহ্যে ফেরে'। একটু বৃষ্টি পড়িলেই—ঐ সকল মাল মসলা গড়ের জলে গিয়া পড়ে। পল্লী গ্রামের লোকে গড়ের ধারেই 'গারফুড' করে। উহাই এক একটি 'নরক' সুতরাং পল্লীস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি করিয়া।

পূর্ব্ব পল্লীবাসিগণ বর্ষার পূর্ব্বেই গ্রামের পয়ঃপ্রণালীগুলি মিলিতভাবে জ্বালাইয়া গভীর করিয়া দিত। গড়ের মোহনা জ্বালাইয়া দিত, পল্লীর জল, পল্লীধৌত করিয়া পল্লীর

বাহিরে কৃষিক্ষেত্রে বা 'নালায়' গিয়া পড়িত এবং ঘুরে চলিয়া গিয়া, কাঁদোড়ে বা নদীতে পড়িত। বর্ষার সময় প্রতিবার পল্লী ধৌত হইত। গড়ের আবর্জ্জনাও বাহির হইয়া যাইত।

এখন আর কেহ পয়ঃপ্রণালীগুলি জ্বালায় না—সেটাও যেন পরের কাজ মনে করে। উহাতেও স্বার্থ নাই বিবেচনা করে। পল্লীর স্বাস্থ্যের সহিত পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য যে হাড়ে হাড়ে জড়িত তাহা আর কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহে না।

ঐ গড়ের জলে বাসন মাজা—তরিতরকারী ধৌত করা হয়, কাপড় কাচা হয়—সন্ধ্যার সময় গড়ের ধার দিয়া চলিলে একটা উৎকট পচা গন্ধ পাওয়া যায়।

পল্লীবেষ্টনীর পার্শ্বেই স্নানের পুকুর তাহাও জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ কেবল অপ্রশস্ত ঘাট কি পরিষ্কার—সেই স্থানেই সাবান মাখা, স্নান এবং সেই জলই পান করা হয়।

পুকুরের ধারে গো-ভাগাড়—বর্ষাকালে ভাগাড়ধৌত জল পুকুরেই গড়াইয়া পড়ে—সেই পুকুরে স্নান হয় সেই পুকুরের জল পান করা হয়।

পল্লীগ্রামের চারিদিকেই 'শ্মশান' শ্মশান-গুলি পুকুরের পাড়ে ও 'গাবার' (গর্ভে) বর্ষাকালে শ্মশানধৌত জল পুকুরে পড়ে এ পুকুরের জল ও পুকুরে যায়। অনেক পুকুরে মরা কচিছেলে পোঁতা হয়। কদাচিৎ কোন পুকুর সংস্কৃত হয়। পঙ্কোদ্ধার ত আর হয়ই না।

নদীতে বাঁধ হয় না, বড় নদীর সঙ্গে বড় বাঁধ দিয়া সমস্ত রোধ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় মাছ জন্মে না। গড়ে গুলিতে আদৌ মাছ হয় না। বড় বড় পুকুরগুলি জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ বলিয়া মাছ জন্মায় না। দু দশটা মাছ হয় মাত্র।

এখা বানের অভাবে বিল খাল মজিয়া উঠিয়াছে—জলহীন হইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে আমন ও বোরা ধান হইত এখন তথায় হৈমন্তিক ধানের চাষ হইতেছে।

পুকুরে গোরুর গা ধোয়ান হয়, ধারে কাপড় কাচা হয়। মলিনস্ত বস্ত্র ধৌত করা হয়। পুকুরের যোহানা গুলি ভাল নহে, বর্ষার জল যেটুকু জমে তাহার অনেকটা বাহির হইয়া যায়। তদুপরি পল্লীর পুষ্করিণীতে বাঁশ বাকারী পচান হয়। শণ, পাট পচান হয়।

দু একটি এঁদোপুকুর বর্ত্তমানে কেহ কেহ কাটাইছেন তাহার ঘাট বাঁধান হইতেছে—পাড়ে আমবাগান, কলাবাগান হইতেছে ইহাতে কিছু কিছু মঙ্গল হইতেছে।

পল্লীর পুকুর গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তন না হইলে—পূর্ব্বেকার মত পয়ঃপ্রণালী উন্নত না হইলে আর গ্রাম্য পথগুলির বর্ষাগমে পয়ঃপ্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইবার পথ রুদ্ধ হইবে না। গ্রামের পচা জল গ্রাম্য 'সরাবে' আবদ্ধ হইয়া—গ্রাম্য মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষার পরই গোটা পল্লী মাটি হইতে দূষিত বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে পুকুরও গড়ের পচাজল বাহির হইতে না পারিয়া ঘোলা হইয়া ও পচিয়া উঠে—সেই জন্যই পল্লীবাসী-গণ বলেন—"কার্ত্তিক মাসে যমের দক্ষিণ দোর খোলা থাকে।"

আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে জ্বর, নিউমোনীয়া প্লুরিসি ও উদরাময় এবং আমাশয়ে মরিতে থাকে। ফাল্গুন চৈত্র হইলে জল কমিয়া আইসে—জল দূষিত হয়—উদরা-ময় ও শেষে কলেরা দেখা দেয়—এই উপায়ে আমরা স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট লাভ করি।

শ্রীহরিদাস পালিত।

ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্য *

ফ্রান্স প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এইজন্য ফরাসী সমাজে রোমীয় সভ্যতার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে কিন্তু জার্মাণ জাতীয় ফ্র্যাঙ্কেরা ফ্রান্সের রোমান রাষ্ট্রশক্তি ধ্বংস করে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার চিহ্ন পর্য্যন্ত অনেকস্থলে লুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, ফ্রান্সের বহু লোক-সমাকীর্ণ নগর ও পল্লী পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয় এবং কৃষিক্ষেত্র সমূহ পতিত ভূমি হইয়া পড়ে।

এই সময়ে খৃষ্টমন্দির ও মঠগুলি সমাজে সভ্যতা বিকিরণের কার্য্য করিত। ফরাসীদের কৃষিকার্য্য মঠের অধীনেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগের প্রথম অবস্থায় মঠাদি হইতে সমাজের অশেষ উপকার হয়। —পরবর্ত্তী কালে মঠগুলিই জাতীয় উন্নতির মহা অন্তরায় দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক ধনবান্ ভূম্যধিকারীরা যখন দলাদলি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তারক্তিতে ব্যাপৃত থাকিতেন সেই সময়ে ধর্ম্মশালার অধিবাসী পুরোহিতগণ সমাজের হিতসাধনে রত থাকিতেন। তাঁহাদের লাঠালাঠি ছিল না—কাজেই জনগণকে ক্ষেপাইয়া তোলা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না। এইজন্য তাঁহাদের ভূমি গৃহ কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পত্তি ও গোবলদাদির উপর জুলুম একপ্রকার হইত না বলিলেই চলে। বরং তাঁহারা যথাসম্ভব শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেন এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত নরনারীগণকে অন্নদান, জলদান, বস্ত্রদান ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতেন। এই উপায়ে সমাজের ভিতর মঠাধ্যক্ষগণের খ্যাতি রটিত। ফলতঃ ফরাসী জাতির বৈষয়িক ইতিহাসে মঠসমূহের স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। ফ্রান্সের ধনসম্পদ মধ্যযুগে আরও কতকগুলি ঘটনার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার ফলে বহু ফরাসী এশিয়া মাইনারে গমনাগমন করিত। তাহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের কথঞ্চিৎ গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজা নবম লুই দেশের ভিতর শিল্প-পরিষৎ 'গিল্ড' ইত্যাদি গঠন করেন। তাহার ফলে কতকগুলি শিল্পকেন্দ্র দেশের নানাস্থানে পুষ্ট হইয়া উঠে এদিকে ফ্রান্স ইতালী ও ফ্ল্যান্ডার্সের সন্নিহিত বলিয়া সেই দুই জনপদের প্রভাব ফরাসীরা সহজেই পাইত। মোটের উপর ফরাসী-সমাজে মধ্যযুগের প্রথম অবস্থায় নানাদিক হইতে বৈষয়িক উন্নতির বীজ উপ্ত হইতেছিল বলা যাইতে পারে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নর্ম্মাণ্ডি এবং ব্রিটানী প্রদেশদ্বয়ে পশম ও সূতার বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। তাহাদ্বারা দেশের অভাব মোচন হইত সঙ্গে সঙ্গে বিলাতেও কিছু রপ্তানি হইতে পারিত। এই সময়েই আবার জার্মাণীর বণিকেরা ফ্রান্স হইতে মদ ও নূণ ক্রয় করিয়া অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

প্রথম ফ্রান্সিস্ দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশমবয়ন প্রবর্ত্তিত করেন চতুর্থ হেন্‌রিও এই শিল্পের উন্নতিবিধানে যত্ন লয়েন, এবং কাচ সূতা ও পশমী বস্ত্রের ব্যবসায় উৎসাহিত করেন।

* ডেভ্রিক লিট প্রণীত "আধুনিক বণিক-বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

মন্ত্রী রিশ্‌লু এবং মন্ত্রী ম্যাজারিণও রেশম-শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে লোয়েন এবং সেভান নগরদ্বয়ের মখমল ও পশমশিল্প উন্নত হয়, এবং মৎস্য পালনে ও বেচালনে জনগণের প্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে।

আমেরিকার আবিষ্কারে ফরাসী সমাজ যথেষ্ট লাভবানই হইয়াছে। পশ্চিম ফ্রান্স হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ স্পেনে রপ্তানি হইত পিরিনীজ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে বহু কৃষক স্পেনের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে যাইয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিত। স্পেন-শাসিত হল্যাণ্ড বেলজিয়ামে ফরাসী মদ ও লুণের কাটতি অনেক ছিল। রেশম মখমলাদি বিলাস দ্রব্যও ফ্রান্স হইতে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্ত্তুগালে রপ্তানি হইত। এই সকল কারণে স্পেনের মুদ্রা ফরাসী বাজারে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল।

ফরাসী শিল্পের স্বর্ণযুগ মন্ত্রী কলবার্টের আমলে আসিয়াছিল। মন্ত্রী ম্যাজারিণের মৃত্যুকালে ফ্রান্সের শিল্প, ব্যবসায়, অর্ণব-বাণিজ্য, নৌশক্তি মৎস্যপালন নিতান্ত নগণ্য ছিল। তখন তাহার আর্থিক অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় ছিল। রাষ্ট্রবীর কলবার্ট ফরাসী সমাজে এক অসাধ্য সাধন করিলেন। ইংরাজেরা তিন শতাব্দী ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া তুলিয়াছে মন্ত্রিবর একাকী ফ্রান্সের জন্য সেই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি ইউরোপের সকল দেশ হইতে সুদক্ষ কারিগরগণকে লইয়া আসিলেন। যে যে শিল্পে যে সকল গুপ্ত রহস্য বা "বীজমন্ত্র" আছে সে গুলিও হস্তগত করিবার জন্য, কলবার্ট প্রচুর অর্থব্যয় করিলেন। তাহা ছাড়া নানা স্থান হইতে, উন্নত যন্ত্র ও হাতিয়ার আনাইবার ব্যবস্থাও করা হইল। তাহার পর কলবার্ট বিদেশীয় দ্রব্য সম্ভারের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইয়া দিলেন। এই উপায়ে দেশীয় বাজার স্বদেশী শিল্পের জন্য সংরক্ষিত হইল। দেশের ভিতর আমদানি রপ্তানির সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত রাস্তা-ঘাট নির্ম্মিত হইতে থাকিল; খাল কাটা হইতে লাগিল—চুঙ্গি, শুল্ক, মাশুল ইত্যাদি দূরীভূত করা হইল। অন্তর্ব্বাণিজ্য যথাসম্ভব সরল সহজ বাধাহীন হইয়া উঠিল।

কলবার্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানও করিয়াছিলেন। ভূমির উপর খাজনা কমান হইল। খাজনা আদায়ের কড়া নিয়ম গুলি খানিকটা নরম করা হইল। ধনী নির্ধনের প্রভেদ বুঝিয়া তিনি খাজনার হার ও দেশকালপাত্র হিসাবে যথকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। তাহার ফলে করস্থাপন অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হইতে পারিল। অধিকন্তু, সুদের হার কমাইবার নিমিত্তও রাষ্ট্রের আইন জারি করা হইল। দুর্ভিক্ষ অথবা মূল্য বৃদ্ধির সময়ে শস্য বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারিবে না এই নিয়মও বিধিবদ্ধ হইল।

বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তার কল্পে কলবার্ট বিশেষ যত্নবান্ হন। মৎস্যপালন ব্যবসায়েও তাঁহার সমধিক দৃষ্টি ছিল। লেবাণ্ড দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপিত হইল, উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্যের বিস্তার সাধিত হইল, এতদ্ব্যতীত উত্তর ইয়োরোপের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কৃষি, শিল্প, অন্তর্ব্বাণিজ্য, বহির্ব্বাণিজ্য মনোযোগের কোন পথই কলবার্টের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সকল বিভাগই তিনি যথাসাধ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হন। একদিকে

এই উপায়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা, অপরদিকে মিতব্যয়িতা, শাসনকার্য্যে হিসাব পরায়ণতা ও কার্পণ্য কল্‌বার্টের বিশেষত্ব। রাষ্ট্রশাসনের কোন বিভাগে কিঞ্চিন্মাত্র অপব্যয় হইতে পারিত না—আবার কোন বিষয়ে অনিয়ম বা নিয়ম ভঙ্গ ঘটিতে পারিত না। কল্‌বার্ট শৃঙ্খলাপ্রিয় ছিলেন।

কল্‌বার্টের মৃত্যুকালে ফ্রান্সে ৫০,০০০ তাঁত শণম-শিল্পে নিযুক্ত ছিল। পাঁচ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল প্রায় তিনকোটী ফ্রাঙ্ক। ফরাসীদের মৎস্যপালন ব্যবসায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল—তাহাদের ব্যবসায়-তরণী সমূহের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত ছিল এবং রাষ্ট্রীয় নৌশক্তি যথেষ্ট প্রবল হইয়াছিল। এক ব্যক্তির কার্য্যফলে এরূপ অসাধারণ জাতীয় উন্নতি!

একশত বৎসর পরে ধনবিজ্ঞানবিৎ কোয়েসে কল্‌বার্টের কার্য্যে ভুল দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"কলবার্ট শিল্পের উন্নতি করিতে যাইয়া কৃষি সম্বন্ধে নিতান্তই অমনোযোগী ছিলেন।" কোয়েসের এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে একথাও বলা আবশ্যক যে, কলবার্ট কৃষিজাত এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলি সাধারণতঃ রপ্তানি হইতে দিতেন। একমাত্র দুর্ভিক্ষের সময়ে এইগুলি বাহিরে যাইতে পাইত না। কলবার্টের এই বিধি ভ্রমাত্মক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কার্য্যফলে মোটের উপর ফরাসীদের কৃষিকার্য্য আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বরং শিল্পের উন্নতি এত বেশী সাধিত হইয়াছিল যে কৃষিজাত দ্রব্যের কাটতিও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিল্পসংরক্ষণের প্রভাবে কৃষিকার্য্য আপনা আপনিই সংরক্ষিত হয়।

কলবার্ট নীতির আর একটা দোষের উল্লেখ করিব। তিনি শিল্পিগণকে হুকুম করিতেন—"তোমার কারখানায় এই এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য চালাও। তুমি অমুক অমুক যন্ত্রপাতি-যার ইত্যাদি ব্যবহার কর। আমি অথবা আমার কর্ম্মচারীরা যে সকল কার্য্য প্রণালী তোমাকে বলিয়া দিবে তোমাকে সেই প্রণালী অনুসারে কারখানায় কাজ করিতে হইবে। আমার আদেশ পালন না করিলে তোমরা দণ্ডনীয় বিবেচিত হইবে।" শিল্পোন্নতির জন্য এইরূপ শাসনবিধি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্র-নীতি অনুসারে দূষণীয় সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যেই রাষ্ট্রের অতিভাবকত্ব বাঞ্ছনীয় হইতে পারে কিন্তু একটা কর্ত্তামি করা ঠিক নয়। কিন্তু কলবার্টের পক্ষে বলিতে পারিতাম যে—তাঁহার কার্য্যফল সৌভাগ্যক্রমে ভালই হইয়াছিল, তাঁহার কোন প্রস্তাবই নিতান্ত খেলো অথবা স্বজুপ-প্রিয় লোকের খেয়াল মাত্র ছিল না। তিনি তাঁহার যুগের সকল প্রকার শিল্প প্রণালী বুঝিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন—সেই সমুদয়ের মধ্যে যেগুলি ফ্রান্সের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেইগুলিই তিনি প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইতেন। কাজেই তাঁহার অভিভাবকতায় অথবা কর্ত্তামিতে শিল্পক্ষেত্রের ওস্তাদেরা লাভবানই হইয়াছে। এইরূপ কর্ত্তামির প্রয়োজনও তখন ফরাসীসমাজে উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ শিল্পী ও কারিগরগণ তখন নিতান্ত সেকেলে প্রণালীগুলি লইয়াই নাড়া চাড়া করিত—নূতন কোন পন্থায় অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইত না। এই নিমিত্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাকে নূতন শিল্প-প্রণালীর প্রবর্ত্তক হইতে হইয়াছিল।

কলবার্টের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে আর একটা নিন্দা রটিয়াছিল। তাঁহার শাসন-ফলে নাকি ফ্রান্সের শিল্পসম্পদ নষ্ট হইয়া যায়; নিতান্ত অজ্ঞ অথবা পক্ষপাতীয় লোকেরাই এইরূপ বলিবেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ফরাসী-সমাজ হইতে পাঁচলক্ষ ধর্মসংস্কারপন্থী হুগো (Huguenot) ধর্মের দিক্ষিকে নির্ব্বাসিত হয়। চতুর্থ হেন্‌রির আমলে ন্যান্টেসবিধি Edict of Nantes) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার ফলে সংস্কার পন্থীরা ক্যাথলিকগণের সঙ্গে ফ্রান্সে চলাফেরা করিতে পারিত কিন্তু ন্যান্টেসবিধি রদ করা হইলে তাহাদের সেই সকল সুবিধা নষ্ট হইয়া যায় তাহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কলবার্টের সংরক্ষণ-নীতির সঙ্গে এই ধর্ম-নির্য্যাতন-নীতির কোন সংস্রবই নাই।

কলবার্টের মৃত্যুর তিন বৎসর ভিতরেই ফ্রান্সের পাঁচলক্ষ শিল্পবিৎ ও ধনী ব্যবসায়ী নির্ব্বাসিত হইল। তাহার ফলে ফরাসী সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহার জন্য কলবার্টকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এই নির্ব্বাসনের ফলে প্রথমতঃ ফ্রান্সের শিল্প-কেন্দ্রগুলি নির্ম্মূল হইল—ফরাসী শিল্পশক্তি অবসন্ন হইল, মূলধনও কমিয়া আসিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ সমূহ লাভবান হইল। সুইজর্লাণ্ড, জার্ম্মাণির সংস্কারপন্থী রাষ্ট্র সমূহ, প্রুসিয়া, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড এই সকল দেশে ফরাসী পলাতকেরা সাদরে গৃহীত হইল। বস্তুতঃ ফ্রান্স এই উপায়ে তাঁহার শত্রুগণের শক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করিলেন। নিজ পায়ে এই রূপেই কুঠারাঘাত করা হইয়া থাকে। কলবার্ট সমগ্র জীবনব্যাপিনী সাধনার দ্বারা যে বিরাট কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা একটা নীচ প্রকৃতি গোঁড়া রাজার সুমন্ত্রণায় তিন বৎসরের ভিতর লুপ্ত হইয়া গেল। ফ্রান্স আবার সেই শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল। ফ্রান্সের দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের পর নবীন উৎসাহে দুনিয়ার দৃষ্টিপাত করিতেছে। এলিজাবেথের আমল হইতে যে কর্ম্মধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়াছে ইংরাজ সমাজে তাহা এক্ষণে নব-শক্তি লাভ করিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংল্যাণ্ডের ক্রমোন্নতি এবং ফ্রান্সের ক্রমিক অবনতি একসঙ্গে চলিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ফরাসী রাষ্ট্রবীরেরা স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা কল্‌বার্ট-নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহারা "সংরক্ষণ-নীতির" পরিবর্ত্তে অবাধবাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহারা ভাবি-লেন—"বিলাতে যদি ফরাসী মদের বাজার পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের অধিক দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে। কাজেই বিলাতী-শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের দেশে অল্প শুল্কে আমদানি করায় কোন ক্ষতি নাই।" ইংরাজেরা ফরাসীদের প্রস্তাবে যারপরনাই আহ্লাদিত হইল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যসন্ধি স্থাপিত হইল—তাহার নাম ইডেন-সন্ধি। ইহা পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে স্থাপিত মেথুয়েন সন্ধিরই নূতন সংস্করণ মাত্র। ফলও তাহারই অনুরূপ হইল।

ইংরাজেরা পর্ত্তুগালের মদে অভ্যস্ত হইয়াছিল—কাজেই ফরাসী মদের কাটতি ইংরাজ সমাজে বেশী হইল না। এদিকে

ফ্রান্সের বাজারে বাজারে বিলাতী মাল প্রবেশ করিল। ফ্রান্স হইতে বিলাতে বিলাসসামগ্রী মাত্র রপ্তানি হইতে পারিত—কিন্তু বিলাত হইতে ফ্রান্সে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি হইত। বিলাতী জিনিষের মূল্য কম থাকিত—এগুলি টেকসইও বেশী হইত। আবার ইংরাজেরা বহুকাল পর্য্যন্ত ধারে মাল ছাড়িতে পারিত। সকল দিক হইতেই ফরাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—"জাতিও গেল, পেটও ভরিল না।"

কিছুকালের ভিতরেই ফরাসী শিল্পীরা ধ্বংসোন্মুখ হইল। ফ্রান্সের মদ বিক্রেতারাও বিশেষ লাভবান্ হইল না। তখন ফরাসী রাষ্ট্র ইভেন-সন্ধি রদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্ষতি সামলান অসম্ভব হইল। শিল্প গড়িয়া তুলিতে এক পুরুষ বা এক যুগ লাগে—কিন্তু শিল্প ধ্বংস করিতে একবৎসরও আবশ্যক হয় না। সন্ধি রদ করিয়া ইংরাজের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিলে কি হইবে? ফরাসীদের মতিই বিগড়াইয়া গিয়াছিল—তাহারা বিলাতী দ্রব্যই বেশী পছন্দ করিত। কাজেই গুপ্তভাবে অবৈধ বাণিজ্য চালান ইংরাজের পক্ষে কঠিন হইল না। ফরাসীরাষ্ট্র যত বাধাই দিন না, ফরাসী সমাজ ইংরাজ বণিকগণের সহায়ক থাকিল। সুতরাং ফ্রান্সের স্বদেশী আন্দোলন সফলতা লাভ করিল না। অথচ ইংরাজের কোন ক্ষতি হইল না। তাহারা ফরাসী মদ বেশী পান করিতও না—আর যাহারা ফরাসী মদ ধরিয়াছিল তাহারাও সহজেই পুনরায় পর্ত্তুগীজ মদ ধরিল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে এবং নেপোলিয়ানী সময়ে ফ্রান্সের শিল্প যথেষ্টই অবসন্ন হয়। এই সময়ে ফরাসীরা তাহাদের উপনিবেশ এবং সমুদ্রবাণিজ্য সবই হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তথাপি নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যে ফরাসী শিল্প চরম উন্নতি লাভ করে। এরূপ উন্নতি বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে ফ্রান্সে দেখা যায় নাই। তাহার একমাত্র কারণ—স্বদেশী আন্দোলন। ফ্রান্সের বাজারে কোন বিদেশী মাল আসিতে পারিত না। ইভেন-সন্ধি পূর্ব্বেই ছিন্ন করা হইয়াছে—এক্ষণে যুদ্ধের ফলে ফরাসীর বাজারে ইংরাজের প্রবেশ পুরাপুরি নিষিদ্ধ—অবৈধ গুপ্ত বাণিজ্যও স্থগিত রহিয়াছে। কাজেই একমাত্র ফরাসী শিল্পীরাই ফরাসীজাতির সকল অভাব মোচনের সুযোগ পাইল।

যুদ্ধের প্রভাবে ইংরাজ ফরাসীদেশ হইতে বহুকাল হইয়া গেল। নেপোলিয়ান এইখানেই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি ইয়োরোপের সকল দেশ হইতেই ইংরাজকে বহুকাল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থার নাম Continental System. তিনি ঘোষণা করিলেন যে আস্ট্রিয়া, রুশিয়া ইত্যাদি সকল দেশই তিনি blockade বা রণতরীদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল দেশের সঙ্গে অন্য দেশীয় লোকের আসা যাওয়া নিষিদ্ধ। বিলাতী দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করাই নেপোলিয়নের মতলব ছিল। বস্তুতঃ যতদিন তিনি এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন ততদিন আস্ট্রিয়াতে এবং অন্যান্য দেশে শিল্পের চূড়ান্ত উন্নতিই সাধিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের কার্য্য-ফলে ঐ সকল দেশে আপনা আপনিই বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী-সংরক্ষণ সুরু হইয়াছিল। স্বদেশের বাজারে বিদেশীয় মালের আমদানি বন্ধ করাই শিল্পোন্নতির সর্ব্বপ্রথম উপায়।

নেপোলিয়ান বলিতেন—"আজকাল-জগতের

যে অবস্থা, তাহাতে যে জাতি 'অবাধ বাণিজ্য'-নীতি অবলম্বন করিবে সেই অধঃপাতে যাইবে।" নেপোলিয়ান সংরক্ষণ নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—এবং কৃষিধনের সঙ্গে শিল্পোন্নতির সম্বন্ধ গভীরভাবে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মত—"প্রাচীন কালে ভূমিই একমাত্র সম্পত্তি ছিল। বর্ত্তমান যুগে শিল্প প্রত্যেক জাতির দ্বিতীয় সম্পত্তি নেপোলিয়ান তথাকথিত ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের রচনা পাঠ করিতেন না। না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কারণ পণ্ডিতেরা নেপোলিয়ানের ন্যায় দেশের অবস্থা ও দুনিয়ার অবস্থা তলাইয়া বুঝিতে পারিতেন না। নেপোলিয়ানের অশিক্ষিত পটুত্বেই ফ্রান্সের অসাধারণ উপকার হইয়াছে। নেপোলিয়ানের সমান স্বদেশসেবক জগতে বিরল। নেপোলিয়ান ফরাসী সমাজে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন—ইয়োরোপে ফ্রান্সের ইজ্জত প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উদ্যোগে নব নব শিল্প ও শিল্প-প্রণালী ফরাসী সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। দেশের ভিতর ভাল ভাল পথ প্রস্তুত করিতেও নেপোলিয়ান মনোযোগী ছিলেন। নেপোলিয়ানের আমলে ফ্রান্সে সকল দিক হইতেই লক্ষ্মীলাভ হয়।

নেপোলিয়ানের পতন হইলে ইংরাজ পুনরায় ইউরোপে ও আমেরিকায় বাজার দখল করিল। ইংরাজেরা এতদিন সংরক্ষণ নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ সালের পর তাহাদের মুখে সর্ব্বপ্রথম অবাধবাণিজ্যের প্রশংসা প্রচারিত হয়। য়্যাডাম স্মিথের গ্রন্থ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল। ৪০।৫০ বৎসর পর তাঁহার মত ইংরাজ সমাজে আদৃত হইতে সুরু হইল। কিন্তু এই যুগের ইংরাজ-প্রচারিত অবাধ-বাণিজ্য-নীতি বড়ই বিচিত্র। ইহারা ইউরোপে এবং আমেরিকায় বিলাতী মাল রপ্তানি করা সম্বন্ধেই বাধাহীন শুল্কহীন ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক—কিন্তু যদি বিদেশীরা অধিক সংখ্যায় বিলাতের বাজারে মাল পাঠাইতে অগ্রসর হয় তখন তাহাদের অবাধ বাণিজ্য-নীতি কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি বিলাতের এই নূতন অবাধ-বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—"অন্যান্য বিলাতী মালের মত এই নিয়মটা বিলাতের বাহিরেই প্রযোজ্য। ইংরাজেরা স্বদেশে এই নিয়ম মানিতে প্রস্তুত নন। ইহারা দেশের কারখানায় যে বস্তু তৈয়ারী করেন তাহা বিদেশে রপ্তানি হইবে। দেশীয় সমাজে তাহার স্থান নাই।"

যাহা হউক ইংরাজেরা উচ্চকণ্ঠে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিল। ইউরোপের অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ এই বক্তৃতায় ভুলিয়া গেল। অল্পকালের ভিতরেই দেখা গেল যে, নেপোলিয়ানের বিলাতী বয়কট, (continental system) প্রভাবে প্রত্যেক দেশের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। এক্ষণে অবাধ-বাণিজ্যের হিড়িকে ঠিক উল্টা ফল ফলিতেছে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুই ইংলণ্ডের অর্থবলে এবং রাষ্ট্রীয় অধীনতায় রাজা হইলেন ইংরাজেরা ভাবিল যে ফরাসীরা সহজেই বিলাতী মাল হজম করিবে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। নেপোলিয়ানের সংরক্ষণ-নীতিই ফ্রান্সে বজায় রাখা হইল। তাহার ফলে ১৮১৫ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর ফরাসী শিল্প বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

প্রতিভা ও যোগানন্দ

ইমার্সন লিখিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষই জগতে কোনও না কোন উপায়ে বড় হইতে পারে। তাহার জন্য জগতের একটা জায়গা খালি পড়িয়াই থাকে, যদি সে সে জায়গাটুকু জুড়িয়া বসিতে পারে তবেই তাহার প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটে। ঈশ্বর মানবকে, শুধু মানবকে কেন তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন জীবকেও নিরর্থক সংসারে পাঠান নাই। তাহার স্বীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি মানবের ভিতরেই রহিয়াছে।

কি তবে মানুষ বড় হয় না কেন? এই যে অসংখ্য নরনারী ধরিত্রী কয়জন সন্তানের মত সন্তান পাইয়া সৌভাগ্যশালিনী? পিছন ফিরিয়া অতীতের অসীম আঁধারের দিকে চাহিয়া দেখ, কয়টী নক্ষত্র তিমির উজ্জ্বল করিয়া মানবের পথের আলো দিতে জাগিয়া আছে? জগতের বিশালতার তুলনায় তাহা অতি অল্প এবং পরিমিত।

সে কোন সুপ্ত শক্তি যাহার উদ্বোধনের অভাবে মানুষ বড় হইতে পারিল না; অসংখ্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করিয়া ধন্য হইল না?

পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিলেন—প্রতিভা। প্রতিভা জাগিবে কিসে? জনসন বলেন—আগন্তুক বিষয়ে বিশেষ বহুশাখাবিশিষ্ট মানসিকবৃত্তিকে সংহত করিয়া আনিয়া লক্ষ্য বিশেষের উপর প্রক্ষেপিত করিতে পারিলেই মানব প্রতিভার অধিকারী হইতে পারে। লক্ষ্য বিশেষে মনের স্থৈর্য্য সাধনই মানবের আত্মস্থ সুপ্ত শক্তির উদ্বোধনের প্রধান উপায়।

"আতস পাথর অর্থাৎ Magnifying Glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মিকে কোন দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তর বাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে তেমনি, আত্মশক্তি সহকারে মন লক্ষ্য বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। ইহার নামই যোগ, এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে মানুষের মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়" *

এবং এই যোগানন্দ বলেই সাধক অলৌকিক কার্য্য সংসাধন করিতে পারেন। কথিত আছে, সক্রেটিস প্রায়ই দিবস রজনী ব্যাপিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। নিউটনাদি প্রাকৃতিক সত্যান্বেষীগণ সকলেই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে এই যোগবলের অধিকারী ছিলেন, ইহাতে ভুল নাই। মারকেটর নামক প্রসিদ্ধ ভূগোল-পণ্ডিত অধিরাত্র অধ্যয়নে এমন আনন্দ পাইতেন যে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা একেবারেই থাকিত না। তাঁহার পত্নী যদি তাঁহাকে খানাহারের জন্য ডাকিতেন কিংবা সম্মুখ হইতে মানচিত্র সরাইয়া লইতেন তবে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন।

গলাস নামক রোমীয় পণ্ডিত প্রভাতে কাগজ কলম লইয়া বসিতেন আর অন্ধকার হইয়া আসিলে চমকিত হইয়া আসনত্যাগ করিতেন। যদি রাত্রিতে বসিতেন তবে ভোরের আলো না পাইলে তাঁহার বাহ্য-চৈতন্য হইত না।

---

* গীতাপাঠ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিশ্চয়ই কোন আনন্দ মানুষকে এমন অবস্থায় লালিত ও পোষিত করে, তাহা না হইলে কি মানুষ এমন শারীরিক অভাব আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া যাইতে পারে? এই আনন্দধারা যোগরত মানবের উপর কেমন-ভাবে ক্রিয়া করে বাফন (Buffon) তদীয় স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার সহিত সুন্দরভাবে আহার বিষয়ে লিখিয়াছেন—আবিষ্ক্রিয়া ধৈর্য্য সাপেক্ষ। তোমার লক্ষ্য বস্তু দীর্ঘকাল অনুধ্যানকর; তাহার স্বরূপ ধীরে ধীরে তোমার নিকট প্রকটিত হইতে থাকিবে পরিশেষে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটা কিছু তোমার মস্তিষ্কের ভিতর লাফা দিয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে এক উজ্জ্বল দীপক তরঙ্গ প্রসৃত হইয়া তোমার হৃদয়ে নামিয়া আসিবে —তখন সিদ্ধানন্দ। সে আনন্দের এমি প্রভাব যে আমি ক্রমাগত বার এবং চৌদ্দ ঘণ্টা লেখনী ধারণ করিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য ক্লান্ত হই নাই। ইটালীর কবি মারিনি (Marini) সম্বন্ধে একটা কথা আছে, তিনি একদিন তাঁহার কাব্য লইয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার একখানা পা আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল তবু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। এই হ্লাদিনী শক্তি প্রভাবে ধ্রুব প্রহ্লাদ যে ঔত্তিক দেহের উপর অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিতে পারিয়াছিলেন তাহা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

যোগোদ্ভূত আনন্দময়ী ওজস্বিনী শক্তি বা শাস্ত্রের কথায় হ্লাদিনী শক্তিই প্রতিভার সূতী। সে যে কি মোহন প্রভাবে সাধককে আনন্দবর্ত্ম দিয়া সিদ্ধির সঙ্গে মিলন করাইয়া দেয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মহাকবি দান্তের (Dante) কথা লিখিতে যাইয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন "তাঁহাকে যেমন উগ্র সাধনায় সমাহিত থাকিতে দেখিয়াছি এমন আর কাহাকেও দেখি নাই।

যখন তিনি পড়িতেন তাঁহার সমগ্র মন তাহার ভিতরে ডুবিয়া যাইত। বাহ্য জগৎ যেন তাঁহার স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। একদিন রাস্তে কোন শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন; রাস্তার ধারে একটা বইয়ের দোকানে বসিয়া তিনি প্রদর্শিত রং চংগুলি দেখিবেন মনস্থ করিয়া তথায় যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দৈবক্রমে দোকানের পুস্তকাধারস্থ একখানা পুস্তকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি বইখানি হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। রাস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কোন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর ক্রমে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার চোখের সামনে যে সকল ধুম ধড়কা হইয়া গিয়াছিল তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন। গান বাজনার শব্দ, মানুষ জনের হৈ হৈ রৈ রৈয়ের টু শব্দটী পর্য্যন্ত তাঁহার কাণে যায় নাই।

মানসিক আত্যন্তিক আনন্দ এইরূপে আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্য সন্নিবেশ হইতে আমাদিগকে বহুদূরে ব্যবহিত করিয়া ফেলে। যোগশাস্ত্র বলেন জীবাত্মা যখন আনন্দময় কোষের রসসম্ভোগে নিরত হন তখন তাহার স্থূলদেহ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। একজন আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ একদিন গগন পর্য্যবেক্ষণের পর শয্যায় শয়ন করিতে গমন করেন; নীহারিকাপুঞ্জের সমুজ্জ্বল ছবি তাঁহার চোখে চোখে লাগিয়াই থাকে। তিনি শয্যায় বসিয়া সেই ধ্যানলব্ধ দৃশ্যপটে আপনার সমস্যার মীমাংসা করিতে করিতে রজনী

ভোর—করিয়া দিলেন। প্রভাতে লোকে তাহার ঘরে যাইয়া দেখে তিনি আপনা আপনি বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন। হাঁ, এটা দেখিতেছি এই রকমই হইবে; আচ্ছা, এখনকার মত রাখিয়া দেওয়া যাক্ আমাকে আবার শুইতে যাইতে হইবে; রাত্রিও বেশী হইয়া আসিল।

ঐকান্তিক যোগানন্দ মানুষের স্থূল দেহের উপরও অপূর্ব্বভাবে ক্রীড়া করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ তিনি যখন মহাভাবে সমাহিত হইতেন তৎকালে বর্ত্তুলবৎ হইয়া আসিত। ভাগবত ভক্তের হৃদিহিত অব্যয় অমৃতধারা বাহুদেহে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

'হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়ত্যু
মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

প্রতিভাশালিনী রমণী মাডাম রোলাণ্ড, টেলিমেকস পড়িতে যাইয়া তাঁহার যে অবস্থান্তর ঘটিত সে বিষয়ে লিখিয়াছেন—তখন আমার শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে, আমার বোধ হয়, একটা আগুনের ধাপ আমার মুখমণ্ডল উত্তপ্ত করতঃ তাহা রক্তাভ করিয়া তুলে। আমি যেন টেলিমেকসের য়ুচারিস (Eucharis) এবং টেনস্রেডের এমিনিয়া হইয়া যাই। এই সময় চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যনিচয় সহসা উত্তোলিত বৃক্ষপটের ন্যায় আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। রোমীয় কবি মেটাষ্টাসিও (Metastassio) লিখিয়াছেন যখন আমি একটু মনোনিবেশ করি আমার মাথাটা উত্তেজিত হইয়া পড়ে; মাতালের মত আমার মুখ লাল হইয়া যায়। আর তখন বেশীক্ষণ কাজ করিতে পারি না। কলোর মনে যখন মানব-সমাজ সমস্যা বিষয়ে নবীন তত্ত্ব-চৈতন্য ঘটে তখন নাকি তাঁহাতে মাঝে মাঝে বিকারের লক্ষণ দেখা যাইত।

মানসিক আনন্দের গভীরতম চাপ অনেক সময় শরীরের পক্ষে ভয়ানক হইয়া থাকে। এরূপ আনন্দের ধেঁসা ধেঁসি যাইবার অবস্থা মানুষের ক্বচিৎ হয়। চিদানন্দ সূর্য্যরশ্মি সমপাত বিকসিত জীবাত্মা তখন স্থূল প্রভাব হেলায় ফেলিয়া ঊর্দ্ধমুখে সজীবদৃঢ় সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বিশাল আনন্দ রাজ্য অভিমুখে ধাবমান হন। ভাগবত ভক্তের এই অবস্থার মানসী ছবি কত না সুন্দর করিয়া সূক্ষ্ম তুলিকা অগ্রে জীবন্ত করিয়া জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দেখাইয়াছেন! তাঁহার স্রথংবলম্ব মল্লিকা, ব্যস্ত বস্ত্র-ভরণা অবলোলকুন্তলা ব্রজসুন্দরীরা মহাভাবময়ী মনোময়ী প্রতিমা। বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস স্বামীর মুখ দিয়া শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—

" নিরবধি আঁখিজলে
পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কর তনু।

বোধ হয়, এই আনন্দেরই একটু আভাস পাইয়া ড্রাইডেন হোমারের অনুবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

I found greater pleasure than virgil; But it was not a pleasure without pain, the continued agitation of the spirits must needs be weakener to any constitution মানবীয় প্রতিভা প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন আচরণ উন্মোচন পূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দ ঘনের সন্ধান পাইবার জন্য সে মধু প্রাণ ভরিয়া পান করিবার আশায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সাধক অবিদ্যার আচ্ছাদনে ঘা' দিয়া বলিতেছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

জনসাধারণের শিক্ষা

মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ অভাব দূর করাকেই শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে উন্নতমনা ব্যক্তিই অবস্থানুসারে আপনার ভবিষ্যতের দায়িত্বও যথাসম্ভব বুঝিতে পারেন। আপনার ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে বুঝিতে পারা আমাদের জীবনের একটী গুরুতর দায়িত্ব। বর্ত্তমানকে বুঝিয়া ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টাই উন্নতিশীলের লক্ষণ। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বুঝাইবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, জনসমাজকে শিক্ষাদান করিতে তাঁহাদের দায়িত্বও গুরুতর। শিক্ষার সুব্যবস্থাতেই ব্যক্তিত্বের ক্রমশঃ সুবিকাশ হয়, ব্যক্তিত্বের সুবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা পূর্ণতালাভ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা সুন্দর হইলেই অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির স্ফুরণে জাতিগত স্ফূর্ত্তিলাভ ও জাতিগত উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তিগত কিরূপ শিক্ষায় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে, ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। শিক্ষার ব্যবস্থায় আর্থিক অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি না হইলে সে শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুফল প্রদান করিতে পারে না।

জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান অভাব আহার ও বাসস্থানের। আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে উচ্চশিক্ষা অভিলাষী ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ এখনও আহার ও বাসস্থানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও সফলকাম হইতেছে না। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ভদ্র জনসাধারণও অনেকটা এই অবস্থার মধ্যে নিপীড়িত, দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহাও বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই আহার্য্য ও পানীয়ের জন্য ব্যাকুল হয়, পরে মাতৃস্নেহে স্তন্যপান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা ভুলিয়া মায়ের কোলে আশ্রয় পায়, মানবজাতির শৈশব অবস্থাও তেমন সর্ব্বপ্রথম ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা মিটাইবার উপায় ও বাসস্থানের সন্ধান করে। যাহারা এখনও আহার ও বাসস্থানের সন্ধান করিতে পারে নাই, অথচ কোন রকমে লোকালয়ে উন্নত মানবের সংস্রবে আসিতে পারিয়াছে, তাহারা যদিও এখন আর মানব জাতির শৈশব অবস্থায় নাই, তথাপি তাহারা আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থার আগে বিশেষ কোন উন্নত চিন্তার সংস্রবে এখনও তেমন আসিতে পারে না। দরিদ্র জনসাধারণ তাহার দুর্ব্বহ চিন্তা-ভার মাথায় লইয়া উন্নত চিন্তার গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে এখনও অবসর পায় নাই। তাহাদের খাওয়া পরার উপযোগী শিক্ষার সঙ্গে যে কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষা তাহারা চাইতে পারে; কিন্তু খাওয়া পরা কি করিয়া চলে, এ শিক্ষা পাওয়ার আগে তারা কোন শিক্ষাই চায় না।

উচ্চশিক্ষা দ্বারা উন্নত চিত্তের মানুষ গঠন করা যায়। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা যাঁর নিতান্তই অর্থ সাপেক্ষ, এবং যাহা নিতান্তই অর্থ

সাপেক্ষ। যাহা জনসাধারণের শিক্ষা হইলে ধনী জনসাধারণ সেরূপ উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, দরিদ্র জনসাধারণ খাওয়া পরার ব্যবস্থা না করিয়া সন্তান সন্ততির জন্য উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। যে পর্য্যন্ত দারিদ্র্য নিষ্পেষণে মানুষের অন্ন চিন্তা ও হতাশা উভয়ই প্রবল থাকে, এবং যতদিনে সেই দারিদ্র্যের হস্ত হইতে সে অব্যাহতি না পায়, ততদিনে তাহার উচ্চ-শিক্ষার ফল উন্নত চিন্তাও সাধারণতঃ কার্য্য-করী হয় না। দরিদ্রের উন্নত চিন্তায় জগতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই চিন্তা দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সুবিধা এখনও তেমন হয় নাই। দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য উন্নত চিন্তার সংস্রবে আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, কিন্তু যাহারা বর্ণমালা ও তাহা শিক্ষা করে নাই। ধর্ম্ম শিক্ষার নৈতিক শিক্ষাও তেমন লাভ করে নাই, উন্নত চিন্তার সংস্রবে তাহা ত তেমন আসিবারই সুবিধা পায় নাই। অনেক অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিতের মাথায় প্রচারবলে অনেক উন্নত চিন্তা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং উহা যে কিরূপ কার্য্যকরী হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার যেমন আদর্শ প্রচার করিয়াছে, আর কোথায়ও তেমন হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। দরিদ্রের মধ্যেও নীতিপ্রচার করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমানকালের উচ্চশিক্ষা প্রচার করা যায় না। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের মত বিনা অর্থব্যয়ে হইত, তাহা হইলে বরং ধনী দরিদ্রকে একত্র টানিয়া আনিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইত।

দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এ সময় দারিদ্র্য চিন্তা দূর করিবার শিক্ষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে যেমন উপযোগী, আর কোন শিক্ষাই তেমন উপযোগী নহে। নিম্নশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষাই এখন দেশের জনসাধারণের মুখ্য শিক্ষা হওয়া উচিত। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা হইলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। অবস্থানুসারে এখন উচ্চশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেও দেশের নর-নারীকে শিল্পশিক্ষা প্রদান করা নিতান্ত উচিত। শিল্পশিক্ষাকে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার অন্তর্গত করিলে শুধু শিক্ষিতের কর্ম্ম ক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে তাহা নহে, কৃষি-শিল্পের প্রতি আমাদের উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধাও কমিয়া যাইবে। উচ্চশিক্ষাই কৃষিশিল্পকে সম্মানের যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

কিরূপ শিল্পশিক্ষা নিম্নশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে গৃহীত হইলে সুবিধা হইবে, অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে, তাহা নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ। বহু ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রশিল্প অপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রচারই সাধারণতঃ কার্য্যকরী হইবে। ইহাতে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনু-সারে নরনারী সকলেরই অর্থাগমের পথ সুগম হইবে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মধ্যে অনেক স্থানে অনেক অবস্থায় অর্থকরী শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজন, উহারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত সঙ্গত।

বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া পড়িতেছে, দরিদ্রের পক্ষে কি নিম্ন-শিক্ষায়, কি শিল্পশিক্ষায়, কি উচ্চশিক্ষায় কোথায়ও ইহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। দরিদ্রের বিনা ব্যয়ে

বা অল্প ব্যয়ে নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বার ধনী দরিদ্রের জন্য সর্ব্বত্রই অবারিত থাকা উচিত। প্রতিভা-শালী দরিদ্র ছাত্র কখনও স্বাবলম্বনে, কখনও পরানুগ্রহে আপনার ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া উন্নত চিন্তার সংস্রবে আসিতে পারেন। দেশের উন্নতি ধনীর হাতেও নহে, দরিদ্রের হাতেও নহে; দেশের উন্নতি কর্ম্মীর হাতে।

যাহাদের আমরা, দেশের অশিক্ষিত লোক বলি, তাহাদের মধ্যেও নিম্নশিক্ষা শিল্পশিক্ষা ও নৈতিকশিক্ষা প্রচারিত হউক। যাহাদের আমরা যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষিত করিতে চাই, তাহাদের মধ্যেও নিম্নশিক্ষা শিল্প-শিক্ষা ও নৈতিকশিক্ষা প্রচারিত হউক। উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত থাকুক, যে পারে আসুক, আপনাকে বিশ্ববাণীর সেবক নিযুক্ত করুক।

জনসাধারণের শিক্ষার ফলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচুক। দরিদ্রের শিক্ষা দরিদ্রের মতনই হউক, কিন্তু শিক্ষার ফল যেন দরিদ্র না হয়, যথাসম্ভব সে দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকুক। দেশের দরিদ্রের অবস্থা উন্নত হইয়াই ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। সর্ব্বাগ্রে আমরা দরিদ্রের আহার ও বাসস্থানের উপযোগী শিক্ষা চাই। দরিদ্রের আর্থিক, নৈতিক ও পারিবারিক উন্নতিই সমাজজীবনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির একটা প্রধান কথা। দরিদ্রের উন্নতিই শুধু উন্নতি নহে, সমাজ-জীবনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে ধনীর আর্থিক, নৈতিক ও পারিবারিক উন্নতি আরও বেশী প্রয়োজন। ধনীর সঞ্চিত অর্থ, ও দরিদ্রের পরিশ্রমই সুশিক্ষাবলে জাতীয় উন্নতির মূলধন রূপে গণ্য হইতে পারে। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত, পরিবার-গত, সমাজগত ও জাতিগত মনে করিতে পারিলে ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা কি, তাহার মীমাংসা কতকটা সহজ হইয়া পড়ে। ব্যক্তি ও পরিবারের চিন্তাধারা ক্রমশঃ যাহাতে উন্নত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও সমাজরক্ষিণী নীতি যাহাতে উচ্চশিক্ষার উচ্চস্তরের উদ্দেশ্য বলিয়া উচ্চশিক্ষাভিলাষীরা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষার কথা প্রচার করা যেমন প্রয়োজন, ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সুশিক্ষা ও সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে তেমন প্রয়োজন। আমরা এই শিক্ষাই চাই, যাহাতে ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা দূর হয় ও ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে আপনার ও পারিবারিক বিকাশ বুঝি-বার জন্য অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিকে যথাসম্ভব বুঝিতে পারে। আমরা শিক্ষার ফলে দরিদ্রের চাই আহার, বাসস্থান ও বিশ্রাম; ধনীর চাই অর্থরক্ষা করিবার ও বিলাসিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি; আর চাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতমনা ধনী ও দরিদ্রের জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির চিন্তাধারা ও জাতীয় দারিদ্র্যের প্রশমন করে সঞ্চিত মূলধন।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যক্ষ্মা রোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ-প্রতিকারোপায় বা গৃহ-চিকিৎসা *

যক্ষ্মা রোগে ধরিলে অধিকাংশের পক্ষেই উহা একটী জীবনব্যাপী সংগ্রাম হইয়া দাঁড়ায়; জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধিতে হয়, ব্যাধির সহিত অহোরাত্র হাতাহাতি করিয়া উহাকে নিরস্ত রাখিতে হয়। সাপের মাথার উপর যতক্ষণ পা থাকে ততক্ষণ উহার ফোঁসফোঁসানি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে; কিন্তু পা-টি কোনক্রমে আল্‌গা পাইলেই ফোঁসফোঁসানী চুলায় যাউক, একেবারে দাঁত ফুটাইয়া দেয়। সুতরাং এই ব্যাধিতে আক্রমণ করিলেই উহার গলায় পা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে কারণ উহা কোন প্রকারে বাগ পাইলেই শত্রুতাসাধন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। এইজন্য উহাকে কোনরূপ সুযোগ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই এই ব্যাধির আচার ব্যবহার, খুটি নাটি, সামান্য বৃহৎ, সমস্ত বিষয়েই জানা আবশ্যক। জানা শত্রুর সঙ্গে তবু লড়াই করা চলে, অজ্ঞাত শত্রু হইলে কোথা হইতে যে পাশিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জীবনান্ত করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেইজন্য এই ব্যাধি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অতি আবশ্যক। ইহার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে, কিরূপে উহা আক্রমণ করে, কিরূপেই বা ঐ আক্রমণ নিবারণ করা যায় সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে "যক্ষ্ম রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়" প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উহার চিকিৎসাদি বিষয়ে আমি তথায় কিছুই বলি নাই, বলা আবশ্যকও মনে করি নাই।- চিকিৎসা বিষয়টি বিশেষজ্ঞদেরই শোভা পায়। যাহারা এ বিষয়ে গতিমত অনুশীলন করিয়াছেন, পুস্তকাদি পাঠে এ বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চা

---

* গত চৈত্র সংখ্যার "জনৈক ভুক্তভোগী" আমার 'যক্ষ্ম রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধটি যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে তাহাতেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছি। ভুক্তভোগীটি আমার অপরিচিত নহেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি আজ আর ইহ সংসারে নাই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মুস্তফী মহাশয় অকালে আমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া এই দুরন্ত যক্ষ্মারোগেই গত ১১শে চৈত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমি জানি তিনিই ঐ প্রবন্ধটির রচয়িতা উহার প্রতিছত্রেই তাহার রোগক্লিষ্ট বেদনাকাতর হৃদয়টি দেখিতে পাই। ভুক্তভোগীর জ্ঞাতব্য অন্যে কি করিয়া বুঝিবে? এ কথা সত্য। কাজেই প্রবন্ধটির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে। আর কাহাকে উত্তর দিব? কে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে? তাহার মত বেদনাকাতর আরও অনেকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির কবলে পড়িয়া বহু কষ্ট ভোগ করিতেছেন এই কথা মনে করিয়াই আমি এই রোগের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধটিতে শুধু রোগের কারণ ও উহার নিবারণোপায় সম্বন্ধেই আলোচনা ছিল সুতরাং উহা হইতে চিকিৎসা বিষয়ে মত প্রত্যাশা করা মুস্তফী মহাশয়ের উচিত হয় নাই। তিনি আরও একটী বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছেন আমি সর্ব্ব অবস্থায়ই খুথু ফেলিতে নিষেধ করিতে পরামর্শ দেই নাই। অবশ্য ভেবে আমাদিগ ব্যবস্থা দিয়াছি। যে কেহ আমার প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। সে যাহা হউক আজ আর এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা চলে না। যদি সময় পাই তাহা হইলে এবং আমার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটুকু সম্ভব এই ব্যাধির সর্ব্ববিধ আলোচনা করিবার প্রয়াসে তাহা নিয়োগ করিতে চিরদিনই তৎপর থাকিব এবং সেই ভরসা লইয়াই আজ এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম।

করিয়াছেন. যে সব বিষয় হাতে কলমে শিখিতে হয় তদ্রূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা-ধিক [illegible] অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন, ও নানারূপ রোগী দেখিয়া বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিদেরই এইরূপ ভার লওয়া শোভা পায়। সুতরাং ব্যাধি হইলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ও তাহার উপদেশ লওয়া সঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া পড়ে যখন চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করিলে চলে না। এই কলিকাতা সহরে না হয় প্রতি রাস্তায় ৪।৫ গণ্ডা করিয়া ডাক্তার আছেন কিন্তু তাদেরই কি সব সময় পাওয়া যায়? বাটীর নিকটের ডাক্তারই যে গৃহচিকিৎসক হইবেন এমন কোন কথা নাই। সকল ডাক্তারের উপর সুবাদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকা অসম্ভব নহে। মনে করুন, আপনার গৃহচিকিৎসকের বাটী প্রায় এক মাইল দূর, এমত অবস্থায় রোগীর কোনরূপ গুরুতর লক্ষণ হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিতেও সময়ের প্রয়োজন; হয়ত সব সময় তাঁহাকে পাওয়া না ও যাইতে পারে, সুতরাং আজকালকার মোটর, টেলিফোনের দিনেও সকল সময় ইচ্ছানুরূপ ডাক্তার মিলিয়া উঠে না। কলিকাতায় না হয় যেখান সেখান হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া জোড়া তালির কাজ চালাইয়া দিতে পারা যায় কিন্তু তাও সব সময়ে ঘটিয়া যে উঠে না এরূপ আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। পাড়াগাঁর কথা আর কি বলিব, তথায় স্থানে স্থানে ৮।১০ মাইল, এমন কি ২০।৩০ মাইলের মধ্যেও ভাল ডাক্তার নাই। কলিকাতায় বসিয়া উহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে কিন্তু ইহার একবর্ণও অসত্য নহে। সে সব স্থানে হঠাৎ অসুখ গুরুতর হইলে, এবং নিজেদের দ্বারা কোন প্রতিকার না হইতে পারিলে, ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অবস্থা বিশেষে সাধারণে যাহাতে সতর্কতা লইতে পারে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যক্ষ্মা ব্যাধিতে যে সব সঙ্কট ও সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব, এবং সাধারণ গৃহস্থে তাহার কি প্রতিকার লইতে পারে তাহার উপায় দেখিতে চেষ্টা করিব।

জ্বরে High fever

যক্ষ্মা রোগে জ্বর একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বরের পরিমাণের কোন স্থির হিসাব নাই, কখনও বেশী, কখনও কম। সময় সময় জ্বর খুব বেশী হইয়া পড়ে। শরীরে বিশেষ মাত্রা বেশী অথবা অন্যবিধ বিষ (Secondary infection) প্রবেশ করিলে প্রায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ১০২°।১০৩° পর্য্যন্ত জ্বরে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ থাকে না। ১০৩° এর উপরে উঠিলেই বাস্ত হইতে হয়। এবং ১০৪° এর উপরে উঠিলেই ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১০৫°।১০৫°৪° জ্বরে অনেক সময় ফিট্ (অপস্মারক-Fits) হইয়া পড়ে এবং নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং জ্বর বৃদ্ধি হইবার সময় হইতেই সাবধানতা লওয়া কর্ত্তব্য। জ্বর ১০২°।১০৩° হইলেই মাথার সম্মুখে কপাল বরাবর ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া আবশ্যক। জলের সঙ্গে বরফ মিশাইলে আরও ঠাণ্ডা হয়। অনেক সময় অডিকোলন (Eude-cologne) বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার (Lavender Water) জলের সহিত মিশাইয়া মাথায় পটী দিলে বেশ আরাম

লাগে। এই সব জলে স্পিরিটের (Spirit) ভাগ থাকায় স্পিরিট উড়িয়া যাওয়ার সময় (Evaporation) গরমটা উঠিয়া যায় ও মাথা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। এই সময় হাত পাখা লইয়া মাথায় একটু একটু বাতাস দিলে বেশ ভাল বোধ হয়।

যাহাদের সর্ব্বদা ইলেক্ট্রিক পাখার (Electric Fan) নীচে থাকা অভ্যাস তাহাদের গায়ে বেশ করিয়া কাপড় দিয়া রেগুলেটারের (Regulator) ২।১ পয়েণ্ট (Point) খুলিয়া দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষা হাত পাখাই ভাল। জলপটীতে যদি জ্বর না কমে বা রোগী যদি ভাল বোধ না করে তবে আইস্ ব্যাগে (Ice-bag) করিয়া মাথায় বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে অধিকাংশ সময়েই আরাম পাওয়া যায় এবং প্রায়শঃই জ্বর নামিয়া আইসে। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা আইস্ ব্যাগ দেওয়াতেও যদি জ্বর না নামে কিম্বা উহা সত্ত্বেও যদি জ্বর বাড়িয়া যাইতে থাকে তবে জল দ্বারা গা মোছাইয়া দেওয়া (Sponging) উচিত। এই গা মোছান সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ গরম জলের ভিতর স্পঞ্জ (Sponge) বা ছোট তোয়ালে বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ডুবাইয়া উহা নিংড়াইয়া লইয়া উহা দ্বারা গা মোছাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে এই ফল হয় যে শরীরটা বেশ পরিষ্কার হয়, লোমকূপের ছিদ্র-সমূহের মুখগুলি পরিষ্কার হয় ও তাপ লাগার ফলে উপস্থিত রক্তবাহী শিরাসমূহ প্রসারিত হওয়াতে ভালরূপে রক্তসঞ্চালন হয় এবং ঘাম হইয়া শরীরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। ইহার গুণ এই যে ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার বেশী ভয় থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহাতে জ্বর বড় একটা বেশী নামে না। তখন উপায়ান্তর হইয়া দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা মোছানই দরকার হইয়া পড়ে। সামান্য একটু সাবধানতা নিলে ইহাতেও ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নাই। স্পঞ্জ করার সময় সমস্ত কাচের সার্সী বন্ধ করিতে হইবে, যদি কাচের সার্সী না থাকে তবে কাঠের দরজাগুলিই বন্ধ করিতে হইবে। অবশ্য সব সময়েই যে উহা প্রয়োজন তাহা নহে খুব গ্রীষ্মের সময় উহা বন্ধ না করিলেও চলে তবে ডাক্তার কাছে না থাকিলে একটু বেশী সাবধানতা লওয়াই সঙ্গত। উষ্ণতম জল হইতে আরম্ভ করিয়া রীতিমত কমিতে জল (Tap water) বা কূপের জল, পুষ্করিণী বা নদী সকল জলই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এ সময় পাখাটি একেবারে বন্ধ থাকিবে। দরকার হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই স্পঞ্জিং করার সময় শরীর জল দ্বারা রীতিমত ভিজাইয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জলে গা মোছাইয়া দিলেই জ্বর নামিয়া আইসে, কিন্তু সময় সময় ৫।১০ মিনিট, এমন কি ১০।২০ মিনিটও ঠাণ্ডা জল দ্বারা মোছাইয়া দিতে হয়। থারমোমিটারে যে পর্য্যন্ত তাপ নামিতে না দেখা যায় সে পর্য্যন্ত স্পঞ্জিং বন্ধ করা হয় না। সাধারণতঃ জ্বর ১০২°।১০১° পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত; কারণ স্পঞ্জিং বন্ধ করিলেও উহার ক্রিয়া কিছুকাল চলিতে থাকে এবং উহার পরেও তাপ এক আধ ডিগ্রী কমে। তাপ বেশী কমিয়া গেলে হঠাৎ হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে যাহাকে 'কোলাপ্স' (collapse) বলা যায়, সুতরাং তাপ যাহাতে বেশী নামিয়া না পড়ে

সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এই স্পঞ্জ করার জলের সহিত টয়লেট্ ভিনেগার (Toilet Vinegar) অডিকোলন বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিলে শরীরটায় বেশ স্ফূর্ত্তি ও সোয়াস্তি বোধ হয়। স্পঞ্জিংএর সময় মাথায় আইস্ ব্যাগ্ রাখিলে ভাল হয় নতুবা ঠাণ্ডা জল দ্বারা মাথাটা বেশ করিয়া ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতেও জ্বর না কমিলে রোগীকে ভিজা কাপড়ে কিছুকাল জড়াইয়া রাখিলে এবং যে পর্য্যন্ত তাপ না কমে সে পর্য্যন্ত উহার উপর জল ছিটাইয়া দিলে তাপ প্রায়শঃই কমিয়া আইসে। উহাতেও কৃত কার্য্য না হইলে রোগীর চারিদিকে বরফ দিলে তাপ দ্রুত কমিয়া যায়। শেষোক্ত দুইটী প্রক্রিয়া ডাক্তার ভিন্ন অপর কাহারও করা উচিত নহে; আমি প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র। মফঃস্বলের অনেক স্থানে বরফ পাওয়া যায় না। সে সব স্থানে জলপটী প্রভৃতিতে উপকার না দেখা দিলে স্পঞ্জিং করার পূর্ব্বে মাথাটা বেশ কয়েক ঘটী জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয় ও জ্বর নামিয়া আইসে। মফঃস্বলে রোগীর মাথায় অনেক সময়ে কলসী কলসী জল ঢালিতে হয় উহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই।

নিশাদল (Ammon chloride) ও সোরা (Nitre) একত্রে মিশাইলে খুব ঠাণ্ডা হয়, উহা বরফের পরিবর্ত্তে ব্যাগে করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে; তবে উহার দোষ এই যে রবারকে সত্বরে নষ্ট করিয়া দেয় এবং আইস ব্যাগটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহা বরফের অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য এবং বরফের মত শীতলও নহে; তবে উহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং ঠিক কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

আইস্ ব্যাগও মফঃস্বলে সব সময়ে পাওয়া যায় না। সুপারী গাছের পত্র আবরণ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার ভিতরের দিকে একটী পাতলা আবরণ থাকে। বহিরাংশ হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারিলে উহার ভিতরে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহার ভিতর দিয়া সহসা জল নির্গত হয় না।

আইস্ ব্যাগ কতক্ষণ মাথায় রাখা যাইতে পারে, মাথার কোন্ দিকে কি ভাবে দিতে হয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞানও সকলের নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধেও এই স্থানে দু, চারিটি কথা বলা অসঙ্গত মনে করি না। সাধারণতঃ একযোগে আইস্ ব্যাগ দুই ঘণ্টার বেশী না দেওয়াই কর্ত্তব্য। দুই ঘণ্টা দিয়া পুনরায় ½ ঘণ্টা—এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা চলিতে পারে। এসব সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশমত চলিতে হইবে কারণ প্রত্যেক রোগীরই অবস্থা বিশেষে স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন। ডাক্তার অনুপস্থিতির সময় কি করা দরকার আমি তাহাই বলিতেছি মাত্র। সুতরাং আইস্ ব্যাগ মাথায় দিয়া পাঁচ মিনিট পরেই নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আইস্ ব্যাগ প্রধানতঃ মস্তকের সম্মুখের ভাগে দিতে হয়। আমাদের মস্তকের কার্য্যকরী শক্তির স্থান বিশেষতঃ তাপ উৎপাদনের কেন্দ্র (Heat producing centre) এই জায়গায়। কাজেই ঐ স্থানে প্রয়োগই প্রধান দরকার—তবে মস্তকের সমস্ত স্থানেই দেওয়া যাইতে পারে। মাথায় বেশী চুল থাকিলে আইস্ ব্যাগ দেওয়াতে অসুবিধা হয়। যাহাতে মাথার চামড়ার সহিত ব্যাগ লাগিতে পায়ে তাহার

অল্প মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; মাথা একেবারে মুড়াইয়া দিলে আরও ভাল হয়। তবে মেয়েদের বেলায় এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেশ রমণীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য; একান্ত আবশ্যক না হইলে উহার উচ্ছেদ কখনই সঙ্গত নহে। সময় সময় রোগী মাথায় আইস্ ব্যাগ রাখিতে আদৌ ভালবাসে না—নেহাৎ বিরক্ত মনে করে; সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। জল দ্বারা মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে আরাম দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যাহাতে সে বিরক্ত হয় সেরূপ কাজ সহসা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে কিছুতেই করা সঙ্গত নহে। এই সব শেষ দেওয়ার পর মুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, উহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া নানাবিধ উপসর্গ আসিতে পারে। রোগীর শরীর বেশ করিয়া মোছাইয়া ও কাপড় চাকা দিয়া তবে দরজা জানালা খোলা উচিত। কিছুকালের জন্য একটা হাল্কা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া ভাল।

এই জ্বর বৃদ্ধির সময় রোগী অনেক সময় পিপাসায় কাতর হয়—ও একটু জল বা এক টুকরা বরফের জন্য অস্থির হয়। নিকটস্থ ব্যক্তিগণ উহা দিতে প্রায়ই ঘোর আপত্তি করেন, কিন্তু পিপাসার সময় একটু জল বা ছোট একখণ্ড বরফ দিলে কোনই ভয় বা দোষের কারণ নাই, বরং জ্বর ত্যাগ বিষয়ে সহায়তা করে। আবশ্যকমত অল্প পরিমাণে সোডাওয়াটার বা লিমনেড দেওয়াও চলে। ফিট বা জ্বর চমকের (Fits) কথা ইতি-পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা নানা প্রকারে হইতে পারে; সে কথার আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং ঐ সময়ে কি কি সাবধানতা লওয়া আবশ্যক কেবল মাত্র তাহারই উল্লেখ করিব। জ্বর চমক সাধারণতঃ বালক বালিকাদেরই বেশী হইতে দেখা যায়। ঐরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিবে মাথা জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে। ও পাখার হাওয়া করিতে থাকিবে। রোগীকে বেশী নাড়া চাড়া করিবে না। গলায় জামার বোতাম আটকান থাকিলে উহা খুলিয়া দিবে। সম্ভবতঃ ইহাতেই জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

জ্বরত্যাগে (Collapse.)

যেমন জ্বর বৃদ্ধির সময় ভয়ের কারণ আছে, সেইরূপ জ্বরত্যাগের সময়ও তাপ ৯৭° নীচে হইলেই আশঙ্কার কথা, তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর দিবে। যদি হাত পা ঠাণ্ডা লাগে ও তাপ কমের দিকে যাইতে থাকে ডাক্তারের জন্য বসিয়া না থাকিয়া ফ্ল্যানেল গরম করিয়া রোগীর হাত পা বেশ করিয়া সেকিবে।

শরীরটা বেশ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বোতলে গরম জল পূরিয়া উহা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দুই পায়ের ভিতরে ও বাহিরে রাখিয়া পা ঢাকিয়া দিবে। এইরূপ হাতের দু আশেও গরম জলের বোতল রাখিবে। বোতলের পরিবর্ত্তে রবারের ব্যাগেও গরম জল ভরিয়া রাখা যাইতে পারে। বোতলগুলির তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, যেন ফাটিয়া না যায়। সাধারণতঃ মদের বোতল, বা স্পিরিটের বোতল বা ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটারের (Distilled water) বোতলগুলিই ভাল। গরম জল পূরিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে—যখন বোতল

গরম হইয়া উঠিবে তখনও যদি না ফাটে তবে সম্ভবতঃ আর ফাটিবার আশঙ্কা নাই। বোতলের কাগ (cork) যাহাতে ভাল করিয়া বন্ধ হয় এবং খুলিয়া গরম জলে গা পুড়িয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ একই কারণে বোতলটি কাপড় বা ফ্ল্যানেল দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে এই সামান্য বিষয়ে সাবধানতা না লওয়াতে রোগীর গায় ফোস্কা প্রভৃতি পড়িতে দেখা গিয়াছে।

যদি বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয় তবে হাত পা ও শরীরের অন্যান্য স্থানে শুঁঠের গুড়া (Pulv Ginger) বেশ করিয়া রগড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘরে ব্রাণ্ডী (Brandy) থাকিলে উহা ৬০।৭০ ফোটা ½ ছটাক জলের সহিত মিলাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মৃগনাভী ২ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি মধু বা বেদানার রস সহ মাড়িয়া খাওয়াইতে পারা যায়। সময় সময় ২।১ চামচ করিয়া গরম দুধ দিতে পারা যায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য পরিচয়

ঝিনুকদ্বীপ সেঁ মেরে ৬১ বর্ষ।—পণ্ডিত তোতারাম বনাঢ্য প্রণীত। একদিন কবি গাহিয়াছিলেন :—

"দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
দীর্ণ, শান্ত, সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া করে॥"

আজ ভারতমাতা তাঁহার লক্ষ লক্ষাধিক সন্তানকে "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" করিয়া দিয়াছেন। তাহারা "দেশ দেশান্তর মাঝে" আপনার স্থান খুঁজিয়া লইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে। উল্লিখিত পুস্তকখানি ভারতের এই সন্তান যুদ্ধের জীবন যুদ্ধের বিবরণ। লেখক নিজে এই নির্ম্মম সংগ্রামের একজন যোদ্ধা। প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়েই বীরের শোণিতে ও শোকের অশ্রুতে দ্রবীভূত ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন গাহিয়াছিলেন :—

—"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা॥"

পণ্ডিত তোতারাম আশার বাণী ধ্বনিত করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, তিনি আমাদের বহু লক্ষ ভগ্ন, রুদ্ধ মূক কণ্ঠে ভাষা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নীরব অপমান আজ বিচারের প্রত্যাশায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন। পণ্ডিত তোতারাম এইজন্য প্রতি দেশবন্ধুরই নমস্য।

প্রশ্নপাল।—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক 'আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া তাঁহার দেশের অতীত ইতিহাসকে বর্ত্তমানের মত জীবন্ত করিয়া দাঁড় করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু এই পথ আংশিক অবলম্বন করেন।

কিন্তু শ্রীযুক্তরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরাপুরি ভাবে এই পথে অগ্রসর। তাঁহার ধর্ম্মপাল সেই পথ-অনুসরণেই নিদর্শন।

আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। প্রবাসীতে যখন ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই। ইহার ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আমরা ত ইতিপূর্ব্বে একরকম অজ্ঞই ছিলাম। দেশের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে ধর্ম্মপাল এখন অনেকটা আমাদের পরিচিত। সেই সব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে রাখালবাবুর আসন অতি উচ্চে। অতএব তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গল্পের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমাদের মত অবিশেষজ্ঞের বলিবার কিছু নাই। তবে তাঁহার লিখন পদ্ধতি, গল্প বলিবার ভঙ্গী, চরিত্রচিত্রন সম্বন্ধে দু এক কথা বলা যাইতে পারে।

পুরাতন কাহিনী বলিতে গিয়া রাখালবাবু পুরাতন ভঙ্গীই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনায় 'ওঠা নামা' নাই—সকল কথাই যেন এক সমতল ভূমির উপর দিয়া সমান চালে কুচ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে পাঠককে বড় ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। রসবৈচিত্র্যের জন্য লিখন বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে—পাঠক সেই বৈচিত্র্যটি পাইলে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহার হৃদয় কেমন নানা রকমে দোল খাইতেছে এবং তাহাতেই তাঁহার পাঠতৃপ্তি। রাখালবাবু এই তৃপ্তি হইতে পাঠককে বঞ্চিত করিয়াছেন। তবে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিলাইয়া তিনি যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মন্দ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু দাঁড়াইলেও এ কথা যেন বারবার আমাদের মনে হইয়াছে—গল্পটা অযথাভাবে দীর্ঘায়িত। ইহার অনেক স্থান কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে মন্দ হইত না। এবং দিলে বোধ হয় অতীতটা আরও জীবন্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিতে পারিত।

আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্মপালের চরিত্র যতখানি ফুটিয়াছে, আর কাহারও ততটা নহে। কিন্তু কল্পিত চরিত্রগুলির অধিকাংশই বেশ পরিস্ফুট। ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবই কি এই তারতম্যের কারণ? বিশ্বানন্দ, ভীমদেব, কল্যাণী ত্যাগস্বীকারে গ্রন্থের মধ্যে এবং পাঠকের অন্তরে উজ্জ্বল। রাখাল বাবু এই ধরণের চরিত্র চিত্রণ যত করিবেন—বাঙ্গালী ততই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

রাখাল বাবু যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বড়ই দুর্গম। পদে পদে নানারকমের বাধা। কিন্তু তিনি সে বাধা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। দেশবাসী শুষ্ক ইতিহাসের তত্ত্বকথায় ভিজিতে চায় না। রাখালবাবু গল্পের সাহায্যে দেশের অতীত ইতিহাসের সহিত দেশবাসীর পরিচয় সাধন করিতে প্রয়াসী। 'গৌড় রাজমালা' 'গৌড় লেখমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠক বঙ্গদেশে এখনও বিরল। কিন্তু আশা আছে, 'ধর্ম্মপাল' 'শশাঙ্ক' প্রভৃতির পাঠক দেশে কম হইবে না। বাঙ্গালী যদি তাহার অতীত বীর্য্য, অতীত শৌর্য্য, অতীত ধর্ম্মভীরুতা, অতীত উদারতা, অতীত ঐশ্বর্য্য জানিতে চাহে, তবে 'ধর্ম্মপাল' তাহার পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিসূচিকা দর্পণ।—ডাক্তার শ্রীসরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি প্রণীত। গৃহস্থ

পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙ্গালা ভাষায় ওলাউঠা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যতগুলি চিকিৎসাগ্রন্থ আছে, তাহাদের মধ্যে বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানি একটি শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার যোগ্য। ইহা ডাক্তার মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে রোগের নিদান, রোগ নির্ণয়-লক্ষণ, রোগ নিবারণের উপায় এবং চিকিৎসার্থে প্রযোজ্য ঔষধগুলির লক্ষণাবলী এবং তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা আছে। ওলাউঠা চিকিৎসা করিতে গিয়া যে সব স্থানে চিকিৎসকের মনে খটকা উপস্থিত হয়, ডাক্তার মহাশয় অতি সরল ও সুন্দর বিচারের দ্বারা সেই সব স্থান পরিষ্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠা চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করি।

শ্রীকমলা (হিন্দী)।—জানুয়ারী ১৯১৬। এই পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য নবীন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান করা। সকল সাময়িক পত্রেই লেখকের পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে প্রবন্ধাদি গৃহীত হয়। শ্রীকমলাতে গুণ অনুসারেই রচনা আদৃত হইবে।

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি
কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
: পরীক্ষ্যতত্ত্বং ভজতে মূঢ়ঃ
পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ।"

শ্রীকমলা কালিদাসের এই উক্তি শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। সুখের বিষয় নবীন লেখকগণের নবীনতার গন্ধ বড় উগ্রভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। বিশেষতঃ কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "ভারতকী হীনাবস্থা" শীর্ষক কবিতাটী একটী ছড়া ব্যতীত কিছুই নহে—রচনা বালক অনোচিত। "মুদ্রা রাক্ষসকা সময়" নামক প্রবন্ধটী সুপাঠ্য। কিন্তু লেখকের যুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। মুদ্রা রাক্ষসের নানা স্থানে "গুপ্ত," "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতির উল্লেখ আছে ও ভরতবাক্যে ম্লেচ্ছদিগের কথা আছে বলিয়া প্রবন্ধকার বলিতে চাহেন যে মুদ্রারাক্ষস ৪২০ খৃষ্টাব্দে রচিত। কালিদাসের সময় নির্ণয়ের জন্যও এইরূপ প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তক বিশেষের তারিখ নির্ণয় করা যায় না। চিত্রগুলির আমরা মোটেই প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

গীতাবিন্দু।—শ্রীবিহারী, লাল গোস্বামী প্রণীত। বিশ্বরূপ দর্শন অনুবাদের উদ্দেশ্য ভাবের পরিচ্ছন্ন পরিবর্ত্তন করা। এক আবরণের মধ্যে ভাববিশেষ একদেশে বা কালে যেরূপ আত্মপ্রকাশ করে যদি আবরণান্তরেও তাহার সেই তথ্য অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই বুঝিব যে অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে সকল ভাবেরই এইরূপ অনুবাদ সম্ভব নয়। দেশকাল ব্যত্যয়ে কেবল বিশ্বজনীন ভাবগুলিই অনুবাদ সত্ত্বেও বোধগম্য হয়। যদি কেবল বুদ্ধির উপরেই অনুবাদ বিচারের ভার থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অনুবাদই সার্থক হইত। কিন্তু কাব্যের যেমন একটা সৌন্দর্য্য আছে, একটা æsthetic quality আছে, ভাষারও সেইরূপ। কাজেই ভাষান্তরে যদি এই

সৌন্দর্য্যটুকু রক্ষিত না হয় তবে ভাবটী পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিব না।

যে মাপকাটী দিয়াই বিচার করি'না কেন গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদকে perfect translation বলিয়া মানিয়া লইতে আমাদের কোনও দ্বিধা নাই। ইহা গীতার শ্লোকগুলির কেবল ভাবানুবাদ হয় নাই। ভাবের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক পাদের সহিত অনুবাদের প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক লাইনের মিল আছে। এরূপ ভাষা চাতুর্য্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের ছন্দের চাতুর্য্যও অসাধারণ। উপজাতি ছন্দকে অবশ্য তিনি উপজাতি ছন্দে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে উপজাতির মাধুর্য্য—পূর্ণভাবে বিদ্যমান আমরা দুই একটী উদাহরণ দিতেছি,

"লেলিহসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রা প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

"অনল-ঝলনা লেলিহ রসনা
মেলিয়া সকল দিশে
তোমার বদন বিশ্বের জন
নিঃশেষে গরাসিছে
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ
তেজে যে উঠিল ভরি
উগ্র-ঝলক সমগ্র লোক হৃষ্টি ছুটিল, হরি!"

নভস্পৃশং দীপ্তমনেক বর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥"

গগনে লিপ্ত যুগতি দীপ্ত রঞ্জিত বহু ধারা,
বিবৃত বদন বিশাল লোচন—
জ্বলিছে উগ্রতারা!
তোমারে নেহারি চিত্ত আমারি
ব্যথায় উঠিছে ভরি,
ধৈর্য্য না পাই, শান্তিও নাই,
কোথায় দাঁড়াই হরি!

আমরা এই অনুবাদকে নিঃসঙ্কোচে গীতার এই অংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

মফঃস্বলের বাণী

১। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন

ইংরাজীতে একটী কথা আছে যে,—The Nation lives in cottages অর্থাৎ পর্ণকুটীর সমূহই জাতির বাস-গৃহ। কথাটী যে খুবই খাঁটী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা গলবাজী বা লিপি কণ্ডূয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কাযের বেলায় উক্ত খাঁটী কথাটী ভুলিয়া যান। এই যে আমাদের জাতীয় উন্নতিকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দিন দিনই ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছে, ইহার একমাত্র কারণ সমগ্র জাতিকে লইয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে

পারি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র সহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে লইয়াই আমরা আমাদের জাতীয় জীবন বুঝিব এবং সেই মুষ্টিমেয় জন-সংখ্যার উন্নতি-অবনতির তারতম্যানুসারেই জাতীয় জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিব, ততদিন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিব না—নিজে নিজকে প্রতারণা করিব মাত্র।

পৃথিবীর সমগ্র উন্নত জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস একবাক্যে স্বীকার করিতেছে যে দেশের আপামর জন-সাধারণের হৃদয়েই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত এবং যে দেশের জন-সাধারণ যে পরিমাণে আত্মোন্নত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ সে দেশ তত উন্নত ও সভ্য। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা দেশের জনসাধারণের কথা ভুলিয়া যাই। এই জন্যই আমাদের জাতির জীবনী শক্তি এত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। দেশের জনসাধারণকে এড়াইয়া চলা ও অবজ্ঞা করাই যেন আমাদেরই স্বভাব, অথচ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ঠিক তাহার বিপরীত। তাহারা চায় জনসাধারণের সাহচর্য্য ও সহযোগিতা এই জন্যই তাহাদিগের জাতীয় জীবন এত উন্নত। নগণ্য কুলি-মজুর হইতেও যে একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মবীরের উদ্ভব ও আবির্ভাব হইতে পারে পাশ্চাত্য দেশে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনী শক্তির ইহাই এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

দেশবিখ্যাত স্বর্গগত মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ যখন আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ব্যাগবাহী একজন কুলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে,—"আপনি কোন্ দেশের লোক?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবাসী।" কুলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি—যে, ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটী লোকের বাস; কিন্তু মহাশয় জিজ্ঞাসা করি,—আপনারা সর্ব্ব প্রকারে এত পরাধীন কেন?" মনোমোহন এই কথায় বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি বেশ লেখাপড়া জান। কিন্তু তুমি কুলির কার্য্য করিতেছ কেন?" কুলি উত্তর করিয়াছিল,—"মহাশয়, আপনি আজ দেখিতেছেন, আমি কুলী—কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, হয়ত যে দিন শুনিবেন,—আমি যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা বা প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি।" তাই বলিতেছিলাম,—জাতীয় জীবনে যদি প্রাণ থাকে, তবে এই সব জাতিরই আছে,—ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির মত জাতি। অধঃপতিত ও জীবনীশক্তিবিহীন বাঙ্গালী আমরা—শুধু বৃথাই জাতীয়তার অভিমান করি! পৃথিবীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বস্তুতঃই বাঙ্গালী জাতি মৃত! সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিরই জাতীয় জীবন সমুন্নত হইতে পারে না। এই তিনের উন্নতিতেই জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা,—আর এই তিনের অবনতিতেই জাতির মৃত্যু বা অধঃপতন বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনেরই অভাব পূর্ণমাত্রায় আমরা অনুভব করিতেছি। মনে হয়, এই তিনের অভাব পূর্ণ হইলেই বুঝি আমরা একটু মানুষের মত মানুষ হইতে পারিব, দশ জনের নিকট একটী জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব।

বাস্তবিক এখন আমাদের সেই সোনার বাঙ্গালার অবস্থা নানাদিকেই অত্যন্ত আশঙ্কা-

অনক। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল—সমাজপতিগণ নীরব নিস্পন্দ। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের উদ্দেশেই বুঝি দেশান্তরিত হইয়াছে! অন্ন, অন্ন, মড়ক দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষাভাবে দেশবাসীর জীবন সংগ্রাম ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। বঙ্গের সাগরাম্বর ও কাননকান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়া দরিদ্রের কোটীকণ্ঠে হাহাকার উঠিতেছে। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদন ব্যাদন করিয়া লোক ক্ষয় করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের সোনার পল্লীসমূহ ছারখার হইতেছে। মহামারী হবিপুষ্ট হুতাশনের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া বঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কত ধনী, বিলাস-ব্যসনের মাত্রা বৃদ্ধি বই হ্রাস করিতেছে না; কত জ্ঞানী তাহার পুঞ্জীকৃত জ্ঞানরাশি লইয়া জড় ভরত সাজিয়াছেন,—কত মানী মান রক্ষার্থ আপনারই কর্ত্তিত কর্ণ সযত্নে কেশাবৃত করিয়া চলিতেছেন! তাই বলিতেছিলাম,—বাঙ্গালীর যদি জাতীয় জীবন থাকে,—তবে মৃত কে?

ভাই বাঙ্গালী,—যদি বাঁচিতে চাও,—যদি পৃথিবীতে আপনার নাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও—সমগ্র দেশবাসীকে আপনার ভ্রাতা জ্ঞান কর। যদি নিজে বাঁচিতে চাও—ভাইকে আগে বাঁচাও। মনে করিতে শিখ,—দেশের আপামর জনসাধারণ তোমার ভাই,—দেশের চাষা ভূষা মুচী মেথর সব তোমার ভাই। সমগ্র দেশবাসীকে লইয়া সমগ্র কুটীরবাসী দরিদ্রকে লইয়া আমাদের জাতি—জাতীয় জীবন আপামর জনসাধারণের হৃদয় লইয়া। ভাই বলি ভাই, কায়মনোবাক্যে ভ্রাতৃসেবক ও মাতৃসেবক হও; ইহাই জাতীয় জীবন—ইহাতেই জাতীয় জীবনের প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

২। রেশম-শিল্প

অধুনা বঙ্গদেশে সমস্ত শিল্পেরই অধোগতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের রেশমের বস্ত্র এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আদরের সামগ্রী ছিল। সেই শিল্পের এরূপ বিলোপ সাধন হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের অর্থাগমের এই উপায়গুলি সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে দেশের হাহাকার ও অন্নকষ্ট কিছুতেই দূর হইতে পারে না। "বীরভূমবাসী" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সংপ্রতি একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বঙ্গের পণ্যসম্ভারের ভিতর বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্র একদিন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর সভ্যমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইত। মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশীয়দিগের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ ও বীরভূম রেশম ও রেশমীবস্ত্র জল ও স্থল পথে পরিচালিত হইয়া সহস্র ধারায় এই কয়েক জেলার অধিবাসীদিগের ধনাগার পরিপূর্ণ করিত। যখন ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি কাশিমবাজারে রেশমী কুঠি খুলিয়া উহার বহির্ব্বাণিজ্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেদের হাতে লইয়াছিলেন তখনও বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্রের ব্যবসায় বিশেষ শোচনীয় ছিল না। ইংরাজরাজ্য সংস্থাপনের পর যখন ইংরাজ বণিকগণ স্থানে স্থানে রেশমী কুঠি খুলিয়া গুটীপোকা হইতে কাঁচা রেশম প্রস্তুত করিবার কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, তখন দেশীয় বণিকগুলি অধোগতি হইতে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে রেশমসূত্র প্রস্তুত কার্য্য উক্ত

কোম্পানীর হাতে পড়ে। মার্শেল কোম্পানী ময়ূরাক্ষী নদীর তীরস্থিত গন্ধুটিয়া গ্রামে এক বিরাট রেশমী কুঠি সংস্থাপন করিয়া গুটি-পোকা হইতে রেশম তুলিবার ব্যবস্থা করেন। ময়ূরেশ্বর থানার অধীন কেটসুর, তারাপুর এবং নলহাটীর অধীন ভদ্রপুরে উহাদের শাখা কুঠি সংস্থাপিত হয়। সকল কুঠিতে বহুদিন ধরিয়া কার্য্য চলে। দেশীয় রেশম তোলা কলগুলির কার্য্য বন্ধ হয়। এবং উক্ত কোম্পানী রেশমতোলা কার্য্যে সকল স্থানে অগ্রসর হন। যদি উক্ত কুঠি সংস্থাপনে দেশীয়গণের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছিল ও কাঁচা রেশম প্রস্তুত বণিকদলের হস্তে পতিত হইয়াছিল তথাপি পলু পোকা পুষিয়া উহারা কম অর্থ প্রাপ্ত হইত না। উক্ত বণিকগণ বীরভূমের কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সুবর্ণবর্ণ রেশম কোষ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সূত্র উৎপন্ন করিত ইহাই কাঁচা রেশম নামে কথিত। সাধারণতঃ বীর-ভূমের উৎপন্ন গুটীপোকা হইতে গুটী আনাইয়া রঙ্গের সময় অতিবাহিত হইলে উহা হইতে রেশম প্রস্তুত করিতেন। এই রেশম শিল্প হইতে যে অর্থ উৎপন্ন হইত বীরভূমের কৃষকগণ তাহার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই এই রেশম কীটের খাদ্য তুঁতপাতা।

এই তুঁতপাতের চাষ বীরভূমের অধিবাসী-গণের এক লাভবান চাষরূপে পরিগণিত ছিল। এক বিঘা জমির চাষ করিয়া ১৫০। ২০০ টাকা লাভ বৎসরে সকল কৃষকেই প্রাপ্ত হইত। বৎসরের মধ্যে প্রধান চারি মাস পলুর চাষের সময়। প্রথম বন্দ আষাঢ় বা শ্রাবণ। ২য় বন্দ কার্ত্তিক। ৩য় বন্দ পৌষ শেষ চৈত্র এই চারিমাসে বীরভূমের প্রত্যেক পল্লী মুড়ার ঝণঝণ শব্দে নিয়ত প্রতি-ধ্বনিত থাকিত।

বসোরা, বিষ্ণুপুর, কড়িধা প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর তাঁতির বাস। উহারা দেশীয় কলের প্রস্তুত, কাঁচা রেশমে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইত। উহাদের একদিন সৌভাগ্যের সীমা ছিল না উহারা অষ্ট্রালিকায় বাস করিত। উহাদের প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। লণ্ডনের বাজারেও উহাদের প্রস্তুত রেশমী থান সমাদরে বিক্রিত হইত। বিষ্ণুপুর ও বসোরার অনেক মহাজন উহাদের নিকট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লণ্ডনে চালান দিতেন। এবং প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইতেন। একদিন রেশম শিল্পে বীরভূমের এত সৌভাগ্য ছিল। ধান্য বিক্রয় করিয়া কাহাকেও খাজনা দিতে হইত না। যাবতীয় নৈমিত্তিক ব্যয় নিত্য-ব্যয়ের অধিকাংশ কৃষকগণ রেশমীশিল্প ও তুঁতপাতের চাষ হইতে সংগ্রহ করিত। আজ প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল হঠাৎ উক্ত মার্শেল কোম্পানি তাঁহাদের কুঠি গুলিকে তুলিয়া দিয়াছেন। উহাদের শুভাগমনে প্রাচীন কালের রেশমতোলা কলগুলি নির্ম্মূল হইয়া-ছিল এমন সাহেবদের কুঠি উঠিয়া যাওয়া ক্রেতার অভাবে গুটিপোকা অবিক্রীত রহিল। সুতরাং দুই চারিবার ক্ষতি সহ্য করিয়া কৃষকেরা উক্ত লাভজনক ব্যবসা গুটি প্রস্তুত কার্য্যে বিরত হইল। পলুর চাষ বন্ধ হওয়ায় তুঁতপাতা বিক্রয় হইল না, কৃষকগণ উহার চাষ তজ্জন্য বন্ধ করিয়া দিল। যে গ্রামে পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমিতে তুঁত উৎপন্ন হইত এখন তথায় ২।৩ বিঘা তুঁতের জমি আছে কি না সন্দেহের বিষয়। পূর্ব্বে যে গ্রামে ১০০ শত ঘর তাঁত মানুষ ঘুঙুরের ঝন্ ঝন্ শব্দে

নিয়ত প্রতিপন্থিত হইত তথায় এখন ১০ খান তাঁত চলে কিনা বলা যায় না। সুতরাং ১০।২০ বৎসর পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই রেশম শিল্পে ক্রমশঃ ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। এইরূপ দ্রুত অবনতি দৃষ্টে অনুমীত হয় উক্ত শিল্পের বুঝি একবারে নাশের আর বিলম্ব নাই। এই রেশম-ব্যবসা যাহাতে একবারে লোপ না পাইয়া আবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে এবং কি করিলে বীরভূমে আবার উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের দয়াবান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় চিন্তা করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ত্রিপুরা হিতৈষী

৩। বর্ত্তমান শিল্প সমস্যা

স্বদেশীর প্রারম্ভ হইতেই আমরা আমাদের দেশে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি; এই আকাঙ্ক্ষার ফলে গত কয়েক বৎসর মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে যৌথ পদ্ধতিতে কতকগুলি মিল ও কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমূহের দ্রুত পতন ও পতনোন্মুখতা আমাদের মনে এক আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়াছে, যে পথ আমরা বুঝি ঠিক ধরিতে পারি নাই। কেহ আমাদের সততার অভাব কেহ বা যথেষ্ট মূলধনের অভাব ইত্যাদি যিনি যে দিক দিয়া পারেন আমাদের এই নবীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সব দিক দেখিয়া কারণ নির্দ্ধারণ ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় অনেকের বিলাতী ধরণে শিল্প প্রতিষ্ঠায় যতগুলি অন্তরায় আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি তন্মধ্যে (১) যথোপযুক্ত মূলধনের অভাব (২) বিশেষ প্রত্যাগত যুবকবৃন্দের ভারতীয় কাঁচা মালের (raw materials) সন্ধান ও ব্যবহারের অনভিজ্ঞতা (৩) দেশীয় মজুরগণের কল ইত্যাদির অভিজ্ঞতার অভাবে বিদেশীয় মজুরের ন্যায় বিচক্ষণতা ও কর্ম্মপটুতার অভাব (৪) অন্যায় বাণিজ্য নীতির ফলে বৈদেশিক বিষম প্রতিযোগিতা ও তন্নিবারণে ভারতগবর্ণমেণ্টের একান্ত ঔদাসীন্য এবং কাহারও কাহারও মতে বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের স্ব স্ব কার্য্যে জ্ঞানের অপর্য্যাপ্ততাই সর্ব্বপ্রধান। আমরা এতদিন যে পথ ধরিয়া চলিয়াছি সেই পথে কৃতকার্য্যতা লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর; অথচ এই শিল্পসমস্যার যথাযথ সমাধান ব্যতীত জাতীয় জীবনে উন্নতির পথে কোন স্থায়ী ফললাভের আশা বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের কৃপার উপর যে জাতির লজ্জা নিবারণের জন্য একান্ত নির্ভর, লিখিবার কালী কলম, পড়িবার পুঁথি—আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন ও বিলাসের সামগ্রী যখন পরে না যোগাইয়া দিলে আমরা একান্ত নিরুপায় তখন এই পরমুখাপেক্ষিতা না ঘুচিলে যে আমরা কি করিয়া নিজের পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইব তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

এই বিষয়ে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে পাশ্চাত্য কবির অমর বাক্যটী স্মরণ রাখিতে হইবে "Humanity is a being" বিশ্বমানব ও জীব ধর্ম্মাক্রান্ত; অতএব প্রত্যেক মানব সমাজ ও এই জৈব নিয়মের (organic law) অধীন। জীব জগতে যেমন প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের ইতি-

হাসের পশ্চাতে তাহার দূর অতীতের ইতিহাসের একটা অস্পষ্ট ছাপ থাকিয়া যায় তেমনি, সমাজও অতীতকে একান্ত ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব ভবিষ্যত চেষ্টার প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিতে হইলে, এই বিলাতীর ঢেউ আসিবার পূর্ব্বে কোন পথে ও কি উপায়ে আমাদের পূর্ব্বতন শিল্প-ব্যবসায়গুলি পরিচালিত হইত তাহা একটু দেখা আবশ্যক। প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ে মূলধনের কোনই প্রয়োজন হইত না। আজ সুইজার-লণ্ডের কৃষকবর্গ যে সমবায়-পদ্ধতির আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া বিপুল অর্থশালী মিলওয়ালাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ভারতের সমাজ-গঠন-চাতুর্য্যে এই সমবায়-ভারতের শিল্প ও কৃষকবর্গের মধ্যে স্বভাবতঃই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমবায়-পদ্ধতির-স্বরূপ একান্নবর্ত্তি পরিবার-প্রথা। অন্ন হিসাবে যতই ভাল বা মন্দ হউক না কেন, শিল্প ও কৃষি ব্যবসায় হিসাবে এই একান্নবর্ত্তি পরিবারপ্রথা ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। আজ পাশ্চাত্য দেশে শ্রমজীবিগণ (Labour) ও মূলধন ওয়ালাদের (Capital) মধ্যে যে গৃহকলহের যুদ্ধ চলিতেছে ভারতে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় নাই। ভারতের এই সমাজগঠনবিশিষ্টতার শেষ কঙ্কাল আজ শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের দুই এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কপালি ও নমশূদ্র জাতি মধ্যে এক পরিবারভুক্ত শতাধিক পোষ্য দেখিয়াছি; তাহাদের কৃষি-ব্যবসায়ে পয়সা দিয়া দিনমজুর নিযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই অতএব মূলধনেরও কোন আবশ্যকতা নাই। পুরাকালে শিল্প ব্যবসায়ও এই পদ্ধতিতেই চলিত; অতএব কাঁচা মাল খরিদের পয়সা ব্যতীত ব্যবসায়ীর অন্য কোন প্রকার মূলধনের আবশ্যক হইত না। বহু শত বৎসর যে জাতির শিল্প ব্যবসায়ে মূলধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই সেই জাতির ব্যবসায়ীবর্গ একটা বিলাতী পদ্ধতি আমদানী করা হইয়াছে বলিয়াই সেখার কিনিতে মুক্তহস্ত হইয়া বসিবে এমন আশাটা কিছু নিতান্ত দুরাশা নহে কি? অতএব এইদেশে কোন প্রকার সফলতা লাভ করিতে হইলে দশ বিশ লাখের হাঁক ছাড়িয়া দশ বিশ হাজারে নামিতে হইবে। ইহার পরীক্ষা যে কতকটা না হইয়াছে তাহা নহে; নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মূলধনের অভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, কিন্তু লোন আফিসগুলি অতিসহজ গতিতেও এত সহজে গড়িয়া ওঠে যে দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। অল্প মূলধন লইয়া কাজ করিতে হইলে বড় বড় সহর ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় গুলির কতকটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা যে না হইবে তাহা নহে। দেশী ও বিলাতী মালের প্রতিযোগিতা বড় সহরে যেমন পল্লীতে ততটা নহে। হাটুর উপরে ওঠা মোটা তাঁতের কাপড় আজও পল্লীগ্রামের বাজারে একান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। শিল্প প্রথাগুলি বিলাতীর বহু নকল না হইয়া যদি কতকটা দেশকালোপযোগী করা যায়, তবে কারিকরের কর্ম্মের অপটুতা নিয়াও এতটা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না এবং কাঁচা মাল সংস্থানের অসুবিধা দেশী জিনিষ নিয়া পরীক্ষার ফলে, আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে, একেবারেই থাকিবে না।

এখন সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য পথ কি ও লোক কোথায়? পথ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই

যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বৃহৎ মিল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা স্থগিত রাখিয়া ১০।২০ হাজারের কারখানা গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে দেশে মূলধন প্রকৃতপক্ষে খাটিবে অনেক বেশী কিন্তু সংগ্রহের জন্য মোটেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। পরন্তু ব্যবসায়গুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িলে দেশের জনসাধারণে কোন না কোন প্রকারে ইহাতে যোগ দিতে পারিবে। ইহাও আমাদের পক্ষে কম লাভের কথা নয়। এই চেষ্টার ফলে হয়ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটা বাড়িয়া উঠিবে, কারণ কারখানায় কাজ করিতে নোটিশ ইত্যাদি পড়িতে সামান্য অক্ষর জ্ঞানও এত সাহায্য করে যে তখন প্রয়োজন বোধেই অনেক লোক শিক্ষা লাভের জন্য অগ্রসর হইবে। আগ্রহের ফলে ব্যাপারও অনেক সহজ হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ লোক—দুই শ্রেণীর লোকের আবশ্যক,—যাঁহারা সমুদয় উদ্যোগ করিয়া পরীক্ষার কর্ম্মটা সমাধা করিয়া দিবেন এবং যাঁহারা এই পরীক্ষা কার্য্যে স্ব স্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগে নিযুক্ত থাকিবেন। প্রথম দল বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সভার ন্যায় একটী সমিতি গঠন করিয়া পরীক্ষার ব্যয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়াদির ব্যবস্থা করিবেন এবং দ্বিতীয় দল স্ব স্ব বিশেষ বিদ্যা বা বিশেষ উদ্ভাবনী প্রতিভা দেশ ও কালোপযোগী করিয়া শিল্প নির্ম্মাণ কৌশল উদ্ভাবনে নিয়োগ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অভাব হইবে না আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি; অভাব যা আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহের। ফল লাভ কতটা করা যাইবে পরীক্ষার পূর্ব্বে বলা যায় না; কিন্তু পথ যখন আর নাই তখন একবার চেষ্টা করিয়া জানা বোধ হয়, নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেন্সাপিয়ার ও মিল্‌টন তৈয়ারের কাজটা যদি আপাততঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া এই শিল্প-সমস্যা সমাধানে একটু মন দেন, তবে অল্প সময় মধ্যেই এই প্রকার একটী সমিতি গড়িয়া তোলা কষ্টকর হইবে না। অন্তর্দ্ধি ব্যতীত দুরন্তর্দ্ধি কখনই হইতে পারে না।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

৪। সাবাস ছাব্বিশ

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হিন্দু প্রজাদের সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার দান করিয়াছেন, এবং ছাব্বিশ জন হিন্দু ফরাসীপ্রজা ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশের জন্য আবেদন করিয়াছেন,—এ কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। চন্দননগরের বড় ডাক্তার তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা সৈন্যদলে প্রবেশের যোগ্য কি না। এই পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদিগকে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। গত রবিবার বেলা নয় ঘটিকার সময় তাঁহাদিগকে চন্দননগরের 'আরগেন্ হাসপাতালে' যথারীতি পরীক্ষা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত আঠার জন সৈনিককে শীঘ্রই পণ্ডীচেরীতে প্রেরণ করা হইবে; সেখানে তাঁহারা ফরাসী সৈন্যদলে যোগদান করিবেন। ইহাই ফরাসী গবর্মেণ্টের প্রথম হিন্দু সৈনিকগণ।

ভারতে ফরাসী গবর্মেণ্টের সহস্র সহস্র হিন্দু-প্রজা আছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের গবর্মেণ্টের নিকট এই বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সহস্র সহস্র হিন্দুপ্রজার মধ্যে ছাব্বিশ জনের অধিক হিন্দু এই মহাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ইউরোপের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার সুযোগের

সম্ভাবহার করিবেন না। প্রথমদৃষ্টিতে ইহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও, সৈনিকপদপ্রার্থী হিন্দু ভলন্টিয়ারগণের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। আমাদের দেশের একদল স্থূলদর্শী লোক ইহা হিন্দুর ভীরুতা ও অপদার্থতার নিদর্শন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না; সংবাদপত্রে নির্লজ্জের মত বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে;—কিন্তু এই সকল স্থূলবুদ্ধি পল্লবগ্রাহীর দল একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না,—এই প্রকার আত্মোৎসর্গে কি পরিমাণ সাহস, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাংসারিক সুখের প্রতি আসক্তির অভাব পরিব্যক্ত হইতেছে। স্বদেশ, আত্মীয়স্বজনগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারের মায়ামমতা কাটাইয়া, সকল সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, দেশান্তরে —কোনও অপরিচিত প্রদেশে, ভিন্ন দেশবাসী, অন্যধর্ম্মাবলম্বী, অপরজাতীয় মিত্র সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। তাহার শেষ ফল কি, কাহারও অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই। পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশা আছে কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং স্বদেশে ফিরিতে পারিলেও কয়জন অক্ষতদেহে, কর্ম্মক্ষম অবস্থায় দেশে ফিরিবেন, তাহা একমাত্র মহাকাল ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত। এ অবস্থায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে ছাব্বিশ জনের অধিক এই দুষ্কর ব্রত গ্রহণ করিল না কেন, বলিয়া যাহারা হিন্দুর কাপুরুষতাকে ধিক্কার দান করিতেছে, তাহারা কৃপার পাত্র। যদি তাহারা স্বয়ং সৈন্যদলে প্রবেশপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে উৎসাহিত করিবার অবকাশ পাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে সম্মান করিতাম, এবং তখন তাহারা অন্যকে এই সুযোগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তাহা ধৃষ্টতা মনে করা হয় ত সঙ্গত হইত না; কিন্তু যাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই, যাহারা ত্যাগের সহস্র সুযোগ হেলায় হারাইয়া অন্যকে আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত দেখিয়া খবরের কাগজে তাহা ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছে, তাহাদের জ্যাঠামী, পাকামী ও ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার কি?

কিন্তু যে ছাব্বিশ জন সৈন্যদলে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরা কি বলিয়া তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিব, তাহা জানি না। তাঁহারা দেশের অলঙ্কার, হিন্দুজাতির গৌরব। তাঁহারা আমাদের দুর্নাম দূর করিয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত কেবল ফরাসী গবর্মেণ্টের নহে, বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহস্র সহস্র হিন্দুপ্রজাকেও আত্মোৎসর্গে উৎসাহিত করিবে, এবং সুযোগ পাইলে সহস্র সহস্র হিন্দুবীর স্বদেশের গৌরববর্দ্ধনের জন্য যে হিন্দু কৌজের সৃষ্টি করিবেন, —তাহা কালে সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভে পরিণত হইবে, এ আশা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক নহে। আত্মদান, আত্মোৎসর্গ, জীবনের মায়া-বিসর্জ্জন আদর্শসাপেক্ষ। সে আদর্শ এ দেশে সুলভ নহে; ছাব্বিশ দূরের কথা, ছয় জন ভারতীয় হিন্দুও যদি এই আদর্শ দেখাইতেন, তাহা হইলেও আমরা আশান্বিত— পুলকিত হইতাম। বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র, তাহা হইতে কত ক্ষুদ্র অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা দেখিয়া কেহ কি কখনও কল্পনাও

করিতে পারে—তাহা কালে সহস্র পাপীর গৃহ, পাপের আশ্রয়, ঝটিকায় প্রতিষ্ঠা মহামহীরুহে পরিণত হইবে?

আমাদের আশা আছে, আমরা বিশ্বাস করি, যে ছাব্বিশ জন এই পৃথিবীব্যাপী মহানরমেধযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারাই ফরাসী গবর্মেণ্টের হিন্দু সৈনিকের শেষ দল নহেন। এই প্রকার সদিচ্ছা, এইরূপ আত্মোৎসর্গ, সাহস ও বৈর্য্য পৃথিবীতে কখনও বৃথা হয় না। ত্যাগের তিলক আবার হিন্দু জাতির গৌরবদীপ্ত ললাট উজ্জ্বল করিবে। মনে পড়ে কি, যে দিন সর্ব্বপ্রথম মেডিকেল কলেজের হিন্দু ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে দিন কেমন তোপধ্বনি হইয়াছিল? তাহার পর এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুসমাজের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! এখন মেডিকেল কলেজে হিন্দু ছাত্রের স্থান হয় না, অনেকে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিয়াও সুবিধা পাইতেছেন না। তাই বলিতেছি, প্রথম আহ্বানমাত্র হাজার হাজার হিন্দুকে যুদ্ধার্থ আত্মনিয়োগ করিতে না দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ বা ব্যথিত হইও না; ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর, ক্রমে তাহাদের সংখ্যা পুষ্ট হয় কি না? বেঙ্গল এম্বুলান্স কোরের সেবক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য, সাহস, ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চক্ষু মেলিয়া দেখ। তুচ্ছ সংসার সুখ অপেক্ষা মহত্তর সুখের জন্য যাঁহারা আগ্রহবান্, তাঁহারা কোনও দিকে না চাহিয়া এই পথের পথিক হইয়াছেন, ইহা গড্ডালিকা-প্রবাহের কার্য্য নহে। আমরা যাঁহাদিগকে সংসারজ্ঞানহীন, নিষ্কর্ম্মা, লক্ষ্মীছাড়ার দল মনে করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদে স্ফীত হই—তাঁহারাই এই স্বদেশের গৌরবসূচক আত্মোৎসর্গে প্রবর্ত্তক, এরূপ নিষ্কর্ম্মা লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যা এ দেশে বিরল নহে; আমরা টাকা আনা পাই ও লাভ-লোকসানের হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারি, কিন্তু দেশের নাম ইহারাই রাখিতেছেন এবং রাখিবেন। আমাদের জাতীয় জীবনের শূন্যতাভারে যদি কিছু সফল করিবার আশা থাকে, তবে ইহারাই আমাদের সে আশা পূর্ণ করিবেন। সংসারতাপক্লিষ্ট, দৌর্ভাগ্যপঙ্ক, জীবনের মায়ায় চিরবিমুখ, নানা অপমানে সদা জর্জ্জরিত, ঘৃণিত বলিয়াই গণ্য যাহারা এই মহৎ সংকল্পসিদ্ধির আশা নাই। হে অন্ধকারভারতাকাশের নবীন ভাস্করবৃন্দ! তোমরা আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

বাঙ্গালী

৫। পল্লী সমস্যা।

(প্রথম প্রস্তাব)

কি দেখিতেছি? দেখিতেছি জীবনমরণ ও দরিদ্রতার সহিত নিরন্তর কঠোর সংগ্রাম। নিরীহ পল্লীবাসী সে সংগ্রামে ক্ষত, বিক্ষত ক্লান্ত ও পরাজিত—নিরাশ্রয় ও নিরুপায়। নিরাশ্রয় ও নিরুপায় পল্লীবাসীর যে শোচনীয় চিত্র অবলোকন করিতেছি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না।

কি দেখিতেছি? দেখিতেছি পল্লীর প্রতি পরিবার রোগে শোকে ক্লিষ্ট, পল্লীর চক্ষুঃপ্রান্ত পীড়িতের হাহাকারে মুখরিত—মুখে জলটুকু দেওয়ার লোক নাই—'কেমন আছ' প্রকৃত সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিবে এরূপ একজন প্রতিবেশী নিকটে নাই—ডাক্তার কবিরাজ নাই, থাকিলেও দরিদ্র কৃষক তাহাকে অর্থ দিয়া ডাকিবে এরূপ সাধ্য নাই। ক্ষেত্রের স্বর্ণশস্য—হৃদয়ের শোণিত বিনিময়ে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা

মহাজনের ঋণ ও জমিদারের খাজনা দিতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। পরিধানে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই। ইহাই পল্লী জীবনের বাস্তব চিত্র।

কবিত্বের উচ্ছ্বাসে আমরা কতকগুলি অতিরঞ্জিত কথা বলিতেছি না—যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। শতবার ভাবিয়াছি কি করিয়া পল্লীভূমির এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে, কি করিয়া আমাদিগের সাধের পল্লীজননীর অধরে হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিতে পারা যাইতে পারে। ভাবিয়াছি—যাহা ভাবিয়াছি তাহাই বলিতেছি দেশের লোক তাহার গুরুত্ব অনুভব করুন।

আমাদিগের বিরুদ্ধে বিলাসিতার অভিযোগ আনিও না, আমরা কে? দুই চারিজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত জনসংঘ লইয়া আমাদিগের আমিত্ব গঠিত হয় নাই। ঐ লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লইয়া আমাদিগের আমিত্ব—আমাদিগের গৌরব—উহারাই আমাদিগের আশ্রয়। উহাদিগেরই মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত আছে। এই দীন-দরিদ্র নিরাশ্রয় পল্লীবাসীর বিরুদ্ধে আর যাহা ইচ্ছা বলিতে পার কিন্তু বিলাসিতার অভিযোগ আনিও না। বৎসরের মধ্যে একটী মেলা ও একটী উৎসব উপলক্ষে যদি সে একখানি ভাল বস্ত্র একখানি চারি পয়সার আয়না চিরুনী ও দুই পয়সার খেলেনা ক্রয় করিয়া থাকে তবে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, উহাকে বিলাসিতার সংজ্ঞা প্রদান করিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক আনিও না। যতদিন ঘোর অজ্ঞতান্ধকার দেশের সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে যতদিন শিক্ষিত সমাজ অশিক্ষিতের আদর্শ না হইবেন ততদিন এই দুই চারি পয়সার অপব্যয় রোধ করিতে পারিবে না। তোমরা যেখানে পাঁচ শত টাকা অপব্যয় করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর সেখানে দরিদ্র কৃষক পাঁচ পয়সা ব্যয় করিয়া একটু আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। অপরাধ কাহার?

আমাদিগের প্রধান ও প্রথম সমস্যা দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতার প্রতিকার করিতে না পারিলে আমাদিগের পল্লীভূমি বিজন শ্মশানে পরিণত হইবে—আমাদিগের 'সাধের স্বপন' আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে—আর ইহাও নিশ্চয়, রাজসহায়তা ব্যতীত এই দারিদ্র্য সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না।

দারিদ্র্যসমস্যার নিরাকরণের প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায় আছে :—

১ দেশের অর্থ সম্পদের বর্দ্ধন।
দেশের অর্থ দেশে সংরক্ষণ।
৩। বিদেশ হইতে অর্থ আনয়ন।

এই কয়েকটী প্রত্যক্ষ উপায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি অপ্রত্যক্ষ উপায় আছে। প্রথম প্রত্যক্ষ উপায় কয়েকটীর আলোচনা করিব। আমরা দেখাইব রাজসহায়তা ব্যতীত উল্লিখিত কোন উপায়ই কার্য্যকরী হইতে পারে না—দেশের দারিদ্র্য মোচনে সক্ষম হইতে পারে না—দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে রাজসহায়তা অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য প্রজারও সাহচর্য্য প্রয়োজন—সে সাহচর্য্যের কথা অনেকবার বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আবারও বলিব। কিন্তু যেখানে রাজার মঙ্গল হস্ত প্রজার কল্যাণসাধনে নিরত হইতে পারে—নিরত হওয়া অত্যাবশ্যক, আমরা এইখানে তাহারই আলোচনা করিব।

দেশের অর্থ সম্পদ বর্দ্ধনের প্রধান উপায় কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন—উপযুক্ত অর্থ

সাহায্য ব্যতীত ইহার কোন্‌টীই সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রথমতঃ কৃষির কথা—বিবেচনা করা যাউক। ভারতের—বঙ্গদেশের—অগণিত প্রজা সাধারণতঃ এরূপ নিরন্ন যে কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য যেরূপ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে অর্থাভাবে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, হলবলদ ক্রয় করিতে পারে না—সময়ে বীজ ক্রয় ও বীজ বপন করিতে পারে না, যদি করিতে হয়, তবে হয় মহাজনের নতুবা ভূম্যধিকারীগণের শরণাপন্ন হইতে হয়। যদি দেবতা সুপ্রসন্ন হন, তবে 'সাইলকরূপী' উত্তমর্ণের করালকবল হইতে সে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। অন্যথা তাহার যাহা কিছু দরিদ্রের সম্বল তাহাও "দরিয়ায়" ভাসিয়া যায়—ধনীর অর্থকোষের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন করে। এ অবস্থায় যদি গবর্ণমেণ্ট কৃষকমণ্ডলীকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করেন—দেশে শত শত কৃষি ব্যাঙ্কের উদ্ভব করা যায় তবেই দরিদ্র কৃষককুল দেশের ও দশের ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীভূমির উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। আমরা যতই চিৎকার করি গবর্ণমেণ্ট নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে দেশের লোক এই সকল ব্যাঙ্কের গঠন ও পরিপোষণ কল্পে কখনই অর্থ প্রদান করিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সুরাজ।

৬। বঙ্গের স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া

জ্ঞানোজ্জ্বল প্রাচীন হিন্দু-ঋষিগণ অতল-গম্ভীর স্বরে এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"

আগে শরীর রক্ষা অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা,—পরে ধর্ম সাধন। কেননা যাহার স্বাস্থ্য নাই, তাহার কিছুই নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যতপ্রকার সুখ আছে, স্বাস্থ্যসুখই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বাঙ্গালী আজ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে সেই সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া দিন দিন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িতেছে। শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গালার সোনার পল্লীসমূহ যে দিন দিন শ্মশান হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রধান কারণই যে ম্যালেরিয়া একথা আজ আর কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মানুষ আর মানুষ থাকে না; মানুষ প্রায় অচেতনে পরিণত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য দিনই দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর আকার ধারণ করিতেছে। ম্যালেরিয়া আক্রমণের শোচনীয় করুণকাহিনী আমরা বহুবার বিবৃত করিয়াছি। জরাজীর্ণ পল্লীবাসীর দুঃখ-দৈন্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তুলিয়া আমরা বারবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি ম্যালেরিয়াকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে যে কারণে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, তাহার প্রতিকারকল্পে রাজা প্রজা উভয়কেই সমবেত ভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। নচেৎ দেশের ও দশের কল্যাণ নাই।

বাঙ্গালার নদী নালার দুরবস্থা প্রভৃতির দরুণই যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, একথা আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে বাঙ্গালার স্যানিটারী কমিশনার ডাঃ বেন্টলিও প্রায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার সেনেট হলে ডাঃ বেন্টলি ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও প্রতিকার সম্পর্কে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করিয়া

ছেন। ডাঃ বেন্টলি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সারমর্ম্ম এই:—

বহুদিন যাবৎ এই কথা শুনিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালা দেশে স্থানে স্থানে বদ্ধ জল আটক থাকে বলিয়াই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ৬০।৭০টী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা সমালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যে সকল অঞ্চলে জলের অভাব অধিক, সেই সকল স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রবল। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার এদেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন অনেকগুলি ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রোগবহুল স্থান সমূহে বদ্ধজল আটক হইয়া ঐরূপ পীড়া উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে স্থানীয় অধিবাসিগণ একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, জলের অভাবে তাঁহাদের কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি আর পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ হয় নাই এবং ঐ সকল জলাধার অতি অল্পদিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলার রিপোর্ট সমূহে এইরূপ অনুযোগই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এদেশে যে জর-কমিশন বসে, তাহাতেও ইহা উল্লিখিত হয় যে, নদীয়া জেলাতেও জলের মাত্রাল্পতার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের আক্রমণ বাড়িয়াছিল। তাহার পর এরূপ শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বুঝা যায় যে, এদেশের নদী নালা সমূহের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের প্রভাবও পরিপুষ্ট হইয়াছে। আজও বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালীর অভিমত এই যে, বাঙ্গালার নদী নালার স্বচ্ছন্দ বারিপ্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়াতেই এদেশবাসীকে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগে গ্রাস করিতে বসিয়াছে এবং আজ যদি ঐ সকল নদী খনন করিয়া তাহাদের জল প্রবাহ আবার অব্যাহত রাখা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি আবার রোগ মুক্ত হইয়া উঠিবে।

আমরা এতকাল ম্যালেরিয়ার কারণ সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছি, ডাঃ বেন্টলির ন্যায় একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিশারদ সুপণ্ডিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর মুখেও আজ সেই সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শুনিয়া আমরা উহার প্রতিকার বিষয়ে অনেকটা আশান্বিত হইয়াছি। আমাদের ভরসা, আছে,—এবার গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একটী সময়োপযোগী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রসঙ্গ আগামী বারে আমাদের বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

নবীন

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ	অষ্টম সংখ্যা।

আলোচনা

১। স্নেহের বন্ধন

ভাঙ্গা গড়ার কর্ত্তা, রক্ত মাংসের মানুষ চিরদিনই বন্ধন ও মুক্তির দাস। স্নেহে যখন দৌর্ব্বল্য স্পর্শ করে তখনই উহা বন্ধনের কারণ এবং যখন স্নেহের শত প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত হইয়াও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না তখনই তাহার মুক্তি হয়। নবীন সাধক যখন তাহার অভিপ্সিত লক্ষ্যকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া যায় তাহার নাম শ্রবণে তন্ময়তা আসে তখন তাহাকে প্রকৃত পথ খোঁজ করিয়া লইতে উপায় স্বরূপ কাহাকেও পাইতে বেশী দেরী হয় না। তাহার হৃদয়ে ভাবের গভীরতা অনুসারে তাহার পথের দূরত্বও কম বা বেশী হইয়া থাকে। নবীন সাধক—যাহার হৃদয় প্রকৃতই প্রেমে ভরপুর, যে ভক্তির মালা গাঁথিয়া কর্ম্মের গলে

দিতে চায়, বাসনা যাহার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নয়, লক্ষ্য পথের সামান্ত স্নেহের বন্ধন তাহাকে কিছুই করিতে পারে না; কারণ মানুষের যাহা ধর্ম, পুরুষের যাহা করণীয়, কোমলতা ও কঠোরতাকে যে সমভাবে টানিয়া লইতে পারিয়াছে—সাধারণ মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে আপনার বলিতে যাহারা তাহারা হয়ত আজ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহার পথের কণ্টক হইতে পারে কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন উষাস্ত নিজেই তাহাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দেন, বিশ্ব তাহার আপন ঘর বাড়ী হয়, পরিত্যাগকারী আত্মীয় স্বজন তাহাকে মাথায় করিতেও দ্বিধা বোধ করে না, শতজন শতভাবে তাহাকে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়। স্নেহেরবন্ধনকে উপলক্ষ করিয়া মানব-জীবনের পথে পঙ্গু হইয়া বসিয়া থাকা ভীরুতার লক্ষণ। যাহার ধর্ম্মের বাণী সত্য, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যাহার প্রতি পদক্ষেপে একটা গৌরবের ভাব প্রকাশিত হয় ইতিহাস তাহার জন্ত নূতন স্থান নির্দ্দেশ করে। হয়ত সংসারে অনেকেই সাধনার পথে—পা দিতে দিতেই সরিয়া গিয়াছেন, কেহ হয়ত আশ্রয় পাইয়াও ছুটিয়া পড়িয়াছেন ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম-ফল হইলেও তাঁহাদের আজকার চেষ্টার অভাব অন্যতম কারণ।

সত্য যদি স্নেহই মানুষের বন্ধনের কারণ হইত তাহা হইলে মানবেতিহাসে আমরা এমন একটী কারণ পাইতাম না, যাহাকে আদর্শ করিয়া মানুষ নিরাশার সমুদ্রে সান্ত্বনা পাইত। আমরা জগতকে ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই—বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অত্যাচারীর হস্ত হইতে ধর্ম্মকে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত বিভিন্ন পুরুষ-সিংহের আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ হিসাবে সমাজের অতি ক্ষুদ্রকণা হইলেও সামর্থ্য অনু-সারে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করিবার আছেই। ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে সৃষ্টিকর্ত্তা বিনা উদ্দেশ্যে কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই, প্রকৃতির তৃণ অবধি তাঁহারই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। আর আমরা মানুষ হইয়া, ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি হইয়া আজ জগতের দাবী দাওয়া অস্বীকার করিতে বসিয়াছি। মনু-ষ্যত্বের নামে, ধর্ম্মের নামে, দৌর্ব্বল্য ও অধর্ম্ম-কে চিনিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে জয় পরাজয় যাহার ইচ্ছা, উত্থান পতন যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতের অপেক্ষা করে, মানুষ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারে না। যেমন করিয়াই হউক, অসম্ভবে সম্ভব সাধিত হইয়া যাইতেছে চিরকাল যাইবেই—আত্মীয় পরি-জনলালিত স্নেহের দুলাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, চক্ষের সম্মুখে কর্ত্তব্য দেখিয়া কত যুগের ভীরুতা এক মুহূর্ত্তে লোকে বিসর্জ্জন দেয়—স্নেহ কখনই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। নিজের প্রাণের বস্তু যাহা, নিজের শিরায় শিরায় শোণিতের সঙ্গে সঙ্গে যাহার ধারা প্রবাহিত, যাহা সম্পাদনের নিমিত্তই মানুষের জন্ম তাহা কতক্ষণ লোকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? লুকোচুরী ত বেশীক্ষণ চলে না। স্বার্থের সম্বন্ধে স্নেহদুর্ব্বল বলিয়াই লোক চরিত্রে দেবত্ব কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সেই দুর্লভ দেবত্বই ইতিহাসের গৌরব, মানব সমাজের গৌরব, ভগবানের অনন্ত মহিমার প্রকাশ।

• •
•

২। আত্মপ্রতিষ্ঠা

দুঃখই ব্যক্তির মহত্ত্ব, অভাবেই জাতির জাতীয়তা বোধ জাগে। অভাব হীন কোন ব্যক্তি বা জাতি নাই। সকলেরই কিছু না কিছু অভাব আছেই। আমাদেরও ছিল এবং এখনও আছে। কতগুলি অভাব আগন্তু, কতগুলি সৃষ্ট। বাবুগিরির দ্বারা শেষোক্ত অভাব আমরা তৈয়ারী করিয়াছি এবং মসলিন্, তালিম প্রভৃতি বস্ত্র দ্বারা আমাদের দেশের সেই অভাব দূর হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্রের উৎপাদনে এইমাত্র বুঝা যায় যে, আমরা বয়নশিল্পে উন্নত হইয়াছিলাম। মানুষ স্থূল হইতে ক্রমেই সূক্ষ্মে পৌঁছিতে চায়, মোটা কথা, মোটা হাবভাব ছাড়িয়া অল্প কথাতে ও ইঙ্গিতে আপনার পরিচয় দিতে চায়। দ্বৈত ও অদ্বৈতে, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যে বিপরীত ভাব থাকিলেও যেমন নৈকট্যের পরিচয় দেয়, সন্ন্যাস ও সৌখিনীতেও তেমন একটা সম্বন্ধ আছেই। সংসারে কোন জাতিই একেবারে সন্ন্যাসী বা সৌখীন হয় নাই তবে সাম্প্রদায়িক নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। সৌখিনী ধরোপ হইতে পারে, তাহাতে জাতির দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখা যায়, একজন মাথা ঘামাইয়া জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এক হাতে অসি অন্য হাতে কটী লইয়া রাজ্য জয় করিলেন আর পরবর্ত্তী বংশপরম্পরায় সুখ আসিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া এক একটা জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়া দিয়াছে।

আজকাল সকলেই আপন আপন বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপন আপন দেশে জিনিষের উৎপাদন করিতেছেন। আমাদের জাতি জাতীয় উন্নতির জন্য গভীর ভাবে স্বদেশপ্রীতি বৃদ্ধির জন্য অভাবের দিনে বৈদেশিক দ্রব্যের বর্জ্জন করিতেছেন ইংরেজের ত কথাই নাই। কিন্তু ভারতের বাজার হইতে জাপান যাইবে, জাপানী আসিবে, জাপানীকে সরাইয়া আমেরিক আসিবে—এই বৃত্তাকার ভাবই চলিবে কি?

আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্যের উপায় হইতেছে না কেন এবং উপায় হইলেও তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না কেন তাহার মোটামুটী কারণ যে না আছে এমন নহে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা ও আজকার শিল্পালয় প্রতিষ্ঠায় একটা বড় রকমের তফাৎ আছেই। স্বদেশীর যুগে দাঁড়াইয়া ছিলাম বলিয়াই আজ উন্নতি না হউক কিন্তু উপায় বাহির করিবার নিমিত্ত খুঁজিয়া মরিতেছি। এইটা বলিতেই হইবে আজ যেমন দাগা পাইয়া হা হুতাশ করিতেছি, সে সময় এরূপ একটা অভাবে পড়ি নাই। আজ যেমন প্রত্যেকেই অভাব বুঝিতে পারিতেছি সে সময় এরূপ ধারণা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় নাই।

আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপায় করা প্রয়োজন বোধ করিলেও আজ আবশ্যক হইতেছে না তাহার কারণ ভারতের বাজার হইতে আজ পর্য্যন্তও বিদেশী মাল পাইয়া অভাব পূরণ করিতেছি। প্রতিষ্ঠালাভ না করার কারণ—(১) দেশী জিনিষ বিদেশীর মত না হওয়ায় অশ্রদ্ধা (২) অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে অক্ষম। গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক সাহায্য না পাইলে শিক্ষা-শিল্প কিছুই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দেশীয় জিনিষ প্রস্তুতকারীরা নিজ নিজ মূলধন লইয়া উদরান্নসংস্থানের উপায় করিতেছে, ইহাকে ব্যবসা বলে না। অধিকন্তু উন্নতাবস্থায় পৌঁছিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা ইহাদের নাই। তারপর ব্যবসা সম্বন্ধে

যে সকল গুণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহারও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।

যাহা হউক যখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইব না, অথচ বৈদেশিক জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা অসম্ভব তখন কি বাঁচিয়া থাকিবার কোনই উপায় নাই? অভাব যদি বুঝিয়া থাকি, যদি সত্য সত্যই প্রাণ হুঁড়িয়া দিতেছে বুঝি, তাহা হইলে উপায় কি? এক উপায় সংযম অন্য উপায় অভাবোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত। যদি প্রকৃতই সৌখিনী করিবার ইচ্ছা থাকে, পুরাপুরি অভিমান থাকে তাহা হইলে ভারতীয় পণ্যে ভারতের বাজার পূর্ণ হইতে বেশী দিন লাগিবে না। স্বদেশীর দিনের প্রতিজ্ঞাটী আজ আবার করিতে পারি না কি? আপনার হৃদয়ের কাছে তাহার একটা অভিযোগ খাড়া করিতে পারি না কি? এক একটা আশার বাণী শুনিয়া, প্রতি বারেই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়াই কি সব শেষ করিতে হইবে? বিদ্যা, বুদ্ধি যদি আজও অভাবের দিনে কোন কাজে না আসিল তাহা হইলে আর কি ফল হইল? ভারতের অট্টালিকাগুলি যে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে আর কাহারও দেরী হইবে না। ধনী দরিদ্র, একই শ্রেণীতে পণ্য হইবে, তবুও মুখের রুচির একটু পার্থক্য থাকিবে মাত্র। বিদ্বান ও বিদ্যাহীনের মধ্যে কি পার্থক্য থাকিবে তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর মধ্যেই শুধু বোঝা যাইবে। দুর্ব্বলের বল ভগবান ইহা মিথ্যা কথা। অলসকে তিনি সাহায্য করেন না। দুর্ব্বলকে কর্ম্মক্ষম করিবার নিমিত্তই এই বাণী প্রচারিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সাহস, শক্তি প্রভৃতি পুরুষের গুণনিচয় লাভ করিয়াও যদি তাহাতে বিশ্বাস না থাকে, তাহার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে মানুষ, মানুষের নিকটপ্রতিবেশী হইয়াও সাহায্য করে না, আর নিরপেক্ষ, সর্ব্বশক্তিমান পৌরুষের পূর্ণমূর্ত্তি যিনি তিনি পরমুখাপেক্ষী, পরগলগ্রাহী, পরানুকরণকারী মানুষকে আশ্রয় দিবেন ইহাপেক্ষা বাতুলতা নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে? পুরুষের কাছে মনুষ্যত্বের বিচার হয়। অতএব পর পর বিভিন্ন দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া যেন পরীক্ষা দিতেছি বলিয়া ভক্তির ভান না করিয়া সাধকের ভক্তিমন্ত্রকে কলুষিত না করি, যেন তখনই ভুলিয়া যাই—

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ
দিতেছ তারা।
সে সকলি দয়া তব জেনেছি মা
দুঃখ হরা।"

* *
*

৩। কর্ম্মীর অভিমান

দেশ যেমন কর্ম্মীর উপর তাহার সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দেয়, কর্ম্মীরও তেমন একটা দায়িত্ব আছে। দেশ কর্ম্মীর কার্য্যে গৌরবান্বিত হয়, কর্ম্মীও পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত দেশের ইতিহাস স্মরণ করিয়া অভিমানে আত্মহারা হয়। অভিমানহীন কোন জাতিই নাই। অভিমানেই পুরুষের পৌরুষ বৃদ্ধি হয়, অভিমানেই জয় আবার অভিমানেই পতন হয়—অবশ্য যখন অহঙ্কারে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের অভিমান রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, জার্ম্মানীর অভিমান জ্ঞানে শিল্পে, ফরাসীর অভিমান আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায়, আমেরিকার অভিমান ব্যবসায়, জাপানের অভিমান স্বদেশ প্রীতিতে, তুরস্কের অভিমান স্বজাতিপ্রিয়তায়। দেশ এবং জাতিভেদে সকলেরই একভাবে না একভাবে অভিমান আছেই। যখন কোন

ব্যক্তিকে অভিমান হীন বলিয়া বোধ হয় তখনই বুঝা যায় তাহার জাতির কোন স্থান কীটদষ্ট হইয়াছে। অভিমানহীন হইয়া কেহ সংসারে থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের মূল সূত্র ছাড়িয়া দিলেও আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই—ত্রেতাযুগের অনুপম কীর্ত্তি স্বর্ণপুরি লঙ্কা অভিমানেই বিসর্জ্জন গেল। ভারতের অতীত যুগের কীর্ত্তি দ্বাপরের হস্তিনাপুর অভিমানে ধ্বংস হইল। অভিমান ভিন্ন পুরুষ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ধ্বংস এবং প্রতিষ্ঠা তাহার নিকট সমভাবে বাস করে। যে হিন্দু রামায়ণ মহাভারত পড়েন তাঁহাকে কি আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে? ভক্তিমান ভারতবাসী দেখিতেছেন রাবণ দুর্য্যোধন পাপী হইলেও রামের হাতে কৃষ্ণের বিরুদ্ধেই মরিতে প্রস্তুত। তাঁহারা পুরুষ তাই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন। ভক্তিমান ভারতবাসীর পুণ্য এই অভিমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অভিমান ভিন্ন ধর্ম্মলাভ, রাজত্বলাভ, কোন কিছুই লাভ হয় না। অভিমানকে উদ্ধত হইতে দেওয়া পুরুষের সংযমহীনতার কারণ, তাই ভাবিতে হয়, গলদঘর্ম হইয়া বলিতে হয় আমার শক্তিদাও।

কর্ম্মীকে সর্ব্বদাই অভিমানের উপর ভর করিয়া চলিতে হয়। তাহাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—আমার সমাজ আমার ধর্ম্ম আমার শিক্ষা আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে দেখাইতে হইবে, আমি সমাজের, সমাজ আমার। নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ শত মন্দ হইলেও যাহা হইতে তাহার জন্ম সে কি নিন্দনীয় হইতে পারে?

কর্ম্মীর যদি সে অভিমান না থাকে, আপনার ধর্ম্ম ও সমাজকে বড় বলিয়া ভাবিতে যিয়া বোধ হয়, বড় ভাবিতে কোন প্রকার যুক্তির সাহায্য লইতে হয় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে তাহার কর্ম্ম প্রবর্ত্তন একটা বোলা জায়গায় বালুর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। দেশপ্রীতি, ধর্ম্মভক্তিও সেইরূপ কোনরূপ যুক্তির অপেক্ষা করে না।

কর্ম্মীকে দাঁড়াইতে হইলে কোমলতা-কঠোরতা, স্বজাতি-প্রীতি, অভিমান ও আত্ম মর্য্যাদা চাই। এই সবগুলি পাশাপাশি গড়িয়া উঠিলে তবে তাহার অভিমান জাগিয়া উঠে। আপনাকে অভিমানের ভিতর দিয়া সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেহে যখন মিশাইতে পারা যায় তখনই কর্ম্মী বলিতে পারেন—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। • • • সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।" • • •

• •
•

৪। দেশের অভাব ও ধনবিজ্ঞান

দেশের ধনাগমের জন্য আজ পর্য্যন্ত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই নিজ নিজ চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার ফলে আমরা কি পাইয়াছি?—আমরা পাইয়াছি আমাদের নব্য ইতিহাসের জন্য এক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহাদের চিন্তা

প্রণালীর ধারাবাহিক ইতিহাস, বৈদেশিক ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা স্বদেশে ধন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা।

কিন্তু কৈ? আজ পর্য্যন্ত ত ধনাগমের কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সুদীর্ঘ কালের সুপ্তির পর জাগরণে সাড়া দেওয়ার মত কেহ বা মত খণ্ডন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই কি আমাদের উন্নতির পরিচায়ক? আমরা শৈশবের সরলতা ধূলা খেলা ছাড়িয়া, যৌবনের প্রথমোন্মেষে বিশাল চিন্তা, গুরুভার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি পণ্ডিতগণের অসার যুক্তি তর্কের অবতারণা দেখিতে পাই তাহা হইলে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

আজ পর্য্যন্তও বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিগণের চিন্তার দ্বারা কোন উপকার পাই নাই তাহার প্রকৃত কারণ—শুধু প্রাণহীন চিন্তার ফল। আমাদের জাতির বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি প্রাণের স্পন্দনকে থামাইয়া রাখিতে চাই তাহা হইলে সেই সমীচীন চিন্তা যতক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে? যতক্ষণ না মস্তিষ্ক আপনার ক্ষমতাকে প্রাণের আবেগের চরণে নোয়াইতে পারে ততক্ষণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শুধু অসার বাগ্মীতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাই বলিতেছি যদি আজ চিন্তার ফল দেখাইতে চাও তাহা হইলে তোমার প্রাণকে সঙ্গে লও, দীর্ঘকাল দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বিসর্জ্জন কর, পথ পাইবে। তোমার চিন্তাপ্রণালী সত্য জগতে নূতন ফল দিবে। নতুবা—যেমন আছ তেমনই থাক।

আমাদের সবই ছিল, সব আছে আবার সবই ষড়ৈশ্বর্য্য হইয়া ফিরিবে এটা সত্য। তুমি যতটুকু সাধনা দ্বারা নূতন ভারতকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছ ততটুকুই পাইয়াছ। যেখানে প্রাণের টান প্রকৃতভাবে তোমাদিগকে টানিতেছে সেখানেই বন্ধ বন্ধন জীর্ণ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমাদের সাধনাই একদিন সিদ্ধির পথে আসিবে। স্বদেশের ধনাগমের নূতন প্রবেশ দ্বার তোমাদের দ্বারাই নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু, যখন দেশ তোমাদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে, নিজেদের অদৃষ্টের দোষ দিতেছে তখন তুমি (তোমরা) এবং তাহারা এই দুই জনে কি তফাৎ? তুমি শিক্ষিত সমাজকে বাণী শুনাইয়াছ এই খানেই তোমার দাবী শেষ। মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তা করিয়া পরের দুঃখভাগী হওয়া যায় না। প্রাণে প্রাণ মিশাইতে না পারিলে অনুভূতি আসে না, হৃদয় গলিয়া অশ্রু বাহির হয় না। সমাজ এখন আর প্রাণহীন বাণী শুনিতে রাজী নহে। যেখানে প্রাণের টান পড়ে মানুষ তাহারই বিচার শূন্য হইয়া সেইদিকেই ছুটে।

যদি ধনবিজ্ঞানের চিন্তা শুধু মৌখিক ক্রিয়া কলাপেই আপনার পরিচয় দিতে চাহে তাহা হইলে আপাততঃ এইখানেই ধনবিজ্ঞানের চিন্তার পরিসমাপ্তি হওয়া ভাল। সকল দিকেই কেবল নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালীর কথা শুনিতে পাই। এক শ্রেণীর, যাঁহারা লেখক, তাঁহারা মনে করেন আমরা শুধু বাণী প্রচার করিয়াই যাইব। পরবর্ত্তী যুগে বা বিভিন্ন এক সম্প্রদায় আমাদের মতে কাজ করিবে। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক জগতে এতদিন অনেক চিন্তাপ্রণালী শুষ্কাম্লান্ত হইয়া থাকিত। ধনাগমের জন্যই যত মারামারি চলিতেছে। আগে দেশের লোককে বাঁচিবার উপায় করিয়া দেওয়া

হউক তবেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ বৈষয়িক তাবুকগণের যথেষ্ট করা হইবে। তাঁহারা এখন বিভিন্ন চিন্তার প্রচার ও মতবাদের খণ্ডন দ্বারা আপন আপন ক্ষমতা দেখাইয়া আরও দীর্ঘকাল বসিয়া উপায় চিন্তা করুন। পরে কাজে আসিবে। আজ যখন দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না, তখন আর ধন বৃদ্ধির জন্য মাথা ঘামাইয়া প্রয়োজন কি? অনর্থক চিন্তায় আজ দরকার নাই। যদি সময়োপযোগী কিছু দেওয়ার থাকে সমাজ তাহাই চায়। আমরা তাঁহাদিগের নিকট শান্তির জন্য সেই পথ চাহিতেছি।

৫। দেশাত্ম বোধ

বাঙ্গালী ভারতবাসী এখন বড় হইয়াছেন, আপনাকে আপনি সামলাইয়া লইবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাই আমরা বলিতে চাই যাঁহারা আজও তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী সেবা শুশ্রূষা, ও সহায়তাকে, বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি তাঁহারা যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া আপন আপন আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন—আমার হৃদয় হইতে দুর্ব্বলতা দূর কর, পরকে বড় করিয়া তাবিবার শক্তি দাও আপনার জনের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে স্নেহ দাও, ভালবাসিবার মত হৃদয় দাও, যে হৃদয়ে সেবক মাত্রেরই প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় এমন হৃদয় আমাকে দাও, আমাকে মানুষ করিয়া তোল।

যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ়ের উন্নত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি এবং বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ এই ত্রিশক্তি ব্যতীত সমাজঅঙ্গ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা সেবা ধর্ম্মের অনুরক্ত তাঁহারা সেবকদিগকে উৎসাহ দিন, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি লাভে সহায়তা করুন ইহাই তাঁহাদের দৈনন্দিন অন্যতম কার্য্য হউক।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ভারতবাসী কত বিপদকে তুচ্ছ করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাদের হৃদয়ে সত্য ভারতীর উপলব্ধি হয়। তাঁহারা যে ধর্ম্ম-প্রাণ, সত্যান্বেষী তাহা দেখাইয়াছেন। দামোদরের বন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া, দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সঙ্গে অন্নকষ্ট ভোগ করিয়া দেখাইয়াছেন, স্বদেশকে স্বজাতিকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, কেমন করিয়া আপনার ভাইয়ের জন্য আপনার মায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। যাঁহাদের তিন পুরুষের মধ্যে কেহ রণহুঙ্কারের শেষ ধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই, যুদ্ধের নামে যাঁহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিত তাঁহাদেরই বংশের সন্তানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবায় জীবন দান করিয়া দেশবাসীকে ভালবাসার চূড়ান্ত দেখাইতেছেন। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে এক মহাকর্ষণের পিছনে ফেলিয়া দিয়াছেন—ভবিষ্যতের বিপুল নির্ম্মল আনন্দলাভের জন্য। তাঁহাদেরই বংশের সন্তানগণ আজ পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া সমর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্"
"জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"

এই বাণীরই উপাসক। আজ তাহাদের প্রাণের অনুপ্রেরণায় বুঝিতে হইবে তাহারা দীর্ঘকালের কদ্ধভাব, গলিতপ্রীতি জড়তা, দীনতা ও ভয়কে ঠেলিয়া দিতে পারিতেছেন—আপনারা সংযত, ভাবপ্রবণ, ভক্তি-

মান, সত্যপিপাসু হইতে পরিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবা করিয়া লোক কোনদিন পুরুষের মত মৃত্যুকে আহ্বান করিতে সাহস করে না। গলিয়া পচিয়া শোকে-তাপে-দগ্ধ হইয়া মরিতেই তাহার চিত্তের পরমা তৃপ্তি। যাহার হৃদয়ে গরল নাই সে মৃত্যুকে ভয় করিবে কেন? সংসারের বাসনা কামনা বিষয় ভাবনাই মনুষ্যত্ব প্রকাশের বিঘ্ন।

কোন দিন ভাবিতে পারি নাই ভারতবর্ষের অঞ্চলে অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দুর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলমানের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চেষ্টা ইহা স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মাইলেও উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায়, সম্মুখে একটা বিপদের ভয় থাকিলেও চরমে যাইয়া আর কোন ভেদই নাই। যাহা হউক মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতের আদরের সামগ্রী, প্রাণের জিনিষ হইবে। ভারতবাসী আজ বিদ্যাদানের সুবন্দোবস্ত আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন দ্বারা নিষ্পন্ন করিবেন। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে পাঁচটীর উপর আবার নূতন এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে ইহা ইংরেজের ইংরেজী শিক্ষাদানের ফল। প্রাণের ভিতর শক্তির ক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত ভারত বিশ্ববিদ্যালয়েপূর্ণ হইবে এবং তখন জার্ম্মানীর অনুপাতে বড় হইতে আমার বেশী দিনের দরকার হইবে না।

আজ আমরা নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিতেছি আমরা শত শত দিকে প্রাণ পাইয়াছি আর আমরা হীন হইয়া থাকিব না। আমাদের কবি প্রাণকাটা দুঃখে বলিয়াছেন—

"রোম গ্রীস ডুবি উঠিল আবার,
অভাগী ভারত রহিল পড়িয়া।"

অশান্ত অতৃপ্ত, উন্মত্ত কবির আজ আমাদের ভালবাসা, আমাদের সেবাধর্ম্ম, আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া শান্তিলাভ করুন। ভারতীয় যুবক সেবক ও সেনানীগণের ত্যাগ ও জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতির কথা প্রাণদানের কথা মারাধন, থার্ম্মোপাইলিতে ধ্বনিত হইয়া রোমের সিনেট সভায় প্রতিহত হউক।

* *
*

৬। বাঙ্গালার সাহিত্য সংসার

কলিকাতার বাহিরে মাসিক পত্র বা পত্রিকা ত এক রকম নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য সম্মিলনীতে কলিকাতার বাহির হইতেও যে পণ্ডিতব্যক্তিগণ না আসিয়া থাকেন এমন নহে, কিন্তু তবুও তাঁহারা একমাত্র কলিকাতার মাসিকের দিকেই চাহিয়া থাকেন। শিশুপত্রিকাগুলির বড় জোর দুই একখানি মফঃস্বল হইতে বাহির হয়। মফঃস্বলের পাঠকগণের একটা অভ্যাস আছে তাঁহারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত না হইলে মাসিক বা সাপ্তাহিককে মোটেই আদর দিতে চাহেন না। কলিকাতার মাসিক বা সাপ্তাহিকেই শুধু প্রবন্ধাদি দিবার নিমিত্ত তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এটা একটা রোগ বলিলেও হয়।

যাহা হউক কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গলা দেশের হিসাবে সাপ্তাহিক কাগজের সংখ্যা কম হইলেও, প্রায় প্রতি জেলা এবং কোন কোন মহকুমা হইতেও সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। কোন কোন সহর হইতে ২।৩ খানিও বাহির হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে সংবাদ পাই না। আমরা বুঝিতে পারি না, ঐ সকল সাপ্তাহিকের দ্বারা আমরা কি উপকার পাইতেছি। বাঙ্গালার সাপ্তাহিকের মধ্যে

৩।৪ খানিকে মাত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাহিত্য ও সমাজের উপযোগী আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি পাইতেছি—তাহা আজই বিচার করার সময়। আজকাল গমনাগমনের সুবিধা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও সকল সময়ে এবং সকল লোকেই সকল স্থানের খবর রাখে না। স্থানীয় অভাবঅভিযোগ আলোচনা করার পর তাঁহারা ব্যাপকভাবে বৃহত্তর দেশের বিষয় এবং আমাদের সমাজ জীবনের গতির সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিবেন। মফঃস্বলের অভাবঅভিযোগ আলোচনা আজ সাধারণের নিকট নূতন না হইলেও তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে, ভাবিবার আছে তাহা দেশের লোক জানিতে পারে না কেন? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি বাঙ্গালীকে বড় করিতে হইলে, বাঙ্গালী জাতিকে বড় দেখিতে চাহিলে গভীর চিন্তা করিতে হইবে, অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। ক্ষুদ্রচিন্তা ছাড়িয়া বৃহৎ ভাবরাজ্যে পৌঁছিতে হইবে। আজ আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে বাঙ্গালী জাতিকে শ্রেষ্ঠ দেখিতে চাহিতেছি সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকার সম্পাদকগণ আজ যেন নীরব নিস্পন্দ। ইহাই কি তাঁহাদের উচিত? তাঁহারা যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের শতমুখ, শতভাবের ফোয়ারা, সমাজরক্ষায় আলোক হস্তে অপরিচিত হিতৈষী।

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ একটা ব্যবসা করিতেছেন বটে, আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভাল হউক মন্দ হউক কালির অক্ষর সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতেছেন কিন্তু আমরা উহাকে শিক্ষিত সমাজের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি বলিব। তাঁহারা আমাদের সামাজিক উন্নতির দিনে নূতন কিছু কেন দিতেছেন না ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশ হইতে যত খানি কাগজ বাহির হইলে একটা নিস্পার কথা ছিল বটে কিন্তু সমাজ তাহার দ্বারা উপকৃত হইত। সংবাদ পত্রের যাহা কাজ তাহা হইতেছে কি? নিলামী ইস্তাহারের দ্বারা তথা কথিত শিক্ষিত সমাজ কিছু পাইতেছেন কি?

আমরা মফঃস্বলের সংবাদ পত্রে খুনের খবর চাইনা, আমরা চাই মফঃস্বলকে, আমরা আরও চাই, প্রতি জিলার সুখ দুঃখের কাহিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরুক।

প্রকৃত কথা বলা যাইতে পারে সংবাদ পত্র চালাইতে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা আমাদের বিভিন্ন অভাবের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে না। (১ম) অভাব—অর্থ, বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করা যায় না; বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার জন্য কোন কোন কাগজের কলেবরও যথেষ্ট নহে কেবল মাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তাঁহারা ব্যয় করেন। (২য়) অভাব—চেষ্টা, দশের সামনে ধরিবার জন্য, আপনার যাহা বক্তব্য তাহা প্রচারের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা ইত্যাদি হইয়া উঠে না। এবং নিজেরাও পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে নূতন কিছু ভাব ভাষা দিতে আর ইচ্ছা করেন না।

পাশ্চাত্য জগতের সংবাদ পত্র সমূহ সংখ্যায় কম নহে। এক আমেরিকা হইতে নানা রকমের কাগজ, ভারতের কাগজ অপেক্ষা ২৫ গুণের কম হইবে না। তারপর জার্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ ত আছেই। তাঁহারা কি লেখেন, কি চিন্তা করেন, কি

করিয়াই বা কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করেন আমাদের ভাবিবার বিষয়—দেখার বিষয়।

সুতরাং আজ বলিতে ইচ্ছা হয় বাঙ্গালার সাহিত্যসংসারে সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষিত এক সম্প্রদায় ভাবভাষা লইয়া উঠিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর একদল নীরব। ইহা কি হইতে পারে? দেবতার আরতিরকালে কাহাকে কি করিতে হইবে, পূজারী কিছু বলিয়া দেন কি? আমাদিগকেই নূতন চিন্তা করিতে হইবে, পড়িতে হইবে ভাবিতে হইবে তবেই না আমরা আমাদের আত্মার প্রসারতা বুঝিতে পারিব। যদি না থাকে তাহা হইলে তাহাই চাই। পরস্পরকে হাত ধরিয়া আনন্দময়ীর কাছে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালার সাহিত্যসংসারের সৈন্য ঘুচাইয়া চিরানন্দ আনিতে হইবে।

* *
*

৭। দেশ কি চায়?

দেশ কি চায় তাহা আজ আর নূতন করিয়া আমাদিগকে বলিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। দেশ যাহা চায়—তাহা পৌরুষের উপর নির্ভর করে; নিষ্কলঙ্ক, ভাবপ্রবণ, সাহসী, আত্মময়ী পুরুষই দেশ চায়। জীবনসংগ্রামে জয় পরাজয়ের মুহূর্ত্তে, মানবত্ব প্রতিষ্ঠার কালে, আপনার জনকে আপনার ধনকে আপনার বুকের রক্ত অপেক্ষাও আপন বলিয়া চিনিবার যুগে দেশ এইরূপ পুরুষ চায়। যাহার মুখের দিকে চাহিলে শত শত দারিদ্র্যপ্রপীড়িত নরনারীর উদর অমৃতের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে, সংসার স্বর্গীয়, শোক-দুঃখ-কাতর পোড়াপ্রাণ পিতা মাতার প্রাণ, মন, শরীর, আপনা হইতেই শান্ত হয়, যাহার আহ্বানে লক্ষ লক্ষ দুর্ব্বল ও সবল, ভীরু ও সাহসী, ধনী ও দরিদ্র, যুবক ও বৃদ্ধ আপনার ক্ষমতা অক্ষমতার বিচার না করিয়া আসিয়া দাঁড়ায় দেশ মাত্রেই এই রকম পুরুষের জন্য প্রার্থনা করে, দুর্ব্বল ও অধঃপতিত সমাজ চিরদিন এইরূপ পুরুষের পৌরুষের জন্যই লালায়িত, ব্যগ্র। যাহার হাব ভাবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, হৃদয়ের ভাবের পরিপূর্ণ সমাবেশ, পরকে আপন করিবার মোহন মন্ত্র, আপনাকে মুহূর্ত্তে উৎসর্গ করিয়া সমাজে পরিবর্ত্তনের নূতন যন্ত্র প্রদর্শন করিতে পারে দেশ চায় তাহাকেই।

দেশ চায়, অজ্ঞতা মূঢ়তা দূর করিয়া শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, ব্যাধি দৈন্য বিদূরিত করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করা। যে যাহা চায় তাই কি হয়? সকল অভাব সকল প্রার্থনার মূলসূত্র ধরিলে দেখা যায়, চারিদিক শূন্য, মস্তক ঘূর্ণিত প্রায় হইয়া উঠে। আমি আজ আমাকে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। বংশের গৌরব, বার্দ্ধক্যের সহায় সন্তানদিগকে শৈশবেই জীর্ণ দীর্ণ করিয়া আমরাই বার্দ্ধক্যে পৌঁছাইয়া দিতেছি, সে কাহার জন্য? আমাদের ভবিষ্যৎ কোন সুখের নিমিত্ত? যাহারা আজীবন বিদ্যাচর্চ্চাকেই একমাত্র বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন, ধনীর গর্ব্বিত মস্তকও যাহাদের চরণ তলে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য লুটাইয়া পড়িয়াছে সেই আমরা আজ তাহাদেরই দেশবাসী মূঢ় বর্ব্বরের মত শিক্ষা পাইবার জন্য লালায়িত। আমার দেশের উপযোগী, আমার জলবায়ুতে পুষ্ট আমার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কোথায়—কেন নাই কেন পাই না তাহা এই দীর্ঘকাল চিন্তা প্রয়োগের পর আজ কি বলিয়া আবার ভাবিতে চাই?

দৈন্যই যদি শিক্ষালাভের প্রতিকূলে হয় তাহা হইলে আজ আমাদের নিশ্চিতই ভাবা উচিত দেশ কি চায়। কি প্রকারে দৈন্য দুর্দ্দশা দূর করিয়া লইতে পারি তাহাই দেখা প্রয়োজন। "উপরে যাহার স্বর্ণ ফলে, মাটীর নীচে চীরার খনি" আমরা সেই দেশের হইয়াও আজ নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। আজ হাহাকারে এদেশের সাধনা, দীনতাপ্রতিমাই এদেশের ঐতিহাসিক চিত্র। খাদ্যের অভাবে, পেটের তাড়নায়, লোক আপন পর বুঝিতে শিখিয়াছে, শূন্য ঘরেও কুলুপ দিতে শিখিয়াছে, চরিত্রগত নিষ্কলঙ্কতাকে পর্য্যন্ত কালিমা মণ্ডিত করিয়া লইতেছে, ইহাই আমাদের ভাবনার বিষয়। ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ আহারের অভাবে, জ্বরোগে মৃত্যু আহারের অভাবে, ইহা কি দেশ জানে না?

দেশের লোক কোন্ দিন পেট ভরিয়া ভাত খাইবে, আপন মুখের গ্রাস পরকে দিয়া শান্তি পাইবে, বাড়ীতে বাড়ীতে গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী সকল বিরাজ করিবে, দুধ, ঘি খাইয়া আপনাদের চিত্তকে শান্ত করিবে, অতিথি অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিয়া দুধ দিয়া তাহার মুখ ধোয়াইবে তাহা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। বাঙ্গালার বাজার ধান চা'লে ভরিয়া উঠিবে, দেশবাসী অকুণ্ঠিত চিত্তে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়া পুণ্যবান হইবে তাহা অত্যাচারী ও অপহরিত মানবের ধারণার অতীত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্ত্তাই।

**
*

৮।- হিন্দুর একত্ববোধ

ভারতবাসী হিন্দু, আজ তোমার হীন অন্তঃ শক্তির মধ্যে স্পন্দিত প্রাণের সাড়া পাইতেছি, তোমাকে যেন আমি নবীন ভাবে মুগ্ধ দেখিতেছি। একটু স্থির হও, নিজের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তুমিও দেখিতে পাইবে—তুমি নবীন মূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছ, তুমিও অনুভব করিবে তোমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। তুমি ভাব, তোমার এ শক্তিহীনতার কারণ কি? তুমি মানুষের মত হইয়া জন্মিয়াছ, সাহস, বীর্য্য, পূর্ব্বস্মৃতি প্রভৃতি মানুষের গুণনিচয় তোমার চারিপাশে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তবুও তুমি আজ এমন কেন? তোমার জাতি বিভাগই কি তোমার হীন শক্তির কারণ? তাই বা কেন হইবে? তোমার জাতির বিভিন্ন বর্ণ থাকুক, তোমার আমার ধর্ম্ম এক, এক দেবমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে পার, তুমি হিন্দু আমি হিন্দু, তোমার আমার এক তীর্থ, তোমার আমার জন্য একই বিধি রহিয়াছে, তোমার আমার উপাস্য এক। একই পবিত্র শ্মশান-ভূমিতে আমাদের পরিণতি, তুমি আমি একই ভূমির গর্ভে একই পুকুরের জলে সমভাগে ভাগী। তুমি গুরু আমি সেবক, তুমি প্রভু আমি ভৃত্যস্বামী তোমাতে আমাতে ভেদ কোথায়? যখন যখন, ধর্ম্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উপর অত্যাচারের সময় শক্তিমান পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ ছিল না। তুমি ইতিহাস, পুরাণ পাঠ কর, দেখিবে শক্তিমান আদর্শ পুরুষের আবির্ভাবে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, ভক্ত অভক্ত এক হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী তুমি কি জান না তোমার ধর্ম্ম কত বড় শক্তিমান? কুরুক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, মানব চরিত্র গঠননীতি প্রচারিত হইয়া শতমুখে তোমারই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। তোমারই চৈতন্যদেব

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত সকলকে এক করিয়া লইয়াছেন। তোমার ধর্ম্ম-ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের রসে পুষ্ট, পুষ্ট ও পরিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে দিক হইতে দেখ না কেন তোমার হৃদয়ের প্রসারতা অনুসারে সবই বুঝিতে পারিবে।

আজ তুমি আমি বিভিন্ন বর্ণের হইয়াও প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়াই চিরদিন চলিতেছি। আমাদের প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হইবে—যখনই কোন শক্তিমান পুরুষ আসিবেন তখনই তুমি আমি এক হইয়া যাইব। আমাদের উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট হইবে, আমাদের শক্তি একত্রিত হইবে—সেদিন মনে রাখিও না তুমি ব্রাহ্মণ আমি চণ্ডাল; তুমি শান্তিগ্রহণকারী, অত্যাচারিত আমি শাস্তা, অত্যাচারী। সেই দিন শতধা বিভক্ত, শত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হিন্দুসমাজ এক বিরাট দেহে প্রকাশ পাইবে। সেই সময় তুমি আমিই প্রচার করিব "বিশ্বময় আগারে ভোল ভা'য়ের প্রতি ভা'য়ের টান।"

যাঁহার অপার স্নেহে আমরা স্নিগ্ধ, যাঁহার কঠোরতা আমাদের পৌরুষের পরিচায়ক, যাঁহার শক্তি আমাদের মনুষ্যত্বলাভের সহায় আমরা আজ আবার তাঁহাকেই ডাকিতেছি। তাঁহার আগমনে ভারতভূমিতে মহামিলনের কার্য্য সম্পন্ন হউক। কুসংস্কার বলিয়া যাহা মিথ্যা প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত হউক। সমাজকে নূতন ভাবে ভাবিতে চাই—এতদিনের বিভিন্নতা আমাদের সমাজ-শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইয়াছে। ভারতভূমিতে কত ধর্ম্ম স্থান পাইয়াছে। আজ সকলেই একত্রিত হইতে চাই, যাহারা মায়ের পাশে দাঁড়াইবে তাহারা সকলেই এক। সেইদিন আমরা দেখাইতে পারিব—আমাদের হৃদয়বত্তা আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ভাবের প্রবাহ, আমাদের সাধনার লক্ষ্য। মহামিলনে হিন্দুর ধর্ম্ম আরও প্রাণস্পর্শী হইবে, আমি সেই মহামিলনের পথের পথিক হইতে চাই। সেই মহামিলন দর্শন, সেই বিরাট মূর্ত্তির স্বরূপ দর্শনই আমার শেষ বাসনা। হিন্দুর ধর্ম্ম জড়তা ও কুসংস্কারের আগার নয়, পরন্তু উহা শাশ্বত, প্রফুল্ল, শান্তিদায়ক, গম্ভীর একটা বিরাট ভাবের সৃষ্টি ইহাই আমরা ভাবিতে চাই। সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমাদের প্রাণ নবভাবে সঞ্জীবিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

* * *

৯। বর্ত্তমান ব্রহ্মের বৈষয়িক অবস্থা

কোন বিজিত জাতি কি করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে, আপনার শক্ত সামর্থ্যে কি করিয়া অবিশ্বাসী হয়, কর্ম্মপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া কেনই বা অসার অমূলক যুক্তির অবতারণা করে, তাহা আমাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। যাহারা অতদূরও যাইতে নারাজ বা ধারণা করিতে অক্ষম তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রভৃতিতে দেখা যায় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ রাজত্ব, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পাইতে বসিল। পরাধীন হইলে অশন বসনের চিন্তা যতটা বাড়ে জাতি বা ব্যক্তি ততটাই হীন হইয়া যায়। তাই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ক্রমেই শুল্ক বৃদ্ধি করিতে

লাগিলেন। ভারতের শিল্পমাত্রেই এইরূপ দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভারতের বাজার হইতে অদৃশ্য হইল। তারপর বিদেশ হইতে শিল্পাদি আসিয়া ভারতের বাজারে পল্লীতে, হাটে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িল আর দেশীয় শিল্পগুলি মাথা তুলিবে কি প্রকারে?

তারপর আরও একটুকু দেখিতে হইবে, যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা মাল না পাইয়া বা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে না পারিয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিল। অনেককে কোম্পানী চাকুরী দিতে-ছিলেন। তাহারা চাকুরী গ্রহণ করিয়া রাজদরবারে উচ্চপদ পাইল, অনুপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তির স্থান বেতন গ্রহণ করিল। কিছুদিন পর ব্যবসায়ের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া এবং চাকুরীতে আয়ের নির্দ্দিষ্ট পন্থা পাইয়া সকলেই ইহার জন্য লালায়িত হইল এবং ব্যবসাকে ঘৃণা করিল। রাজদরবারে সম্মানও হইল আমাদের জাতীয় জীবনে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

তারপর হীনবীর্য্য হইবার আরও একটী কারণ আছে। যে সকল ব্যবসায়ী রাজদর-বারে সম্মানলাভের অনুপযুক্ত অথবা ব্যবসা ত্যাগ করিতে চাহিল না তাহারা কোম্পানীর বড় বড় আড়ৎ দেখিয়া চমকাইয়া গেল। দশ হাজার টাকার জিনিষ লাখ টাকার মত করিয়া বড় বাড়ীতে সাজাইয়া গ্রাহককে দেখাইতে পারিল না। এই সম্মোহন আজ পর্য্যন্তও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় নৌবাণিজ্যে আমরা যে সব ব্যবসায়ীদিগের কৃতিত্বের পরিচয় পাই তাঁহা-দের অনেকে যে বাঙ্গালা দেশের লোক ছিলেন এ ধারণা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু কিম্বদন্তী আছে, গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাই বিশ্বাস করিতে হয়। দেশীয় মাড়ওয়ারী, পার্শী, সাহা, তিলি প্রভৃতি জাত ব্যবসা করিয়া থাকিলেও তাহাদের উন্নতির প্রণালীকে আমরা টানিতে চাই না। বর্ত্তমান ব্যবসার প্রণালীকে ধরিতে চাই অথচ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসার বুদ্ধি বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের কাছে শিক্ষার্থ গ্রহণ করিতে চাহিনা। শুধু বিলাতে গিয়া ব্যবসা বিভাগ হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলেই ব্যবসা-হিসাবে তাহার কোন মূল্য হয় না, যদি অভিজ্ঞতা না থাকে।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থাও আমা-দের মত হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশের শিল্প ব্যবসায় জগতের কাছে এক নূতন জিনিষ হইলেও পাশ্চাত্য শিল্প বিভাগের কাছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইবে না। আমাদের তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পীরা যে জোর জবরদস্তি করিয়াছিল সে শুধু তাহাদের ব্রহ্মদেশ এখন অজ্ঞতাবে ভরপুর, ব্রহ্মবাসীরা আশাতীত অর্থ পাইয়া চাকুরী গ্রহণ করিতেছে; অর্থাগমের নির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরিতে পাইয়াছে। কিছুদিন পর সাহেব বাড়ীর স্থান দেখিয়া আমাদেরই মত তাহাদের হইবে; এখনই অনেকটা হইয়া গিয়াছে। ব্যবসাকে আর তাহারা পছন্দ করে না। আর ১৯২০ বৎসর পর ব্রহ্মের শিল্প ভারতে পৌঁছিবে কি না সন্দেহ। আরও কিছুকাল পরই ব্রহ্মের শিল্প ভারতে একটা কিম্বদন্তী হইয়া থাকিবে।

আজ ভারতের চাকুরীর বাজার যেমন হইয়াছে, স্বার্থ লোলুপ সারমেয়দিগের সম্মুখে এক টুকরা রুটি লইয়া কামড়াকামড়ি চলিতেছে ব্রহ্মের অবস্থাও ঠিক তাই হইবে।

যদি আমাদের জাতীয় জীবনে নৈষয়িক উন্নতির নূতন পন্থা না পাই তাহা হইলে চাকুরী আর তুকুরবৃত্তির অপেক্ষা করিবে না। বিজিত জাতির ইহাই পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত। জাতি এই ভাবেই হীনবীর্য্য হয়। মান অপমান প্রকৃত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হইয়া জাতীয়তা বিনাশের হেতু হইয়া থাকে।

• •
•

১০। সমাজের গতি কোন দিকে

যাহার কিছু করিবার ইচ্ছা আছে, প্রাণের ভিতর হইতে একটা বিষম পরিবর্ত্তনের জন্য তোল পাড় করে সেই কিছু চায় ইহা সহজেই বুঝা যায় নতুবা সংসারের অবস্থা এমন হইত না। মানুষের শক্তি চেতন তাই সে এমন ব্যগ্র, একটা পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত। অবশ্য মানুষের মধ্যেও অচেতন অনেক আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য প্রাণীতে কোনই প্রভেদ নাই। তাহারা ভাল মন্দও প্রাণদিয়া বুঝে না একটা লোক যেখান বোধশক্তি আছে মাত্র। এ জিনিষটাকে আমার বলিতে হইবে তাই আমার বলে, ওটা তোমার, তাই তোমার। এরূপ লোক সমাজের অনিষ্টকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোক যখন ভাল জিনিষ পাইতে চায় তখনই তাহাকে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে শোনা যায়, তাহার আকুল আর্ত্তনাদে পৃথিবী ভীতা হয়, কিন্তু কোন খারাপ জিনিষ যখন ব্যক্তিগত চরিত্রের ভিতর দিয়া সমাজকে দূষিত করিতে থাকে তখন কোন প্রকার ব্যাকুলতা আসে না। সেই সময় কেবল মাত্র সম্মোহনই আমাদিগকে সাম্‌নে আরও সাম্‌নে টানিতে থাকে। কিন্তু তারও একটা পরিবর্ত্তন না-ই কি? পরিবর্ত্তন প্রত্যেকেরই আছে। মোহের যা পরিবর্ত্তন তা ভয়ঙ্কর। আমরা সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান। আমরাই সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের স্রষ্টা আমরাই সেই পরিবর্ত্তনের স্রষ্টা। তাই আমরা আজ ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ধর্ম্ম কি? তাহা হয়ত আমরা অনেকেই বুঝিনা তবুও বলি সমাজে ধর্ম্ম নাই। সমাজে একজন ন্যায়পরায়ণ লোক নাই দশজনে একজনকে বড় বলিয়া মানিতে চায় না। একথা কি ঠিক?

আমরা কখনই ভাবিতে পারিব না সমাজে ধর্ম্ম নাই এবং ধার্ম্মিক বা ন্যায়পরায়ণ কেহ নাই। তাহা হইলে সমাজ এতদিন চুরমার হইয়া যাইত। রাজতন্ত্র অথবা সাধারণতন্ত্র যাহাই হউক না কেন প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের দ্বারা রক্ষিত। আমাদের সমাজেও ন্যায়পরায়ণ বা ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন নিশ্চয়ই, তবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের নিজেদের স্বার্থত্যাগই নেতার প্রকৃত অর্চ্চনা।" সে স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে বা ভাবিতে অনেকেই চায় না। সেটাকে একটা বাতুলতা বা দুর্ভাবনা বলিয়া উড়াইতে অনেকেই বদ্ধ পরিকর।

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পাইতে হইলে আর এক প্রকার গভীর সাধনার প্রয়োজন —ভালবাসা। ভালবাসা অর্থ দুইয়ে, একে অথবা দুইয়ে চারের মধ্যে একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন বা নিভৃত আলাপ নয়। রাশি রাশি লোভনীয় বস্তু হাতে পাইয়াও অন্যের সামান্য অপরাধের বোঝা টানিয়া লইয়া বিপক্ষকে আলিঙ্গন করাই প্রকৃত ভালবাসার পরিচায়ক। মোট কথা স্বার্থের সম্বন্ধই সেখানে নাই।

সকল পদার্থকেই আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া

ভাষা বিচার করিতে হয়। ভালবাসা যখন প্রাণ হইতে বাহির হয় তখন আর পাত্রাপাত্র বিচার করে না। তাই মুচি, মেথর, কুলি সমস্তে আপনার জন হইতেও আপন বলিয়া মনে হয়। যে কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বকে ক্ষুদ্র ভালবাসা দ্বারা বদ্ধ না করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে দেখা যায় ভালবাসার সীমা না—যতদূর ছাড়িয়া দিবে ভালবাসা আপন পথ আপনি খুঁজিয়া লইবে। এক পরিবারের এক ব্যক্তিকে ভাল বাসিয়া ক্ষুদ্রতার পরিচয় না দিয়া তাহার পরিবারের সকলকে ভাল বাসিব ইহাই আমাদের উচিত।

মুচি, মেথর ত দূরের কথা আমরা যাহাদিগকে লইয়া একত্র বসতি করি, আমাদের আপদে বিপদে যাহারা আমাদের স্বজন অপেক্ষাও নিকট বন্ধু তাহাদিগকেও আমরা প্রাণ দিয়া ভাল বাসি একথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। বলিলে অন্যায় বলা হইবে। তাহারা চিরদিনই সাধ্য মত সকলকে বিশেষতঃ মনিবকে যতটা আপনার করিতে পারিয়াছে মনিব ততটা পারেন নাই। তাহারা মনিবের দুঃখে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের ভালবাসা একটা লোক দেখান ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভাল বাসাটা যেন কোন নিয়ম বা উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত না হয়। ভালবাসা ভালবাসারই জন্য এটা আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে কারণ অনেকদিন আমরা ভালবাসাটাকে 'উপহার' করিয়া তুলিয়াছিলাম।

আমরা প্রাণে মনে সব সময় যেন বুঝিতে চেষ্টা করি—উভয়ের বা বহুর মধ্যে এমন কোন্ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যাহার জন্য আমরা এক হইব নিজের ক্ষতি করিয়াও অন্যের উপকার করিব। অন্য আর একজনকে আমার শরীরের রক্ত মাংসের মত মনে করিব। একটা লোকের মৌখিক দু'চারটা আলাপন শুনিয়া আপনার মনে করার পূর্ব্বে তাহার অন্তস্তলে যাইয়া দেখিব, সে এবং আমি কতটা আপন, বরং যখনকার জন্য ভালবাসা ততটুকু থাকাও ভাল তবুও আইনের নিয়মে বা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া আপন করিতে গেলে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ আসিতে পারে। আমরা রাজনৈতিক ভালবাসা চাহি না, উহাতে কেবল চালচলতির মারপ্যাঁচ আলাপ ব্যবহারে ধূর্ত্ততা আছে অবশেষ ছুরি লুকাইয়া মুখে হাসি। আমরা সামাজিক ভালবাসা চাই। যে ভালবাসার চাল চলতিতে সারলা, আলাপ ব্যবহারে সারলা, প্রতি হাসিতেই সারল্যের প্রকাশ সেটা কে চালায়? বিশ্ব সমাজ যে ভালবাসায় ভবিষ্যযুগে ভূষিত হইবে আমরা সেই ভালবাসা চাই। আমাদিগকে ভালবাসা গড়িতে হইবে না,—মার্জ্জিত করিতে হইবে। যে ভালবাসায় মানুষ অন্যায় দেখিয়া পরোক্ষে অনুতাপ করে, বিচ্ছেদের ভয়ে ক্ষতি সহ্য করে সে ভালবাসা মহত্ত্বদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল হইলেও তাহা সমূহের কাছে, শেষ পরিণতির নিতান্তই প্রতিকূল। যে ভালবাসায় মানুষ অল্পেকেই অন্ধ হয় সেই ভালবাসাকে সদুদ্দেশ্যে চালিত করিলে সকল বিপদ কাটিয়া যায়, চিরানন্দের বিকাশ হয়। তখন একের সদুদ্দেশ্য দুই জনেরই স্বার্থ হইয়া দাঁড়ায়। নিজের প্রাণকে যতটুকু সরল করা যায় অন্যকেও ততটুকুই সরল দেখা যায়।

তাই বলিতেছি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে যখন আমাদের ভালবাসা ছড়াইব তখন যেন

সমষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ না থাকি মেথরের শ্রেণী, মুচিরশ্রেণী, তন্তুবায়েরশ্রেণী এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রেণীগুলিকেও যেন আমাদের ভালবাসার পাত্র করিতে পারি তাহাই প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে

ভালবাস যেন সাময়িক সহৃদয়তার উত্তেজনায় মুগ্ধ হইয়া পরক্ষণেই আবার অবসাদগ্রস্ত না হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। কোনরূপ যুক্তি তর্ক আসিয়া স্থান অধিকার না করে তাহাই প্রধান দ্রষ্টব্য। ভালবাসা যখন সসীম ছাড়িয়া অসীমে যাইবে—আমাদের সকলের ভালবাসার মধ্যে আর কোন হীনভাব থাকিবে না তখনই ভালবাসার পূর্ণবিকাশ হইবে। সেই সময়ই আমরা দেখিতে পাইব—আমাদের সমাজ রক্ষক বা নেতা আবির্ভূত হইয়াছেন— তিনি "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"।

আমাদের নবম অবতার পর্য্যন্ত দেখিতে পাই—অবতারগণ সকল শ্রেণীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, প্রস্তর, তারপর মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শ্রেণীই তাঁহাদের অধিকারে ছিল। আমাদের সমাজরক্ষক ভালবাসা দ্বারা গঠিত হইবেন। আমরা ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে শুধু ভালবাসারই খেলা দেখিতে পাইব। অকৃত্রিম ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া শত শত নর—নারায়ণ দেখা দিবেন। তখন আমরা বুঝিতে পারিব এই আমাদের সভ্যতা সাধনের প্রারম্ভকাল।

আহ্বান

যদি সাধন করিতে চাও সাধনা তোমার
হে প্রিয় তাপস মোর,
তবে নীরবে বিজনে আসি কর আরাধনা
দিবস যামিনী ভোর।
লাজ-মান-ভয় যত, কর দূরে পরিহার
দূর কর মন হতে বিষাদের ভার ;
ক্ষুদ্র স্বার্থ সঁপি দিয়ে মহাসাগরের জলে
নিভৃতে দাঁড়াও আসি মহাকাশ তলে।

কেন, এ রোদন কেন ? সরম ! সরম !
মুছে ফেল তব লোর
যদি সমাধি হয়েছে সাধ কিশোর বয়সে
হে প্রিয় তাপস মোর,
তবে, নীরবে বিজনে আসি কর আরাধনা
দিবস যামিনী ভোর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

রুশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য *

রুশেরা প্রথমে গ্রীসের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। গ্রীক প্রভাবেই রুশিয়ায় শিল্প ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে হ্যান্সা-পরিষদের বণিকেরা নবগরুড নগরে ব্যবসায় প্রবর্তন করে। কিন্তু আইভান ওয়াসিল-জেভিচ কর্তৃক এই নগর ধ্বংস করা হয়। তখন ইংরাজ এবং ওলন্দাজদিগের সঙ্গে রুশের দ্রব্য বিনিময় সুরু হয়। শ্বেত সাগরের পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বাণিজ্য সহজে নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু রুশ-শিল্প ও সভ্যতার যথার্থ প্রবর্তক পিটার দি গ্রেট। তাঁহার কার্য্যফলেই বর্ত্তমান রুশিয়ার গোড়া পত্তন হইয়াছে। বিগত ১৫০ বৎসর ধরিয়া রুশ সমাজে যত কিছু দেখিতেছি সকলই এই কর্ম্মবীরের প্রতিভা প্রসূত। রুশজাতির সভ্যতা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, রাষ্ট্রশক্তি সুদৃঢ় ও অনুকূল হইলে অল্পকালের ভিতরেই দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। পিটার রুশিয়ার রাষ্ট্র-শক্তিকে সকল দিক হইতেই প্রবল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে রুশিয়া কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধহীন অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতিপুঞ্জের আবাস স্থান ছিল। পিটার এই জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিলেন। তাহার পর হইতে রুশসমাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উন্নতিশীল শিল্পী ও বণিক দেখা দিয়াছে। গমনাগমনের সুবিধা, খাল ও রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়েও রাষ্ট্রের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফলতঃ অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। রুশিয়া ইয়োরোপের নৌবল সমন্বিত ব্যবসায়শীল বণিক সমাজে স্থান পাইয়াছেন। পিটার যে কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভিতরেই এই সকল সমৃদ্ধির বীজ ছিল।

রুশিয়ার উন্নতি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে বহুকাল লাগিয়া ছিল। নিতান্ত অসভ্য সমাজ বড় শীঘ্র জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। দ্বিতীয় ক্যাথেরিণ পিটারের আদর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে ছিলেন। তিনি বহু বিদেশীয় শিল্পী ও বণিকগণকে স্বদেশে আনাইয়া তাহাদিগের জন্য নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তথাপি লৌহ, কাচ, সূতা ইত্যাদি শিল্প তাঁহার আমলে শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি রুশিয়ার কৃষিক্ষেত্র এবং আকর হইতে যে সমুদয় প্রাকৃতিক উপকরণ উৎপন্ন হইত সেগুলির উপযুক্ত শিল্পও বিশেষ উন্নত হয় নাই।

এই অবস্থায় রুশিয়ার শিল্পের অত্যধিক উন্নতি বাঞ্ছনীয়ও ছিল না। সভ্যতর দেশের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ রক্ষা করিলেই রুশ সমাজের যথার্থ উপকার হইত। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি এবং উচ্চ শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি কিছুকাল তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ানী সমর, Conti-

* ফ্রেড্রিক লিষ্ট প্রণীত "জাতীয় অর্থবিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

mental Blockade দ্বারা বিলাতীদ্রব্যকট প্রচার ইত্যাদি দ্বারা রুশিয়ার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল। বিদেশ হইতে শিল্প দ্রব্য আসা বন্ধ হইল—বিদেশে প্রাকৃতিক উপকরণ পাঠানও স্থগিত থাকিল। সমুদ্রপথে রুশিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য আর চলিতে পারিল না—স্থলপথে জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের সঙ্গে সম্বন্ধ মাত্র রহিয়া গেল। মোটের উপর রুশিয়ার ক্ষতি হইল।

নেপোলিয়ানী সমরের অবসানে রুশেরা পুরাতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে উৎসাহিত হইল। অবাধ বাণিজ্য নীতির পৃষ্ঠপোষক ইর্ক্ত সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। বিদেশীয় শিল্প দ্রব্য দেশের বাজার ভরিয়া দিল। স্বদেশী কারখানাগুলির অধোগতি হইল। বিলাতী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কম মাল টিকিতে পারিল না। ইর্ক্তের শিষ্য ও বন্ধুগণ বলিতে থাকিলেন—"কোন আশঙ্কার কারণ নাই। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময়ে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াই থাকে। অল্পকাল পরেই অবাধবাণিজ্য-নীতির সুফল দেখিতে পাইবে।" অবশ্য ঘটনাচক্রে রুশিয়ার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ইউরোপের নানা দেশে শস্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—এইজন্য রুশিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য ঐ সকল দেশে রপ্তানি হইতে থাকিল। সুতরাং বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে স্বদেশী শিল্পের যত ক্ষতি হইয়াছিল এই শস্য রপ্তানির প্রভাবে তাহার পূরণ হইতেছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রে কিয়ৎকালের জন্য অবাধবাণিজ্যের কুফল বুঝা যায় নাই।

কিন্তু বিদেশে দুর্ভিক্ষ বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই—রুশশস্যের রপ্তানি অল্পকালের ভিতরই মন্দগতি হইতে লাগিল। বিলাতের রাষ্ট্র Corn-Law বা শস্য বিধি জারি করিয়া বিদেশীয় শস্য আমদানি বন্ধ করিয়া দিলেন। রুশিয়ার শস্য ও কাষ্ঠ বিলাতে যাইতে পারিল না। তখন হইতে রুশিয়ার দুরবস্থা স্পষ্ট হইতে থাকিল। তখন ইর্ক্ত প্রবর্ত্তিত মতবাদ ও বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে রুশসমাজে আন্দোলন সুরু হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবীর কাউণ্ট নেসেল রোড প্রচার করিলেন—"প্রত্যেক দেশের স্বার্থ স্বতন্ত্র—সুতরাং তাহার রাষ্ট্র-নীতি এবং ব্যবসায়-নীতিও স্বতন্ত্র। এই কথা স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বাণিজ্যবিধি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এতদিন আমরা ভাবিতেছিলাম—দেশে দেশে কোন দ্বন্দ্ব নাই—এক দেশের লাভ হইলে অন্য দেশেরও লাভ হয়, এক দেশের ক্ষতি হইলে অন্য দেশেরও ক্ষতি হয়। এই বুঝিয়া আমরা স্বদেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করি নাই। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতেছি কি? এক জাতির লাভ হইতে থাকিলেই অন্যান্য জাতির লাভ না হইতেও পারে। বরং একজনের লাভ অপরের ক্ষতির কারণ। এই কারণে রুশিয়ার সকল বিভাগেই ক্ষতি দেখিতেছি। আমরা বিদেশে মাল রপ্তানি করিবার সুযোগ পাই না। আমাদের স্বদেশী শিল্প অবসন্ন প্রায়—আমাদের টাকা দেশে থাকিতেছে না—আর বড় বড় কারবারের মালিকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছেন।"

কাজেই স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইল—সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিল। ইর্ক্ত এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মত এই আন্দোলনে ভাসিয়া গেল। বিদেশ হইতে মূলধন রুশিয়ায় আসিল—বিদেশীয় বিচক্ষণ কারিগর, বণিক ও শিল্পী রুশিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন

করিল। ইংলাণ্ড ও জার্ম্মাণির লোকেরাই রুশসমাজে স্থায়ী ঘর করিতে বেশী অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক—কাজেই জমিদার এবং রাজরাজড়াগণও এই দিকেই ঝুঁকিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ জমিদারীর ভিতর নানা শিল্পকেন্দ্র ও কারখানা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দেশের নানা স্থানে নানা কারবার চলিতে লাগিল। পশমবয়নের কার্য্য বিশেষ প্রসারলাভ করিল। তাহার ফলে পশমের কাটতি যথেষ্ট হইত। এইজন্য মেষপালকগণ তাঁহাদের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে থাকিল—মেষপালন বিদ্যাও উন্নত হইল। চীন, পারস্য এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়িয়া চলিল। ফলতঃ রুশিয়ার বাণিজ্য-সচিব সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সৌরবময়ী ভাষায় প্রকাশ করিলেন।

জার্ম্মাণেরা দুঃখ করিতেছেন—"রুশিয়ার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জার্ম্মাণির উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের ক্ষতি হইয়াছে।" তাহা ত হইবেই। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতির স্বার্থ স্বতন্ত্র। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। জার্ম্মাণেরা যদি আশা করে যে রুশিয়া জার্ম্মাণসমাজের উপকার করিবে তাহা হইলে ইহাদের মত বেকুব দুনিয়ায় আর কেহ নাই। জার্ম্মাণদের কথা ভাবিবার জন্য রুশিয়ার মাথাব্যথা হইবে কেন? এই জন্যই জার্ম্মাণদিগকে বলিতেছি—"ওহে বাপু, একটা অবাধ বাণিজ্যের বুধা বলিয়া নিজের গলায় নিজে ছুরি মারিও না। মানবজাতির কথা না ভাবিয়া জার্ম্মাণ জাতির কথা ভাব। বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা না হইয়া স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া যাও। মানবজাতির উদ্ধারকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্বজাতীয় দুরবস্থার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখ।" রুশেরা তোমাদের মত নির্ব্বোধ নয়। তাহারা জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল রকম বুঝে। তাহাদের নিকট তোমরাও স্বদেশ হিতৈষণা শিক্ষা কর।"

বলা বাহুল্য ইংরাজ রুশিয়ার স্বদেশী-সংরক্ষণ-প্রচেষ্টায় ভীত হইল। কারণ ইহার ফলে রুশেরা প্রথমতঃ ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসায় হিসাবে অধীনতার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রুশিয়ার ও ইংলণ্ডে এশিয়ার বাণিজ্য ও বাজার লইয়া একটা তুমুল প্রতিযোগিতা সুরু হইতে চলিল। ইংরাজ না হয় সস্তায় মাল তৈয়ারী করিল। কিন্তু মধ্যএশিয়ায় মাল পাঠাইতে ইংরাজের খরচ যথেষ্ট—অথচ মধ্যএশিয়া রুশিয়ার ঘরের কোণে। কাজেই ইংরাজকে এই বাজার হইতে হঠাইয়া দেওয়া রুশের পক্ষে নিতান্তই সহজ। তাহাছাড়া রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রভাবও এশিয়ায় যারপর নাই বাড়িয়া যাইবার কথা। রুশেরা ইউরোপের মাপ কাঠিতে অসভ্য বটে—কিন্তু এশিয়াবাসীর সঙ্গে তুলনায় যথেষ্ট সভ্য।

রুশিয়া সম্প্রতি এক বিরাট বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রথমস্তরে পদার্পণ করিল। এই ভবিষ্যৎ গৌরবের যথার্থ অধিকারী হইবার জন্য বর্ত্তমানে রুশিয়ার কতিপয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ রুশিয়ার শাসন প্রণালী খানিকটা উদার করা আবশ্যক। তাহা না হইলে শিল্পীদিগের সুবিধা এবং শিল্পের চরম উন্নতি হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রুশসাম্রাজ্যের প্রদেশ-শাসন এবং নগর-শাসন বিস্তৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করা আবশ্যক।

জনগণের ক্ষমতা ও অধিকার শাসনকার্য্যে বিস্তৃত না হইলে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ কশিয়ার গোলামজাতিকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। চতুর্থতঃ, রুশসমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। এইরূপ এক সম্প্রদায় গঠিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পঞ্চমতঃ কশিয়ার ভিতর সমবাগমনের সুবিধা বেশী নাই। রীতা নির্ম্মাণে সাম্রাজ্যের বৎসরোনাস্তি অর্থব্যয় করিতে হইবে। অধিকন্তু যথা এশিয়ার সঙ্গে যাতায়াতের পথও সুগম ও সুরক্ষিত করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কশিয়ার সম্মুখে এই সকল সমস্যা রহিয়াছে। এই গুলির সমাধান হইতে থাকিলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, অর্ণব-বাণিজ্য ও নৌবল দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিবে। এই কথা বুঝিয়া কশিয়ার কৃত্যধিকারিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

রংপুরে নবম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কৃষিবিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন আমি অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অকস্মি নিমন্ত্রণ পাইলাম, তখনই বুঝিলাম যে সম্মিলনের কৃষি-সাহিত্য বিভাগের পৃথক সভাপতির আবশ্যকতা আপনারা অনেক পরে অনুভব করিয়াছেন এবং হাতের কাছে আর কাহাকেও না পাইয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এই সভার সভাপতিত্ব করিবার আমার যোগ্যতা আদৌ নাই আমি জানিতাম কিন্তু পাছে কাহাকেও না পাইয়া আপনারা বিপন্ন হন এই ভয়ে এই গুরুভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র বিজ্ঞান-সেবী, আমার দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন সম্ভবপর নহে, তবে ভরসার কথা এই যে আজ এই কৃষিশিল্পবাণিজ্যের বিষয়প্রতিযোগিতার দিনে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন। আমিও সেই সুরে সুর মিশাইয়া কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা মোটা কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিব। বলা বাহুল্য কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে আমার হাতে কলমে কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কৃষি বিষয়ক পুস্তক ও কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টাদি পাঠে আমার যেটুকু ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই এখানে বলিতেছি। তাহার উপর সময়াভাবে যাহা বলিবার ছিল তাহাও গুছাইয়া লিখিতে পারিলাম না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কৃষি সাহিত্য

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত আবহমান কাল কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, আছে এবং চিরকালই থাকিবে। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত যে বিশাল উর্ব্বরা ভূমিভাগ আমরা বহুপুণ্য ফলে মাতৃভূমিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার

কর্ষণে চিরদিনই সোণা ফলিয়াছে ও ফলিবে। শিল্পবাণিজ্যে ভারতভূমি একদিনে সমগ্র জগতের মধ্যে অগ্রতম শীর্ষস্থানীয় ছিল, এবং আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মাতৃভূমি শিল্পবাণিজ্যে আবার তাহার পূর্ব্বাসন লাভ করিবে, তবুও ভারতের ভূমিজাত অন্ন চিরকালই ভারতের কেন, বহু দেশ বিদেশের, নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে ও করিবে।

অধুনা ভারতের শতকরা আশী জন ব্যক্তির উপজীবিকা কৃষি। কৃষিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিল্প। আপনারা এই সর্ব্বপ্রধান শিল্পের মাতৃভাষায় আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানে কতগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে বঙ্গ সাহিত্যের কৃষিবিভাগে খুব বেশী পুস্তকাদি নাই। অথচ আধুনিক উন্নত কৃষিবিদ্যার লব্ধ তথ্যগুলি মাতৃভাষার প্রত্যেক গৃহস্থকে জ্ঞাত করাইতে পারিলে অনেক সুফল হইতে পারে। সরকার বাহাদুর কৃষিবিদ্যার আলোচনার জন্য পুসা, স্যাবোর, পুনা প্রভৃতি স্থানে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন বাঙ্গালাদেশে ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি সহরে কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে (Experimental farm) কৃষির উন্নতির জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছেন। এই সকল স্থানে পরীক্ষায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি ইংরাজিতে কৃষি বিভাগের রিপোর্টে এতদিন আবদ্ধ থাকিত; যাহার জন্য সেগুলি আবিষ্কৃত হইল সেই গৃহস্থকে সেগুলি মাতৃভাষায় জানাইবার এতদিন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সকল পরীক্ষার ফল "কৃষি সমাচার" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়া একদিকে মাতৃভাষার দৈন্য দূর করিবেন এবং অপর দিকে দেশে উন্নত কৃষি শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের কৃষি-সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সফল হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ও কৃষি

আজ কাল এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের দিনে স্বভাবতই চাকুরি সম্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষির দিকে এখনও পড়ে নাই। বিশ পঁচিশ টাকায় কেরাণীগিরিতে আর চলে না, বি, এ- এম, এ,র বাজার দর মাসিক পঞ্চাশ ষাইট টাকায় দাঁড়াইয়াছে—এক্ষেত্রে আয়ের অন্যবিধ পন্থা উন্মুক্ত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক দৈন্য ঘুচিবে কি করিয়া বুঝিতে পারি না। উপরন্তু যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, তখন কৃষি শিল্প প্রভৃতি আয়ের নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাজার দর আরও কমিতে থাকিবে। শিল্পোন্নতির জন্য অধিকাংশ স্থলেই হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনের প্রয়োজন; তদুপরি শিল্পশিক্ষা ব্যবসাবুদ্ধি প্রভৃতি অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। এসকল সংগ্রহ করা দুরূহ। বড় রকমের কৃষি কারবার চালাইতেও এই সকলের প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিক যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার জন্য

আমরা লালায়িত তাহা কৃষিকার্য্যের সাহায্যে অর্জ্জন করিতে শিক্ষিত গৃহস্থের পুঁজিপাটা ও বুদ্ধিই যথেষ্ট। যে সকল শিক্ষিত যুবক পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার চাকুরির জন্য আফিসের দ্বারে দ্বারে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন "go back to the land"। এবিষয়ে কৃষি বিষয়ক রিপোর্টাদি পাঠ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনও কোন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ করিতে পারিলে যুবকগণ স্বল্পায়াসে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। আমার বক্তব্য আপনাদের নিকট বিবৃত করিতেছি; ইহার কার্য্যকারিতা যদি যুবকগণ জীতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে সুখী হইব।

বঙ্গদেশে ধান ও পাট প্রধানতম শস্য। উপজীবিকা হিসাবে ইহাদের চাষ খুব অধিক বিঘা করিতে না পারিলে শিক্ষিত গৃহস্থের পোষাইবে না। অবশ্য অন্যবিধ চাষ বা পেশার সহিত এসকল চাষ চলিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিষের আবাদ সম্ভবপর যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে বিঘা প্রতি খুব বেশী লাভ হইতে পারে। ইহাদের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ইক্ষুর চাষ—ইক্ষুর চাষ খুব লাভজনক। তাহার উপর যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার দেওয়া হয় এবং মরিসাস, জাভা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আনীত আকের চাষ করা যায় তাহা হইলে এক এক বিঘাজাত আক হইতে ৪০ মণ পর্য্যন্ত গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মূল্য ন্যূনকল্পে ২৫০৲ টাকা এবং খরচ প্রায় বিঘা প্রতি বড় জোর ৮০৲ টাকা হইতে পারে অতএব বিঘা প্রতি লাভ অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা হইতে পারে। এবিষয়ে কৃষি বিভাগের বাঙ্গালা ১৩১৯—১৩২০ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলাদির বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

ঢাকা বিভাগে গেণ্ডারি নামক ইক্ষুর চাষই সমধিক প্রচলিত কিন্তু ঢাকা কৃষি ফার্ম্মে বিঘা প্রতি ১০ মণ চূণ, ১০০ মণ গোবর ও ৬½ মণ সরিষার খোল সার দিয়া বিঃ ১৪৭ ও ডোরাট্যানা নামক বিদেশী ইক্ষু হইতে গেণ্ডারিজাত গুড় অপেক্ষা প্রায় ডবল গুড় উৎপন্ন হইয়াছে—

নাম	তিন বিঘায় কত মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে।
বিঃ ১৪৭	১২৩
ডোরা ট্যানা	১১২
হরিদ্রা ট্যানা	১০৬
ঢাকা গেণ্ডারি	৭৮

বিঃ ১৪৭ হইতে বিঘা প্রতি ৪০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। রংপুর ফার্ম্মেও ইংরাজি ১৯১২—১৩ সালে একই প্রকারে আবাদ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছিল—

সাদা ট্যানা	তিন বিঘায়	১৩০ মণ গুড়
ডোরা ট্যানা	"	১২০ " "
মরিসাস		১০৪
গেণ্ডারি		৭১ "

রাজসাহী ফার্ম্মেও গত কয়েক বৎসর এই বিঃ ১৪৭ ও ডোরা ট্যানার চাষ হইতেছে, আমি সেগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছি। লম্বায় ৮।১০ হাত ও দেখিতে খুব মোটা। সেখানেও বিঘায় ৪০ মণ ভাল গুড় হইতেছে। রাজসাহী ফার্ম্মের অধ্যক্ষ তিন বিঘা প্রতি নিম্নলিখিত সার দিতে উপদেশ দেন।

২০০ মণ গোবর
১০ মণ রেড়ীর খোল
৬ মণ হাড়ের গুঁড়া।

চুঁচুড়ার ফার্ম্মেও আখ ইক্ষু হইতে বিঘা প্রতি ৩০ মণের উপর গুড় হইয়াছে। যাঁহারা বেশী সার দিতে পারিবেন না তাঁহারা যেন এই সকল বিদেশী আকের চাষ না করেন—ঢাকার ফার্ম্মের এই মত। আমাদের দেশী আকের চাষে অত ফলন হয় না, বিঘা প্রতি ২০।২৫ মণ গুড় হয়, কিন্তু সার কম লাগে বলিয়া উহার চাষেও বিঘা প্রতি প্রায় ১০০৲ হইতে ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বিঘা প্রতি কেবল ১০০ মণ গোবরসার দিয়া ও বিনা সিঞ্চনে রাজসাহী ফার্ম্মে ১৯১১—১২ সালে নিম্নলিখিত গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভেল্লামুণ্ডী নামক ইক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আকের নাম	প্রতি বিঘার খরচ	প্রতি বিঘার উৎপন্ন গুড়	প্রতি বিঘার লাভ
গেণ্ডারি	৪০৲	২৪	১১৫৲
শ্যামসারা	৩২৲	২১	১৪১৲
ভেল্লামুণ্ডী	৩৫৲	২৮	১৪৮৲
দেশীয় বাগড়ী	৩১৲	২১	১০২৲

তবেই দেখা যাইতেছে যে ইক্ষুর চাষে খরচ বাদে বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার খুবই সম্ভাবনা। ১৫০৲ টাকার জায়গায় ১০০৲ টাকা লাভ হইলেও ১২ বিঘা জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ করিলে বৎসরে ১২০০৲ টাকা অথবা মাসে ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। এই ১২ বিঘা জমির চাষের খরচের জন্য ৪০০৲।৫০০৲ মূলধন হইলেই চলিতে পারে। যাঁহারা বেশী উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহারা ১০০ বিঘার চাষ করিলে মাসে ৪০০।৫০০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। যুবকগণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? (বিদেশী আকের cuttings পাইতে হইলে রাজসাহী ডিভিসানের অধিবাসীরা Superintendent of Agriculture Rajshahi Division এর নিকট আবেদন করিলে পাইবেন। অন্যান্য ডিভিসানের অধিবাসীরা তত্রত্য কৃষি বিভাগের Superintendentএর কাছে আবেদন করুন)।

(২) তামাকের চাষ—তামাকের চাষ আর একটি লোভজনক চাষ। রংপুরের বুড়ির হাটে কৃষি ফার্ম্মে বিভিন্ন জাতীয় তামাকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, সুমাত্রা দেশ হইতে আনীত চুরুটে বহিরাবরণের উপযোগী তামাকের চাষ বঙ্গদেশে অন্ততঃ রংপুর জেলায় খুব ভাল হইতে পারে। উপযুক্ত সার দিয়া ১৯১০—১১ সালে তিন বিঘার ১৪১৮৵০ আনার সুমাত্রা তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মাত্র ২২৪৵০ আনা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং খরচ বাদে ১১৯৪৵০ আনা লাভ হইয়াছিল। ১৯১১—১৯১২ সালেও তিন বিঘা প্রতি খরচ খরচা বাদে ৬২৪৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। খুব কম করিয়া ধরিলেও এইরূপ তামাকের চাষে এই

সকল রিপোর্ট পড়িয়া বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৩) আলুর চাষ—আলুর চাষে অত লাভ না হইলেও বিঘা প্রতি পঞ্চাশ ষাট টাকা হইতে পারে। বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, অনেক স্থানে দার্জ্জিলিংএর আলুর বীজ হইতেই আলুর সর্ব্বাধিক ফলন হয়। ১৯১১—১২ সালে রাজসাহী ফার্ম্মে তিন প্রকার আলুর বীজ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ লাভ হইয়াছিল।

আলুর নাম	প্রতি বিঘায় খরচ	প্রতি বিঘায় উৎপন্ন আলু	প্রতি বিঘায় লাভ
ইটালীয়	২৯৲	৩৮ মণ	৪৯৲
দার্জ্জিলিং	২৩৲	৪৮ ,,	৭৬৲
নৈনিতাল	৩০৲	২২ ,,	১৫৲

দেখা যাইতেছে যে দার্জ্জিলিং এর আলু হইতে লাভ সব চেয়ে বেশী। রংপুর আদর্শ কৃষি ফার্ম্মে ১৯১১ সালে বরবটীর সবুজ-সারের (green manure) ব্যবহারে প্রতি তিন বিঘায় ২৫৪ মণ দার্জ্জিলিং আলু উৎপন্ন হইয়াছিল এবং খরচ বাদে তাহাতে ১২৩ টাকা লাভ হইয়াছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ফার্ম্মে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্ততঃ এই তিন দ্রব্যের মধ্যে যে কোনও এক বা ততোধিক দ্রব্য চাষ করিতে পারিলে উদরান্নের ব্যবস্থা কৃষি হইতেই হইতে পারে। আরও সুবিধা এই যে ঐ তিন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবিতে হইবে না। কারণ আমাদের দেশে গুড়, আলু ও তামাকের কাটতির অভাব নাই। যাঁহার যেরূপ পুঁজি ও সামর্থ্য তিনি পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ বা একশত বিঘা চাষ করিয়া কৃষি বিভাগের রিপোর্ট সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। উহার মধ্যে একটি কথা আছে-নিজে খাটিতে হইবে। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। নিজেকে সব দেখিতে শুনিতে হইবে। পরিশ্রম করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মাঠে যাইতে হইবে। তাহার উপর যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা কৃষি বিভাগের অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশেরই কৃষির উন্নতির জন্য দেশের স্থানে স্থানে ফার্ম্ম খুলিয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। সেই সকল পরীক্ষিত ফল যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা কৃপার পাত্র। মনে করিবেন না যে, এই সকল ফার্ম্মে ঘোড়ার দ্বারা ষ্টীম বা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে কার্য্য হয়। সেখানেও সাধারণ লাঙ্গলাদি যন্ত্র অথবা তাহাদের কোন উন্নত সংস্করণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সার প্রভৃতি যেরূপ ও যত পরিমাণে দিতে উপদিষ্ট হইবেন তাহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। প্রথমেই জমির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল কৃষি বিভাগের কোনও কর্ম্মচারীকে জানাইলে, তিনি সেই জমিতে কোন দ্রব্যের চাষ প্রশস্ত এবং কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপে চাষ করিতে পারিলে

কার্য্যে প্রাপ্ত ফসলের সমান পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, নচেৎ সন্তায় সারিতে যাইলে আশানুরূপ ফসলের অপ্রাপ্তিতে বেচারি কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে যেন গালি না দেন। জমির জন্য যে খুব বেশী চিন্তিত হইতে হয় তাহা নহে। দশ পঁচিশ বিঘা জমি, ক্রয় করিয়া না হউক, খাজনা করিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে; চারি পাঁচশত টাকা মূলধন অন্ততঃ ধার করিয়া সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভবপর নহে। যুবকবৃন্দ বৃথা কেরাণীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে না গিয়া একবার কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে চেষ্টিত হইবেন কি?

মাঠে কৃষি প্রদর্শন

এইত গেল শিক্ষিত সমাজের কথা। দেশের কৃষকেরা ত নিরক্ষর। তাহারা ত কৃষি বিভাগের রিপোর্ট পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে উন্নত কৃষিবিদ্যার কথা মুখে বলিয়া দিলেও তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিবে না। সেই জন্য রাজা মান্ধাতা যখন হইতে এদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় যে কৃষি পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল তাহাই এতাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কৃষিকার্য্যে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা তাহার সহায়; কিন্তু অনেক বিষয়েই উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। উপযুক্ত সার প্রয়োগে উন্নত কৃষি বিদ্যার (Intensive cultivation এর) তথ্যগুলি, নূতন যন্ত্রাদির ক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে গিয়া তাহাকে হাতে কলমে না দেখাইয়া দিলে সে কিছুই বিশ্বাস করিবে না। এইজন্য হাতে কলমে কৃষি শিক্ষাদান (Field demonstration) একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া এবিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছেন; বঙ্গদেশের এক এক ডিভিসনে এক একজন বিশেষজ্ঞ Superintendent of Agriculture নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন District Inspector আছেন এবং তদ্নিম্নে অনেকগুলি Demonstrators নিযুক্ত হইয়াছেন; ইহাদের কার্য্য হইতেছে যে মাঠে যাইয়া ইহারা হাতে কলমে কৃষকগণকে উন্নত কৃষি দেখাইয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কৃষি কার্য্যে এতদিন কেবল পরীক্ষাই চলিতেছিল। ইহাদের পরীক্ষার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, ইহারা পরীক্ষিত ফলগুলি আনিয়া কৃষকের মাঠে পঁহুছিয়া দিবেন। বন্যা বাহুল্য দেশে কৃষির উন্নতি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আশা করি ইহাদের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং রাজসাহী বিভাগেই ১৯১৪ ডিমনষ্ট্রেটারের স্থানে একশত বা ততোধিক ব্যক্তি প্রতি গ্রামে গিয়া কৃষকগণকে হাতে কলমে উন্নত কৃষি শিক্ষা দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কৃষি বিভাগের যে কনফারেন্স নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেও এই মাঠে কৃষি শিক্ষাদানের প্রথার সমধিক চলন ভারতের কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কৃষক যদি স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে উপযুক্ত সার দিয়া তাহার ফসল দ্বিগুণ বা তিনগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহার চিরানুসৃত পন্থা সে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিবেই করিবে। বাঙ্গালা দেশের কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই যে ইহার মধ্যেই এই উপায়ে অনেক উপকার দর্শাইতেছে। এখানে দুই একটি

দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিঘা প্রতি একমণ হাড়ের গুঁড়া সার দিলে ধানের ফলন অনেক বাড়ে, এমন কি স্থলবিশেষে দুই গুণেরও বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আরও সুবিধা এই যে হাড়ের গুঁড়ার সার একবার ব্যবহৃত হইলে তিন বৎসর আর লাগে না। কৃষি বিভাগ হইতে প্রথমতঃ বিনা-মূল্যে বা নাম মাত্র মূল্যে হাড়ের গুঁড়া অনেকগুলি কৃষককে দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি প্রদর্শকেরা তাহার ব্যবহার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে হাজার হাজার মণ হাড়ের গুঁড়া এখন জমিতে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং লোকে অগ্রিম টাকা দিয়াও কৃষি বিভাগ হইতে হাড়ের গুঁড়া পাইতে-ছেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ বড় বেশী প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতি কৃষি বিভাগ কয়েক বৎসর ধরিয়া দার্জ্জিলিং আলুর বীজ আনাইয়া নাম মাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রজাদিগকে দিতেছেন এবং কৃষি প্রদর্শকগণ উহার চাষ দেখাইয়া দিতেছেন। তাহার ফলে এই কয় বৎসরে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এখন আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষি বিভাগ আশা করেন যে আলুর চাষ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব বঙ্গে একটি সাধারণ কৃষি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এইরূপে নানা বিষয়ে ইতিমধ্যে উন্নতি দেখা যাইতেছে ও আশা হয় ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে। আমার নিবেদন এই যে সরকার বাহাদুরের নিযুক্ত এই সকল কৃষি প্রদর্শককে যেন আমরা উপযুক্তরূপে খাটাইয়া লইতে পারি। যদি আমরা নিজ নিশ্চেষ্টতার ফলে এই সকল প্রদর্শকের সাহায্য পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশে উন্নত কৃষির প্রচলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়টি আমাদেরই দোষে প্রসার লাভ করিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষিবিদ্যা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি আমাদের দেশের সার্ব্বজনীন কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বলাবাহুল্য কৃষিশিক্ষাও শিক্ষা। পুসা, সাবোর, পুনা ও নাগপুরে কৃষিশিক্ষার জন্য বড় বড় কলেজ আছে, সেখানে অধ্যয়ন করিলে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কৃষি বিদ্যার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। দেশের সার্ব্বজনীন শিক্ষা যদি দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পের শিক্ষা হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সেটা নিতান্ত অন্যায় হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমি সেই জন্য মনে করি যে অন্ততঃ পল্লীগ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল গুলিতে কৃষি শিক্ষা অল্পাধিক প্রচলিত হওয়া উচিত। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় ছেলেরা পরি-মিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। জানিনা যাহারা পরে কলেজে না পড়িবে, এ বিদ্যা তাহাদের কোন্ কাজে আসিবে। কিন্তু উন্নত কৃষিবিদ্যা যদি কতক কতক পরিমাণে মাতৃভাষায় নিম্ন স্কুল সমূহে পঠন পাঠনের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা অন্ততঃ কৃষিজীবীর পুত্রের পরে কাজে আসিতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবিধ প্রথম ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন, দ্বিতীয় অন্নসংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ। যে শিক্ষা নিতান্ত সাহিত্যিক

ধরণের (literary) তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেই জন্য শিল্প ও কৃষি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত দেখিতে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বাসনা করি।

এই সাধারণের মধ্যে কৃষি শিক্ষার বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একমত নহেন দেখিতেছি। লক্ষ্ণৌএ গত তৃতীয় বিজ্ঞান সম্মিলনের কৃষি বিভাগের সভাপতি ও পুণা কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কেরেট্টি সাহেব এইরূপে শিক্ষা প্রচলনের সমধিক পক্ষপাতী, কিন্তু যে কৃষি কনফারেন্সের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এরূপ শিক্ষায় কোনও লাভ হইবে না। এই কনফারেন্সে শিক্ষা বিভাগের লোক খুব কম থাকাতে শিক্ষার দিকটা ভাল করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস বাস্তবিক দেশের শিক্ষা জাতীয় অভাব পূরণেরই জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য এ ক্ষেত্রে জাতীয় সর্ব্বপ্রধান জীবিকার উপায়কে বাদ দিয়া কোনও প্রকার শিক্ষা দেশে বেশীদিন প্রচলিত থাকিতে পারে না। নিতান্ত সাহিত্যিক ধরণের শিক্ষায় মানসিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু কৃষি ও শিল্প শিক্ষার সহিত বিজড়িত হইলে উহা দেশের জন সাধারণের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে।

কৃষকসন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা

কৃষিশিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও কৃষিজীবী ও কৃষকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ত অন্ততঃ চাইই ; আমাদের দেশের কৃষকগণ একেবারে নিরক্ষর। কৃষির উন্নতির কথা ত দূরে থাক সামান্য হিসাব নিকাশ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া করিতে না পারাতে বহু নীচপ্রকৃতি মহাজন তাহাদিগকে ঠকাইয়া থাকে একথা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষককুলের ঋণভার (indebtedness peasants) তাহার অন্যতর প্রধান কুফল। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে তিন কোটী সাত লক্ষ বালকবালিকা স্কুলে যাইবার বয়স প্রাপ্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ শতকরা কুড়িজন মাত্র শিক্ষার্থী। মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রসন্তান, কারণ ভদ্রসমাজে শিক্ষা আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ বাধ্যকরী। অবশ্য যতদিন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়মুক্ত ও বাধ্যকরী না হইতেছে ততদিন কৃষকসন্তানের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইবে না। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন কৃষকসন্তানগণের শিক্ষার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই ? আসামের চা বাগানের অথবা কয়লার খনির কুলিদের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহেব ম্যানেজারেরা বিস্তর স্কুল স্থাপন করিয়াছে, আর যাহারা স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্ন উৎপাদন করিয়া দিতেছে তাহাদের সন্তানগণকে সামান্য শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে কি দায়ী নহেন ? আমার মনে হয় অন্ততঃ যদি প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক কৃষকসন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। চারি পাঁচ গ্রাম পার হইয়া কৃষকসন্তান যে শিক্ষা করিতে যাইবে না ইহা নিশ্চিত: অতএব আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে নিজ নিজ গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরূপ স্কুল স্থাপন করিতে ও তাহা

চালাইতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না, গ্রামবাসীরা একটু চেষ্টা করিলেই হয়। এসম্বন্ধে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব আছে। স্কুল কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ সন্নিকট। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছাত্রেরা তিন মাস ও স্কুলের ছেলেরা দেড়মাস ছুটি পায়। এইরূপ কলেজের ছয় ক্লাসের ও স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত যুবক এই গ্রীষ্মাবকাশে তাহাদের স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়। এই সময়টা যদি তাহারা তাস পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় ব্যয় না করিয়া গ্রামে অন্ততঃ একটী স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে মনে হয় অনেক কাজ হইতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইবে না, তাহারা কেবল চাঁদা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া স্কুল-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। চাঁদা দিতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু যোগাড় করিবার লোকের অভাব। যুবকেরা যদি এইরূপ চেষ্টা করেন তাহা হইলে পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র এক জনও কৃতকার্য্য হইলে বৎসরে এক হাজার প্রাথমিক স্কুল আমরা নিজেই স্থাপিত করিতে পারি। এবিষয়ে ছাত্রেরা কি একটু মনোযোগ করিবেন? আমাদের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি ভারতীয় প্রজাবিগণের শ্রম মধুময় করিবার জন্য এইরূপ বহু বিদ্যালয় (a network of schools) স্থাপিত হইতে দেখিলে নিতান্তই সুখী হইবেন।

কৃষকের কর্ম্মশক্তি ও ম্যালেরিয়া

কিন্তু বঙ্গদেশে কৃষিজীবী ও কৃষকের কর্ম্মশক্তির প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। ভদ্রসন্তানকে কৃষিজীবী হইতে হইলে তাঁহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু বঙ্গের গ্রামগুলি ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার শতকরা অন্ততঃ নব্বই জন হয় কৃষিজীবী ভদ্রসন্তান না হয় কৃষক, কারণ সহরে ম্যালেরিয়া কমই হইয়া থাকে। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কাল ব্যাধিতে বঙ্গের কৃষককুলের স্বাস্থ্য এবং সেই জন্য কর্ম্মশক্তি (efficiency of labour) কত নষ্ট হইতেছে তাহা পল্লীগ্রামের কৃষকগণের শীর্ণ দেহ ও প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত উদর দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রকৃত সার সংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া কি লাভ যদি কৃষকের কর্ম্মশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে? সেই জন্য মনে হয় দেশের কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে অগ্রে এই ব্যাধির নিরাকরণ করিতে হইবে।

সুখের বিষয় আজকাল দেশের ও দশের দৃষ্টি এই বিষয়ে পতিত হইয়াছে, ফলে এ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করিতে হইলে দেশের সমস্ত পুকুর ভরাট করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, নদীর মোহানা খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন আমরা বঙ্গের পল্লীবাসী গৃহস্থেরা নিজেকে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যাহাতে ম্যালেরিয়া মুক্ত রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা কি করিব না? বিশেষজ্ঞেরা যেমন একদিকে পুকুর ভরাট ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কতকগুলি উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি পালন করিয়া নিজেকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হই না কেন? এ সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞেরা বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত করিয়াছেন যে দূষিত বায়ুর দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় না, এনোফিলিস নামক মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি মূলক এই বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। মশা কামড়াইয়া ম্যালেরিয়া হয় একথা স্বগ্রামে গিয়া কাহাকেও বলিলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষক মশক কুল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিখিবে। সুখের বিষয় নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার Social service league এই বিষয় বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া অনেককে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, এ প্রবন্ধ পড়িবে কয় জন? আমার মনে হয় আলোকচিত্রের (Lantern slides) সাহায্যে গ্রামে গ্রামে যাহাতে এ বিষয়ের বক্তৃতাদি হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কয়েক জন এম, বি, ডাক্তারকে এইরূপ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে দেশের যাবতীয় সরকারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজসাহীতে গতবৎসর ও এ বৎসর আমি এই বক্তৃতা শুনিয়াছি। দেখিলাম ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দেশের অজ্ঞতা দূর করিবার এইরূপ বক্তৃতাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ শ্রোতৃবর্গ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়া বিষ কিরূপে সংক্রামিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কোন্ কোন্ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন। আমার মনে হয় যদি গ্রামে গ্রামে এইরূপ বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বক্তৃতার জন্য এম, বি, ডাক্তার নিযুক্ত করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ, কারণ অনেক ডাক্তার প্রয়োজন। স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার এমন কি পাশ করা কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় শিখাইয়া এবং এক এক সেট আলোকচিত্র দিয়া যদি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার জন্য পাঠান যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিদান ও নিবারণ সম্বন্ধে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষকের অজ্ঞতা অতি অল্পদিনেই দূরীভূত হইতে পারে। Social service Leagueকে এই উপায় অবলম্বন করিতে আমি বিনীত উপরোধ করিতেছি।

দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে মশক দংশন নিবারণের জন্য রাত্রে মশারি ব্যবহার ও কুইনাইন ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করি কিন্তু উহা যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক তাহা সকলে অবগত নহে। সপ্তাহে বারো গ্রেন কুইনাইন সেবন করিলে উহা প্রতিষেধকের কার্য্য করে এবং যে সকল সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রামে থাকেন তাঁহারা

প্রায় সকলেই কুইনাইন এইরূপে প্রতিষেধক-রূপে সেবন করেন বলিয়া প্রায়ই ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন না। দেখা যায় যে বর্ষার শেষে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। সেই সময় যদি পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মশারি ব্যবহার ও কুইনাইন সেবনের দ্বারা কৃষকগণকে কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন যে, ঐ উপায়ে নিজেকে ম্যালেরিয়া মুক্ত রাখা যায় তাহা হইলে কৃষকগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলে ম্যালেরিয়া সমস্যার নিরাকরণ হইবে না, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ থাকিয়া অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়কে কার্য্যতঃ স্বাস্থ্য-শিক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য কৃষক-গণের স্বাস্থ্যের উপর তাহার কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি পুনশ্চ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে কৃষি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান শিল্প। বলা বাহুল্য ইহার আলোচনা ও উন্নতির সহিত জাতীয় জীবনসংগ্রাম সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক মাতৃভাষায় ইহার আলোচনার সূত্রপাত বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করি এইরূপ আলোচনা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং উহা অদূর ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে। এ সভায় কৃষিশাস্ত্রে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়াছি। আপনা-দিগের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র অভিভাষণ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস *

আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণন

ইউরোপের দক্ষিণদিকে এবং এশিয়ার পশ্চিমদিকে আফ্রিকা মহাদ্বীপ বিদ্যমান। দেশ অতিশয় বৃহৎ হইলেও ইহাতে সুসভ্য মনুষ্যের সংখ্যা অতিশয় কম। কেবল কোন কোন রমণীয় ও মনোরম ভূমির উপর কতিপয় সভ্য মনুষ্য বসবাস করেন। ইঁহারা অন্যদেশ হইতে

* সত্যাগ্রহের অর্থ—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কিম্বা নিজের প্রতিকার। ইহা ইংরাজী (Passive Resistance) শব্দের অর্থ। ইহার আসল ইংরাজী (Truth Force)। আত্মাগ্রহ (Soul Force) কিম্বা প্রেমাগ্রহ (Love Force) অর্থেও ইহা অভিহিত হইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণের সহিষ্ণুতা, আত্মিক বল ও স্বদেশাভিমানের উপর এই ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার ইহাকে সত্যাগ্রহের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দেশভক্ত মহাত্মা গান্ধী ইহাকে সত্যাগ্রহের ইতিহাস নামে অভিহিত করিতে গ্রন্থকারকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। অবশিষ্ট সমস্ত ভূভাগ জনশূন্য আর নিবিড় বন দ্বারা আচ্ছাদিত। এমন কত বন রহিয়াছে যাহাতে এপর্য্যন্তও মনুষ্য প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কেবল চারিদিকে ভয়ঙ্কর বনচরসমূহ স্বেচ্ছানুযায়ী বিচরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তাহারা কেবল মনুষ্য মাত্র। উহাদিগের আকার বৃহৎ, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, মনুষ্যই আহার সামগ্রী আর সর্ব্বদাই উলঙ্গ। ইহারা ভোজন আচ্ছাদন এবং যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্যান্য সাংসারিক ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্তও উহাদের অবস্থা প্রায়ই একরূপ প্রতীত হয়। আর্য্যগণ আপনাদের উন্নতির অবস্থায় কেবল মিশ্র আর মাতাগাস্করগণকে সভ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন; মুসলমানেরা কেবল সমুদ্রতটস্থ বর্ব্বর ও জাঞ্জিবারগণকে সভ্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ইউরোপীয়ান যাত্রিগণ প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ভূভাগের উৎপত্তি বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন তথাপি সমুদয় আফ্রিকাকে সুসভ্যকরা সহজ ব্যাপার নয় বরং এই কার্য্যে কয়েক শতাব্দীও অতিবাহিত হইতে পারে। যেখানে সেখানে ইউরোপীয়ানগণ সমুদ্রতীরে আপনাদের উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন। আর প্রথম হইতে কিন্তু যবন উপনিবেশও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা সত্বেও আফ্রিকার আভ্যন্তরিক অবস্থা ও সামরিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু নির্ণীত হয় নাই। আফ্রিকার মানচিত্র কেবল অনুমানের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকের সীমানা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিখ্যাত সাহারা মরুভূমিই ৩০ লক্ষবর্গমাইল বিস্তৃত। সাহারাকে কেবল সমুদ্রের বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই মরুভূমিতে না কোথাও কোন বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, না কোথাও বিন্দুমাত্র জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম কারণ এখানে ত বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই তথাপি যদিও কখন সামান্যমাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাও কোন প্রয়োজনে আসে না। "সাহারা"র বেগ ইহাতে সর্ব্বদা প্রচণ্ডভাবে বর্ত্তমান থাকে, আর "সু" এর উষ্ণতা এত অধিক যে তাহাতে শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। কেবল চারিদিকে বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে।

যেমন কুদেশ তেমন লোক বনায়।
বিধি বিচিত্র সংযোগ মিলায়॥

যেরূপ জঙ্গলী দেশ সেরূপ এখানকার অধিবাসিগণও মূর্খ, পুরুষত্ব হীন, আলস্যপরায়ণ ও অসভ্য। না চাষ করিতে জানে, না ব্যবসাবাণিজ্য করিতে জানে; কেবল ফলমূল খাইয়া আর বন্য পশু শীকার করিয়া কালাতিবাহিত করে। গৃহ প্রস্তুত করিতে, রন্ধন করিতে, কিম্বা ঘোড়ার উপর চড়িতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি উহাদের হস্তে কোনও প্রকারের খাইবার জিনিস দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে শুঁকিয়াই ফেলিয়া দিবে আর যদি কোন মাংসের টুকরা দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিবে। উক্ত নিবিড় জঙ্গল সমূহে গমন করা এত কষ্টকর যে রাজকীয় ক্ষেত্র মাপিবার কর্ম্মচারিগণ ছয়মাসে কেবল ১৬ মাইল মাত্র জমি মাপিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সহস্র ক্রোশের মধ্যে না কোথাও জল পাওয়া যায়, না কোথাও নগর কিম্বা বাজার দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল দলে দলে বিহঙ্গ, মদমত্ত হস্তী, আর ভয়ঙ্কর সিংহ সমূহ আরাম পূর্ব্বক বিচরণ করে। ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে আফ্রিকার

জঙ্গল সমূহে বৃহৎ বৃহৎ সিংহ বাস করে। এখানকার অধিবাসিগণ এতদূর জঙ্গলী আর অসভ্য যে থাকিবার জন্য কোনও প্রকারের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। ইহাদের আবির্ভাব কালের কোনরূপ বর্ণন করিতে পারা যায় না। কারণ এপর্য্যন্ত ইহাদের কোনও ইতিহাস প্রস্তুত হয় নাই। এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে ইহাদের অসংখ্য বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে আর আজ পর্য্যন্তও ইহারা সেইরূপ পশুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কতিপয় প্রদেশ মিলাইয়া আফ্রিকা মহাদ্বীপ নাম হইয়াছে। মিশ্র, ট্রিপলি, ও আলজিরীয়া প্রভৃতি প্রদেশের নাম উত্তর আফ্রিকা; সিনি, অপোলা, সীনিগাম্বিয়া ও কঙ্গো প্রভৃতি প্রদেশের নাম পশ্চিম আফ্রিকা; জাঞ্জীবার, মোম্বাসা, সোমালিল্যাণ্ড ও মোজম্বিক প্রভৃতি প্রদেশের নাম পূর্ব্ব আফ্রিকা; এবং নেটাল, কেপ, ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জফ্রীষ্টেট প্রভৃতি প্রদেশের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে চারিটী বড় বড় প্রদেশ আছে। উহা নেটাল, ট্রান্সভাল, কেপ এবং অরেঞ্জফ্রীষ্টেট নামে প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ প্রান্তের নাম "কেপ অব গুড্ হোপ।" কেপটাউন ইহার রাজধানী। ইহার ক্ষেত্রফল ২,৭৬,১২৫ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা ১১,৯১,২৪৮জন। নেটালের—উত্তরে ট্রান্সভাল এবং এই উভয়ের মধ্যে অরেঞ্জফ্রীষ্টেট নামক প্রদেশ অবস্থিত। ট্রান্সভালের ক্ষেত্রফল ১১০,৪২৬ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা ৭,২৮,১৭৪ জন। ইহার রাজধানী প্রামফ্যাণ্টীন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বড় বড় পাহাড় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও সমতল ভূমিও দৃষ্ট হয়। এস্থানের জলবায়ু বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। নেটাল আর কেপ কলোনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া এস্থানে কিছু গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। কিন্তু ট্রান্সভাল ও ফ্রীষ্টেটে শীত অতিশয় প্রবল। এ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইউরোপের সমতুল্য। এখানকার খনিতে হীরা, সোণা তামা, আর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ট্রান্সভালে সোণা বাহির করিবার জন্য আর ফ্রীষ্টেটে হীরা বাহির করিবার জন্য কয়েকটি কারখানা আছে। এইজন্য ট্রান্সভালকে সোণার দেশ (Gold field) বলে আর ফ্রীষ্টেটকে হীরার দেশ (Diamond field) বলে। এখানে প্রায় বারমাস কিছু কিছু বর্ষা হয়। কর্ণ, লোকা ও মকই (শস্যবিশেষ) এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। সকল রকমের ফলমূল ও শাক সব্জিও এখানে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদি অধিবাসী

এ স্থানের আদিম অধিবাসী আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল আর গোণ্ড প্রভৃতি জাতি হইতেও অধিক অসভ্য ও বন্য বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মিলিত জাতি আছে, তাহাদের সমষ্টিকে কাফির বলে। নিম্নে ইহাদের জাতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করা গেল।

বুশমেন—ইহাদের আকার ছোট, বর্ণ হলদে ও ঈষৎ লালচে। ইহারা পশু মারিয়া ভক্ষণ করে।

হোটেণ্টস—ইহারা বুশমেন জাতি অপেক্ষা সভ্য। ইহারা চাষ করে, গরু, ছাগল ও মেষ প্রতিপালন করে। ইহারা অতিশয় আলস্যপরায়ণ, ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকারের দুর্গন্ধ বাহির হয়। অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল

খাওয়া খাওয়া নৃত্য করা ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সূর্য্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রগণকে ইহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে।

কাফির—ইহারা বুশমেন এবং হোটেণ্টস্ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। ইহাদের রং একেবারে কাল। কাফির জাতি তিন ভাগে বিভক্ত যথা—পূর্ব্বীয় কাফির, যুক্ত কাফির, আর পশ্চিমীয় কাফির।

পূর্ব্বীয় কাফির—ইহার জুলু, মটাবেল, গোওসা, মলটু, টেম্বস আর থৈকস জাতি সমূহের মধ্যে গণনীয়।

যুক্ত কাফির—ইহারা বচুয়ানস, এবং ডমরস জাতির মধ্যে গণনীয়।

প্রথমাবস্থায় ইহারা কখন কখন আরবের অধীনে ছিল। বর্ত্তমানে পর্ত্তুগীজ, জর্ম্মণ আর ইংরাজ জাতি প্রায় সমুদয় আফ্রিকা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীনতার জন্য ইহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিয়াছিল। এই সকল ভীষণ সংগ্রামে ইহাদের সহস্র সহস্র জীবন আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শেতাঙ্গগণের অত্যাচারেও ইহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। ইহাদের রক্তে আফ্রিকার জনপদ প্লাবিত হইয়াছে—আর ইউরোপের সর্ব্বোত্তম সভ্যতা জনপদ সমূহে বিস্তৃত হইয়াছে। অনুমান দুই চারি শতাব্দী পশ্চাতে ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে এবং ইউরোপের আজব ঘরে ইহাদের অস্থি-খণ্ড সংরক্ষিত হইবে। ইউরোপীয়ানগণ প্রথমে হোটেণ্টস ও পশ্চাতে বুশমানকে অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল হতভাগ্যগণ কামান, বন্দুক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হইবে এজন্য নির্দ্দয়তা সহকারে মারা পড়িয়াছিল। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র ইউরোপীয়ানগণ পশুর মত মারিয়া ফেলিতেন কিম্বা দাস বনাইয়া রাখিয়া দিতেন। এক একজন শ্বেতাঙ্গ ভূম্যধিপতির নিকট সহস্র সহস্র গোলাম রহিত। গোলামগণের ক্রয় বিক্রয়েরও বাজার গরম রহিত। ইহার পরে ইউরোপীয়ানগণ বাণ্টু নামক জাতিকে অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ও প্রবল সাহসী। এজন্য অনেক দিন ধরিয়া শেতাঙ্গগণের প্রাণান্ত মলিন হইয়া রহিয়াছিল। প্রায় শতেক বর্ষ ব্যাপী ইহারা ভীষণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে। এই মহা সংগ্রামে কাফিরীগণের বীরতা এবং স্বতন্ত্রপ্রিয়তার আর শেতাঙ্গগণের ক্রূরতা ও অত্যাচার-প্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমি লাল হইয়া গিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার আবিষ্কার

সত্য কথা, ভারতবর্ষ বড়ই হতভাগ্য দেশ। ভারতবর্ষের গুণরাজি শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয় নাই বরং অন্যান্য দেশের পক্ষেও মারাত্মক হইয়াছিল। যেরূপ ভারতবর্ষ অন্বেষণ করিতে করিতে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতবর্ষ খুঁজিবার সময় সন ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ ডায়জ কেপ অব্ গুড্হোপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে 'কেপ' অন্তরীপের নাম। যে সময় ভারত অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী এই অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহাদের হতাশ হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা ইহার নাম "কেপ অফ্ গুড্হোপ" অর্থাৎ শুভ আশার অন্তরীপ রাখিয়াছিলেন।

নয় বৎসর আগে যে রাস্তা দিয়া বার্থোলোমিউ ডায়ত অন্বেষণে আসিয়াছিলেন বাস্কোডিগামাও সেই রাস্তা দিয়া ভারতের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ঘুরিবার পর সন ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব তটোপরি বাস্কোডিগামা একটি দেশ দেখিতে পাইলেন। বহুদিনব্যাপী সমুদ্র মধ্যে অবস্থানের পর বিশেষতঃ ঐ সময়ের বিপদ সঙ্কুল অবস্থার পশ্চাতে স্থলভাগ দেখিতে পাইয়া এই সকল অতুল সাহসী নাবিকগণ যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনাতে আনিতেও অসমর্থ। অতঃপর দিন খৃষ্টানগণের অতিশয় আনন্দের দিন। কেন না এই ২৫শে ডিসেম্বরই মহাত্মা যীশুখৃষ্ট পবিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইদিনে খৃষ্টানগণ মহাউৎসবে নিমগ্ন হন। নেটাল শব্দের অর্থ ধর্ম্মবিষয়ক। বিশেষ করিয়া ২৫শে ডিসেম্বরই ইহার প্রয়োগ হয়। এজন্য বাস্কোডিগামা এই দেশের নাম নেটাল রাখিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়ানগণের প্রবেশ

সন ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকখানি জলপোত 'কেপ অফ গুডহোপে' আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং সন ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দুই জন ইংরেজ কাপ্তেন এই দেশে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নিশানা প্রোথিত করেন। সন ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ডচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়। এই কোম্পানীর ১৭ জন ডাইরেক্টর ছিলেন। উক্ত ডাইরেক্টরগণের সভা চেম্বর অফ সেভেন্টিন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কোম্পানী পূর্ব্বের বাণিজ্য পর্ত্তুগীজ এবং ইংরাজের প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন। সন ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে টেবল্ সাগরে ডচ কোম্পানীর একখানি জাহাজ ভগ্ন হয়। আর ইহার নাবিকগণকে কয়েক মাসের জন্য সমুদ্রের তীরে অতিবাহিত করিতে হয়। পরন্তু এই আকস্মিক ঘটনার পরিণাম অতিশয় বিস্তৃত হইয়া উঠে। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল নাবিকগণ এই ভূভাগ সম্বন্ধে বহুত প্রশংসা করেন। আর বলেন যে যদি কেপের মধ্যে একটি ছোট বস্তী কেল্লাবন্দীর ভিতর বসান যায় তাহা হইলে বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিক সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে সন ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে একদল ডচ্ 'কেপে' যাইবার জন্য রওয়ানা হন। জন বানরেবিক উঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহারা তথায় উপস্থিত হইয়া টেবল বে'র তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সুদৃঢ় কেল্লা প্রস্তুত করিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ নেটালে ডচ্ প্রবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইঁহাদের দেখাদেখি কতিপয় ফ্রেঞ্চ অধিবাসী এখানে আসিয়া বাস করিতে সুরু করেন আর ডচ্গণের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। সন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বার হাজার হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল অধিবাসীর সুবিধাও উত্তম শাসন বিধান সম্বন্ধে ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন মনোযোগ ছিল না। এ কারণ ইহাদের শাসন অনিয়ন্ত্রিত ও রাজপ্রণালী বিকৃত হইয়াছিল। বাণিজ্যের লোভ বশতঃ ইহাদের কার্য্য অতিশয় স্বার্থপ্রণ হইয়াছিল। কোম্পানী আপন অধিকারের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীগণের দ্বারা কার্য্য করানই সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এই হেতু এখানে অরাজকতার অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া

উঠে। কোম্পানীর ভয়ে এখানকার শেতাঙ্গ অধিবাসীরা বহুদূরে পলায়ন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং তথাকার আদিম অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধে রত থাকেন। এখানকার আদিম অধিবাসিগণের বিনাশ হইবার ইহাও একটি কারণ।

কোম্পানীর ১৪৩ বৎসরের জুলুম শাসনের পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, প্রবাসী ক্রুর ও কপট বুয়র জাতি পরিশ্রম হইতে বিমুখ হইয়াছিল। ইহারা আদিম অধিবাসিগণকে গোলাম বনাইয়া তাহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর সন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশ ইংরেজ জাতির অধিকারে আসে। কিন্তু আবার সন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ডচদিগের অধিকারভুক্ত হয়। আট বৎসরে এস্থানের শাসন পদ্ধতি অনেকটা সুধরাইয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে ইংলণ্ডের ২৪ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। কিছুদিন ডচ্ শাসনাধীনে থাকিবার পর সন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের স্থায়ী রাজত্ব এখানে স্থাপিত হয়; উহাতে প্রবাসী বুয়রগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়।

আদিম অধিবাসিগণের উদ্ধার

সন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড চার্লস বেরেসফোর্ডের কথানুযায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাছা বাছা চারি হাজার ইংরাজ, স্কট, ও আইরিশকে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রেরণ করেন। স্থানে স্থানে দুর্গও নির্ম্মিত হয়। মিশনারীগণ বৃটিশ রাজ্য বৃদ্ধির জন্য অতিশয় সহায়তা করেন। ইঁহাদের উদ্যোগে আদিম অধিবাসীদিগের কষ্টের পরিমাণ কিছু লাঘব হয়। ইঁহারা বুয়র আর ইংরাজের ঘৃণিত অত্যাচারের উপর অতিশয় খড়্গহস্ত ছিলেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির খৃষ্টধার্ম্মক জন ফিলিপের চেষ্টাতে সন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ স্থানের আদিম অধিবাসীদিগকে গোলামপনা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। সন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সমুদয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে গোলামীগিরি উঠাইয়া দিবার আইন প্রচলিত হয়। অবশেষে চারি বৎসর শিক্ষা প্রদান করিয়া সন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত গোলামগণকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। এই সৎকার্য্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই প্রকার একটি অত্যাবশ্যক সংস্কারের জন্য শেতাঙ্গ প্রবাসিগণ মিশনারীগণের বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে মিশনারীগণ বিন্দুমাত্রও চিন্তিত না হইয়া তাহাদিগকে সুধরাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। যে বৎসর গোলামী প্রথা উঠিয়া যায় ঐ বৎসর কেপকলোনিস্ট শেতাঙ্গ সম্প্রদায় আর আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ের ব্রিটিশ গভর্ণর সার বেঞ্জামীন ডি উবানের অত্যাচারমূলক নীতির ফলেই এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ডি উবান অধিক অগ্রসর হইয়া কাফ্রি প্রদেশকে নিজ অধীনে আনয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু উপযুক্ত পাদরি ডাক্তার ফিলিপের যত্নে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডি উবানের এই অন্যায় অত্যাচার বিধিত হইয়া কাফ্রি প্রদেশ হইতে তাহাকে চলিয়া আসিতে বাধ্য করেন। প্রায় ৮০০০ বুয়র ও ইংরেজ এজন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিশ শাসনের বাহিরে অরেঞ্জ নদীর পরপারে নেটাল ও ট্রান্সভালে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বুয়রগণ ইংরাজের প্রতি অধিকতর দ্বেষ করিতে আরম্ভ করে। ইহার পরিচয় সন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'বলয়ে'

আর প্রসিদ্ধ বুয়র যুদ্ধে পাওয়া যায়। এই দ্বেষ ভাব আজ পর্য্যন্তও নির্মূল হয় নাই। এদিকে নেটাল ও তাহার চারি দিকে বুয়র আর ইংরাজের বসতবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সকল লোক স্বাধীন ছিল। ইহারা মেরিৎস-বর্গে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে।

দুইটি প্রজাতন্ত্র

ব্রিটিশ শাসনে কষ্ট হইয়া যে সকল লোক অরেঞ্জ নদীর পরপারে অধিবাস করিতে থাকে তাহাদিগকে অধীনে আনয়ন করিবার জন্য কেপকলোনীস্থ ব্রিটিশ গভর্ণর কয়েকবার প্রযত্ন করেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। সন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে ট্রান্সভালের অনেক ছোট ছোট স্থানেও স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেটেও এক স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই প্রকারে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই সময় চারিটি রাজ্য গঠিত হয়। কেপকলোনী আর নেটাল প্রদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে এবং ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জফ্রীষ্টেট স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়।

তার পর জর্ম্মণ, গ্রেক, রাশিয়ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয়ন জাতিগণ ইহার চারি প্রান্তে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মারামারিও হইতে থাকে। সন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ট্রান্সভাল প্রদেশকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন; ইহাতে বুয়রগণ ঘোর বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে। অবশেষে যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে ট্রান্সভাল প্রদেশ স্বাধীন করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন তখন বুয়রগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইহারা মজুবা পাহাড়ের উপর আক্রমণ করিয়া সার জর্জ্জ কোলের সমূহ ব্রিটিশ সেনাকে মারিয়া ফেলে। এই ভয়ানক যুদ্ধে স্বয়ং সেনাপতিও মারা গিয়াছিলেন। ট্রান্সভালস্থ বুয়রগণের এই জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত বুয়রগণের একতার ভাব দৃঢ় হয়। বুয়রগণ ইংরেজগণকে অতিশয় ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর সন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট প্রিটোরিয়া কনভেন্সন দ্বারা বুয়রগণ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয় এবং সন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন কনভেন্সন দ্বারা ট্রান্সভাল অর্দ্ধস্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাপ্ত হয়।

বুয়রযুদ্ধ

পবল ক্রুগারের পরিশ্রমের ফলে ট্রান্সভাল অর্দ্ধস্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে পবলক্রুগার এখানকার রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) হন। ইহাঁর ইহাই মহান আকাঙ্ক্ষাছিল যে সমুদয় দক্ষিণ আফ্রিকাব্যাপী এক প্রধান প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং তাহাতে বুয়রগণের সম্পূর্ণ প্রাধান্য থাকে। তিনি ইহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজগণকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ট্রান্সভালে সোণার খনি বাহির হওয়াতে ইহার আদরও বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সর্দ্দারগণের লোভের মাত্রাও বাড়িয়া উঠে। বর্ষব্যাপী ট্রান্সভাল আর ব্রিটেনের মধ্যে কাগজ পত্রে বাদানুবাদ হইতে থাকে, পরন্তু ইহার পরিণাম কিছুই ঠিক হয় নাই কেবল মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। অবশেষে সন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ রাজদূত সার কেনিংগ হমগ্রীণকে ৪৮ ঘণ্টার সময় প্রদান করেন।

তদনুসারে ১১ই অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জফ্রীষ্টেট ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করে। নেটাল আর কেপকলোনীস্থ বুয়রগণও ইহাদের সহিত যোগদান করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোথা স্মটস্ প্রভৃতি সমুদয় বীরগণ ইংরাজ রক্তে ভূমি প্লাবিত করিতে থাকে। এই যুদ্ধে বুয়রগণ আপনাদের বীরত্বের এমন অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিল যে জগত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বার বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও অস্ত্রধারণ করিয়া নিজের প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু এত বড় বৃটিশ জাতির সাম্নে মুষ্টিমেয় বুয়র কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? পরিশেষে বুয়রগণ পরাজিত হয় এবং সন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে প্রিটোরিয়াতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই ভয়ানক যুদ্ধে ৫৭৭৩ জন ইংরেজ হত ও ২২৮২৯ জন আহত হইয়াছিল বুয়রগণের ৪০০০ জন সৈনিক মারা গিয়াছিল।

সন্ধির সর্ত্ত

যে সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সারাংশ এই :—

(১) প্রত্যেক বুয়র পক্ষীয় পুরুষকে অস্ত্র সহিত আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

(২) ঐ সকল পুরুষ যাহারা আপনাদিগকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবে তাহারা স্বাধীন ব্রিটিশ প্রজার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

(৩) আত্মসমর্পণকারী কোন বুয়রের সম্পত্তি কিম্বা স্বাধীনতা নষ্ট হইবে না।

(৪) যুদ্ধের সময় কৃত কোন কার্য্যের জন্য কাহারও উপর কোনও অভিযোগ আনীত হইবে না।

(৫) পিতা মাতা যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণ সরকারী বিদ্যালয়ে ডচ ভাষা শিক্ষা পাইতে পারিবে এবং উহাও আদালতে পরিচালিত হইবে।

(৬) সকলেরই লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া শিকারের জন্য বন্দুক রাখিবার অধিকার থাকিবে।

(৭) সন্ধির পর যথা সম্ভব শীঘ্র স্বৈরী শাসনের পরিবর্ত্তন হইয়া মুলুকী শাসন পরিচালিত হইবে এবং তদনন্তর স্বরাজ্য প্রদত্ত হইবে।

(৮) যে পর্য্যন্ত না দক্ষিণ আফ্রিকা স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত আদিম অধিবাসিগণকে প্রজার অধিকার দিবার প্রশ্ন উত্থিত হইবে না।

(৯) যুদ্ধের খরচ আদায় করিবার জন্য জমিদারীর উপর কোনও রাজকর স্থাপিত হইবে না।

(১০) বুয়র সৈনিকগণের ক্ষতি পরিপূরণের জন্য—একটি কমিশন নির্ব্বাচিত হইবে এবং যুদ্ধের জন্য জমীর যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে সাড়ে চারি কোটি টাকা প্রদত্ত হইবে।" এই সকল বিষয় সন্ধির সর্ত্ত। ইহা পাঠ করিলে অনুমান হইবে যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইংলণ্ডের ইহাই লাভ হইয়াছিল যে বুয়রগণ কেবল নামে মাত্র ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রজাগণ অন্যান্য প্রজার সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সংযুক্ত স্বরাজ্য

১৯১০ সালের ৩১শে মে ইংলণ্ড পার্লা-

মেণ্টের নির্দ্ধারিত আইন অনুযায়ী নেটাল, ট্রান্সভাল কেপ ও অরেঞ্জফ্রীষ্টেট এক সম্মিলিত রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হয় এবং ইহারা ঔপনিবেশিক স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও সংহতি (Union of South Africa) নামে অভিহিত করা হয়। এখন ইহাদের শাসন স্থানীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বিলাতের হাতে ইহাদের জন্য গভর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার সহায়তার জন্য একটি কার্য্যকারিণী সমিতি হইয়াছে। এই সমিতির সদস্যগণকে গভর্ণর জেনেরল আপনার ইচ্ছানুযায়ী নিয়োগ করেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান বিভাগ সমূহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য গভর্ণর জেনেরল প্রায় দশটী প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এই প্রতিনিধিগণও কার্য্যকারিনী সভার সদস্য হন। আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা স্থানীয় পার্লিয়ামেণ্টের হাতে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের সম্রাট, মন্ত্রিসভা ও প্রতিনিধিসভা এ পার্লামেণ্টের অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। মন্ত্রি সভাতে ৪০ জন সদস্য রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আটজন গভর্ণর জেনেরলের দ্বারা নিয়োজিত। অবশিষ্ট ৩২ জন সদস্য আট আট জন করিয়া প্রত্যেক প্রান্ত হইতে গৃহীত হন।

সন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর এই সংগঠন আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। যিনি বংশপরম্পরা ক্রমে ইউরোপীয়ান কিম্বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর, যিনি সংহতির কোন প্রান্তের নির্ব্বাচনে সম্মতি দিবার অধিকার রাখেন, এবং যিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল এইরূপ নির্ব্বাচনে রহিয়াছেন, তিনিই এই সিনেটের সদস্য হইবার উপযুক্ত। নির্ব্বাচিত সিনেটারের সম্পত্তির মূল্য অন্ততঃ ৭৫০০ টাকা হওয়া উচিত।

প্রতিনিধি সভাতে ১২১ জন সদস্য আছেন। এই সকল সদস্যের মধ্যে ৫১ জন কেপকলোনী হইতে, ১৭ জন নেটাল হইতে, ৩৬ জন ট্রান্সভাল হইতে ও ১৭ জন অরেঞ্জফ্রীষ্টেট হইতে গৃহীত হয়। এই চারি প্রান্তের ইউরোপীয়ান অধিবাসীর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যার পরিবর্ত্তনের নিয়মাবলীও বিহিত রহিয়াছে। প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক প্রান্তকে বিভাগ করা হইয়াছে। ইহাকে নির্ব্বাচন বিভাগ (জেলা) বলে। প্রত্যেক বিভাগ হইতে এক একজন প্রতিনিধি উক্ত সভাতে আসেন। যে সকল নিয়ম মন্ত্রিসভার সদস্যগণের জন্য উপরে লিখিত হইয়াছে ঐ সকল নিয়মই প্রতিনিধি সভার সদস্যগণের পক্ষে প্রযোজিত হয়। প্রথম প্রতিনিধি সভা পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। একই পুরুষ উপরি উপরি দুইটি সভার সদস্য হইতে পারিবে না। সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই সভাতে নির্ব্বাচিত হইবার দাবী রাখিতে পারিবে না।

টাকা কড়ি সম্বন্ধে নূতন আইন প্রস্তুত করিবার দাবী কেবল প্রতিনিধি সভারই থাকিবে। পরন্তু সাধারণতঃ গভর্ণর জেনেরলের অনুমতি অনুযায়ী এই নূতন কর কিম্বা খরচের আইন পাশ হইবে। প্রতিনিধি সভার স্বাধীনে আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাকে মন্ত্রিসভা কিছু পরিমাণে নিয়মিত করিবেন। এই উভয় সভার বিরোধ মীমাংসা

করিবার জন্য আইন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সম্রাটের স্বীকৃতি বিষয়ে এবং গভর্ণর জেনেরলের দ্বারা স্বীকৃত আইনকেও রহিত করিবার বিষয়ে নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ আছে। কেপটাউন নগরে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রান্তের শাসনের জন্য গভর্ণর জেনেরল পাঁচ পাঁচ বৎসরের জন্য এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইঁহার সঙ্গে চারিজন সদস্যকে লইয়া কার্য্যকারিণী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। প্রদেশিক শাসনকর্ত্তা এই কার্য্যকারিণী সভার অধ্যক্ষ হন। ইঁহারা একত্রিত হইয়া আপন প্রদেশ শাসন করেন। কেপকলোনীর প্রাদেশিক সভাতে ৫১ জন, নেটালস্থ প্রাদেশিক সভাতে ২৫ জন, ট্রান্সভালস্থ প্রাদেশিক সভাতে ৩৬ জন ও অরেঞ্জ-ফ্রীষ্টেটস্থ প্রাদেশিক সভাতে ২৫ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

প্রাদেশিক আয়, ব্যয়, শিক্ষা, চাষ, খনি, প্রজাবিষয়ক প্রবন্ধ, স্থানীয় কার্য্য, রাস্তা, পুল, বাজার এবং ইহাদের সংরক্ষণকারী প্রভৃতি এই সভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করেন এবং ইহাদের অনুকূল মতানুযায়ী সমস্ত কৃত হয়। ন্যায় বিভাগ সঞ্চালনের জন্য সমস্ত প্রদেশের মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান ন্যায়ালয় আছে। উহার অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে ছোট ছোট ন্যায়ালয় অবস্থিত। ইংরাজী ও ডচ এই উভয় ভাষা উক্ত কার্য্যালয়ে চলিয়া থাকে।

অরাজকতা

যখন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা এক সামিল হইয়া যায় তখন হইতে অরাজকতার ঘনঘোরঘটা চারিদিকে ছাইয়া ফেলে। খেতাঙ্গ মজুরগণ বারবার ধর্ম্মঘট করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই ধর্ম্মঘট সামান্য প্রকারের না হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্মঘটে মজুরগণের বিরাটদল পার্ক ষ্টেশনে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইহার নামক সমাচার পত্রের কার্য্যালয় উড়াইয়া দেয়, কত দোকান লুটিয়া লয়। সরকারী সিপাহীগণের উপর প্রবল আক্রমণ করিতে থাকে। এজন্য বাধ্য হইয়া সরকারী সিপাহীগণ গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে কয়েকজন হতাহতও হয়। অবশেষে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া মজুরদলকে শান্ত করা হয়। সন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় এক ভয়ানক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। মজুরগণ কয়েক স্থানে রেলগাড়ী উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করে। নানা রকমের ঘৃণিত কাজ করিতে আরম্ভ করে. এজন্য সমস্ত দেশে ফৌজী কানুন জারী হয়। যেখানে ছয় জন মনুষ্য একত্রিত হইবে এবং সরকারী সিপাহীগণের সন্দেহ ভাজন হইবে, সেইখানে তাহারা গ্রেপ্তার হইয়া বিচারের জন্য প্রেরিত হইবে। রাত্রিকালে যদি সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তি রেল লাইনের নিকট দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। ধর্ম্মঘটকারিগণের কোন কোন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডস্বরূপ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। সার কথা দক্ষিণ আফ্রিকা অরাজকতায় পূর্ণ হইয়াছিল।

সেবাভিক্ষু-জীবন।

(রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল ,

নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ

"বালোসা" রাজার গড়

খননকার্য্য ভিন্ন প্রত্ন-সম্পদের উদ্ধারের আশা অনেক স্থলেই বৃথা জানিয়াও কেবল মাত্র ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আলোচ্য বিষয়ে আকর্ষণের জন্য আমার এই প্রয়াস। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কাঠগড়াতে সংগৃহীত ইষ্টক-প্রদর্শন উপলক্ষে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম। সাধারণের অবগতির জন্য সে আলোচনা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করিলাম।

সম্প্রতি নদীয়া জেলাতে "বালোসা রাজার গড়" নামে এক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ অবশ্য আমি চক্ষে দেখিয়া নদীয়া জেলার গণ্ডীর ভিতরে ফেলি নাই। এই গড় কৃষ্ণনগরের নয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত। গত পূজার অবকাশে একদিন এই গড় দেখিতে পদব্রজে রওনা হই। গড়ে যাইবার পথে মহারাজপুর নামে একটী গ্রাম অতিক্রম করিতে হয়।

মহারাজপুর অতি প্রাচীন গ্রাম। অনেক পুরাতন গ্রামের ন্যায় এ গ্রামও বহু জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রামের উত্তর অংশে "রাজার দীঘি" নামে একটী মজা সরোবর দেখা যায়। ইহার চারি পা'ড়ে সঘন বন। সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বটগাছের তলে একটী পাতলা "আদরা" ইটের ঢিপি মহারাজপুরের রাজার বাড়ীর অবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থানটী জলঙ্গী নদী হইতে কিছু দূরে। কোন গ্রামের পুরাতত্ত্বের আলোচনার সহিত গ্রামের নামের উৎপত্তির আলোচনাটাও থাকা আবশ্যক, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের এইরূপ মত। শুনা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে স্থানীয় কোন বিস্মৃতনাম নরপতির সম্পর্কে গ্রামের নাম মহারাজপুর হইয়াছে। একজন কৃষক দীঘির উত্তরের মাঠে ধান কাটিতেছিল। সে বলিল রাজার কাছারী বাড়ী ও কেল্লা নিকটে কাঠগড়া গ্রামে ছিল। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। মহারাজপুর অঞ্চলে অনেক পুকুর মজা অবস্থাতে দেখা যায়। রাজধানীর জন্য বহুল জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে দেখা যায়।

এখন কাঠগড়ার গড়ের কথা আলোচনা করা যাক্। পরিখা খননের সময়ে তাহার একধারে যে মাটী স্তূপীকৃত করা হয় তাহাকে গড় বলে, আবার কখনও কখনও পরিখাকেও লোকে গড় বলিয়া থাকে। কাঠগড়া গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী প্রায় চতুষ্কোণ ও অল্পউন্নতশীর্ষ মালভূমি বিশেষ দেখা যায়। ইহাই আলোচ্য গড়। ইহার উচ্চতা ৭।৮ হাতের বেশী নয়। গড়ের উপরিভাগে যে সকল ভিত দেখা যায় তাহা প্রায় তিন হাত চওড়া। ভিত গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে "আয়ত" আকারের প্রকোষ্ঠের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ গুলিতে বোধ হয় প্রহরী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। পাটনা খননকার্য্যেও প্রোথিত প্রাচীরে এইরূপ প্রহরীর খোপ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়াছি। গড়ের উপরে নক্সার ইটও দু একখানি পাওয়া যায়। এরূপ একখানি ইট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইষ্টকের উপরে

ভূজঙ্গদামবেষ্টিত একটী পদ্মফুল অঙ্কিত দেখা যায়। ইহাকে নদীয়া সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষবাবু নারায়ণের অনন্তশয্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গড়ের পূর্ব্বে পুষ্করিণী ও দক্ষিণে ইন্দারার চিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। এই ইন্দারাতে আন্দাজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও জল ছিল। উহাতে একটী কুম্ভীর ও এক জোড়া মাছ দেখা যাইত, এরূপ প্রবাদ আছে; কুম্ভীর ও মাছের মাথাতে নাকি সিন্দুর ঢালা ছিল! গড়ের উত্তর দিয়া "কলিজের বিল" বাহিত। Bengal Revenue Settlement এর Record এ কলিজের নীচে নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নদীর চূর্ণীর সহিত যোগ ছিল। বিলের কাঁধা খনন উপলক্ষে সময়ে সময়ে নদীর নিদর্শনও কিছু কিছু মিলে। কলিজের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার হালদার বি, এর মুখে একথা শুনিয়াছি। বিলের উত্তর দক্ষিণের মাঠকে "ঝন্‌ঝনে করালী" ও বিলের ওপারের মাঠকে "করালী ডেঙ্গা" বলে। গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ এখনও গড়ের মাঠ বলিয়াই পরিচিত। গ্রামের নাম হইতে অনুমান হয় যে কাঠগড়াতে পূর্ব্বে কেল্লা ছিল।

গড়ের এক মাইল দক্ষিণে "রম্‌রমা পোতা" নামে একটী নাতি উচ্চ ভূমি আছে। "রম্‌রমা পোতা" ইটাবেড়িয়া গ্রামের লাগাও। এখানে পূর্ব্বে পুকুর ছিল। পরে পুকুর মজিয়া বিল হয়। মাটির নীচে এখনও বাঁধা ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়।

কাঠগড়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই স্থানটীর প্রাচীনত্বের বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার ইতিহাস এখনও কেহই অবগত নহে। তবে এখানে বহু পূর্ব্বে কোন রাজা ছিলেন, তাহা অশীতিপর বৃদ্ধেরাও শুনিয়াছেন। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন স্থানের ন্যায় আলোচ্য স্থানটীও কিংবদন্তী বিজড়িত ও বর্গির হাঙ্গামা বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবাদের হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই। এখানে প্রচলিত আর আর কিংবদন্তী গুলি ন্যূনাধিক অস্বাভাবিক। স্থানের পূর্ব্বগৌরব না থাকিলে তাহার উপরে অলৌকিকত্বের আরোপ অনেক স্থলেই সম্ভব নহে। তাই বলিয়া আমি কিংবদন্তীর মূল্য অধিক দিতেছি না। স্থানটীর সহিত কোন বিষাদময় ব্যাপারের সংস্রব আছে কি না আমরা জানি না। সাধারণের ধারণা যে গড়ের ইষ্টক লওয়া বা উহার সম্পর্কে আসাও বিপজ্জনক! বাঁশবেড়িয়ার এক সাহেব কয়েক গাড়ী ইট লইয়া গিয়া নাকি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আর এই গড়ে "খামার" করাতে নাকি কাঠগড়ার লোকের দলুই অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।

অনুসন্ধান ক্রমে "রহের খালের" নিকটে আসাতে আসিয়া জনৈক বৃদ্ধা "রেয়াদীনের"

* গড়ের বিষয়ে একটী বড় করুণ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গড় বাথান "রেওয়াজ" উপলক্ষে চাষারা মাঠে যাইত। ইহাদের মধ্যে এখনও জীবিত বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনা যায় যে তাহাদের বালককালে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একটী অলৌকিক দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হইত। সকলে "নিয়ুতি" হইলে একখানি জাহাজ গড় হইতে উঠিতে দেখা যাইত। উহা ১৬ জন বেহারার বহিত ও ইহার সম্মুখে ২ জন ও পিছনে ২ জন মশাল ধরিয়া যাইত। আর আগে পিছু উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত চলিত। ঘোর রজনীতে এই যাত্রা গড়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া কলিজের বিল বাহিয়া তাহার পশ্চিম বাঁকে আসিয়া কোথায় মিলিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে আলো মিলিয়া যাইত, সে অসংখ্য পাদক্ষেপ আর দেখা যাইত না—যেন মহী বাঁকে আসিয়া সব ফুরাইত—কেবল এক অপার্থিব বিলাপের রোল আকাশ মার্গে উঠিতে থাকিত।

মুখে শুনিয়াছিলাম যে উক্ত গড় "বালোসা বাজার" বা "বাল বাদসা"র। বালোসা বাজার বিষয়ে সে বেশী কিছু জানে না। এই বাল বাজের বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

উক্ত আবার পূর্ব্বভাগে "হম্‌দমা" নামে একটী উচ্চ ভূমি আছে। শুনিলাম এখানে পূর্ব্বে কোন মহাপুরুষ চেলাগণকে ভোজ দিয়াছিলেন। এই "হম্‌দমা"র দক্ষিণে "মুক্তোদা" উত্তরে "জেনজোলা" ও কিছু পশ্চিমে হরের খালের দিকে "জোড়াপুকুর" নামে বিল আছে। শুনিলাম ঐ ভোজ উপলক্ষে "জোড়া পুকুরে" পাক হয়, কেন জোলাতে যেন কেলে, হম্‌দমাতে ভাত চালে ও মুক্তোদাতে মুখ ধোয়।" লোকের মুখে শুনা যায়—রান্নার পর যে ছাই জমা হইয়াছিল তাহার ঢিপি আর যেখানে সাধু মহাপুরুষ—ভাতের কাটি পুঁতিয়াছিলেন সেখানে মাধবী কুঞ্জ এখনও দেখা যায়। "হম্‌দমা"তে প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে মেলা হয়। হরের রামভদ্র পালের কোন ধার্ম্মিক পূর্ব্ব পুরুষ ইহার প্রবর্ত্তন করেন।

আলোচ্য মহারাজপুর, হম্‌দমা ও কাঠগড়া স্কুল কলেজের ছাত্রগণের পরিদর্শনের বিষয়। এইরূপ পরিদর্শনে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার বৃদ্ধি এবং শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে রীতিমত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আবশ্যক। এখানে কোন শিলালিপি ও মুদ্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই ও ইহা এই বাংলা দেশের সমস্তলে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সামান্য ঢিপি বিবেচনায় অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস এখানে খননে ঐতিহাসিক উপাদান মিলিতেও পারে। আশাকরি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আলোচ্য গড়ের উপর পড়িবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

অভিব্যক্তিবাদ

ভূতাভিব্যক্তি বাদ

(৬০৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

নীহারিকা হইতে জগৎ উৎপত্তি হয় বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা (concrete form) হইতে জগতের আরম্ভ হয়—ইহাই স্বীকার করা হয়; কিন্তু স্পেনসারের মতে জগতের ঈদৃশ ইতিহাস সর্ব্বথা অসম্পূর্ণ (any account which begins with it in a concrete form or leaves off with it in a concrete form is incomplete.

দ্বিতীয়তঃ স্পেনসার এই নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য পদার্থের রূপান্তর প্রাপ্তির যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না। এই নির্ব্বিশেষ পদার্থ কেন নিয়ত পরিবর্ত্তিত—রূপান্তরিত হয়? স্পেনসার বলেন ঐ পদার্থ অস্থির স্বভাব—সর্ব্বদা চঞ্চল; রূপান্তর গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু একথা কতদূর সঙ্গত একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় যে পদার্থ নির্ব্বিশেষ—যাহাতে জগত

ভেদের গন্ধ মাত্র নাই—তাহা নিয়ত সাম্যাবস্থায় না থাকিয়া কেবল অবস্থান্তর গ্রহণ করে কেন? নির্ব্বিশেষ পদার্থে চাঞ্চল্য কি প্রকারে আসিবে? আমরা দেখিতে পাই যে পদার্থ যথার্থতঃ নির্ব্বিশেষ নহে, যথা যে পদার্থ আপেক্ষিক ভাবে—অপর পদার্থের তুলনায় কতকটা নির্ব্বিশেষ তাহাই বাহ্য কারণে ক্ষোভিত, বৈচিত্র্যময় ও জটিল হইয়া থাকে। এমন কি এই বাহ্য কারণ না থাকিলে তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। স্পেনসার যে সকল অবিশেষ হইতে বিশেষারম্ভের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটিতেও এই বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ হয় নাই। তাঁহার নির্ব্বিশেষ বাহ্য নিমিত্ত জগৎই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন :—

"Moreover all such instances require that besides homogeneous and unstable object, or the heterogeneous or unstable object, as the case may be, there should be external forces affecting it. An egg alone in the void would neither hatch nor cook nor smell it is on the object+external causes that the result—be it more, be it less complexity—essentially depends."

যাহা হউক স্পেনসার নির্ব্বিশেষ পদার্থের প্রবর্ত্তক রূপে বাহ্য নিমিত্তনিচয় আবশ্যক বুঝিয়াও তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই বাহ্য নিমিত্ত নিচয়কে উপেক্ষা করিলে যে নির্ব্বিশেষ পদার্থের পরিণাম একান্তই অসম্ভব হয়, তাহা তাঁহার প্রখর বুদ্ধির নিকট কখনও প্রতিভাত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। তাই তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন,* "The absolutely homogeneous must lose its equilibrium." কিন্তু যতই গর্ব্বসহকারে উক্ত হউক না কেন আচার্য্য শঙ্কর সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন তাহা অকাট্য। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাহ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাৎ গুণ বৈষম্য নিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ। বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থাতঃ নিমিত্তাভাবাদৈব বৈষম্যং ন ভজেরন।" বাস্তবিক নির্ব্বিশেষ পদার্থ বৈষম্যোপগম যোগ্য হইলেই যে স্বতঃ পরিণাম স্বভাব হইবে তাহা নহে; বাহ্য কারণ ব্যতীত উহার সাম্যভাব ক্ষোভিত হইতে পারে না। সাম্যাবস্থার অর্থই চাঞ্চল্যরহিত স্থির অবস্থা। বাহ্য অতি সামান্য শক্তির প্রয়োগেও সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাহ্য শক্তি তাহার উপর প্রযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে বৈষম্য—চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পদার্থ যদি নির্ব্বিশেষত্ব বশতঃই আপন স্বভাব—নির্ব্বিশেষ বলিয়াই অস্থির—হইত, তাহা হইলে এই নির্ব্বিশেষকে বিশিষ্টাকারে পরিণত করিবার জন্য তাপাদির হ্রাস ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক নিচয়ের অনুপগম কদাচ আবশ্যক হইত না। এগুলি অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক হয় বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাহ্য নিমিত্ত ব্যতীত, আপনা হইতেই, নির্ব্বিশেষ পদার্থের সাম্যভাব বিচ্যুত হয় না। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন—

* স্পেনসার বলেন—"Already this has been tacitly implied by assigning unlikeness in the exposure of its parts to surrounding agencies, as the reason why an uniform mass loses its uniformity," F. P. P. 436.

"Again if the instability is due to homogeneity simply, why is it essential to reduce the temparature and to insure "the presure of the varying surrounding affinities" before the lapse into heterogeneity begin? If the homogeneity were absolute—that of Lord Kelvin's primordial medium, say,—than the stability would be absolute too. In other words, "if the indefinite, incoherent homogeneity" in which, according to Mr. Spencer, some rearrangement must result, were a state devoid of all qualitative diversity, and predicable of the universe, then.....any 'rearrangement' could result only from external interference; it could not begin from within."

একণে যদি ব্রহ্মাণ্ডকে একটি মাত্র বস্তু বলিয়া ধরা যায় ও তাহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের আর বাহ্য 'পারিপার্শ্বিক' কিছু থাকে না যাহার প্রভাবে উহার সাম্যাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং উহাতে বৈষম্যের আবির্ভাব ঘটিবে। অতএব স্পেনসারের স্বকীয় দৃষ্টান্তগুলিই তাঁহার মতের পোষকতা না করিয়া বরং তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বভাবতঃ পরিণামী নহে, এই মতই দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে।

স্পেনসার হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন? প্রকৃতি স্বতঃ পরিণামী না হইতে পারে কেন? নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বতঃই পরিণাম স্বভাব—এ কথা বলিলে দোষ কি? বাহিরের শক্তি ব্যতীত যে নির্ব্বিশেষ পদার্থের সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হয় না এমন কোন নিয়ম নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় স্পেনসারের স্বয়ং উদাহৃত দৃষ্টান্তাবলীই তাঁহার মতবাদের পরিপন্থী। বাহ্য শক্তি নিরপেক্ষে কোন বস্তু রূপান্তরিত হইয়াছে, তিনি এ প্রকার কোন নিদর্শন দিতে পারেন নাই; তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—সকল গুলিই বাহ্য শক্তির সাপেক্ষত্ব বোধক।*

তৃতীয়তঃ। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার যুক্তিও দেওয়া যাইতে পারে। অচেতন পদার্থ স্বতঃই ব্যাকৃত—স্বতঃই গতিশীল হইতে পারে, এ সিদ্ধান্ত স্বীকারে গতির প্রাথমিক নিয়মটিই (the first law of motion) বাধিত হয়। ঐ নিয়ম বলিতেছে জড়ত্বের ধর্ম্মই এই যে নিমিত্তান্তর ব্যতীত জড় কখনও স্বকীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। জড় স্বশক্তি প্রভাবে স্থির অবস্থা হইতে চঞ্চল অবস্থায়, কিম্বা চঞ্চল অবস্থা হইতে স্থির অবস্থায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পণ্ডিত ওয়ার্ড বলেন—

"To suppose that matter in however unstable a condition can be set in motion without receiving any energy from without is not to find a loophole within the mechanical theory, but to deny the

* The instability thus variously illustrated is obviously consequent on the fact, that the several parts of any homogeneous aggregation are necessarily exposed to different forces—forces that differ either in kind or amount; and being exposed to different forces they are of necessity differently modified. F. P. P. 404.

absolute validity of its most fundamental conception—that of inertia. If such an assumption is legitimate, the first law* of motion is not true.

বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ বলিতেই যে অস্থির স্বভাব—পরিণাম স্বভাব বুঝিতে হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। নির্ব্বিশেষ বলিতে বরং কূটস্থ নির্ব্বিকার ভাবই স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের মনে উদিত হয়। নির্ব্বিশেষকে যে অস্থির স্বভাব হইতেই হইবে ইহা যদি স্বতঃসিদ্ধরূপে কিম্বা প্রত্যক্ষতঃ উপপন্ন না হইল, তখন অবশ্যই তাহার পরিণামে বাহ্য হেতু অপেক্ষিত হইবে।

চতুর্থতঃ। স্পেনসার মনে করেন, শক্তির অবিনশ্বরতা (persistence of force) উহার পরিণাম প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ যেহেতু শক্তি নিত্য নিরপায়ী সেই হেতু উহা পরিণাম স্বভাব। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, শক্তির নিরপায়িতা বিকার বা পরিবর্ত্তনের হেতু নহে; ইহা কোন প্রকার অবস্থান্তরের উৎপাদক নহে; ইহা একটি পারিমাণিক নিয়ম মাত্র, গুণগত বৈচিত্র্যের নিয়ামক নহে। শক্তি রূপান্তরিত হইলেও উহার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে—ইহাই শক্তির অবিনশ্বরতার তাৎপর্য্য। কিন্তু কি কি নিমিত্তবশাৎ ও কোন কোন অবস্থায় ইহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, শক্তির অবিনশ্বরত্ব হইতে তাহার কোন সন্ধান বা ব্যাখ্যা আমরা প্রাপ্ত হই না। অমুক অমুক নিমিত্ত সহযোগে শক্তির আকার পরিবর্ত্তিত হইলে, পূর্ব্বাকারে উহার যে পরিমাণ ছিল, অভিনব আকারেও উহার ঠিক সেই পরিমাণ রহিয়াছে—পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা এই টুকুমাত্র আমরা অবগত হই। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন :—

"But the conservation of energy is not a law of change still less a law of qualities. It does not initiate events, and furnishes absolutely no clue to qualitative diversity. It is entirely a qualitative law. When energy is transformed, there is precise equivalence between the form and the old, but of the circumstances determining transformation and of the possible kinds of transformation the principle tells us nothing. If energy is transformed, then the system doing work loses precisely what some other part of the universe gains but again the principle tells us nothing of the conditions of such transferences.

স্পেনসার নিজেও বলিতেছেন, যে শক্তির নিত্যতা আমরা প্রতিপাদন করিতে যাইতেছি, সে শক্তি আমাদের পরিচিত প্রবন্ধরূপী শক্তি নহে; কেন না প্রবন্ধরূপী শক্তির নিত্যতা আমরা কখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণে অবগত হইতে পারি না। তবে যে শক্তি শাশ্বত, নিত্য, অব্যয়,—সে কোন্ শক্তি? স্পেনসার বলেন

* নিয়মটি এই—"Every body perseveres in its state of rest or of moving uniformly in a straight line except in so far as it is made to change that state by external forces."

তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সুতরাং তাহা পরীক্ষা যোগ্য বস্তুশক্তি নহে। স্পেনসার বলেন :—

But what is the force of which we predicate persistence? It is not the force we are immediately conscious of in our muscular efforts; for this does not persist. Hence the force of which we assert persistence is that Absolute Force of which we are indefinitely conscious as the necessary correlate of the force we know. By the persistence of force, we really mean the persistence of some cause which transcends our knowledge and conception [p.p. 192c 192d F.P.]

[পাঠক, লক্ষ্য করিবেন—স্পেনসার অবাঙমনসোগোচর শক্তির সম্বন্ধেই নিত্যতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহা মন বুদ্ধির অতীত তাহার সম্বন্ধে এ প্রকার কিছু বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য। যে পদার্থ অবিজ্ঞেয় তাহার শক্তি যে নিত্য—অব্যয়, তাহা জানিবার উপায় কি? এবং তাহা যদি জানা সম্ভব হয়, তবে সে পদার্থকে অবিজ্ঞেয়—জ্ঞানের অগোচর—বলিতে পারা যায় কিরূপে?]

স্পেনসার নির্ব্বিশেষ বস্তুর স্বাভাবিক অস্থিরতা (Instability of the Homogeneous) সম্বন্ধে যে অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কতকটা অংশে রাসায়নিক বৈচিত্র্য আলোচিত হইয়াছে। উহার এক স্থলে তিনি বলিতেছেন—

"Without entering into qualifications for which space fails, we believe no chemist will deny it to be general law of these inorganic combinations that *other things equal*, the stability decreases as the complexity increases. When we pass to the compounds of organic chemistry, we find this general law still further exemplified: we find much greater complexity and much less stability. পুনশ্চ:—Chemical stability decreases as chemical complexity increases" কিন্তু প্রকৃতির পনর আনা বস্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভূত। এবং এই পনর আনা স্থলে দেখা যাইতেছে, জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, স্থিরতা তিরোহিত হয়। যে পরিমাণে রাসায়নিক জটিলতার বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে বস্তুর স্থিরতার হ্রাস। সুতরাং বস্তুগুলি যত সরল—যত নির্ব্বিশেষ ভাবের অভিমানী, উহাদের স্থিরতা বা স্থায়িত্বও তত বেশী। তাহা হইলে, যাহা যথার্থতঃ নির্ব্বিশেষ—তাহা যে একান্ত স্থির স্বভাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব নির্ব্বিশেষ বস্তু যে স্বভাবতই অস্থির স্বভাব—পরিণাম স্বভাব—সে সিদ্ধান্ত অন্ততঃ রাসায়নিক জগতে সত্য বলিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে না।

স্পেনসার অভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"অবিশেষের বিশিষ্টভাবে আগমন"—সে সংজ্ঞাও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। বস্তুর প্রধ্বংস অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে জটিলতার (heterogeneity) আগম হয়—বস্তুর ধ্বংসাবস্থা স্থিত্যবস্থাপেক্ষা

অনেক মিশ্র—জটিল; কিন্তু তাই বলিয়া সে অবস্থা কি বস্তুর অভিব্যক্ত—ব্যাকৃত অবস্থা? সরল অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থার পরিণতিই কি অভিব্যক্তি? তাহা নহে; কেবল জটিলতার পরিবর্ত্তন হইলেই সে পরিবর্ত্তনকে অভিব্যক্তি (evolution) বলা যায় না; কেন না ধ্বংসাবস্থাতেও জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। অভিব্যক্তি ও প্রধ্বংস (evolution & dissolution) পরস্পর বিরোধী অবস্থা। অভিব্যক্তিতে বস্তুর উন্নতি ও প্রধ্বংসে বস্তুর বিনাশ বা বিলোপ বা অধোগতি সূচিত হইয়া থাকে। এবং স্পেনসার অভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই প্রধ্বংস সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। স্পেনসারের অনুরক্ত ভক্ত Hudson এ কথাটার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া বুঝিয়াছেন, স্পেনসারের উক্তি অযৌক্তিক। তিনি বলেন :—

"The mere change in the direction of increasing heterogeneity or complexity could not.....be held to constitute evolution, since there are many such changes which make, not for evolution, but for destruction. An injury to an organism renders that organism more multiform in its composition; a cancer in the system produces marked increase in heterogeneity; a revolution in the social state makes the state far less homogeneous; but we look upon none of these changes as changes in the line of progress or evolution. On the contrary, we see at once that they tend in the opposite direction—in the direction of dissolution; for let them go on long enough and far enough, and dissolution will be the inevitable results. " *

একজন শারীরবিদ পণ্ডিত বলেন—

"I have already referred to the fact that these changes are now commonly described as "differentiation," an abstract expression which simply means the establishment of differences, without any reference to the peculiar nature of those differences, or their relations to each other and to the whole. But the inadequacy of the word to express the facts is surely obvious. The processes of dissolution and decay are processes of "differentiation" quite as much as the processes of growth and adaptation to living functions. Blood is differentiated just as much when, upon being split upon the ground, it separates into fibrine, serum and corpuscles, or finally into its inorganic elements, as when, circulating in the vessels, it bathes and feeds the various tissues of the

* Introduction to the Philosophy of Herbert Spencer by W. H. Hudson.

living Body. But these two operations—these two kinds of "differentiation"—are not only distinct but absolutely opposite in their nature and there does not seem to be much light that philosophy which insists using the same formula or expression to describe them both. It is a phrase which empties the facts as we can see and know them, of all that special in our knowledge of them. *

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি বিভিন্ন ব্যাপার বুঝাইতে যে সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়, তাহা স্বীয় লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না। স্পেনসারের অভিব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা তাই অতি ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে।

আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য আছে। প্রকৃতির এই বিপরীত পরিণতি যাহাকে আমরা প্রলয় বলিতেছি—তাহার বাহ্যাবস্থাকেও স্পেনসার শক্তির অবিনাশিতাকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভিব্যক্তি যেমন শক্তির অবিনাশিত্ব হেতুক, প্রলয়ও সেই প্রকার শক্তির অবিনশ্বরতা হেতুক। শক্তি নিত্য; তাই সে সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যে আগমন করে; শক্তি নিত্য; তাই সে পুনর্ব্বার বৈষম্য হইতে সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। অতএব তাহার মতে এই বিপরীত প্রক্রিয়াদ্বয়ের একমাত্র কারণ শক্তির নিত্যতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—যদি শক্তির অনশ্বরত্বই তাহার অনুলোম ও বিলোম পরিণতির একমাত্র হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, কখনও ইহার অনুলোম পরিণতি, কখনও বিলোম পরিণতি হয় কেন? শক্তি যখন সাম্যভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন বহির্বস্তুর প্রবর্ত্তকতা ব্যতীত, তাহার সেই সাম্যভাবের চ্যুতি হইতে পারে কি? সাংখ্যের প্রকৃতি আলোচনায় এ কথার নিষ্যুক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর সে তর্কের পুনর্ব্বার অবতারণা বাঞ্ছনীয় নহে। একটি বীজ বৃক্ষেই পরিণত হউক, বা বিনষ্টই হউক, একটি পরিবর্ত্তন যেমন শক্তির নিত্যতা হইতে অনুমিত হইতে পারে, অপর পরিবর্ত্তনও সেই প্রকার অনুমিত হইতে পারে; অথবা একটি পরিবর্ত্তন যেমন অনুমিত হইতে পারে না, অপর পরিবর্ত্তনটিও সেই প্রকার অনুমিত হইতে পারে না। শক্তির কেন এই প্রকার বিপরীত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, স্পেনসারের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

স্পেনসার সম্ভবতঃ শক্তি অর্থাৎ কার্য্যকরী ক্ষমতা ও কৃতকার্য্যকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছেন—"যতক্ষণ শক্তির পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ শক্তি নিয়তর সমাবর্ত্তন পরায়ণ।" কিন্তু ইহা শক্তি সংরক্ষণের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। বিশেষতঃ যদি শক্তির প্রলয়বাদ সত্য হয়, তবে ত ইহা অসম্ভবই হইয়া পড়ে। কেন না, কেবল শক্তির নিত্যতার উপর এই সমাবর্ত্তন নির্ভর করে না। শক্তির রূপ যাহাই হউক না কেন, উহা উচ্চ ভূমি হইতে নিম্ন ভূমিতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য শুষ্ক বস্তুকে পতিত হইতে, উষ্ণ বস্তুকে শীতল হইতে দেখা যায়। অতএব উচ্চ

* Text-book of Physiology by Prof. Forster of Cambridge.

বস্তুর সংস্থিতিগত ও উষ্ণত্বগত বৈষম্যই তন্নিষ্ঠ শক্তির যতটুকু পরিমাণ কাজে লাগান যাইবে তাহার নিয়ামক। যেখানে এই বৈষম্য অবিদ্যমান, সেখানে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিকে কাজে লাগান অসম্ভব। তাপের স্বভাবই উষ্ণ ভূমি হইতে শীতল ভূমিতে গমন করা। এই প্রকারে চলিবার সময় তাহা হইতে কতকটা কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু যদি সকল ভূমিই সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপও সঞ্চারিত হইবে না, তাহা হইতে কাজও পাওয়া যাইবে না। সাধারণতঃ সমপরিমিত কার্য্য না জন্মাইয়া সঞ্চারিত হয় না; কিন্তু তাপ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। তাহার কতকটা অংশ কার্য্যে লাগে বটে, কিন্তু আর কতকটা অংশ অপব্যয়িত হয়। এবং এইখানেই শক্তির অপচয়ের অবসর পণ্ডিত ওয়ার্ড বলেন :—

Apparently, too, Mr. Spencer confuses energy or the *capacity of doing work* with work actually *done*, and imagines that so long as the quantity of energy persists, it must be manifest perpetual changes of equivalent amount. But this in any case is not a necessary consequence of the conservation of energy, and if the dissipation of energy be true, it is an impossible consequence. For it is not on the bare persistence of energy, but on the transference and transformation of energy that physical changes depend. But energy, whatever be its form, is only transferrable from places of higher "intensity" to places of lower intensity, to use a convenient term. So we find heavy bodies tend to fall, hot bodies to cool, and so forth. Thus the amount of energy available for work of the total of the energy possessed by two bodies is a function of this difference of level or intensity, and is *nil* when the difference *nil*, whatever total energy be. Generally speaking energy is not transferred without an equivalent transformation into work; but to this thermal energy is an exception. And it is here that the so-called waste or dissipation of available energy comes in.

স্পেনসার একস্থলে বলিতেছেন—নির্ব্বিশেষের বিশেষে পরিণতিই;—উন্নতি! সুতরাং অভিব্যক্তি শব্দটি তাঁহার মতে উন্নতির উপলক্ষণ। যথা :—From the earliest traceable results of civilization, we shall find that the transformation of the homogeneous into the heterogeneous is that in which progress essentially consists (pp. 7 & 8 Essays)*

কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অবিশেষের বিশেষে আগমনই উন্নতি নহে; কেন না বিধ্বংস কালেও বস্তুর আপেক্ষিক অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এবং বিধ্বংস কখনও উন্নতি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যে বিশেষ ভাবে বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল ও অসমঞ্জস হইয়া যায় এবং বস্তুর স্থিতি বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা করে না, সে বিশেষ ভাবে বস্তু

* Spencer's Essays—A selection R. P. A. series

উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান না হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়, সাধারণ কথায় যে অবস্থায় বস্তুর আপেক্ষিক-ভাবে (organic unity) রক্ষিত না হয়, সে অবস্থা অবনতি বোধক, উন্নতি বোধক নহে।

যাহা হউক স্পেনসারের অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এখানে দুই একটি কথা বলা যাউক।

পূর্ব্বে অভিব্যক্তি বলিতে ভৌতিক অবস্থা হইতে জৈবিক জীবের ক্রম বিকশিত পূর্ণাবয়ব সম্প্রতি সৃষ্টি হইত। জীবের এই ক্রম বিকাশ এই বিভিন্ন উন্নতির স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া উক্ত দশার আগমন ব্যাপারটা কেবল কালেরই অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া গণ্য হইত না।

কিন্তু কোন চিচ্ছক্তি ঐ মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়াই উপকরণচয়কে তাহার বিকাশোপযোগী ক্রমতঃ ধীরে ধীরে আত্ম প্রকটিত করিয়া থাকে, পূর্ব্বে অভিব্যক্তি বলিতে লোকে ইহাই বুঝিত। উপাদানগুলি যদৃচ্ছা বশাৎ ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা একটা জীবরূপে প্রকটিত হউক ইহা অধুনাতন পণ্ডিতগণের কল্পনা; এই মতের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিবার ইচ্ছা আছে।

অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে, উহা চিচ্ছক্তি নিরপেক্ষ দুর্ব্বোধ্য। বর্ত্তমান অভিব্যক্তিবাদ কিন্তু অবয়বব্যক্তির একটা প্রক্রিয়া মাত্রেই পর্য্যবসিত। প্রকৃত প্রস্তাবে অধুনা অভিব্যক্তি শব্দটা কোন একটা বিশেষ প্রণালীর একটা প্রক্রিয়া বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। সে প্রক্রিয়া যে চরম বিশ্লেষণে ঐ চিচ্ছক্তিরই আত্মলাভ চেষ্টা—সাধনীভূত হইবার চেষ্টা, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া সে শক্তিকে অস্বীকার বা অপলাপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও অনুমানবলে তাহার অস্তিত্ব উপপন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তরে তাহাকে বাদ দিলে অভিব্যক্তিতত্ত্বই ধারণাতীত হইয়া পড়ে।

এতাবৎ অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে এই টুকু মাত্র বুঝা যাইতেছে যে, তত্ত্বতঃ একটা কিছু তত্ত্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু সেই তত্ত্ব কিস্বরূপ তাহা নির্ব্বাচন করিয়া বলা যায় না। কেহ তাহাকে পরমাণু, কেহ বা প্রকৃতি, কেহ বা প্রধান, কেহ বা ঈশ্বর ইত্যাদি নানা ভাবে তাহাকে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই তত্ত্ব হইতে এই হইল পরিদৃশ্যমান জগৎ কি প্রকারে আবির্ভূত তাহাই প্রধানতঃ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যে প্রকারই ধারণা করিয়াছেন—কোন বিশিষ্ট ধারণাই যে সে তত্ত্বের যথার্থ ধারণা হইতে পারে না তাহা বুঝা যাইতেছে। এবং সেই একতত্ত্ব কি প্রকারে বহুত্বে পরিণত হইতে পারে তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বেদান্তবাদীরা সেই তত্ত্বকে সদসদ নির্ব্বচনীয় 'কিছু একটা' মনে করেন; তাহা "ইদং" "তৎ" ইত্যাদি শব্দবাচ্য নহে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

কাক

হে কর্কশকণ্ঠ পক্ষী—ঘোরকৃষ্ণ কাক সুদর্শন
আঁধারের মূর্ত্তিমান্ মুহুর্মুহুঃ বিদায়-বচন।
অরুণ রথের শঙ্খ কণ্ঠে তব ঘোষিত আকাশে,
মঙ্গল বারতা তুমি আনো নিত্য ধরার সকাশে।
"জাগ' জাগ' স্বপ্নমূঢ়, অন্ধকার লভিছে বিদায়
আলোকের পুনর্জ্জন্ম হের ঐ প্রসন্ন আশায়,
কে আছ'রে এ সময় অন্ধগৃহে মুদি দু'নয়ন,
বহে যায় ব্রাহ্মক্ষণ সুসময় কর উন্মীলন।
সুপ্রসন্ন আঁখি পাতে বিশ্বপিতা চাহে ধরাপানে
বীর লহ সবিতায় আনন্দের পুণ্য সামগানে।
হারা'ও না এ মুহূর্ত্ত সারাদিন ব্যর্থতায় ভরি,
শুষ্ক হবে জীবনের শতদলে একটি পাপড়ি।
বনে বনে জাগে পুষ্প, শস্প, অলি, জাগে সমীরণ
পশুপক্ষী তরুলতা তাহারেরো হলো জাগরণ।
কেন নর ঘুমাইবে, ত্যজ শয্যা স্বপ্ন অবসাদ
জাগ জাগ কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়াছি আনন্দ সংবাদ।
চারিদিকে প্রকটিত বিধাতার প্রসন্ন ইঙ্গিত
ফুরাইয়া যায় ঐ ভক্তদের মঙ্গল সঙ্গীত।"
এই বাণী শুনি আমি হে বায়স, তব কণ্ঠস্বরে,
কৃষ্ণ ঋষি পক্ষী তুমি তপঃকৃষ্ণ শশিতেছ নরে।
ঘোরেল পাপিয়া পিক গাহে বটে সুমধুর স্বনে
ঘুমেরে ঘনায়ে আনে তন্দ্রাতান পশিলে শ্রবণে।
কে জাগিবে মোহপঙ্কে না পীড়িলে কর্ণের পটহ,
নগ্ন তীব্র সত্য যাহা জাগায় তা' সতত দুঃসহ,
সত্য কহি যেই জন ভেঙে দিবে মোহের বিরাম,
সে কি কভু প্রিয় হয়—সে কি হয় নয়নাভিরাম?
সত্যসঙ্গ বৈতালিক! ডাকো তুমি আলোকের পথে,
আমি আমি হিতবাক্য মনোহারী দুর্লভ, জগতে।

শ্রীকালিদাস রায়।

নিত্যলীলা

জগতে এত গভীর উত্তেজনার মধ্যে এমন কে হতভাগ্য আছে, যাহার প্রাণ আশার নিশ্বাসে উৎফুল্ল হয় না? সকলেই জানেন আশা কুহকিনী, জীবকে বৃথা মায়ায় ভুলাইয়া দুর্লভের জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে, কিন্তু কৈ, কেহই ত সে কুহকে মত্ত হইতে বিরত হয়েন না? মৃগ যেমন বালুকারাশি মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, মরুভূমির বালুকাস্তূপকে জলাশয় মনে করিয়া তাহাকে ধাবমান হয়, তৃষ্ণা শান্তির পরিবর্ত্তে, নিরাশায় প্রাণ হারায়, সেইরূপ এই সংসারের চাকচিক্যময় অনিত্য বস্তুর সম্ভোগকে মানব আনন্দ মনে করিয়া ক্রমাগত প্রধাবিত হইয়াও নিরাশ হইলে তথাপি এ অনুধাবন ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হয় না, অবশেষে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে অবসাদ লইয়া জীবন কাটায়,—তথাপি নিত্য আনন্দের সন্ধান করিবার ইচ্ছাও হয় না। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর এই সংসারের ক্ষুদ্র সম্ভোগে আত্মহারা হইয়া, মহান্ অবিচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ সম্ভোগের দিকেও লক্ষ্য করে না। তাই শ্রীভগবান ব্যাসদেব শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

"তদ্যেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥"
২।৯।৩৩

"আভাস অর্থাৎ প্রতীয়মান দ্বিচন্দ্রাদি বস্তু যেমন বাস্তবিক কোন পদার্থ না হইলেও প্রতীত হয়, এবং তম অর্থাৎ অন্ধকার যেমন সৎ অর্থাৎ পদার্থ হইয়াও প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ অর্থ বিনা যাহা প্রতীত হয় এবং থাকিয়াও স্বপ্রকাশ আত্মাতে প্রকাশ পায় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে।"

যাহা কিছুই নয় তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন যে মায়া সেই মায়ার অধ্যাসে আত্মবিস্মৃত জীব, ক্রমান্বয়ে ভেজে বারি ভ্রমের ন্যায়, কাচে জল ভ্রমের ন্যায় এই আপাতঃ মনোরম অসার সংসারের অনিত্য সুখসম্ভোগকে সার বিবেচনা করিয়া ইহাতেই মগ্ন হইতে চায়। অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য এই সতত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির ভাণ্ডারে আপন নিত্যানন্দ লাভের সন্ধান লইতে চায়, পরিণামে নিরাশ হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পায়। তবুও এ প্রধাবন ত্যাগ করে না।

জগৎ গম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গম + কিপ্ — জগৎ। যাহা যায়, অহরহঃ যাহা মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাই জগৎ। ধ্বংসপ্রবণ এই জগৎ নশ্বর অণু পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এই ধরিত্রী, অণু পরমাণুর বিচ্ছেদে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বালুকাস্তূপের উপর যদি কেহ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহা কতক্ষণ থাকে? বালুকাস্তূপের ন্যায় অসার বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া যে আনন্দ নিকেতন জীব সৃষ্টি করে, তাহা কয়দিনের জন্য? বালুকাস্তূপ সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে যেমন তদুপরি নির্ম্মিত অট্টালিকাও ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই নশ্বর সংসারের ধ্বংসাত্মক উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ক্ষুদ্র আনন্দ তাহাও সংসারের ত্রিতাপানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। অবশেষে নিরাশা ও অনন্ত দুঃখ তাহার স্থান অধিকার করিয়া

বসে। জীব যতক্ষণ বাহিরে আনন্দ অন্বেষণ করে, সে ততক্ষণ তাহা পায় না। বাহিরের সমস্ত পদার্থে আনন্দ লাভের আশায় প্রধাবিত হইয়া যখন নিরাশ হৃদয়ে আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নয়ন ফিরায়, তখন তাহারি উপায়ের সুযোগ হয়। বাহিরের যে পদার্থে আনন্দ পাইবে মনে করিয়া ধরে, তাহারই পরিণাম নিরাশা ও নিরানন্দ দেখিয়া দেখিয়া যখন চৈতন্য হয়, মনে হয় বাহিরের কোন পদার্থে আনন্দ নাই, তখন তাহার অন্তর্দৃষ্টি আরম্ভ হয়। "বাহিরে কিছু নাই, আমার ভিতরেও কি কিছু নাই ?" কস্তুরিমৃগ যেমন আপন নাভিগন্ধে উন্মত্ত হইয়া, সেই সৌরভের সন্ধানে অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি নিজের নাভিতে যে সুগন্ধ তাহার সন্ধানও পায় না, সেইরূপ জীব আপন হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে যে আনন্দ মূর্ত্তি বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বসিয়া আছেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ক্রমাগত সংসারের প্রত্যেক পদার্থে সুখান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অবশেষে নিরাশায় অবসাদে অত্যন্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় সাধুর কৃপায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন আপন আনন্দে সে আপনি বিভোর হইয়া এই মর্ত্ত্যেই আনন্দময়ের সেবানন্দ সম্ভোগ করিবার সুযোগ পায়। এই সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্যের স্থান। ভক্ত "তুমি ও আমি" ভেদ রাখিয়া এই সেবানন্দ সম্ভোগের দ্বারা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়। ভক্ত মোক্ষ চায় না। সে চায় অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ। সে "চিনির পাহাড়" হইতে চায় না, সে পিপীলিকা হইয়া চায়। সে অমৃত সাগরে বিলীন হইতে চায় না, সে চাহে অমৃত পান করিতে, সে চাহে প্রাণনাথের সহিত প্রাণ বিনিময় করিয়া অনন্তকাল তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া সে অমৃত মধুর প্রেমের আস্বাদন লইতে, যেমন গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

"সুরতবর্দ্ধনং শোক নাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥"

শ্রীভাগবৎ গোপীগীতা।

"হে বীর সম্ভোগসুখবর্দ্ধনশীল শোকনাশন বাদিতবেণু চুম্বিত মনুষ্যদিগের বিষয়ান্তর রাগের বিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।" সেইরূপ সে সেই অতুল্য অধরের অমৃতময়ী সুধা পানে বিভোর হইতে চায়। সে তাঁহাকে লইয়া "ঘরকন্না" "খুটিনাটি" করিতে চায়। তাই সে জ্যোতি দর্শন করিতে চায় না—সে "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং বিচিত্রং শ্যাম সুন্দরং" দর্শন করিয়া বিভোর হইতে চায়।

ভক্ত চায় বটে কিন্তু কুহকিনী মায়া আপন তমোময়ী আবরণ বিক্ষেপরূপা যবনিকা চক্ষের সমক্ষে ক্ষেপণ করিয়া দৃষ্টি আবরিত করিয়া সে সুখ সম্ভোগের আভাস পাইতে দেয় না। তাই অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যকে ভগবান বলিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন,

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"সত্ত্ব রজ তমোগুণময়ী আমার এই দৈবসম্বন্ধীয় মায়া দুরত্যয়া, ইহাতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে না, কেবল আমাকে প্রপন্ন ব্যক্তিই একমাত্র এই মায়ার হাত এড়াইতে পারে।"

জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। সব জানিয়াও অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহে। শশকের লুক্কায়িত হইবার মত মনে করে যেন বেশ নিরাপদে আছে, কিন্তু কাল যে সতত সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা ভাবিয়াও ভাবে না। মার্জ্জারের ন্যায় আড়াই পদ যাইতে না যাইতে সব ভুলিয়া যায়। সংসারের শত সহস্র দুরাহ্বানে ভোর অলাপর থাকিতেও সে চাতকের ন্যায় মেঘের বারির জন্যই উন্মুখ হইয়া থাকে। তাই কবি গাহিলেন—

"কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং।
পৌরন্দরী ; কলয়তে নববারি ধারাম্।"

শত শত সাধু জগতে বিদ্যমান থাকিতেও সে সে সঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যা মায়াবশে কামকাঞ্চনের দাস হইয়া আনন্দ-লাভ করিতে চাহে, অবশেষে তৃষাবঘাতীর ন্যায় "শ্রম এবহি কেবলং" হয়, পরন্তু অশেষ দুঃখও পায়।

জগতের ত এই ব্যাপার। এখন এই অত্যন্ত দুঃখ, এই ত্রিতাপ নিবারিত হয় কিসে? ভক্তি পরাঙ্মুখ মানব অহরহঃ এই দুঃখ জ্বালা ভোগ করিয়াও ইহাতেই লিপ্ত হইয়া আছে। জগতের এই সমস্ত অসার বস্তুর সম্ভোগের দ্বারা মানব এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়ে যে বার বার অশেষবিধ যন্ত্রণা পাইয়াও উষ্ট্রের কণ্টক-তৃণ ভক্ষণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সেই সম্ভোগেরই লালসা করে। কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হয়? কোন্ পথ অবলম্বন করিলে এই অনিত্য সুখসম্ভোগের পরিবর্ত্তে নিত্যানন্দ উপভোগে জীব শান্তি পাইতে পারে?

জীব যখনই কলির প্রভাবে অবসন্ন ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, তখনই জীবের প্রতি অনন্ত দয়াময় ভগবান বাসুদেব আত্মমায়া-বলম্বনে আত্মসৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই দুঃখের অবসান করিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েন। যথা গীতার সিদ্ধবাক্য—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

গীতা—৪র্থ অধ্যায়।

মায়ার অতীত বস্তু জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মায়া মনুষ্যরূপে এই মায়ার খেলাঘরে লীলা করিতে আসেন। জীব ও পরমে যে কি সম্বন্ধ তাহা শিখাইবার জন্য, জীবরূপে জীব সন্নিধানে অবতীর্ণ হয়েন—তাই এই মর্ত্ত্যভূমে ত্রিবিধের লীলাভিনয়ে ভক্তের আশার পথ সুগম করিয়া দেন। যে লীলা নিত্যরূপে পূর্ণভাবে গোলোকে অহরহঃ অভিনীত হইতেছে, স্বধাম ত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রাণ, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জগতে দেহ ধারণ করিয়া জীবকে তাহা শিখান। এই লীলা, শ্রীমান শ্রীমতীতে যে এই প্রেমলীলা, ইহাই নিত্য তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিলেন—

"এখনও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এই লীলার অনুভূতির জন্য শ্রীগুরুর কৃপা-মাত্র ভরসা। নতুবা ইহা আস্বাদনের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমান শ্রীমতীকে, জীব পরমে, ভক্ত ও ভগবানে এই যে লীলা ইহা নিত্য। বৃন্দা-দেবীর তপোবনে যেরূপে এই লীলা প্রকট হইয়াছিল, তাহা অতি গুহ্য, সেই গুহ্য লীলা জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য আজ জীব ও পরমে, ভক্ত ও ভগবানে, শ্রীমান ও শ্রীমতীতে একত্রীভূত হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন। গোপীপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহাতে

জীব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই কারণ স্বয়ং আচরিয়া জগতকে শিখাইবার জন্য অদ্বৈত প্রভুর সাধন হুঙ্কারে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই লীলা নিত্য। নিত্যের বিকাশ বলিয়া এই জীবজগৎ অনিত্য উপাদানে গঠিত হইলেও, ইহা নিত্য। কারণ ধ্বংসের পর যে অবস্থা, অণু পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এই জীবজগৎ অণু পরমাণুর বিচ্ছেদেও যে অবস্থায় থাকে তাহাও নিত্য কারণ সব পদার্থই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় লয়ের অনুগামী সুতরাং "স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" যে সূক্ষ্ম হইতে এই বিরাট বিকাশ, লয়ের পর আবার সেই সূক্ষ্মেই পরিণতি। সূক্ষ্ম অবস্থায় সকল পদার্থই নিত্য বিদ্যমান—শাশ্বত!

তাই "অহং বহুস্যাম্" এই সিদ্ধ বাক্য অনুসারে ভগবান বাসুদেব যে লীলার অভিনয় করিয়াছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া করিতেছেন, তাহা নিত্য! লীলা নিত্য বলিয়া এ বিশ্বও নিত্য!

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যেমন নেতা কেতার হাঁড়ি। মেয়েদের একটা হাঁড়ি থাকে, তাহাতে একটু নীলবড়ি, সমুদ্রের ফেণা, শশার বিচি প্রভৃতি আবশ্যকীয় অনেক পদার্থ সংগৃহীত থাকে" সেইরূপ প্রলয়ের পর মা মহামায়া সৃষ্টি পত্তনের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্ম উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া রাখেন, আবার সৃষ্টির বিকাশে সেইগুলি বাহির করিয়া দেন। নূতন সৃষ্টি কিছুই হয় না। সকলই সূক্ষ্ম-ভাবে শ্রীভগবানে বিরাজিত থাকে। সৃষ্টির কালে সেইগুলি সত্ত্বরজতমোগুণের বিক্ষোভনে স্থূলরূপে বিকাশিত হয়। এই স্থূলই জগৎ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। লয়ে সূক্ষ্মাবস্থা ও বিকাশের কালে স্থূলাবস্থা এইরূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ক্রমাগত চলিতেছে ও চলিবে। সুতরাং ইহাই নিত্যাবস্থা, বিলোম গমনে লয়ের অনুগামী ও অনুলোম গমনে সৃষ্টির পরিপোষক। এই নিত্য বস্তুর যে লীলা তাহাও নিত্য। সূক্ষ্ম লইয়া যে জগৎ, তাহাও নিত্যের অংশ বলিয়া নিত্য, কারণ ভগবান যখন নিত্যবস্তু, তিনি ওতঃ প্রোতঃ ভাবে যখন এই সৃষ্টির মধ্যে বিরাজিত তখন ইহাকে অনিত্য বলা যায় না যথা গীতায় সিদ্ধবাক্য—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং
সূত্রে মণিগণাইব।"

আবার শ্রীভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"অহমেবাস মেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং।"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, আমা ভিন্ন সৎ, অসৎ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম কিংবা তদুভয়ের কারণ কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরে আমিই আছি। এই যে জগৎ তাহাও আমিই এবং সকল বিলীন হইলে আমিই অবশিষ্ট থাকি।"

নিত্য বস্তু যাহাতে অনুপ্রবিষ্ট, তাহা কখন অনিত্য হইতে পারে না কিন্তু এই জগৎ নিত্যের বিকাশ হইলেও ইহা সতত পরিবর্ত্তনশীল। ইহা অব্যয় নহে। কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল জগত হইতে অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ লাভ হইতে পারে না। সতত চঞ্চল এই জগৎ, ইহা হইতে অচঞ্চল সুপ্রতিষ্ঠিত কোন আনন্দ লাভ হইতে পারে না। তাই জীব এই অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য বস্তু সতত বিরাজিত তাঁহার সন্ধান করিতে চায়। সেই

নিত্য বস্তুতে মনপ্রাণ সংযোজিত করিলে তবে নিত্যানন্দ ভোগ জীবের ভাগ্যে ঘটে। তাই মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভক্তি লীলাভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি সাধনার দ্বারা নিত্যানন্দ লাভ হইলে তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লাভ হয়, জীবের শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। সাধনার দ্বারা এই সাধ্য বস্তু লাভ অতি দুরূহ বলিয়া দয়াময় বাসুদেব অগ্রে নিত্যানন্দকে, দেবানন্দরূপী নিজ দক্ষিণ হস্তকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া জীবকে নাম সাধনা শিক্ষা দিয়াছেন। অতি গুহ্য বৃন্দাবনলীলা সুবোধ্য করিবার জন্য নাম ও নামীর, ভক্ত ও ভগবানের এই প্রেমলীলাভিনয়! নিত্যানন্দ প্রভুর অকাতরে নাম বিতরণ, জগতে ভক্তি-বীজ নির্ব্বিশেষে রোপণ করিবার জন্যই হইয়াছিল। এই ভক্তি লাভ ভিন্ন ভক্ত হয় না, এবং ভক্ত না হইলে ভক্তের একমাত্র ভজনীয় বস্তু ভগবান লাভ হয় না। তাই কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে দয়াময় এই প্রেমলীলাভিনয় করিয়া ক্ষীণ শক্তি কলিজীবের সহজ সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাঁরা প্রেমানন্দ ভারতী একস্থানে লিখিয়াছেন "Sree Krishna is a mystery & Gouranga is its explanation." শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব একটি গূঢ় রহস্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই রহস্য ভেদকারী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দয়া দিয়া লাভ করিতে হইবে। নতুবা অন্য উপায় নাই। সৎ, চিৎ ও আনন্দ লইয়া যে বিগ্রহ তাহার সর্ব্ব-সার্থকতা আনন্দে। আমার গত কার্ত্তিক মাসের "মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অতি দুরূহ তত্ত্ব, সুতরাং শ্রীমানকে বুঝিতে হইলে শ্রীমতীর মধ্য দিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে তাহা বোধগম্যই হইবে না। তাই বিশ্বরূপ মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক, দ্বাপরের যুগলকিশোর মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক, কলিতে ভগবান মিলন মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন। নতুবা মায়াবদ্ধ, ভ্রমসঙ্কুল জীব কিরূপে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে? তাই রাধা রাধা অন্তঃকৃষ্ণরূপে ভক্তের হৃদয়রঞ্জন করিতে নদীয়া ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই লীলা সাধারণ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিবার জন্য প্রকট মূর্ত্তিতে, ভগবানের জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠা সেই অদ্ভুত প্রেমবিলাস স্বয়ং আচরিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন। তাঁহার লীলা নিত্য হইলেও, যাঁহারা সাধনার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন নাই, তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া, গুহ্যকে ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিলেন, অমৃতভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন সর্ব্বসাধারণে পান করিয়া অমর হইবে বলিয়া। নাম সুধা "অমৃতস্যাবকল্পতে" বলিয়া দয়াময় প্রকট মূর্ত্তিতে জগতে নাম সুধাই বিতরণ করিয়াছেন। দেবানন্দ রূপী নিতাইচাঁদ জাতিনির্বিশেষে সেই সুধা বণ্টন করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছেন। "নাম ভিন্ন গতি নাই—নাম নামী অভেদ, নাম পাইলে নামীকে পাইবে" এই শিক্ষা দিয়া কলিপাবন নিতাইচাঁদ জগত উদ্ধার করিয়াছেন।

এই নামলীলাই নিত্য, সত্য। এই অলীক সংসারে একমাত্র নামই সত্যের আধার, কারণ নাম ও নামী অভেদ এবং নামী

"সত্যা ব্রতং সত্য পরং ত্রি সত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥"

শ্রীভাগবত ১০।২।২৭

ভগবান বাসুদেব যখন দেবকীর কারাগৃহে অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময় ঈশান ও ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম শ্লোক উপরোক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেবগণ বলিতেছেন—

হে ভগবন, তোমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য বলিয়া তুমি সত্যব্রত; তোমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে সত্যই পর অর্থাৎ প্রধান সাধন বলিয়া তুমি সত্যপর; তুমি তিনকালেই সত্য বলিয়া তুমি ত্রিসত্য; সত্যের অর্থাৎ পঞ্চভূতের তুমিই যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ; স্থিতির সময়েও তুমি ঐ সত্যের অর্থাৎ পঞ্চভূতে অন্তর্যামীরূপে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত; সত্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধ সত্য অর্থাৎ উহার নাশেও তুমিই অবশেষ থাক বলিয়া পরমার্থ বস্তু; ঋত অর্থাৎ সত্যবাক্য এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অথবা এই উভয় তোমার প্রাপক বলিয়া তুমি ঋত সত্যনেত্র; এইরূপে দেখা যায় তুমি সর্ব্বপ্রকারেই সত্য; অতএব সত্যাত্মা যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।" সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে সত্যময় ভগবানের নাম লইয়া জীব নিত্যানন্দ লাভ করে। পরে তাহার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানলাভ হইলে, ভক্ত ও ভগবানে, জীব ও পরমে, শ্রীমান ও শ্রীমতীতে যে লীলা অনন্ত কাল ধরিয়া হয় তাহার অনুভূতি পায়। তাহাই নিত্য, সেই পরমপুরুষের বিরজাপারস্থিত পরব্যোমের এই নিত্যলীলা। এই লীলা সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায়,

"—শ্রীললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতাঃ।"

শ্রীবৃন্দাবনে বংশীধ্বনি হইলে, সেই রব যখন ব্রহ্মকুটাহ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে শ্রুত হইল, তখন কমলা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর পদ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি সেই রবে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া পাদ সেবা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানহীনার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলে, শ্রীবিষ্ণু তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য পথরোধ করিলে তিনি বলিলেন "প্রভো, আমি আর আপনার স্পর্শের যোগ্যা নহি। আমি অভিসার মানসে বৃন্দারণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলাম।"

পালনকর্ত্তা উত্তর করিলেন "দেবি তুমি যেখানে যাইবার মানস করিয়াছ, তিনি বিভু, আমি তাঁহারই অংশ—অণু। সুতরাং তাঁহাতে অভিসার দোষ ঘটিতে পারে না। তুমি সতীশিরোমণি। তবে এক কথা সে স্থলে যাইবার বা সে লীলায় যোগ দিবার তোমার অধিকার নাই। তাই কমলা কঠোর তপস্যায় বসিয়া এই অধিকার লাভ করিলেন যে, যখন ভগবান গোপীমণ্ডল মণ্ডিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহারাস আরম্ভ করিবেন, তখন কমলা তাঁহার বক্ষে স্বর্ণরেখার ন্যায় থাকিবেন মাত্র। তাই ভগবান বাসুদেবের বক্ষ শ্রীবৎস চিহ্নিত। শ্রী, বৎ, স অর্থাৎ তাঁহার বক্ষে শ্রী অর্থাৎ কমলা আছেন। এই মহারাসরূপী লীলাই নিত্য। অহরহঃ বিশ্বময় এই মহারাস হইতেছে। শ্রীগুরুর কৃপায় ইহার অনুভূতি জীব পাইতে পারে। আপন হৃদয়মধ্যে অণু পরমাণুর সমবায়ে, এই বিরাট বিশ্বময়ে যেখানে অন্বেষণ করিবে, এইলীলা সর্ব্বত্রসর্ব্বদা হইতেছে বুঝিতে পারিবে। কারণ সত্যময়ের লীলা সকলই সত্য, বিশ্ব ভরিয়া দেদীপ্যমান। তাই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন—

শ্রীরাধা প্রাণবল্লোচরণ কমলয়ো কেন
সেবাভগম্যা।
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজ চরিত পরৈঃ গাঢ়
লৌল্যক লভ্যা॥
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যথাস্যাং প্রথয়িতুমধুনা
মানসীমস্যসেবা।
তাব্যা রাগার্দ্র পাথৈঃ ব্রজমনচরিতং নৈত্তিকং
তত্ত্ব নৌমি॥"

"যে চরণ কখন ব্রহ্মা, শিব বা অনন্ত-দেবেরও জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ দেবগণও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং যাহা ব্রজধামের একমাত্র ধন, প্রগাঢ় লৌল্য ব্যতীত যাহা লাভ করা যায় না, সেই প্রেমসেবারূপ মানসী সেবাই নিত্য রাগানুগা-মার্গাবলম্বনে যাহার ধারণা—ভক্ত অনুভব করেন সেই নিত্যবস্তু বা নিত্যলীলারূপ প্রেমসেবাকে নমস্কার করি।"

এই নিত্যলীলা "ব্রজচরিতপর" ব্রজগোপী-গণের একমাত্র ধন। গোপী না হইলে এই নিত্যলীলার আস্বাদন জীবের পক্ষে অতি দুরূহ। নররূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত লীলা, সেই "কুঞ্জাদ্বোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে গোধনান্তা সপর্য্যাং প্রাতঃ সান্ধ্যক লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গযে চারয়ন গাঃ। মধ্যাহ্নে চাথনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াথাপরাহ্নে গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ, সকৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী।

নিশান্তে কুঞ্জ ভঙ্গের পর সেই গোষ্ঠ প্রবেশ, সেই প্রাতঃ ও সান্ধ্যলীলা, সেই গোচারণে সখাগণ সঙ্গে গোচারণ, মধ্যাহ্নে প্রখর রবিতাপতপ্ত হইলে বিপিনে বিহার অপরাহ্নে শ্রীরাধার সহিত প্রেমলীলা, এবং সেই সন্ধ্যা সময় গোষ্ঠ হইতে সুহৃদগণের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন, এই সমস্ত লীলা চিন্তা করিতে করিতে ভক্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন যে রাধাহৃদয় বিহারী এই সমস্ত লীলা করেন, তিনি আমা-দিগকে চরণে স্থান দিয়া রক্ষা করুণ।

এই লীলা গোলোকে অহরহঃ সংসাধিত হইতেছে তাই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন যথা—

"গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীসাথ,
শ্রীদামাদি সহচর গণ।
নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন॥
সুধা সমুদ্রের মাঝে, চিন্তামণি বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্ব কানন।
"নানাপুষ্প বিকশিত, নানাপক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান, ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিনী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাস রসরঙ্গে
নৃত্যগীত বাদ্য নানামত॥

গোলোক সম্পদ লয়ে, ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ, করিবারে নিপাতন
দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে॥"

ত্রিদেবের এই নিত্যলীলা, গোলোকের এই গুপ্তধন, গুহ্য লীলা, জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য দয়াময় ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই গুহ্যলীলা তখন কেবল ব্রজদেবীগণ, ব্রজদেবীরূপে স্বর্গের অমরগণ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাও অতি গোপনে। সেই নিত্যধন সাধারণের সম্পত্তি করিবার জন্য, আবার দয়াময় এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নাম সাধনা জগতকে শিখাইয়া গিয়াছেন, কারণ নাম সাধনেই জীব সর্ব্বানন্দ লাভ করিতে পারে। যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, আপন স্ত্রী, কি প্রাণবন্ধু যাহার অদর্শনে দশদিক শূন্য বোধ হয়, এমন পরমাত্মীয়ের নাম অবশ্য আমরা সর্ব্বদা শুনিতে ভালবাসি। নাম করিলেই নামীকে মনে পড়ে বলিয়া, প্রিয়তমের নামটি পর্য্যন্তও আমাদের নিকট প্রিয়তম। তাই মহাপ্রভু এই নামধন আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া আপন মহিমারই বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং জীবগণের পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই নাম লীলাই নিত্য। ইহারই মধ্যে সর্ব্ব সত্তার অধিষ্ঠান। এই নাম ও নামীর মিলনই মহারাসের পরিণতি। ভক্ত ও ভগবানের জীব ও পরমে, নাম ও নামীর এই মহামিলনই মহারাস।

এই নিত্যলীলার আস্বাদে, নাম সঙ্কীর্ত্তনের মধুর আস্বাদে নিত্যানন্দলাভ করিয়া শ্রীশুক দেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ বিভোর হইয়া অনন্তকাল হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার নিকট, এই কীর্ত্তনানন্দের নিকট, প্রাণ নাথের মানসী সেবার দ্বারা যে জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হইয়া অতীন্দ্রিয় চিৎ সত্তায় ও সম্ভোগ লালসা পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেই সেবানন্দই সত্তাসার, কারণ ইহার নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ।

ব্রহ্মানন্দ, জ্ঞানী জ্ঞানমার্গাবলম্বনে যে জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন, সে আনন্দকে যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত করা হয়, শাস্ত্রকার বলিতেছেন, তথাপি সেবানন্দের একপরমাণুকণারও সমতুল্য হইবে না। যথা—

"ব্রহ্মানন্দ ভবেদেষা চেৎ পরার্দ্ধ গুণীকৃতঃ।
নহি ভক্তি সুখা পোবেঃ পরমাণুকণাবপি॥"

এই ভক্তি পথকেই শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন এই ভাগবতধর্ম্ম "নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং" ভক্তি মার্গ আশ্রয় না করিলে, ভাল বাসিতে না শিখিলে জীব নির্ম্মৎসর হইতে পারে না, সুতরাং এই ভালবাসা বা প্রেম হইতে যে আনন্দ দীনভক্ত লাভ করে, তাহার তুলনায় জ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গের পরিণতি যে আনন্দে তাহা অতি ক্ষুদ্র।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট ভাবে ভগবান যে লীলা করিয়াছেন। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবান ঐশ্বর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ মাধুর্য্যে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই নিত্য এবং সেই লীলাই অপ্রকট ভাবে—গোলোকে নিত্য হইয়া থাকে, তাই শ্রীভাগবতকার বলিলেন—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বিক্ষ্যরন্ত; মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ॥"

তিনি ভগবান হইয়াও, ষড়ৈশ্বর্য্যময় অপার, —অপরিমেয় বিরাট পুরুষ হইয়াও, "রন্ধ্রং মনশ্চক্রে।" তিনি যে শুধু ঈশ্বর নহেন, আবার মধুর, পূর্ণ মাধুর্য্যের আধার, তিনি "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং"—তিনি যে কেবল ঐশ্বর্য্যময় নহেন আবার পূর্ণ প্রেমময়। সেই প্রেমে যে জীবের নিকট ভক্তের নিকট অতি সুলভ, তাই ত গোপীগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহাতে হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা প্রতিদানাশা বর্জ্জিত হইয়া "প্রোজ্ঝিত কৈতব" হইয়া, ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া, মোক্ষের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, শ্রীমতীর চরণে পর্য্যন্ত ধরাইয়াছেন। তাই রাসমণ্ডলে যোগ দিবার জন্য যে সকল গোপী উন্মত্তবৎ প্রধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিবাধিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় শ্রীভাগবত বলিতেছেন।

"তাসং প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ।

১০।২৯।১০।১১

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহ তাপে তাহাদিগের অশুভ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধ্যানলব্ধ তদীয় আলিঙ্গন হইতে উৎপন্ন আনন্দে তাহাদিগের মঙ্গলসকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে সদ্য বিমুক্ত বন্ধন গোপী সকল জার বুদ্ধির দ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন।"

এই অপূর্ব্ব প্রেমের বলে তাঁহারা তাঁহাদের অশিষ্ট দেহাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে সেই রাসোৎসবে যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কামনা হীন ছিলেন, আর কিছু চাহিতেন না, তাই তাঁহারা শ্রীমানকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়াছেন।

যোগী ঋষিগণ তপশ্চরণ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিলে, ইষ্টদেবতা সম্মুখীন হইয়া "বরং বৃণু" বলিতেন। তাঁহারা কিছু বর লইলেই তাঁহারা "তথাস্তু" বলিয়াই কার্য্য ফুরাইত কিন্তু ব্রজদেবীগণ কিছুই চাহিতেন না। কিছু লইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলিতেন "আমাদের কিছুরই অভাব নাই, কি চাহিব?" এই কথা বলিতেন আর বলিতেন "আমাদের যাহা অভাব তাহা তুমি পূর্ণ করিয়া দাও। আমরা তোমার অভাবে অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ, আমাদের সে অভাব পূর্ণ কর, আমাদের হৃদয় মন্দিরে তোমার জন্য সিংহাসন পাতা আছে, তাহা শূন্য করিও না। সতত যেন পূর্ণ থাকে এই চাই। আমরা তোমাকেই চাই।"

"অনুক্ষতে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
"সংসার কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।

শ্রীভাগবত ।১০।৮২।৩৪

"হে পদ্মনাভ, সংসারকূপে পতিতকে উত্তোলন করিবার অবলম্বনস্বরূপ তোমার পদারবিন্দ গভীরজ্ঞানী যোগেশ্বরগণই সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। আমরা গৃহে থাকিয়া সেবা করিলেও যেন আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদয় হয়।"

তাই ভক্তপ্রাণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া একপদও যাইতে পারেন না। তাই গোপী-

সঙ্গকে লইয়া তাঁহার এই নিত্যলীলা। এই কামনাহীন সম্ভোগ, এই নিষ্কাম প্রেম গোপী প্রেমকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই নিষ্কামত্বহেতু সকল গোপীই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল শ্রীমতী শ্রীমানের উপযোগী, মনোমোহিনী করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত। এক পুরুষের যদি দুই বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার গৃহে অবস্থান অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। দুই পত্নীর অহরহঃ কলহে সে স্বামীকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কিন্তু সকল ব্রজদেবীই কেবল শ্রীমতীর জন্যই, শ্রীমতীর মনস্কামনাপূর্ণ করিবার জন্যই সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিতেন। যেমন মনের আনন্দ সম্পাদিত হইলে, সর্ব্বদেহেও আনন্দ বিকাশ হয়, সেইরূপ যেমন শ্রীমতী মন ও ব্রজদেবীগণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মনের তৃপ্তি সাধনেই সর্ব্বাঙ্গের তৃপ্তি সাধন! এ নিঃস্বার্থতা এই নিষ্কামত্ব গোপীপ্রেমকে অমর করিয়া জগৎময় সুবাসিকনে পরিতপ্ত ভক্তহৃদয়ে বিমল শান্তি বিতরণ করিয়াছে। তাই এই বৃন্দাবন লীলাই নিত্য। এই নিত্যলীলার অভিনেতা নটনাগর স্বয়ং সর্ব্বরসের অবতারণা করিয়া বিশ্বে বিমোহিত করিয়াছেন কারণ "রসো বৈ সঃ।" সর্ব্বরসের আকর যে তিনি। সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ব মাধুর্য্য লইয়া এই রাসলীলাই তাঁহার নিত্যলীলা। বিশ্ব করিয়া এই লীলা অহরহঃ হইতেছে এই লীলা সহজ বোধ্য করিবার জন্য নটনাগর স্বয়ং বিমল মূর্ত্তিতে নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হইয়া আচরিয়া জগতকে বুঝাইয়াছেন। নহিলে কে ধরিতে পারিত? কে বুঝিতে পারিত? এই লীলার নিত্যত্বই বৈষ্ণবের প্রাণ, নদীয়ার প্রেমধর্ম্মের মেরুদণ্ড। এই নিষ্কাম প্রেমের বলেই গোপীগণ বলিয়াছিলেন,

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবী মটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদি ভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।

শ্রীভাগবত। ১০।৩১।১৯

"হে প্রিয়, তোমার যে সুকুমার চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনসমূহে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বন মধ্যে বিচরণ করিতেছ এবং তাহাতে উহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদিগের জীবন।"

এই নিষ্কাম প্রেমের বলে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীমানের যে লীলা তাহাই নিত্য। এই লীলার নিত্যত্বই জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মহা কারণ। এই লীলার মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

জ্যোতিষচর্চ্চাফলে মানব ও ব্রহ্মের ধারণা

মানব বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? কতকগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিই মানব নামে অভিহিত। আমাদের ফলিত জ্যোতিষের মতে, এই ইন্দ্রিয় সমষ্টিটা দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত নবগ্রহের বিভিন্নরূপ শক্তি ক্রীড়া মাত্র। সাধারণ লোকে, দুই হস্ত দুই পদ দুই চক্ষু নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিটাই মানবদেহরূপে কল্পনা করেন। জ্যোতির্ব্বিদের মানব ধারণা উহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। জ্যোতিষীরা মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশিতে ব্রহ্মাণ্ড বিভাগের ন্যায়, জীব বা জীবের আয়ুঃ কালটিকে তনু, ধন, সহজ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় এবং ব্যয় এই দ্বাদশ ভাবে বা দ্বাদশবিধ শক্তিতে বিভক্ত করেন। ফলিত জ্যোতিষের মতে, মানব যেন এই দ্বাদশ ভাবের সমষ্টি বা উক্ত দ্বাদশ ভাব সমন্বিত এক একটি শক্তিপিণ্ড মাত্র। জড় বৈজ্ঞানিক যেমন কোন জড়পিণ্ড পাইলে তাহাতে কয়ভাগ অম্লজান (অক্সিজেন), কয়ভাগ উদ্‌জান (হাইড্রোজেন), কয়ভাগ বা অঙ্গার (কার্ব্বণ) ইত্যাদি মূল পদার্থ আছে বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যান এবং এই বিরাট বিশ্বটাকে কতকগুলি মূল পদার্থ সমূহের বিভিন্নরূপ সমাবেশ মাত্ররূপে উপলব্ধি করেন, শারীরতত্ত্ব বিদের দৃষ্টিতে মানব যেমন কতকগুলি সজীব বা কার্য্যক্ষম অস্থিপেশী প্রভৃতির সমাহার বা মিলন ফল মাত্র, আমাদের ফলিত জ্যোতিষগণও তদ্রূপ মানবকে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ভাবের বিভিন্নরূপ শক্তি ক্রীড়া এবং গ্রহগণকেই সেই শক্তির উৎসস্বরূপে বিবেচনা করেন। জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে মানবদর্শন এইরূপ সাধারণ জীবের মানব সম্বন্ধীয় ধারণা হইতে কিছু বিভিন্ন। মানবকে এই ভাবে গ্রহগণের বা বিশ্বাত্মার শক্তি স্ফুরণমাত্ররূপে বিবেচনা করিতে আমরা এখনও তাদৃশ অভ্যস্ত হই নাই কিন্তু উক্তরূপ ভাবনার ভিতর ভাবিবার মত কিছু যে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে, সকলেই তাহা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি।

সম্প্রতি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এ-পি, সিনেট মহোদয়, জ্যোতিষীয় ভাবে ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকের গোচরার্থ আমরা এখানে উহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

য়ুরোপে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বিরোধ বহুকাল যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। এতকাল পরে কিন্তু উভয় দল মধ্যে সন্ধি স্থাপনের একটা আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্র বিশ্বাসীকুল, বিবিধ বিজ্ঞান সমূহ মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রটিকেই সর্ব্বাধিক সন্দেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। পূর্ব্বে শাস্ত্রব্যবসায়িগণ শাস্ত্রার্থ অবধারণ কালে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষপরম্পরাগত শাস্ত্র মর্ম্ম সমূহের প্রচার করিতেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না, বিজ্ঞানের প্রতি অনাদরের

ভাব প্রদর্শন করিতেন। পক্ষান্তরে কোন কাচের জিনিসের দোকানে ষাঁড় এসে ঢুকিলে, দোকানের জিনিস কুনিস যেমন সে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে, সেইরূপ ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক বর্গের প্রথম অভ্যুদয় কালে বিজ্ঞানের হাতে পড়ে শাস্ত্রেরও কতকটা সেই দশা ঘটে ছিল। যাহা হউক বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে এই উপেক্ষা বিদ্বেষ ও সন্দেহের ভাব ক্রমশঃই কাটিয়া আসিতেছে; এখন বরং বিজ্ঞানের মানই বজায় রাখিয়া তদনুযায়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থ অবধারণের চেষ্টাই লক্ষিত হয়। এখন আর বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক একার্থবাচক নহে; শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ অবধি তাঁহাদের আস্তিক্য-বুদ্ধি খ্যাপনে এখন আর কুণ্ঠা বোধ না এবং শাস্ত্রব্যবসায়িগণও বুঝিতেছেন, বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার ফলে, ধর্ম্ম, ঈশ্বর শাস্ত্রার্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে সনাতন ধারণা সমূহ বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন নূতন ভাবে উপলব্ধি আর নাস্তিক্য বুদ্ধি, দুটা ঠিক এক জিনিস নহে।

বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য এই, শাস্ত্র যেন উপর হইতে নীচের দিকে আগমন করে আর বিজ্ঞান উল্টা পথে নীচু হইতে উপরে উঠিতে যেন চেষ্টা পায়। আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যেন কোন অপ্রত্যক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গঠন, শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আর বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তদনুযায়ী অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সাহসী। কি শ্রেয়ঃ কিবা প্রেয়ঃ, কি বিদ্যা কি অবিদ্যা, কি কর্ত্তব্য কিবা অকর্ত্তব্য ইত্যাদি নির্দ্ধারণ কালে শাস্ত্র ও বিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন পথের অনুসরণ করেন। সরল সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় উভয় পথেরই গৌরব বুঝিয়া এবং উভয়েরই অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া উভয়ের সাহায্যে স্বীয় মত গঠনে চেষ্টা পান।

উভয়দলের মধ্যে এইরূপ সন্ধি স্থাপন চেষ্টা ফলে এখন আবার অল্পে অল্পে অনেকেই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, জড়ের ন্যায় চেতনেরও জন্মদাত্রী এই যে পূর্ণা প্রকৃতি, ইহাকে শুধু জড় রূপে ধারণা করিলে সেটা কি ভুল ধারণা হইবে না? জড় দেহ বিশিষ্ট সচেতন দেহীর ন্যায় জড় চেতন মিলিয়া পূর্ণ প্রকৃতিটা চৈতন্যময়ী ভাবিতেই বা বাধা কি! প্রাকৃতিক নিয়মগুলা জড়ের গুণরূপে যেমন ভাবনা করা হয় তদ্রূপ চৈতন্যময়েরই ইচ্ছা প্রকাশ ভাবিলেই বা দোষ কি? প্রকৃতিটা অচেতন জড় শক্তি না ভেবে, জড়টা সচেতনেরই বিকাশ ভেদ বা আংশিক স্ফূর্ত্তি মাত্র ভাবিবার জন্য ধীরে ধীরে মানব মন আবার প্রস্তুত হইতেছে।

জগৎস্রষ্টা কোন একদিন এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্রষ্টা সম্বন্ধে এই পুরাতন ধারণায় অনেকে আজকাল আর আকৃষ্ট হন না। সৃষ্টির কি আদি অন্ত লক্ষিত হয় যে উহার আরম্ভ কল্পনা করিতে হইবে? পক্ষান্তরে, ভ্রূণ হইতে মানবের বিকাশ, বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ, নীহারিকা হইতে সৌরজগতের বিকাশ ইত্যাদি সৃষ্টি লীলা নিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়। বিশ্বময় সদা সজীব এই যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া একভাবে দেখিলে ইহা আদ্যন্ত বিহীন, আর এক ভাবে দেখিলে ইহার আদি অন্ত অনুক্ষণ ঘটিতেছে। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদে সৃষ্টি রহস্য ফুটতর হইয়াছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্নরূপে উপলব্ধি

করিবার জন্য মানব মন মনে মনে প্রস্তুত হইতেছে। নিরাকার অপ্রত্যক্ষ কল্পনাই ভগবানের পরিবর্ত্তে সাকার প্রত্যক্ষ ভগবানের জন্য ব্যগ্রতা বাড়িতেছে। স্থূল সূক্ষ্ম দুটাকে পৃথক না ভেবে একেরই মূর্ত্তিভেদ রূপে ধারণা জন্মিতেছে

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বটে কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞানটি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়েই নিবদ্ধ নহে এ ধারণা জন্মিতে বিলম্ব হয় না। যে জীব যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাস করে তাহার তদুপযোগী দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম উদ্ভূত হয়। জলে চুপ্‌ইয়া ধরিলে আমরা বিনাশ পাই কিন্তু মৎস্যাদি জলচর জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাতে নষ্ট হয় না প্রত্যুত তদ্বিপরীত অবস্থায় কার্য্য শক্তি হারায়। এই ভাবে বিচার করিয়া যাইলে বরফ অপেক্ষাও শৈত্যে এবং অগ্নির অপেক্ষাও তাপে চৈতন্যের সত্তা বা জীবের অস্তিত্ব আর অসম্ভব বিবেচিত হইবে না; স্থূল সূক্ষ্ম যে কোন আকারে চৈতন্যের অধিষ্ঠান সম্ভব পর মনে হইবে। blairvoyance প্রভৃতি সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিকাশও প্রমাণিত করে, চৈতন্যের বিকাশ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতও নানা অবস্থায় ও নানা আকারে ঘটিতে পারে।

এই ভাবে বিচার করিয়া গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবপূর্ণ ভাবিতে আর ভয় হইবে না, সূর্য্যাদি গ্রহগণকে সচেতন মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইবে না, স্থূল শরীরী বা সূক্ষ্ম শরীরী দেবতা, এঞ্জেল, মুক্ত মহাত্মা প্রভৃতির কল্পনায় শিহরিয়া উঠিবার আবশ্যক হইবে না।

পুরাতন মতে এঞ্জেল বা দেবদূতগণ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী স্বরূপ। নাস্তিক বৈজ্ঞানিক এই ভাবের কর্ম্মচারীকুলের অস্তিত্বে সন্দেহবান্। নাস্তিক আস্তিকের সন্ধির পরিণামে এই উভয় ভাবই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকার প্রাপ্ত হয়। বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ ভ্রূণ হইতে জীবদেহের বিকাশ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, বিশ্বব্যাপী ক্রমবিকাশ লীলা বা সৃষ্টি লীলাটি যেন কোন নাটকের অঙ্কের পর অঙ্কে ক্রম বিকাশের অনুরূপ সৃষ্টির ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই সেই পূর্ণা প্রকৃতি বা স্রষ্টার কর্ম্মচারী স্বরূপ অথবা অংশ স্বরূপ; অথবা এই সৃষ্টি লীলায় সকলেই যেন এক একটি অভিনেতা রূপে নিজ নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সমস্ত অভিনেতৃবর্গ বা কর্ম্মচারী কুল আমাদের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট হউন বা না হউন, উঁহাদের অস্তিত্বে সন্দেহের কারণ নাই, কারণ উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বের ভাবৎ ব্যাপারে, সৃষ্টি লীলার এই সমস্ত অভিনেতৃবর্গ স্রষ্টার এই সব কর্ম্মচারী কুল বা অংশ সমূহ দেখিয়া সুখী হন। দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে যদি সাধ যায়, জ্যোতির্ব্বিৎ ঐ সূর্য্য চন্দ্রাদিকে দেখাইয়া দিবেন। ইঁহাদের ন্যায় সৃষ্টি লীলায় বিরাট অভিনেতা, স্রষ্টার মহৎ কর্ম্মচারী বা শ্রেষ্ঠ বিকাশ আর কি আছে?

মনের ভাব ভাষায় বা অক্ষরে প্রকাশ করা কত না দুরূহ! লেখনী চিত্র বা ভাষার সাহায্যে মানস চিত্রাঙ্কণ চেষ্টা অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতাকে বড় করিয়া দেখিয়া, এই ত্রুটিটা একটা অযথা ত্রুটি বিবেচনায় অভ্যস্ত হইয়া উপাস্য সম্বন্ধে মূর্ত্তি বা চিত্র রচনার চেষ্টা দেখিলে কেহ কেহ অতীব বিরক্ত হন, প্রতিমা পূজার নামেই অনেকে খড়্গহস্ত। তথাপি ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা কমে না, লেখনী

চিত্রাঙ্কণে ও তুলিকা সাহায্যে চিত্রাঙ্কণে কেহ বিরত হন না। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধবাদি-গণও বহু সময় অজ্ঞাতসারে প্রতিমাপূজক সাজিয়া বসেন। য়ুরোপের মধ্যযুগের কোন কোন চিত্রে ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বরের (ঈশ্বর, খৃষ্ট ও পবিত্রাত্মার) পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দেখা যায়। উচ্চ একখানি আর্ম-চেয়ার বা কেদারার উপর বসিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু পিতা ঈশ্বর সোজা পাইতেছেন, তাঁহার পিঠের উপর একটি ঘুঘুর রূপ ধরে পবিত্রাত্মা উপবিষ্ট, পার্শ্বে একটু নীচু আসনে পুত্র ঈশ্বর বা খৃষ্ট বিরাজমান। উপাস্তকে এবম্বিধ ভাবে চিত্রে প্রকাশিত দেখিলে আজি কালিকার দিনে অনেকেই শিহরিয়া উঠেন কিন্তু খৃষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ইত্যা-কার শাস্ত্রের কথা শুনিলে ইহারাও শিহরিয়া উঠেন না। প্রতিমা পূজার উপর খড়্গহস্ত অনেকেই এইরূপ অজ্ঞাতসারে নিজেরাই প্রতিমা পূজক।

প্রতিমা পূজার বিড়ম্বনা বুঝিতে সত্য-সত্যই যদি সাধ থাকে, আকাশে একবার নেত্রপাত করা। সূর্য্যের দিকে একটি বার চাহিয়া দেখিলেই চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে মূর্ত্তি বা চিত্ররচনা ও দূরের কথা। স্রষ্টার অনন্তত্ব জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সাহায্যে যেমন প্রকটিত হয় এমন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সাহায্যে হয় কি না সন্দেহ। এই জ্যোতিষের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এক সময় কি বিবাদই না চলিয়াছিল। পৃথিবীকে সচল বলায় গ্যালিলিওকে কারা-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল; বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহভাগী কাণ্ডরূপে বিবেচিত হইত। এক-দিকে শাস্ত্র বিশ্বাসীকুল সমক্ষে বিশ্বাসের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত, অন্য পক্ষে বৈজ্ঞানিকের বল, "কোন বিষয় অসত্য জানিয়াও তৎপ্রতি সত্যের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন বা মিথ্যা পূজার নাম বিশ্বাস" বিশ্বাসের প্রতিকূলে এইরূপ সব উপেক্ষাবাণী সমূহের প্রচার রত। শাস্ত্র ও জ্যোতিষের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব এখন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের সাহায্যে শাস্ত্র এখন অনেক মার্জ্জিত তত্ত্বের অধিকারী হইতেছেন। অনন্তের ধারণা একটা উদা-হরণ।

আমাদের এই পৃথিবীটি কিরূপ বিশাল! কত কোটি কোটি জীব ইহার অঙ্কে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের এই সৌরজগতের সূর্য্যটি, এই পৃথিবী অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণ বৃহত্তর। আবার, এই সূর্য্য অপেক্ষাও বহুগুণে বৃহত্তর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র বা সূর্য্যে আকাশের ছায়াপথ পূর্ণ। পৃথিবী তাঁহার বার্ষিক গতিতে সূর্য্যের চারিদিকে কত না বিস্তীর্ণ পথ প্রতি বর্ষে অতিক্রম করিতেছেন; নেপচুন গ্রহের ভ্রমণপথ এতদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বৃহত্তর। আজ কাল প্রায় সকল জ্যোতিষীই স্বীকার করেন, সূর্য্য তাঁহার অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় বার চৌদ্দ মাইল হিসাবে প্রচণ্ডবেগে শূন্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সূর্য্যের গন্তব্য পথটি যে কি সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণ এখনও কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন না কিন্তু অনুমান সাহায্যে ইহাও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় করিয়া লইতে পারি।

এই শ্রেণীর অনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম extrapolation. নিয়মগুলা নিত্য ও বিশ্বব্যাপী এবং স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বত্র প্রসারিত এইরূপ একটা ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ধারণা বা স্বতঃ সিদ্ধি সাহায্যে, প্রত্যক্ষের অনুরূপে অনেক অপ্রত্যক্ষ সত্য

আমরা নির্ণয় করিয়া থাকি। উপমা অনুমানকে এই ভাবে প্রমাণরূপে গ্রহণ করার নাম extrapolation. আমরা দেখিতে পাই, উল্কা ধূমকেতু প্রভৃতি কতকগুলি ব্যতীত অন্তরীক্ষচর যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহাদি, আবর্ত্ত গতিতে বৃত্তাভাস পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা হইতে প্রাগুক্ত extrapolation বা অনুমান বলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি, আমাদের এই সৌর জগতের সূর্য্যও তাঁহার অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে লইয়া অতি বেগে, অনন্ত তুল্য এক অতি বিস্তীর্ণ পথে, অপর কোন বৃহত্তর সূর্য্য বা নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন।

উপমা অনুমানাদি ব্যতীত আরও এক সূক্ষ্মতর ভাবে বহু সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হয়। এক সূক্ষ্ম চৈতন্য শক্তি বা জ্ঞান শক্তিতে এই বিশ্ব যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উপযুক্ত ঘাহে যেমন তারহীন তাড়িতবার্ত্তা সমূহ ধরা পড়িয়া যায়, আমাদের হৃদয়েও অনেক সত্যের আভাস সেই ভাবে যেন প্রতিফলিত হয়। স্বচ্ছ দর্পণে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব উঠার মত, অনেক সত্য স্থূল আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে হৃদয় আকাশে সূক্ষ্মাকারে যেন তাহাদের একটা ছায়া উঠে। রেডিয়ম্ আবিষ্কারের প্রায় যাদশ বর্ষ পূর্ব্বে (শ্রীযুক্ত সিনেট্ মহোদয় কর্ত্তৃক) এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলি পূর্ব্বোক্ত ভাবে সত্যোপলব্ধির উদাহরণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। সুখের বিষয় ঐ সব তত্ত্ব মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে পূর্ব্বেই জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল সুতরাং সে সব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ বা বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কতকটা এইরূপ ভাবের সত্যোপলব্ধির ধরণে, অনেকেই আজ কাল মনে করেন, "আমাদের এই সূর্য্য ও সৌর জগৎ, sirius সিরিয়াস্ নামক নক্ষত্রটির চারিদিকে প্রদক্ষিণ রত।

এই সিরিয়াস্ নক্ষত্রটির দূরতা প্রভৃতি ভাবিতে বসিলে, "অনন্ত" যে কি ব্যাপার একটু আধটু আভাস পাওয়া যায় এবং তাহাতেই আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; আলোক রেখা এক বর্ষে কতটা পথ অতিক্রমে সমর্থ ইহা হইতে গণিতের সাহায্যে নির্ণয় কর; সিরিয়সের দূরতা এইরূপ ৮·৮ বা প্রায় নয়টি আলোক বর্ষ। কতকগুলি সংখ্যার পার্শ্বে কতকগুলি শূন্য বসাইয়া আর ফল কি? মানব মন এ দূরতার ধারণায় অক্ষম।

সিরিয়াসের দূরতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া জ্যোতির্বিগণ বিবেচনা করেন, সিরিয়স্ নক্ষত্রটির আকার ও কিরণজাল আমাদের এই সূর্য্য অপেক্ষা তিন শত হইতে প্রায় সহস্র গুণ অধিক। আমাদের এই একটি মাত্র সৌর জগৎ নহে, এমন একাধিক সৌর জগৎ হয় ত এই সিরিয়াস্ নক্ষত্রটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। পৃথিবীর তুলনায় অতি প্রকাণ্ড আমাদের এই সূর্য্যটি, সিরিয়াস্ নাক্ষত্রিক জগতে ক্ষুদ্র এক গ্রহস্থলীয় মাত্র।

এই বিরাট বিশ্বে, ক্ষুদ্র এই বসুন্ধরাই কি চৈতন্যের একমাত্র আবাস ও বিকাশ ক্ষেত্র? গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও অনেক অনেক পণ্ডিতের অবধি এইরূপ ধারণা ছিল। এখন অল্পে অল্পে এই ভাবটি পরিত্যক্ত হইতেছে। মঙ্গল গ্রহের অবস্থা বহুপরিমাণে পৃথিবীর অনুরূপ বলিয়া, মঙ্গল গ্রহে আমাদের ন্যায় জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই আজকাল

বিবাসবান্। আবার পৃথিবীর ন্যায় অবয়ব এবং মানবের ন্যায় জীবন না হইলে চৈতন্যের অধিষ্ঠান বা বিকাশ অসম্ভব, আজকাল অনেকেই আর এরূপ মনে করেন না। তৎসৎ ব্রহ্ম যে একমাত্র মানবেরই অনুরূপ ভাব বিশিষ্ট এ ধারণা অল্পে অল্পে পরিত্যক্ত হইতেছে, আত্মা সম্বন্ধে মানবের ধারণা এইরূপ ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করিতেছে।

আমাদের এই সৌর জগৎ সিরিয়াস্ নক্ষত্রটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে বলিয়া যেমন অনুমান করা যায়, তদ্রূপ ঐ সিরিয়াস্ নাক্ষত্রিক জগৎ আবার কোন বৃহত্তর নক্ষত্রকে বেষ্টন করিয়া সম্ভবতঃ ঘুরিতেছে। সিরিয়াস্ নক্ষত্রটির দূরতা প্রায় নয় আলোক বর্ষরূপে নিরূপিত হইয়াছে; আকাশের গায় আর্কটরস্ (arctarus) নামক আর একটি নক্ষত্রের দূরতা প্রায় ১৪০ আলোকবর্ষ অথচ ঔজ্জ্বল্যে ইহা সিরিয়সের সহিত প্রায় তুল্য মূল্য! ইহা হইতে এই আর্কটরস্ নক্ষত্রটির আকার ও কিরণের পরিমাণ কতকটা অনুধেয়। আকাশের অনন্তদেহে এইরূপ আরও কত নক্ষত্র বিরাজিত নিরূপণে কাহারও শক্তি নাই।

মহৎ ছেড়ে একবার অণুরদিকে মন দাও। অণুতে অন্তর্লীলা বুঝিতে চাহ কি? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, চারি ইঞ্চ মাত্র ব্যাস বিশিষ্ট কোন শূন্যগর্ভ কাচ গোলককে যদি ক্ষণতরে সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ করিয়া উহার মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে দশকোটি হিসাবে বায়ুর অণু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র গোলকটি বায়ব অণুতে পূর্ণ হইতে পঞ্চাশ হাজার বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যাইবে। বুঝিয়া দেখ কত ক্ষুদ্র স্থানে কত অধিক অণুর সমাবেশ। জ্যোতির্কিদের বিশ্বব্যাপী স্রষ্টা বা সৃষ্টি শক্তি এইরূপ অনন্ত এবং অণোরণীয়ান্ ও মহতো মহীয়ান্।

এই স্রষ্টা বা সৃষ্টি শক্তিটির বৈচিত্র্য লীলাও অনন্ত। জীব ও জড় প্রত্যেকের মধ্যেই কত না বৈচিত্র্য। মূলতঃ এক সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি শক্তির অংশীভূত হইলেও, সুতরাং বিভিন্ন জড়জীব প্রকৃতির ন্যায় বিভিন্ন দেবতা বা প্রধান প্রধান সৃষ্টি শক্তির অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও বহুধা বিভিন্ন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

সৃষ্টির বিকাশ পদ্ধতিটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, উহা নানা পর্য্যায়ে বিভাজ্য। জড় জগতের সৃষ্টি পুষ্টি লয় আর জীবের ক্রমোন্নতির বা ক্রম পরিণতি ঠিক একভাবের বিকাশ নহে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহার্য্য সংস্থান জন্য জীবন সংগ্রামে জড়কে যোগ দিতে হয় না, জড় অচিন্তা মুক্ত)। জীবের ভিতর আবার মানুষের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে, আরও একটু বিভিন্ন ভাবে চৈতন্যের ক্রম বিকাশ লক্ষিত হয়। (ইতর জীবের বুদ্ধি কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি কতকটা যেন জড় জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুরূপ, মৌমাছির চাক, বাবুয়ের বাসা চিরকালে একই ভাবে নির্ম্মিত—উহাদের সহিত মানুষের আবাস গৃহ সমূহের বৈচিত্র্য তুলনা কর; অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে ইতর জীব অপেক্ষা মানুষের সামর্থ্য অধিক; মানুষের ক্রমোন্নতি যে ভাবে শিক্ষা সাপেক্ষ ইতর জীবে তাহা দৃষ্ট হয় না—কচ্ছপের ছানাকে ডিম হইতে বাহির হইয়া সাঁতার শিখিবার জন্য স্কুলে যাইতে হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হইতে, ইতর জীব ও মানুষের মধ্যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতির বিভিন্ন ধারা

বুঝিতে পারা যায়)। মানুষের মধ্যে আবার সভ্য ও অসভ্য সমাজে শিক্ষার দান ও গ্রহণ শক্তিটি সমভাবে বিকশিত নহে। এই সমস্ত বিভিন্ন বিকাশের মূল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি শক্তি, স্রষ্টা বা দেবতার পরিকল্পনাদত্ত দোষ নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা সবাই অভিন্ন একই স্রষ্টার বহুধা বিকাশ মাত্র। কিন্তু ভাবের খেলাতে একত্বের পরিবর্তে বহুত্বটাই বড় করিয়া দেখিয়া জড় ও চৈতন্যকে পৃথক্ বিবেচনা করিলেও ক্ষতি নাই। সূর্য্য প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র ভাবিলেও, চেতন দেবতা, যুক্ত পুরুষ প্রভৃতি নানা উপাদেয়ের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত বা অসম্ভব বিবেচিত হইবে না। স্রষ্টার বা সৃষ্টি শক্তির একাংশ জড় ও অপরাংশ চৈতন্যময় ভাবিলেও উভয়ের বিকাশই অন্তহীন এই সমস্ত অনন্ত বিবিধ বিকাশ, ভাবের খেলায় কখন পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র কখন বা অভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয়। একভাবে দেখিলে স্রষ্টা ও সৃষ্টি স্বতন্ত্র, সৃষ্টির মধ্যে আবার জড় ও চেতনরূপ দুটা প্রধান পার্থক্য, এবং এই দুই প্রধান পার্থক্যের প্রত্যেকটির ভিতর আবার অনন্ত পার্থক্য স্বীকৃত হয়। আর একভাবে দেখিলে উহার বিপরীত প্রক্রিয়ার চিন্তার গতি হইয়া একত্বটাই সত্যরূপে উপলব্ধ হয়, সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকের ব্রহ্ম এইরূপ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবান্বিত।

পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই নানাভাবে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, মানবাকারে বিকশিত চৈতন্যটিই অন্তরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিকাশবাদ সহ পরিচয় ফলে, ধীরে ধীরে সেই পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ফলে মানব ধীরে ধীরে অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় উপনীত হয়। চৈতন্যের এই ক্রমবিকাশরূপী অনন্তত্ব আর পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাসীর মানবাত্মার অনন্তত্ব উভয় ধারণার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অনন্ত এই বিশ্বের অনন্ত এই সৃষ্টি রহস্য পর্য্যালোচনা ফলে, জ্যোতির্ব্বিদের মানব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ধারণা, সাধারণ মানবের এতৎসম্বন্ধীয় ধারণা হইতে এইরূপ বহু বিষয়ে পৃথক্। বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাস ও শাস্ত্রার্থের অবধারণ ধীরে ধীরে মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

আমাদের মন্তব্য।—বঙ্গীয় পাঠক মূলকে শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধের একটু পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ উহা অবলম্বনেই, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। উহাকে বেদ বাক্যরূপে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থাপিত করা, বা সর্ব্বাংশে উহার সমর্থন আমাদের অভিপ্রেত নহে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্ত বা আলোচনা, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। যাহা হউক জ্যোতিষচর্চ্চাফলে মানব ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ধারণার একটি আভাস, সিনেট মহোদয়ের এই প্রবন্ধে আমরা প্রাপ্ত হই এবং উহাতে ভাবিবার মত যে অনেক বিষয় আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিশ্বাসী বলিতে সিনেট্ মহোদয় প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তদ্বিশ্বাসী সম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণাম বিষয়ক তাঁহার উক্তি গুলি অন্যান্য দেশের শাস্ত্র বিশ্বাসী সম্বন্ধেও বহুপরিমাণে যথার্থ।

সিনেট্ মহোদয়, ইউরোপে শাস্ত্রবিশ্বাসী ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রবল বৈরিতার ইতিহাসের কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন। আমাদের এদেশে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান বা দর্শনের মধ্যে বিরোধের পরিবর্ত্তে একটা সন্ধিস্থাপনের চেষ্টাই যেন বরাবর লক্ষিত হয়। এদেশের দার্শনিক, স্বীয় মতানুযায়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং তদনুযায়ী সম্প্রদায় সমূহের উদ্ভব হয়; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতান্তর দৃষ্ট হয় কিন্তু শাস্ত্রের উপর সকল মতেরই ভিত্তি; শাস্ত্রকে স্বপক্ষে আনিতে যাঁহারা চাহেন না বা পারেন না, এদেশে সেই সব মতের প্রায়ই প্রতিষ্ঠা হয় না। য়ুরোপে যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যাতার পদ গ্রহণে প্রায়ই চেষ্টা পান না; ও দেশে আপ্তবাক্যে ও বিজ্ঞানে তাই এমন ঘন ঘন বিরোধ উপস্থিত হয়, আর আমাদের দেশে শাস্ত্র ও বেদ প্রায়ই উন্নতির পরিপন্থী রূপে বিবেচিত হয় না। শাস্ত্রব্যবসায়িগণ বিজ্ঞান দর্শনাদির চর্চ্চা না করিলে, অথবা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকবর্গ শাস্ত্র চর্চ্চা ছাড়িয়া দিলে, ঐ ভাবের ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে বিরোধ বাধে ও সেযে একটা রফানিষ্পত্তি বা সন্ধিস্থাপনের প্রয়োজন হয়।

নাস্তিকতাটা উপাসনারই প্রকার ভেদ মাত্র, বৈরিভাবে উপাসনা ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা, ইত্যাকার মতবাদের সহিত এতদ্দেশবাসিগণ বহুদিন হইতে পরিচিত এবং এ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণও বহুদিন হইতে এদেশে প্রচারিত। সিনেট্ মহোদয়ের সম্বর্দ্ধে, শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যে সন্ধি বিগ্রহের ইঙ্গিতে এই বৈরিভাবে উপাসনার অর্থ সুন্দর ও বিশদ ভাবে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। শাস্ত্র বিশ্বাসীকুল যেন মিত্রভাবের উপাসক এবং সহাপিপাসু বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক দার্শনিকের দল যেন উদাসীন ও বৈরিভাবের উপাসক সম্প্রদায়। উপাসনার এই ত্রিমূর্ত্তিটি অনুধাবনের যোগ্য বটে। শেষোক্ত দুই উপাসক সম্প্রদায়কে আর রাবণ কংসাদির ন্যায় পুরাণের অতীত কাহিনীমাত্ররূপে ভাবিবার আবশ্যক হয় না।

সিনেট্ মহোদয়ের প্রবন্ধে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের উপর প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী জ্ঞান করিতে এদেশের লোক চিরাভ্যস্ত এবং ঐ তত্ত্বেরই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ জন্য এদেশেরই একজন মনীষী (শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু) বর্ত্তমানে তপস্যা নিরত।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদ সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত সিনেট্ মহোদয়ের ধারণা এইরূপ এদেশবাসী অনেকের পক্ষে নূতন মনে হইবে না—উহা বেদান্তেরই শাখা বিশেষের মতবাদ মাত্র।

ধর্ম্মকে বিভিন্নরূপে দর্শন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মতের উদ্ভব, মনে হয় যেন অনিবার্য্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে একই কথার বিভিন্নরূপ অর্থোপলব্ধি হয়। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থাবধারণ চেষ্টা এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "তৎ ত্বম্ অসি" তুমিই সেই এবং "তত্ত্বম্ অসি" তুমি তাঁহার এই দুই ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীরূপে দুই মহাসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সিনেট্ মহোদয় প্রোক্ত আত্মার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও এইরূপ নানা ধারণা দৃষ্ট হয়। কেহ মনে করেন দেহান্ত ঘটিলে জীবাত্মা কোন এক অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম লোকে চিরাবস্থিত রহিয়া ক্রমবিকাশ বা পরিণতি প্রাপ্ত হন; কাহারও বিবেচনায়

অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম লোক নাই, এই বাদেই নূতন স্থূল দেহে জন্মান্তর লাভ হয়; কাহারও মতে, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় লোকেই কিছুকাল করিয়া অবস্থিতি ও ক্রমবিকাশ ঘটে। অপর কাহারও বা ধারণায়, দেহান্তে দেহী সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া যান, তাঁহার ব্যক্তিত্বে লোপ পায়; এবং নূতন নূতন জড়জীবের উদ্ভব হইয়া সৃষ্টির ক্রমবিকাশ লীলাটি মোটের উপর অব্যাহত থাকে। ইঁহাদের প্রত্যেক দলই আপন আপন মত স্থাপন জন্য নানাবিধ যুক্তি তর্কের শরণ লয়েন। ইহাদের মধ্যে এই শেষোক্ত মতটি কিয়ৎ পরিমাণে নাস্তিকতার প্রবর্ত্তক ও কাহারও কাহারও নিকট আপাত-প্রতীয়মান সত্যরূপে অনুভূত হইতে পারে বলিয়া এতৎ সম্বন্ধে শুধু আমরা বলিতে চাহি, যে সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত হইলে ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন না ঘটিয়াও উহা হইতে পারে। এখনই কি আমরা সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত নহি? আমরা কি সৃষ্টি ক্রীড়ার বহির্ভূত। অহং অভিমানটি ত্যাগ করিতে যিনি যে পরিমাণে সমর্থ, জীবিতই হউন বা মৃতই হউন তাঁহার ব্যক্তিত্ব সেই পরিমাণে বিলুপ্ত, সেই পরিমাণে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত, সেই পরিমাণে তিনি মোক্ষাভিমুখে অগ্রসর। আমরা সবাই সতত সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত রহিলেও ব্যক্তিত্ব বোধ বিবর্জ্জিত নহি, আমাদের মধ্যে কয়জনই বা প্রকৃত মোক্ষাভিলাষী, এবং মরণের পরই উহা সহসা উহা ঘটিয়া যায় মনে করারও কারণ নাই। যাহা হউক আমরা দেখিলাম, একই ক্রমবিকাশবাদ পাত্রভেদে নানা ভাবে গৃহীত হয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদ খ্যাপনেই বা গোল মিটে কৈ? নাস্তিকও এক হিসাবে অভেদ-বাদী কারণ নাস্তিক সৃষ্টির অতিরিক্ত স্রষ্টা স্বীকারে অসম্মত; তাঁহার দৃষ্টিতে স্রষ্টাই সৃষ্টি, সুতরাং এই হিসাবে তিনি অভেদ-বাদী। প্রভেদ এই, নাস্তিকের সৃষ্টিটা চেতনা-বিহীন জড় পদার্থ মাত্র, নাস্তিকের দৃষ্টিতে চৈতন্য ক্ষণ-ভঙ্গুর। আস্তিক ওরূপ মনে করেন না। আস্তিক সৃষ্টির বাহিরে বা সৃষ্টি-সহ মিলিত ভাবে, অস্তিত্বে বিশ্বাসী। একদল আস্তিকের মতে, স্রষ্টা ও চৈতন্যের চির সৃষ্টি মূলতঃ অভিন্ন; আর একদল আস্তিকের বিবেচনায় উহারা চির স্বতন্ত্র এমন কি সৃষ্ট জীব চৈতন্য আমি।

আস্তিকের অভেদবাদও একবিধ নহে। একদলের মতে, সৃষ্টিটা যেন দেহ এবং স্রষ্টা তাহার মধ্যে দেহীর ন্যায় বিরাজিত। কেহ বা এই প্রকৃতিকে সত্তণা ও চৈতন্যময়ী রূপে জ্ঞান করেন এবং জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কেহ বা এই সত্তণার আধাররূপী নির্গুণ সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পান। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার "পত্রাবলীতে" এই অভেদবাদের আর একটি নূতন ব্যাখ্যাসহ আমাদিগকে পরিচিত করেন। রক্তের পরিণতিই এই মাংস অস্থি প্রভৃতি হইলেও, এই হিসাবে মাংস অস্থি প্রভৃতি রক্তের সহিত অভিন্ন হইলেও, শোণিতেরএকটা মুখ্য সত্তা ও অধিষ্ঠান স্থল আছে, রাজা হইতে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী অবধি একই রাজশক্তির বিবিধ বিকাশ মাত্র, তথাপি রাজার স্বতন্ত্র ও প্রধান অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এইভাবে মূলতঃ অভিন্ন হইলেও উহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, অন্ততঃ ব্যবহারিক জগতে উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধাদি বিলুপ্ত হয় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত আবহমান কাল হইতেই পরিদৃষ্ট। সিনেট মহোদয়ের স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আলোচনারও সম্ভবতঃ ঐরূপ পরিণাম ঘটিবে।

অনুমান উপমাদি সাহায্যে সত্য নির্ণয় এবং নির্ম্মল হৃদয় দর্পণে সত্যের প্রকাশ এদেশেরই পুরাতন মত। সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধ হইতে বুঝা গেল, নব্য যুগেও ঐ সনাতন মত অনাদৃত নহে।

সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধে জ্যোতিষের সাহায্যে অনন্তের ধারণাটি সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভের এই অংশটুকু সকলেরই উপভোগ্য হইবে আশা করা যায়

ফলতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্ম বিশ্বাস যেমন মার্জ্জিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ ধারণা সহ পরিচয় বুদ্ধি বলেও মার্জ্জিত ধর্ম্মমত গঠনে সাহায্য হয়। প্রধানতঃ এই আশাতেই আমরা এই নানাভাবের দ্যোতক, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম বঙ্গীয় পাঠক কুলের গোচরে আনিতে চেষ্টা পাইলাম।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় মুসলমানসম্রাট্‌গণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

বাবর

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, বাবর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ তৈমুরলঙ্গের চরিত্রের কয়েকটী কঠোর গুণ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন ছিলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিত এরস্কিন্ (Erskine) এই সুলতান সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন তাহা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই যথা—

"মোটের উপর যদি আমরা পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়া এশিয়ার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব কয়েকজন মাত্র যুবরাজ বাবর অপেক্ষা প্রতিভা ও গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। হয়ত বাবরের পৌত্র, আকবরই গভীর ও উদার নীতির জন্য তাঁহার উচ্চে স্থান পাইতে পারেন, কিন্তু কূটীল কৌশলী আরঙ্গজেব আকবরের সমশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন না। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের চরিত্রগত গুণ তাঁহাদের বিজয় কাহিনীর সঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে এবং উহা বাবরের চরিত্রকে অনেক বেশী অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের কার্য্যকারিণী শক্তি, উৎফুল্ল উদার প্রীতি এবং মনুষ্যোচিত ও সামাজিক গুণ সম্বন্ধে আমরা সম্ভবতঃ দেখিতে পাইব, এশিয়ার রাজগণের মধ্যে বাবর অপেক্ষা কেহই উচ্চাসন প্রাপ্ত হন নাই।"[১]

বাবরের চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যানুরাগও সংযুক্ত হইতে পারে। তিনি আরবী পারসী ও হিন্দী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বিচক্ষণ সমালোচক ছিলেন।[২] বাবর

1. Erskine's *Memoirs of Babar*. p. 432.
2. *Tuzkia Babari* Elliot iv, p. 219.

জ্ঞান-লাভের প্রথমাবস্থা হইতেই কবিতার বিশেষত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং সংগৃহীত তুরকী কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ঐ সকল কবিতা তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবুল ফজল বাবরের পারসী গ্রন্থ 'মাসুবাণী' রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন উহা সুপ্রচারিত ছিল। বাবর ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং আরও ছোট ছোট কতকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম জীবন স্মৃতিতেও লিখিত আছে উহা তুর্কী ভাষায় রচিত হয়।[২] তিনি খোজা আব্দুল অবারের গ্রন্থকেও কবিতায় পরিবর্ত্তিত করেন। বাবর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই কৃতী ছিলেন এবং সঙ্গীতাভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত বিষয় সম্বন্ধে উচ্চ ধরণের একখানি ভাষ্য[৩] লিখিয়াছিলেন। 'তারিখি রাশিদি' গ্রন্থের কর্ত্তা মির্জ্জা মহম্মদ হাইদার লিখিয়াছেন—

"তুর্কী কবিতা রচনায় তিনি আমীর আলি সার পরবর্ত্তী কবি ছিলেন।—তিনি মুবাইয়ান নামক ছন্দঃ প্রণালীর উদ্ভাবক। নিত্য প্রয়োজনীয় আইন বিজ্ঞানের ভাষাও তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। তুর্কী ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধেও তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ভাষ্য ছিল। উক্ত ভাষ্য অন্যান্য লোকদিগের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যবিধায়ক হওয়াতে বিলাসা—ই-ওয়ালিডিয়া নামে কবিতায় লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহার নামের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে।"[৪]

আমরা তারিখি মুজাফ্ফরী হইতে আরও জানিতে পারি যে, উবইদুল্লা অবারের মাতা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থের ভাষাকে বাবর কবিতায় পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহার নাম রাখেন মুফঃস্বল।[৫] ১৫০৪ খৃঃঅব্দে তিনি নূতন এক প্রকার হস্তাক্ষর প্রচলন করেন উহা 'বাবরী, হস্ত,[৬] বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। তিনি উক্ত হস্তাক্ষরে কোরআনের একখানি নকল করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন।

বাবরের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে মাননীয় লেনপুল বলেন—

পাঁচবৎসর বয়সে শিশুকে (বাবর) সমরখন্দে লইয়া যাওয়া হয়। পরবর্ত্তী ছয় বৎসর শিক্ষা ও সৎসঙ্গে কাটিয়াছে কারণ সেই সময় নিজের পারিবারিক উন্নতি বিধানের অবসর খুব কমই ছিল এবং দুইটী ভাষাতে যে প্রশংসনীয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, দ্রুত ধারণা শক্তিই উহার একমাত্র কারণ। আমরা তাঁহার শৈশবের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানি না তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে ধারণা হয় যে, শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় পরিবারের মহিলাদিগের নিকটেই কাটিয়াছিল।"[৭]

---

1. *Babar's Memoirs* was translated into Persian by *Khan Khanan* at the instance of Akbar ; *vide* Miratul Alam M.S. in the Bob. coll, leaf 179.

2. Erskine's *Memoirs of Babar* P. 431 ; also *Ferisha* vol. ii, pp. 61 and 65.

3. Erskines *Memoirs of Babar* p. 431. Also Ferishta vol. ii. pp. 61 and 65.

4. Translation by E. D. Ross and N. Elias, pp. 173, 174, see also *Muntakhabul Tawarikh*, vol. i, (Ranking) p. 449.

5. *Tarikhi Muzaffari* By Mahamad

6. Talbot's *Memoirs of Babar*, p. 97.

7. *Muntakhabul Tawarikh*, vol i. (Ranking) p. 449.

বাবর আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গ ভাল বাসিতেন এবং সেই সময় সদ্য রচিত কবিতা এবং তুর্কী ও পারসী ভাষা হইতে নানা বিষয়ের আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। প্রায়ই তাঁহার বন্ধুগণ কোন প্রকারে বিষাদিত হইলে, তিনি তাঁহার হৃদয় আমোদ আহ্লাদে পূর্ণ করিয়া নিশ্চল অশ্ববাহনের মত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। যাহা হউক তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বর্ণিত আছে যে, একখানি নৌকার উপরে সাহিত্যিকদিগের সম্মিলনীর মধ্যে বাবর এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ পরস্পরকে কবিতা রচনা করিয়া আমোদিত করিতে ছিলেন। ১

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যে কয়জন বাবরের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নানা প্রকারে উৎসাহ ও পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম বিখ্যাত মীরখুন্দের পুত্র হবিবুল সিয়রের রচয়িতা খুন্দামীর, স্বার্থবোধক শব্দ ও ভাব রচয়িতা মৌলানা সাহাবুদ্দিন, এবং হিরাটের মির্জ্জা ইব্রাহিম। তাঁহারা সুলতানের দরবারে বাস করিবার জন্য সুলতান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। খুন্দামীর অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া হিরাট ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইয়া আগ্রাতে সম্রাটের সহিত পরিচিত হন। সম্রাট বাবরের বঙ্গযাত্রা উপলক্ষে তিনি সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর খুন্দামীর হুমায়ুন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং হুমায়ুনের নামে কোশেহুনি-হুমায়ুন রচনা করেন। উহা আবুল ফজল আকবরনামাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে গুজরাট যাত্রা করেন এবং সেই খানেই (১৫৩৪-৩৬ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহকে, নিজামুদ্দিন অলিয়া, এবং আমীর খুসরুর সমাধির পাশে সমাহিত করা হইয়াছে।২

গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার প্রাথমিক জীবনে তিনি পারস্য-সুলতান হোসেনের বিদ্বান মন্ত্রীর যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুলতান তাৎকালিক সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একটা দামী লাইব্রেরী তৈয়ারী করেন এবং উক্ত মন্ত্রীকে উহার তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করেন।৩

যাহা হউক বাবরের জীবনস্মৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতির কথা থাকিলেও ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে, যখনই আমরা উহাতে দেখিতে পাই যে হিন্দুস্থানে কোন কলেজ ছিল না লিখিত আছে তখনই ইহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। উহাতে আরও লিখিত আছে—"হিন্দুস্থানবাসিগণের ভাল ঘোড়া নাই, এখানে ভাল মাংস পাওয়া যায় না, আঙ্গুর অথবা সুমিষ্ট তরমুজাদি নাই, কোন প্রকার ভাল ফল নাই, বরফ অথবা সুপেয় জল নাই, হিন্দুস্থানের বাজারে কোন প্রকার ভাল খাদ্য অথবা রুটি পাওয়া যায় না। কোন একটী স্নানাগার অথবা কলেজ নাই, মোমবাতি নাই মশাল নাই—নাই একটী আলোক

1. Erskine's Memoirs of Babar, p. 291.
2. Elliot iv, pp. 141, 143.
3. *Ibid.*

খানি কথাটার মূল্য কিরূপ সহজেই বুঝা যায়।১

ভারতবর্ষে আলোচিত হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক গণনা এবং তাৎকালিক সময়বন্ধের পর্য্যবেক্ষণাগার ও মুসলমানদিগের উদ্ভাবিত গণনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"এই পর্য্যবেক্ষণাগার হইতে উলুগ বেগ মির্জ্জা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তালিকা প্রস্তুত করেন; সেই তালিকাই বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহৃত হইতেছে কদাচিৎ অন্য গুলিও ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল তালিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হলাকুর রাজত্বকালে মরাগা বেক্ষনাগার হইতে খাজা নসীরের নির্ম্মিত ইল্‌খানি তালিকাই (সূত্র) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। হলাকুখাঁ ইলখানিতে রাজত্ব করিতেন। সারা জগতের মধ্যে সাতটি কি আটটির বেশী পর্য্যবেক্ষণাগার ছিল না। এই সকল বেক্ষণ গৃহের মধ্যে একটি খালিপ মামুন কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়, এবং ঐ বেক্ষণাগার হইতে যে সকল তালিকা (সূত্র) বাহির হইত উহা পণ্ডিত মহলে 'জিক মামুনি' বলিয়া পরিচিত ছিল। একটী বাটলিয়াস (টলেমি) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং অন্যতম একটী হিন্দুস্থানের রাজা বিক্রমজিতের সময়ে মালব রাজ্যে উজ্জয়িনী এবং বাবের কোন হিন্দু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। উক্ত রাজ্য এখন মাণ্ডুদের রাজধানী বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে যে তালিকা (সূত্র) আবিষ্কৃত হয় হিন্দুগণ আজও তাহা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক তাহাদের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি অন্য সকলেরই অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। হিন্দুদের বেক্ষণাগারের অট্টালিকাটী আকবরের রাজত্বের ৯ম বৎসরে স্থাপিত।" ২

গাজিখাঁ পাঞ্জাবের একজন আফগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সম্রাট ইব্রাহিমের নিকট হইতে আফগানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বাবরকে আহ্বান করেন। তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত বাবর তাঁহাকে বন্দী করিয়া কিছুকাল পর মুক্তি দিলেন। গাজিখাঁর মূল্যবান গ্রন্থাদি শোভিত বড় পাঠাগার ছিল, বাবর ১৫২৪ অব্দে পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি গ্রন্থ হুমায়ুন ও কামরানের ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। লাইব্রেরীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ ছিল, ঐগুলি শুধু সুলতানের ধর্ম্মে মতি রাখিবার জন্যই পাঠাগারে ছিল। যাহা হউক বাবর পুস্তক কয়খানি গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে—"মোটের উপর এই বইগুলির চেহারা দেখিয়া বইটা মূল্যবান মনে করিয়াছিলাম কাজে তাহার পরিচয় পাইলাম না।" ৩

একখানি গ্রন্থকে ছবি দ্বারা অধিকতর সরল এবং চিত্তাকর্ষক করিবার অভ্যাসটি মুসলমানভারতে বাবরের আমল হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবন স্মৃতিতে যে সকল প্রাণীর বিষয় বর্ণিত আছে তাহাদিগের মূর্ত্তি আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি

1. *Babar's Memoirs*, p. 333 (or Tablot's *Memoirs of Babar*, p. 190).

(2) Erskine's *Memoirs of Babar* pp. 50, 51. The task of farming the tables was given by Ulugh Beg Mirza first to Qaisadah Rumiaudon his death to Maulana Ghiyasuddin Jamshid and then to Ibn Ali Mahammad Kusliji.

(3) Talbot's *Memoris of Babar* p. 176 also *Taskiratul-Salatin* MS in the Book call, leaf 104.

পাইয়াছে কিন্তু জাহাঙ্গীর এই সকল ছবির দোষ বাহির করিয়া বলেন, খুব শীঘ্রই বস্তুতঃ চিত্রকরগণ জীবনাদর্শ হইতে ছবিগুলি আঁকে নাই। তিনি তাঁহার নিজ জাহাঙ্গীর নামাতে এই অভাব দূর করিয়াছেন। ১

বাবর চিত্রবিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পাঠাগার হইতে যে সকল ছবি পাইয়াছিলেন প্রত্যেক খানিরই এক এক খানি নকল ভারতবর্ষে আনিয়া ছিলেন। বাবর সাহার দীক্ষিতের পর তৈমুর বংশীয়দের কেহ কেহ পারস্যে ঐ গুলি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই সকল চিত্র ভারতীয় চিত্র শিল্পের উপর যথেষ্ট প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। ২ বাবরের অমাত্য হৈদর মুখবীরআলি প্রণীত তাওয়ারিখ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ের সাধারণ কর্ম্ম বিভাগের (মুরাটি আম) কার্য্য মোগলসম্রাটগণের বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের মধ্যে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সংবাদ পত্র প্রচলন এবং স্কুল কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অন্যতম কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত। শিক্ষা বিভাগের কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টির মধ্যে ছিল এবং উহার কার্য্য পরিদর্শন সরকারী কাজের তালিকাভুক্ত ছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বাবরের সময়ের পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে—সেখজৈনখানি তিনি ওয়াকি-আতি-বাবরির অনুবাদ করেন, মৌলানা নাসারুদ্দিন হেয়ালিক এবং মীর জামালুদ্দিন পুরাণ বর্ণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ৩

হুমায়ুন

হুমায়ুন তাঁহার পিতার প্রবাহ কাহিনী গুলিকে অনুধাবন করিয়া চলিলেন। নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত কর্ত্তব্য ও পাঠাভ্যাসে সময়াতিবাহিত করিতেন। তিনি জ্যোতিষ এবং খগোল বিদ্যার আলোচনা করিতেই ভালবাসিতেন এবং পঞ্চভূতের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। তাঁহার নিজের উক্ত বিষয়দ্বয়ের আলোচনার জন্য পার্থিব ও স্বর্গীয় গোলক ৪ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত কবি এবং দার্শনিকবিগণের সংসর্গ ভাল বাসিতেন; তাঁহাদের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেন। তিনি কাব্য প্রিয় ছিলেন। এবং নিজেও সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

সুলতানের বয়স যখন ৪ বৎসর ৪ মাস এবং ৪ দিন তখন তাঁহার প্রথম শিক্ষারম্ভের জন্য উৎসব করা হইয়াছিল।

---

(১) *Waquati-Jahangiri* Elliot, VI. p. 331.

(২) Martin's *Miniature painting and painters of India, Persia and Turkey* Vol. i. p. 79.

(3) *Muntakhabul-Tawarikh* vol. i (Ranking) p. 449.

Farishta vol. ii, pp. 70, 71; *Ta-zkki-Akbari*, MS. in ASB, leaf 19; *Tarikhi-Salatani-Afaghana*, MS. in ASB, by Ahmad Yadgar, leaf 208; Abul Fazl, in his *Akbar Namah*, vol. i. p. 287 (Beveridge), says: "His noble nature was marked by the combination of the energy of Alexander and the learning of Aristotle."

শিশু সুলতানকে বসাইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হাতে তাঁহার ভার দেওয়া হইয়াছিল। ১ সাজাহান নামাতে ইহা মকতব উৎসব ২ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মাননীয় এল, এফ, স্মিথ (L. F. Smith) ১৮০১ অব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুসলমান সমাজে এই বিদ্যারম্ভ উৎসব দেখিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল—"শিশু যখন ৪ বৎসর, ৪ মাস ও ৪ দিনের হয় সেই দিন তাহার জন্য মৌলা নির্দ্দিষ্ট একখানি স্লেটে "বুয়াহি ইকরা" নামে কোরআনের এক অধ্যায় লিখিয়া দেওয়া হয় এবং বালক উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। অবশ্য এসময়ে একজন শিক্ষক সামনে রাখা হয়।" ৩

এই সুলতান তাঁহার দরবারে হাতা বসিয়া প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে শ্রেণী বিভক্ত করেন, উপযুক্ততানুসারে পদোন্নতির সুত্রপাত করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর অভ্যর্থনার ও (বসিবার) জন্য কতকগুলি বড় বড় ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাহাদিগকে দিন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় সাহিত্যিক (পণ্ডিত)দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত এবং তাহাদিগকে কোন্ আসন দেওয়া হইত।

তাঁহার সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :—

১। সাধু, সাহিত্যিক, আইনব্যবসায়ী এবং[৪] বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া যে শ্রেণী বিভাগ করেন তাহার নাম রাখেন অলি-স, আদত। কারণ এইরূপ লোকের সংসর্গ করিলে, তাহাদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে চিত্তোন্নতির সূচনা করে।

২। সুলতানের স্বজন সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ অমাত্যগণ এবং সৈনিক বিভাগকে লইয়া যে শ্রেণী বিভাগ করেন তাহার নাম রাখেন অলি দৌলত কারণ তাহাদের ছাড়া কোন প্রকার ধনলাভের আশা নাই।

৩। যাহাদের মুখশ্রী এবং সৌন্দর্য্যছিল, যাহারা যুবক এবং লাবণ্যময় ছিল, যাহারা নর্ত্তক ও গায়ক ছিল তাহাদিগকে লইয়া এই শ্রেণী গঠন করেন উহার নাম দেওয়া হয় আলিমুরাদ (আমোদী লোক)। ৫

রাজা সাপ্তাহিক দিনগুলিকে পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া দিলেন ; এবং এই তিন দলের প্রত্যেকের জন্য ২ দিন নির্দ্দেশ করেন। শনি ও বৃহস্পতি বার (১) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয়। শনির নামানুসারে শনিবারে এবং বৃহস্পতির নামানুসারে বৃহস্পতিবারে দেওয়া হয়—কারণ এই গ্রহদ্বয় মানুষকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই এই বারদ্বয় দেওয়া হয়। রবি ও মঙ্গলবার (২) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয়, রবির (সূর্য্য) নামানুসারে রবিবারে দেওয়া

---

1. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i (Ranking), p. 602 ; *Ferishta* vol. ii. pp. 178—180.

2. *Tazkiratul-Salatin*, MS. in the Doh. Coll. vol. i, leaf 169.

3. *Shah-Jahan-Namah*, MS. in ASB, leaf 45. The ceremony looks very much like the *Hate Khadi* (হাতে খড়ি) of Hindus.

4. L. F. Smith's Appendix to *Chahar Darwish*. p. 253.

5. *Humayun-Namah*, Elliot v, pp. 119, 120.

হইয়াছে কারণ প্রত্যেক রাজারই অদৃষ্ট সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে গ্রথিত। এবং মঙ্গলের নামানুসারে মঙ্গলবারে দেওয়া হয় কারণ মঙ্গল যোদ্ধৃদিগের এবং সাহসী পুরুষদিগের পৃষ্ঠপোষক। সোম এবং বুধবার (৩) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয় কারণ চন্দ্রের নামানুসারে সোমবার এবং বুধের নামানুসারে বুধবার দেওয়া হইয়াছে। ইহা যুক্তি সঙ্গত যে, রাজা ঐ দুই বারে যুবক এবং চন্দ্রের মত সুশ্রী পুরুষদিগের সঙ্গে বাস করিবেন এবং তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত এবং মনোহারী বাদ্য শ্রবণ করিবেন।*

প্রতি শুক্রবারেই (জুম্মাবার) রাজা তিন শ্রেণীকেই একত্রিত করিতেন এবং যতক্ষণ তাঁহার অন্য একটী কার্য্যের সময় না আসিত ততক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপবেশন করিতেন। ১

তাঁহার নির্দ্ধারিত উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর কোনটীতেই সাহিত্যিকদিগের জন্য কোন সম্মানের স্থান নাই; কিন্তু তিনি যে সকল সবডিভিসন (subdivision) প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে স্থান দিয়াছেন। পদের তারতম্য দেখাইবার জন্য তিনি (রাজা) সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণের পরিমাণানুসারে সোনার তীর বিতরণ করিতেন। তিনটী প্রধান শ্রেণী ১২টী তীরন্দাজ শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দ্বাদশ সংখ্যক তীর খাঁটী সোনার তৈয়ারী হইত এবং উহা রাজার নিজ তূণের মধ্যে রক্ষিত হইত। রাজাই স্বয়ং প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন। একাদশ সংখ্যক তীর রাজার আত্মীয় এবং সরকারী কাজে নিযুক্ত 'সুলতান'গণ পাইতেন। দশম সংখ্যক তীর পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণকে দেওয়া হইত। নবম সংখ্যকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, ৮ম সংখ্যক তীর দরবারীদিগকে এবং রাজার নিজ পরিচিত পাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ পাইতেন, সপ্তম সংখ্যক তীর—সেনাপতিদিগের পরিচিত ব্যক্তিরা পাইতেন, ৬ষ্ঠ সংখ্যকটী উত্তম ব্যবহারিণী স্ত্রীলোকেরা পঞ্চমটী যুবতী পরিচারিকাদিগকে চতুর্থটী কোষাধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগকে, তৃতীয়টী সৈন্যদিগকে, দ্বিতীয়টী অতি নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যদিগকে এবং ১২টী প্রাসাদরক্ষক, উষ্ট্রপালক প্রভৃতিকে দেওয়া হইত।

এই সকল তীরন্দাজদিগেরও আবার তিনটী পদ আছে—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ২

ফেরিস্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সুলতান শ্রোতাদিগের নিমিত্ত ৭টী বড় বড় হর্ম্ম্য সকল তৈয়ারী করেন। ঐ সমস্ত ঘরের মধ্যে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকেই গ্রহণ করিতেন। ৭টী গ্রহের নামানুসারেই ৭টী ঘরের নাম করণ হয়। চন্দ্রপ্রাসাদে, শ্রমণকারী ও রাজদূত প্রভৃতি বক্তৃতা শুনিতেন। অতারদ্ অথবা শুক্র প্রাসাদে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ স্থান পাইতেন। পণ্ডিতব্যক্তিগণ শনি ও বৃহস্পতি প্রাসাদে স্থান পাইতেন। হুমায়ুন বক্তৃতা দিনের গ্রহের অনুসারে সেই সেই ঘরে বক্তৃতা দিতেন এবং সেই দিন ঘরের আসবাব এবং ছবিগুলি এমন কি লোকদিগের পোষাক পর্য্যন্ত গ্রহের বর্ণিত

---

* *Humayun-Namah*, Elliot v, pp. 121, 122.

Humayun Namah, Elliot v, p. 123.

পোষাকের মত পরিতে হইত। এই সকল প্রাসাদের প্রত্যেকটীতে তিনি সপ্তাহে একদিন বেচা কেনা করিবার প্রথা করিয়া দিয়াছিলেন। ১

সুবুক্ত তগবারিখ প্রণেতা মীর আবদুল লতিফ সুলতান কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তিনি রাজ দরবারে পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বড় দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে তিনি তাঁহার গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন।' ২

সুবিখ্যাত পারশ্য ঐতিহাসিক খুন্দামির যিনি গুজরাটে সম্রাটের শিবিরে মৃত হন তিনিও সম্রাটের সাহিত্যিক বন্ধুদিগের অন্যতম ছিলেন।

তজ কি রতুল ওয়াকি আত (হুমায়ুনের একখানি অজ্ঞাত জীবন চরিত) প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ জৌহর সম্রাটের অতি নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য ছিলেন। তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ভৃত্যাবস্থায় তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা ছিল। ৩

হুমায়ুন পুস্তক প্রিয় ছিলেন, এমন কি কোন স্থানে যাত্রাকালেও তাহার নির্ব্বাচিত লাইব্রেরীটী সঙ্গে যাইত। যখন তিনি শের সাহের ভয়ে ক্রত পলায়ন করিতেছিলেন তখনও তাহার সঙ্গে পুস্তক রক্ষক এবং অতি প্রিয় কয়েক খানি পুস্তক লইয়াছিলেন।৪ যখন তিনি কাবের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন সে সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি পুস্তক ছিল। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে তৈমুরলঙ্গের ইতিহাসই প্রসিদ্ধ। একদা নৈশ আক্রমণের সময় তাঁহার শিবির হইতে এক শ্রেণীর বুনোজাতি 'কুলি' দিগের দ্বারা পুস্তকগুলি অপহৃত হয়। যাহা হউক পরে ঐ গ্রন্থ সকল আবার উদ্ধার করা হইয়াছিল। ৫

লাল বেগের পিতা নিজাম সুলতানের পুস্তক রক্ষক ছিলেন তিনি বক্স বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ৬

নিম্ন মণ্ডলের ব্যবহার দ্বারা হুমায়ুনের সাহিত্য সাধনায় মতি পরিবর্ত্তন আরও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া ছিল। পুরাণ কিল্লাতে ইহা শের সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

---

1. *Ferishta* vol. ii. p. 71. Briggs' note: Among the Hindus cities are usually subdivided into *puras* (wards) called after each day of the week, by which markets are regulated and equally distributed throughout the town; palaces sometimes derive their names from these words."

2. Elliot iv, p. 294.

3. Elliot v, p. 136.

4. Noer's *Akbar*, p. 136.

5. Elphinstone, vol. ii, p. 126 (ed. 1841). *Tazkiratul-Salatin*, MS. in Boh. Coll., vol. i., leaf 125, adds that the *Timur-Namah* was copied by one Mulla Sultan 'Ali; *Akbar Namah* vol. i p. 309 (Beveridge), informs us that it was illustrated by Ustad Bihzad.

6. *Tuzuk-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p 21.

হয়; ইহা আমোদ গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু হুমায়ুন যখন দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন তখন তিনি উহাকে (সির মণ্ডল) পাঠাগারে পরিণত করেন। এই খানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সিহর উল মুতাখ খরিন প্রণেতা বলেন "একদিন" "সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহ ১ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে উঠিবে। এই কথা শুনা মাত্র সন্ধ্যার সময়ে তিনি (হুমায়ুন) ঐ গ্রহকে দেখিবার জন্য তাঁহার পাঠগৃহের ছাদের উপর আরোহন করেন। ছাদের উপর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া নামিতে ইচ্ছা করিলেন। মুয়াজ্জিনের সময় উপস্থিত হইল। হুমায়ুন আজানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য নীচের সিঁড়িতে বসিতে চাহিলেন। সিঁড়ি গুলি মসৃণ থাকায় অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল। হঠাৎ ঐ সিঁড়ি হইতে পা সরিয়া যাওয়ায় হুমায়ুন, মাথা নীচের দিকে রাখিয়া সিঁড়ি গুলি গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।২ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের গ্রন্থি গুলিতে খুব আঘাত পাইলেন। মাথার ডান দিকে খুব বেশী আঘাত পাওয়ায় ঐ সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন।"৩ উহার কিছুকাল পরই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খৃঃ অব্দ—জানুয়ারী)।

আমরা দিল্লীতে হুমায়ুনের প্রতিষ্ঠিত একটী মাদ্রাসার কথা শুনিতে পাই। সেখ বোসেন সেখানে একজন অধ্যাপক ছিলেন।৪

তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে হেঁয়ালী রচনায়, সদ্য কবিতা রচনায় এবং পদ্য ও প্রবন্ধ উভয় বিষয়ের রচনায় সেখ জৈনুদ্দিন কাফি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নিজামের (চুণার) নিকটে সেখ জৈনুদ্দিন কাফি ১৫৩৪ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত দেহ তৎপ্রতিষ্ঠিত কলেজের ভিতর সমাহিত হয়। তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত যমুনার তীরে আগ্রার বিপরীতদিকে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।৫ হুমায়ুনের রাজত্ব কালে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুইটী শিক্ষা কেন্দ্রের নাম শুনিতে পাই।

নূতন দিল্লীর সন্নিকটেই হুমায়ুনের যে বিখ্যাত সমাধি রহিয়াছে তাহাই এক সময়ে বিদ্যাদানের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা সাধারণে জানে না। সমাধিভবন সর্ব্বদাই কেবল মাত্র একটী সুন্দর ও অতুল গৃহ

---

1. *Sayyid Ahmad* (Garcin's Transl., p. 139) confirms the story, but Ferishta differs, and says that the Emperor went there for an airing. See also *Ferishta* vol. ii. pp. 177, 178. Hearn says, "His death was due to his astrological studies. One evening he was told that Venus ought to be visible, and he determined, if he saw the planet, to promote certain nobles, as it would be fortunate to do so."—Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 218.

2. The fact of Humayun's "rolling downstairs on to the ground" has been taken as improbable by some writers, *e.g.* Elphinstone, Marshman, etc., though that is the story told by *Ferishta Muntakhabul-Tawarikh, Tabaqati-Akbari, Mira-tul-'Alam Shah-Jahan-Namah etc.* That Humayun fell headlong over the parapet is taken by them as more likely.

3. *Siyarul-Mutakhkhirin*, as quoted in C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 194.

4. Blochmman's *A'ini Akbari*, vol. i. p. 538.

5. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i, (Ranking), pp. 610, 611.

হইয়া সম্রাটের কফিনকে স্থান দিবার জন্য বিরাজমান ছিল না; পরন্তু উহার উপর একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে সমাধির ও বিদ্যাদানের দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হইত। Stephen (সি, ষ্টিফেন) উহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন।

"কলেজটী সমাধির ছাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এক সময়ে উহার কার্য্যকারিতা মন্দ ছিল না। বিভিন্ন পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতেন। যাহা হউক দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার খ্যাতি আর সুপ্রচারিত নহে। বিশেষতঃ বিগত ১৫০ বৎসর সব গৃহগুলিই পরিত্যক্ত হইয়াছে—হয়ত এক সময় তাহাদের প্রত্যেকটি বেশ ভর্ত্তি থাকিত।"[১]

সের সা

সের সাহের রাজত্ব অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস জনহিতকর কার্য্যে গৌরবময় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বিচক্ষণ নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। কিন্তু আমরা এইটুকু মাত্র জানিতে পারি যে, তিনি পণ্ডিত সঙ্গ ভাল বাসিতেন, এবং পণ্ডিতদিগের সঙ্গেই তাঁহার আহারাদি ক্রিয়া সমাধা হইত।[২]

সের সাহের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে আমরা নিম্ন লিখিত বিষয় জানিতে পারি :—

সের সাহের পিতা হোসেনের ৮ পুত্র ছিল। ফরিদ (পরে সের সা) এবং নিজাম পাঠান বংশীয়া এক রমণীর সন্তান ছিলেন এবং অন্যান্য পুত্রগণ সকলেই দাস বংশীয়ারমণীদিগের গর্ভজাত। হোসেন তাহার পুত্রদিগকে স্নেহ করিতেন না এই কারণে ফরিদ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জামালের অধীনে সৈনিকের কাজ লইলেন। হোসেন শাসিরাম হইতে জামালকে অনুরোধ করিয়া, তাহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে এবং তিনি শাসিরামে তাহার পুত্রকে পড়াইতে পারেন এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন। ফরিদ পিতার কথামত কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি জৌনপুরেই থাকিতে চাহিলেন, এবং বলিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে জৌনপুর শাসিরাম অপেক্ষা প্রকৃষ্ট স্থান হইবে। পিতাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে তিনি গভীর পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করিবেন। শীঘ্রই তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় যথেষ্ট উন্নতি দেখাইলেন, এত উন্নতি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাহির গ্রন্থাবলী তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

ইতিহাস এবং কাব্য পাঠেতিনি অধিকাংশ সময় দিতেন। পাঠাভ্যাসে তাঁহার সদাশয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি এবং উৎসাহ পাইয়াছিলেন।[৩] সিকন্দর নামা, গুলিস্তান, বাস্তান প্রভৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল; তিনি দর্শন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যখনই কোন পণ্ডিতব্যক্তি

1. C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 207; also Fanshawe's *Delhi past and present*, p. 232: "On the top of the building, round the drum below the dome, are a number of rooms and pavilions once occupied by a *college* attached to the mausoleum, and reminding one of the colony of St. Peter's Dome."

2. *Tarikhi-Shir-Shahi* of Abbas Khan Elliot iv, P. (*I bid., Garcin de Tassy's* transl., p. 143); *Waqi' ati-Mushtaqi*, Elliot iv. P. 538: *and Tariki-Fan-Fahan* MS. in ASB, leaf 98.

3. Stewart's *Hist. of Bengal* pp. 127, 128; also *Ferishta* vol. ii. p. 100.

সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিত তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই 'আসিয়া হিন্দি' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন কারণ তিনি ইতিহাস গ্রন্থ এবং প্রাচীন রাজগণের জীবনী খুব পছন্দ করিতেন। ১

সের সাহ, কাজি সাহাবুদ্দিনের ভাষা সমেত আরবী গ্রন্থ 'কাফিয়া' (ব্যাকরণ গ্রন্থ) পাঠ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে প্রাচীনকালের রাজগণের জীবনীও পড়িয়াছিলেন। তিনি মদরসা (মঠ) ও উচ্চবিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিতেন এবং আমোদপ্রিয়তির নিমিত্ত, সুপণ্ডিত ও সেখদিগের সঙ্গে মিশিতেন। ২

হিসার ও জয়পুরের মধ্যবর্ত্তী 'রেওল' রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল পশ্চিমে 'নরনৌল' নামক স্থানে সম্রাট সের সাহ কর্ত্তৃক একটী মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টী উক্ত নগরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৃহ। এইখানেই সের সার প্রপিতামহ শিবওয়েখের সমাধি মন্দির রহিয়াছে। এই সমাধি মন্দির উত্তোলন করিতে সুলতানের প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ মাদ্রাসা ৯২৭ হিজীরা (১৫২২ খৃঃ অব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৩

সের সাহের পুত্রও বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সদ্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই, সেখ আবদুল হাসান কাম্বু এবং সেখ আবদুল্লা সুলতানী পুরী মখদুম-উল-মলক এই পণ্ডিত দ্বয়ের সঙ্গে মিশিতেন। ৪ সেখ আলাই তাঁহার সময়ের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, বি-এল।

স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট

(২)

(সর্ব্বজনীন জলকষ্ট)

কষ্টের কারণ কি ?—সহজে বুঝিতে পারেন না এমত লোক পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ। বৈশাখে বৃষ্টি না হইলে জমিতে চাষ দেওয়া যায় না। বৈশাখ মাস অতীত হইল অথচ জমিতে কাহার চাষ পড়িল না—ইহার কারণ কোন কৃষকেরই অবগত হইতে বাকি থাকে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বীজতলায়' ধানের বীজ ছিটান হইল না—কেন হইল না! ইহার কারণ যে বৃষ্টির অভাব তাহা কি বুঝিতে বাকি থাকে। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হইলে ধানের জমিতে জলাভাব হয়, —তাহার নাম কৃষি ভাষায় 'কেতেরা'।

কার্ত্তিক মাসে হৈমন্তিক ধানের 'শীষ' বাহির হয়। আশ্বিনের শেষে—'থোড়' হয় এই সময়ে ধানগাছ জল বেশী টানে—কার্ত্তিক মাসে ধানের জমিতে জল থাকার প্রয়োজন

1. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i, (Ranking) p. 446; and *Tarikhi-Shir-Shahi* Elliot iv. P. 311.
2. *Ibid.*
3. Arch. Survey Report, vol. xxiii, p. 27.
4. *Tarikhi Fan-Fahan*, MS. in ASB, leaf 103.

কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ধান 'ফুলায়' না, বা ভাল শীষও বাহির হয় না। শ্রাবণ মাসে ধানগাছ 'বিয়ান' ছাড়ে। তখনও জলের আবশ্যক।

কৃষকেরা বলিতে পারেন কেন শীষ 'ঝাড়িয়া' বাহির হইল না। কেন ভাল করিয়া ফুলাইতে পারিল না। যখন ধান ফুলায় তখন ঝড় জল হইলে ধান গাছ পড়িয়া যায়। ফুল ঝরিয়া পড়ে—ধানে 'দুধ' হয় না কারণ ধানে—চাউল পূর্ণ না হইয়া শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে—এই প্রকার শূন্য গর্ভধান কোন স্থানে 'আগড়া,' কোন স্থানে 'পাতান' ইত্যাদি নামে পরিচিত। কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন কেন এমন হয়।

কষ্টের কারণ গুলি সকল ফসলের পক্ষে সমান না হইলেও, কৃষকগণ বুঝিতে পারেন কি কারণে কোন্ কোন্ ফসল হইল না। কিন্তু এমন কতকগুলি কারণ আছে যাহা কৃষকেরা বুঝিতে পারেন না।

কলাই, গাছে পাতে ভালই হইয়াছে—কিন্তু 'হদ্‌লাইয়া' গেল—গাছে পাতে বাড়িল কিন্তু 'ওঁটি' আদৌ হইল না—কেন এমন হয় তাহা কৃষকগণ অবগত আছেন। সময় সময় দেখা যায় 'শন' প্রচুর হইল—গাছে পাতে বাড়িল—ফুল প্রচুর হইল কিন্তু ফল মোটেই হইল না বা যাহা হইল তাহা নগণ্য—ইহার কারণ কৃষকগণ স্থির করিতে পারেন না।

পটল, গাছে পাতে লতে খুব হইয়াছে, ফুলও (পুষ্প) ধরিতেছে অথচ পটল ধরিতেছে না। কচি পটল, পাকার মত বর্ণ ধরিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—কেন এমন হইতেছে তাহা ধানের চাষী বুঝিবেন না; কিন্তু পটলের চাষী বুঝিবেন।

পটলের কৃষক ইহার কারণ অচিরে নির্ণয় করিতে পারেন তিনি দেখিতে পাইবেন পুং-পটলের লতা তাঁহার ক্ষেত্রে নাই, অথবা পুংপুষ্পতাঁহার ক্ষেত্রে বা পার্শ্বপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও নাই, সেই কারণে পটল ধরিতেছে না।

সময়ে সময়ে বিলাতী কুমড়ার লতায় সকলই স্ত্রীপুষ্প হয় কুমড়া ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই শুষ্ক হইয়া যায়। কৃষক বুঝেন কেন তাঁহার কুমড়া ধরিতেছে না।

একবার দেখা গেল তিলগাছে, গাছ পাতায় ভালই হইয়াছে, যথেষ্ট ফুল ধরিয়াছে, তিলের ফলও ধরিয়াছে কিন্তু তিলের ফলে বীজ জন্মে নাই, অথবা যাহা জন্মিয়াছে তাহা নগণ্য কেন এমন হইল তাহা কৃষক বুঝেন না।

এই রকম প্রত্যেক ফসলের অজন্মার কারণ কি তাহা কতক কৃষক জানেন আবার কতক কারণ অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু অনাভাবে ফসলের অবস্থা কীদৃশ হয়, তাহা সকলেই বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

বীজের চারার অভাবে যথা সময়ে ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ হয় না তাহার কারণ বৈশাখে বৃষ্টির অভাব। এমনও দেখা গিয়াছে পুষ্করিণী বিল খালের জল ছেঁচিয়া জমি সেঁওতা (আর্দ্র) করা হয় তৎপরে জমির 'বাত' করিয়া লইয়া বীজধান ছিটান হয়। তাহাতে যে 'বীচ' (চারাধানগাছ) হয়, তদ্দ্বারা জ্যৈষ্ঠের জলে জমি আবাদ করিয়া ধানের চারা রোপণ করে। যাঁহারা বৈশাখের বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া 'বীজ-তলায়' ধান ছিটাইয়া চারা করিতে পারেন নাই—তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে তাড়াতাড়ি 'নেয়াচ' বীজ প্রস্তুত করিয়া ধানের চাষে প্রবৃত্ত হন। নেয়াচ বীজের ধান—ফুলায় বীজের মত হয় না।

এখন দেখা যাইতেছে কৃষক বৃষ্টির জল ও খাল, বিল তড়াগাদির জলে নির্ভর করিয়া

কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। বুঝা যাইতেছে বৃষ্টির জল এবং জলাশয়ের জল এই দুই প্রকারের জলের উপর নির্ভর করিয়া কৃষক ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন।

অন্তরীক্ষ জল এবং ভৌম জল—এই দুইটী কৃষিকার্য্যে আবশ্যক। বঙ্গদেশে প্রায়ই এই উভয়বিধ জলের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

অন্তরীক্ষ জল বলিলে বৃষ্টির জলই বুঝায় —শীলাবৃষ্টি ও বরফের জল যে বুঝায় না তাহা নহে শীলাবৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা ফসলের হিতাপেক্ষা অহিতই অধিক হয়।

ভৌমজল বলিলে নদ নদী, তড়াগ, কূপ ইত্যাদির জলই বুঝিতে হয়—ইহার মধ্যে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ ভৌম জল সংগ্রহের উপায় আছে। নদী বিল প্রভৃতি স্বভাবজাত অর্থাৎ অকৃত্রিম। পুষ্করিণী, কূপ, ক্যানেল পাম্প প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ের জলাধার।

অন্তরীক্ষ জল

আমাদের বাঙ্গালা দেশে অন্তরীক্ষ জলের অপ্রতুলতা নাই বলিলেই হয়। সকল প্রকার ভৌম জলাধার অন্তরীক্ষ জলের উপর নির্ভর করে। সুবৃষ্টি না হইলে নদ নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণীতে জল জমে না। সুতরাং অন্তরীক্ষ জলের উপর কৃষিকার্য্য মূলতঃ অপেক্ষা করিতেছে।

ভাণ্ডার বা দোকানে যেরূপ মানবের আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত থাকে, আবশ্যক হইলেই তথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ জলও ভাণ্ডারে সময়ে সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে আবশ্যক মত জলপ্রাপ্তির সুবিধা হয় না।

বৃষ্টির জল সময়ে ভূপতিত হইয়া ক্ষেত্রে প্রচুর জল সঞ্চিত হয় কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। জমির জল প্রবাহ—নদী, খাল, বিলে গিয়া পড়ে। নদীতে যাহা পড়ে তাহা সাময়িক বন্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়া যায়। সকল সময়ে বন্যাও হয় না এবং বন্যা অসময়ে হইলে ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়। সুতরাং অসময়ে বন্যা প্রবাহ যাহাতে কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত না করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হয়।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিল খালের মুখে বাঁধ দিয়া আবশ্যকমত জল রক্ষার উপায় করিয়া রাখিতে হয়। যে স্থানে এই প্রকারের কোনই বন্দোবস্ত নাই তথায় জল কষ্ট অনিবার্য্য।

ফসল ঋতুভেদে নানাবিধ উৎপন্ন হয়। সকল ঋতুতে কিছু বৃষ্টি হয় না। এবং সকল ফসলেই বৃষ্টির আবশ্যক নাই—উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে সর্ষপ যখন পুষ্পিত হয় তখন বৃষ্টির কোনই প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি হইলে এ ফসল জন্মে না। সর্ষপ-বীজ যখন উপ্ত হয় তখন জমিতে রস থাকিলেই যথেষ্ট তৎপরে দু পাঁচ পাতা হইলেই ফুল বাহির হইতে থাকে, তখনও বৃষ্টির প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি হইলে 'পাঁথি' লাগে অর্থাৎ এক রকম পোকা ধরিয়া সর্ষপের পাতা খাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ফুলের সময় বৃষ্টি পড়িলে—ফল ধরে না। সুতরাং সর্ষপে জলের প্রয়োজনই নাই।

আলু, যব, গম, মটর, মুসুরী প্রভৃতি ফসলে বৃষ্টির জলের প্রয়োজন অতি সামান্য। ভৌম জলের আবশ্যক অত্যধিক। আলু বৃষ্টির জল চায় না—বৃষ্টির জলে ইহার অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। যব, গম, মটর, মুসুরী কিঞ্চিৎ অন্তরীক্ষ জলের প্রত্যাশী তাহা দেখা যায়।

যাহাহউক অন্তরীক্ষ জলের সাময়িক প্রয়োজন যে অমৃত তুল্য মূল্যবান তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু আমাদের আবশ্যক মাত্রেই বৃষ্টির জল পাইতে পারি না। যদি বুদ্ধিমানের মত অন্তরীক্ষ জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপায় করিয়া রাখি তাহা হইলে জলকষ্ট আদৌ অনুভব করিতে হয় না। ধান তুষ্টা প্রভৃতি বর্ষাতি ফসলে অন্তরীক্ষ জলের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু অন্তরীক্ষ জলের অভাব হইলেও ভৌম জল সেক দ্বারা উক্ত অভাব বিদূরীত হইতে পারে।

অন্তরীক্ষ জল রক্ষার উপায়
ও
অপচয় নিবারণ

কৃষিবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত কৃষকগণ বলেন "একবিন্দু অন্তরীক্ষ জল যাহাতে বৃথা অপচয় না হয় কৃষক মাত্রকেই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" অন্তরীক্ষ জলের প্রত্যেক বিন্দুর সৎব্যবহার করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক।

স্বভাব জাত অকৃত্রিম জলাধার

বাঙ্গালার সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার থাকবন্দি জরিপের মানচিত্র সন্দর্শন করিলে দেখিতে পাইব যে নদ, নদী, কাঁদোড়, খাল, বিল, বাওড় প্রভৃতি জলাধারে প্রায় পরিপূর্ণ। কোথাও বেশী কোথাও কম।

দেশের মধ্যে যেমন উচ্চ ভূমি আছে তেমনি নিম্ন ভূমিরও অভাব আদৌ নাই। বৃষ্টির জল গড়াইয়া যে ভূখণ্ডের উপর দিয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হয় বা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায় তাহাই নিম্ন ভূমি। বৃষ্টির জল বর্ষাকালে বা অন্য সময়ে ঐ সকল ক্রমনিম্ন স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত গভীর স্থানে গিয়া জমা হয়। যাহা মানবকৃত খাত নহে, তাহাকে 'অকৃত্রিম জলাধার' বলা যায়।

মানবকৃত—কৃত্রিম জলাধার

কাটাখাল—ক্যানেলের নালা, দীঘি, পুষ্করিণী ও কূপ ইত্যাদি কৃত্রিম জলাশয় নামে উক্ত হইয়া থাকে। খাল, নালা, দীঘি ইত্যাদিতে অন্তরীক্ষ জলেরই প্রাধান্য এবং কূপ ও দীঘি প্রভৃতিতে ভূগর্ভস্থ জলস্রোত এবং চোঁয়াট জলের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথায় ভৌম ও অন্তঃরীক্ষ জলের অপ্রতুলতা তথায় ওয়েল পাইপ দ্বারা বা সুগভীর কূপ খনন করিয়া ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা যায়।

কৃত্রিম ভাণ্ডারে ও অকৃত্রিম জলাধারে

জল রক্ষার উপায় বর্ষাকালেই করা সম্ভব। বৃষ্টির জল যখন কৃষিভূমি প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; তৎকালে সেই জলধারা যাহাতে বাহিত হইয়া নদী খালে গিয়া পড়িয়া না যায় তাহার জন্য জলস্রোত আবদ্ধ পুষ্করিণী, তড়াগ, বিল, খালে জমা করিয়া রাখিবার উপায় কৃষককেই করিতে হয়। যাহাদের জলের খরচ বেশী, তাহাদিগকে ঐ প্রকারে অন্তরীক্ষ জলকে ভৌম জলাধারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইবে।

আহারার্থ যদ্রূপ ধান চা'ল গোলাজাত বা ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখিতে হয়। যাহার সংসারে যেমন খরচ তাহাকে হিসাব করিয়া বৎসরের উপযুক্ত ধান চাল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই কার্য্যটি যেমন ব্যক্তি ভাবে করিয়া থাকে। অন্তরীক্ষ ও ভৌম জলও তদ্রূপ কৃষকের বৎসরের ফসলের উপযুক্ত মত সংগ্রহে যত্নবান হইতে হয়।

কৃষক ব্যক্তিগত ভাবেও সংগ্রহ করিতে

পারেন এবং সমষ্টিগত ভাবেও সংগ্রহ করিতে পারেন। স্বীয় জলাশয়ের জন্য কৃষক ব্যক্তিগত ভাবেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। জমির 'আই' কাটিয়া পয়ঃপ্রণালীর জলস্রোত ফিরাইয়া, পুষ্করিণীর মোহানা দিয়া পুষ্করিণী জলপূর্ণ করিবার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

জলস্রোত ফিরাইয়া না দিলে, জল কিছু আপন ইচ্ছায় জলাশয়ে গিয়া জমা হইবে না। জল-ভাণ্ডার পূর্ণও হইবে না। বৎসরে যত জলের প্রয়োজন বা ঐ জলাশয় হইতে যত জল পাইবার আশা করা যায়, তাহা কখনই পাইবার আশা থাকে না।

সময়ে হউক অসময়ে হউক জল পাইলেই কৃষি উপযোগী জলভাণ্ডারে তাহা সাদরে গ্রহণ করা চাই। গৃহে প্রচুর অর্থ বা শস্য থাকিলেও যদি অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় তাহা কেহই গ্রহণ পূর্ব্বক ভাণ্ডারজাত করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করেন না।

জল অতি প্রয়োজনীয়—স্নান, পান ও সংসারে সকল সময়েই প্রয়োজন। জলের যে মূল্য কত তথায় একবার জলাভাব বা জলকষ্ট হইয়াছে তথাকার লোকে হৃদয়-গ্রাহী রূপে বুঝিয়াছেন। কদর্য্য পর্য্যুষিত অন্নাহারে জীবন যেমন বিপন্ন হয়, কদর্য্য ও সমল জল পান ও ব্যবহার তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর ও বিপদের মূল।

সকল স্থানেই দেখা যায় দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ জলাভাব। সময়ে বারিপাত না হইলে শস্য জন্মে না। অসময়ের জলের ব্যবহার দেশের লোক ভাল মতে অবগত আছেন বলিয়া মনে হয় না। অসময়ের জলের যে মূল্য আছে তাহা বুঝিতে পারেন না, একেবারে উদাসীন থাকেন।

জলাধারে যে জল আছে, তাহাতেই চলিয়া যাইবে এবং যথাকালে বৃষ্টি হইলে জলে পূর্ণ হইবে। যদি সময়ে জল অল্প হয় বা বিলম্বে হয় তাহা হইলে অসময়ের জলের যে মূল্য কত তখন বুঝিতে আর বাকি থাকে না। তখন অনুতাপ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই!

সে অনুতাপ কেবল বাক্যর নহে—অন্তরে জ্বালামালার সৃষ্টি করিয়া ভীষণ কষ্ট অনুভব না করাইয়া ছাড়ে না।

সময়ের বা অসময়ের বৃষ্টিজল বুদ্ধিমান কৃষকগণ কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। পল্লীর ও মাঠের জলাধারে যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভাণ্ডারে জলপূর্ণ থাকিলে প্রভূত উপকার ব্যতীত বিন্দুমাত্র অপকারের আশঙ্কা নাই।

ব্যক্তিগত স্বার্থ যে স্থলে প্রবল তথায় গৌণভাবে সাধারণ স্বার্থও বিদ্যমান আছে। সেই জন্য জল সংগ্রহ ব্যপদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত পল্লীর সমষ্টিগত স্বার্থ মিলিত করিয়া জল সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মানবের মানবত্ব তাহা হইলে স্ফুটতর হয়, নচেৎ পশুত্বেরই বিকাশ সূচীত করে।

বর্ষাকালে নদী খাল জাত বন্যা প্রবাহ যখন কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত করে সেই সময়ে মাঠের ও পল্লীস্থ জলাশয়ে যত্নসহকারে জল গ্রহণ করিয়া জল-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়।

বৃষ্টির জলে দুদিন পরে জলাশয় পূর্ণ হইবে এ চিন্তা বা ধারণা ত্যাগ করিয়া যাহা উপস্থিত তাহাই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। বৃষ্টি হয় হইবে—সে ভবিষ্যৎ জলের আশায় বর্ত্তমান জল ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করার মত নির্ব্বোধের কার্য্য আর নাই।

কোন দূরবর্ত্তী স্থানের বৃষ্টির জল নদ নদী প্লাবিত করিয়া বহুদূর দূরান্তরের ভূমিভাগ প্লাবিত করে। সেই জল অসময়ে হইলেও তাহা জল-ভাণ্ডারে যত্নতঃ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের আশা ও চিন্তা হইতে নির্লিপ্ত থাকা উচিত।

বন্যার জলে যে সকল তড়াগ, খাল, বিল ও পুষ্করিণী, যে পথ দিয়া পূর্ণ হইতে পারে তদ্দেশবাসী কৃষক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতে নাই। বর্ত্তমানে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; ভবিষ্যতে এমত সুযোগ আর উপস্থিত নাও হইতে পারে। নিশ্চিতের আশা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের আশা পোষণ করা—'সুকুর ও প্রতিচ্ছায়া' গল্পেই শোভা পায়—মানবে তাহা আদৌ শোভা পায় না।

অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, বর্ষার পূর্ব্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে কৃষক উহা উপেক্ষার সহিত ত্যাগ করেন। জমিতেও আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। কারণ তৎকালে জমি জলপূর্ণ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। জমিতে যাহাতে 'যাত' হয় তাহারই চেষ্টা করেন। ভূমি কর্ষণ করিবার মত যে জলের প্রয়োজন ইহার অতিরিক্ত থাকিলে, জমিতে চাষ চলে না।

সেই প্রচুর জল জমির 'যাই' দিয়া বাহিয়া খালে ও শেষে নদীতে পড়ে অথবা বিলে গিয়া সঞ্চিত হয়। বরং বিল খালে সঞ্চিত হওয়া ভাল তত্রাচ নদী প্রবাহের গতি বর্দ্ধনে কিছুই লাভ নাই।

উপেক্ষায় যে জল ত্যাগ করা হইল তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, জমিতে চাষ পড়িল কিন্তু আর পূর্ব্বের মত বৃষ্টি সময়ে হইল না; সুতরাং চাষ করা জমি পড়িয়া থাকিল, জলাভাবে তাহা সময়ে আবাদ হইল না।

যাঁহারা সেই জল যত্ন সহকারে জলাশয়ে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা জলাশয় হইতে জল উত্তোলন করিয়া আবাদ আরম্ভ করিলেন। দশ দিন পরে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে তাঁহাদের আবাদী জমিতে প্রচুর জল জমিয়া গেল। ফসল খুব জোর ধরিল। কিন্তু যাঁহারা অসময়ের জলকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন জলে জমি আবাদ করিয়া শেষ করিতে করিতে জলাভাব দেখা দিল। যদি তাহাও না দেয় তাহা হইলে অগ্রে যাঁহারা আবাদ সারিয়াছেন তাঁহাদের মত ফসল পাইলেন না। যদি বৃষ্টি বেশী না হয় তাহা হইলে যাঁহারা অগ্রে আবাদ সারিয়াছেন তাঁহাদের জলকষ্ট হইল না কিন্তু শেষের জলে যাহারা আবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের ঘোর জলকষ্ট উপস্থিত হইল।

অসময়ের জলকণা এই উপায়ে সংগৃহীত থাকিলে সময়ে তাহা কাজে লাগে। একথা কৃষক মাত্রকেই মনে করিয়া জল সংগ্রহে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

পর আবাদি পড়া জমির জল বিনা উপকারে বহিয়া চলিয়া যায় সুতরাং সে জল যাহাতে মানবের উপকারে লাগে তাহা করিতে হয়। বর্ষার জল পতিত ভূমি হইতে যে পথে গড়াইয়া যায়, সেই পথ হইতে যত্ন সহকারে, মোড় ফিরাইয়া নিকটবর্ত্তী জল-ভাণ্ডারে প্রবেশ করাইতে হয়। পতিত পর আবাদি জমির জল সংগৃহীত করিয়া রাখিতে পারিলে সময়ে আবাদী ভূমির শস্য রক্ষার সাহায্য করে। তখন বুঝা যায় পতিত জমির অযত্ন-প্রবাহিত জলের মূল্য কত।

পতিত জমির জল অতীব মূল্যবান, পতিত ভূমিতে গোচারণ হয় বলিয়া গোময় ও গোমূত্র সংগৃহীত থাকে। শ্মশানের ও গোয়াড়ের ধৌত জলও মূল্যবান—জৈবীক সারে পরিপূর্ণ। কৃষিভূমির জল জলাশয়ে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভূখণ্ডের ধৌত জল ক্ষেত্রে রক্ষা করিলে ভূমি উর্ব্বর হয়।

বর্ষার প্রথম প্রচুর জল যাহা পল্লীগৃহ ও পল্লীপথ প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায় তাহা পল্লীমধ্যস্থ কোন পুষ্করিণীতে যাহাতে সঞ্চিত না হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হয়। পল্লীধৌত জল যাহাতে পল্লীপার্শ্ববর্ত্তী কৃষি ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া পতিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

প্রথম পল্লীধৌত জল ক্লেদ ও মলপূর্ণ এবং বিষাক্ত অথচ সারবান। এই জল পল্লী ব্যবহার্য্য জলাশয়ে পতিত হইলে অশেষ রোগের মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ জল পল্লীপার্শ্বস্থ কৃষিক্ষেত্রে পতিত হইলে প্রচুর সারের কার্য্য করে কারণ ইহাতে যে 'পলি' পড়ে তাহা সার পূর্ণ। কৃষি ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভূমিতে সার দিয়া শেষে মাঠের জলাশয়ে সঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যতের কৃষি ভূমির জলাভাবও দূর করে।

এই সকল উপায় দ্বারা অগ্রে মধ্যে ও শেষে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম জলাশয়ে জল পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা প্রতি কৃষককে যত্ন সহকারে করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। ইহাতে যে কীদৃশ উপকার সম্ভব তাহা কৃষক মাত্রেই অবগত থাকিয়া উদাসীন হন।

এ করিবে, ও করিবে, সে করিবে ইত্যাকার "গবৎসঙ্ঘ" ভাব দ্বারা সকলসাধারণের জলভাণ্ডার প্রায় শূন্য থাকিয়া যায়।

বিল, খাল, বাওড়, কাঁদোড় প্রভৃতির মোহানা গুলি যত্নসহকারে—সাধারণের ব্যয়ে বাঁধ দিয়া সুরক্ষিত করা আবশ্যক এবং অতিরিক্ত জল যাহাতে বাঁধের পার্শ্বস্থ প্রণালী দিয়া বহিয়া যাইতে পারে তাহা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। আবশ্যক মত জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে—অতিরিক্ত জল ছাড়িয়া দিয়া বাঁধ রক্ষা করিতে হইবে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এই উপায়ে অনাবশ্যক জলের অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ করা যায়।

ভৌম জল

জলের অপচয় ও অপব্যবহার

ভৌম জলের অপচয় ও অপব্যবহার বলিলে জল-ভাণ্ডারের জলের অপব্যবহার বুঝায়। ইহা যত প্রকারে হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। স্থূল স্থূল অপচয়ের কারণগুলির বর্ণনা মাত্র এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাঢ়দেশে কাঁদোড়ের অভাব নাই—কাঁদোড় কাহাকে বলে পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে—কেদার বাহিনী স্রোতস্বিনী ইংরাজীতে যাহাকে Brook বলে ইহা তাহাই। কৃষকগণ এই কাঁদোড়ে বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রবাহ রোধ করে, এবং সেই জল তুলিয়া উঠিলে, জমির 'আই' কাটিয়া বা পয়ঃপ্রণালী দিয়া জলের নালা দিয়া; কাঁদোড়ের বা কাঁদড় অপেক্ষা কিছু বড় নদীর জল ক্রমশ নিম্ন কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

কাঁদোড়ের শত স্থানে বাঁধ বাঁধা হয়,দৈবাৎ বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইলে উভয় বাঁধের মধ্যগত জল বাহির হইয়া যায় কিন্তু ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি হয় না।

প্রত্যেক বাঁধের এক পার্শ্বে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য ক্ষুদ্র প্রণালী আছে। সেই জল প্রণালী দ্বারা জল বাহির হয়। রাঢ়দেশে প্রতি বাঁধের জমা আছে; যে বা যাহারা জমা লয়েন তাঁহারা বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 'আড়া' নামক মাছ ধরিবার এক প্রকার সহজ ও সরল কৌশল আছে। যে পথে জল বাহির হইয়া যায় সেই জলে/বাড়ে' পুতিয়া 'আড়া' দেওয়া হয়। উজান বাহিয়া মাছ ঐ পথে গমন কালে আড়ায় গিয়া পড়ে।

যাঁহারা বাঁধ রক্ষা করেন তাঁহাদের নজর থাকে মাছের উপর—তাঁহাদের জ্ঞান অতি সামান্য, তাঁহারা স্বীয় স্বার্থই বোঝেন, ফলের

অপকার হইবে কি উপকার হইবে সেদিকে বড় লক্ষ্য থাকে না। দিবসে আঢ়ায় চুনো মাছ ছাড়া অন্য মাছ পড়ে না। জলের বেগ অধিক থাকিলে দিবসে কাঁদোড়ের জল ছাড়িয়া দিতে হয়। তখন জমাদার আড়া দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন জলের বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন দিবসে বা রাত্রে জল ছাড়া হয় না। এই জল টানের সময় আবার মাছও বেশী পরিমাণে আড়াতে পড়ে।

বাঁধরক্ষক পাছে কাঁদোড়ের জল ছাড়িয়া দেয়, এই জন্য পল্লীর কৃষকগণ তীব্র দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু লোভী আড়ার ও বাঁধের জমাদার গভীর রাত্রে জল ছাড়িয়া আড়া যেন, তাহাতে অচিরাৎ কাঁদোড়ের জলাভাব উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষকগণের সহিত বাঁধ রক্ষকের বিবাদ হয়, অনেক স্থলে মোকদ্দমাও রুজু হয়।

কাঁদোড়ের নিম্ন অংশের পল্লীবাসীগণের কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব হইলে, উপরের বাঁধ কাটিয়া তাহারা স্বীয় বাঁধের মধ্যে জলবেগ বর্দ্ধিত করিয়া লয়। এবং গভীর রাত্রে গিয়া উপরের বাঁধ কাটিয়া দেয়।

প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উপরের বাঁধের পল্লী কৃষকগণ গোপনে গিয়া নিম্নের বাঁধ কাটিয়া দেয়। তাহাদের ইহাতে যদিও কোন লাভ নাই, কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ তাঁহারা ইহা নিয়ত করিয়া থাকেন। নিম্নের জল যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সেই জল লইয়া নিম্নের লোক কৃষিকার্য্য করিবে ইহা সহ্য হয় না। সুতরাং উভয়েরই সমান দশা লাভ হয়।

এই প্রকার বাঁধ কাটাকাটি ব্যাপারে জলের অপচয় ও অপব্যবহার হইয়া, ক্ষেত্রের জলকষ্টের সময় জলাভাব উপস্থিত হয়।

খালের জলও ঐ প্রকারে অপচয় হয়। খালের যে মুখ দিয়া জল বাহিরা যায় তথায় বাঁধ বাধা হয়। এই প্রকার বাঁধকে শাস্ত্রে 'পালী' বলা হয়। 'পালী'রক্ষার বন্দোবস্ত প্রাচীনকালে যে প্রকার ছিল, বর্ত্তমানে সে প্রকার নাই।

খাল যদি স্থানে স্থানে প্রশস্ত হইয়া জলাভূমির সৃষ্টি করে তাহা হইলে জলের অপচয়ের চির ব্যবস্থা হয়; খাল, কাঁদোড় ও কেয়ার বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যে প্রশস্ত নিম্ন সমতল বা ক্রমনিম্ন ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা পূর্ব্বকালে গরআবাদী বা পতিত থাকিত। বাঁধ বাধিয়া দিলে, খাল কাঁদোড়ের জল ফুলিয়া ঐ নিম্ন জলাভূমি পূর্ণ করিয়া রাখিত। এবং উহার উপরের কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব হইলে সিঁওতী বা ডুনী দ্বারা জল ছেঁচিয়া কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া হইত। তাহাতে ফসলের জলাভাব নিবারিত হইত।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ কারণে ঐ সকল খালের জমি, পতিত জমি, জমিদার বা পত্তনীদারগণ প্রজা বিলি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে ঐ নিম্ন জলাভূমি 'আমন' ও 'বোরো' ধান্যের কৃষির জন্য বন্দোবস্ত লয়।

ক্রমশঃ ঐ পতিত জমি আবাদী হইলে উহাতে জলের অভাব দৃষ্ট হয় না দেখিয়া, আমনের ক্ষেত্রে উচ্চ আলী বাঁধিয়া ধান্য রোপণ করিবার বন্দোবস্ত করে। হৈমন্তিক ধান্য রোপণ আরম্ভ করিলে অতিরিক্ত জলের আবশ্যক হয় না; অর্থাৎ জলাভূমির আমনের মত জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উপরের হৈমন্তিক কৃষকগণের জমিতে জল পাইতে হইলে—বাঁধটি উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয়। বাঁধ উচ্চ হইলে জলও ফুলিয়া উঠে এবং বিলান জমি ডুবিয়া যায়। যাহারা সামান্য বিলান জমি জমা লইয়াছে, তাহারা স্বীয় অনিষ্ট দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের সামান্য অনিষ্ট যে না হয় তাহা নহে কিন্তু তাহাদের অনিষ্ট অপেক্ষা উপরের প্রচুর হৈমন্তিক ক্ষেত্রের জলাভাব নিবন্ধন প্রচুর অনিষ্ট হয়।

জলাভূমির ক্ষেত্রস্বামিগণ স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে জল রাখিবার জন্য, বাঁধ গোপনে বা প্রকাশ্যে কাটিয়া খাল, কাঁদোড় বা বিলের জল বাহির করিয়া দেয়। এই সকল 'বিলকাণা' জমিতে 'ছোমান-চাষ' করিতে পারিলে সর্ষপ, তোড়া, শোরগুঁজি, মটর, যব, ছুটা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—ইহা

কাল কর্দ্দমাক্ত সারবান মাটি (Dark clay soil)। কার্ত্তিকের আরম্ভে ইহার জল অপসারিত হইলে চাষ দিবার সুবিধা হয়। সুতরাং তাহারা আশ্বিন মাসে যাহাতে ঐ সকল জমির জল শুষ্ক হইয়া যায় তাহার জন্য বিলের বা খালের মোহানের বাঁধ কাটিয়া দেয়।

আশ্বিনমাসে সেই সকল নিম্ন ভূমি জলশূন্য হয় বটে কিন্তু ইহাতে 'বিলকাণার' জমিওয়ালাদের যেমন উপকার হয়, তাহা অপেক্ষা 'বিলকাণার' উপরের হৈমন্তিক কৃষকগণের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাহারা 'কেতারী'র জলকষ্ট নিবারণের কোন উপায় করিতে পারে না। সুতরাং মাঠকে মাঠ জলাভাবে শুষ্ক হইতে হয়। এই কারণে তাহারা বাঁধ বাঁধে ও বাঁধ রক্ষার উপায় করে। ইহাতে কৃষকগণের মধ্যে বিবাদ বাধে, লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধে এই প্রকার অশান্তি উৎপাদনের একমাত্র কারণ জমিদার মহাশয়গণের কিঞ্চিৎ লোভ নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ফসল নষ্ট ও জলাভাব কেবল বিলকাণার কোন কোন জমির বিলি বন্দোবস্ত নিবন্ধনই হয়।

যদি দুইজন জমিদারের জমি ঐ সীমান্তে পড়ে তাহা হইলে জমিদারে জমিদারেও বিবাদ বাধে। কেহ বাঁধ বাঁধেন, কেহ বা কাটিয়াদেন। এই উপলক্ষে যে কত মামলা মোকদ্দমা হয় তাহার তালিকা দেখিলে অর্থের অপব্যয়ের সংখ্যা উপলব্ধি হইবে।

এই কারণে খাল বিলের জলের অপচয় ও অপব্যবহার প্রায়ই হইয়া থাকে। ইহাতে

"স্বল্পক্ষতি মূলীভূত প্রশস্ত মঙ্গল।
তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিশ্চিত কেবল॥"

এই কথাই মনে পড়ে। দেশের 'অর্জ্জিত জলকষ্ট' কীদৃশ ভাবে উপস্থিত হয় তাহার অনুসন্ধান প্রজাহিতৈষী জমিদার মহোদয়গণকে চিন্তা করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না।

বিলান জমির কথা এই সমস্যার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। উপরে হৈমন্তিক ক্ষেত্র, তাহার নিম্নে তাদই, কলাই, মটর, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্র, তন্নিম্নে আমনের ক্ষেত এবং সকলের নিম্নে বিলতল পার্শ্বে 'বোরো' ধানের ক্ষেত।

এই সকল ক্ষেত্রই প্রজাবিলি থাকে। সকলের স্বার্থ পৃথক্ পৃথক্; কাহার জলের আবশ্যক, কাহার নাই কাহার কার্ত্তিক মাসেই জলের টান পড়া প্রয়োজন। এই প্রকার বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে, জলের অপচয় করা হয়।

তদুপরি বিল, খাল ও জলা জমিতে 'মাছের মহল' বিলি আছে, তাহাতে জমিদারগণের দশ টাকা ঘরে প্রবেশ করে। যাহারা মাছের মহল জমা লয় তাহাদের বিল খালে বর্ষার প্রারম্ভেই জল প্রবেশ পথ উন্মুক্ত রাখিতে হয়। কারণ তাহা হইলে প্রথম জলের স্রোতে বড় বড় মাছ বিলে প্রবেশ করে ও তাহাদের জালে পড়ে। ইহাতে ধীবরগণের দশ টাকা লাভ হয় কিন্তু আমন, হৈমন্তিক ও তাদই ক্ষেত্রের ফসলের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। সে সর্ব্বজনীন অনিষ্ট বড় সামান্য নহে, কিন্তু মাছমহলের আয়টি রক্ষার জন্য ধীবরদিগকে সে জন্য কোনই 'কৈফিয়ৎ' দিতে হয় না।

এদিকে যেমন বর্ষার প্রারম্ভে জল প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়, বর্ষান্তে তদ্রূপ ধীবরগণ, যাহাতে বিল খালের জল শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করে। তাহাতে বিলের জল শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। বিলের জল বহির্গত হইবার সময় ধীবরগণের জালে প্রচুর মাছ পড়ে, তাহারা জল বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে বিলকাণা জমি ও বোরা ও আমনের উপকারও হয়। কিন্তু হৈমন্তিকের প্রভূত ক্ষতি হয়।

বিলে জল পূর্ণ থাকিলে ম্যালেরিয়া হয়, না, বিলের জল শীঘ্র পচিয়া উঠে। দেশে ম্যালেরিয়া এই কারণে কার্ত্তিকে প্রবল হয়। কাত্তন চৈত্রে বিলের জল মরিয়া যাইলে—অল্পজলে মাছ ধরিবার সুবিধা হয় বলিয়া ধীবরগণ বিলের জল বাহির করে।

যে বিলে জল পূর্ণ থাকে কার্ত্তিক মাসে

তথায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কম থাকে। বিল ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাইতেছে। কোন কোন বিলের তলভূমি পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিলের জল যতনীঘ্র পারা যায় তত নীঘ্র বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে হৈমন্তিক জমি প্রায়ই অজন্মা হয়। এবং উহার মূল্য কমে। দেশের কৃষকগণ বলেন উচ্চ জমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা হতাদরে পতিত ছিল এখন বিলান জমি জল নিকাশের জন্য উর্ব্বর কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। আওল জমি উচ্চ হইয়া পড়িতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের আবাদি জমি অনেক সময় এই কারণে পতিত হইয়া থাকে।

জমির আদর বাড়িতেছে বা জমি হ্রাস পাইতেছে এ সমস্যার মীমাংসা এ স্থলে করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দেখিতে পাইতেছি যোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই কারণে বর্ত্তমানে প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।

মেঠো পুষ্করিণীর জলের অপচয় ও অপব্যবহার

বর্ষার জল বা নদী প্রভৃতির জল দ্বারা পুষ্করিণী পূর্ণ করা প্রাচীন কৃষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান ছিল। জমিতে জল রাখিবার পূর্ব্বে তাঁহারা পুষ্করিণীতে অগ্রে জল সঞ্চয় করিতে আগ্রহ ও যত্ন করিতেন।

বর্ত্তমানকালে কৃষকগণ এই সনাতন প্রথার নিয়ম গুলিতে যে উদাসীন তাহা মাঠের পুকুর গুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে। অধিকাংশ মেঠোপুকুর গুলির 'পাড়' প্রায় সমতল এবং কোন কোন স্থলে কৃষিক্ষেত্রে পরিণতি নিবন্ধন বর্ষার জলে পাহাড়ের মাটি ধৌত হইয়া জলাশয়ে পতিত হইতে হইতে পুকুর ভরাট হইয়া পড়িতেছে। মেঠো পুকুরের মোহানা বড় ও উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জল সঞ্চিত করিবার ভাল বন্দোবস্ত নাই। জমিলে মোহানা দিয়া বাহির হইয়া যায়। মাঠের পুকুরে কার্ত্তিকে 'আড়া' দিয়া জল বাহির করা হয়। কেতারী হইলে দেখিতে দেখিতে মেঠোপুকুরের সামান্য সঞ্চিত জল তুলিয়া লওয়া হয়। কেহ পায়, কাহার কম হয়, কাহার কিছুই হয় না। 'ছেঁচা জল ও মিছা কথা স্থায়ী নহে'—কেতারির টান মাঠের পুকুরে থুচাইতে পারে না। সুতরাং ধান দাঁড়াইয়া মরে। যোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই প্রকারে হয়।

কোন কোন বৎসর কেতারি যদি কম হয়, তাহা হইলে মেঠো পুকুরে জল জমিয়া থাকে। ঐ জল যদি রাখিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে পরবৎসর প্রথম বর্ষাতেই পুকুর পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চিত করিয়া রাখাও হয়। প্রত্যেক বৎসর কিছু বৃষ্টি সমান হয় না। কোন বৎসর বেশী, কোন বৎসর কম হয়। পূর্ব্ব বৎসরের জল থাকিলে অল্প বৃষ্টিতে যত্ন করিয়া জল ধরাইলে পুকুর ভরিতে পারে। কিন্তু শীতান্তে মেঠো পুকুরের মাছ ধরিবার জন্য জল ছেঁচিয়া জল শূন্য করা হয়। সুতরাং সেই জল 'না দেবার না ধর্ম্মার' অপচয় হইয়া যায়। পর বৎসরে যোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই প্রকারে পূর্ব্ব বৎসরে অর্জ্জিত করিয়া রাখা হয়।

পল্লী পুষ্করিণীর জলের অপচয় ও অপব্যবহার

পল্লী পুষ্করিণী যে জলপূর্ণ রাখিতে হয়, একথা পল্লীবাসিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। কিন্তু 'স্বার্থ বড় বালাই'—এই 'বালাই' দূর না হইলে পল্লীর শ্রী ফিরিবে না ইহা সুনিশ্চয়।

রাঢ় দেশের সমুদায় প্রাচীন পল্লীতে সংখ্যায় যথেষ্ট পুষ্করিণী আছে। সংখ্যাগত ভাবে পুষ্করিণীর অভাব নাই এ কথা সত্য। কিন্তু একটি পুষ্করিণীও পরিষ্কার আছে কি না সন্দেহ। পুষ্করিণীতে প্রচুর জলও যে নাই তাহা নহে। তত্রাচ সুপেয় জলের একান্ত অভাব।

পূর্ব্বে জল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কৃষি সাধন সম্বন্ধে 'যোপার্জ্জিত জলকষ্টের' কথাই অধিক। এক্ষণে যাহা বলা হইবে তাহা পানীয় ও পল্লীর ব্যবহার্য্য জলের কথাই অধিক থাকিবে।

পল্লীর কেন্দ্রগত পুষ্করিণী

পল্লীর মধ্যভাগে যে সকল ছোট বড় জলাধার আছে, তাহার অবস্থা যে কীদৃশ

ভীষণ তাহা পল্লীভ্রমণকারী মাত্রেই অবগত আছেন।

খিড়কী পুকুর

প্রত্যেক পাড়ার মধ্যে এক বা একাধিক 'খিড়কী' আছে। তাহা কদাচিৎ পরিষ্কৃত থাকে। কচু, ঘেচো, কলমী, পানা প্রভৃতিতে জল কখন সূর্য্যের আলোক ও বাতাস প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থদের বাটীর নর্দ্দমার জল গড়াইয়া ঐ সকল খিড়কীতে গিয়া পড়ে। 'খারের' কাপড় কাচা হয়। শিশুদের বিষ্ঠার 'ছড়া' প্রভৃতিরা ঐ খিড়কীর ধারে ফেলিয়া থাকেন। থাল বাসন ধৌত করা হয়। রমণীগণ খিড়কীর জলে প্রস্রাব ত্যাগ করেন। খিড়কীর জলে গাছের পাতা পচিয়া ভট্ ভট্ করে।

খিড়কীর পুকুর গুলির প্রায়ই পঙ্কোদ্ধার হয় না; তদুপরি বাঁশ, বাকারী ঐ জলেই ডুবাইয়া পচান হয়। বাঁশ বাকারী না পচাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করিলে 'ঘুণ' ধরে। বাঁশ বাকারী পচাইয়া, গৃহটি যে সুদৃঢ় করা হয় তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু যাহারা ঘরে বাস করিবেন তাঁহারা কিন্তু ঐ খিড়কীর ধারে বাস নিবন্ধন ও উক্ত পচা দুর্গন্ধ জলের অপব্যবহার করিয়া যমালয়ে বাস করিবার জন্য ব্যস্ত হন।

মলমূত্র লিপ্ত বস্ত্রাদি ঐ খিড়কীর জলেই 'কাচা' হয় আবার ঐ জলেই থাল বাসন মাজাঘষা করিয়া পরিষ্কার করা হয়।

কখন কখন খিড়কীর জল শুষ্ক হইয়া যায়। তখন পুকুরের মধ্যভাগে গর্ত্ত কাটিয়া নিম্নস্তরের চোঁয়াট জল সঞ্চিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। এই সকল গর্ত্তকে 'চুয়ো' বলে। এ জল যেমন দুর্গন্ধ তদ্রূপ বিবর্ণ—ইহাতে রমণীগণ প্রস্রাবও ত্যাগ করেন মুখেও দেন, কুলকুচাও করেন। থাল বাসন মাজিয়া ধৌত করিবার জন্য ঐ 'চুয়া' কাটা হয়। খিড়কী বড় ও ছোট হয়। ব্যক্তিগত বেড়া দেওয়া খিড়কীর জল পরিষ্কার থাকে অর্থাৎ মাছ ছাড়া হয় বলিয়া জলজ উদ্ভিদ্ বিহীন রাখা হয়।

পল্লীবাসীর স্নানের পুষ্করিণী

পল্লীবাসীর স্নানের পুষ্করিণী বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। অনেকেই খিড়কীর জলে স্নান করেন। খিড়কী অপেক্ষা বড় অথচ ঐ জাতীয় জলাশয়ে পল্লীর অনেক 'শুচিবাই'-গ্রস্তা রমণীরা স্নান করেন। কাপড় কাচেন, মলমূত্র লিপ্ত বস্ত্র ধৌত করেন, বাঁশ ভিজান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কাজ হয়। গ্রামের বাগ্দী, ডুলেরা ঐ জলে প্রায়ই স্নান করে। ভদ্র লোকের মধ্যে বহু স্ত্রীলোককে স্নান করিতে দেখা যায়। ঐ জলাশয়ে জেলেরা মাছের আবাদ করে। সোণার তেলায় চাপিয়া প্রায় প্রতিদিন 'জাল দিঠায়' চুনোমাছ ধরে। কখন জলজ উদ্ভিদ দাম হইতে মুক্ত থাকে কখন 'খুদি পানা'য় পূর্ণ হইয়া যায়। জলে 'আইসুটে' গন্ধ ছাড়ে। এই প্রকার বড় খিড়কী পুকুরের 'পাষায়' মলত্যাগ করা চিরপ্রসিদ্ধ। পাড়ে পাড়ার ছেলেরা জল বাঁধিয়া মলত্যাগ করে। বর্ষার প্রথম জল পল্লীধৌত করিয়া, পুকুরে সঞ্চিত হয়। এই জলে গাত্র ধৌত ও স্নান, ছেলে বুড়ো সকলেই করে। বর্ষার প্রথমে 'চোখ-ওঠা' কর্ণমূল ফোলা প্রভৃতি ব্যাধি ঐ জল হইতেই লাভ হয়।

গ্রামে কলেরা, বসন্ত হইলে ঐ জলেই উক্ত রোগিগণের বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়। স্ব-ইচ্ছায় খিড়কীর জলে বিষ ঢালিয়া দূষিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। স্বোপার্জ্জিত দূষিত জল এই প্রকারে পল্লীবাসভবনকে কলুষিত করে।

গরু বাছুরের স্নান ঐ জলেই সমাধা হয়। ঐ জলে রন্ধনাদি ব্যাপার সমাধা হয়। এই যে সকল স্বোপার্জ্জিত জলকষ্টের কথা বলা হইল —ইহার এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত বা স্বকপোল কল্পিত নহে প্রত্যক্ষ ও ভুয়োদর্শনের ফল। আবশ্যক মত এই জলে 'শণ' পচান হয়। শণ কাচা হয়।

গ্রামের অব্যবহিত পার্শ্বে যে বড় পুকুর থাকে তাহার জলে পল্লীবাসীর সকলেই স্নান করেন। বস্ত্রও ধৌত করেন, গরু বাছুরের স্নানও হয়। ঐ জল কলসীপূর্ণ করিয়া রমণীরা গৃহে আনয়ন করেন তাহা পান করা হয়।

বাঙ্গালীর মত জল সম্বন্ধে উদাসীন জাতি ভারতে আর নাই। জলের অপব্যবহার ও অপচয়ে এতাদৃশ নিরুদ্যম জাতি অতি বিরল। কিন্তু জল যেমনই হউক না তাহাতে হস্তপদ ধৌত স্নান দ্বারা বাঙ্গালীই শুদ্ধ হইতে জানেন।

যে পুষ্করিণীর জলে স্নান, সেই জলেই বস্ত্রাদি ধৌত করণ এবং পানার্থে আনয়ন করা পল্লীবাসীর অভ্যাস অধিকাংশ পল্লী-গ্রামের স্নানের পুষ্করিণী জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ—জলাশয়ের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত উদ্ভিদ শূন্য দেখায় কিন্তু নানান জাতীয় শৈবালে জলগর্ভ পরিপূর্ণ থাকে চলিত কথায় ঐ প্রকার শৈবালকে 'গ্যাজ' বলে। পল্লী পুষ্করিণীর জল পান করে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায় ইহাকে দেশের লোকে 'গেঁজো গন্ধ' বলে।

সময়ে সময়ে ঐ 'গ্যাজ' পচিয়া জলে ভীষণ দুর্গন্ধ হয় এবং জলের বর্ণ 'কষ' জলের মত 'লালচে' দেখায়। বিশেষ যে পুকুরে 'পানিফলের' লতা আছে, তাহার জল পরিষ্কার থাকে বটে কিন্তু বড়ই দুর্গন্ধ হয়। পানিফল, 'পাতাড়ি' শালুক, কুমুদ, পদ্ম পাতা লতা পচিয়া জল অতি কদর্য্য হইয়া উঠে।

অধিকাংশ বড় দীঘি চিরজলজ উদ্ভিদে এবং 'গ্যাজে' পূর্ণ। ঐ জলই সুপেয় পানীয়জল বলিয়া পল্লীগ্রামে বিখ্যাত।

কোন কোন পুষ্করিণীতে বাঁধাঘাট আছে কিন্তু তাহার পাহাড়ে তেঁতুল গাছে স্থানটিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তেঁতুল পাতা এবং তেঁতুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়া জল পচাইয়া তুলে। তেঁতুল আম বাগান পল্লীপুষ্করিণীর 'আপদ'। ঐ বৃক্ষনিচয়ের পত্রাদি জলে পড়িয়া জলকে পচাইয়া তুলে।

যে পুষ্করিণী পরিষ্কার বা কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক পঙ্কোদ্ধৃত হইয়াছেন তাহার জল হয় ঘোলা না হয় পরিষ্কার। তাহাতে প্রচুর মাছের চাষ আছে। মাঝে মাঝে জাল দিয়া মাছ ধরাইবার জন্য বর্ষার জল 'কানায় কানায়' করিয়া পূর্ণ করা হয় না। পুষ্করিণীপূর্ণ জল থাকিলে তাহাতে মাছ ধরিবার অসুবিধা হয়। যদি ঐ সকল পুকুর 'জেলে বিলি' থাকে তাহা হইলে বহুবার মাছ ধরা হয়।

গো ভাগাড় অনেক স্থানের পুষ্করিণীর নিকটেই থাকে। গো ভাগাড় ধৌত জল স্নানের পুষ্করিণীতে পড়ে। শ্মশানও অনেক পুষ্করিণীর তীরে থাকে। তাহার জল স্নানের পুকুরে পড়ে।

প্রত্যেক পুষ্করিণীর মোহানায় মাছ ধরিবার 'আড়' আছে। বর্ষার জল প্রবেশ কালে আড়া দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে জলপূর্ণ করা হয়। পুষ্করিণী জলপূর্ণ হইলে শেষে আবার 'আড়া' দিয়া 'মাছের লোভে' জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং দুই এক বৎসর কম বর্ষা হইলে পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইয়া যায়। 'স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট ইত্যাদি প্রকারে পল্লীভবনে উপস্থিত হয়।

এমন বহু ক্ষুদ্র পল্লী আছে যে তাহার দুই তিনটির বেশী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুকুর নাই। তাহাতেই পল্লীর সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ধল দাম ও মধ্যপুকুর প্রত্যেক পল্লীতে দৃষ্ট হয়। একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া—জীবনধারণের মূল যে জল তাহা ভাল রাখিতে কেহই যত্নশীল নহেন। ইচ্ছা করিয়া জলের অপচয় অপব্যবহার ও দূষিত করিয়া জলকষ্ট উৎপাদন করা হয়।

পল্লীপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী জলে দরিদ্রগণ শব নিক্ষেপ করে। অনেকে নদীর জলপার্শ্বে কিঞ্চিৎ গর্ত্ত করিয়া শব প্রোথিত করে। শৃগালে ঐ শব তুলিয়া জল স্থল অপবিত্র করিয়া তুলে।

মাঠে বা কৃষিক্ষেত্রে জলকষ্ট হইলে যে সকল স্নান পানের পুষ্করিণীতে 'ছেঁচ' নাই অর্থ গ্রহণ করিয়া পুষ্করিণীর মালিক তাহার জল বিক্রয় করেন। পানীয় জল কৃষিসাধন উদ্দেশে বিক্রিত বা ব্যয়িত হইয়া যায়। স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট দেখা দেয়।

দেশের লোক ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানে সুস্থ মেজাজে স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট আনয়ন করেন। এই স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট হইতে দেশকে রক্ষা করা না করা এক মাত্র দেশের লোকের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। আমরা জলকষ্ট উপার্জ্জন করি—এউপার্জ্জনে আমরা সিদ্ধহস্ত। জলকষ্ট দূর করিতে আমরা উদাসীন।

আমরা ইহা সমুদ্রসার হইতে ত্যাগবলের মহিমা দেখাইয়া মুক্ত পুরুষবৎ অবস্থান করিতেছি। কেবল চীৎকার করিতে শিখিয়াছি—ওগো আমরা 'স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট' আনিতে শিখিয়াছি—মরিতে শিখিয়াছি—তোমরা যদি কেহ পার আমাদের 'স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট' দূর করিতে আইস। আমরা কিন্তু অন্নকষ্ট উপার্জ্জন করি। তোমরা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের ভিতরের মরণা দৌড় করিয়া দিয়া যাও!

শ্রীহরিদাস পালিত।

সাহিত্য পরিচয়

"প্রাচীন মুদ্রা"—(প্রথম ভাগ) শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

উক্ত নামক গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোনও ভাষায় আজ পর্য্যন্ত মুদ্রাতত্ত্বের উপর কোনও গ্রন্থ বাহির হয় নাই; এ কারণে ইহা ত সাদরে গৃহীত হইবেই। অধিকন্তু, ইহা অদ্ভুত হইবার আরও কারণ আছে। যদিও মুদ্রাতত্ত্বের দুর্গম ক্ষেত্রে নবীন অনুসন্ধিৎসুর জন্য পুস্তকটি রচিত, তথাপি এত প্রাঞ্জলভাবে লিখিত যে ইহা এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেরই সুবোধ্য হইতে পারে। গ্রন্থকারকে যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার প্রমাণ পুস্তকটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত হয়। আয়তনে বৃহৎ না হইলেও য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত মুদ্রাতত্ত্ববিষয়ক আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত গ্রন্থই ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনকালের নিষ্ক, সুবর্ণ, পুরাণ, কার্ষাপণ প্রভৃতি মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীকরাজগণের ভারত রাজত্বকালের মুদ্রা, শক ও কুষণবংশীয় নরপতিবর্গের মুদ্রা, জনপদ ও গণসমূহের মুদ্রা, গুপ্ত সম্রাটগণের ও সৌরাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মুদ্রা ও এরূপ আরও অনেক মুদ্রাবিষয়ক তথ্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। ভারতে যে সমস্ত দেশ প্রজাতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হইত তথায় কিরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহা "জনপদ ও গণসমূহের মুদ্রা" নামক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার মুদ্রার কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর অনেক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন যথা পাশ্চাত্য দেশে নিষ্কেলের আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ভারতে ইহার প্রচলন, আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ, পল্লবদিগের অর্ণবপোত অঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে তাহাদের বিদেশে বাণিজ্যার্থে গমন প্রভৃতি। গ্রন্থের শেষ ভাগে বহুসংখ্যক মুদ্রার চিত্র, পত্রে পত্রে অত্যাবশ্যকীয় পাদটীকা ও সমগ্র পুস্তকের একটি বর্ণানুক্রমিক নামসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সহিত একটি বিষয় সূচী থাকিলে ভাল হইত। মুদ্রার চিত্রগুলি গ্রন্থের শেষ ভাগে থাকায় জন্য পড়িবার সময় গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত মুদ্রার সহিত উহার চিত্রটি মিলাইয়া দেখিবার বড় অসুবিধা বোধ করিতে হয়। যদি গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়ের মুদ্রার চিত্র সেই অধ্যায়ের অব্যবহিত পরেই দিতেন তাহা হইলে পাঠকের অধিক সুবিধা হইত বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রাচীন হিন্দুদিগের মুদ্রার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার আলোচনা আরও কিছু বিশদ ও বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। যে অনুপাতে তিনি অপর দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সেই অনুপাতে ও বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের এই অংশটি আরও কিছু বৃহৎ হইলে পাঠকের অভিলাষ মিটিত।

১৮৩ পৃষ্ঠায় ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে পল্লবগণের "প্রাচীন মুদ্রা অন্ধ্ররাজগণের অনুরূপ। ইহাতে এক দিকে বৃষ ও অপর দিকে মৃক্ষ অর্ণবপোত, তারকা····দেখিতে পাওয়া যায়।" কিন্তু অন্ধ্রগণের মুদ্রার বিষয়ে বলিতে গিয়া তিনি তাহাদের অর্ণবপোতের চিত্রযুক্ত, মুদ্রার উল্লেখ করেন নাই। অন্ধ্রগণের অর্ণবপোত যুক্ত যে তিন চারিটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়া উচিত।

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লী প্রসঙ্গ

(মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক)

চাকুরিকে অতিমাত্রায় আদর করিতে করিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই মাসন্থের লালসায় ব্রাহ্মণ সন্তান নীচসংসর্গে যেখানে সেখানে পাচকের কাজ করিতেছে। কায়স্থ সন্তান স্থান অস্থান জ্ঞান না করিয়া ভাণ্ডারী খানসামা ইত্যাদির কার্য্যেও লজ্জা বোধ করিতেছে না। "ভাল মাহুষ" মুসলমান তনয় পেয়াদা, চাপরাসী প্রভৃতির কার্য্যে কুণ্ঠিত নহেন। এখনও বঙ্গে ১৫।২০ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করিলে একটী ক্ষুদ্র পরিবারের অন্নচিন্তা করিতে হয় না। অধিকাংশ ভদ্র সন্তানেরই কিন্তু ঐ সংস্থানটুকু আছে। থাকিলে হইবে কি? ওটী যে চাষার কাজ! তবে সেগুলি বর্গাদারের হাতে দিয়া "স্বত্বী ও প্রবাসী" হইয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পাচক, ভাণ্ডারী, সর্দ্দার, পেয়াদা প্রভৃতির কার্য্যেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

এখন একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভদ্রলোক নিজে হল চালনা না করুক, মজুর রাখিয়াও ত নিজ নিজ জমিতে চাষ আবাদ করাইতে পারেন। এ কথার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি, আজ কাল কৃষি-মজুর, ঠাকুরের চেয়েও মাননীয় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে, যে মূল্যে চাকর পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহাদের বেতন ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক স্থলেই ছ'মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া চাকর রাখিতে হয়। পরন্তু তাহাদের কাপড়, গামছা, মাহিয়ানা ইত্যাদি যতটুকু প্রাপ্য চাহিবামাত্র না দিলে পরদিন তৈল,হস্ত তাহার বাটী পর্য্যন্ত গিয়াও ফিরাইয়া আনা দায় হইয়া উঠে। অনেক স্থলে মুসলমান মজুর হিন্দুর কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের অনেকেই এখন হিন্দুর ভাত খাওয়া মূল্য বিবেচনা করে। পরিবারের দশজনের সহিত একটী লোক বসিয়া খাইলে তাহার জন্য ভাবিতে হয় না। কিন্তু খোরাকীর জন্য পৃথক বন্দোবস্ত বা রৌপ্য মুদ্রা ঘর হইতে বাহির করিতে হইলে অর্থহানি এবং কার্য্য নষ্ট হইয়া থাকে। তাই এখন মজুর দ্বারা কাজ করান এক কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। অপর নিজ হস্তে কাজ করিলে কাজটী যেরূপ সুচারুরূপে হইয়া থাকে, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাহার অর্দ্ধেকও হয় না। নিজের ভাবিয়া কাজ করে, এখনকার দিনে সেরূপ চাকর সুদুর্লভ। যাহাদের জমি জমা বেশী থাকে, চাকর রাখিয়া কাজ তাহাদেরই পোষায়। অপর সামান্য জমিতে এইরূপ আটসাট্টা করিতে গেলে লাভের গুড়টুকু পিপড়াতেই খাইয়া ফেলে। জমির মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে জমি সংগ্রহ করাও আজ কাল সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে।

যে সমস্ত মধ্যবিত্ত লোক এতদিন তালুক, দরতালুক, ব্রহ্মোত্তর বা অন্যান্য নিষ্কর সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া একবারে দিন কাটাইতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দিন দিন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, কি চাকরের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সম্পত্তির আয় বাড়িতেছে না। দিন দিন বরং সরীকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাঁরাই বংশগৌরবে প্রাচীন বলিয়া আধুনিক ভদ্র শ্রেণীর উপর কটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এটা ছাড়িতে পারিব না ওটা ছাড়িলে লোক কি বলিবে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের ক্রিয়া কলাপ নষ্ট করিলে লোকের নিকট মুখ দেখান দায় হইবে এই সমস্ত বেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকের ভিটার মাটিটুকুও যায় যায় হইয়াছে। তবুও মানের মাত্রা ঠিক রাখিতে আমাদের অবসর নাই।

এইরূপ যেদিক দিয়াই দেখি না কেন সম্প্রতি মধ্যবিত্তের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

যে মধ্যবিত্তশ্রেণী এক সময়ে উচ্চ নীচ সমগ্র শ্রেণীর পরিচালক ছিল, আজ সেই শ্রেণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয় নাকি একদিন সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখনও সময় থাকিতে সমাজের অগ্রণীগণ ত বটেই গবর্ণমেণ্টকেও এই শ্রেণীর দুর্দ্দশার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই যে দেশে সেটেলমেণ্ট হইয়া খরচা আদায় হইতেছে, ইহাতে জমিদার ও কৃষককুলের উপর বেশী কিছু পড়াইতেছে না। কিন্তু মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট মধ্যবিত্তের খরচাই বেশী দিতে হইতেছে। এই স্বত্ব অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অতি কমই আছে। গবর্ণমেণ্ট কৃষি প্রজার জন্য অনেক সুবিধা করিয়াছেন। কিন্তু বিপন্ন মধ্যবিত্তের দুর্দ্দশা একটুও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না।

এই সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদিগেরও নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভদ্রতার হানি বলিয়া যে কথাটা চলিতেছে—তাহার মূল্য অতি অল্প। আর যদি সমস্ত ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজের কাজ নিজে করে নিজের জমিতে চাষ আবাদ করে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অগ্রসর হয় নিজের মোট হাতে করিয়া বহিয়া লয় তাহা হইলে কালে সেইটীই ভদ্রতাসূচক হইয়া দাঁড়াইবে। যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে তাহাতে এসব না করিলে আমাদের ভদ্রতা নাই। চাকুরী চাকুরী করিয়া ফিরিলে আর চলিবে না। বঙ্গমাতার শস্য শ্যামল অঙ্কে বাস করিয়া যে কৃষিকার্য্যকে অবহেলা করে সে প্রকৃতই মাতার কুসন্তান। একটু স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে কৃষিকার্য্য চাকুরী হইতে সহস্রগুণে সম্ভ্রমসূচক। আমাদের আর্য্যনাম কৃষিকার্য্য হইতেই হইয়াছে। এই সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিও মনোনিবেশ করিতে হইবে। যতদিন মধ্যবিত্ত ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ইত্যাদির দিকে ধাবিত না হইবে, ততদিন তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। আর যতদিন এটীতে ভদ্রতা হানি, ওটীতে সম্মান হানি ভাবিবেন, ততদিন তাঁহাদের পদে পদে ঠকিতে হইবে। "নিজের কাজে দোষ নাই।" এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করতঃ যেদিন হইতে মধ্যবিত্ত নিজের সমস্ত কার্য্য অম্লান বদনে দশের সাক্ষাতে করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না, সেই দিন হইতে মধ্যবিত্তের আবার পূর্ব্ব গৌরব ফুটিয়া উঠিবে।

সুরাজ।

২। দেশ ব্যাপী জলকষ্ট

ব্যাধি প্রপীড়িত বঙ্গের জলাভাব চিরসহচর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কয়েক মাস বারিপাত না হইলেই বঙ্গ পল্লি শতমুখী হইয়া "জল" "জল" বলিয়া চীৎকার করে ইহা আমরা প্রতি বৎসর দেখিতেছি। দুইচারিটা সহরে সুপেয় জল সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু দুই চারিটা সহর লইয়া ত আর বাঙ্গালা নয়; দুই চারিটা সহরে পরিষ্কৃত-জল সরবরাহের জন্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলেই বঙ্গের জলাভাব বিদূরিত হইল ইহা ত মনে করিলে চলিবে না; এক বার বঙ্গের পল্লিগ্রামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহারা কিরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত। আর পল্লিগ্রাম লইয়াই বাঙ্গালা; পল্লিগ্রামই বঙ্গের প্রাণ, সহর বাহিরের চাকচিক্য মাত্র; পল্লিগ্রামই বাঙ্গালা-মহীরুহের মূল, সহরগুলি তাহার দুই চারিটা ফুল মাত্র। মূল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দুই চারিটা ফুলের বাহার লইয়া কি করিব!

চীৎকার বহুবার করিয়াছি, আবার করিতেছি, কিন্তু এ যেন অরণ্যে রোদন হইতেছে। কে না দেখিতেছে কে না বুঝিতেছে। বৃষ্টির অভাবে প্রায় সমগ্র বাঙ্গালায় ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইতেছে। সংবাদ পত্রে নিত্য এই জলকষ্টের হৃদয়বিদারক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে কে না তাহা দেখিতেছে। বঙ্গের দুই চারিটা ভাগ্যবান পল্লি ভিন্ন যাবতীয় পল্লি একবাক্যে সমস্বরে এই করুণ বেদনা জানাইতেছে যে "গ্রামে একটীও ভাল পুষ্করিণী নাই; যাহা ছিল তাহা বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে; পঙ্কিল জলে পিপাসা নিবারণ করিতে হইতেছে; ভদ্রমহিলাগণকে দুই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া জল আনিতে হইতেছে ইত্যাদি।" এই কথাই

সর্ব্বস্থান হইতে উঠিতেছে, ইহা ত আমরা প্রত্যহই শুনিতেছি।

কিন্তু শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়া, আমরা কি করিতেছি। কিছুই করিতেছি না। আমরা এরূপ নির্লজ্জ হইয়া গিয়াছি, যে এ কথা বলিতে জিহ্বা জড়তা প্রাপ্তও হইতেছে না। আমাদের অন্তর এতই কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে মুখে আমরা দেশভক্ত স্বদেশ বৎসল, দেশের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর এইরূপ নানা রসাল রসাল লম্বা চওড়া বাক্যে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেছি, মহাসমিতি প্রাদেশিক সমিতি, জেলা সমিতি কতই সমিতির গঠন করিতেছি, কিন্তু কার্য্যের সময় আমাদের টিকি দেখিতে পাইবে না। ফুমীরের কান্না কাঁদিয়া লোক ভুলাইতেছি। দেশের লোক সুপেয় জলের অভাবে পিপাসাকুলিত হইতেছে চাতক পাখীর ন্যায় "ফটীক জল" "ফটীক জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, প্রতিকারের প্রকৃত ব্যবস্থা কি করিতেছি?

সম্মিলিত চেষ্টায় যে ফল হয় না ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না। পল্লিগ্রামের জল কষ্ট দূর করা অবশ্য সহজ ব্যাপার নহে, সবিশেষ ব্যয় সাধ্য, মানি; কিন্তু উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে যে দুর্দ্দশা বর্দ্ধিতই হইবে। দেশে সদাশয় ধনাঢ্য লোকের ত অভাব নাই; উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সম্মানার্থ সান্ধ্য সম্মিলন, উদ্যান সম্মিলনে অকাতরে অর্থব্যয় করিবার লোকের ত অভাব দেখিতে পাই না; শাসন কর্ত্তৃগণের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না এরূপ অর্থশালী ব্যক্তিও ত বিরল নহে। বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নগর বাসের লোভ সম্বরণে আসক্ত এরূপ রাজা জমীদারের অভাব ত দেখিতে পাই না। ইহারা মন করিলে কি দেশের এই জলাভাব দূর করিতে পারেন না? তাঁহারা যে সকল রাজপুরুষের সম্মানার্থ সান্ধ্য সম্মিলন উদ্যান সম্মিলন প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করেন, তাঁহাদের নামে জলাভাবক্লিষ্ট জনপদে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিউন না; এস্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী-কল্প হইয়া থাকিবে প্রস্তর মূর্ত্তিতে অর্থব্যয় না করিয়া দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভক্তিভাজন শাসনকর্ত্তৃগণের নামে তাহার নামকরণ করিয়া দিউন না এইরূপ করিলে যে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে নগরে বাসের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আপন আপন জমীদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহের উন্নতিবিধান করুন না। ইহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্য করেন তাহা হইলে অচিরেই দেশের জলকষ্ট বিদূরিত হইবেই হইবে।

মনের আবেগে আমরা কত কথাই বলি; হইতে পারে অনেকে মনে করিবেন এ সকল প্রস্তাব "কাগজে কলমে" বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। সহজ অবশ্য নয়, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। মোট কথা জলাভাবে বঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, অধিকাংশ ব্যাধিই সুপেয় জলের অভাব হইতে উৎপত্তি লাভ করে, ইহা বিশেষজ্ঞগণের মত। দেশে পানীয় জলের সংস্থান হউক, দেখিবে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। আর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা ভাল নহে। স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রাপ্তির আশায়, আমরা নাচিয়া উঠিতেছি অথচ আমাদের দেশের এই নিদারুণ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে না। এ কলঙ্ক কালিমা অঙ্গের ভূষণ করিয়া আর কত দিন থাকিব।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, আষাঢ়	নবম সংখ্যা।

আলোচনা

১। সাহিত্যের দুর্দ্দিন

ভাবিয়াছিলাম সাহিত্য-সম্মেলন লইয়া আর আলোচনা করিব না। ধুরন্ধর সাহিত্যিকেরা এখন আর আমাদের কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন না তখন "আপন মান আপনি রাখ, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।" তাই এবারকার সম্মেলন সম্বন্ধে আমরা কোন উচ্চ বাচ্য করি নাই। কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া শেষে পুনরায় কলম ধরাটা শ্রেয় মনে করিলাম। আমরা পূর্ব্ব হইতেই চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে, সাহিত্য-সম্মেলন অচিরে কংগ্রেসের দশাপ্রাপ্ত হইবে। আমাদের উক্তি যে কথায় কথায় ফলিতেছে সেইটী আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব। আচ্ছা; জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের কি উদ্দেশ্য?

কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ? না কতকগুলি জাতিক বিদ্যাগর্ব্বী বিলাসী নাগরিকের নাম জাহির? আমরা জানি, সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয় লোকমত গঠনের জন্য সাধারণ্যে কোন বিষয়ের প্রচার অথবা সত্য আবিষ্কারের জন্য কোন বিষয় বা বিষয়সমূহের আলোচনা। আর সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য—সাহিত্যের প্রচার; কেন না—কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে আলোচনা আবশ্যক হয় তাহার জন্য সম্মেলনের প্রয়োজন কি? এত ছাপাখানা, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র, দৈনিক পত্র, এত স্কুল, কলেজ, সাহিত্য পরিষৎ, বিজ্ঞান পরিষৎ, অনুসন্ধান সমিতি, এত লাইব্রেরী, লেবরেটারী, ইন্‌স্টিটিউটের সাহায্যে কি সে কাজ সাধিত হয় না? দেশের টাকার অপব্যবহার চিন্তাশীল লেখা সাজিয়া কিরূপে যে যে তোমরা কর আমরা কিন্তু একটুও বুঝি না। তোমরা কি দেখিতেছ না তোমাদের জাতি আজ অনশনক্লিষ্ট, ছিন্নবাস! কত বিনিদ্র যামিনী তাহার সহচর! তোমরা কি বুঝিতেছ না যে, যে বিশাল বেদনা তাহার বুকের মধ্যে শেলের বেদনার মত বাজিতেছে তোমরা যদি তাহার প্রতীকারে যত্নবান না হও তাহা হইলে তাহার বিষম ফল একদিন তোমাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে? তোমরা না প্রচার করিয়া থাক 'মাৎস্যন্যায়-মপহিতুং—'?

* *
*

২। পূর্ব্ব কথা

এটাও গেল আমাদের মামুলী কথা। ইহার সার্থকতা ইতিমধ্যেই কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এখন তাই দেখাইতেছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে ঢাকায় একদল লোক 'পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের' নাম দিয়া নূতন একটা সম্মেলনের সৃষ্টি করিতেছে। বহুদিন হইতে ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। চট্টগ্রাম সম্মেলনে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একটা মতভেদের সূত্রপাত হয় পরে কলিকাতার সম্মেলনে তাহা স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, এই ভাবী সম্মেলনের সৃষ্টি কল্পনা ছাড়িয়া কার্য্যে পরিণত হইতে একটু দ্রুততার অবলম্বন করিয়াছে। কলিকাতার সাহিত্যিকেরা প্রথমে এই সম্মেলনে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বরাবরই ইহার পক্ষপাতী। কারণ, আমাদের কাছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য—প্রচার। সুতরাং উহার যতই অনুষ্ঠান হইবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তবে কলিকাতার সম্মেলনে, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকেরা সম্মেলনের শাখা বিভাগ লইয়া মতভেদ হইলে যখন সমর্থনকারীর সংখ্যাল্পতায় হারিয়া যান তখন হইতে বৈষয়িক অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এখানেও পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এই উভয় দলেই উভয় বঙ্গের লোকই আছেন। কিন্তু সাহিত্যসমাজে এই যে ঈর্ষ্যাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে ইহা গ্লানিকর। আমাদের মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনকে একদিন এই আগুণে পুড়িয়া মরিতেই হইবে; অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজনকারীরা সাবধান হইবেন। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকে যাহা চাহিতেছেন তাহাই সত্য তবে তাঁহারা কলিকাতা সম্মেলনে যে হারিয়া গিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ, সম্মেলন কলিকাতায় হইয়াছিল। কলিকাতাসহরব্যতীত অন্য কোন স্থানে সভার অনুষ্ঠান হইলে পূর্ব্ববঙ্গ-

বাসীরা জিতিতেন সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহারা যাহা চান আমাদের বিশ্বাস তাহাই বেশ চায়। এ বিষয়ে ইহার অধিক ইঙ্গিত করা প্রয়োজন বোধ করি না। যদি থাকে ভবিষ্যতে বলিব।

* * *

৩। নারী-নিগ্রহ

এবারকার সম্মেলন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু নির্ব্বিবাদে নয়। এবার সেখানে নারীনিগ্রহের পালা অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারটা নিতান্তই লজ্জাকর। নেতা সাহিত্যিকেরা! তোমরা ইহার একটা চরম মীমাংসা করিতে পার না? মাঝে মাঝে তোমরা যে স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রতি অযথা অসম্মান বর্ষণ করিতেছ ইহা কি পৌরুষ? ভারতবর্ষ এখনও সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয় নাই। এদেশে বহুদিন হইতে স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি যে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল বা রহিয়াছে তাহার দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে বা হইতেছে একথা আমরা মনে করি না। মানকুমারী এ পর্য্যন্ত কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন এমন আমরা শুনি নাই তাই বলিয়া কি তাঁহাকে কবি বলিয়া আমরা উচ্চে আসন দিতেছি না? পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে অবাধ মিলন হিন্দুর চোখে বিষদৃশ লাগে তাই যেখানে তাহারা হিন্দু জাতির মধ্যে এই মিলনের সমর্থন হইতে দেখে সেইখানে প্রতিবাদ করে। সুসংস্কার হোক আর কুসংস্কার হোক জাতি যখন একটা ধারণাকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিতে পারিতেছেনা তখন জোর করিয়া তাহাকে মুছিতেই হইবে এমন কি কথা? জোর করিয়া সংস্কার হয় না—সংস্কার হয় চরিত্র বলে।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক লেখিকা নামিয়াছেন তাঁহাদের লেখা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারা পুস্তকাদি রচনা করিতেছেন তাহা স্কুল কলেজের পাঠ্য হইতেছে। ইহাতেও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না? তাঁহাদের রচনাবলী অনেক সভাসমিতিতে অন্য কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে, ইহাতেও কি তাঁহারা আর মনে করিতে পারেন যে পুরুষেরা তাঁহাদের উন্নতিতে উদাসীন? যদি এমনই হয় তাহা হইলে সেও ত একটা ভ্রান্ত সংস্কার! আমরা আশাকরি, সাহিত্যসমাজের নেতারা এ দিকে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সত্বরই করিবেন।

* * *

৪। মন্দিরে প্রবেশ

আমাদের সমালোচনার তৃতীয় বিষয় সম্মেলন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিধি। বর্দ্ধমান সম্মেলন হইতে নিয়ম হইয়াছে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সম্মেলন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে দুই টাকা করিয়া নজর দিতে হইবে। দর্শকেরা এক টাকা মূল্যে টিকেট ক্রয় করিয়া সম্মেলন মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবার যশোহরে দেখিলাম অনেক প্রতিনিধিই বিনামূল্যে টিকেট ক্রয় করিয়াছেন। যাহারা আনাড়ী পল্লীবাসী অথবা টিকেট বিক্রেতার অপরিচিত তাহাদিগকেই টিকেট কিনিতে বাধ্য করা হইয়াছে। শুনিয়াছি যাঁহারা সাহিত্যিক অর্থাৎ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হন নাই কিম্বা কোন পরিষৎ বা সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হন নাই তাঁহারা যদি সম্মেলনে প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে বিনা দর্শ-

নীতে টিকিট পাইবেন এই রূপ একটা কথা ছিল কিন্তু আমরা ঠিক জানি দুই চারিজন ভদ্রলোককে এরূপ টিকেটের দাবী করিয়া অপদস্থ হইতে হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও যদি এইরূপ পক্ষপাত নীতি অনুসৃত হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে উহার অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্মেলনের কর্তাদিগকে অনুরোধকরি যেন ভবিষ্যতে তাঁহারা এই কুপ্রথা রহিত করিয়া সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে চেষ্টা করেন। যদি তাঁহারা এই নজর প্রথা রাখাই একান্ত আবশ্যক স্থির করেন তাহা হইলে যেন উহা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে প্রবর্ত্তিত হয়।

* *
*

৫। প্রবন্ধ সমস্যা

চতুর্থ কথা এবার সম্মেলনের প্রত্যেক শাখাতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের জন্য আসিয়াছিল। সময়াভাবে অবশ্য সবগুলির পাঠ সম্ভব নহে তাই কতকগুলি প্রবন্ধ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পঠিত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে অপঠিত প্রবন্ধের রচয়িতারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এই আশঙ্কায় বোধ হয় এবার একটা নূতন প্রস্তাব হইতেছিল যে প্রত্যেক শাখায় প্রবন্ধের পুরস্কার ঘোষণা করা হউক। যাঁহাদের প্রবন্ধ পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহারাই পাঠের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এই পাঠ সমস্যা মীমাংসা কি কঠিন তাহা ত আমরা বুঝি না। এইরূপ একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? সম্মেলনের দুই কি তিন মাস পূর্ব্বে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হইল তাহা সম্মেলন-সমিতি কর্ত্তৃক পঠিত ও অনুমোদিত হইলে সম্মেলনের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সমিতিতে আলোচনার জন্য রাখা হইল। পরে সভাপতিরা স্বীয় বিভাগীয় প্রবন্ধ গুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য উহাদিগকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির উপর পাঠের ভার দিলেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য স্থির করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সভায় জানাইলেন। সভাপতি সেইগুলিকে সভ্যমণ্ডলীর মতানুযায়ী তালিকা-বদ্ধ করিলেন। যদি তখনও প্রবন্ধ সংখ্যা এত অধিক হয় যে সভায় সবগুলির পাঠ শেষ হওয়া অসম্ভব তাহা হইলে সভাপতি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ হওয়া আবশ্যক ও সম্ভব বোধ করেন সেইগুলিই ঘোষণা করিয়া দিবেন ও অন্যগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে। ইহাতে কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না এবং সম্মেলনে নিম্নশ্রেণীর প্রবন্ধও খুব কমই আসিবে। প্রবন্ধ-তালিকা পাঠোরম্ভের পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক পাঠককে বড় বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের এই প্রস্তাবটী সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষ একবার ভাবিয়া দেখিবেন। মুখ দেখিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করাতে একদিকে সম্মেলনের যেমন ক্ষতি অন্যদিকে সভাপতিরও কলঙ্ক। আমরা দুই একটা প্রবন্ধের কথা জানি; সে গুলি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিবেচ্য প্রস্তাবে পূর্ণ ছিল কিন্তু তাহারা সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে আর এক দিকে চর্ব্বিত চর্ব্বন সমর্থিত হইয়াছে। এ গুলি কি সভাপতির যোগ্যতার পরিচায়ক?

* *
*

৬। ব্যক্তির প্রভুত্ব

সম্মেলন সাধারণের জিনিষ। সেখানে আমরা ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব দেখিতে চাহি না। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি কয়েকজন লোক সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা নিজেদের মতানুযায়ী সম্মেলনকে পরিচালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সভাপতির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রভাব আমরা কিছু বেশী অনুভব করিয়া থাকি। অনেকে তাঁহাদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে সভাপতি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষও সেই সেই মহাত্মাগণ সাদুগ্রহে আমাদের এই কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখিবেন। নব্য ধরণে সভাসমিতি করা আমরা প্রতীচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনুকরণেও যে সবিশেষ পটু হইতে পারি নাই তাহা ত আমরা ভাবি না। সভা সমিতি করিতেছ অথচ তাহার ধুরন্ধরগিরি করিতে পার না ইহা লজ্জার কথা নহে কি? বিশেষতঃ তোমরা হইলে দেশের শিক্ষিতশ্রেণী, দেশের উচ্চ স্তর, দেশের নিয়ন্তা তোমাদের যদি এই অবস্থা তাহা হইলে আমাদের এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা কোথায়?

* *
*

৭। শেষ জিজ্ঞাসা

শেষকালে একটি ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করি। অন্যান্য বারে আমরা দেখিয়া থাকি যেন ইতিহাস শাখাটা সম্মেলন দ্রুমের মাথার উপরে অন্য শাখাগুলিকে পরাভূত করিয়া কিছু বেশী রকম 'মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।' এবার হঠাৎ সে একটু খাটো হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গেল নাকি?

* *
*

৮। আত্মরক্ষা

নামের চটকে মেকি আসল বলিয়া চলিয়া যায়, অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে হয়। আত্মঘাতী স্বার্থপরতাকে বিজ্ঞতার মুখোস পরাইয়া "চাচা আপন বাচা" এই একটা উপদেশ বাক্য বাঙ্গালার অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পশুধর্ম্মী মানুষ স্বকৃত অন্যায়কে সমর্থন করিবার জন্য বরাবরই এই প্রবাদ বাক্যটার দোহাই দিয়াছে। দেবধর্ম্মী এ কথা কখন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু সমাজে দেবধর্ম্মী কয়জন আছে? "চাচা আপন বাঁচা"—এই নীতির অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী আজ কি বাঁচাইতে পারিয়াছে? যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালী আত্মহত্যা করিতেছে।

আত্মরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম। বৃক্ষলতাও নানা উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর পশু রাজ্যের ত কথাই নাই। পশুগণের হিংসাবৃত্তির কথা আলোচনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কারণ সেখানে পরস্পরের ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ। একে অপরকে আক্রমণ ও বধ করিয়া ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর নৃশংসতা মূলে আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই। মারামারি কাটাকাটি করিয়া সাহসী ও বলবান বাঁচিয়া থাকিবে এবং ভীরু ও দুর্ব্বলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি রাজ্যে আবহমান কাল ধরিয়া যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা হইয়া আসিতেছে। এখানে অযোগ্যের স্থান নাই।

মানুষের মধ্যেও যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটির অভাব নাই। যোগ্যতমের

প্রতিষ্ঠা ও অযোগ্যের ধ্বংস—যা পশুরাজ্যের নিয়ম—তা মনুষ্যরাজ্য সম্বন্ধেও খাটে তবে মানুষ ও পশুর যোগ্যতার লক্ষণগুলি যে একই তাহা অবশ্য কেহই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কারণ তাহা হইলে মানুষকে পশুর পঙক্তির মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয় এবং তাহাতে যে, সকল মানুষই নারাজ তা বলাই বাহুল্য। মানুষ ও পশুর কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি। কিন্তু তাহা ছাড়া মানুষের যা আছে পশুর তা নাই। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিচারশক্তি আছে, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রীতি, ভালবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি বৃত্তি নিচয় আছে, তাহাদের অনুশীলনের চেষ্টা আছে, মানুষের সমাজ ও ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা আছে, জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে। কাজেই একই আদর্শে মানুষ ও পশুর যোগ্যতার বিচার হইতে পারে না। "চাচা আপন বাঁচা" পশুর নীতি হইতে পারে, কিন্তু মানুষের কখনও নহে।

সাধারণতঃ মানুষ নিজেকেই সুখী করিবার চেষ্টা করে; নিজে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবে, সাধারণ মানুষ এই চিন্তা লইয়াই থাকে। সে সাবধানে লাভক্ষতির হিসাব করে, চারিদিক চাহিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এক পা বাড়ায়—কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তার মধ্যে সকল সময়ে শুধু আপনাকে বাঁচাইয়া চলাটাই আপনার ধর্ম্ম নহে। জীবনে এমন দিন আসে, প্রাণে এমন ভাব জাগে, যুগধর্ম্মের এমন পরিবর্ত্তন হয় যখন এই মানুষই আবার নির্ভয়ে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিয়া মরণকে বরণ করিয়া লয়; বিপদ তখন তার পরম সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়; শত বেদনা কামনার বস্তু হইয়া পড়ে! মানুষ তখন এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করে যে আত্মদানেই প্রকৃত সুখ, আত্মত্যাগেই যথার্থ আত্মোপলব্ধি।

একটা অঙ্গকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদা বাঁচাইয়া রাখা যায় না। কারণ দেহের সঙ্গে তার একটা জীবন্ত সংযোগ আছে যার অভাবে হাজার যত্ন সত্ত্বেও সে রক্ষা পায় না—পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সংযোগ ও সহকারিতা জীবদেহকে বাঁচাইয়া রাখে। মানুষের সমাজও একটা জীবন্ত জিনিষ। বিভিন্ন দেশে সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজ সর্ব্বত্রই জীবন্ত, সর্ব্বত্রই একটা Organic Unity, যার প্রত্যেক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের একটা নাড়ীর টান আছে। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেমন কোন অঙ্গের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, সমাজ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেইরূপ কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। বিচ্ছিন্ন হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমি সমাজের মধ্যে বাঁচিয়া আছি, সমাজের মধ্যেই আমার গতিবিধি, প্রকৃতপক্ষে "আমি সমাজেরই একজন "এছাড়া মানুষ নিজের সম্বন্ধে অন্য কোন ধারণা করিতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন নানা কারণে দেশ হইতে উচ্চ আশা, উচ্চ চিন্তা, মহৎভাবের সাধনা লুপ্ত হয়, তখন মানুষের হৃদয় স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, সে তখন সমষ্টির সহিত সংযোগ সূত্র ছিন্ন করিয়া শুধু নিজের স্বার্থের দিকে ঘোল আনা নজর রাখে। সকলেই ভাবে নিজেকে এইরূপে বাঁচাইয়া

চলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সহানুভূতির অভাবে সকলেই অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মনাশ করিয়া থাকে এবং সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়।

এই স্বার্থব্যাধি আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে মুমূর্ষু করিয়া ফেলিয়াছে; বাঙ্গালীর ঘরে রোগ শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ডাকিয়া আনিয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী তাই আজ চোখ মেলিতেছে—সকল দিকে এই পরিপূর্ণ সর্ব্বনাশের চিত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে এবং কি করিয়া আপনার ঘর সামলাইবে তাহারই ভাবনা ভাবিতেছে। বাঙ্গলার আত্মঘাতী স্বার্থপরতার যুগ কাটিয়া যাইতেছে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে।

এই যুগের প্রধান লক্ষণ হইতেছে আত্ম-ত্যাগ—আত্মদানের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি। সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির প্রকৃত জীবন এবং সমষ্টির অর্থাৎ সমাজ ও দেশের সেবাতেই ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ, এই সত্যগুলি দেশের যুবকদের নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মদান ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নীরব কর্ম্মী লোক চক্ষুর অন্তরালে পূর্ণ একাগ্রতায় ও অখণ্ড বিশ্বাসে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই নবজাগরণের দিনে, এই অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিবার দিনে, অন্যান্য ঘটনার সহিত চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈন্যের কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে।

বাঙ্গালীর ছেলে ননীর পুতুল ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোকা বলিয়াই পরিচিত। সে হঠাৎ নিশ্চেষ্টতার গণ্ডী ছিঁড়িয়া আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া মরণের মুখে ছুটিয়া চলিল! বাধা মানিল না, নিষেধ মানিল না, ভয়ে টলিল না,—সাহসে ভর করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল। তাহার স্বভাবের এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কি করিয়া ঘটিল? স্বাভাবিক মহাভাবকে আশ্রয় করিলে মানুষের এইরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তনই হইয়া থাকে—মূক তখন বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। মানুষ তখন লাভ ক্ষতির গণনা ভুলিয়া যায়, তাহার সঙ্কুচিত হৃদয় প্রসারিত হইয়া সিন্ধুতে পরিণত হয়, সে তখন প্রতিদিনের তুচ্ছতা, নীচাশয়তা ও কাপুরুষতাকে পায়ের তলায় রাখিয়া মহত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত এক নূতন রাজ্যের অভিমুখে ছুটিতে থাকে। কাহারও আকুল আহ্বান, সে মহাযাত্রায় বাধা দিতে পারে না।

শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকার উষার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে মানুষ যখন অবসাদের পর নূতন জীবনের সন্ধান পায় তখন নিশ্চয় ছাড়িয়া অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতে সে আনন্দ অনুভব করে এবং তাহার উন্মত্ত উৎসাহ, অপরাজেয় আশা ও বিরাট আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর প্রাণ জাগাইয়া তুলে! কয়েকজনের জীবন কোটির দেহে প্রাণ সঞ্চার করে। বাঙ্গালী সেনার সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায় বটে কিন্তু তাদের প্রাণের স্পন্দন কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপিত হইবে? বাঙ্গালীর ললাটের কলঙ্ক রেখা মুছিয়া আজ তাহারা তেজে ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। "চাচা আপন বাঁচার" মন্ত্রকে তাহারা পদাঘাত করিয়াছে; তাহারা দেখাইয়াছে—মানব জীবনে ত্যাগেই আনন্দ ভোগে নহে; বিসর্জ্জনেই প্রতিষ্ঠা, রক্ষণে নহে।

৯। সচিত্র পত্র

আমাদের দেশে মাসিক পত্র বা পত্রিকা অনেক শ্রেণীরই দেখিতে পাই। সাহিত্য সম্বন্ধীয় মাসিকই তন্মধ্যে বেশীর ভাগ। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিকও ২।৪ খানি দেখা যায় এবং আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চ্চার হিসাবে তাহারা খুবই উন্নত মনে করি। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতিও সাধারণতঃ বিজ্ঞান নামেই অভিহিত হয়। ব্যবসা থাকুক বা না থাকুক ব্যবসা সম্বন্ধীয় ও ২।৪ খানি পত্রিকা, আমাদের শিল্পবিজ্ঞানের অধঃপতিত অবস্থায় নীরবে তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে। জানিনা কোন আশায়, তাহারা সুদূর পরাহত কালের দিকে চাহিয়া আপন আপন পথে চলিয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমরা আরও একখানি পত্রিকার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি।

আমাদের শিক্ষিত সমাজের জন্য নানান রকমের মাসিক থাকা সত্ত্বেও, বহু বিষয়ের চিত্র সমন্বিত কোন পত্রিকাই দেখা যায় না। আমাদের দেশে খোদাই চিত্রকর অনেকেই আছেন, যাহাদের চিত্র আমাদের দেশে সসম্মানে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাদের সহায়তায় এবং উদ্যোগে ২।১ খানি সচিত্র মাসিক যে অনায়াসে প্রচারিত হইতে পারে একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস অন্যান্য মাসিকের চেয়ে সচিত্র কোন একখানি অধিক লাভবান্ হইবে। সাহেবমিগের পরি-চালিত বিখ্যাত ২।১ খানি কাগজ লাইব্রেরী ও ক্লাব ঘরে দেখা যায়।

এখন ভাবা দরকার এতদিন কোন সচিত্র মাসিক বা সাপ্তাহিক বাহির হয় নাই কেন? দেশের লোক তাহার অভাব বোধ করে নাই কেন?

আমরা দেখিতেছি—সচিত্র মাসিকের পাঠক বা দর্শক তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী জনকয়েক মাত্র। তাঁহারা পাঠাগারের সভ্য; পাঠাগারে অথবা নির্দ্দিষ্ট দিন কয়েকের মধ্যে আপনাদের ঘরে বসিয়াই দেখিয়া যেন। কারণ অপরিমিত মূল্য দিয়া নিজের জন্য সচিত্র পত্রিকা গ্রহণ এই দরিদ্রদেশে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ২।১ খানি মাসিক সাপ্তাহিক অনেকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে হইবে না তাহারা চিত্র দর্শনে অনিচ্ছুক বা রসবোধ হীন। আধুনিক যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনী-কান্তের হাসির গান ও কবিতা পড়িয়া এবং তাহাদের পূর্ব্বেরও কোন কোন কবির গান শুনিয়া, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পেটে খিল্ ধরিয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা তৃপ্ত হন হন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত নব্যবঙ্গের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে আপনাদের গঠিত হাস্য-ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বঙ্গের চির দুঃখ কষ্ট কিঞ্চিৎ ভুলাইয়া ছিলেন তবুও বাঙ্গালা দেশ হাসি ছাড়ে নাই। সেই বাঙ্গালা দেশ রসবোধ হীন—এটা ভাবাও অন্যায়।

আমরা যে সকল ব্যঙ্গচিত্র বা নদী, পাহাড়, সৈন্যশ্রেণী, নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র ইত্যাদি দেখি তাহা প্রধানতঃই বিদেশী কাগজ হইতে গৃহীত হয়। বিদেশী ব্যঙ্গচিত্র সাধারণতঃ দেশী কাগজের মধ্যে ইংরাজী "মডার্ণরিভিউ" নামক মাসিক পত্রে, এবং দেশীয় ধরণে সময়ে 'দর্শক' পত্রেও দেখা যায়। মূল চিত্রগুলি আমেরিকার কাগজ হইতেই লওয়া হইয়া থাকে। আমরা উহারই দুই চারিটি লইয়া আনন্দিত হই। এমন অবস্থায় যদি কেহ আমাদিগকে রসবোধহীন বলেন তাহা হইলে অন্যায় বলা হইবে। ঐ সকল কাগজ

আমাদের দ্বারা চালিত হয় না কেন তাহার কারণ আছে।

সচিত্র পত্র বাহির করিতে অক্ষমতার কারণ—

(১) যদি কাহারও কখনও বাহির করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে টাকার অভাবে হয় নাই।

(২) ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী সংগ্রহ করিতে যতটুকু পরিশ্রম, ও ভ্রমণের প্রয়োজন ততটুকু অনর্থক ও স্বাস্থ্যহানির কারণ মনে করা।

(৩) ব্যঙ্গচিত্র বাহির করিতে হইলে যেরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা হয়ত জুটিয়াই উঠে না। মোট কথা হাস্যরসের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় থাকা চাই।

এখন আমাদের সাহিত্যিক জীবনে রসসঞ্চার করিতে হইলে এবং দেশকে বুঝাইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা সচিত্র পত্র প্রকাশিত হইতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ উপরোক্ত অভাবগুলি পূরণ করা, দ্বিতীয়তঃ দেশের লোকের সুবিধা সৃষ্টি করিতে গেলে দেখিতে হইবে—

শিক্ষিতদিগের সকলেই বাঙ্গালা ভাষা জানেন। সুতরাং ঐ সকল চিত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া। আবশ্যক মত কোন কোনটীর যথাযথ বিবরণও দিতে হইবে, যাহাতে পরিবারের শিক্ষিতা মহিলারা নিজেরাই ছবিগুলি বুঝিতে পারেন।

দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতেরা যাহাতে কিনিয়া পড়িতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা। ইহাতে সর্ব্বত্র সুলভ প্রচারের সুবিধা হইবে।

ইহাতে আর একটা লাভ হইবে দেশের চিত্র জনসাধারণের কাছে বেশ পরিচিত হইবে। প্রাচীন ভাস্কর্য্য, বিশ্বকর্ম্মশিল্প, বিলুপ্তপল্লীর চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিবে—দেশের নদী, পুল, পাহাড়, খাল, বিল নূতন ভাবে দেখা দিবে। দেশের জননায়ক ও নায়িকাগণের চিত্র এবং তৎসঙ্গে পাহাড়িয়া ও অশিক্ষিত জাতিসমূহের সাহিত্য জীবনের প্রতিকৃতি দেওয়াও সহানুভূতির পরিচায়ক হইবে। দেশকে চিনিবার জানিবার পক্ষে একটা উপযুক্ত অভিধানের পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ ইউরোপের নব নব জ্ঞানবিজ্ঞানের চিত্র সহজেই আমাদের নিকট পরিচিত হইবে। কলকব্জার বিষয় না পড়িয়াও তাহার একটা মোটামুটি ধারণা সকলেই করিতে পারিবে। আবিষ্কারকের জীবনী ও চিত্র ঐ সঙ্গে বাহির হইলে ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর হইয়া মানুষ তৈয়ারীতে সাহায্য করিবে। বিশেষতঃ এই সকল পত্রের দ্বারা শিশুরা শৈশবের ধূলা খেলা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন খেলার সামগ্রী পাইয়া আনন্দিত হইবে—তাহাদের জীবন নূতন ভাবে গঠিত হইবে—আপনার যাহা কিছু তাহার একটা চিত্র হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। তাহার তরুণ হৃদয় একটা অক্ষয় চিত্রফলক হইয়া থাকিবে।

* *
*

১০। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপরীত্যের কারণ

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইলেও কোন কোন স্থলে বৈপরীত্য দেখা যায়। প্রাচীন জাতির অবস্থান্তর হইলেও যদি তাহার বংশ গৌরব ধারাবাহিক চলিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। ইউরোপীয় জাতিসমূহের

মধ্যে পোলাণ্ড একতম পরাধীন জাতি হইলেও জগতের বিদ্বৎ সমাজে শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে তাহার একটা দাবী আছেই। পোলাণ্ড তাহার বীরেন্দ্র সমাজের গৌরবে চিরদিনই গর্ব্বিত। ত্রিশক্তির পরাধীনতা স্বীকার করিয়াও তাহার নিজস্ব বজায় রাখিয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যে সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেশ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষায় আশায় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাদের হয়ত অনেকেরই পোলাণ্ডের মত পণ্ডিত সমাজে স্থান নাই। একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতি সমূহের পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্যই তাহাদের স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতে কিন্তু তাহাও দেখিতে পাই না। নেপাল, ভোট ও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিলেও ভারতের মত তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই। ইংরেজ রাজত্বেই উক্ত রাজ্য সমূহ ভৌগলিক সীমাবদ্ধ হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ আপনার জাতীয়তা অনেকটা হারাইলেও, বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে দাঁড়াইবার মত যতটা শক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত রাজ্যত্রয় ততটা হইতে পারে নাই। তাহারা স্বাধীন হইলেও অথবা আপনাদের স্থিতিতে আপনারা সন্তুষ্ট হইলেও জগৎ তাহাদিগকে কতটা সম্মান করে তাহা জগতের রাষ্ট্রশক্তিরাই জানেন। ভারত পরাধীন হইয়াও আপনার যতটা সুফল দেখাইতে পারিয়াছে স্বাধীন নেপাল, ভোট ও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য ততটা অগ্রগামী হইয়াছে। পরাধীন হইয়া নিজস্ব হৃত হওয়া, জাতিসমূহের নিজেদের ব্যবহারের উপরও নির্ভর করে।

বিজিত এবং বিজেতার ভাব মিশ্রণেই সময়ে সময়ে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত বিজেতার দ্বারাই বিজিত জাতির সাহিত্য, ধর্ম্ম খর্ব্ব হইতে থাকিলেও গৌণভাবে তাহাদের দ্বারাই অনেক সময়ে সুপ্রচারিত হয়। ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ভাষা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া দেশের প্রতি তৃণগুল্মের গৌরব ঘোষনা করিতেছে। কিন্তু বিদেশ হইতে, আমরা যতটা লইতে পারিয়াছি স্বাধীন নেপাল, ভোট ও মণিপুর ততটা লইবার মত উপযুক্ত হয় নাই। জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতিসমূহের সঙ্গে চলিতে হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানে যতটা অধিকার বা ভাব গ্রহণে সমর্থ হওয়া উচিত তাহা ইহাদের নাই। ইহারা আপনাদিগকে বর্ত্তমান জগতের উপযোগী করিবার জন্য আজও চেষ্টিত হয় নাই। উক্ত স্বাধীন রাজ্যসমূহ পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকিলেও পার্ব্বত্য বন্ধনের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র অবলম্বন করিতেছে। ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের ন্যায় ইহাদের কতকটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে সত্য কিন্তু তাহাদের তুলনায় শক্তি কতটুকু, তাহা হয়ত আদৌ চিন্তা করে নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বন্ধনে নেপাল, ভোটান কেন অন্যান্য অনেক দেশেরই ঠিক এই অবস্থা। সমতল ভারতের সঙ্গে পার্ব্বত্য ভারতের এই জন্যই বৈষম্য রহিয়াছে।

ভারতের অঙ্গে যাহারা আজও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, ব্রিটিশ ভারত যে তাহাদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহারা শারীরিক বলে ও সমরে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু বাণক-

দিগের শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাহা আজ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও ভারতের পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাসিতা দ্বারা অভিভূত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ের যাহা শ্রেষ্ঠ বিষয়, মানবের মস্তিষ্ক হইতে যাহা ভগবানের অনন্ত মহিমার বিকাশ করে তাহাকে দূরে রাখিয়া দিতেছে। একদিক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অন্যদিকে হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে।

তাহারা যে বর্ত্তমান সময়ে আপন আপন দেশের উন্নতি চিন্তায় বিরত তাহা সহজেই বুঝা যায়। দেশের অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যে তাহাদের যোগ নাই তাহা কতকটা উপলব্ধি হয়। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা দীক্ষার ধারা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং সফলতা-বিফলতা, আশা ও নৈরাশ্যের চিন্তায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখা যায়, তাহার অন্যতম কারণ সংবাদ পত্রের অভাব। ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ পত্র ও মাসিক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ ও সুচিন্তা এবং শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে তাহারা পরস্পরে সেই সকল সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাহাদের নিজ নিজ দেশের জন্যও কোন সংবাদ পত্রাদি প্রকাশিত হয় না। মোট কথা তাহাদের অবস্থা ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা বড়ই অনুন্নত। কিন্তু তাহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতের সমকক্ষতা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের দরকার। তাহাদের উচিত অন্যস্থান হইতে উপযুক্ত শিক্ষক গ্রহণ করিয়া আপনাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা। পার্ব্বত্য বন্ধনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত থাকা সভ্যজগতের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা।

* *
*

১১। ব্যক্তির দায়ীত্ব

সমাজে প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের দাবী আছে; এবং প্রত্যেকের এক একটা দায়ীত্বও আছে। এই দাবী ও দায়ীত্বের জন্যই সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য কেহ বিদ্যা দেন, কেহ বুদ্ধি দেন, কেহ অর্থ দেন আবার কেহ বা ঐ সকলকে সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আপন শক্তি দেন। সুতরাং মোট কথা— সমাজ চিরদিনই বিদ্বান-বুদ্ধিমানকর্ম্মী ও ধার্ম্মিক-ধনবানকর্ম্মী চায়।

আমরা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থের অভাব উপলব্ধি করিতেছি। অর্থের অভাবে নব নব কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম ক্ষেত্রের পরিপুষ্টি কিছুই হইতেছে না। এই সুজলা সুফলা দেশে অর্থের অভাব নাই আছে শুধু প্রাণের অভাব। তারপর যাঁহারা দেশের ধনবান ও কর্ম্মী তাঁহাদের উভয়েরই প্রাণ ও চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। নচেৎ আমরা বিভিন্নদিকে চিন্তার ও ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি না কেন? সমাজ আমাদের কৃপণ নয়; মুষ্টি ভিক্ষাই আমাদের সমাজপ্রীতির পরিচায়ক। সমাজের উপকারার্থে অর্থ ও তুচ্ছ, কতজন প্রাণ অবহিলান করিয়া সমাজের গৌরব, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য-অশোক, হর্ষবর্দ্ধন ও ধর্ম্মপাল, পাঠান ও মোগল সম্রাটগণ এবং মহসীন ও বিদ্যাসাগরের দেশবাসী সমাজের জন্য কার্পণ্য প্রকাশ

করিতে পারেন না। আমাদেরই সমাজে নীতি বাক্য রহিয়াছে—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"

জ্ঞানী ব্যক্তি পরের জন্য ধন এবং জীবন উভয়ই ত্যাগ করেন।

যাঁহার বুকের উপর—পাহাড়ের গায়ে, তটিনীর কল কল স্বরে, রাজযন্ত্রের ঘায়ে ত্যাগের কথা রহিয়াছে তাঁহার সন্তানেরা সমাজ সেবায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।

কর্ম্মীদিগকেই কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। যাহার চোখ দেখে না তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দিতে হইবে, যাহার কাণ শোনে না তাহাকে শ্রুতিশক্তি দিতে হইবে, যাহার হৃদয় বোঝেনা, হৃদয় গলিয়া অশ্রু বাহির হয় না তাহার হৃদয়কে বুঝাইতে হইবে গলাইতে হইবে—ইহাই কর্ম্মীর কাজ। যদি এই ভাব আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত না দেয় তাহা হইলে সমাজ-উন্নতির আর কি কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে?

আমাদের দেশবাসিগণ ত্যাগের উৎসে নিত্য স্নান করিতেছেন। ধন বহন করিয়া যাওয়াই আমাদের স্বভাব নয় আমাদের সৎ স্বভাবের পরিচয়—পরার্থে। সুতরাং যাঁহাদিগকে আমরা আজ অর্থকৃক্ বলিতেছি তাঁহারা একবার আপনাদের অবস্থা উপলব্ধি করুন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তারপর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের আদর্শ চরিত্রগুলি সমাজেতিহাসে স্থান পাইবার জন্য আমাদিগকেও এমন কতকগুলি নূতন নূতন বিষয় বাহির করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা পেছনে পড়িয়া থাকিতে আপনা হইতেই লজ্জিত হন। আমাদিগকে আরও সত্যান্বেষী, সংযতচরিত্র হইতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আপনা হইতেই দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর পরের গঠিত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণ মনে না করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের এক মহাসুযোগ মনে করেন।

যদি কেহ আজই মনে করেন তিনি সমাজের জন্য যাহা কিছিৎ করিয়াছেন তাহা অন্যের অসাধ্য এবং তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গেল তাহা হইলে আমরা বলিতে চাই উন্নতিমুখী সংসারের কাছে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে। তিনি, যে দেশের, বা যে জাতির, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিতেও তাঁহার দুঃখ নাই। তাঁহার চিত্তের গভীরতা অনুসারে তিনি মুহূর্ত্তেই জগৎকে মাপিয়া লইতে পারেন। যাহারা বাস্তবিকই আত্মোন্নতি চাহেন তাঁহারা কায় মন ও বাক্য দ্বারা সমাজের উন্নতি প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা ২।১ জন্মের নয়, তাঁহারা সমাজের উন্নতির জন্য নানাসময়ে নানাপ্রকার উপায় সৃষ্টি করিয়া লন। জগৎটা তাঁহাদের শিক্ষার স্থান, তাঁহাদেরই ভাঙ্গা গড়ার বিষয়। তাঁহারা আজীবন কর্ম্ম করিয়া গেলেও কলেকের নিমিত্ত চিত্তে শান্তি আনিতে পারেন না। শৈশব হইতে যাহার ফল জলের সহিত পরিচিত হন তাহাকে এক জন্মে কি বলিয়া ভুলিয়া যাইবেন?

তাই বলিতে চাই—সমাজকে আরও ভাল করিয়া জানিতে হইলে, প্রতি বিভাগ উপবিভাগ, ক্ষেত্র, শাখাক্ষেত্রগুলিকে জানিতে হইবে; সকলকে বিপদে আপদে আপনার সাথী করিতে হইলে আরও প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। আমরা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিব তাহা এই সময় হইতেই ঠিক করা ভাল। আমাদের জীবন অল্প, আশা বিপুল। সর্ব্বদা প্রাণ মন এক করিয়া উপাস্য দেবতার কাছে বলিতে হইবে আমায় পথ দাও, আমার

কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত কর, সকলকে আপন করিয়া লইবার মত শক্তি দাও আমার শরীরের শেষ শোণিতবিন্দু সমাজ সেবায় উৎসর্গীকৃত হউক।

১২। কর্ম্মক্ষেত্রে বিহার ও উৎকল

ইতঃপূর্ব্বে বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কার্য্য বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষাকার্য্যও পৃথক হইল। বিহার-উড়িষ্যার পার্থক্যের ফলে আমরা একটা নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। বিহার ও উড়িষ্যার ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪০ বৎসরে যে কয়টি বিদ্যালয়কে আপনার কক্ষে স্থান দিয়াছে এই শিক্ষাপ্রচার, জ্ঞানলাভের যুগে বিহার ও উড়িষ্যাবাসী তাহা লাভ করিতে বেশী দিনের অপেক্ষা করিবে না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা দেখিতে চাই, বিহার ও উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালাদেশ হইতে কোন কিছু লাভ করিয়াছেন কি না, আমরা দেখিতে চাই এই মিলনে তাঁহারা কি নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন! বিহারী বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছেন, বিহারী কর্ম্মবীরগণ বাঙ্গলাদেশে কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তার পর অপেক্ষাকৃত নিকট ভাষা-ভাষী উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গলাদেশেরই অংশ ছিলেন। তাঁহাদের ভাষা অনেকটা বাঙ্গলার সঙ্গে এক। বাঙ্গলা দেশকে কে কতটুকু আপন করিয়াছেন, তাহা এইবার দেখিতে পাইব।

শিক্ষাপ্রচারে কোন কোন বিষয়ে আমরা উড়িষ্যাকেই বরং উন্নত দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাদি যে পরিমাণে আছে তাহার তুলনায় পাঠক আছে কি না সন্দেহ। উড়িষ্যাবাসিগণ নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিবাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই হয়। উড়িষ্যার ও বিহারের জিলায় জিলায় এক একটি মাত্র সরকারী বিদ্যালয়ই যথেষ্ট নহে। তাঁহারা নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষাকে বড় করিতে থাকুন। উচ্চচিন্তা, দ্রুত উন্নতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সব চাই। উড়িষ্যা ও বিহারের সমাজ অঙ্গ যে যে বিষয়ের জন্য দুর্ব্বল, উক্ত প্রদেশদ্বয়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহার পুষ্টির উপায় নির্দ্ধারণ করুন, কর্ম্মীরা তাহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হউন, আপনার দায়ীত্ব কাঁধে লইতে প্রস্তুত হউন, ইহাতে একদিকে আপনাদের কার্য্য ক্ষমতা বাড়িবে অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানে ভবিষ্যতে আরও সুযোগ পাইবার আশা রহিবে।

প্রাচীন গৌরবে উড়িষ্যা ও বিহার উভয় দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাই উজ্জ্বল। এইবার তাঁহারা আপনাদের গৌরব লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য পাইবেন। এতদিন আমরা যাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই আজ তাঁহারা অবশ্যই আপনাদের অভাব, দৈন্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বাহিরে আসিবেন। বাঙ্গলা দেশের বালকসমাজে তাঁহাদের জীবনী অন্যতম আলোচ্য বিষয় হইবে! উড়িষ্যা ভাষায় রচিত প্রাচীন শিল্প-বিজ্ঞান দর্শন ও পণ্ডিতব্যক্তিগণের জীবনী এইবার বিহারী ইতিহাসের সঙ্গে সমভাবে প্রকাশিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের দ্বারা আমরা যেন সঙ্কীর্ণমনা না হই। বাঙ্গলা দেশে

২টী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইহা আমাদের সুখের বিষয়। আমরা আরও অধিকতর সুখী হইব যেদিন উড়িষ্যা নিজের বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান দিতে পারিবে। হিন্দুস্থান, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় প্রত্যেকেই আরও শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া শত শত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিলাভ করুক। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা প্রচারিত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য, পঞ্চনদের প্রাচীনেতিহাস, মহারাষ্ট্রের ব্যবসাগৌরব, তৈলঙ্গ-দ্রাবিড়ের সাহিত্য, উৎকলের ভাস্কর্য্য, প্রাচীন বিহারের শিক্ষা-গৌরব, নব্য বঙ্গের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, হিন্দুস্থানের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দিক্।

শেষ কথা এই, আমরা নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে শীঘ্রই বিহারী ও উড়িয়াদের নবীন কর্ম্মক্ষেত্ররূপে দেখিতে চাই। তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলিতে শিখুন এই পাটনাই পুণ্য-তোয়া গঙ্গাবতীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পাটলি-পুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহাই বহু বহু পণ্ডিতগণের বিহারভূমি হইয়াছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলা এই দেশেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানপিপাসুগণের তীর্থক্ষেত্ররূপে ইতিহাসে পরিচিত রহিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টী বিহারের প্রাচীন শিক্ষাগৌরবে গঠিত হউক, তারপর উড়িষ্যার শিল্পজ্ঞানে ভূষিত হইয়া ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক।

* *
*

১৩। বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায়

দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে নানান ধর্ম্ম প্রচারিত রহিয়াছে, প্রচারিত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম—প্রচারক গন্তব্যস্থান এক, লক্ষ্য এক জানিয়াও বিভিন্ন ভাবে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায় শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের অঙ্গে অঙ্গে যুক্ত রহিয়া আপনাদের মতবাদ প্রচার করিতেছে। কেহ কেহ বা, বেদান্ত উপনিষদের পথে চলিয়া আপনাদিগকে প্রচারিত করিতেছে। আমরা বলিতে চাই এই সকল সম্প্রদায় আরও প্রতিষ্ঠিত হউক, আরও বিভিন্ন প্রচারক বা তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগকে পাইতে চাই। তাঁহারা ভগবৎ লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হউন বা নাই হউন এদেশের মাটিতে জন্মিয়া কাহাকে কিছু করিতে হইলে ঐভাবে আংশিক লাভবান হইতেই হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান যাহাই কেন প্রচারিত হউক না সেই বেদান্ত উপনিষদের ভিতর দিয়াই তাহার বাণী প্রচারিত হইবে। নতুবা তাহার পরিণতি অনতিদূরেই দৃষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান দশপনের বৎসরের ভিতর যে সকল সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া চলিতেছে আমরা তাহাদের উন্নতির সহিত দৃঢ় প্রতিষ্ঠা কামনা করি। উহাদের কোন কোনটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হইলেও অধিকাংশই সমাজ-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ যুগে যুগেই অধিনায়কত্ব লইয়া সমাজকে পুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যেমন বিভিন্নভাবে দেখিতে পাই, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইরূপ বিভিন্ন আভরণে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা চাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যই চিরকাল অবিকৃত অবস্থাই থাকুক। একবার অবস্থার বিকৃতি ঘটিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তন শীল। একটা সম্প্রদায় চিরদিনই এক পথ বা এক মত লইয়া চলিবে

এটা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন পরিবর্তনকারী প্রতিষ্ঠিত সমাজের মতবাদকে সময়োপযোগী পরিবর্তন দ্বারা সামলাইয়া লইতে পারেন। দীর্ঘকাল সাধনা দ্বারা উদ্দেশ্য সুদৃঢ় না হইলে মতবাদ কখনই স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মপ্লাবিত অর্দ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত হইয়াও স্থির থাকিতে পারিল না। বুদ্ধের বাণী তাঁহার জীবিতকালে লোকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর পারিপার্শ্বিকের আঘাতে সে ভাব টিকিল না। তারপর চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাই। চৈতন্য যে ভাবে চলিতেছিলেন, দুই এক পুরুষ বা কিঞ্চিদধিক কাল তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছিল তাহার পরেই বিকৃতি ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এক শঙ্করাশ্রম ব্যতীত পুরাতন সম্প্রদায়গুলির কোনটীই অবিকৃত নাই। প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহাদের স্বল্প জীবনে যাহা গড়িয়া তোলেন তাহার ভিত্তি দৃঢ় হইতে না হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়। একটী সম্প্রদায়কে লইয়া গড়িয়া ভাঙ্গিয়া ধরিয়া রাখিবার মত শক্তিমান কর্ম্মী আবশ্যক, তবে উহা অবিনশ্বর অবস্থায় পৌঁছে।

আমাদের আশার বিষয় বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলি যেখানে জন্মিতেছে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত চলিতেছে। অথবা অন্যত্র তাহার হাবভাব চতুর্মুখ হইয়া বিকাশ পাইতেছে।

যাহারা সাম্প্রদায়িক কাজ কর্ম্মের ভার লইয়া থাকে তাহারা যদি শক্তিমান হয় তাহা হইলেই পতনের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত আমাকে লইয়াই এই সম্প্রদায়। আমার শরীরের শেষ শোণিতবিন্দু ইহার জীবনীশক্তির রক্ষক। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহারা এই সব সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়াছে এবং এই বিংশশতাব্দীতে যাহারা লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া একহাতে কর্ত্তব্যকে টানিতেছে অন্যহাতে দুষ্টদৈবকে ঠেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্র, তাহাদের পরিপন্থী কেহই নাই। সাফল্যের স্বর্ণচূড়া তাহাদের দৃষ্টিতেই প্রথম পতিত হইবে।

* *
*

১৪। হিন্দুর গৃহে দুরবস্থা

আমাদের দারিদ্র্যের এক কারণ যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের অভাব এবং শিক্ষাহীনতায় এক কারণ যেমন অর্থাভাব তেমন অন্যান্য কারণও আছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে অসময়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশই দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অর্থের অভাবে লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছে সৎকর্ম্মে সঙ্কুচিতে এক কপর্দ্দক দান করিতে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করে, দরিদ্রের হাতে একমুষ্টি চাল দিতে তাহারা দারিদ্র্যের করুণগীতি গাহিয়া থাকে অথচ পুত্রের বিবাহ দিয়া অভাবকে শত ভাবে বরণ করিয়া লইতেছে। যে বিদ্যা পুরুষের এক মাত্র সম্পত্তি, সেই বিদ্যাচর্চ্চাই যেন আজ গৌণ বিষয় হইয়া পড়িতেছে।

বিবাহের জন্য বঙ্গীয় যুবক সবই ভুলিতে পারে। দেশ, ধর্ম্ম আত্মমান সকলই যেন ত্যাগ করিতে পারে। যুবকের উদ্দাম লালসার পশ্চাতে পিতামাতার একান্ত ইচ্ছাই বিবাহকে মুখ্য করিয়া ফেলিয়াছে। পিতা মাতা

বুঝিতে পারেন না বা ভাবিবার জন্য অবসর লইতে চাহেন না—বিবাহ কাহার জন্য? তাঁহারা কে? তাঁহাদের অস্তিত্ব কোন যুক্তির ভিতরে বিরাজমান রহিয়াছে? সমাজে পিতামাতার পুত্রস্নেহ এতটা প্রকাশ না পাইলে সন্তানের বিবাহের ইচ্ছা প্রবলাকার ধারণ করিতে পারিত না। যে পিতামাতা ধর্ম্মার্থে সবই করিতে পারিতেন, আপনাদের হস্তে পুত্রকে বধ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ধর্ম্মকে বড় করিয়াছেন, সেই পিতা মাতা আজ সমাজের কর্ত্তব্য চিন্তা সমাজের উন্নতির জন্য সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতেও চাহেন না। সন্তান উপযুক্ত হইয়া বংশের গৌরববৃদ্ধি করিবে তাঁহারা যেন সেটা চাহেন না। খ্যাতনামা পুত্র যে তাঁহাদেরই সাধনার ফল তাঁহারাই যে সেরূপ সন্তানকে পাইতে পারেন এটা যেন মোটেই ভাবিতে পারেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁহাদের সদালাপ, সচ্চিন্তা যে বংশপরম্পরায় বাহিয়া যাইবে, আর উহারই স্পর্শে শত শত জগৎ-কর্ম্মীর উত্থান হইবে তাহা কি তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন? পিতামাতা পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে পারেন না একমাত্র শিক্ষার অভাবে, অসময়ে লালসার তাড়নায় অসংযত হওয়াতে, গার্হস্থ্য চিন্তা প্রবলাকার ধারণ করায় বংশের গৌরব অচিরেই ডুবিয়া যাইবে। যে সন্তানের জন্য পিতামাতার গৌরব, সেই সন্তানকে তাঁহারাই পঙ্কে নিমজ্জন করিতেছেন। এই রকম পিতামাতার সন্তান হইতে সমাজ কিছুই পায় না। এই সকল সন্তানগণ কেবল মাত্র বোঝা হইয়াই চিরদিন বাস করে। স্নেহাতুর পিতা মাতা পুত্রের অনিষ্ট সাধন করিয়া শত্রুর কার্য্য করিতেছেন। সন্তানের ভবিষ্যৎকে তাঁহারা মুহূর্ত্তে ভাসাইয়া দিতেছেন। তাহাকে বিশাল জগৎ দর্শন, বিপুল চিন্তা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ ত্যাগীর দেশ। আদর্শ ত্যাগী যেমন তাহার লক্ষ্য, আদর্শ গৃহস্থও তাহার প্রার্থনীয়। গৃহস্থই সন্ন্যাসীর আশ্রয়। সন্ন্যাসীর সম্মান গৃহস্থের কাছেই। তাই মনে করি আদর্শ গৃহস্থ হইবার জন্য যে সকল গুণ বা শিক্ষাপ্রয়োজন বর্ত্তমান যুবকগণের সে সব নাই। তাঁহারা বিবাহকে একটা খেলার সামগ্রী মনে করিয়া কতকগুলি বাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়া হিন্দুরসমাজ শক্তিকে, হিন্দুর আদর্শকে খর্ব্ব করিতে চলিয়াছেন। পিতৃগৃহে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ না হওয়ায় বিবাহিত বালিকা তাহার শিক্ষা দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারে না। পিতামাতার স্নেহ অতি অল্প বয়সেই একটা প্রথার মধ্য দিয়া চালিত হইয়া তাহাকে সংসারের কাছে অনুপযুক্ত করিয়া রাখিতেছে। তাহার দ্বারা হিন্দুর সংসারে আদর্শ চরিত্রের প্রবর্ত্তন না হইলেও আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিবার মতও কিছুই সংগ্রহ করিতে অবসর পায় না।

হিন্দুর সংসার আদর্শ জননীর কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু বহু বালিকা ভবিষ্যসন্তানের সুশিক্ষয়িত্রী হইতেছেন না। হিন্দুর গৃহ এই প্রকারে একটা ভোগের আড্ডা হইয়া চলিতেছে। লজ্জানিবারণ ও উদরপূর্ত্তিই হিন্দুর ধর্ম্ম নহে। দেশের উন্নতির পরিবর্ত্তে গাঢ় তমিস্রা অগ্রসর হইবে কি? একদিক চিরোদ্ভাসিত দেখিতেছি সত্য কিন্তু অমনিই অন্য দিক কৃষ্ণটিকাময় হইয়া উঠিতেছে।

সাহিত্য-প্রচার*

দেশে একটা প্রবল তর্ক উঠিয়াছে—আমাদের সাহিত্য কোন্ পথে চলিবে? দুই বৎসর যাবৎ মাসিক পত্র সমূহে এই বিষয় লইয়া বিষম লড়াই চলিতেছে। একদল বলেন, আমাদের আধুনিক সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন, তাহার বেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং এই জন্যই সে আর যুগপ্রবর্ত্তক নহে, সে লোকশিক্ষক নহে। বিরুদ্ধবাদীর কথা—সাহিত্যের মধ্যে যেটা আমরা খুঁজি, সেটা রসবস্তু। "এই রসটা এমন জিনিষ যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোন মীমাংসা হয় না। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু কোন দেশেই সাহিত্য স্কুল মাষ্টারীর ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী কাঙালের দুঃখ করণার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় বীর ও বড় বড় মানুষের বড় বড় ন্যায়ের কথাই আছে। আশাপোড়া অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িয়াছে। সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব বিদ্যাপাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত? তুমি কি মনে কর লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না? লোকসাধারণ নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি কি করিয়া করিতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোন বই লেখে নাই? কিন্তু সে কি সাহিত্য?" আর একস্থলে অভিযুক্ত দলের উক্তি এই—"যিনি প্রকৃত কবি তিনি সত্যের দ্রষ্টা। তিনি রসের মধ্য দিয়া আনন্দময়ের—সুন্দরের প্রকৃত রূপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন।" কবিবাদীগণ আবার বলিতেছেন যে, "সাহিত্যে যুক্তি ও তর্ক অবলম্বন করিলে, একটা তত্ত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, লোককে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলে, সত্যপ্রকাশ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অন্তরায় হয় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।"

এই উক্তিগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এত কথাকাটাকাটি সাহিত্যের আদর্শ লইয়া নয়, সত্য প্রকাশ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কথা লইয়াও নয়। প্রকৃত কারণ এই যে আধুনিক সাহিত্য কেন সমাজের অন্তস্তল স্পর্শ করিতেছে না। কেন আধুনিক সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতের মত ঘরে ঘরে আদৃত হয় না। একদল মনে করেন, বুঝি আমরা তাহাদের সুখ দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না তাই এমন ঘটিল। অপর দল বলিতেছেন, আমরা শিক্ষা ও সাধনাবলে এত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

উঠে উঠিয়াছি যে আমাদের চিন্তাপ্রণালী বা ভাষা সাধারণের বোধাতীত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভাব বুঝিবার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা উপযুক্ত করিয়া তোলা দরকার। বস্তুতঃ উভয় দলের উক্তিই এক একটা খণ্ড সত্য। খণ্ড সত্য কেন না, দেশের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা লইয়া দেশের চলিত ভাষায় সাহিত্য রচিত হইলেই যে তাহা সর্ব্বজনাদৃত হইবে, এমন নয়। রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন তত্তুল্য আর কোন বই কি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নাই? তাহাদের নাম জনসাধারণ জানে না কেন? আর এক কথা সরল ভাষায় রচিত হইলেই যদি পুস্তকের বহুল প্রচার হয়, তবে ত বটতলার নাটক নভেলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদর হওয়া উচিত ছিল।

পক্ষান্তরে তথাকথিত শিক্ষিত হইলেই যে বর্ত্তমান সাহিত্যের আদর বাড়িবে, তাহাতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। রবিবাবুর নোবেল পুরস্কার পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুস্তক কয়জন শিক্ষিত বাঙ্গালী পড়িত? আজ যাঁহারা পড়েন, তাহাদের কয়জনই বা তাঁহার সহিত একমত? সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় তাঁহার পুস্তক কোন কালে এত বেশী লোকের নিকট সমান আদরের হইবে কি? আসল কথাটা হইতেছে এই, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে সর্ব্বজন সমাদৃত করিবার ও তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের পদে উন্নীত করিবার পথ—মানবের চিরন্তন আদর্শকে সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বা ভগবদ্দত্ত প্রতিভার সাহায্যে জাতীয় জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলা এবং নানা উপায়ে এই আদর্শকে জাতির সমক্ষে ধরা। 'সবুজ-পত্র'-সম্পাদক একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবক-সেবিকারা আর কিছু করুন বা না করুন অন্ততঃ ভাবী গুণীর আসর জমাবার জন্য পাঠকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। তবে তিনি যে আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, —বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, উভয়-স্থলেই নবসাহিত্য সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে, এই কথার সহিত আমার মনের একটুও মিল নাই। কেন নাই সেটি আমি পরে বলিব।

এখন কথা এই, আমরা কি কি উপায়ে বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্যকে সমাজ-জীবনের অন্তরে প্রবেশ করাইতে পারি। এই খানেই আমার প্রবন্ধের প্রকৃত আরম্ভ। History repeats itself—দেখিতেছি আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতীতের আংশিক পুনরাভিনয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন বঙ্গের এক রাষ্ট্রীয় শক্তি লুপ্ত হইবার পর যখন মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া বসিল তখন ভারতীয় সাহিত্যেরও অধঃপতন আরম্ভ হইল। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিক্রমশীলা বিহার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে; প্রিয়দর্শী, শিলাদিত্য ও শিক্ষানুরাগী পালবংশীয় রাজারা এখন কোথায়? সুতরাং তপনদেব হাসিয়া উঠিলে অন্ধকারের যে দশা হয় ভারতীয় সাহিত্যেরও তদবস্থ হইতে বেশী দেরী হইল না। হিন্দুসমাজনেতৃরূপ বৃক্ষের আড়ালে মুখ গুঁজিয়া সে কোনরূপে বাঁচিয়া গেল মাত্র। ধর্ম্মভাব হোক, জাতীয় ভাব হোক, যা কিছু ভাব হোক না কেন সবই প্রকাশ পায় মানুষের ভাষার সাহায্যে, প্রচার হয় তাহার সাহিত্যে। রাজাই যখন মুসলমান তখন বর্ত্তমান যুগের ন্যায় রাজ ভাষাই সমাজে

আদর পাইতে বসিল। রাজজাতির আচার ব্যবহারই সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দু সমাজের অবনতির আরম্ভ হইল।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে, পতিত অথচ যোগ্য জাতিকে উদ্ধার করিতে ত ভগবান চিরদিনই কৃতসঙ্কল্প; তাই সারাটা ভারতময় একটা ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি হইল। বঙ্গদেশও সে আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল। আমাদের এত গৌরবের যে বঙ্গসাহিত্য তাহা এই আন্দোলন হইতে সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত অমৃতের ন্যায় উঠিয়া আসিল। আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তির যুগের কথাই বলিতেছি।

মুসলমান ধর্ম্মের কবল হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাঙ্গালা দেশে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তখনকার শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বই বর্ত্তমান সাহিত্যের জন্মদাতা। আজ যে, দেশে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিতেছে সেই অতীত যুগেও এইরূপ একটা সুর বাজিয়াছিল। আজিকার ন্যায় সেই যুগেও সুরটীকে সমাজজীবনে প্রবিষ্ট করিতে নানা চেষ্টা চলিয়াছিল। সেই চেষ্টা সেই অতীত যুগের আদর্শকে সমাজে ধরাইয়া দিতে পারিল তাহার কারণ, সমাজ বুঝিল যে এটা আমারই জিনিষ। সাহিত্য যে সেই তামসযুগে সমাজের প্রধান আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল সাহিত্যে নূতন আদর্শসৃষ্টি যেমন তার একটী কারণ, সাধারণ্যে সেই যুগাদর্শ প্রচারের জন্য নানা মণ্ডলী গঠন ও সেই সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশিষ্ট একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাবও তার অন্যতম। যদি চৈতন্য-দেবের ন্যায় প্রতিভাবান চিন্তাশীল ও প্রচারক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব না হইত তবে হয়ত বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিত না। অথবা তাহাকে বৈষ্ণবীয় যুগের ভাব সম্পদগুলি হারাইতে হইত। যুগাদর্শ প্রচার উদ্দেশ্যে যে মণ্ডলী গঠনের কথা আমি বলিতেছি, সেটা কিন্তু বঙ্গ সমাজের নেতৃবৃন্দেরই কর্ত্তব্য; যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মী তাঁদের কর্ম্ম দ্বিতীয়টী। অবশ্য আমার এ প্রস্তাবটী একেবারে নূতন নয়। আমা অপেক্ষা বহুজ্ঞানবান লোকে একথা পূর্ব্বেই দুই একবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু সেদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। বিদেশে সাহিত্য প্রচার ত পরের কথা, এই বাঙ্গালা দেশের কয়টী জেলাতে রংপুর, ঢাকা, রাজসাহী জেলার ন্যায় একটা করিয়া উপযুক্ত শাখা সাহিত্য পরিষৎ আমরা এখনও গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। যশোহর খুলনা কলিকাতার এত নিকটে এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মনীষি ও সাহিত্য-সেবিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য অথচ সেই জেলা দুইটীই এ বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তবে একথা আমি বলি না যে এটা শুধু তাঁদেরই কর্ত্তব্য। আমরা চাই, জেলায় জেলায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রংপুর সাহিত্য পরিষদের নেতাদের মত অক্লান্তকর্ম্মী আর একটী করিয়া সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র। কিন্তু এটাও গেল একটা মণ্ডলী গঠনেরই কথা যাহা দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজই চলে এবং তাহা সাহিত্যের পরিপোষকেরা প্রকৃত সাহিত্যসেবী না হইলেও গড়িয়া তুলিতে পারেন। সাহিত্য প্রচারকল্পে ইতিপূর্ব্বেই আমি যে একদল প্রচারক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব কামনা করিলাম তাঁহাদের দ্বারা কি কাজ হইবে, তাঁহাদের আদর্শ কি ও তাঁহাদের পথ-ই বা কোনটী তাই এখন আমাদের আলোচ্য। সাহিত্যের কথা

ভাবিতে ভাবিতে যখন অতীতের দিকে তাকাই, তখন কি দেখি না শিক্ষাগুরু পরিবৃত শিক্ষাব্রতধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংস্কৃত সাহিত্যে কোন উপহার দিয়াছেন, মধ্যযুগের সন্ন্যাসী শঙ্কর, রামানুজ, কুমারিলভট্ট প্রভৃতি মনীষিরা লোকশিক্ষার জন্য মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া সাহিত্যের কতটা গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন? আমরা কি পুরাণেতিহাসে উপমন্যু আরুণির উপাখ্যান পড়ি নাই? অধুনা আমরা পাশ্চাত্য মোহে অভিভূত তাই এই সমস্ত শিক্ষকজীবনের সার্থকতা দেখিতে পাই না। এরূপ লোকশিক্ষক এখনো বর্ত্তমান থাকিলেও সমাজে তাঁহাদের জন্য আদর ত নাই বরং বিদ্রূপবাণী আছে—"কোন ক্ষমতা নাই কাজেই উনি ত্যাগী, কাজেই উনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক।" ইহারাই যে দেশের প্রকৃত নিয়ন্তা সে কথা আমরা জানিয়াও জানিতে চাহিতেছি না। দেশের যে কোন প্রকার উন্নতি যে ইঁহাদেরই হাতে তাহা ভুলিয়াছি আমাদের দরিদ্রতায়। তাই সাহিত্য আলোচনার বা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র যে দেশের শিক্ষালয়গুলি তাহাও আমাদের মনে নাই। বৈদিকযুগে শুনি, স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতি সব কাজই করিত। স্ত্রীলোক শাস্ত্রাদি রচনা করিতেন। সে যুগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, ঐতিহাসিকেরা বলেন সে যুগে ভারতবর্ষ যে খুব বেশী উন্নতিলাভ করিয়াছিল এমন নয়। বৌদ্ধযুগে দেখিয়াছি লোকশিক্ষার ভার ধর্ম্মযাজক বা সন্ন্যাসীদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাদি চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজদরবারে সাহিত্যের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা কেহ কেহ শিক্ষাব্রত লইয়া জীবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। এই যুগ হিন্দুসভ্যতার চরমোৎকর্ষের যুগ। এ সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতিষ্ঠা কমিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগের বা মুসলমান যুগের প্রথমভাগে সন্ন্যাসীরাই লোকশিক্ষক রহিলেন কিন্তু বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিল। ধর্ম্ম ও দর্শন সাহিত্যই সমাজ-জীবনে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। রাজ-সাহায্য অভাবে অন্যান্য সাহিত্য ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদানীন্তন যুগসাহিত্যে স্ত্রীলোকের নাম বড় দেখা যায় না। ইহার পর হইতে শিক্ষার ভার সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে রাজার হস্তে আসিল। লোকশিক্ষা সাহিত্যসৃষ্টির উপায় না থাকিয়া জীবিকা-সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হইল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় অধঃপতনের যুগ চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি বাক্‌দেবীর আরাধনা করিতেছেন বটে কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমশঃ জীবিকা অর্জ্জনের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। এখন আর লোকশিক্ষক ধর্ম্মবেত্তা বা শিক্ষাব্রতধারী সন্ন্যাসী নহেন। সাহিত্য সৃষ্টিও এখন তাঁহাদের কার্য্য নহে। এখন যাঁহারা একাধারে উপাসক ও শিক্ষাব্রতধারী তাঁহাদের এ দুইটী বিষয়ের মধ্যে আর আগেকার সাধ যোগ নাই। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য প্রচার ও আলোচনার যে নূতন কেন্দ্র আমরা সৃষ্টি করিয়াছি সেগুলি হইতেছে—পরিষৎ, সম্মিলন ও পাঠাগার। প্রচার কার্য্যে ইহাদের মধ্যে সম্মিলনই অগ্রণী। কেন না ইহা প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখি এত বড় একটা বিশাল দেশ—যাহার লোক

সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট কোটী এবং শতকরা ৮ জন মাত্র শিক্ষিত; সে দেশে বৎসরান্তে এমন দুই একটা সম্মিলন বা দুই দশটা পুস্তকাগার-পরিষদে বাস্তব পক্ষে কতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব। আর সম্মিলনে ত কয়েকজন লোকে কয়েকটা সন্দর্ভ পড়েন মাত্র। সে সন্দর্ভও সাধারণ লোকের অবোধ্য। সুতরাং তাহাতেই বা প্রচার কার্য্য কতটুকু অগ্রসর হইতেছে? আবার আজকাল সম্মিলন ত বিশেষজ্ঞের সম্মিলন স্থান হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল দেশীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কলেজগুলি এখন এক একটা সাহিত্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখানে নব সাহিত্য সৃষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। এটা কিন্তু এখনকার মত একটা ভুল ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা যে বাঙ্গালা শিখে তাহাতে তাদের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না। সংবাদ পত্রাদিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র ছাত্রী-গণের প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা একটু আশা-ন্বিত হই, অনুসন্ধানে জানা যায় তাহার অধিকাংশই সহরের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং লেখকদিগের প্রতিবেশ প্রভাব ঐ কার্য্যের অনুকূল। এ সব লেখায় জাতির ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে না—সে নিশ্চয়। সবুজ পত্র সম্পাদকের সহিত এই কারণেই আমার মতানৈক্য।

স্বদেশী আন্দোলনে একটা সত্যপথ দেখাই-য়াছে যে তোমরা ঘরে ফের। পল্লীর দিকে একবার তাকাও। সেইখানেই তোমার যত কিছু বল নিহিত। আরো পল্লীসংস্কার কর তারপর জগতের কাছে তোমার দাবী করিও। এই হতভাগ্য পল্লীগুলি লইয়া সেই কারণেই আজ এত টান পড়িয়াছে যে কলমের খোঁচায় তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত লোক ত বাহির হইল না। সাহিত্যিকেরাও কেহ কেহ আজ কাল একটা ধুয়া ধরিয়াছেন—"সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন তোল, পল্লী-সেবক সাজিয়া সাহিত্যসেবক, পল্লীগ্রামে প্রবেশ কর।" জিজ্ঞাসা করি, কে তাহা করিবে? আপনারা ত সহরবাসী, গ্রামে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজ ছাইয়া আছে। আপনারা সেখানে যাইয়া কাজ করিতে পারিবেন না তবে এ আদেশ পালন করিবে কে? যাহারা এতকাল পল্লীর সেবা করিতেছিল সেই কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও তাহারাই কর্ম্মী। তাদের সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, বল নাই, বুদ্ধি নাই, আছে কেবল দৈন্য আপ্লুত হাহাকার, আর মুমূর্ষুর বাঁচিবার আশায় বহুশ্বাস ত্যাগের শেষ চেষ্টা। তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, ওসব Patriotic Philosophy বা দেশ প্রীতি-তত্ত্বে শুধু কাজ হইবে না অথবা তাহাতে সাহিত্যের আভিজাত্য ঘুচিয়া যাইবে না। সাহিত্য লোক-শিক্ষক সাজিয়া সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেও কোন ফল ফলিবে না। যে প্রণালীতে চলিলে সাহিত্য সমাজ-জীবনের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে তাহা পল্লী-বাসীর মুখে শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত। এইটী মনে করিয়া আজ আমি আপনাদের সকাশে সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। আপনারাই ভাবিয়া দেখিবেন এটা কতদূর কার্য্যকরী।

আমি পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়ত আমাদিগকে আর একবার ইতি-হাসের পুনরাবৃত্তি করিবার সময় আসিয়াছে। আমার মনে হয় দেশের শিক্ষালয় গুলিকে শুধু

অর্থাগমের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া আমরা প্রকৃত জ্ঞান সাধনা বা সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি এবং সেটী এক মাত্র সম্ভব এদিকে বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ দ্বারা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি সাহিত্য সম্মিলন ও আন্দোলন ব্যাপারে যোগদান করেন তবে তাঁহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের চিত্র আমরা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তাহাই প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য হইবে। কারণ তাঁহারা যত বেশী সমগ্র পল্লীর সুখ দুঃখের সহিত, দরিদ্রের আশা ভরসার সহিত, গ্রাম্য কুলীদজীবীর ব্যবহারের সহিত পরিচিত,শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহই তত নহেন। তাঁহারাই বঙ্গের ভাবী-যুগপ্রবর্ত্তকের শিক্ষাগুরু সুতরাং তাঁহারাই ত আমাদের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। দেশে যে স্বরাজাভাসের একটা আভাস আমরা পাইতেছি তাহাতে আমি অনুভব করিতেছি বঙ্গীয় শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের সমাজ দেহে পুনর্জ্জীবন দান করিবেন। দেখিব তাঁহারাই সেই অতীত যুগের সর্ব্বত্যাগী শিক্ষাব্রতধারী লোক শিক্ষক-রূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারাই আবার লোক শিক্ষকরূপে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যে সব নবীন জীবন গড়িয়া উঠিবে তাহাতেই বঙ্গের প্রকৃত বাণী ফুটিয়া উঠিবে। তখন আমাদের আজিকার সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হইবে। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করা দরকার কিন্তু যাহাতে সে দিকে অগ্রসর হইতে পারি তাহার ব্যবস্থাও দরকার।

এখন ভাবিবার বিষয়, বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোন্ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিলে আমরা অধিক ফল পাইব। আমার প্রস্তাব, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রমণ্ডলীকে লইয়া প্রত্যেক পল্লী বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধীনে এক একটা পল্লী পরিষদ গঠন করা হোক। এই পল্লীসমিতিগুলি স্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, সামাজিক সমস্যা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করুন এবং তাহার ফলাফল সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করুন। তাহাতে শীঘ্রই আমরা দেখিতে পাইব এমন অনেক নূতন সত্য তথ্য পল্লীর ভাষাতে ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা কবি, দার্শনিক সমাজ-সংস্কারক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সকলেরই আদরের সামগ্রী, সকলেরই আলোচনার বিষয়। আর একদিকে পল্লীর এই শিক্ষা বাহকেরাই নব্যভাব ও নব্য-সাহিত্য প্রচারে যত সহায়তা করিতে পারেন অন্য কাহারও পক্ষে তত সম্ভবপর নহে। তাঁহারাই পল্লী কবির গানে নূতন সুর ধরাইবেন; পল্লীর যাত্রাল তাঁহাদেরই কাছে 'স্কুল মাষ্টারের ভায়' রবি বাবুর 'ফাল্গুনী' নাটকের বাউল সাজিতেও শিখিবে; পল্লীর গায়ক হরি সংকীর্ত্তনের ভায় দেশ-কীর্ত্তন গাইতেও জানিবে। তখন আর আধুনিক সাহিত্য আভিজাত্য গৌরবে দূরে সরিয়া যাইবে না, পক্ষান্তরে উহার 'উচ্চ ভাব' সমূহ পল্লীকৃষকেরও আয়ত্ত হইবে। সাহিত্যে বাস্তব লইয়া তখন আর বেশী গোলযোগের কারণ থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সে দিন ধন্য হইবে যে দিন তাহার ভাণ্ডার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ধমনীতে ধমনীতে জীবনরস সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সেদিন আর কতদূর!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জীবাভিব্যক্তিবাদ

আজ কাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কৃপায় নানা প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বের উদ্ঘাটন হইতেছে, তাঁহারা অভিব্যক্তিকে সার্ব্বভৌম নিয়ম—সর্ব্বার্থে সাধিকা—বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং জীবের আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন তাহার প্রতিবাদ বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি সকলের বুদ্ধিবৃত্তি সমানভাবে পরিবর্দ্ধিত না হওয়ায় কেহ কেহ এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই জীবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

বর্ত্তমান জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ধরিয়া লইয়াছেন অভিব্যক্তি যখন সর্ব্ববস্তু উৎপত্তির নিয়ম, তখন জীবের উৎপত্তিও ঐ নিয়মের অন্তর্গত। সুতরাং কোন এক অপরিজ্ঞেয়—অলক্ষণ, বিস্তৃতক্রিয়াকার বীজ হইতে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেষ্টনীর প্রভাবে—কি উদ্ভিদ, কি জন্তম সর্ব্বপ্রকার প্রাণীই ক্রমশঃ স্ব স্ব আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে ব্যাকৃত হইয়াছে। ঐ মূল বীজ আমাদের দৃষ্টির অগোচর—অনির্দ্দেশ্য। ইহাতে কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হয়। জগতে স্থাবর ও জন্তম সর্ব্বপ্রকার জীবের মূল কারণ ঐ বীজ। উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া এই যে বীজের ক্রমবিকাশ, ইহা কোন জ্ঞানশক্তি পরিচালিত নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি এই জীববৈচিত্র্যের ও জীবন সমরে জয়ী হইবার বিশেষ সহায়ক। এই ক্রমবিকাশের মূলে কোন জ্ঞানশক্তি বা কোন উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত নাই। ঐ বিকাশ উদ্দেশ্যশূন্য—লক্ষ্যশূন্য নিয়ন্তাশূন্য—ইহাই ইঁহাদের স্ফুট সিদ্ধান্ত। প্রাণীতাত্ত্বিকগণ বলেন পৃথিবীর শৈশব অবস্থায় এই প্রকারেই জীব সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অধুনা প্রকৃতিদেবী আর এক বীজ হইতে বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি করেন না। অধুনা তাঁহার রীতি নীতি একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ঐ প্রকারে জীবাভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত আজ কাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহা হউক, সময়ের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেক নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তখন উক্ত নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? পক্ষপাত শূন্য হইয়া একবার কল্পনার কনকপক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদের এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইবে, আমাদের অনুমান সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

মহামতি স্পেনসার বলেন—"The investigations of Wolff, Goethe, and von Baer, have established the truth that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an

advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage, every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in texture and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between two parts of this substance; or, as the phenomenon is called in physiological language, a differentiation.

This process is continuously repeated—is simultaneously going on in all parts of the growing embryo; and by endless such differentiations there is finally produced that complex combination of tissues and organs constituting the adult animal or plant. This is the history of all organisms whatever." (Spencer's Essays—A selections—R. P. A. series.

বাস্তবিক আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই একটি বীজ,অবস্থার প্রভাবে,কিছু দিনের মধ্যেই একটি অঙ্কুরে, পরে মহান অটবীতে পরিণত হইতেছে। এই পূর্ণমূর্ত্তি অটবী ও ইহার মূল বীজে বৈলক্ষণ্য এত বেশী, যে কোন প্রকার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। কি আয়তনে, কি গঠনে, কি বর্ণে,কি আকারে কি রাসায়নিক উপাদানে উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তথাপি কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বীজটি ঐ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন এত আস্তে আস্তে—এত সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে, কোন মুহূর্ত্তে এ কথা বলিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই—"এই খানে বীজের শেষ, এইখানে বৃক্ষের আবির্ভাব।" উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্বন্ধেও এইরূপ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্রোত পরিবর্ত্তনকে অণুবীক্ষণ সংযোগে নিরীক্ষণ করিয়াও পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাকে ধরিতে পারে কাহার সাধ্য? ধীরে ধীরে যখন ঐ পরিবর্ত্তন মূলমূর্ত্তিতে আগমন করে, তখনই আমরা একটা বিভিন্ন বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। যাহা হউক প্রাণী নিচয় যে মূলীভূত বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তাবয়ব হয় পূর্ণমূর্ত্তিতে আগমন করে, তাহা প্রত্যক্ষ-লব্ধ-সত্য, অস্বীকার করিবার যো নাই। বৃক্ষ ও ভ্রূণের ক্রমবিকাশ কে অস্বীকার করে? পরন্তু একই প্রকার অলক্ষণ (Homogeneous) বীজ হইতে সমস্ত উদ্ভিদ ও জঙ্গম প্রাণীর অভিব্যক্তিবাদীয় কি না তাহাই আমাদের আলোচ্য। আমরা বিবেচনা করি অভিব্যক্তিবাদিরা যদি সকল দ্রব্য হইতে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এই প্রকার কল্পনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কল্পনা সমীচীন নহে। তাহা হইলে ইহারা এক হস্তে আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন অপর হস্তে পুনর্ব্বার তাহা ছিনাইয়া লয়েন এবং এ প্রকার হইলে,—কি প্রকৃতির রাজ্যে, কি মনের রাজ্যে আমাদের গবেষণার সমস্ত বৈজ্ঞানিকতা বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু হইতে সর্ব্ব বস্তুর উদ্ভব হয় না। আমরা সাংখ্যের এ মতে কোনপ্রকার ভ্রান্তি দেখিতে পাই না। সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি দৃষ্টান্তবাধিত। মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হয়, সিকতা বা বারি হইতে হয় না, ভিন্ন বীজেই ভিন্ন জাতীয় তৃণ

আবির্ভূত হয়, বটবৃক্ষ আবির্ভূত হয় না। বট বীজ হইতে এরণ্ড জন্মে না। ইত্যাদি স্থলে আমরা দেখিতে পাই এক উপাদানে বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয় না। তেমনি মনুষ্যের বীজ বৃক্ষোৎপত্তির কিম্বা মানুষের প্রাণীর উৎপত্তি কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং একই প্রকার বীজ হইতে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর অভিব্যক্তি হইয়াছে এ-মত কি প্রকারে গ্রহণীয় হইতে পারে?

অবশ্য প্রচুর ক্ষমতাপন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর উপাদানীভূত বীজে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ধরা যায় না। একটি হংসডিম্বের মধ্যে যে দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়, একটি কুক্কুট অণ্ডের অভ্যন্তরেও সেই দ্রব্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্য বীজেও বোধ হয় সেই এক দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দ্রব্যকে রাসায়নিক দৃষ্টিতে দেখিলেও কোনপ্রকার বৈচিত্র্য অনুভূত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়াই কি ঐ তিন দ্রব্য বস্তুতঃ একই জিনিষ? একটি অশ্বত্থ বীজ ও একটি বট বীজ হস্তের উপর রাখিয়া কোনটি কি জাতীয় বীজ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না বটে; কিন্তু তাই বলিয়াই কি উভয় একই দ্রব্য? উভয়ের বিভিন্নতা অবগতির কি ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই? এমন কি হইতে পারে না যে ঐ বিশিষ্টতা ঐ বৈচিত্র্য এতই সূক্ষ্ম যে তাহা চর্ম্মচক্ষুর কিম্বা যন্ত্র শক্তির অগম্য? অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে ঐ সকল পদার্থের বীজগত শক্তি ভিন্ন ভিন্ন, উপাদান বিষয়ে উহারা যতই কেন অভিন্ন বা একাকার বলিয়া প্রতিভাত হউক। শক্তির পার্থক্য ফলের পার্থক্য হইতে অনুমেয়। কার্য্য-দর্শনেই শক্তির অনুমান। কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি দুর্নির্দ্দেশ্য। যদি একথা স্বীকার্য্য হয়, তবে ফলগত বৈলক্ষণ্য দর্শনে উপাদান শক্তির বৈলক্ষণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাই যখন দেখিতে পাই হংসডিম্বে কোন হংস, মনুষ্য বীজে কেবল মনুষ্য, পশুর বীজে কেবল পশু উৎপন্ন হয় তখন তত্তৎ বীজ শক্তি যে পৃথক পৃথক তাহা আমরা অনুমান করিয়া থাকি। এবং ঈদৃশ অনুমান সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ।

স্পেনসার স্বয়ং একথা স্থানান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন—

"We are still in the dark respecting those mysterious properties in virtue of which the germ, when subject to fit influences, undergoes the special changes that begin the series of transformations. All we aim to show is, that given a germ possessing those particular proclivities distinguishing the species to which it belongs, and the evolution of an organism from it, probably depends on that multiplication of effects which we have seen to be the cause of progress in general, so far as we have yet traced it." (Essays. pp. 27 25).

স্পেনসার উক্ত বাক্যে যাহাকে প্রচ্ছন্ন গুণ বা প্রবৃত্তি বলিয়াছেন তাহা জীব অভিব্যক্তি ব্যাপারে নিতান্ত নগণ্য সামগ্রী নহে। আমার বোধ হয়, জীবগত পার্থক্য ব্যাখ্যাতই হইতে পারে না যদি না উহা ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং কোন বীজ কোন পূর্ণমূর্ত্তিতে পরিণত হইবে, অভি-

ব্যক্তির প্রথম হইতেই তত্তৎ বীজে তাহার নিয়ামিকা শক্তি নিহিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত আছে অমুক বীজ অমুক মূর্ত্তি পর্য্যন্ত অগ্রসর বা অভিব্যক্ত হইবে, তাহার বাহিরে যাইবে না। প্রত্যেক উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য প্রাণীর মৌলিক বীজ যে ভিন্ন ভিন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করে, স্পেনসারের বাক্যে তাহারও সঙ্কেত রহিয়াছে।

তাই ভট্ট মোক্ষমূলার বলিয়াছেন—"From this admission of different beginnings it follows that each living cell can only become what, according to different philosophical points of view, it was fit or meant or willing to become, and that after it has fulfilled this purpose it remains fixed and does not go beyond. It follows from this that no living being and no class of living beings should be derived from any other, if they possess a single property which thus supposed ancestor does not possess either actually or potentially." (Science of thought p. 94).

পুনশ্চ—"If two things, be they roots or cells or any thing else, which appear to be alike, become different by evolution, their difference need not always be due to outward circumstances (commonly called environment), but may be due to latent dispositions which in their undeveloped form, and beyond the powers of human perception.

if two germs, though apparently alike, grow under all circumstances, the one always into an ape and never beyond, the always into a man and never below, then the two germs, though undistinguishable at first, and though following for a time the same line of embryonic development, are different from the beginning, whatever their beginning may have been." (p. 187).

কিন্তু পূর্ণ বিকাশিত অবস্থায় প্রাণীদিগের সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও, তাহাদের অবস্থা পরম্পরায় বিশ্লেষণ করিতে করিতে যদি মৌল অবস্থায় ব্যবহারতঃ কোন বৈচিত্র্য লক্ষিত না হয়, তাহা হইলেই বীজের অন্তরালস্থ অদৃষ্ট বৈলক্ষণ্যগুলিকে অস্পষ্ট বাক্যপ্রপঞ্চের মধ্যে চাপা দেওয়াই আজ কালকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রীতি। ঐ বৈলক্ষণ্যগুলি যখন কার্য্যতঃ অদৃষ্ট ও অপরীক্ষণীয় তখন ঐ গুলিকে বৈজ্ঞানিকগণ অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু যদি দেখিতে পাইতাম তাঁহাদের এ প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত তাহা হইলে তাঁহারা কতকটা প্রশংসা ভাজন হইতে পারিতেন। তাঁহাদের গবেষণার অন্যান্য স্থলে অদৃষ্ট ও প্রচ্ছন্ন শক্তি সগর্ব্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শক্তিতত্ত্বের অবিনশ্বরতা প্রতিপাদনপরায়ণ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ কেবল উদ্ভূত শক্তির গণ্ডী মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, ঐ শক্তির অবিনশ্বরতা প্রতিপাদন করা দুর্ঘট হইত। তাই তাঁহারা শক্তির

অপ্রভূত প্রচ্ছন্ন একটা অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন। এবং মনে করেন যখন শক্তিকে অবিনাশী বলা হয়, তখন এই উভয় শক্তির সমষ্টিই অবিনাশী; বিষয়ব্যাখ্যানুরোধে যেমন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন শক্তির সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য; বিষয় ব্যাখ্যানুরোধে তেমনি তাঁহারা ভ্রৌণ অবস্থার অন্তরালস্থ প্রচ্ছন্ন বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। উহা অস্বীকার করিলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। ডিউক অব আরগাইল বলিয়াছেন—

"If, for example, in the albumen of an egg there be no discernible differences either of structure or of chemical composition, but if, nevertheless, by the mere application of a little heat, part of it is differentiated into blood, another part of it into flesh, another part of it into bones, another part of it into feathers, and the whole into one perfect organic structure, it is clear that any purely chemical definition of this albumen or any purely mechanical definitions of it, would not merely fail of being complete, but would absolutely pass by and pass over the one essential characteristic of vitality which makes it what it is, and determines what it is to be in the system of Nature." (Unity of Nature).

এক্ষণে যে প্রণালীতে একটী হংস ডিম্ব পূর্ণ হংসে বিকাশিত হয়, ঠিক সেই প্রণালীতেই একটী কুক্কুট ডিম্ব পূর্ণ কুক্কুটে অভিব্যক্ত হয়—ইহা বুঝা যাইতেছে। বাহ্য প্রণালী উভয়ত্রই একবিধ; কিন্তু যাহা এই বিশিষ্টতার নিয়ামক তাহা অবশ্যই মূলে সন্নিবিষ্ট না থাকিলে এই ফলবৈশিষ্ট কোথা হইতে আসিবে?

যাহাকে অভিব্যক্তি (evolution) বলা হইতেছে তাহা একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া মাত্র (a mere process)। প্রক্রিয়া কি কখনও লক্ষ্যবর্জ্জিত? তাহা নহে এই লক্ষ্য প্রাপ্তির যাহা প্রণালী তাহাই অভিব্যক্তি। সুতরাং অভিব্যক্তি স্বতঃ বস্তুবৈশিষ্টতার নিয়ামক নহে, পরন্তু অভিব্যঞ্জক। প্রত্যেক প্রক্রিয়ারই আরম্ভ ও উপসংহার আছে। এবং বস্তুর পূর্ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করাই উহার উপসংহার। যে পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তি বিকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্তই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। দৃষ্টির দিক হইতে দেখিতে গেলে অবশ্য এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিব্যক্তির ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বুদ্ধির দিক হইতে দেখিতে গেলে উহা যে প্রাক্‌সিদ্ধ তাহা বুঝিতে গোল হয় না। ঐ লক্ষ্য ভাবরূপী এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাই ঐ প্রক্রিয়া।

দার্শনিক ইতিহাস প্রণেতা লিউয়েস কিন্তু এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। অভিব্যক্তির মূলদেশে যে একটা লক্ষ্য আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে, তিনি তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলেন জীবদেহ কোন উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া সৃষ্ট হয় না; পরন্তু উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাস দেখিয়াই আমরা একটা উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য গোড়া হইতে উহার উপাদানিকৃত বীজকে পরিচালিত করে না, কিন্তু অবয়ব-

গুলির সামঞ্জস্যেই একটা উদ্দেশ্য উদ্ভূত হয় (the parts with their adjustments evolve a plan)। নিম্নে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"Let us first see what experience tells us of the development of an organism. The ovum and the seed are starting-points from which an animal and a plant may, *under requisite conditions*, be developed. This is the expression of our experience. By a regressive movement of Thought. We carry the developed organism back again to its starting-point (*minus* the conditions of development, therefore), and form a concept of the ovum and seed as *potentially* containing the animal and the plant. • • • Assuredly not that the lineaments of the animal are actually present in the ovum they do not exist. When you say that they exist *potentially*, what is the translation of your phrase? It is, that under a given history—under a successive series of particular conditions a special result will ensue. If we know the conditions and their succession we may foretell the result. The law of causation determines it. Any variation in any one of the conditions will be followed by a corresponding variation in the result. • • • In mathematical phrase, the Plan is the function of Development and Developing conditions, and is variable with every variation of either." Science and Speculation).

লিউয়েন সাহেবের যুক্তিহীন বাক্যে আমরা সায় দিতে পারিতেছি না। অবস্থা বিশেষের ক্রমপরম্পরার অধীনে জীবের অভিব্যক্তি ঘটে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বজীবেই সাধারণ। যাহা সর্ব্বজীবে সাধারণ, তাহা জীবের বিশিষ্টতার নিয়ামক হইতে পারে না। যে অবস্থা-পরম্পরার অধীনে রাখিলে হংস ডিম্ব হইতে হংস শাবক আবির্ভূত হয়, সেই অবস্থা পরম্পরার অধীনে একটি কুক্কুট ডিম্ব হইতেও কি হংস শাবকের আবির্ভাব হইবে? তাহা কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার মতে উভয় ডিম্বের মধ্যে কোন প্রকার উপাদানগত বৈচিত্র্য বা বিশেষ শক্তিও নাই। সুতরাং কেন যে কুক্কুট অণ্ড হইতে ঐ অবস্থা পরম্পরার অধীনে হংস শাবক আবির্ভূত হইবে না, তাহারও কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। স্বীকার করি অবস্থা বিপর্য্যয়ে ভাবী জীবের অঙ্গাদির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে কি প্রমাণিত হয়? তাহাতে ভাবী জীবের জাত্যন্তর ঘটিবার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না; তাহাতে এইটুকু মাত্র সপ্রমাণ হয় যে ঐ ভাবী জীব পূর্ণাঙ্গ না হইয়া বিকলাঙ্গ—বা অসম্পূর্ণাঙ্গ জীবরূপে আবির্ভূত হইবে। হংস ডিম্ব হইতে অবস্থার বিপর্য্যয়ে হংস জাতীয়ই একটি বিকৃত জীব অর্থাৎ একটি বিকৃত হংস আগমন করিবে। পরন্তু হংস ডিম্ব হইতে একটি ভিন্ন জাতীয় জীব আবির্ভূত হইবে এ কথা সত্য বলিয়া

স্বীকার করা যায় না। ভাবী জীবের বিশিষ্টতার নিয়ামক কেবল তদ্বীজের বিশিষ্টতা। অভিব্যক্তির কারণ কলাপ জানিতে পারিলে অবশ্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিতে পারি জীব অভিব্যক্ত হইবে কি না। কিন্তু কোন জাতীয় জীব অভিব্যক্ত হইবে, তাহা আমরা কদাচ অনুমান করিতে পারি না, যদি বীজের জাতিগত বৈশিষ্ট সম্বন্ধ আমাদের পূর্ব্বে কোন জ্ঞান না থাকে। অতএব ভাবী বা উৎপাদ্য জীব বা উদ্ভিদ যে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে শক্তিরূপে তত্তৎ বীজে অবস্থিত, তাহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করিতে হয়। ঐ শক্তি প্রাণরূপী শক্তি—কেবল বাহ্য কারণ কলাপ সহায়ে আত্মপ্রকটন করে মাত্র। তাই একজন দার্শনিক বলিয়াছেন,—

"An acorn cotains potentially a whole sak forest All that is required is the stimulating influence of soil, water, light, air, and heat, *to act* upon it, and then the acorn must perforce grow into an oak. The tendency which is inherent in the seed is a part of its being—indeed, essential to it—therefore the acorn cannot become anything else. It may, owing to its environment, become a crippled, dwarf tree, and as whither away, or it may become an oak forest extending for miles; never, however, under any possible circumstances, could it become a potato-filed or a flock of sheep." (Monism by S. P. H. Mercus M.D.). তাই হয় ত পণ্ডিত হক্সলী বলিয়াছেন—"A whole does not lend to vary in the direction of producing feathers, nor bird in the direction of producing a whole-bone."

আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। নির্দ্দিষ্ট অবস্থাধীনে জীবকোষের যে ক্রমিক বিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা সর্ব্বত্রই এক প্রকার ক্রমশঃ একটি পরিবর্ত্তনের পরে আর একটি পরিবর্ত্তন, তৎপরে অন্যটি ইত্যাদি—যে পর্য্যন্ত না জীবের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন পরম্পরা কোন স্থলে দ্রুত সম্পাদিত কোন স্থলে অপেক্ষাকৃত ধীরে সংসাধিত। অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, তাহারও একটা নিগূঢ় অর্থ রহিয়াছে। উৎপাদ্য জীব যে প্রকার জীবন যাপন করিবে, তাহার সাধনানুকূল যে সকল অঙ্গের আরও প্রয়োজন, সেইগুলিই দ্রুত বিকাশিত হয়, কিন্তু যে অঙ্গগুলি বিলম্বে ব্যবহৃত হইবে তাহারা অপেক্ষাকৃত ধীরে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। সুতরাং ভাবী জীবের প্রয়োজন অনুসারেই এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কোথায়ও বা ত্বরিতে, কোথায়ও বা অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সম্পাদিত। ডিউক অব আরগাইল বলেন—

"Sir J. Lubbock tells us that whilst these transformations as a whole are in a sense the same in all cases, they differ widely in the rapidity with which different organs are developed in different insects; and he adds that the condition of those organs at the time of birth or hatching of the egg,

depends mainly on the manner of life which the larva is intended to lead. Those organs are well developed which are requisite for immediate use in the larval state, whilst those other organs which are destined for a future stage are present only in rudiments or in germ. (Unity of Nature.)

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি পণ্ডিত লিউয়েসের সমর্থ বাক্যের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে প্রদর্শন করিলেও, ক্রমোন্নতির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। যে অদৃষ্ট শক্তির পরিচালনায় ঐ স্তরগুলি উত্তরোত্তর প্রকটিত হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তনের স্তর বা ক্রমগুলি দেখাইয়া দিলেই অভিব্যক্তির রহস্য ভেদ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ সে শক্তিকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে চাপা দিতেই বদ্ধপরিকর। ইহা সাহসের পরিচয় নহে, বরং ভীরুতারই নিদর্শন। তাই একজন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত বলিয়াছেন—

—"As in the case of the oviparous species, scientists have ascertained by dissection all the stages through which the embryo passes till its exit from the womb complete and alive. But of the nature of the power which conducts it through all these stages they seem entirely ignorant ,and the Darwinian must acknowledge the inability of his theory to solve the mystery." পুনশ্চ—"It is true that biologists can tell us hour by hour all the progress made in the process of conversion of two structureless substances into a live chicken. But that throws no light on the question, what is the formative power which causes the whole process. One certain truth is that this cause is invisible, and if therefore the microscopist observers were enabled to see through the shell of the egg, and were to watch every thing that went on inside it from the moment when the egg was laid till the chicken came out of it, they would learn no more than what we know at present."

যাহাহউক অভিব্যক্তিবাদে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; তাহাদের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে পারে। প্রথমতঃ Homogeneityর প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। Homogeneous কাহাকে বলে? Fiske বলেন:—"An object is said to be *homogeneous* when each of its parts is like every other part. An illustrations is not easy to find, since perfect homogeneity is not known to exist. But there is such a thing as relative homogeneity; and we say that a piece of gold is homogeneous as compared with a piece of wood; or that a wooden ball is homogeneous as compared with an orange."

এক্ষণে কথা হইতেছে জীবাভিব্যক্তির মূলীভূত বীজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ কি না তাহা জানা যায় না। যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ নামে কোন বস্তু সংসারে না থাকে, তবে অবশ্যই ঐ বীজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ বস্তু নহে। তাহা হইলে উহা আপেক্ষিক নির্ব্বিশেষ সন্দেহ নাই। তাহার অর্থ, ঐ বীজের অংশ বিশেষের কোন বিশিষ্টতা নাই; এবং অপরাপর বীজের তুলনায়ও উহার কোন বিশিষ্টতা নাই ("Each part of the germ-cell is as nearly as possible like every other part, in molecular texture, in atomic composition, in temperature, and in specific gravity..... In the first place all animal germs are homogeneous with respect to each other; .....in the second place, each germ is homogeneous with regard to itself.")

দ্বিতীয় শব্দটি heterogeneity। ইহার অর্থ কি? Fiske বলেন—"An object is said to be heterogeneous when its parts do not resemble one another." আমাদের ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য—বৈচিত্র্য।

তৃতীয় শব্দটি Differentiation। ইহার অর্থ কি? Fiske বলেন—"Differentiation is the arising of an unlikeness between any two of the units which go to make up an aggregate. It is the process through which objects increase in heterogeneity."

এ শব্দগুলি ছাড়া আরও কতিপয় পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যথা Influence of environment (পারিপার্শ্বিক প্রভাব), Natural Selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন), Sarvival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন)। Accidental variation (আকস্মিক ব্যতিক্রম), Heredity বংশানুক্রম), ইত্যাদি।

অন্যান্য শব্দগুলির বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা যাউক।

প্রথমতঃ, জীবসমূহের বীজগুলির আভ্যন্তরীণ প্রভেদ নাই অর্থাৎ স্বগত ভেদ নাই এবং স্বজাতীয় ভেদ নাই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যে বস্তুতে স্বগত ও স্বজাতীয় ভেদ অস্বীকার করা হইল, পরক্ষণে তাহাতে বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইল—যাহা পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ছিল তাহা বিচিত্র হইল। কি প্রক্রিয়াতে ইহা সম্পন্ন হইল? Differentiation দ্বারা। অর্থাৎ অবিশেষ বস্তু বৈচিত্র্যাগম দ্বারা বিচিত্র, বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। দেখা গেল যে বস্তু পূর্ব্বে একাকার—অবিশেষ ছিল, এক্ষণে তাহার অভ্যন্তরে বৈলক্ষণ্যের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কেন হইল—কোন শক্তির পরিচালনায় হইল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে কি? পরিবর্ত্তন পরম্পরা ত দেখিতেছি—কোন শক্তি কর্ত্তৃক উহা নিয়মিত তাহা দেখিতেছি কি? Differentiation একটা পরিবর্ত্তন—একটা কার্য্য—সুতরাং তাহার নিজেরই ব্যাখ্যা (account for) করা চাই; তাহাকে কারণ বলিয়া ধরা যাইবে না।

তার পর অন্যান্য শব্দগুলির তাৎপর্য্য আলোচনা করা যাউক।

Natural Selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন), নির্ব্বাচন শব্দের অর্থ 'বাছিয়া লওয়া'। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অর্থে তাহা হইলে প্রকৃ-

তির বাহিয়া লইবার ক্ষমতা মনে করিতে হইবে। কিন্তু বাহিয়া লওয়া ভাবটির মধ্যে যে সকল উপকরণ নিহিত আছে তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। উহার প্রথম উপকরণ—প্রায় সমান উপযোগী—বহুবস্তুর উপস্থিতি। দ্বিতীয় উপকরণ—তুলনামূলক বিচারশক্তি। চতুর্থ উপকরণ—ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান। বোধ হয় চতুর্থ উপকরণটি সর্ব্ব প্রথম হওয়া উচিত ছিল। কেননা উহা দেহ রক্ষা বা আত্মসংরক্ষণের উপযোগিত্ব জ্ঞাপক। কোন বস্তু আত্মসংরক্ষণের অনুকূল সে বোধ পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ না থাকিলে মনোনয়ন কার্য্য চলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে বাছিয়া লওয়া ব্যাপারটি একটি জটিল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া (subjective activity)। উহা কোনও মতে অচেতন নিষ্ঠ কৃতিত্ব (objective activity) নহে। সুতরাং প্রকৃতিতে আত্মভাব বা চৈতন্য আরোপ না করিয়া আমরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন শব্দের কোন অর্থই লাভ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে অচৈতন্য পদার্থের অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতির নির্ব্বাচনতা যদি ঈদৃশ নির্ব্বাচন না হইয়া আমাদের জ্ঞানাতীত অন্যকোন প্রকার প্রক্রিয়াই হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের বুদ্ধিগম্য কি না, এবং ঐ প্রক্রিয়াকে নির্ব্বাচন আখ্যা প্রদান করা সঙ্গত কি না পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

Influence of Environment (পারিপার্শ্বিক প্রভাব)। এই কথা দুইটির অর্থ বৃত্তির (surroundings) প্রভাব। এই প্রভাবটি আত্মসংরক্ষণের অনুকূল অথবা প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। ইহাকে অনুকূল বলিতে আমার ভয় হয়, কেননা আত্মশক্তির অভাবে শরীরের উপর উহার বিপরীত প্রভাবই দৃষ্ট হয়। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অগ্নি আমাদের অনুকূল অথবা প্রতিকূল,—তাহার উত্তরে যেমন আমি বলিব—যতক্ষণ উহা আত্মপ্রযত্ন দ্বারা নিয়মিত—নিয়ন্ত্রিত, ততক্ষণই উহা আমাদের অনুকূল, যখনই আত্মপ্রযত্ন মন্দীভূত বা অসতর্ক তখনই ভয়াবহ—সর্ব্বনাশকর ;—ইহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকারই বলিব। জীবনান্তে দেহে যে বিক্রিয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাই পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বস্তুতঃ আনুকূল্য জ্ঞাপক। জীব বাহ্যশক্তিসমূহকে প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মসংরক্ষণের অনুকূল করিয়া তোলে এই মাত্র। সুতরাং ঐ প্রভাবের নিয়মে জীবের অভিব্যক্তি ঘটে কি প্রকারে বলা যায়? ঐ প্রভাব বশতঃ বীজবস্তুতে একটা বিকার সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু সে বিকার বৈচিত্র্য হইলেও অভিব্যক্তি আখ্যা লাভ করিতে পারে না।

Survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন)। যোগ্যতম যে সর্ব্বত্র জয়ী হইবে এ কথাটা ঠিক। যোগ্যতম না হইলে সমরে জয় লাভ অসম্ভব। অবশ্য শঠতা, প্রতারণা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোগ্যতার অঙ্গীভূত। কিন্তু কেমন করিয়া জীব যোগ্যতম হয় সেই টিই প্রশ্ন। যোগ্যতা বাহির হইতে অর্জ্জন করিতে হইলেও ভিতরকার একটা যোগ্যতা থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কোন জীব যোগ্যতম কি না তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? তাহার স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে জয় দেখিয়া। অর্থাৎ যোগ্যতম কে? না, যে জয়ী। আবার যদি জিজ্ঞাসা করি কে জয়ী হইবার পাত্র?—না, যে যোগ্যতম? সুতরাং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই বাক্যটি যোগ্যতার হেতু

বিষয়ক কিছু আভাস প্রদান করে না। যোগ্যতা থাকিলে তাহার উদ্ভবন সম্ভবপর এই তাৎপর্য্যটুকু প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু এ কথাটার কিছু নূতনত্ব নাই। আমরা বলিতে চাই এই যোগ্যতার স্বরূপ কি এবং উহা কোথা হইতে আগমন করে?

Accidental Variation (আকস্মিক ব্যতিক্রম)। অভিব্যক্তিবাদীর ইহাও একটি অমোঘ অস্ত্র। অথচ ইহার তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কথাটাকে নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়। ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার একটা পরিবর্ত্তন—অথচ উহা আকস্মিক—অর্থাৎ অহেতুক—ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় মত। বলিতে হইবে এই ব্যতিক্রমের হেতু অজ্ঞাত; এই অজ্ঞাত হেতু বুঝাইতেই আকস্মিক শব্দের ব্যবহার। কিন্তু যে স্পর্দ্ধার সহিত ঐ শব্দটির ব্যবহার হয়, তাহাতে মনে অন্যভাবের উদয় হয়।

Struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম) আর একটি বাক্য। আত্মরক্ষণ চেষ্টা হইতেই উহার উৎপত্তি। এবং এই আত্মরক্ষণপ্রবণতাই সর্ব্ব চেষ্টার মূলীভূত কারণ। ইহা হইতেই ক্রমশঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ, পুষ্টি ও পটুতা। মূল বীজের মধ্যে এই চেষ্টা নিহিত; নতুবা তাহার সম্বন্ধে জীবনসংগ্রাম অসম্ভব। নির্জ্জীব পদার্থের জীবনসংগ্রাম অবিরোধীভাব। অভিব্যক্তির ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন লাভের ইতিহাস নহে। লাভ ক্ষতির মধ্য দিয়া ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়। ইতর জন্তুর দেহই সর্ব্বস্ব, বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত ছোট কথা। তাহাদের দেহ তাই বলিষ্ঠ, পুষ্ট ও সুদৃঢ়। মানুষের চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, হনু, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইহাদের তুলনায় দুর্ব্বল, অপটু, অপরিপক্ক। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এই সকল অপূর্ণতার পরিপূরণ করিয়া থাকে। তাহার ক্ষেত্রে বুদ্ধিই প্রধান—তাই সে এখনও ধরাপৃষ্ঠে জীবিত, কেবল জীবিত নহে, প্রভুত্ব সহকারে জীবিত। অথচ কত মামথ, কত ডোডো প্রভৃতি জীবের অস্তিত্ব চির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষের বীজশক্তিতে অবশ্যই এই বুদ্ধিশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে না থাকিলে, পারিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতে উহা প্রকটিত হইত না, কিম্বা উহা প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ বীজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

বংশানুক্রম (heredity)। ইহার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ দেহের অংশ বিশেষে ঐ কার্য্যের একটা প্রতিমুদ্রা (impression) অঙ্কিত হয়। উহাকেই সংস্কার বলা যায়। এই সংস্কার তদ্দেহসম্ভূত প্রাণীদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। উত্তরকালজাত প্রাণী যেন উত্তরাধিকারীসূত্রে ঐ সংস্কার লাভ করে। এবং ঐ সংস্কার সংক্রম ফলেই, বুদ্ধির পরিচালনা নিরপেক্ষে, ভাবী প্রাণিবর্গ স্ব-অন্বয় সম্বন্ধ পূর্ব্বজাত প্রাণীবর্গের আচরণ সদৃশ আচরণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ সংস্কার পরিশেষে বদ্ধমূল হইয়া প্রাণীর স্বাভাবিক পটুত্বরূপে (instinct) পরিব্যক্ত হয়।

কিন্তু এই সংস্কার নিচয়ের অস্তিত্ব ও সংক্রম ব্যাপারটি যে রহস্যপূর্ণ তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ধরুন যেন একটা নব্য প্রস্ফুটিত হাঁসের ছানা। ডিম্ব হইতে বা'র হইয়াই উহা জলে সাঁতার কাটিতে পারে। এখানে মনে করা হয়, শাবকটির পূর্ব্বপুরুষের বহু চেষ্টার ফলে সাঁতার শিক্ষা করিয়া, অবিরত সাঁতার কাটিতে কাটিতে, সাঁতারকে

দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত করিয়াছিল, এবং ঐ স্বভাব বা অভ্যাস উহাদের কোন দৈহিক অবয়বে একটা প্রতিমুদ্রা বা ছাপরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। জীবনরক্ষণের অনুকূল হওয়ায় উহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। পরে উহা ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে, সংক্রম নিয়মে, একটা জাতিগত পটুতায় পর্য্যবসিত হইল। শরীরের কোন অবয়বে ঐ সংস্কার সঞ্চিত ছিল তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। হয়ত কোন স্নায়ুমণ্ডলীর এক দেশে অথবা মস্তিষ্ক কোণে আণবিক একটা পরিবর্ত্তন-রূপে সঞ্চিত ছিল। ঐ সংস্কার জীবাণুতে সংক্রামিত হইয়া উপযুক্ত স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা করে বলিয়া ঐ জীবও পূর্ব্বপুরুষের আচরণ অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু দেহের কোন অংশে স্নায়ুমণ্ডলীর কোন স্থানে এই প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহার আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চলে না। একটা প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, এই প্রকার ধরিয়া লওয়া হয় মাত্র। কোন অণুবীক্ষণ এ কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কোন ছাপ বা দাগের চিহ্ন আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক ঐ দাগের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইলেও কি প্রকারে উহা ভাবী সন্তানে সংক্রমিত হয় তাহা বুঝা যায় না। সংস্কারের আশ্রয়ীভূত দেহাংশ বিশেষকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে, দৈহিক অবয়বাশ্রিত সংস্কারকে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর কি না তাহাও বিবেচ্য। আমাদের গৃহীত দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করা যাউক। প্রথমতঃ ইহা হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ডস্থ পদার্থটি সর্ব্বাংশে অবিশিষ্ট (homogeneous)। উহার মধ্যে অবয়ব বিশেষের কোন লক্ষণ নাই। উহাতে তখনও স্নায়ুমণ্ডলী অনুৎপন্ন—মস্তিষ্ক অবিশিষ্ট। সুতরাং সংস্কারটি সাশ্রয় উন্মূলিত হইয়া উহাতে নীত হইলে, অণ্ডের বিশ্লেষণে ঐ বিশিষ্টতার চিহ্ন পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। অতএব সংস্কারটি সাশ্রয় সংক্রমিত হয় এ প্রকার অনুমান অমূলক। আবার যদি আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংক্রমিত হয়, এই প্রকার মনে করা যায়, তাহাও অমূলক কল্পনা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কেননা যাহাতে সংস্কার সঞ্চিত থাকে বা যাহাতে প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহাকে বাদ দিয়া কেবল সংস্কারটিকে স্থানান্তরিত করা যায় এ প্রকার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ সংস্কারের আশ্রয়টিকে যে অবিকল দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চালিত করা যায়—এই পরিবর্ত্তনে ঐ আশ্রয়টি যে বিকল বা বিকৃত হইয়া যায় না—ইহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? ইত্যাদি কারণে প্রাণীর দেহ নিবদ্ধ সংস্কার যে দেহান্তরে সংক্রমিত হয় সে মতটি নিঃসন্দেহ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কেবল 'হয় ত হইতে পারে'—এ প্রকার একটা কল্পনাকে সত্যের স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই জীবাভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিতে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহার কতকটা ঔপচারিক (figurative) এবং কতকটা অস্পষ্ট (confused in meaning) কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বৈজ্ঞানিকগণ মানবীয় ভাবারোপের প্রতিকূলতাচরণ করিতে যাইয়া যে সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে আত্মপ্রতারিত, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি অতি অল্প।

যাহাহউক, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াবশে জীবজগতের আবির্ভাব হইতে পারে; কিন্তু প্রক্রিয়ার মূলদেশে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করিতেছে, যে পর্য্যন্ত তাহার তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম উদ্ঘাটিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য প্রক্রিয়া মাত্র লইয়াই অভিব্যক্তি তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। প্রজ্ঞা উহা লইয়াই নিশ্চিন্ত বা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

শঙ্খের জন্ম কথা

'হুলিয়া'দের পাতায় ছাওয়া ঘর
সাগর তীরে আছে দেখা দেখা,
স্বর্গদ্বারের কাছেই নিরন্তর
ভক্ত সাধু বাস করিত একা।

(২)

ফণা তুলে নীলাম্বুধির ঢেউ
তাঁরে দেখেই লুটতো এসে কূলে,
শুক্তি আহা দেখত না ত কেউ,
মুক্তা তাঁহার ঢালতো পদ মূলে।

(৩)

রত্নাকরের রত্ন ভরা থালা
তাঁহার কাছে আনতো মনে মনে
স্তব করিত নিত্য সাগর বালা
সাধ্য কি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণে।

(৪)

সন্ধ্যাকালে ভক্ত গভীর স্বরে
ভগবানকে ডাকতো গভীর প্রেমে,
বইত তুফান বিশ্ব চরাচরে
সিন্ধুর রোল ক্ষণেক যেত থেমে।

(৫)

সঙ্গে তাঁহার উঠতো গেয়ে পাখী
উচ্ছ্বসিয়া উঠতো সাগর জল
ফুলগুলি সব মেলত কোমল আঁখি
ফুটতো শশী কনক শতদল।

(৬)

সে ডাক শুনে নয় নারীর প্রাণ,
কাহার লাগি উঠতো যেন কেঁদে,
প্রাণের মাঝে বাজত কিসের টান,
রাখতে ধরা পারত নাকো বেঁধে।

(৭)

কোথা হতে উঠছে এমন স্বর
এমন মধুর প্রাণ মাতানো রব,
সন্ধান তার চললো ধরা পর
রাজা প্রজা খুঁজতে লাগলো সব।

(৮)

অচেনা এক নরের হঠাৎ আসি
বল্লে আমি খোঁজ পেয়েছি তার,
ছুটলো লোকে আনন্দেতে ভাসি
লোকে লোকে ভরলো সাগর ধার।

(৯)

'চক্ষু মুদি' ডাকছে সাধু মরি !
ব্যাকুল প্রাণে সেই সে নিরঞ্জনে
অমৃত আঁখির ধর আলোক পড়ি'
ধ্যানটী তাঁহার ভাঙলো কতক্ষণে।

(১০)

চাইলে সাধু—জ্যোৎস্নারি ধারে,
ভূতল গগন উঠলো আহা ভেসে,
নরনারী সবাই একে বারে
চরণতলে পড়লো তাঁহার এসে।

(১১)

কোথায় সাধু মিলিয়ে গেল ধীরে
আঁধার হয়ে উঠলো শোকে ধরা
দেখলে লোকে ভাসি নয়ন নীরে
বুধীর রাশি কমণ্ডলু ভরা।

(১২)

পুণ্য হিয়ার শুভ্র প্রেমাঞ্জলি
ভাসিয়ে দিলে সাগর বুকে যবে,
সাগর বালা সিন্ধু নীরাম্বোলি,
হস্তে লয়ে নৃত্য করে সবে।

(১৩)

দেব বালার হুংকারেতে ভরা
শঙ্খ হলো সাধুর কুল রাজি,

আনন্দেতে ব্যাকুল করে ধরা
গভীর স্বরে উঠলো আহা বাণি।

(১৪)

চকিত হয়ে শুনলে নরনারী
ক্ষণেক তরে ভুলি সকল ব্যথা,
কাতর ব্যাকুল পরাণ পাগল কারী
কণ্ঠ সাধুর কণ্ঠে তাদের গাঁথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভূপৃষ্ঠের গঠনরহস্য

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ধরিত্রীদেহ সম্ভবতঃ শীতল উল্কাপুঞ্জ সমবায়েই সমুদ্ভূত হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও মোটের উপর ভূপৃষ্ঠটি এক সময়ে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা উষ্ণতর অবস্থায় ছিল। ইহা সহজেই অনুমেয়। উল্কাপিণ্ডগুলি একত্র জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বে কিছুকাল পরস্পরের মধ্যে খুবই সংঘর্ষ ঘটিত এবং উহার ফলে উহারা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ আঘাত জনিত উত্তাপ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না শীঘ্রই বিকীর্ণ হইয়া যায়। এদিকে আবার তাপক্ষয় সহকারে পদার্থসমূহের আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং এই সঙ্কোচ সাধন কালে সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তাপেরও উৎপত্তি হয়, সুতরাং মোটের উপর তাপক্ষয়ে বিলম্ব ঘটে। সঙ্কোচন জনিত এই তাপোৎপত্তি ব্যাপারটি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতে পারে। শক্তির প্রকৃত পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, শুধু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ইহা প্রকাশ পায় মাত্র। এখন মনে কর উচ্চ এক প্রাচীরের উপর কোন এক পদার্থ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐরূপ উর্দ্ধে অবস্থিত রহিবার জন্যই উহার ভিতরে যে শক্তিটুকু সঞ্চারিত হইয়াছে নিম্নে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত রহিলে সেইটুকু আর থাকিতে পারে না। এরূপ পদার্থটি ভূপতিত হইলে সেই শক্তিটুকু তাপের আকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ উল্কাপুঞ্জের সঙ্কোচন ঘটিবার সময়ও তদন্তর্গত উল্কাপিণ্ডগুলি যেন কোন উচ্চস্থান হইতে উল্কাপুঞ্জের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু অভিমুখে ধীরে ধীরে নিপতিত হইতে থাকে ও সেই সময় তদ্ধেতু একটা তাপোৎপত্তি হয়।

ধাতুসমূহ তাপের উৎকৃষ্ট পরিচালক। সুতরাং লৌহপ্রধান উল্কাপিণ্ডগুলি সঙ্কুচিত হইবার কালে উহাদের সর্ব্বাংশ শীঘ্রই সমভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং বহির্ভাগ হইতেও নিয়মিত ভাবে তাপক্ষয় ঘটিতে থাকিবে। ভিতরের প্রচণ্ড তাপে উল্কাপিণ্ডগুলির কিয়দংশ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। কঠিন পদার্থ তরল হইবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পায়। উর্দ্ধাংশের গুরুতার হেতু উল্কাপিণ্ডগুলির খুব ভিতরের অংশ আয়তনে

বাড়িতে পারিবে না, কাজেই খুব ভিতরের অংশ দ্রবীভূত হইবে না, বহির্ভাগের নিকটস্থ অংশই দ্রবীভূত হইবে। এদিকে বহির্ভাগের সুকঠিন ধাতব অংশ যতই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে ততই চাপ দিয়া ভিতরের এই দ্রবীভূত অংশটিকে বাহিরে ঠেলিয়া দিবে। হাপরে খনিজ পদার্থ গলাইয়া ধাতু নিষ্কাশনের সময় দেখা যায় যে দ্রবীভূত অবস্থায় উক্ত খনিজ পদার্থের ধাতব এবং প্রস্তরময় অংশ পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং ধাতব অংশটুকু হাপরের নিম্ন প্রদেশে সঞ্চিত হয়। ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই ভূগর্ভে ধাতুময় এবং ভূপৃষ্ঠে একটা প্রস্তরময় স্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

ধরিত্রীগর্ভে বহুদূর প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে উহার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে এখনও আমরা সমর্থ হই নাই, তথাপি ভূগর্ভ যে ধাতুময় অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে।

বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া বলেন ভূগর্ভের ভার সমায়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় দ্বিগুণ। সহজেই মনে হয় ভূগর্ভের ধাতুময় অবস্থাই উহার এইরূপ গুরুভার হইবার কারণ।

গ্রীক্ ভাষায় ব্যারস্ (ভারঃ) শব্দের অর্থ ভার। এই হেতু পৃথিবীর এই গুরুভার ধাতুময় অভ্যন্তর প্রদেশটি Barysphere নামে অভিহিত। লঘুভার প্রস্তরময় ভূপৃষ্ঠের নাম Lithosphere।

প্রফেসর Strutt প্রমাণ করিয়াছেন, যে সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব হেতু ভূপৃষ্ঠটি radio-active গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ ইহার উপরিস্থ বায়ুরাশিতে তাড়িত শক্তি প্রকাশিত হয়), ধরণী গর্ভে সেইরূপ পদার্থ সম্ভবতঃ ৪৫ মাইল অবধি মাত্র বিস্তৃত। এতদপেক্ষা অধিক দূর অবধি বিস্তৃত থাকিলে উক্ত radio-active গুণটিও অধিকতর মাত্রায় প্রকাশ পাইত। পরীক্ষায় জানা যায় লৌহময় উল্কাপিণ্ডগুলির radio-active গুণ নাই এবং পৃথিবীতে এইরূপ radio-active গুণহীন পদার্থের সংখ্যাও অধিক নাই। এই হেতু মনে হয় Barysphere বা ভূগর্ভটি উল্কা-পিণ্ড সমূহে দৃষ্ট নিকেল লৌহেই প্রধানতঃ গঠিত।

হাপরে ধাতু গলাইবার সময় উপরে গাদ জমিয়া যে একটা কঠিন আবরণ উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের পাহাড় পর্ব্বতগুলি সেইভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। স্বর্ণকারের দোকানে যে ধূলা জমে তাহার ভিতরে একটু আধটু সোণা থাকে। সেই জন্য অনেকে পয়সা খরচ করেও ঐ আবর্জ্জনারাশি ক্রয় করে এবং গলাইয়া সোণা বাহির করিতে চেষ্টা পায়। ধাতু দ্রব্য গলাইবার সময় যে গাদ বাহির হয় তাহার ভিতরও ঐরূপ অনেকটা ধাতু রহিয়া যায়। পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বতগুলিও এইরূপ বহু ধাতুর আকর। প্রস্তর মাত্রই এক বা একাধিক ধাতু সমবায়ে সমুৎপন্ন। জল দিয়া ধুইয়া, হাত দিয়া বাছিয়া প্রভৃতি সহজ উপায়েই অনেক সময় প্রস্তরচূর্ণ হইতে বহু-ধাতু পৃথক করা যায়। অনেক প্রস্তর আবার ধাতু দ্রব্যগুলি মিশ্রিত ও দ্রবীভূত হইয়া সমুৎপন্ন হয়। এই প্রস্তর গুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর প্রস্তরের খনিজ পদার্থগুলি দ্রবীভূত হইবার পর মিশ্রিতা-বস্থায় থাকে, অন্যগুলিতে যে খনিজ পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় সেগুলি এত সহজে উৎপন্ন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Quartz নামক পদার্থে একভাগ সিলিকা ও দুই ভাগ অক্সিজেন থাকে কিন্তু তাই বলিয়া সিলিকা দ্রব করিয়া

Quartz প্রস্তরে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। প্রবল চাপ অত্যুষ্ণ সলিল এবং কোনরূপ Catalyser প্রভৃতির সাহায্য বিনা ঐগুলি উৎপন্ন হয় নাই। যে পদার্থের গুণে এইরূপ সমীকরণ প্রক্রিয়াদি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহার ইংরাজি নাম Catalyser, যেমন সোহাগার সাহায্যে সহজে সোণা গলে।

ধাতুদ্রব্যগুলি সহজে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যে শ্রেণীর প্রস্তর সমুৎপন্ন হয়, সেই শ্রেণীর প্রস্তর স্তরই সম্ভবতঃ ভূপৃষ্ঠের আদিম বা প্রাচীনতম প্রস্তর।

এই গুলিতে লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়ম্, কৃষ্ণাভ প্রভৃতি ধাতু দৃষ্ট হয় এবং সিলিকার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর প্রস্তরের ইংরাজি নাম বেসিক বা বেসিক প্রস্তর। বাসাল্ট নামধেয় প্রস্তরগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তরে acids, alkalies প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এবং শ্বেত অভ্র quartz, felspars, hornblende প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রানিট্ নামধেয় সুকঠিন প্রস্তর এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

ধরণীর দেহ এইরূপ ত্রিভাবে গঠিত বা সজ্জিত। মধ্যাংশটি গুরুভার ধাতুময়; অনন্তর acid, alkalies, quartz প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রস্তর স্তর; সর্ব্বোপরি লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়া, চূণ প্রভৃতি সমবায়ে সমুৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে বাল্যজীবন

চৈত্র মাসের গৃহস্থে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গে বাল্যজীবন" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। সেন মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন "বঙ্গ বালকের বিষাদপূর্ণ বিমলিন মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা স্তম্ভিত হইয়া যায়।" বাস্তবিক কথা—শিশুরাই দেশের আশাস্থল—তাহাদের রুগ্ন দেখিলে প্রাণে যে আতঙ্ক সঞ্চার হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে? শিশুই দেবশিশু—তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল তাদের অনিষ্ট দেখিলে প্রাণ কেনইবা অবসন্ন না হইবে? বঙ্গে বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমি অনেক দিন ভাবিয়াছি এই ভাবনাতে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি। আমার ভাবনাগুলি আজ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাল্যজীবন কতদিন, প্রথমেই এই কথাটা আসিতে পারে। মোটামুটি হিসাবে আমরা জন্ম হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যজীবন ধরিয়া লইলাম। শাস্ত্র একথা বলিয়াছেন—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। এই ষোড়শ বর্ষ একটা বয়ঃসন্ধির কাল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই ষোল বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় ধার্য্য করিয়াছেন।—এই সময় ছেলেরা হঠাৎ "বালক" হইতে "ভদ্রলোকে" পরিণত হয়। কাজেই বাল্যজীবন বলিতে আমরা জন্ম হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বুঝিব। আমরা এই সময়টার আলোচনা করিলেই মোটামুটি হিসাবে বাল্যজীবনেরই আলোচনা করা হইবে।

"আমরা যেন পকেশ, কুঞ্চনত দেহযষ্টি লইয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছি।" কথাটা খুব ঠিক আমাদের শিশু যা জন্মিতেছে তার জীবনীশক্তি অতি অল্প বলিয়াই মনে হইতেছে। জীবনীশক্তি বা vitality জিনিসটা বাঙ্গালী শিশুতে বড়ই কম; কেন? তার অনেক কারণ আছে—তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রধান। বাঙ্গালী শিশুর জীবনীশক্তি বাড়াইতে হইলে এই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া যথাযথভাবে তার প্রতিকার করিয়াই কাজে নামিতে হইবে। বাজে চীৎকারে সভাসমিতিতে বড় বড় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলে সেই মন্তব্যগুলি আলমারির মাথায় পড়িয়া ধূলা খাইবে আর কিছুকাল পরে তাহা শিশিবোতলওলার কৃপায় বেণের দোকান হইতে মশলা বাঁধিয়া গৃহস্থের গৃহে প্রচারিত হইবে। বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকার না করিলে কাজ কিছুই হইবে না। বৃথা শব্দে লোকের প্রাণ "অ্যাৎকাইয়া" উঠিবে কিন্তু কাজ কিছুই হইবে না। তাই আমরা প্রথমে এই সকল কারণ আলোচনা করিব, তাহার পর প্রতিকারের কথাও বলা যাইবে।

বাঙ্গালী শিশু দিন দিন দুর্ব্বল জীবনশক্তি হীন, ব্যর্থ জীবন লইয়া জন্মাইতেছে কেন? কেনই বা অকালে এত শিশু মরিতেছে? আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ পিতামাতার দুর্ব্বলতা। আজকাল সকলেই জানেন যে, শিশু পিতামাতার দৈহিক বল, সাদৃশ্য ও গুণ লইয়া জন্মাইবে। বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব আজকাল স্কুলের বালকগণও জানেন। বাঙ্গালী, পিতামাতা কেমন এ আলোচনাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতি অল্প বয়সেই পকেশ, কুঞ্চনত হইতেছেন। পিতা—খাদ্যের অভাবে, সংসার চিন্তায় মানসিক কষ্টে ও অরবিকার, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি যম সদৃশ ব্যাধির উপদ্রবে বাঙালি পিতা আজ কুঞ্চনত। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি রবিবাবুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। কথায় কথায় রবিবাবু বলিয়াছিলেন যে "আমাদের দেশের যুবারা যেন বৃদ্ধ।" "যৌবনের বেগ চলিয়া যাইবে—কে জানে কাহার কাছে" এই ভাবটা নাই—তাহারা যেন মরিয়া রহিয়াছে। আর্থিক কষ্টের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য জুটে না। সম্প্রতি আমরা যা হিসাব পাইয়াছি তাহা হইতে দেখিতে পাই প্রতি ইংরাজের বাৎসরিক আয় ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৯০ টাকা প্রতি আস্কাণের ২৯ পাউণ্ড বা ৪৩৫ টাকা; প্রতি ইংরাজ প্রতি বৎসরে ৩৮ পাউণ্ড বা ৫৭০ টাকা ও প্রতি আস্কেশ ২৩ পাউণ্ড বা ৩৪৫ টাকা খরচ করিয়া থাকে। এই আয় ও ব্যয় হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে আর্থিক কষ্ট ইহাদের কিছুই নাই বা হইতে পারে না। কাজেই খাদ্যের অভাবে এদের জাতির পতন হইতে পারে না। কাজেই ইহারা কোমর তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে আর্থিক কষ্ট কাহাকে বলে ইহারা জানে না। প্রত্যেক কানাডা ও অষ্ট্রেলেসিয়াবাসীর বার্ষিক আয় ৪৮ পাউণ্ড বা ৭২০ টাকা। আমাদের আয় কত? কে বলিবে? কাজেই আমরা আজ খাইতে না পাইয়া মরিব না ত কি? যদি বাঁচিয়া থাকি তা হইলে নিশ্চয়ই জড়পিণ্ডবৎ থাকিব—কাজেই আমাদের শিশুসন্তান বিজ্ঞানের মতে জড়পিণ্ডবৎ হইবেই। নানা কারণে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই সাহস গিয়াছে—আমরা সকলে না হইলেও অধিকাংশ লোকেই ভীরু কাজেই আমাদের শিশু বিজ্ঞানের মতে ভীরুই হইবে। আমাদের অধিকাংশ লোকের

না খাইতে পাইয়া—না মুক্ত স্থানে বাস করিতে পাওয়ায় জীবনীশক্তিহীন বা lowered vitality হইয়া পড়িয়াছে কাজেই আমরা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই রুগ্ন অবস্থায় কাটাইয়া দিই। বিজ্ঞান বলিয়াছে রুগ্নের শিশু রুগ্নই হইবে—কাজেই বাঙ্গালী শিশু জন্মাবধি হইতেই রুগ্ন। যে কারণেই হউক আনন্দ বাঙ্গালা হইতে বিদায় লইয়াছে কাজেই বিজ্ঞানের মতে বাঙ্গালী শিশু নিরানন্দ হইবে। কুসংস্কার ত আমাদের অঙ্গের ভূষণ কাজেই শিশুও কুসংস্কারগ্রস্ত হইবে। মানসিক বল আমরা অনেক স্থলে ইচ্ছা থাকিলেও চালাইতে পারি না—বিজ্ঞান বলিয়াছে তোমার মানসিক বল কম হইলে তোমার ঔরসজাত শিশু মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারিবে না।

পিতার তরফের কথাই আমরা এতক্ষণ বলিলাম। এখন মাতার কথা বলি—বাঙ্গালী জননী চিররুগ্না—শিশু ত চিররুগ্ন হইবেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাজেই শিশুও তাই হইবে—আর শেষের কথা দুর্ব্বল কাজেই শিশুও দুর্ব্বল হইবে।

আমি এ সব কথা যাঁহাদের কাছে বলিয়াছি তাঁহারাই বলিয়াছেন যে কি করা যাইবে এই সকলের উপর আমাদের হাত নাই। হাত নাই সত্য; কেবল আংশিক সত্য; কতকগুলার উপর ত হাত আছে। অনেক স্থলেই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক কিন্তু তাহা না হইলে কি আমরা কিছুই করিতে পারি না? পারি! কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত আলস্য আর ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আবার যে গুলাতে আমাদের হাত আছে তাই বা করিতেছি কই। বিবাহটাতে আমাদের হাত আছে কিন্তু তাহার সংস্কার হইতেছে কৈ? আমাদের দেশের লোক এখনও অতি অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিতেছেন কেন? ইহাতে কি আমাদের হাত নাই? সমাজ শাসনটাতে যদি হাত না থাকে তবে হাত আছে কিসে? আইন থাকিলেও, ১২ বৎসরের বালিকা শিশুমাতা এই দৃশ্য গৃহে গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বালিকা মাতার নিজের অর্দ্ধেক হাড় তখনও পুষ্টি লাভ করে নাই তখন তার ছেলে কিরূপে ভাল হইবে একথা বুঝাটা কি এতই শক্ত। আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন অশিক্ষিত কিন্তু যে দুইজন শিক্ষিত তাহারাই বা এ বিষয়ে নজর দেন না কেন? দুই জন শিক্ষিত লোকের ১৭ জন লোকও অতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেন। এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পতন অনিবার্য্য।

এমন দুই চারিজন লোক দেখিয়াছি তাঁহারা এ বিষয়ে মস্ত মস্ত শাস্ত্র কথা আনিয়া এই "গোলমালে" জিনিষটাকে আরও "ভাল-গোল" পাকাইয়া দেন। দুই একজন বলেন যে ইহা সনাতন পদ্ধতি সেই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে আমি এই সামান্য কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে চাই যে একটা জাতির উত্থান পতন দুই এক পুরুষে বুঝা যায় না—অনেক সময় লাগে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আলোচনায় ভুল ধারণা দূরীভূত হইবে। দুই চারিজন আবার এক আধ পাতা শরীরতত্ত্ব বা Physiology পড়িয়া বলেন যে "menstruation indicates maturity in sexuality" কিন্তু তাঁহাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন শরীরতত্ত্ব সবটা পড়িয়া নিজেদের মতামত প্রচার করেন। আমাদের দেশে বালিকারা সাধারণতঃ ১৩ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে। কিন্তু

তাহাদের দেহের হাড় পুষ্ট হয় ২৬ বৎসর বয়সে। ইহুদী বালিকারা আরও অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া ৭।৮ বা ৯ বৎসর বয়সের বালিকার সন্তান হওয়াটা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কি?

ঋতু অনেক কারণে ঘটিয়া থাকে—দেশের জলবায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্যের অভাব বা প্রাচুর্য্য, দৈহিক শ্রম বা আলস্য। একেবারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্ত ভুল—menstruation indicates maturity in sexuality. কতকগুলি ফল অকালেই পাকিয়া থাকে—এঁচড়ে পাকা কাঁটাল কথাটা সকলেই জানেন—এই ফল কখনও সুস্বাদু হয় না।—আর তা ছাড়া এই কাঁটালের বীজে যে বৃক্ষ হয় তাহার ফল অতি অপকৃষ্ট ধরণের একথা অনেকেই জানেন।

বাঙ্গালী শিশুর মেরুদণ্ড সরল দেখিতে হইলে বালিকাদের বিবাহের দিন আরও পিছাইয়া দিতে হইবে।—১৬ বৎসরের কম কোনও কারণেই বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে দেশে অনেক সভাসমিতি হইয়াছে কিন্তু ফলাফল কি নারায়ণে অর্পিত হইয়াছে?

তাহার পর শিশুর জন্মের কথা। আমাদের কুসংস্কার এখানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—শিশুকে আমরা নারায়ণ, দেব শিশু, প্রভৃতি বড় বড় আখ্যা দিই কিন্তু এই নারায়ণের আহ্বান হয় বাড়ীর অপকৃষ্ট গৃহে, গোয়ালে বা বাহিরে একটা গোল পাতা ছাওয়া ঘরে। কাজেই আমাদের দেশের শিশুর মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। আমি কলিকাতা সহরের জন্ম মৃত্যুর হার দিতেছি।

জন্ম মৃত্যুর হিসাব

হাজার করা জন্ম	হাজার করা মৃত্যু
২১·৬	২৮·১
২০·৫	২৯·২
১৯·৪	২৮·৩

কলিকাতা সহরে ১৯১১ সালে ১ বৎসর বয়স্ক ১০০০ শিশুর মধ্যে ২৫১ জনের মৃত্যু হইয়াছে আবার ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা ২৮২·৭ দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতার ন্যায় সহরে যখন হাজার করা ৩০০ শত শিশুর মৃত্যু হয় তখন বঙ্গের পল্লীতে কত হয় তাহা অনুমেয়। খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসের অভাব ইত্যাদিতে অনেক শিশুই মরিতেছে। তাহা ছাড়া ভয়ানক কথা এই যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ডে জন্মের হার মৃত্যুর হারের অপেক্ষা অনেক বেশী তবুও সে দিন Lancet পত্রিকায় দেখিতে ছিলাম ইংলণ্ডের জননায়কগণ শিশুর মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি।

সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে এক সভ্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অতি "দুঃখের" সহিত বলিয়াছেন এ বিষয় গৃহস্থের হাত তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য প্রত্যেক স্থানে উপযুক্ত

সম্যক শিক্ষিত ধাত্রী রাখা। অনেক শিশু ধাত্রীর অজ্ঞতায় মারা পড়ে গভর্ণমেণ্ট যদি শিশু-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, ভড়কা বা tetanusই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ। আর অজ্ঞতাই এই tetanus রোগের প্রধান কারণ সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে ?

জন্মের পর দারিদ্র্য নিবন্ধন অনেক শিশু না খাইয়া বা কু-খাদ্য খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যাহারা কোনও রকমে বাঁচিয়া যায় তাহারা দিন দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইতে থাকে। তাহার উপর দেশে রোগের অভাব নাই—একটা রোগ ধরিয়া চিরকালের মত পঙ্গু করিয়া দেয়। এ সব প্রতিকূল সম্বন্ধ ছাড়াইয়া বাঙ্গালী শিশুকে উঠিতে হয়। তাহার কাছে কি আশা করা যাইতে পারে ? সে "নরভুক্" ত হইবেই।

এইবার শিক্ষার পালা। শিশুকে শান্ত শিষ্ট দেখিতে বাঙ্গালী বড় ভালবাসে। যে যত কম নড়িবে বাঙ্গালীর সেই তত আদর্শ শিশু। সভ্য করিবার জন্য বাঙ্গালী পিতামাতা অতি শিশু অবস্থা হইতে পীড়ন আরম্ভ করেন। কি কুক্ষণেই Discipline বাঙ্গালায় ঢুকিয়াছিল—স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ই যে কেবল Discipline যন্ত্র ফেলিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের Raw-meat juice বাহির করিতেছে তাহা নহে এমনি কি মা বাপও এই যন্ত্রের হাতল ঘুরাইয়া শিশুর হৃদয় পেষণ করিতেছেন। রবি বাবু এখানে সত্যই বলিয়াছেন—

"বিধাতার নিয়মানুসারে বাঙ্গালী ছাত্রদের এই বয়ঃসন্ধিকাল যখন আসে তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্মশক্তির অভি-মুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোনও মহত্ত্ব দেখে, যেখান হতে তারা শ্রদ্ধা পায়, বরণ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায় সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে। মিশনারি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে, পেষণে, দলনে, দমনে নির্জ্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার ধাত্রী কল বানাইয়া তোলা অপবিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।"

শিশুর মনোবৃত্তি দলন করাটা যে কত বড় অমার্জ্জনীয় পাপ তা বলা যায় না। আমাদের বাঙ্গালী মা বাপ আর সেই পাপে লিপ্ত। শিশুর মনোবৃত্তিকে দলন করিবার জন্য তারা ভূত প্রেত দুষ্ট প্রকৃতি শিশুর মাথায় কলিয়া পেরেক ঠুকিয়া মারিতে ছাড়েন না। ছেলেরা বিপত্তীঃ হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ একটা জড়পিণ্ড হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুকে মুক্ত বাতাসে জগতে বেড়াইতে দাও—এইটাই হচ্ছে এ যুগের বিজ্ঞানের শিক্ষা। আর এই শিক্ষাই অবলম্বন করিয়া জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মিশিতে দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া কিন্তু আমরা তা দিই কয়জন। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা তাকে কেবল সভ্যতার মাপকাটি দিয়া মাপিয়া থাকি আর যা কিছু এই মাপকাটির বাহিরে পড়ে তাহা চোক কান বুজিয়া ছুঁটিয়া দিই। ছেলেকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে সংসারে বিশ্বের মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে দিতে হইবে—কেবল রক্ষা করিতে হইবে এলো মেলো বাতাস হইতে, ঝড় হইতে কিন্তু বাঙ্গালী মা বাপ কয়জন এই

নীতি পালন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? বালককে মুক্ত আলোকে সূর্য্যের প্রখর কিরণে বেড়াইতে দিতে হইবে আর মাথায় কোনও রকমে যাহাতে কোনও প্রকার কুসংস্কার না প্রবেশ করে সেইটাই দেখিতে হইবে—

"আরো আলো আরো আলো প্রভু নয়নে মোর ঢাল" এই নীতিই জোর করে শিখাইতে হইবে কিন্তু আমরা কি করি—অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে লইয়া যাই না কি? শিশুর প্রাণের মধ্যে এইটাই প্রথম হইতে জোর করিয়া গাঁথিয়া দিতে হইবে—

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

তাকে বেশ করিয়া বুঝাইতে হইবে যেন তার মূল মন্ত্র এই দাঁড়ায়—

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাইব তুষি।

তার মনের মধ্যে প্রথম হইতে কাহাকে ছুঁইলে নাহিতে হইবে—কাহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন খাইতে নাই এসব শিক্ষা দিলে চিরকালই তার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। শিক্ষকতার অভাবে পিতামাতার পালনদোষে শিশুকুঁড়ি মানব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে দেবতাব যদি কখনও থাকে—যদি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব কখনও থাকে সেটা শিশুকাল। এই জন্য যীশু বলিয়াছিলেন শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।

এই দেব শিশুর মন দলন করার পাপ যে কি ভয়ঙ্কর তাহা আমরা বাঙ্গালী জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমরা এই শিশুর মন যেমন ভাবে গড়িব ভবিষ্যতে ফল ঠিক তেমনি পাইব। শিশুকে বিশ্বের সহিত পরিচিত করিতে হইবে—বিশ্বে সমস্ত সংবাদ প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্যের সহিতই তাহাকে পরিচিত করাইতে হইবে। তাকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নীতি পূরা মাত্রায় ভোগ করিতে দিতে হইবে। কিন্তু এইটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে ত্যাগ, সত্য, আত্মসম্মানের সাড়ায় মাতা পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠেন। নেলসন বলিয়াছে—আমরা কেবল পড়িব Fear! what is it grandmama? কিন্তু আমরা শিশুর মুখে এই কথা শুনিলেই মুখ চাপিয়া ধরিব! তাহার উপর এই কুসংস্কারের আর একটা মস্ত অংশ নাস্তিকতা; অনেক সময় আমরা এই নাস্তিকতাটা শিশুর মাথায় ঢুকাই কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই—

রয়েছ তুমি একথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

এইটাই হিন্দুর প্রাণের কথা—শিশুহৃদয়ে এই বীজ বপন করাই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল।

শিশু পারিবারিক কুসংস্কারের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে এইবার শিক্ষার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। এখানেও ঘোর কুসংস্কার। সেইগুলা ছেলের অস্থি মজ্জায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য মস্ত মস্ত বেত আছে। আমার বেশ মনে আছে আমার ধারণা ছিল যে লোকে যাকে যম বলে সেইটাই হচ্ছে এই গুরুমশায় আর এই ধারণাটা কতকটা বেতের জন্য আর কতকটা

আত্মীয় স্বজনের গুরুমশায়কে আমার যম বলিয়া উল্লেখ করার জন্য মাথায় ঢুকিয়াছিল। শিক্ষক হতে পারে কে? যে প্রাণ ঢালিয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারে সেই ছেলের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত। "ছাত্রদের ভার লইবে কে? ছাত্রদের তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন—যাঁরা জানেন "শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা" যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"— রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু শিক্ষক বলিলে আমরা এই বুঝি যে ছাত্র দমনের একটা যন্ত্র বিশেষ। পাঠশালায় ও স্কুলে মাষ্টার মহাশয় ছাত্রদের সহিত মিশিতে একটা মস্ত লজ্জার কথা বুঝেন এমন কি এই ভাবটাও কলেজ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আইসে। গুরু শিষ্যে এই পার্থক্য থাকলে শিক্ষায় একটা মস্ত "ছাড়" পড়িবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা পৃথিবীর সব আবহাওয়া বাদ দিয়ে শিক্ষা দিতে চাই—ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে শিক্ষা দিতে চাই—তাইতে আমাদের দেশের ছেলের শিক্ষাটা বরফ কোম্পানির ছাঁচে ফেলা ইটের মত—সবগুলাই সমান পার্থক্য কিছুই নাই। আবহাওয়া—প্রকৃতি—বিশ্ব এই সব বাদ দিয়ে শিক্ষা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষা আগে গুরুর গৃহে হইত তখন শিক্ষা থেকে কোনও জিনিসই বাদ পড়িত না। এখন আবার সেই শিক্ষার প্রচলন হওয়াটা দরকার হয়েছে। অবশ্য কথা হইতেছে দেশ কাল পাত্র সবই দেখিতে হইবে। আমেরিকায় এখন মুক্ত বায়ুতে বিদ্যালয় (Open Air School) স্থাপনের একটা মস্ত হড়াহড়ি পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন অবশ্য এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আকাশ, আলো, বাতাস, জল প্রকৃতি এ সব বাদ দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না—হইতে পারেই না। আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ঘরের কথা বলাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। বোলপুরে যে বিদ্যালয় আছে সেইটারই উদ্দেশ্য এই রকম কিন্তু এই বিদ্যালয়টা একঘরে হইয়া রহিয়াছে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যতদূর পড়া উচিত ছিল ততদূর পড়ে নাই। বাঙ্গালা ছাড়া পাঞ্জাবেও এইরূপ একটি আধটি বিদ্যালয় আছে।

লক্ষ্ণৌয়ে বা সিলোনে এখন School Garden পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখন সেখানে ২৮৭টি স্কুল এ প্রণালীতে চলিতেছে।

উদ্যানে, মুক্ত বাতাসে, প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষাটা যেমন হয় সে রকম আর কোথাও হয় না। এই খানে বাস্তবিকই হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া যায়। দেবশিশুকে দেবভাব বাড়াইতে যাও তাহার প্রাণ ভরিয়া তুষা হরিয়া আরো আরো আরো যাও প্রাণ; তার চোখে আরো আলো ঢাল এখানে কার্পণ্য করিও না। কবি বলিয়াছেন—

"To kiss the sun for pardon,
The song of bird for mirth,
One is nearer God's heart in
the garden
Than any where else on earth."

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "বালকদের উপযোগী সরল ও সুলভ পুস্তকের প্রচার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার সাহায্যে বালক-হৃদয়ে মানবত্বের সরল অঙ্কুর রোপণ করিতে হইবে। বালকের উদ্ধামতা তদীয় জীবনের ঔদ্ধত্য ও

সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনোন্মুখতা যাহাতে স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া তাহার জীবন সংস্থান গঠনের সহায়করূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তজ্জন্যে আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইতে হইবে।" কথাগুলা খুব খাঁটি। বালকদিগকে শিক্ষা দিবার উপযোগী বই খুব কম। এসব বই কেন হয় না আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য—Central Text Book Committee বোধ হয় এই সব বই প্রচলনের চেষ্টা করেন না। না হইলে হয়ত এতদিনে হইত। আমার বোধ হয় উক্ত কমিটি এইসব বই প্রচলনে বাধা দেন। আবার দুই চারি খানা ভাল বই যা আছে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ভয়ে চালাইতে চাহেন না। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে যারান্তরে বলিব। তবে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বই নিশ্চয়ই চালাইতে হইবে শিশুহৃদয় বিকশিত করিবার জন্য নানা সদ্‌গুণের ভাবপূর্ণ পুস্তক চালাইতে হইবে। যাহা ভাল তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে তবেই আমাদের শিশুদের পরিণত বয়সে শিক্ষা হইবে। দেশীয় বীরের বীরত্ব কাহিনী ছেলেদের পড়াইতে হইবে। ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? আমাদের সম্রাট স্বয়ং স্বহস্তে আমাদের দেশের বীরগণকে V. C. medal পরাইয়া দিতেছেন নিজের মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, দেশকে ভালবাসে না কে? দেশের যা ভাল তা শুনিতে বা শুনাইতে ভয় কি? আমি এখনও পর্য্যন্ত শুনি নাই যে কোনও ইংরাজ নেলসন-কাহিনী পড়িবার সময় আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন কিম্বা কোন ফরাসী নেপোলিয়ান-কাহিনী পড়িবার সময় মূর্চ্ছা গিয়াছেন।

সৎশিক্ষার অভাবে উপযুক্ত খেলার অভাবে healthy recreationএর অভাবেই আজ আমাদের দেশের ছেলেরা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে রত হইতেছে। সত্য সত্যই আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের ঘাণঘ্যাপানী বাঙ্গালার ঘাটে, পথে, মাঠে মাঠে চলিতেছে। ছেলেরা যদি প্রাণ ভরিয়া খেলিতে পায় যদি বেদম হওয়া পর্য্যন্ত দৌড়াইতে পায়, যদি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাকে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তা হইলে আর তাহার মধ্যে কোনও প্রকার কদর্য্য ব্যাধি ঢুকিবে না। আর যদি তাহাকে শান্ত শিষ্ট করিয়া ঘরে বসাইয়া রাখ পৃথিবীর যা কিছু জঘন্য ব্যাধি আছে সবই আসিয়া তাহাকে আধার করিয়া বসিবে এই কথা একেবারে ধ্রুব সত্য। হৃদয় বৃত্তির বিকৃতি না পাইয়াই এসব জঘন্য ব্যাধি আসিয়াছে। তাহাকে শাসনের দড়ি দিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিও না। মুক্তি দাও সে ঘুরিয়া বেড়াক তাহা হইলেই সে সুস্থদেহ ও সবল মন লইয়া উঠিবে। তাহাকে আলোকে ও রৌদ্রে ঘুরিতে দাও কুয়াটিকায় ও "লু"তে নয় তাহা হইলেই সে ঠিক সোজা হইয়া উঠিবে। অঙ্কুর যে দিকে আলো দেখে সেই দিকেই যায়—হৃদয়অঙ্কুরও তাই করে। আলোর অভাবেই তাহা আগাছায় পরিণত হয়। তাহাকে এই মহামন্ত্র শিখাও—

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিয়াছি। এক্ষণে গুণিগণ যদি বঙ্গের বাল্য-জীবন সমস্যা লইয়া মতামত প্রকাশ করেন এবং আলোচনা করেন তাহা হইলে জনসাধারণের বড়ই উপকার হয়। কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি আমাদের মেরুদণ্ড সোজা হয় এইটা আমার মতে মস্ত প্রশ্ন। আর এইটার সমাধান হওয়াই প্রধান আবশ্যক।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীরাণী

চোখ্‌ভরা কার স্নেহের দৃষ্টি বুক্‌ভরা কার ভালবাসা ?
মুখভরা কার মধুর বাণী প্রাণভরা কার তরুণ আশা ?
সূর্য্য কাহার খেজুর সাজে'—সকাল বিকাল সোণার ধারা:—
ছড়িয়ে দে' যায়,—গড়িয়ে তোলে কাহার রূপের মোহ কারা ?
নিশীথে কার চাঁদের আলো স্বপন হ'য়ে বুকের'পরে— ?
'শিউরে' উঠে দেহটী কার গভীর রাতের বাঁশীর স্বরে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী—তরুবল্লীর ছায়াঘেরা,
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

ধানের ক্ষেতের সোণার আঁচল দোলায় কাহার মৃদুল হাওয়া ?
ঘুরায় না কার গাছের তলায় রাখালগণের গোঠের গাওয়া ?
দুপুর বেলার রোদে কাহার খেলার মাঠে শিশুর মেলা ?
লক্ষ্মী কাহার অঙ্গে অঙ্গে প্রীতির সঙ্গে করেন খেলা ?
কাহার ক্ষুদ্র নদীর বক্ষ পল্লীবধূর হাস্য রোলে—
ভরে' ওঠে সকাল বিকাল নেচে ওঠে হাওয়ার দোলে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী, তরুবল্লীর ছায়াঘেরা:—
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

(৩)

আঙ্গিনা কার অঙ্গনাদের—পুণ্যব্রতের মহোৎসবে,—
পূর্ণঘটা,—শিশুর হাস্যে ? অভ্যাগতের উচ্চরবে ?
কাহার উদার বক্ষমাঝে,—পক্ষপাতের নাইক' ছায়া,—
ধনীর সনে দীনের মনের—সমান প্রীতি সমান মায়া ?—
কাহার কোলের সকল ছেলে সকল বাড়ীর সকল কাজে—
সমান সুখে সমান দুঃখে যুক্ত সদা—মুক্ত লাজে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী তরুবল্লীর ছায়াঘেরা,
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

মণ্ডপে কার বিকাল বেলা, বৃদ্ধগণের শ্রদ্ধাভরা—
মধুর কণ্ঠে বেঁধে ওঠে পুরাণ কথার 'সপ্তস্বরা' ?
কাহার সাথের কাসর ঘণ্টা গভীর ছন্দ জাগায় প্রাণে,
বেঁধে দিয়ে সুরটী আমার বিশ্ববীণার মধুর তানে ?
কাহার সরল শান্তিমাখা, মুক্ত প্রাণের উৎসবলে,—
বিশ্ববাসীর সুপ্ত আশা তপ্তস্রোতে পড়্ছে গলে' ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী তরুবল্লীর ছায়াঘেরা
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাকলে আছে বেড়া ॥

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

ভারতীয় জনসংখ্যা

দক্ষিণ আফ্রিকাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪১৭৯১ জন ভারতবাসী নিবাস করেন। উঁহাদের মধ্যে ৯৩৮৮৬ জন পুরুষ ও ৫৫৯০৫ জন স্ত্রীলোক। নেটাল প্রদেশে ৮০১৬০ জন পুরুষ আর ৫২৮৭১ জন স্ত্রী একত্রে ১৩৩০৩১ জন; ট্রান্সভালে ৮০৫০ জন পুরুষ আর ১৯৯৮ জন স্ত্রী, একত্রে ১০০৪৮ জন; কেপকলোনীতে ৫৫৯০ জন পুরুষ আর ১০১৬ জন স্ত্রী একত্রে ৬৬০৬ জন; অরেঞ্জফ্রিষ্টেটে ৮৬ জন পুরুষ আর ২০ জন স্ত্রী একত্রে ১০৬ জন; ভারতীয় নরনারী অধিবাস করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১১৫৪৮০ জন হিন্দু, ২০৮৯২ জন মুসলমান, ৩১৪ জন পারসী, এবং ১২৯৭৮ জন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়ের বাস। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩২৪০৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩১৩৬৮ একত্রে ৬৩৭৭৬ জন। আসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩০ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১ একত্রে ৩১ জন। বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১০৬৬২ আর স্ত্রীর সংখ্যা ৫৫০৩ একত্রে ১৬১৬৫ জন। বোম্বাই প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৯৭৪৫ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১১৩৮ একত্রে ১০৮৮৩ জন। ব্রহ্মদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩০ আর স্ত্রীর সংখ্যা ৩ একত্রে ৩৩ জন। মধ্যপ্রদেশে ও বরারের জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৪৪, আর স্ত্রীর সংখ্যা ৫ একত্রে ৪৯ জন। পূর্ব্ববঙ্গের জন্মগ্রহণকারী পুরুষের

সংখ্যা কেবল ৩ জন মাত্র। মাদ্রাজ প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ২৭৮৪৭ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১৩৫৬৭ একত্রে ৪১৩১৪ জন। পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩১২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩০ একত্রে ৩৪২ জন। যুক্তপ্রদেশ, আগরা ও অযোধ্যা প্রদেশে জন্ম-গ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১৮৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭৮ একত্রে ২৬৫ জন। অজ্ঞানিত প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১১৯৬৫ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩৯৫৬ একত্রে ১৫৯২১ জন। অন্য প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৬৫২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩৪৭ একত্রে ১০০৯ জন। বাঙ্গালা প্রদেশের সংখ্যা, বাঙ্গালা ও বিহার এই দুই মিলাইয়া ধরা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৩৫৮২৪ ও বিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যা ২৬৮৬৮ একত্রে ৬২৬৯২ জন। অবি-বাহিত পুরুষের সংখ্যা ৫৫৩৮২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৬৮৪৪ একত্রে ৮২৩০৬ জন। মৃতদার পুরুষের সংখ্যা ২২৯৫ ও বিধবা স্ত্রীর সংখ্যা ২০৯৯ একত্রে ৪৩৪৪ জন। স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী পুরুষের সংখ্যা ১২২ ও স্বামীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারিণী স্ত্রীর সংখ্যা ৪৪ একত্রে ১৬৬ জন। অজ্ঞাত পুরুষের সংখ্যা ২৩৩ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৫০ একত্রে ২৮৩ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ বৎসরের নীচে পুরুষের সংখ্যা ৩২৮৮৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৯৪৩৭ একত্রে ৬২২২৩ জন। ২০ হইতে ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পুরুষের সংখ্যা ৪৪৬১০ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২০৫৪৩, একত্রে ৬৫১৯৩ জন। ৪০ হইতে ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পুরুষের সংখ্যা ১৪১১৪ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৪৮৫৭ একত্রে ১৮৯৭১ জন। ৬০ বৎসরের অধিক বয়সের পুরুষের সংখ্যা ২৪২২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৯৫৮ একত্রে ৩৩৮০ জন। অজ্ঞানিত বয়সের পুরুষ সংখ্যা ১৪ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১০ একত্রে ২৪ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল নিজের নিজের কাজ করে, এমন পুরুষের সংখ্যা ৬৭৫ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৫৪ একত্রে ৭২৯ জন। ঘরের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৭৭৫৭ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৩২৮২ একত্রে ৩১০৩৯ জন। ব্যবসা বাণিজ্য করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৯৫৬৩ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭৪৪, একত্রে ১০৩০৭ জন। চাষের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২৯১৮৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭০৫২ একত্রে ৩৬২৩৮ জন। কারিকরের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২১০১০ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৮৫১ একত্রে ২১৮৬১ জন। অনিশ্চিত কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৩১৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৮৩৩ একত্রে ১১৪৯ জন। পরের অধীনে কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২৪৬৯১ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২২৬০০ একত্রে ৪৭২৯১ জন। অজ্ঞানিত কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৬৮৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১৮৯ একত্রে ৮৭৭ জন।

এই গণনাতে যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসীর সংখ্যা যে কম হইয়াছে, তাহা ভ্রমমূলক বলিয়া মনে হয়। কেননা এই উভয় প্রদেশেরই অধিক লোক এখানে বাস করে। ইহা শ্বেতাঙ্গ গণনাকারি-গণের অসাবধানতার জন্যই বোধহয় এইরূপ গণিত হইয়াছে। এই গণনা সন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসের রিপোর্ট অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

আড়কাটীগণের কুহক জাল

বিদেশে কুলী প্রেরণের ভয়ঙ্কর প্রথা

অনেক অভাগা ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ভারতবর্ষে মহামারী, বিসূচিকা ও দুর্ভিক্ষ তো লাগিয়াই রহিয়াছে; আর এই ভয়ানক বিপদের জন্য দেশের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী কম্পিত হয় আর মুখ হইতে এই শোক বাক্য নির্গত হয় :—

অন্ন বিনা অর্দ্ধ মৃত,
চিন্তাজ্বরে জীর্ণ।
অস্থি মাংস একত্রিত,
ভোজন বিনা তনুক্ষীণ।

যেখানে পৃথিবীর ভিন্ন দেশ আজ উন্নতির পথে বেগে ধাবমান হইতেছে, সেখানে আমাদের হতভাগ্য দেশ কেবল অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী কর ও জমিদারের অত্যাচারে কত কৃষক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। ভারতের ইতিহাস বিবেচনা পূর্ব্বক পড়িলে জানা যাইবে যে, ভারতবর্ষে দিন দিন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। সন ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে সন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দশ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সরকারী রিপোর্ট পড়িলে অবগত হওয়া যাইবে যে, সন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে সন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুর্ভিক্ষ এতদপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। শেষ ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে ২৫ বার দুর্ভিক্ষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ লোক ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের কৃতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস এলিয়ট যে সময় যুক্তপ্রদেশ বন্দোবস্ত করিবার জন্য শাসক নিযুক্ত হন, সে সময় তিনি দেশবাসীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "বৃটিশ ভারতে কৃষকগণের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।" ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আধা সরকারী সমাচার পত্র 'পাইওনীয়র' ভারতবর্ষের দরিদ্রতা বিষয়ে লিখিয়াছিলেন যে "বৃটিশ ভারতে প্রায় ১০ কোটী অধিবাসী অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় দিন অতিবাহিত করে।" এই হিসাব দেখিলে প্রতীত হইবে যে, ভারতবর্ষ কেবল দুর্ভিক্ষের নিবাসভূমি। এইরূপ দুঃসময়ে ভারতবাসীর বিদেশে কুলী হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। একেতো ভারতবাসী দুর্ভিক্ষের আগুনে সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে, তার উপর এই সকল সরল প্রাণ কৃষককে ভুলাইয়া বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য আড়কাটীগণ কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রাখে। এই আড়কাটীগণ ভারতবাসীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া আপন বশে আনয়ন করে। হতভাগ্য ভারতবাসীকে বলা হয় যে, বিদেশে তোমাকে খুব বড় কাজ দেওয়া হইবে। হয় সরদার হইবে নয় জমাদার হইবে। এই প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া বেচারা কৃষককে নিজের বশ করিয়া লয় এবং গোলামের ন্যায় বিক্রয় করিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে।

এই কুলী-প্রথায় পাশ বদ্ধ হইয়া কত ভদ্র ঘরের ছেলে, কত উচ্চ বংশের সন্তান, এখানে চলিয়া আসে। কত ছেলে ঘরে ঝগড়া করিয়া কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসে এবং তথায় আড়কাটীর জালে বদ্ধ হইয়া বিদেশের পোষা পাখী হইয়া

যায়। উহাদের পিতা মাতা আপনাদের পুত্রগণের বিয়োগে নানারূপ পরিতাপ করিতে থাকে। কেহ কেহবা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া অতিশয় কষ্ট সহ্য পূর্বক সামান্য রাজকর্মচারী হইতে উচ্চাধিকারী পর্য্যন্ত আবেদন নিবেদন করার পর আপনার সন্তানগণকে ফিরাইয়া পায়। কিন্তু অধিকাংশ যুবকের ঠিকানা পাওয়াই মুস্কিল হয়।

যদিও গভর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, কোনও কুলী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে প্রেরিত হইতে পারিবে না, তথাপি কুলীগণকে একত্র করিবার পর আড়কাটীগণ নানারূপ ছল কপট দ্বারা কুলীদের প্রত্যেককে নূতন কথা শিখাইয়া লয় প্রথমে যখন কুলীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, তখন তাহাকে বিদেশের সুখ, দুঃখের কথা শুনান হয়। একেতো ঐ অবোধ কুলী কঠিন সর্ত্তসমূহ কিছুই বুঝিতে পারে না, তার উপর আড়কাটীগণ তাহাকে প্রথমেই শিখাইয়া পড়াইয়া রাখে; সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের কথিত প্রত্যেক সর্ত্তই সে স্বীকার করিয়া লয়। এই প্রকার জালে ফাঁসিয়া নিয়া ভারতীয় মজুর বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মজুরের, মা, বাপ, সন্তান প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত সারা জীবনের জন্য সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়।

নেটাল প্রদেশে ভারতীয় মজুর

সন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেটালকে কেপকলোনী হইতে পৃথক করা হয়। এখানকার ইংরাজ অধিবাসিগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্ব দেশে উৎপন্ন প্রায় সমুদয় জিনিস এখানে উৎপন্ন হইতে পারে। ইক্ষু, চা প্রভৃতির চাষ তথায় দিন দিন বাড়িতে থাকে, কিন্তু মজুরের অভাবে তাহারা অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। স্থানীয় কাফ্রিগণ শ্বেতাঙ্গগণকে বেশ করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল; সুতরাং তাহারা উহাদের জমীতে মজুরী করিতে ভালবাসিত না। এজন্য নেটালীয় শ্বেতাঙ্গগণের দৃষ্টি ভারতবাসিগণের উপর পতিত হয়। উদ্যোগী ভারতবাসিগণের মেহনত দ্বারা লাভ উঠাইবার প্রলোভন সামলাইতে ইহারা অপারগ হন। ইহাদের চেষ্টাতে নেটাল গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয় যে, ভারতবর্ষ হইতে সর্ত্তবদ্ধ করিয়া মজুরগণকে এখানে প্রেরণ করা হউক। অনেক লোকের ধারণা যে, ভারতবাসিগণ স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলে কোন সত্যতা নাই। নেটালস্থ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের কথানুযায়ী নেটাল গভর্ণমেণ্ট তথায় মজুর প্রেরণ করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করেন। এই বিষয়ে সর্ত্ত ছিল যে, কোন মজুর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোনও শ্বেতাঙ্গ জমিদারের অধীনে কার্য্য করিলে পর স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং নেটালে বসবাস করিতে পারিবে। এমনকি জমি জায়গা দেওয়ারও প্রলোভন দেখান হয়। এই প্রকার লোভে সরল ভারতীয় মজুর নেটালে আসিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে কেবল নেটালে ভারতবাসীর সংখ্যা ১৩০০৩১ জন। ইহাদের মধ্যে ৩২ হাজার সর্ত্তবদ্ধ মজুর। আর ৩২ হাজার মজুর, সর্ত্ত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা পূর্ব্বে নেটালে সর্ত্তবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল এমন লোকের সন্তান।

মজুরদের উপর অত্যাচার

যে ভারতবাসী সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিবার জন্য নেটালে আসে, তাহাকে পাঁচ বৎসর

পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ কৃষকের অধীনে কাজ করিতে হয়। এখানে বেচারা মজুর নানারূপ কষ্টে পতিত হয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষকের আদেশানুযায়ী অনেক রকম কার্য্য করিতে হয়। কোন কাজ করিতে অস্বীকার করিলে শ্বেতাঙ্গ কৃষক চাবুক দিয়া মারিতে থাকে। প্রত্যেক মজুরকে সারাদিনের জন্য ঠিকায় কাজ করিতে হয়। এই ঠিকার পরিমাণ এতবেশী হয় যে, বড় বড় জোয়ান মজুরও সমস্ত দিনে পুরা কাজ করিতে সমর্থ হয় না। শ্বেতাঙ্গ কৃষক ভারতীয় মজুরকে 'ড্যাম কুলি ব্লাডী কুলী' বলিয়া গালি দিয়া থাকে। মজুরগণ সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে আসায় শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণের হস্তে বিক্রীত হইয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণ ইহাদের উপর ইচ্ছামত অত্যাচার করিতে থাকে। কাজ না করিতে পারিলে ইহাদিগকে অপমানিত করা হয়। সর্দ্দার ও সাহেবের লাথি খাইতে হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরাধীন মজুরগণের উপর তুলসীদাস গোস্বামীর এই দোঁহা ঠিক খাটে :—

"পরাধীন স্বপনেও সুখ নাহি পায়"

নেটালে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য বড় বড় কারখানা আছে। তাহাদের মালিক প্রায় সমস্তই ইয়োরোপীয়ান। মজুরগণকে আকের জমিতে সমস্ত দিন কাজ করিতে হয়। কখন কখন রাত্রিকালেও ইহাদের দ্বারা কাজ করান হয়। মজুরগণকে মহলার টোকরি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া জমিতে ঢালিতে হয়। বৃষ্টি হইলে, ঐ টোকরির মহলা চুয়াইয়া এই হতভাগ্যগণের মুখে ও সমস্ত শরীরের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে। কাজে কিছু ভুল হইলে দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় অথবা বেত, লাথি কিম্বা চাবুক দিয়া খুব প্রহার করা হয়। এই অমানুষিক অত্যাচারে মজুরগণের জীবন অতিশয় ভারাবহ হইয়া উঠে। কতজন সমুদ্র জলে লাফ দিয়া, কতজন গলায় দড়ি দিয়া আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে। কেহ কেহ অগ্নিরূপে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া শ্বেতাঙ্গ কৃষকের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। কেহ কেহ বা এই ঘৃণিত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদের হাত, পা কাটিয়া ফেলে।

ভারতীয় মজুরগণকে মাসিক বেতন স্বরূপ পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হয় এবং খাইবার জন্য চাউল, ডাইল ও নুণ দেওয়া হয়।

ভারতীয় মজুরগণের উন্নতি

ভারতীয় মজুর সর্ত্ত শেষ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসাতে মনোনিবেশ করে। অধিকাংশ মজুরই চাষের কাজ করিতে থাকে। কেহ কেহ ছোট ছোট দোকান করিয়া এবং কেহ কেহ বা পরওয়ানা লইয়া ফেরি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে থাকে। মোটের উপর প্রত্যেক ভারতবাসী আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। আস্তে আস্তে ইহাদের উন্নতি হইতে থাকে। ইহারা অনেক প্রকারে রোজগার করিয়া উপার্জ্জিত টাকা নানা রকমে সুদে খাটাইতে আরম্ভ করে। ভারতবাসী আফ্রিকার অধিবাসীর চেয়ে উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও চতুর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ইহারা খুব ভালরকমে বুঝিতে পারে। তজ্জন্য ইংরাজ ব্যবসাদারগণের সহিত ইহাদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহারা কম লাভ লইয়া সস্তাদরে জিনিস বিক্রয় করে। ভারতবাসী বাল্যাবস্থা হইতেই পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হয়। উহাদের সমুদয় অভাব অল্প অর্থে পরিপূরণ হয়। এজন্য এখানকার প্রায় ছোট বড় ব্যবসা ইহাদের

হাতে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ধনের এক সর্ব্বপ্রধান অংশ ইহাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারা সহস্র সহস্র বিঘা জমির অধিপতিত্বে পরিণত হয়।

ভারতীয় মজুরগণ অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত উন্নতি করিয়া লয়, দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়। যেখানে আগে বন্যজন্তু বিচরণ করিত, সেখানে এখন সবুজবর্ণের ক্ষেত্র সমূহ পবন হিল্লোলে নাচিতে থাকে; আম্র, দ্রাক্ষা, রম্ভালু, সেও প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ উদ্যানাকারে শোভা পাইতেছে; কফি, সীম, আলু ও আম্রক প্রভৃতি নানা রকমের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। এই সব মজুরগণের পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার মত অসভ্য জঙ্গলীদেশও সুসভ্য মনুষ্যের অধিবাসের উপযোগী হইয়াছে। ভারতবাসিগণের উদ্যোগে নেটাল আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গগণের বিদ্বেষ

যে সময় এ দেশ নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল, বৃহৎ বৃহৎ সিংহের ভীম গর্জ্জনে ও হস্তিগণের বৃংহিত ধ্বনিতে নিস্তব্ধ অরণ্যানী ভয়ানক কোলাহলময় হইয়া উঠিত; যে সময় এই ভয়াবহ বন প্রদেশে কাহারও প্রবেশ করিবার সাহস মাত্রও ছিল না, শস্য, ফলমূল প্রভৃতি মনুষ্য খাদ্যের নামমাত্রও কোথাও দৃষ্ট হইত না, সেই সময় ভারতীয় মজুরগণ অসীম সাহসের সহিত জঙ্গল কাটিয়া শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাদের দ্বারা ধীরে ধীরে সভ্যতার প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর দৃষ্টিতে ভারতবাসী সব রকমে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল। শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়গণকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিত। কিন্তু যেই দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সব রকমের আবশ্যক জিনিস মাত্রই উৎপন্ন হইল ইউরোপ হইতে আগত দরিদ্র শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল, অমনি ইংরাজগণের সুর বদলাইয়া গেল। তাহারা ভারতবাসীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের স্বার্থ দৃষ্টিতে ভারতবাসী কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। শ্বেতাঙ্গগণের এই অত্যাচার ও বিদ্বেষের কারণ স্বার্থবুদ্ধি; আর এই স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধির দ্বারাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্য পরিচালিত। ইহার জন্য যে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাগণই দোষী, তাহা নহে। এখানকার গোরাদিগের ন্যায় আমেরিকানগণেরও ভারতবাসীর আগমন অরুচিকর বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এই হেতু ইহারা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এখানকার গোরাদিগের চেয়ে কোন কোন স্থানে আমেরিকানগণের বেশী পরিমাণে স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রথম নিয়মিত আমেরিকান আন্দোলনকারী মিঃ ফোলরের উক্তির সারাংশ এই যে, "পূর্ব্ব ও পশ্চিম কখনও এক হইতে পারে না; এই হেতু এসিয়াবাসীর কর্ত্তব্য যে তাহারা যেন কখন আমেরিকান ভূমির উপর পদার্পণ না করে।" এ কথার আসল উত্তর এই যে, আমেরিকানগণেরও কখন চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ না করা উচিত। যদি আপনার দেশের লোক আপনার দেশেই থাকে, তাহা হইলে সংসার হইতে এই বাদ বিসম্বাদ চিরকালের জন্য নিবৃত্তি হইয়া যায়।

ভারতবাসিগণের জাগরণ

সন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেটাল গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রস্তুত করিতে চাহেন। ভারতবাসিগণকে প্রচলিত

অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নূতন বিধান প্রস্তুত করা এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় ভারতমাতার উপযুক্ত সুপুত্র লোকমান্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নেটালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই আইনের সম্বন্ধে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহুদিন হইতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ভারতবাসীর নব-জাগরণের সময় উপস্থিত হয়। উহাদের আপনার ভালমন্দের দিকে দৃষ্টি পড়ে। উহারা একটি বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া নেটালে গভর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে এই আইন সম্বন্ধে আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এই আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। এই আইন জারী হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তখনকার প্রধান শাসনকর্ত্তা সার হেনরি বোবিন্স ভারতবাসিগণের প্রার্থনায় মনোযোগ প্রদান করিয়া আইনের কয়েকটী ধারা বদলাইয়া দেন। নেটালের সংবাদপত্র সমূহে ভারতবাসিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। স্থানীয় ভারতবাসিগণ লোকমান্য গান্ধীর অনুমতি অনুসারে দশ হাজার মনুষ্যের স্বাক্ষরিত এক খানি প্রার্থনা পত্র লর্ড রিপণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পরিণাম এইরূপ হয় যে, সম্রাট এই আইন না মঞ্জুর করাতে ইহাকে চাপিয়া রাখা হয়। সর্ত্তে আবদ্ধ ভারতীয় মজুর এক প্রকার গোলামীর নরকে পড়িতে থাকে। এই প্রকার প্রবল আন্দোলন করাতে উহাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং আপনাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়। লোকমান্য গান্ধীর 'প্রবন্ধে নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' ও 'নেটাল ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল এসোসিয়েসন' স্থাপিত হয়।

৩ পাউণ্ডের কর

ভারতীয়গণকে এই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর মনে ঘৃণা আসিয়া প্রবেশ করে। উহারা ভারতবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট করিবার জন্য একদল প্রতিনিধিকে ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করে যে, এখন হইতে যে সকল ভারতীয় মজুর সর্ত্তবদ্ধ হইয়া নেটালে আসিবে, তাহাদের সর্ত্ত সমাপ্তি হইলে পর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। আর যদি এদেশে বাস করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে ২১ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩১৫ টাকা বার্ষিক কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণ ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। ভারতগভর্ণমেণ্টও এই অদ্ভুত প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। সমস্ত দেশে একটা কোলাহল পড়িয়া যায়। স্থানীয় গোরাগণের স্বার্থপরায়ণতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতীয়গণের প্রবল আন্দোলনেও শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা আপনাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ না করিয়া বরং এই প্রস্তাব স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করে। অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্টের পরামর্শে বার্ষিক কর ২১ পাউণ্ডের স্থলে ৩ পাউণ্ড হয়। সন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ ধারা অনুযায়ী কোন ভারতীয় মজুর এদেশে আসিলে তাহাকে প্রতিবৎসর তিন পাউণ্ড হিসাবে গভর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করিতে হইবে কিম্বা স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইবে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর ভারতবাসী প্রথম এদেশে আগমন করে। তখন কেবল তিন বৎসরের জন্য তাহাদের কার্য্য

করিবার সর্ত্ত ছিল। সর্ত্ত শেষ হইলে এখানে অধিবাস করিবার পুরা অধিকার তাহারা প্রাপ্ত হয়। তখন পর্য্যন্তও শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদিগকে জমি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিত। এই প্রকার সর্ত্তবদ্ধ মজুরীর নিয়ম ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। ইহার পরে কিছুদিনের জন্য এই প্রথা রহিত করা হয়। এই প্রথা রহিত হওয়াতে নেটালের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হয়। এজন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম পুনরায় জারী হয়। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত নেটালের খুব উন্নতি হইতে থাকে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিবাদের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় মজুরের এখানে আসা কেন বন্ধ হইবে না এ সম্বন্ধে একটি কমিশন নিযোজিত হয়। কমিশন অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের মত প্রকট করেন যে, ভারতীয় মজুর ব্যতিরেকে নেটালের কাজ চালান অসম্ভব। অবশেষে এই প্রথা যথাপূর্ব্ব রহিয়া যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিরোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই বৎসরে ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী ১৭ ধারার নিয়ম এই বলিয়া পরিবর্ত্তিত হয় যে, কোন ভারতীয় মজুর পাঁচ বৎসরের গোলামী হইতে খালাস হইলে স্বদেশে চলিয়া যাইবে কিম্বা ৫০ টাকা করিয়া বার্ষিক কর প্রদান করিবে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণও কর ধার্য্য সম্বন্ধে একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা করিয়া ইহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি কোন ভারতবাসী কর প্রদান করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহার উপর যেন ফৌজদারী অভিযোগ আনয়ন করা না হয়। ইহা প্রণিধানের যোগ্য যে, ঐ সময় কোন স্ত্রী কিম্বা বালকের উপর কর ধার্য্য হইবে এরূপ কিছু নির্ণয় হয় নাই।

করের জন্য দুর্দ্দশা

এই মারাত্মক করের জন্য ভারতীয়গণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। এই কর সম্বন্ধে "লণ্ডন টাইমস্" স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, "ইহা এক প্রকার গোলামী প্রথার সমতুল্য।" একখানি রেডিকল পত্র বলেন যে, "এই ভীষণ অন্যায় বৃটিশ প্রথার পক্ষে অপমানজনক।" যে সময়ে এই আইন পাশ হয়, সে সময় নেটালের অনেক সহৃদয় লোকও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নেটালীয় কমিশনের একজন সদস্য মিঃ জেম্‌স আর হেওার্স, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "যদি তোমাদের মনে এতই অভিমান হয়, তবে মজুর আসা বন্ধ করিয়া দাও কিম্বা সর্ত্ত সমাপ্তি হইয়া যাইলে স্বাধীনতা প্রদান কর, নতুবা এরূপ ভাবে জুলুম করা ঘোর অন্যায় অত্যাচার।"

এই কর সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহারা এগ্রিমেণ্ট সমাপ্ত হইয়া যাইবে, সে যদি স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বার্ষিক কর প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত মজুর যদি পুনরায় সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে স্বীকার করে তাহা হইলে এই আইন তাহার উপর প্রয়োগ হইবে না অর্থাৎ সে বার্ষিক ৩ পাউণ্ডের মারাত্মক কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। ইহার পরিণাম ফল এই হইবে যে, মজুরগণের কার্য্যের সর্ত্ত শেষ হইয়া গেলে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বার্ষিক কর দিবার ভয়ে সে পুনরায় সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের সর্ত্ত চলিতে থাকিবে। শেষ কথা, ভারতীয়

মজুর চিরকালের জন্য গোলামী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। ঐ সময় কথিত হয় নাই যে, স্ত্রী ও বালকের উপর কর নির্দ্ধারিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে ১৬ বৎসরের অধিক বালকের উপর, এমন কি ১৩ বৎসরের অধিক বালিকার উপরও কর ধার্য্য হয়। অনুমান করুন একটি পরিবারে ৪ জন লোক বাস করে, তন্মধ্যে পুরুষ একজন, স্ত্রী একজন, বালক একজন ও বালিকা একজন; ইহাদের সকলকে ১২ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা করিয়া কর প্রদান করিতে হইলে, মাসে ১৫ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হয়। বিবেচনা করুন ভারতীয় মজুরগণের বেতন মাসিক ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ টাকা কিম্বা এর চেয়ে কিছু বেশী। তাহা হইলে কেমন করিয়া সে পরিবার প্রতিপালন করিবে আর কেমন করিয়াই বা গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক কর প্রদান করিবে? ইহা কি সন্তাপর? যে স্ত্রীলোক বিধবা তাহাকেও এই কর প্রদান করিতে হইত। এজন্য কত স্ত্রীলোক ব্যভিচার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করিতে করিতে অবশ হইয়া যাইত, আর কত পুরুষ চুরি প্রভৃতি কু-কাজে নিযুক্ত হইত। ইহা দ্বারা অনুমিত হইবে যে, ভারতীয়গণের আচরণের উপর এই মারাত্মক কর কিরূপ অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আগে বলা হইয়াছিল যে, "যদি কোন মজুর কর প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার উপর ফৌজদারী অভিযোগ আনয়ন করা হইবে না," কিন্তু এ কথা রক্ষা করা হয় নাই। যে কেহ ঐ কর প্রদানে অসমর্থ হইত, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করা হইত। স্ত্রীলোকেও কর দিতে না পারিলে জেলে প্রেরিত হইত, এমন কি বালক বালিকাগণকেও কারাদণ্ড দেওয়া হইত।

কেবল কারাদণ্ড ভোগ করিলেই যে, সে এই কর হইতে মুক্তি পাইত তাহা নহে; প্রত্যুত কারাগার হইতে মুক্ত হইবার সময় তাহাকে শুনান হইত যে, "তুমি শীঘ্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই কর প্রদান করিবে, নতুবা পুনরায় তোমাকে জেলে বন্দী করা হইবে।" দীন, দুর্ব্বল ও রোগার্ত্ত পুরুষ এবং স্ত্রীগণ কর প্রদান করিবার অসমর্থতাহেতু জেলে প্রেরিত হইত। ভারতবাসিগণকে এই কর ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলে—উহারা না খাইয়া মরিতে থাকে, দুর্দ্দিত জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, কিম্বা পুনরায় মজুরীর সঙ্গে আবদ্ধ হইতে থাকে। এই দীন হীন ভারতীয় মজুরগণকে এদেশে লইয়া আসিয়া এমন প্রভুর অধীনে রাখা হয়, যাহাদিগকে চিনিবার সামর্থ্য উহাদিগের নাই; যাহাদের ভাষা, রীতি নীতি, উহারা কিছুই অবগত নহে। এইরূপ প্রথার যে কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই অমানুষিক ও পাশবিক।

স্বতন্ত্র ভারতীয়গণের প্রতিরোধ

পরতন্ত্র ভারতীয় মজুরগণের এই দেশে বসবাস রোধ করিবার জন্য এই খুনিকরের সৃষ্টি হয়, এবং তন্নিমিত্ত নানারকমের অত্যাচারও আরম্ভ হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র ভারতবাসিগণের এই দেশে প্রবেশের পথ রোধ করিবার জন্য আজ পর্য্যন্তও কোনও বিধান ছিল না এখন এই কথা শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের মনে উদয় হয়। তাহারা স্বতন্ত্র ভারতবাসীর আগমন বন্ধ করিবার জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করিতে থাকে। পরিশেষে ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। স্বতন্ত্র

ভারতবাসিগণের আগমন রোধের জন্য একটি আইন প্রস্তুত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক আইন রচিত হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে, এখন হইতে কোনও স্বতন্ত্র ভারতবাসী এদেশে আসিতে পারিবে না। যদি কেহ স্বদেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে সনন্দ (Domicile Certificate) লইয়া যাইতে হইবে এবং দেশ হইতে যখন ফিরিয়া আসিবে তখন ইহা দেখাইয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। সনন্দ দেখাইতে না পারিলে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই আইনের আর একটি ধারা এই যে, যে ভারতবাসী ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এবং ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান হইবে, সে আপনার যোগ্যতা প্রমাণিত করিয়া এখানে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

এই আইন ভারতবাসীর উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া দেয় এবং নূতন ভারতবাসিগণের এখানে আসিবার পথ একেবারে রুদ্ধ করে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা মিঃ স্মিথের লিখিত রিপোর্ট পড়িলে বিদিত হওয়া যায় যে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নেটাল বন্দরে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭৮৩ জন যাত্রীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ৩২৪৪ জন বৃটিশ রাজ্যের ভারতীয় প্রজা ছিল। এই আইন অতিশয় কঠোর আকার ধারণ করে, ইহার আমলে বৃটিশ রাজ্যের ভারতীয় প্রজা (British Indians) গণকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়। ভারতবাসী ইহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, বৃটিশ উপনিবেশ পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিবার সুবিধা তাহাদের ভাগ্যে নাই। উহারা বহু দূরদেশ হইতে আগমন করে, জাহাজের মাশুলের জন্য শত শত টাকা খরচ করে, অনেকে আবার অন্যের নিকট হইতে ধার লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে পারে যে, স্বতন্ত্র ভারতবাসীর এখানে আসিবার অধিকার নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৬৯ জন এসিয়াবাসীকে এদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে ১১ জন চীনা, ১ জন ইজিপ্সিয়ান, ৩৮ জন গ্রীক, ৮ জন সিংহলী, ১ জন সিরিয়ন, ৮ জন তুর্কী আর শেষ সমুদয় ভারতবাসী ছিল। যে সকল ভারতবাসী এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ১৮৫ জন ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতবাসিগণের সদ্মার্গপথে কিরূপ প্রতিবন্ধক উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত 'নেটাল লাইসেন্সিং এক্ট' রচনা করিয়া ভারতবাসীকে বাণিজ্য করিবার পরওয়ানা দেওয়া রহিত করা হইয়াছে। এই বিচিত্র 'এক্ট' ভারতবাসীর প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করিয়াছে। ব্যবসাদার-গণকে জব্দ করিবার আর এক উত্তম উপায় এই যে, যখন কোন দোকান খুব ভাল রকম চলিতে থাকে, হয়ত এমন সময় তার পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হয়, তখন ব্যবসাদার নূতন পরওয়ানার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করে; সেখানে তাহাকে বলা হয় যে, তুমি দোকান উঠাইয়া লইয়া অমুক জায়গায় চলিয়া যাও, নতুবা তোমার পরওয়ানা রহিত করা হইবে।

দোকানদার তখন নিরুপায় হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে দোকান উঠাইয়া লইয়া যায়।

স্থানের পরিবর্ত্তন জন্য গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া যায়। যে স্থানে ঐ দোকানদার দোকান লইয়া গিয়াছে সেস্থানে হয়ত কোন ইংরাজ ব্যবসাদারের দোকান আছে। কিন্তু পরিশ্রম ও বিশ্বাসের জন্য ভারতীয় ব্যবসাদার যেখানে গমন করে সেইখানেই সে ব্যবসাতে প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সময় পুনরায় তাহার উপর সেই পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর এখানকার ব্যবসাদারগণের ক্রয় বিক্রয়ের পুস্তক গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পরিদর্শন করা হয়। ঐ পুস্তক হইতে কোথাও একটি সাধারণ ভুল বাহির করিয়া পরওয়ানা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার কুটিল প্রযত্নের দ্বারা ভারতবাসিগণের এ দেশে বসবাস করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মজুর প্রেরণ রহিত

এই প্রকার ভারতবাসিগণের প্রতি ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া ভারতীয় জনসাধারণ অতিশয় দুঃখিত হয়। ভারতগভর্ণমেণ্টেরও এই অত্যাচারের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। মাননীয় গোখ্‌লের কোমল হৃদয় এই অন্যায় অত্যাচারে দ্রবীভূত হয়। অতঃপর মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, নেটালে ভারত হইতে মজুর প্রেরণ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। অধিকাংশ সভ্যগণ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। সকলের সম্মতি অনুসারে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে নেটালে ভারতীয় মজুর প্রেরণ করা চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হন। আশ্চর্য্যান্বিত হন এই জন্য যে, ভারতের ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন প্রস্তুত করিলেন; আর দুঃখিত হন এই জন্য যে নেটালে ভারতীয় মজুর আসা বন্ধ হওয়াতে ইক্ষু-ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইঁহারা সভা করিয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টকে বলুন যেন এই সময়ের পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইঁহাদের অনুরোধ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট উত্তর প্রদান করেন যে, ১লা জুলাই ব্যতীত আর দিন বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এই উত্তরে অসন্তুষ্ট শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী আপনাদের অধীনস্থ মজুরগণকে ভারতবর্ষ হইতে মজুর যোগাড় করিয়া লইয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করেন। যে সকল লোক মজুর সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসের দিকে যায়, তাহারা অনতিবিলম্বে ৫০০ মজুর সংগ্রহ করে আর যাহারা কলিকাতার দিকে মজুর সংগ্রহ করিতে যায়, অদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের মজুর প্রাপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। এমন সময়ে যে ষ্টীমার মজুরগণকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতার বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা বিলাতে প্রস্থান করে। এ দিকে কলিকাতার ডিপোতে নেটালে প্রেরণ করিবার জন্য ৫০০ শত মজুর সংগৃহীত হয়। শেষে যখন এই সংবাদ নেটালের শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণ প্রাপ্ত হন তখন তাহারা কলিকাতার এজেণ্টকে কোনও ষ্টীমার ভাড়া করিয়া

মজুরগণকে প্রেরণ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে এজেণ্ট একখানি জাহাজ ভাড়া করেন, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ জাহাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মজুর লইয়া যাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

এক্ষণে এস্থানে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বড়ই মুস্কিলে পতিত হন। কিরূপে মজুর লইয়া আসিবেন তাঁহারা ইহার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। শেষে তাঁহারা স্থির করেন যে, কলিকাতা হইতে রেলগাড়ী করিয়া তুতীকোরিন পর্য্যন্ত এবং তুতীকোরিন হইতে ষ্টীমার করিয়া সিংহল পর্য্যন্ত মজুরগণকে লইয়া আসিতে পারিলে পুনরায় নেটাল হইতে ষ্টীমার গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিবে। এই কথা ভারতীয় এজেণ্টকে জানান হয়। তিনি রেলগাড়ী করিয়া মজুরগণকে তুতীকোরিণে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পরন্তু এখানেও ভারতগভর্ণমেণ্ট রেল গাড়ীতে মজুর লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এইখানে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। মজুর লইয়া যাওয়া চিরকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। নেটালস্থ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীগণের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। নেটালের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র "মারকিউরি" অতিশয় দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন যে, আজ হইতে ভারতীয় মজুর আসা চিরকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া গেল।

নূতন মজুর আসা বন্ধ হওয়াতে পুরাতন মজুরগণের অবস্থা কিছু ভাল হয়। স্বাধীন মজুরগণকে শ্বেতাঙ্গগণ অধিক বেতন দিয়া নিয়োগ করেন এবং পূর্ব্বের চেয়ে খুব ভাল ব্যবহার করেন। এই উদারতার জন্য মাননীয় গোখ্‌লে ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বোচ্চ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীসেবা ভিক্ষু জীবন।

যক্ষ্মা রোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ চিকিৎসা

(গত বৈশাখ মাসের ৬৫৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

গলা দিয়া রক্ত উঠা

যক্ষ্মা রোগে অনেক সময়েই গলা দিয়া রক্ত উঠিতে দেখা যায়। হাসপাতাল সমূহে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০, ৭০, জনেরই ব্যাধির এক সময় না এক সময় গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া থাকে। কাহারও বা গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াই এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়। হয়ত তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ অসুখ বোধ হয় নাই, বেশ সচ্ছন্দে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ রক্ত উঠাতে ভয়ে অস্থির হইয়া ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া এই ব্যাধি সম্বন্ধে হয়ত সন্দিহান হইলেন নতুবা ব্যাধিতে

আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোগী ও রক্ত দেখিয়াই আতঙ্কে অস্থির হয়। রক্ত যদি ১ ছটাক উঠে, সে মনে করে যে নিশ্চয়ই একসের উঠিয়াছে; সমস্ত দেহের রক্তই যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। রক্ত দেখিলে স্বতঃই আমাদের ভয় আসে। উহা আমাদের দেহের একান্ত সার পদার্থ সুতরাং উহার মোক্ষণ দেখিয়া যে রোগী শঙ্কায় কাতর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে রক্ত উঠাতে বাস্তবিক উপস্থিত ভয়ের বেশী কোন কারণ নাই যেহেতু শুধু রক্তপাতের দরুণ ক্ষয় রোগীকে বড় একটা মরিতে দেখা যায় না। হয়ত উহাতে শতকরা ২।১ জন মরিয়া থাকে, কাজেই উহার জন্য ভয়ে আধমরা হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ যক্ষ্মা রোগের দুই অবস্থায় রক্ত উঠিয়া থাকে। এক ব্যাধির প্রথম ভাগে, অপর শেষের দিকে। প্রথম ভাগের দিকে যে রক্ত উঠে উহা সাধারণতঃ ফুসফুসে রক্তাধিক্যের কারণ। আমাদের শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লাগুক না কেন সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। দেহের একটা স্থানে যদি সূঁচ বিঁধিয়া পড়ে বা কোন স্থানে যদি একটা সামান্য ক্ষুদ্র পিপীলিকাও দংশন করে, সেই স্থানই যে লাল হইয়া উঠে ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শরীরের যে স্থানই কোনরূপে উত্তেজিত হউক (irritated) সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্য তথাকার আক্রমণকারী শত্রুকে বা দূষিত পদার্থকে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করে এবং সেই স্থানকে পুনরায় স্বাভাবিক সুস্থ-অবস্থায় আনিতে সহায়তা করে। এইরূপ ফুসফুসেও; ফুসফুসে যদি কোনওরূপ আঘাত লাগে বা তথায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষয় জীবাণু বা অপর জীবাণু ঘাইয়াও যদি প্রবাহ (irritation) উৎপাদন করে তাহা হইলে তথায়ও রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্যের কারণে রোগের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় রক্ত মোক্ষণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী (capillaries) যেখানে রক্তাধিক্য ঘটে, সেখান হইতে রক্ত চুয়াইয়া (By Diapedesis) শ্বাসনালীতে যায়, এবং তথা হইতে কাশীর সহিত গলা দিয়া উঠে। সময় সময় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ীগুলি ছিঁড়িয়াও রক্ত মোক্ষণ হয়। প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে উহা প্রায়শঃই পরিমানে অল্প—হয়ত কাশীর সহিত মিশ্রিত সামান্য রক্ত। সময় সময় যে বেশীও না উঠে তাহাও নয়, তবে সাধারণতঃ ৩।৪ আউন্সের বেশী উঠে না।

ব্যাধি অগ্রসর হইলে বা শেষের দিকে যে রক্ত উঠে উহা প্রায়ই রক্তবহানাড়ী (artery) ছিঁড়িয়া বাহির হয়। ক্ষয় জীবাণু ও উহার নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ সকল ক্রমশঃ ফুসফুসের ক্ষয় সাধন করে। উহার ফলে ফুসফুসের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত হয় (cavity formation) এবং উহার কার্য্য চলিতে থাকিলে উহা ক্রমে বৃহদায়তনও হয়। ফুসফুস যে পদার্থে তৈয়ারী তাহা অপেক্ষা রক্তবহানাড়ীগুলি কঠিন উপাদানে নির্ম্মিত এবং এই কারণে ফুসফুসের ক্ষয় হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই রক্তবহানাড়ীগুলির ক্ষয় না। ঐ নাড়ীগুলি, চারিদিকে খোলা জায়গা পাওয়াতে ও উহাদের উপরকার চাপ কমিয়া যাওয়াতে এবং নিজেদের সাধারণ স্থিতি-স্থাপকতাগুণ থাকা বশতঃ প্রসারিত হয় বিশেষতঃ ভিতরকার রক্তসঞ্চালনের

বেগ যদি কোন কারণে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আরও সহজে হয়। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইতে হইতে উহাদের আবরণগুলি (walls) পাতলা হইয়া পড়ে ভিতরে কোন কারণে রক্ত চলাচলের জোর বৃদ্ধি হইলেই উহার আবরণ ফাটিয়া যায় এবং শ্বাসনালীর ভিতর রক্ত আসিয়া পড়ে ও তথা হইতে কাশীর সহিত গলা দিয়া উঠে। সকল সময়েই যে নাড়ী এইরূপে প্রসারিত হইয়া ফাটিয়া যায় তাহা নহে। ফুসফুসের ক্ষয় আরম্ভ হইলে শেষে অনেক সময় উহা এই নাড়ীও খাইয়া দেয়। নাড়ীর চারিদিক খোলা পড়িলে, শরীরে যদি হঠাৎ কোনরূপ আঘাত লাগে কিংবা ঝটকা টান লাগে তাহা হইলে উহাতেও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় সময় সময় বৃহদাকার নাড়ী ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রক্ত বেশী পরিমাণ উঠে। ২।৩ আউন্স হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ পাইন্ট (২০ আউন্স— ১ পাইন্ট) অর্থাৎ ১½ সের, ২ সের পর্য্যন্ত রক্ত উঠে। রক্ত খুব অধিক পরিমাণে উঠিলে সময় সময় ভয়ের সম্ভাবনা আছে। উহা শ্বাসনালীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দম বন্ধ হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। একবারে যদি খুব অধিক রক্ত উঠে তাহা হইলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হইয়া, মূর্চ্ছা রোগে মৃত্যু ঘটিতে পারে। (death by syncope from cerebral anaemia) তবে উহার সম্ভাবনা খুব কম। পূর্ব্বোক্ত ভাবেই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী, তাহাও শতকরা ২।৩ জনের অধিক যে হইতে দেখা যায় না সে কথাও ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই যে গলা দিয়া রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনিল (frothy)। উহা যখন অল্প পরিমাণে উঠে তখন প্রায়শঃই কফের সহিত মিশ্রিত থাকে। সময় সময় রক্ত গলা হইতে পাকস্থলীতে যায় এবং কিছুকাল পরে যখন বমনের সহিত উঠিয়া আইসে তখন উহার বর্ণ কিছু কাল দেখায়। পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিলে কচিৎ মলের সহিতও নিঃসৃত হয় উহার বর্ণ তখন কাল।

গলা দিয়া যে রক্ত উঠে উহার সহিত অনেক সময় ক্ষয় জীবাণু মিশ্রিত থাকে।

এই রক্ত উঠার কারণ সব সময়ে সবিশেষ নির্দ্দেশ করা যায় না। হঠাৎ কোন জোরের কাজ করিতে যাওয়া, অতিরিক্ত শ্রম বা কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা, মলত্যাগের সময় জোরে কোঁথানি দেওয়া, অনবরত কাসিয়া অস্থির হওয়া, ঋতুস্রাব বা কোনও কারণে রক্ত চলাচলের বেগ হঠাৎ বৃদ্ধি হইলে, হঠাৎ অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসিলে বা অত্যধিক মদ্যপান করিলে রক্ত উঠার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অনেক সময় বিনা কারণেও রক্ত উঠিয়া থাকে। হয়ত রোগী বিছানায় শুইয়া আছে, কিংবা সুস্থভাবে আরাম কেদারায় বসিয়া আছে—হঠাৎ গলাটা একটু সুর সুর করিল, বুকটা একটু চাপা চাপা বোধ হইল—পরক্ষণেই গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া পড়িল।

গলা দিয়া রক্ত উঠিলেই যে উহা যক্ষ্মা-জনিত এ কথা মনে করা উচিত নহে। নানাবিধ কারণে গলা দিয়া রক্ত উঠিতে পারে। প্রথমেই নাকের ও গলার ভিতর হইতে কোনরূপ রক্ত বাহির হইবার কারণ কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। দাঁতের গোড়া হইতেও অনেক সময় রক্ত যাইয়া কাসীর সঙ্গে আইসে, উহাও ভাল করিয়া দেখা উচিত। তারপর নানাবিধ হৃদ্‌রোগে, কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে (cancer), নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাই-

টীস্, ও লিভারের সিরোসিস্ এ (Cirrhosis of liver) এবং বসন্ত, রেগ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ও রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যাধিতেও (Diseases of blood) এইরূপ রক্ত উঠিয়া থাকে। এ সমস্ত বর্জ্জন করিলেও যদি কোথাও কিছু না পাওয়া যায় তাহা হইলে সচরাচর উহা ফুস্‌ফুস্ জাতই মনে করিতে হইবে কারণ যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় প্রায়শঃই কোন উপসর্গ ধরা যায় না। যখন ফুস্‌ফুসে ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ত সন্দেহের কারণই থাকে না। রক্তের ভিতর কচ জীবাণু পাওয়া গেলে উহা যক্ষ্মা-জনিত বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব কখনও কখনও যে স্বাভাবিক পথে না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মাসে মাসে গলা দিয়া রক্ত উঠে এ কথাও মনে রাখা দরকার।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত বলিয়া একটা অবস্থার সবিশেষ বিবরণ দেখা যায়। উহাকে কবিরাজগণ যক্ষ্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন পিত্ত কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং ঐ দূষিত পিত্ত ও রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া কখনও গলা দিয়া কখনও মলদ্বার পথে, প্রস্রাবের পথে, যোনীদ্বার পথে, কখনও বা লোমকূপ পথে বহির্গত হয়। উহা হইতে আমার অনুমান হয় অবস্থা বিশেষে যকৃতের কার্য্য কোন বিশেষভাবে বিকৃত হইলে উহা রক্তের বিশেষ এক পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং তখন উহা নানা পথে নির্গত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তন কি এবং কোন উপায়ে ঘটে তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তবে আশা আছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার একটা কূল কিনারা হইতে পারে। যকৃতের রক্তের উপর একটা বিশেষ ক্রীড়া আছে বলিয়া আমার মনে হয় কিন্তু এ বিষয়ে সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই।

যখন গলা দিয়া রক্ত উঠে তখন রোগীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, শরীর বিবর্ণ ও ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং রোগী ভয়ে কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। শরীরের তাপ স্বাভাবিক হইতে অনেক নীচে নামিয়া যায়। এই সময়ে রোগীর বিশেষ সাবধানতা লওয়া দরকার, ডাক্তারের জন্য ত লোক যাইবেই কিন্তু নিজেরও একটু সতর্কতা লইতে হইবে। রোগীকে নাড়াচাড়া করিবে না, যেখানে থাকে সেইখানেই অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রাখিবে একেবারে শোয়ার চেয়ে পিঠের ও মাথার নীচে বালিস দিয়া আধশোয়া করিয়া দেওয়াই ভাল। যদি ডাক্তার পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন কোন দিক হইতে রক্ত উঠিবার আশঙ্কা আছে এবং সেইদিকে শোয়াইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে রক্তটা যাইয়া ভাল দিকের শ্বাস নালীর ভিতরপ্রবেশ করিয়া শ্বাসকষ্ট করিতে পারিবে না। যদি বেশী রক্তমোক্ষণের জন্য মূর্চ্ছা যাইয়া থাকে তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। কারণ এই মূর্চ্ছার দরুণ রক্তের জোর কম থাকে এবং উহা রক্ত উঠা বন্ধ করিতে সহায়তা করে। ঘরটা যাহাতে ঠাণ্ডা থাকে ও উহাতে বেশ হাওয়া চলাফেরা করে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরে যাহাতে কোনরূপ গোল না হয় তাহাও করিতে হইবে। ঘরটা বরং একটু অন্ধকার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। কথা বলা এক রকম বন্ধ থাকিবে। কোনরূপ সাংসারিক বা মানসিক চিন্তা ও স্ত্রীলোক হইলে ছেলে পিলের হাঙ্গামা না করিতে হয়। পটীর মধ্যে কোনরূপ গোল না হয়। ডাক্তার

আসিলেও রোগীর বুক ঠুকিয়া পরীক্ষা বা জোরে জোরে শ্বাস নিতে বলা উচিত নহে। কেবল 'ষ্টেথেস্কোপটি' আস্তে বুকে লাগাইয়া স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা একটু দেখা। একবার রক্ত উঠিলে পুনঃ পুনঃ উঠার আশঙ্কা থাকে। ২।১ টুকরা ছোট বরফ, মাঝে মাঝে খাইতে দেওয়া যায়, তবে বেশী না, উহাতে পাকস্থলীর গোলমাল হইয়া বমন আরম্ভ হইতে পারে এবং পুনরায় রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে। অল্প পরিমাণ রক্ত উঠিলে বিশেষ কোন ঔষধ পত্রের প্রয়োজন হয় না:— উপরোক্তরূপ সাবধানতা নিলে আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়, তবে রক্ত বেশী উঠিতে থাকিলে ও ডাক্তার আনিতে বিলম্ব ঘটিলে আধ ছটাক পরিমাণ আধা পানের রস খাইতে দেওয়া যায়। জেলেটিন (geletine) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার একটু একটু খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। বুকের যে দিক হইতে রক্ত উঠে সেই দিকের উপরে আইস্ ব্যাগে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে বিশেষ উপকার হউক না হউক রোগীর মনটা শান্ত হয় এবং রোগী মনে করে যে একটা কিছু করা হইতেছে। অন্ততঃ বুকের ধড় ফড়ানিটা বারণ করে। অন্যান্য ঔষধাদি ডাক্তারের উপদেশ মত দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠিবার অব্যবহিত পরেই পথ্য দেওয়া উচিত নহে। কয়েকদিন শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তরল পথ্য ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। ৩।৪ ঘণ্টা বাদে বাদে ২,৩ আউন্স করিয়া ঠাণ্ডা দুধ, দুধবার্লি বা দুধসাগু এমন কি অবস্থা বিশেষে হরলিক্স্ মলটেড্ফুড্ (Horlick's Malted Food) দিবে। ফলাদির রসও ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ৩।৪ দিন একাদিক্রমে রক্ত ওঠা বন্ধ থাকিলে তবে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই অল্প পথ্যের ফলে রক্ত চলাচলের জোর কম থাকে এবং রক্ত উঠার আশঙ্কাও কম হয়। এ সময় ব্রাণ্ডী বা কোন উত্তেজক ঔষধ দেওয়া উচিত নহে।

বাহ্যে যাহাতে বিশেষ পরিষ্কার থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। কাসী হইতে থাকিলে রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে সুতরাং কাসী যাহাতে না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। কাসী আসিলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া কতকটা বন্ধ করা যায়। দরকার হইলে এ সম্বন্ধে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে কাসীর উত্তেজনা করিতে পারে সেরূপ কোন জিনিস নিকটে না থাকে তাহা দেখিতে হইবে। তামাক ও সিগারেট অভ্যাস থাকিলে উহা এ সময় বন্ধ থাকিবে, ঘরে অপর কেহও ধুম পান করিতে পারিবে না! কোন রূপ ধুঁয়া বা উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট জিনিস যাহাতে রোগীর নিকট পৌঁছিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত দেখিতে হইবে। যে সব লোক রোগীর জন্য বৃথা ব্যস্ত হয় বা সামান্য ব্যাধিকে বৃহৎ করিয়া রোগীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে সেরূপ আত্মীয় বা অপর কাহাকেও রোগীর নিকট যাইতে দেওয়া সমীচীন নহে।

এইরূপ সাবধানমত রাখিলে সত্বরেই রোগীর রক্ত উঠা বন্ধ হইবে। রক্ত উঠার শেষ দিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। তখন পথ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দুধসুজি, বা দুধরুটী অথবা পাউরুটী পরে আস্তে আস্তে দুধ ভাত আরম্ভ করা

যাইতে পারে। মাংসটা কয়েক দিন না খাওয়াই ভাল।

সামান্য ছিটে ফোটা রক্ত উঠিলে পথ্যের এতটা কড়াকড়ির প্রয়োজন নাই। রক্ত উঠাটা যে সব সময়ই খারাপ তাহা নহে। প্রথম অবস্থায় উহা হইতে অনেক সময়ে উপকার হইতেও দেখা যায়। এই রক্ত উঠার পর কখনও কখনও ফুস্‌ফুসের সমস্ত লক্ষণ লোপ পাইতে দেখা গিয়াছে ও রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। আবার ইহা হইতে খারাপও যে না হয় তাহা নহে। অনেক সময় রক্ত মোক্ষণের পর ব্যাধি নানা স্থানে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হয় ও দ্রুত বাড়িয়া যায়। সুতরাং এই রক্ত মোক্ষণের পর রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজনীয়। রক্ত মোক্ষণে যদিও আশু ভয় নাই—কিন্তু রক্ত হানির দরুণ শারীরিক দুর্ব্বলতাও ঘটে। যাহাতে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া শরীর সারিয়া উঠে সে জন্য একান্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

রোগী অনেক সময় রক্ত গিলিয়া ফেলে উহা কদাচিৎ উচিত নহে। উহাতে কয় বীজ নানা স্থানে নীত হইয়া নানা স্থানের ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে।

হাসপাতালে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে একজনের রক্ত মোক্ষণ হইলে সেই সময়ে অপর কতকগুলি রোগীরও রক্ত মোক্ষণ হইতেছে। উহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ উহা কোন রূপ সংক্রামক উপায়ে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য রক্ত উঠিলেই রোগীকে আলাহিদা স্থানে ভিন্ন ভাবে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। অবশ্য নিম্ন বাটীতে সেরূপ করার আবশ্যক হয় না।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এইরূপ এক সময়ে রক্ত মোক্ষণের কারণ জল হাওয়ার অবস্থার দরুণ ঘটে। যখন সাঁৎস্যাতে গরম হাওয়া দেয় প্রায় সেইরূপ সময়েই ইহার আধিক্য দেখা যায়। শীতকালে ততটা বেশী রক্ত উঠিতে দেখা যায় না।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে রক্ত উঠিলেই একটা হৈ চৈ করিবে না। রোগীর ত স্বভাবতঃই ভয় পাইবার কথা। ভয় পাইলে আরও রক্ত উঠিতে থাকে মাত্র।

রোগীকে অভয় ও আশ্বাস দিবে। বাস্তবিক ভয়ের সেরূপ কোনও কারণই নাই। রোগী যদি সুস্থভাবে বিশ্রামে থাকে ও যে সব নিয়ম এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে তাহা পালন করে তাহা হইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনেকে রক্ত উঠাতে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে অধিক নড়াচড়া হওয়ার সম্ভাবনা ও উহাতে রক্ত উঠার আশঙ্কা আছে।

যাহাদের বার বার রক্ত উঠে তাহাদের সম্বন্ধে আরও বিশেষ সাবধানতা লওয়া দরকার। ডাক্তারের নিকট হইতে সবিশেষ ব্যবস্থা লইয়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি নাই। এই প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে উহা সাধারণতঃ শিরা (vein) হইতে নির্গত হয় বলিয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখায়। ফুস্‌ফুসের শিরা সমূহে বিশুদ্ধ রক্ত (oxygenated) থাকে কিন্তু ধমনীতে (Artery) দূষিত রক্ত থাকে সেইজন্য শেষ দিকে যে রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লালবর্ণের নহে বরং একটু কালো রঙ্গের।

রক্ত উঠার সময় শরীরের তাপ যেমন স্বাভাবিকের নীচে যায় পরে আবার একটু স্বাভাবিকের উপরে উঠে তবে ক্রমশঃ উহা স্বাভাবিক হইয়া আসে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পল্লী-কথা

সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা; আমাদের বর্ত্তমান আয়ুর অনুপাতে একটু বেশী বলিয়া মনে হইলেও কালের হিসাবে—এই সে দিন—বলিলে চলে। সহরতলির বেচারাম সুর মহাশয়ের গৃহিণী প্রসবান্তে পীড়িতা হওয়ায়—মধু ডাক্তার মহাশয়—চা সেবন করিবার ব্যবস্থা দেন। কিন্তু ব্যবস্থাটা যত সহজে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করাটা সুর মহাশয়ের পক্ষে তত সহজ ছিল না; তাঁহাকে এই উপলক্ষে আর্ত্তের ন্যায় স্বার্থের শরণ লইতে হইয়াছিল। পরে অনেক অনুসন্ধানে রাজনারায়ণ বেণের দোকানে হাঁড়ির মধ্যে—হাঁড়ির হালে অবস্থিত চীনের চা পাইয়া ও পাদরি সাহেবের পেয়ারা পীরবক্সের নিকট তাহার পাকপ্রণালী সংগ্রহ করিয়া সুর মহাশয় এই দুরূহ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। অকস্মাৎ ভূমিকম্পের ন্যায় এই অভিনব সংবাদটি সমগ্র পল্লীটিকে সচকিত করিয়া তোলে। গ্রামের প্রান্ত হইতেও পুরমহিলারা এই উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং অকস্মাৎ নাসারন্ধ্র রোধ করিয়া একটু ব্যবধানে থাকিয়াই তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এমন কথাও উঠিয়াছিল—সুর মহাশয় আর জাতে থাকিতে পাইবেন কি না?

তাহার পর ইংরাজী আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কবিবরের "অসভ্য জাপান" মুলুকের সাত হাত উর্দ্ধে সাইনবোর্ড তুলিয়াছে. মানুষের পালক উঠিয়াছে, মানচিত্র বহুরূপী সাজিয়াছে, বিজ্ঞানের বন্যা বহিয়াছে, পুরোহিত-ঘরণী গাগ্‌রা পরিয়াছে, মস্তকের প্রথমার্দ্ধ উর্ব্বর ও পরার্দ্ধ উসর হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের উপমাটা জন্মের মত কানা হইয়াছে। কবিবরের "ঘুমাইয়া রয়ে"র আক্ষেপ আমরা রাখি নাই,—আমাদেরও অনেক রকম হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চা ও চশমা", কেবল "চৈতন্যটি" নয়। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এত দ্রুত উন্নতি এক "বাক্য বীরত্ব" ছাড়া আমাদের আর কোন ডিপার্টমেণ্টেই হয় নাই,—বোধ হয়, "সুগন্ধি তৈলেও" নহে। আমার এই অনুমানটা সম্ভবতঃ সরকার মহাশয়ের মত সাবধানী ঐতিহাসিকও অস্বীকার করিবেন না।

সকলের একই রকম গুণ থাকে না। আমরা ভগবানের কৃপায় নিজের অভাব সৃষ্টি করিতে সিদ্ধহস্ত; অপরে আবার দয়া পরবশ হইয়া আমাদের অজানা অভাবগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে যত্নবান। শুনিতে পাই প্রখর প্রতিভাশালী বুদ্ধিধুরন্ধর মহামতি লাট কর্জ্জন মহোদয়ের নিকট যখন চা-করেরা দুঃখ জানাইয়া বলেন "প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন করিয়া আর ফল কি, কাটতি কোথায়, এ দেশের লোক চা খায় কয়জন?" তখন তিনি তাঁহাদেরই লক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা এ দেশের লোককে চা খরাইবার উপায়টা কি করিয়াছ, তোমাদের সে চেষ্টাই বা কোথায়?"—এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার মূল্যবান মন্ত্রণা দ্বারা, তাঁহাদের যন্ত্রণা নিবারণের উপায়টাও ইঙ্গিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

ভাগ্যবান বাণিজ্যবীর মাননীয় ইউল সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সেই উপদেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়া চা-টা ক্রমশঃ নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশাধিকার পাইল। পুরাকালে যেমন রাজপুত্রেরা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইত, ইহাও সেইরূপ সকাল সন্ধ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বাবুদের কাবু করিয়া বউঝিদের পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। তাঁহারাও অনেকেই ইহাকে সাদরে বরণ করিয়া, প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। মহাজনের অযোঘ মন্ত্রণা মহিমান্বিত হইল। এখন ইঁহা নেশায় দাঁড়াইয়াছে, চা ব্যতিরেকে মনে উৎসাহ, দেহে স্ফূর্ত্তি, প্রাণে বল ও কাজে হাত পা আসে না। অনেককে স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনি—"ভাত দাও আর নাই দাও, এক কাপ্ চা দিয়ে সারা দিন খাটিয়ে নাও তাতে আমার কোনও কষ্টই হবে না।"

আবার সে দিন "বসুমতীতে" দেখিলাম—

"এ দেশের চা-ব্যবসায়ীরা এ দেশে চা'র ব্যবহার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহারা এই বিজ্ঞাপন বাবদে অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। সেবার অ্যাংলো ইউল্ কোম্পানী পয়সায় পুলিন্দা চা বিক্রয় করিয়াছিলেন—লোকের মৌতাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে ফলও ফলিয়াছে। সেই সময় হইতেই কলিকাতার পথে পথে চা'র দোকান বসিয়াছে। তখন এই কোম্পানীতে সংবাদ দিলেই তাঁহারা সভাসমিতিতে উৎসবে অতি সামান্য খরচ লইয়া চা যোগাইয়া আসিতেন। চা, চিনি, দুগ্ধ, পিরিচ, পেয়ালা—সবই তাঁহারা আনিতেন, গৃহস্থ কেবল উনান ও কয়লার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। এখন যে, বিবাহ বাড়ীতে চা'র আয়োজন থাকে, সেও সেই সময় হইতে। এবার আবার চা-ব্যবসায়ীরা আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। এবার তাঁহারা বিজ্ঞাপন বাবদে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। যাহারা ইহাদের সাহায্য লইয়া চা'র দোকান খুলিতেছে—ইহারা তাহাদিগকে লোক জমাইবার জন্য দোকান সাজাইবার খরচ দিতেছেন, গ্রামোফোন কিনিয়া দিতেছেন। মফঃস্বলে মেলায় চা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদ পত্রে "চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ" প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে।"

ইহা অপেক্ষা চেষ্টার চূড়ান্ত আদর্শ আর কি হইতে পারে। এরূপ উদ্যোগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কারণ—চায়ের প্রচলনে উপকার যে কিছুই হয় নাই তাহা বলিলে নিতান্ত নিমকহারামী হয়। অনেক গরীবেরই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে—তাহাতে এই একটানা অন্নকষ্টের দিনে কতকটা বাঁচোয়া বলিতেই হইবে। আবার অনেকে প্রমোশন্ পাইয়া ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ডিপ্লোমা আদায় করিয়াছেন, অন্নচিন্তা একেবারেই নাই, সাত্ত্বিক ভাবে সামান্য জলসাবুতেই পরিতুষ্ট। ইহাও দেখা গিয়াছে—পল্লীগ্রামের কোন কোন ভদ্র পরিবার এক পেয়ালা চা ও এক মুটো মুড়ি অবলম্বনেই একবেলা কাটাইয়া দেন। এটা, ক্রমে অনটন বশতঃই অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। যেখানে শতকরা ন্যূনাধিক তিরিশটি সংসারের রোজগারী লোকগুলি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, সেখানে চা সেবনের ভাবি পরিণাম সম্বন্ধে নীতিকথা শুনাইতে যাওয়া আর তাহাদের পরিহাস করা—একই কথা। উহাই

এখন বহু অনুষ্ঠিতের উপজীব্য। সুতরাং এ স্থলেও চায়ের "উপকারার্থে বা জীবন-ধারণার্থে প্রয়োগ"ই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কাজেই চায়ের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্যই নাই। কথাটা পাড়িলাম—কেবল মাত্র চায়ের প্রচলনার্থে প্রচেষ্টা ও তাহার সাফল্য দেখাইবার জন্য। তবে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে মহা মহারথীরা যেসা কথা বলিয়াছেন, আমিও না হয় একটা বলিলাম।

জীবতত্ত্ববিদেরা জানেন—একটা মশা দিনে কত ডিম্ পাড়ে। তাহাদের বংশবৃদ্ধির সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য যে কত রাজা মহারাজাও লালায়িত, অপুত্রক বিষয়ী লোকেরাও তাহা জানেন। এ হেন রক্ত-বীজের ঝাড় উজাড় করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইতে আমরা উপদিষ্ট। চেষ্টা থাকিলে সকলই সম্ভব। কিন্তু, সিংহগুলা শুনিয়াছি—এক বনে একটা থাকে—এক কামড়ে একটা মানুষ মারে, এবং সিংহিনী নাকি বার বৎসর অন্তর একটি করিয়া সন্তান প্রসব করে। কই—আজিও ত তাহাদের নির্বংশ হইবার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক—এই মশক মারণ মহোৎসব না হয় মিউনিসিপাল মহাশয় চালাইতে থাকুন। কিন্তু যাহারা ম্যালেরিয়ার মরে—দেশের মহোদয়দের নিকট তাহাদেরও দু একটা কথা বলিবার সাধ হয়। জানি—তাহাদের কথাগুলা চিরদিনই বাজে কথা বলিয়াই গণ্য। অতএব আজ যাহা বলিতে যাইতেছি—তাহা যে হঠাৎ মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইবে ও দশের নেক নজর আকর্ষণ করিবে, বা তাঁহাদের একটু ভাবিয়া দেখিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিবে, এরূপ দুরাশা আমার নাই। তবে বলা ভিন্ন উপায়হীনের আর অন্য পথ কি আছে,—তাই বলি।

দুর্ভাগা দেশে চায়ের মত একটা লোক-দেখানে আস্‌বাব এক চালেই ফট করিয়া চলিয়া গেল। দেশে পূর্ব্বে কখনও কেহ তাহার জন্য অভাব বোধও করে নাই এবং তাহার আবশ্যকের কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই; অথচ পাচনটার প্রচুর অভাব ও আবশ্যকতা সত্ত্বেও তাহা দুষ্প্রাপ্য ও অচল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সম্ভ্রান্ত ও ভাগ্যবান কবিরাজকুল একবার কোমর বাঁধিলে, ম্যালেরিয়ার পাচনটিকে কি প্রত্যহ প্রাতে প্রস্তুত অবস্থায় পল্লীর দ্বারে দ্বারে সকলের সুলভ ও সহজ প্রাপ্য করিয়া উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না? যাহাতে গরীব দুঃখীরা ঘরে বসিয়া প্রত্যহ এক পয়সা খোরাক হিসাবে ready made পাচন পায় তাহার উপায় কি হইতে পারে না? সহরে আসিয়া, ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ সংগ্রহ করিবার সুবিধা ও সামর্থ্য অনেকেরই নাই। অনেকেই ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণ ও নিরুৎসাহ; তাহাদের আর কোন উদ্যমই নাই,—জীবনে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে। এমন অর্থও আর নাই যে টাকা ফেলিয়া শিশির পর শিশি ম্যালেরিয়া মিক্‌শ্চার যায়। এই হতাশ অসমর্থদের প্রতি বঙ্গের বরাণ্য বৈদ্যবংশের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না কি? তাঁহারা কি বঙ্গদেশের এই বিপন্নদের বাঁচাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন না? যদি একা না সম্ভব হয় ত দশ জনে মিলিয়া সঙ্ঘ গঠন করিয়া ইহার একটা উপায় বিধান করুন, আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

প্রথমতঃ পল্লীতে পল্লীতে সন্তরণ লোক পাঠাইয়া পাচনের উপকারিতা, তাহা পাই-

যার উপায় ও সুবিধা, তাহা ব্যবহারের নিয়ম এবং তাহার মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইবার ব্যবস্থা করা চাই। পরে, চায়ের মত প্রস্তুত অবস্থায় পাঁচনটি নিত্য নিয়মিত সরবরাহ বা ফেরী করান চাই। যেখানে বহু লোকের সহজ প্রাপ্য হওয়া সম্ভব এমন এক একটি গ্রামে ডিপো খুলিলেও মন্দ হয় না। কিন্তু সমস্ত কাজটি সঙ্ঘের লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ মেকী ঢুকিয়া এই সদুদ্দেশ্যটিকে নিষ্ফল করিয়া দিবে। গ্রীষ্মাবকাশে, পূজার বন্ধে ও বড়দিনের ছুটিতে কলেজের ছাত্রেরা এই মহৎ প্রচেষ্টাটিকে সাফল্য দিবার জন্য, তাঁহাদের পরার্থপর হৃদয় ঢালিয়া নিশ্চয়ই এই মহাব্রতের প্রধান সহায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবেন।

এই কার্য্যটিকে "হিতসাধন ব্রত" বলিয়াই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। চাই কি ভবিষ্যতে ইহা একটি সমূহ লাভজনক অনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু "ব্যবসা" বলিয়া যেন ইহাকে কলুষিত না করা হয়। আপাততঃ এই উপায়ে দেশকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিলেও, দেশের ও দশের মঙ্গলুহয় হইতে যতই যে আশীর্ব্বাদ উঠিবে—তাহার মূল্য নাই, তাহা দুর্লভ।

চায়ের মত একটা অবেলো বিলাসের বস্তু এই অল্পদিনের মধ্যে যে দেশের অলিতে গলিতে এবং পর্ণকুটিরে প্রভাব বিস্তার করিল, সেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মুমূর্ষু দেশে ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচনের মত এত বড় একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচার জন্য কোন চেষ্টাই কি হইবে না, কোন চেষ্টারই কি আবশ্যক নাই?

বৈদ্যবংশ শিরোমণি বিশেষজ্ঞ ও সম্পন্নেরা কৃপা করিয়া পল্লীবাসীদের হতাশ হৃদয়ের এই প্রতিধ্বনি ও প্রস্তাবটা একবার ভাবিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব। উচ্চ জনে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদসাধন কল্পে মশক কুল নির্ম্মূল করিতে এবং কুইনাইনের কামান চালাইতে থাকুন; আপনারা মানুষের ম্যালেরিয়া মুক্তির ভারটা লইয়া দেশের দুঃখ নিবারণ করুন।

আশা করি কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত "হিতসাধন সমিতি"ও এ সম্বন্ধে চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা
ও
শিক্ষাবিস্তার
মোগল রাজবংশ

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর তাঁহার উদার পিতা অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে হীন হইলেও সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি তাঁহার শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইলেও কতকগুলি

দোষ- তাঁহার চরিত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহার জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের শিক্ষকদিগের মধ্যে মৌলানা মীর কালান মুহদ্দিস একজন। তিনি আকবরের ১ রাজত্বসময়ে হিরাট হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন; এবং আবদুল রহিম খানখানার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ২। আমরা আরও জানিতে পারি যে, কুতবুদ্দিন মহম্মদ খাঁ (১৮৭ হিঃ-১৪৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত) তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং ইহার নিয়োগের সময় বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আহূত হইয়াছিলেন। প্রথানুসারে এইরূপ ঘটনা উপলক্ষে শিক্ষক তাঁহার পদের উপযোগী হস্তী প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন এবং শিক্ষক যুবরাজকে কাঁধে লইয়া সোণা ও মণিমুক্তাপূর্ণ ছোট থালা (রেকাবী) জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে আদেশ দিতেন ৩। পারস্য-ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সম্রাটের নিজের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি হিন্দুস্থানে লালিত পালিত হইলেও তুর্কীভাষায় লেখা পড়ায় অজ্ঞ ছিলেন না। তুরস্কভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারিয়াছেন সম্রাট উক্ত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ৪ এই অভিজ্ঞতা হইতে সম্রাট বাবরের মূল জীবনস্মৃতি (ওয়াকি-আতি-বাবরী) পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (সম্রাট) জাহাঙ্গীর বাবরের স্বহস্ত লিখিত যে গ্রন্থখানি পাইয়াছিলেন উহাতে চারিটী অধ্যায়ের অভাব ছিল। জাহাঙ্গীর উক্ত অধ্যায় চারিটী নিজে লিখিয়া মূল পুস্তকের সহিত যোগ করিয়া দেন এবং উহাতে তাঁহারই কৃতিত্বের পরিচয়ের জন্য তুরস্ক ভাষায় কয়েক পংক্তি লিখিয়াছিলেন ৫। ইতিহাসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং অন্যান্য মোগল বাদসাহদিগের ন্যায় তাঁহারও রাজত্বকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতি স্বহস্তে এবং মহম্মদ হাদি ও মুক্তাদর খাঁ ঐতিহাসিকদ্বয় একমত হইয়া লিখিয়াছেন। জীবনস্মৃতি সম্পাদিত হইলে তিনি পাঠাগারের অধ্যক্ষকে আদেশ দেন যে, উচ্চ রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে এবং দেশের সর্ব্বত্র গণ্যমান্য লোকদিগের নিকট প্রেরণ করিতে। প্রথমখণ্ড সাহজাহানকে অর্পণ করা হয় ৬।

জাহাঙ্গীরের নাম একটী সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ঐ বিজ্ঞাপনের দ্বারা তিনি এরূপভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন যে যখনই কোন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি অথবা কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা যাইতেন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত এবং তদ্দ্বারা অট্টালিকা উত্তোলিত হইত এবং মাদ্রাসা ও দরগা সমূহের স্থাপন ও সংস্কার সাধিত হইত ৭।

---

1 *Muntakhabul-Mir' atul-Alam*, MS. in Boh. Coll., p. 29 ; Elliot viii, p. 159.
2 Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 247.
3 *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. ii, (Lowe's), p. 278.
4 Elphinstone (9th ed.), p. 548.
5 *Wakiati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 315.
6 *Ibid.*, Elliot vi, p. 360.
7 Khafi Khan's *Muntakhabul-Lubab (Bibl. Indica)*, Pt, i, p. 249 ; *Tarikhi-Akbari*, MS. in ASB, Leaf 66

তারিখি—জান-জহানে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল মাদ্রাসা পশু পক্ষীর আবাসভূমি হইয়াছিল তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি সেই গুলির সংস্কার করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদিগের দ্বারা পূর্ণ করেন। ১

আকবরের সময়ে আগরা যেমন সর্ব্বপ্রধান দারুল্‌ত কেন্দ্র হইয়াছিল জাহাঙ্গীরের সময়েও ঠিক সেইভাবেই চলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তুজাক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, "আগরার অধিবাসিগণ আপনাদের উদ্যমে নানা-প্রকার হস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু অধ্যাপক উক্ত নগরে তাঁহাদের বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ২।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মকতুব খাঁ রাজকীয় পাঠাগার ও চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ৩। যখন জাহাঙ্গীর গুজরাটে গমন করেন তখন সঙ্গে একটা লাইব্রেরী লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার পুস্তকপ্রীতি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার চরিত্রে কতকটা বর্ত্তিয়া ছিল। তাঁহার সঙ্গের লাইব্রেরী হইতে গুজরাটের সেখদিগকে তফ্‌সির হুসাইনি, তফ্‌সির কাসসফ্ এবং রজাতুল অবাব উপহার দিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁহার গুজরাটে আগমন ও পুস্তক উপহারের তারিখ লিখিয়া দিয়াছিলেন ৪।

জাহাঙ্গীর অত্যন্ত পুস্তকপ্রিয় ছিলেন। ফিঞ্চের মার্টিন বলেন—"পুস্তকসংগ্রাহক অভিযোগ করেন হস্তলিখিত পারসিক গ্রন্থ-সমূহের জন্য অত্যন্ত অর্থব্যয় হইতেছে, তথাপি পুস্তকের পূর্ব্বতন মালিকেরা যত ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার তুলনায় অতি অল্পই ব্যয়িত হইয়াছে। ঐ সকল হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন—উহার মূল্য ১০,০০০ পাউণ্ডের সমান—২০০০ পাউণ্ড দিলেও আজ পারিস হইতে কিনিতে পাওয়া যায় না। আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং রাজকীয় হিসাব সমূহ হইতে দেখিয়াছি বিহজাদের (বিখ্যাত পারসিক চিত্রকর) প্রত্যেকখানি ছোট ছোট ছবির শত শত পাউণ্ড মূল্য ছিল এবং তাহার কতকখানি বহুল অঙ্কিত ছবির বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা দশগুণ মূল্যও ছিল। কয়েকদশবর্ষ গত হইল যখন প্রাচীন গ্রন্থাগার পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ছিল সেই সময় বর্ত্তমান লণ্ডন অথবা প্যারিসের মূল্য অপেক্ষাও অনেক বেশী দিতে হইত। পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ, পুরাতন পুস্তকের জন্য ঐরূপ যত্ন প্রায়োচলাভ করিলে এবং রোমব্রানড্‌টস ও ভন্‌ডিকসের গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য আমেরিকদিগের ন্যায় অতিরিক্ত মূল্য দিতেছে। মোঙ্গলীয়, তৈমুরবংশীয় এবং মোগলবংশীয় সম্রাট ও আমীরগণ যে অর্থব্যয় করিতেন তাহা আমরা কদাচিৎ ধারণা করিতে পারি এবং এইরূপ কার্য্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই কারণ হস্তলিখিত কোরআন সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত অর্থ বর্ত্তমান মুদ্রা

1 Tarikhi-jan-jahan by Jan-Jahan Khan, MS. in ASB. We learn that in 1623 A. D. Muhammad Safi, Diwan of the Subah of Gujrat founded *madrasahs at Jubbalpur* in front of the gate of the fort Irk, and beside Sayif khan's *madrasah (Mirati-Ahmadi* by 'Ali Muhammad Khan, vol, i, p. 200).

2 *Tuzuk-i-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 7.

3 *Ibid.*, p. 12.

4 *Tuzuk-i-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, pp. 439, 440.

প্রচার আফিসের (currency) লক্ষ ক্রাউনের সমান হইবে।"১

জাহাঙ্গীর চিত্রবিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ফরাখবেগ তাঁহার সময়ের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর।২ তাৎকালিক অন্যতম প্রধান চিত্রকর আবুল হসন দরবারে আসীন সম্রাটের একখানি চিত্র আঁকিয়া সম্রাটকে উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরনামার মুখপত্রে ঐ চিত্রখানি ব্যবহার করিতেন। হসন কোন লোককে দেখিয়া অথবা তাহার বর্ণনা শুনিয়া চিত্র অঙ্কনেও সুপারগ ছিলেন। মনসুর অন্য আর একজন বড় চিত্রকর তিনি নাদির-উল-অসর উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।৩

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চিত্রবিদ্যা উন্নতির চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কাব্রেটা বলেন "এই সময়ে ভারতীয় চিত্রকরগণকে ইউরোপীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রসমূহের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে দেখা যায়: ঐ গুলি যে মূল চিত্র হইতে পৃথক নয় তাহা নিঃসন্দেহে ধারণা হয়৪।"

সার টমাস্ রো জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান কালে একখানি চিত্র তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সর্ব্ব প্রধান চিত্রকরকে উহা দেখিতে দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন ঠিক অনুরূপ একখানি আঁকিয়া দিতে পারেন। কিছুদিন পর সম্রাট্ মানবীয় রো-কে ছয় খানি ছবি দেখিতে দিলেন উহাদের পাঁচখানি তাঁহার আপন চিত্রকরের হাতের অঙ্কিত। ছবিগুলির মধ্যে ইতর বিশেষ না থাকায় গোধূলির আলোতে একটিকে অন্যটি হইতে তফাৎ করিবার উপায় ছিল না। এক ঘণ্টা নিরীক্ষণ করার পর রো সাহেব তাঁহার উপহৃত ছবি বাহির করিলেন। রাজদূত বলিলেন তিনি এতদূর আশা করিতে পারেন নাই যে ছবিগুলি এত সুন্দর হইবে।৫

জাহাঙ্গীর তাঁহার জাহাঙ্গীরনামাকে প্রাণীদিগের ছবি দ্বারা সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত চিত্রকর নিয়োগ করেন। ঐ সকল ছবি গোয়ার সামুদ্রিক বন্দর হইতে মুকাররব খাঁ তাঁহার নিকট এই উদ্দেশ্যে আনিয়াছিলেন যে, "তাহাদের মৌখিক বর্ণনা অপেক্ষা ছবিদ্বারা বুঝাইলে পাঠকের মনে অধিকতর বিস্ময় আনিতে পারিবে।৬

তুজাক্ ও ইক্‌বাল্ নামা জাহাঙ্গীরের দরবারের নিম্নলিখিত গায়কদিগের নাম করেন—জাহাঙ্গীরদাদ, চতর খাঁ, পরবিজ-দাদ, খুরমদাদ, মখু এবং হুসন।

---

1 Martin's *Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey*. vol. i, p. 58.

2 *Tuzuk-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 159.

3 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 359. "Jahangir was a great lover of birds, and had a painter Mansur who portrayed his favourites (birds) in a way often worthy of Durer."—Martin's *Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey* vol. i, p. 88.

For an account of the painters of Jahangir and their paintings existing in the British Museum and other places, see *ibid.*, pp. 131, 132.

4 Catrou's *History of the Mughal Dynasty*, p. 178.

5 *Purchas His Pilgrims*, vol iv, pp 344 ff.

6 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 331.

জাহাঙ্গীরের দরবারের নিম্নলিখিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নাম করা যাইতে পারে :—মির্জা খৌসবেগ, "অত্যুৎকৃষ্ট রচনায় ও পাটীগণিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।" ১ নকিব খাঁ, তাঁহার ইতিহাস জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন—ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মুতমদ্ খাঁ এবং নিমতুল্লা উভয়েই জাহাঙ্গীরের জীবনী লেখক ছিলেন।২ সামানের হবিবৎ খাঁ আফগান জাতীর ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেন, জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমতুল্লা সেই গুলিকে সাজাইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।৩ আবদুল হক্ দিলাবী,* সেই সময়ের অন্যতম সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি জাহাঙ্গীরের সহানুভূতি লাভ করেন এবং ভারতীয় সেখদিগের জীবনী রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। ৪

জাহাঙ্গীর "তুজাকে" লিখিয়াছেন যে, শুক্রবার সন্ধ্যাকালে তিনি পণ্ডিতব্যক্তি, ফকীর এবং কার্য্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আলাপ করিতেন।৫

ইকবাল-নামা-ই জাহাঙ্গীরি হইতে আমরা সম্রাটের সমসাময়িক কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতদিগের নামের একটি তালিকা পাই।

পণ্ডিত ব্যক্তি

মুল্লা রুজবাহান সিরাজী
শুকরুল্লা সিরাজী
,, তুজ্যটৈ সুস্তরী
মীর আবুল কাসিম গিলানী
আ'মী আ'মরী
মুল্লা বকর কাশ্মীরী
,, তুতরী
,, মকসুদ আলী
কাজী নূরুল্লা
১০। মুল্লা কাজিল কাবুলী
,, আবদুল হাকীম সিয়ালকুটী
মুতালিব গুলস্তানপুরী
,, রহমন তুল্লা গুজরাটী
১৪। হসন ফরাষী গুজরাটী
১৫। হসেন গুজরাটী
১৬। খাজা ঔসমান হিসারী
১৭। মুল্লা মহম্মদ জৌনপুরী।৬

উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কবিদিগের নাম পাওয়া যায়

১। বাবা তালিব ইস্ফাহানী
২। মুল্লা হয়াতী গিলানী
৩। ,, নজীরী নীশাপুরী
৪। ,, মহম্মদ সুফী মাজনদ্রানী
৫। মলিক-উল-শুয়ারা তালিবাই আমুলী
৬। সৈদাই গিলানী
৭। মীর মসুম কাশী
৮। ফসুনী কাশী
৯। মুল্লা হাইদার খসালী ৭ এবং
১০। সৈদা

1 Price's *Jahangir*, p. 26.
2 Elliot v, p. 67.
3 See Dorn's Preface to *Makhzani-Afghani*.
4 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi. p. 336.
5 *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 21.
6 *Iqbal-Numah-i-Jahangiri*, (*Bibl. Indica*), p. 308.
7 *Ibid.*, p. 308.

সাজাহান ও দারাসেকো

সাজাহান বৃহৎ বৃহৎ ইমারতের দ্বারা সাজাহানাবাদকে শোভিত করিয়াছিলেন অথবা প্রিয় এবং আত্মীয়গণের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপে সেগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি। কিন্তু শিক্ষার উন্নতি কিম্বা নিজের এবং প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তাঁহার আগ্রহ ততো ছিল না, তথাপি পিতা অথবা পিতামহের শিক্ষা-কার্য্যকে তিনি লোপ করিয়াছিলেন, এরূপ কিছু বুঝা যায় না। পরন্তু অপরদিকে দেখা যায় 'তাক্সিরুল ইমারাৎ' ১ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি আকবরের পন্থানুসরণ করিয়া চলিতেন।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক্ বার্নিয়ার এই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং হিন্দুস্থানের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি দুঃখের চিত্র (ইতিহাস) রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ লেখা (মন্তব্য) অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় তিনি বলেন—

"খুব বেশী ও গভীর অজ্ঞতা রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। সুতরাং ইহা কিরূপ বিস্ময়নীয় হইতে পারে যে, সে সময়ে অনেক সাধারণ ও উচ্চ বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল? এই রকম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? এবং যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সুপণ্ডিতদিগের নামই বা কোথায় পাওয়া যায়? জনসাধারণের এইরূপ প্রচুর অর্থ কোথায় যাহারা সন্তানদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারে? এবং যদিই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকে তাহা হইলে অর্থশালী কাহাকেও দেখা যাইত না কি? তাহারা যদি উচ্চশিক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন সেই সকল বর্ব্বরোচিত উদ্ধতস্বভাব, উন্নতিশীলতা ও পদগৌরব কোথায়, যারা যুবকগণকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলে? ২"

যদিও সাজাহানের রাজত্বকাল শিক্ষা-ক্ষেত্রের কোন নূতন দ্বারায় খ্যাতি লাভ করে নাই তথাপি বার্নিয়ারের বিবরণ হইতে যাঁটী বিষয় জানিতে পারা যায় না। তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন ধ্বংস-কারী ছিলেন না তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাকেন্দ্র, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের প্রদত্ত যথেষ্ট সুসম্পত্তি দ্বারা চলিতেছিল, এবং তাহার রাজত্বকালেও সেইগুলি আপনাদের গৌরব লইয়া জীবিত ছিল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই সাজাহান শিক্ষার জন্য একটী অতি প্রয়োজনীয় ও সুপরিজ্ঞাত দান করিয়াছিলেন, উহার দ্বারা দিল্লীতে জমিমসজিদের সন্নিকটে একটী রাজকীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ ষ্টিফেন (Carr Stephen) সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায়—

"দিল্লীর জমিমসজিদের উত্তরদিকে রাজকীয় ঔষধালয় এবং দক্ষিণদিকে রাজকীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুইটী অট্টালিকাই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের অনেক পূর্ব্বেই ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এবং উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরই উহা সমভূমিতে পরিণত হয়। এই দুই অট্টালিকাই ১০৬০ হিজীরার (১৬৫০ অব্দে) মস্‌জিদের সঙ্গে নির্ম্মিত হইয়াছিল।" ৩

সৈয়দ আহম্মদ আরও বলেন যে, সাজাহানাবাদের সদর-উল-সুদুর মৌলবী মহম্মদ সফ্‌দিন খাঁ বাহাদুর, তাৎকালিক দিল্লীর

1 *Tafrikul-'Imarat*, by Silchand, MS. in ASB, leaf 41.
2 *Bernier*, p. 210 (Ouldinburgh's edition).
3 C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 255.

সম্রাটের রাজত্বের কিছুকাল পরেই মাত্রাসাকে তাহার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করেন, এবং অট্টালিকার সংস্কার ও নানা বিষয় যোগ করিয়া, তাঁহার নবীন চিন্তাশক্তির বলে উহাকে নবভাবে সঞ্জীবিত করেন। ১

সাজাহান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসোন্মুখ দার-উল-বকা (অনন্তের আবাসস্থান) নামক কলেজটী মেরামত করান। সম্রাট্ কলেজটী মেরামত করাইয়া উহার জন্য কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিকে অধ্যাপক নিয়োগ করেন। কলেজটীকে সমৃদ্ধিশালী করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ দিল্লীর প্রধান বিচারপতি মৌলানা মহম্মদ সঙ্গদ্দিন খাঁ বাহাদুরকে উহার ডিরেক্টর নিয়োগ করেন। এই কলেজের নিকটে জলের দুইটী বড় বড় সরোবর একটী মসজিদ্, একটী হাসপাতাল এবং একটী বড় বাজার ছিল। ২

সাজাহানের স্বহস্তে লিখিত দৈনিক কর্ম্মের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, রাত্রে পাঠের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"রাত্রি প্রায় ৮।০ টার সময় রমণীদিগের প্রাসাদে আসিতেন। ২ ঘণ্টা কখন কখন তিন ঘণ্টা অবধি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। অতঃপর সম্রাট শুইতে যাইতেন এবং নিদ্রাকালে গ্রন্থাদি পাঠ করা হইত। সু-পাঠকগণ সম্রাটের শয়নকক্ষের পাশে এক ঘরে বসিতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ভ্রমণকাহিনী, সাধুমহাত্মাদিগের জীবনী এবং জ্যোতিষী ও পূর্ব্বতন রাজগণের ইতিকথা পাঠ করিতেন—প্রত্যেক গুলিই গভীর উপদেশপূর্ণ। ঐ সকল জীবনীর মধ্যে 'তৈমুরের জীবনী' এবং 'বাবরের আত্মজীবন চরিতই' ৩ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ৪"

সাজাহান সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। ৫ রামদাস ও মহাপাত্তর তাঁহার প্রধান গায়কদ্বয় ছিলেন। ৬

সাজাহান চিত্রশিল্পেরও উৎসাহদাতা ছিলেন। মহম্মদ নাদির সমরকন্দি তাঁহার দরবারের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদিগের অন্যতম ছিলেন। ৭ সাজাহানী চিত্রন-পদ্ধতি অনেকটা জাহাঙ্গীরী চিত্রন-পদ্ধতির অনুরূপ হইলেও উভয় পদ্ধতিই আকবরী চিত্রন-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ৮

মহম্মদ আমিনী—কাজবিনী সম্রাটের আদেশে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাদ্‌শা

1 *Asarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad, 3rd chap., p. 69.

2 Garcin de Tassy's transl. of Sayyid Ahmad, p. 152, corresponding to *Asarul-Sanadid*, 3rd chap., p. 69.

3 It appears from *Shah-Jahan-Namah, by* Muhammad Amin-i-Qazwini (MS. in ASB, leaf 34), that a copy of the *Memoirs* in Babar's handwriting was in Shah Jahan's Library.

4 J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, p. 174.

5 *Mir'atul-'Alam*, MS. in the Boh. Coll., leaf 181 ; also J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, pp. 173, 174.

6 Willard's *Treatise on Hindu Music*, p. 213.

7 See Martin's *Miniature Painting and Painters, etc.*, vol. i, p. 132. For an account of the Paintings executed by the painters of Shah Jahan's Court, see pp 131, 132 *(ibid.)*.

8 *Ibid.*, p. 82.

নামা রচনা করেন। সম্রাট সাজাহানের নাম চিরদিন উহার সঙ্গে জড়িত থাকিবে।১

সাজাহান পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার বৃত্তি দ্বারা উৎসাহিত করিতেন।২ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহার রাজত্ব সময়ের পণ্ডিত ও কবি ছিলেন—

১। সৈয়দ বুখারী গুজরাটী
২। ,, আমালুদ্দিন
৩। সেখ মীর লাহঅরি
৪। খাজা খান্দ মামুদ (আলাউদ্দিন অহরের দৌহিত্র)
৫। সেখ বহলুল কাদিরী
৬। মীরজা জিয়াউদ্দিন
৭। মৌলানা মুহিবালি সৈয়িদি
৮। সেখ নাজীর
৯। মুল্লা সুকুল্লা সিরাজী
১০। মীর আবদুল আসিয়া ইরাকী
১১। মুল্লা মহম্মদ কাসিম বদখ্‌সী প্রভৃতি।৩

রাজপরিবার যুবরাজ দারার মত সুপণ্ডিত লাভ করিয়াছিল। আরবী ও পারশী উভয় ভাষাতেই তাঁহার অধিপত্য ছিল এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের পারশী অনুবাদ দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গৃহশিক্ষকদিগের অন্যতম সুপণ্ডিত খোয়াসানবাসী সেখ হিরবী, মৌলানা আবদুল সালীমের ছাত্র ছিলেন।৪ যুবরাজ দারা তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুর ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গীরূপে দেখা যাইত। হিন্দুর জ্ঞানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। বেদপাঠ শ্রবণে তিনি ভক্তি প্রণোদিত হইয়া বেদের অনুবাদের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বস্থান হইতে সুপণ্ডিত হিন্দুদিগকে আহ্বান করেন। হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ থাকায় তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল, কারণ তিনি হিন্দুর ধর্ম্মোপদেশগুলি সুপ্রচারিত করেন, এবং তাহার হীরক ও কবি প্রভৃতির অঙ্গুরীতে হিন্দী ভাষায় 'প্রভু' শব্দটী খোদিত করাইয়াছিলেন।৫

দারাসেকো নিম্নলিখিত বৃহৎ গ্রন্থগুলির প্রণেতা ছিলেন—

(১) সির্-উল-অসরার (রহস্যের রহস্য) এই গ্রন্থ কখনও কখনও সির্-উল-আকবর বলিয়াও কথিত হয়, গূঢ় রহস্য।[৬] গ্রন্থখানি উপনিষদের পারস্যানুবাদ। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকা হইতে দেখিতে পাই তাঁহার কাশ্মীরে অবস্থিতিকালে তিনি সুফী-প্রধান মুল্লাশার শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি সুফী মতবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বেদ বিশেষতঃ উপনিষদ ব্যতীত আর কোথাও তৃপ্তিদায়ক উপদেশ পান নাই। সুতরাং কাশী

1 *Vide Khafi Khan*, Pt. i, p. 237.

2 For an account regarding this point, see *Bad ah-Namah*, by 'Abdul Hamid Lahauri, vol. i, pp. 106, 318, 364, and vol. ii, pp. 127, 138, 184 and 309; also *Mir'atul-'Alam*. MS. in the Boh. Coll. leaf 190. 'Abdul Hakim Siyalkuti was on one occasion given his weight in silver.

3 *Shah-Jahan-Namah*, MS. in ASB, leaves 574 ff.

4 Elliot viii, p. 159 (from *Jami'-Jahan-Numa* of Muzaffar Husain).

5 Alamgir-Namah. Elliot vii. p. 179.

তখন তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তিনি কাশী হইতে কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা উক্ত গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। এই কার্য্য ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়।১

(২) ভগবদ্গীতার অনুবাদ

(৩) যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থের আরও দুইখানি অনুবাদ আছে, একখানি কোন অজ্ঞাত লোকের প্রণীত এবং অপরখানি মহাত্মা আকবরের রাজত্বকালে কোন হিন্দু পণ্ডিতের দ্বারা অনুদিত হয়।

(৪) মুকালম-ই-বাবা লাল দাস—হিন্দু সন্ন্যাসী জীবন এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী সম্বন্ধে যুবরাজ ও বাবা লাল দাস এই উভয়ের কথোপকাহিনী

(৫) সকিনত-অল অলিয়া—ইস্‌লামের প্রারম্ভ হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত। (এই কার্য্য ১৬৪০ অব্দে সম্পাদিত হয়)।

(৬) সকিনত-উল-অলিয়া——ভারতীয় মহাপুরুষ মিয়ানমীর ও তাঁহার শিষ্যগণের বিবরণী (১৬৪২ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়)।

৭। নাদির-উল-হুকাত,
৮। হসনত-উল- আরিফিন,
৯। রিসালা-ই-হকনামা

সুফী মতবাদসম্বন্ধীয় গ্রন্থত্রয়।

১০। মজমা-উল-বহরেইন—হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ এবং সুফী একেশ্বরবাদ গ্রন্থে ঐগুলির অর্থ সামঞ্জস্য সম্বন্ধে একখানি ভাষ্য।২ দুইটি প্রণালীর বিশদ ব্যাখ্যার জন্য (১৬৫৪ খৃঃ অব্দে) লিখিত হয়।

দারাসেকো আরঙ্গজেবের দুরভিসন্ধি সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন যদি জনসাধারণের শিক্ষাপ্রণালী অন্যরূপ হইত। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল স্লীমেন যুবরাজের সমাধি দেখিয়া আক্ষেপ করেন যে—

"এইখানে একখণ্ড মার্ব্বল পাথরের নীচে হতভাগ্য দারাসেকোর ছিন্নমস্তক সমাহিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার কিঞ্চিৎ দৃঢ়তাবর্জ্জিত ভাবের জন্য তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের নীচে তাঁহার মস্তক চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অমনি ভাবি প্লাবন এবং অনাবৃষ্টি দ্বারা যে আকস্মিক বিপদ আসে তাহা ক্ষুদ্র এবং মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি ও হৃদয়ের অনুভূতি যাহাদের উপর জাতির এবং সাম্রাজ্যের ভাগ্য অনেক সময়ই নির্ভর করে তাহা অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র।" ৩

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

It was rendered into Latin by Anquetil-Duperron, and published by him at Paris in 1801. (See Constable's *Bernier*, p. 323 n.

2 For some of my information regarding Dara-Shikuh, I am indebted to Prof. Hidayet Husain.

3 Sleeman's *Rambles* and Recollections, vol, ii, pp. 270, 271.

স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট

(১)
আত্মবিস্মৃতি

আত্মবিস্মৃতির ন্যায় মহাপাপ আর নাই—ইহা সকল পাপের সেরা—সকল অনর্থের মূল। স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট কেবল মাত্র আত্মবিস্মৃতির দ্বারাই উপভোগ হয়, অন্য কিছুতে নহে। আমার আমিত্ব জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন আমি ষোল আনা আমিই থাকি, আমিত্ব যে পরিমাণে কমিতে থাকে সেই পরিমাণে আমারও ওজন হ্রাস হইতে থাকে। আমার ওজন আমিত্বের উপর নির্ভর করে। আমিত্বই আমাকে লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়া রাখে।

'আমিত্ব' কোথায় যায়? যায় না কোথাও, আমার মধ্যেই বন ঠাসা হইয়া আছে, সঙ্কুচিত হইয়াও থাকে—আকুঞ্চনত্ব ও প্রসারণত্বই আমিত্বের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে কখন আমিত্বকে বঞ্চিত করা যায় না। আমিত্ব যখন প্রসারণত্ব ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া চলে তখন 'আমি' স্ফুটতর হই; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ হই। আবার আমিত্ব যখন আকুঞ্চনত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া কূর্ম্মের ন্যায় স্ব শরীরে লুক্কায়িত হয়, তখন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অন্তরালে সুষুপ্তাবস্থায় স্পন্দনহীন হইয়া পড়ি। তখন আমি থাকি কিন্তু আমিত্ব প্রায় থাকে না। থাকায় না থাকার সমান হইয়া পড়ে।

আমিত্ব দু'মুখো,—হয় প্রসারণত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, না হয় আকুঞ্চনত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমিত্ব যখন আত্মশক্তির উদ্বর্ত্তনে হস্ত প্রসারণ করে, নয় আত্মশক্তির সংহরণ দ্বারা প্রসারিত হস্ত ধীরে ধীরে গুটাইয়া লয়। কর্ম্ম লোপ পায় না শক্তির বিদ্যমানতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

পুষ্প কোরকের বিস্মৃতি বা বিকাশ আমিত্বের সৌরভে পূর্ণ। প্রসারণত্বই পুষ্পের বিকাশক। যেখানে বিকাশ নাই—সেখানে পুষ্পের আমিত্বের একান্ত অভাব। সৌরভত্ব বিকীর্ণ হইতে পায় না। যেখানে সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ নাই—সেখানে পুষ্পের অস্তিত্বও নাই। সেস্থলে ফল কামনা নিরর্থক।

পুষ্পের আকাঙ্ক্ষা ফলোন্মুখী, পুষ্প আপনাকে তুলিতে চায়—ফলের মুখ চাহিয়া। ফল প্রাপ্তিই পুষ্পের আকাঙ্ক্ষা! এস্থলে পুষ্প আত্মহারা হয় কিন্তু আত্মবিস্মৃতি হয় না—তাহার লক্ষ্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা ফলের অভিমুখে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলে—ফল কামনা করিলে—একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় আত্মহারা হইতে হয়। পরিণতির দিকেই সৃষ্টির লক্ষ্য। আত্মবিস্মৃতি উদ্বর্ত্তনের চিহ্ন নহে—স্বোপার্জ্জিত গতিশক্তির দ্বারা জড়ত্ব বাড়াইয়া তুলিতে হয়। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত গতি শক্তির উদ্বর্ত্তন দ্বারা আত্মহারা নামক ভাবাবেশে বিভোর হইতে হয়। সকল চিন্তা লক্ষ্যের দিকে সরল রেখার ন্যায় ছুটিতে থাকে বলিয়াই অগ্র রেখার বিস্ফুটির গতিও বাড়িয়া যায়। সকল দিক হইতে চিন্তাকে গুটাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই ছুটাইতে থাকে বলিয়া চিন্তার অর্জ্জিত শক্তি বড়ই বাড়িয়া যায়—এই অবস্থার বাহ্যিক

ভাবের নাম—সমাধি—সমাধি-ভাব আনাই যোগের উদ্দেশ্য—মন যখন চিন্তা, কল্পনা সকল দিক্ ভুলিয়া লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হয় তখন স্মৃতি থাকে 'আত্মহারা' ভাবাবেশ হয়, কিন্তু আত্মবিস্মৃতি হয় না।

কর্ম-চিন্তা-শক্তি বিন্দুটি যখন আরও আগে আরও আগে দৌড়াইতে থাকে লক্ষ্যকে ধ্রুব করিয়া অনন্ত কাল-সমুদ্রের উপর তুফান তুলিয়া ছুটে, তখন উহার গতি-পথটিকেই আমরা কল্পনা নেত্রে সন্দর্শন করি। উহারই নামান্তর 'কর্মরেখা' বা 'কর্মপথ'—ইঞ্চি, ফুট, গজ বা মাইলের মাপ কাটি দিয়া কর্ম পথটির পরিমাণ করি—পথের দূরত্ব বুঝিবার জন্য কর্মক্ষেত্র রূপ মাইল ষ্টোন বসাইয়া যাই।

কর্ম বিন্দুটিই কর্মী,—কর্মীর কর্ম-লক্ষ্য-অভিমুখে দ্রুত গমন কালে কর্মী ফিরিয়াও দেখেনা ভাবেও না যে কতদূর অগ্রসর হইল।—সে যে আত্মহারা—কর্ম পাগল অর্জিত গতি শক্তিতে আপনার জড়ত্ব বাড়াইয়া আমিত্বের বিকাশ ও উদ্বর্তন করিয়া ছুটিয়াছে—তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কর্ম লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে—সে বিশ্বসৌন্দর্য্যে অন্ধ হইয়া কেবল লক্ষ্য পদার্থ বা বিষয়টিই দেখিতে পায়। পথের দূরত্ব, পথের ক্লেশ কিছুই মনে পড়েনা বলিয়া তাহার আত্মহারা ভাব আসে—সে বিশ্বের সকল সুখ সৌন্দর্য্য লক্ষ্য মধ্যেই দর্শন করে সে আত্মহারা কিন্তু লক্ষ্যহারা নহে—তাহার এই ভাবকে 'আত্ম-বিস্মৃতি' বলা যায় না। তাহার আত্মস্মৃতি লক্ষ্যগত ব্যক্তিগত নহে—সে আত্মহারা লক্ষ্যস্মৃতি বিশিষ্ট যোগী। লক্ষ্য স্থানে গমনই তাহার উপাসনা।

সেই আত্মহারা লক্ষ্যস্মৃতি বিশিষ্ট যোগীর কর্ম সমূহ—অপর কর্মীর কর্মপথ, তাঁহার নহে। তিনি পথ করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু পথ হইতেছে কি না তাহা তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। কর্মরেখা বা কর্মপথের সন্ধান অন্যান্য কর্মেচ্ছু কর্মিগণ পড়িয়া লয়েন। মাইলষ্টোন পুতিয়া কর্মের পথরেখার দূরত্ব মাপিতে থাকেন। কিন্তু যে লক্ষ্যের দিকে আত্মহারা হইয়া ছুটে সে গত পথের সন্ধান আনেনা—তাহার গতি শক্তি কেবল অগ্রে আরও অগ্রে ছুটিয়া চলে।—এই যে ভাব ইহাকেই 'আমিত্বের প্রসারণত্ব' বলা যায়।

আমিত্বের প্রসারণত্বই লক্ষ্যের নিকটে যায়—যখন লক্ষ্যটি ধরি ধরি হয় আর একটু এই হাতে ঠেকিতেছে—তখন কর্মীর ভিতরে যে মহান্ ভাবের উদয় হয় তদ্দ্বারাই বুঝা যায় উহাতে আদৌ আত্মবিস্মৃতি নাই—আত্ম-স্মৃতিতে পরিপূর্ণ।

ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, ভগবান শ্রীচৈতন্যের এই আত্মহারা ভাব ছিল—আত্ম-বিস্মৃতি ছিলনা—আত্মবিস্মৃতির প্রকৃত মূর্ত্তিই ঐ প্রকার। অনন্ত কর্ম অনন্তলক্ষ্যদ্বারা আত্ম-স্মৃতি-শক্তি গতিশীল ও উদ্বর্তিত হইয়া উঠে। এই নিয়মে যে কর্মী লক্ষ্যস্থির রাখিয়া অনন্ত মনে তদভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হন তিনিই 'আদর্শ কর্মী'।

আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে যাঁহার কর্মের প্রতিলক্ষ তিনিই স্মৃতিশীল, তাঁহার স্মৃতি স্বার্থ বিজড়িত বা স্বার্থশূন্য হইতে পারে কিন্তু তিনি কখনই আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট নহেন। জগতে যত কিছু মঙ্গল অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা এই প্রকারের অনন্ত কর্মীর দ্বারাই হইয়াছে।

দ্রোণ বলিলেন—"কি দেখিতেছে"?
"কেবল পক্ষীর চক্ষু দেখিতেছি"।
"এইবার তীর ছোড়"
সিদ্ধি অনিবার্য্য!

যাহা বলা হইল উহার নাম—আমিত্বের হস্ত প্রসারণ। আমিত্বের হস্তসঙ্কোচন যাহা ঘটে তাহাই আত্মবিস্মৃতির বিষ-ফল। সুধা ও বিষ—অমৃতের কায়া ও ছায়ামাত্র। আমিত্বের প্রসারণত্ব ঠিক কায়া—কায়া না থাকিলে তাহার ছায়া থাকেনা—আলোর ছায়া নাই। ছায়ারও ছায়া নাই! আমিত্বের সঙ্কোচনত্ব উহার ছায়া। আছে কিন্তু নাই—আলোকের অভাবই ছায়া, আবার ছায়ার অভাবই আলোক। দ্বন্দ্ব বড় ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। দুইটিই চাই নতুবা একের অস্তিত্বের প্রমাণ অসম্ভব হইয়া উঠে—তুলনা দ্বারাই অস্তিত্ব বোধ হয়।

বাঘের আত্মবিস্মৃতির কথা কিছুই না। প্রকৃত আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট যাহারা তাহাদেরই প্রকৃত নাম পাগল বা উন্মাদ। চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্মাদের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে তাহার বর্ণনার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। নূতন লক্ষণগুলি স্ফুটতর ভাবে প্রদর্শনের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মজগতে পাগলের সংখ্যাও অনেক এবং রকমও অনেক—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লইয়াই মানুষ। মানুষ হইতে যদি মনুষ্যত্ব বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পড়িয়া থাকে অমানুষত্ব। তখন আর মানুষ বলা যায় না। মানববৎ হস্ত পদাদি বিশিষ্ট "অনর"। পশুর ভাব বর্জ্জিত হইয়া নর, পশুশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াই ত মানব! যদি উহাই বাদ পড়ে তাহাহইলে বানরাকৃতি বিহীন "নৃ-বানর" ঠিকের তলায় দেখা যায়।

আমি কে? আমি নর, না বানর। আমার কর্ম্ম নৃধর্ম্মমুখী, কি বানর বা পশুধর্ম্ম মুখী? এচিন্তা যাহার নাই সেই আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট। নর হইয়া যদি সর্পের ন্যায় খল ও ক্রূর স্বভাব বিশিষ্ট হয়, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রক হয়—কাকের ন্যায় চোর হয় তাহা-হইলে তাহার আত্মবিস্মৃতি যে স্ফুটতর তাহা বুঝা যায়।

মানবের মূল্য কত—তাহা পশুভাবগুলির বারিবর্জ্জন দ্বারাই নিরূপিত হয়। যে মানবের পশুত্ব যত কম তাহার মূল্য তত বেশী। মানব—পশুত্ব—প্রকৃত মানব।

পশুত্বের শক্তি যত, তাহা যে মানবে যত কম—সেই মানবের মনুষ্যত্ব তত বেশী।

পশুত্বের শক্তি যদি ১০ হয়। আর মানবে ঐ শক্তিগুলি যত ন্যূন হইবে মানবের মনুষ্যত্ব ততই শক্তিতে বাড়িবে।

মানব—পশুশক্তি৩,—মনুষ্যত্ব, ৩ হইবে। আদর্শ মানবে পশুত্ব শক্তি নাই হইয়া যায়। মনুষ্যত্ব তিন হইলে আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ সাত হইবে। অর্থাৎ সেই তিন পশুত্ব ভাব-মুক্ত মানবের আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ সাত।

এই নিয়মে মানবের মনুষ্যত্বের ওজনের ন্যূনাধিকতার পরিমাণ করা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের ওজন যত বাড়িবে ততই মানবের আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ হাল্কা হইয়া যাইবে। এখন এক এক করিয়া মনুষ্যত্বের ওজন নির্ণয় এবং আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ নির্ণয় করিলে প্রকৃত মানব কতগুলি তাহাই অবগত হওয়া যাইবে।

আত্মবিস্মৃতির পরিমাণানুসারে সভ্যতার তারতম্য নির্ণয়

যে মানবজাতির আত্মবিস্মৃতি যত কম; সেই মানবজাতি তত সভ্য, নচেৎ নহে। আত্মবিস্মৃতির নামই "বর্ব্বরতা"। বর্ব্বরতাই স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে।

উন্মাদ ও বর্ব্বর একই বৃক্ষের দুইটি ফল। উন্মত্ততা এবং বর্ব্বরতা কেবল আত্মবিস্মৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করে।

সভ্যতার আর্য্যা বা ব্যাখ্যা যাহাই হউক না তাহার বিষয় লইয়া গোলযোগ বা তর্ক বিতর্কের সমাবেশের প্রয়োজন দেখিনা।

সভ্যতার্থে এই বুঝি—মানবে পশুভাব সংখ্যার ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ কত? আত্ম-বিস্মৃতির ওজন বেশী না আত্মস্মৃতির ওজন বেশী। আত্মস্মৃতির ওজন যে সমাজে যত বেশী—সেই সমাজ তত সভ্য। উন্মত্ততা ও বর্ব্বরতা আত্মবিস্মৃতির ওজন বাড়ায়। আত্মস্মৃতি—উন্মত্ততা ও বর্ব্বরতা দূর বনে তাড়াইয়া দেয়।

আত্মবিস্মৃতির ওজন যেখানে যত বেশী সেইখানেই 'অসভ্য' নামক জীবনিবাস।

এখন বুঝিতেছি—(১) অসভ্যতা অর্থে আত্মবিস্মৃতিত্ব।

(২) সভ্যতা অর্থে আত্মস্মৃতিত্ব।

সভ্যতা ও অসভ্যতার নিক্তির কাঁটা ঠিক থাকেনা

একটি 'পারার' একদিকে মানবসমাজ অপর দিকে সামাজিক সভ্যতা যদি চাপাইয়া রাখা যায় তাহাহইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে কাঁটা কাঁপিতেছে। একদিকে সভ্যতা এক দিকে অসভ্যতা রাখিলেও দেখা যাইবে, নিক্তি দুলিতেছে—স্থির হইবেই না, হইতে পারেই না। সভ্যতা এবং বর্ব্বরতা চিরস্থির নহে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনির সহিত নিক্তির কাঁটার উঠা নামা হই-তেছে। মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে থাকে না।

'দশ' এই সংখ্যাটি পরিমাণার্থে গ্রহণ করা হউক। তাহাহইলে দেখা যাইবে নিক্তির কাঁটা কেন ঠিক থাকে না।

বর্জ্জিত পশুভাবই আত্মস্মৃতি)

১ নং—সমাজের বর্জ্জিত পশুভাব	৫,	সুতরাং মনুষ্যত্ব ৫,	আত্মবিস্মৃতি ৫।
২ নং—	৪,	„ ৪,	৬।
৩ নং—	৩,	৩,	৭।
৪ নং—	২,	২,	৮।
৫ নং— „ „	১,	১,	৯।
৬ নং—পশুত্ব পূর্ণ			

আত্মস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা দ্বারাই 'সভ্যতার' একটি পরিমাণ পাওয়া যাইবে। বিশ্বমানব এখন এই তালিকার উপরে উঠিতে পারিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায় না। পশুত্ব এখন মানবত্বে প্রভুত্ব করিতেছে—মানব পশুত্ব ভাব হইতে মুক্তির চেষ্টা করে নির্ম্মল দেবত্বের আশা পোষণ করে কিন্তু এ পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। পশুত্বই মানব নামক দ্বিপদ পশুকে মানবত্বে পূর্ণ অধিকারী হইতে দিতেছে না।

মানব উন্নত দ্বিপদ পশু—এই জাতীয়ত্ব ভাব হইতে মানব মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না। "Natural instincts are lost with domestication" কিন্তু মানবই মানবকে domesticate করিতেছে, সুতরাং domes-ticator এর যে প্রচ্ছন্ন পশুত্ব তাহাই সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মানব পশুত্বে নির্ম্মুক্ত নহে।

আত্মস্মৃতি বা বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন সমান রাখা সহজ নহে—এই যেখানে দেখা গেল বর্জ্জিত পশুভাবের পরিমাণ সেখানে পাঁচে। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে আবর্ত্তিত—নিয়তির আত্ম-বিস্মৃতির আধিক্য বিশিষ্ট সমাজের সংঘর্ষে—হইয়া স্বীয় ওজন ঠিক রাখিতে পারিতেছে না—Temper ঠিক থাকিতেছে না।

বর্জ্জিত পশুভাবময় আত্মস্মৃতি নামিয়া পড়িল, আত্মবিস্মৃতি বাড়িয়া গেল—এই রকমের নামা উঠা (Fluctuation) নিয়ত ঘটিতেছে, সুতরাং মানবত্ব ঠিক থাকিতেছে না।

ধর্ম্মময়, স্বার্থময় সভ্যতাময়, অসভ্যতা-ময় নামে পাশব প্রকৃতির পরিচয় দিয়া মানবত্বে হাল্কা হইয়া পড়িতেছে—মানবত্বে হাল্কা হইলেই তাহার সভ্যতার কাঁটা বর্ব্বরতার দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। সভ্যতার দিক হইতে কত ডিগ্রী অসভ্যতা বা বর্ব্বরতার দিকে গেল তাহা ধরা পড়িতেছে। লাভ লোকসানের পরিমাণ এই প্রকারে নির্ণয় করা যায়।

আবার সামলাইয়া উঠিলে কাঁটাও সভ্যতার দিকে ডিগ্রীতে ডিগ্রীতে উঠে বা সরে। সুতরাং এই হিসাবে সভ্যতা যেমন বর্ব্বরতার দিকে হেলিয়া পড়ে, বর্ব্বরতাও তেমনি এই নিয়মে সভ্যতার দিকে ঝুঁকিয়া যায়। কিন্তু চিরস্থির থাকেনা। আত্মস্মৃতি আত্ম-বিস্মৃতির গায়ে পড়ে আবার আত্মবিস্মৃতি আত্মস্মৃতির গায়ে পড়ে। এই উপায়ে সাড়া-দেয় ও সাড়া লয়।

সভ্যতা ও বর্ব্বরতার ওজন ঠিক থাকিত যদি 'সভ্যতা' বা 'বর্ব্বরতা' জাতিগত 'উপাধি' হইত। ইহা ত আর জাতিগত উপাধি বা পদবী নয়! ইহা বংশগত বা জাতিগত কিম্বা সমাজগত অথবা ধর্ম্মসম্প্রদায়গত 'খেতাব'ও নয়। সভ্যতা বা মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বা সমাজগত আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে কাহার মৌরসী পাট্টা বা দখলিকার স্বত্ব জন্মায় না। আত্মবলের উপর ভাবস্ফূর্ত্তির দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়।

বিদ্যা অর্জ্জন দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি লাভ হয়—কিন্তু দেখা যাইতেছে ভট্টাচার্য্যের মূর্খ পুত্রেরও নামান্তে 'ভট্টাচার্য্য' সংযুক্ত হয়। ইহা যেমন বিদ্যাসূচক ভট্টাচার্য্যত্ব বর্ত্তমান যুগে 'সভ্যতা'ও তদ্রূপ জাতিবাচক শব্দের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে সংযুক্ত হইয়া—বর্ব্বর জাতিকেও লোকলোচনে ধূলা দিয়া 'সভ্য' এই আখ্যায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

হাতে করিয়া স্বীয় ঘড়ির কাঁটাটি ঘুরাইয়া আটটার সময় দশটা বা বারটার সময় দশটা বাজাইয়া রাখিলে কি ঠিক দশটা বেলা বুঝাইবে! তাহা কখনই বুঝাইবে না।

অহঙ্কার ও বীর্য্যের দ্বারা "সভ্যতা" 'সভ্য' এই আখ্যা বা উপাধি দুর্ব্বলের মুখে বসান যাইতে পারে—কিন্তু 'বর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে।' পশুত্ব বর্জ্জনের নামই সভ্যতা। যেখানে পশুত্বভাবের ষোলআনা অধিকার তথায় বর্ব্বরতারই যে রাজত্ব ইহা স্থির নিশ্চয়। বুঝিতে হইবে তাহাদের মনুষ্যত্ব কমিয়াছে—আত্মস্মৃতি আত্মবিস্মৃতির কোলে মাথা নোয়াইয়া শয়ন করিতেছে। তাহাদের বর্জ্জিত পশুভাব পুনঃ অর্জ্জিত হইয়াছে—তাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ হু হু শব্দে বাড়িতেছে।

যে সমাজের বর্জ্জিত পশুভাব পাঁচ ছিল—সেই সমাজের বর্জ্জিত পশুভাব দুই হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যত্বও দুই হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ আট

হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ১নং সভ্যতা ৩নং সভ্যতায় নামিয়া পড়িয়াছে।

যাহারা ৩নং সভ্য ছিল এখন উন্নত ১নং সভ্যগণ তাহাদেরই সমান হইয়া গিয়াছে—তাহাহইলে বলিতে হইবে এক নম্বর সভ্যগণ স্বস্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে 'সুসভ্য' আখ্যা আর বর্ত্তমানে তাহাদের নাই, তাহারা 'অর্দ্ধসভ্য' দাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তত্রাচ যদি তাহারা বলে আমরা 'সুসভ্য জাতি' তাহা তাহাদের গর্ব্বের ও আহাম্মকীর পরিচায়ক—পশুত্বের শক্তি তাহাদের মধ্যে প্রবল বলিয়া, তাহারা পশুত্বের পরিচায়ক মিথ্যা গর্ব্বই করিতেছে।

আত্মস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির 'মিটারে' তাহাদের সে জুয়াচুরী ও কৃত্রিমতা ধরা পড়িতেছে। বিজ্ঞান সত্যাবিষ্কার করে। তাহাদের গর্ব্ব এবং অভিমান পশুভাবই ব্যক্ত করে।

বর্দ্ধিত পশুভাব, আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তির পরিচায়ক 'বাহ্যিক' নহে। মনুষ্যত্ব যদি বেশভূষা হইত তাহা হইলে একটা গাধাকে ঐ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া মনুষ্যত্ব উন্নীত করিয়া দেওয়া চলিত। আত্মস্মৃতি মানসিক সম্পত্তি শারীরিক সম্পত্তি নহে।

আত্মস্মৃতি মানসিক রাষ্ট্রের পরম শক্তি

বাহ্যিক কোন কিছু দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সভ্যের মত, কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মত সভ্যতার ভ্রমোৎপাদন করা যায় কিন্তু তাহা পুত্তলিকার নৃপসাজে সজ্জিতের ন্যায়, নাট্যশালার অভিনেতৃগণের ন্যায় অলীক ও কৃত্রিম।

আত্মস্মৃতি মানসিক (mental), বাহ্যিক বা শারীরিক (Physical) নহে। ভারতের প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা বাহ্যিক বা শারীরিক ভাবে বিকাশ পায় নাই মানসিক ভাবেই দেখা দিয়াছিল। কেবল ভারত কেন, যেখানেই সভ্যতা মানসিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রীভূত হইয়াছিল সেই স্থানই প্রকৃত সভ্যপদে উন্নীত হইয়াছিল।

অর্জ্জুন, ভীম, অশোক প্রভৃতির বীরত্ব মানসিক ভাবের দিক্ দিয়াই স্ফুরিত হইয়াছিল। আর রঙ্গালয়ের অভিনেতাগণ যখন অর্জ্জুন, ভীম নেপোলিয়ানবেশে সজ্জিত হইয়া ঐ ঐ ব্যক্তিগতভাবে অভিনয় করে তাহা 'একদম্' বাহ্যিক—ইহাতে মানসিকত্ব কিছুই নাই।

আত্মস্মৃতি বা সভ্যতা হারাইয়া আত্মবিস্মৃতির দাসত্বে যাহারা বর্ব্বর হইতেছে তাহাদের আত্মস্মৃতিমূলক মানসিক সভ্যতার ভান একদম্ 'বাহ্যিক' পশুত্বের বিকাশক ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা কাকের শোভাবর্দ্ধনের মত।

এখন বুঝা গেল 'সভ্যতা' ব্যক্তিগত বা জাতিগত একচেটিয়া উপাধী বা পদবী নহে। ইহার বিকাশ মানসিক ক্ষেত্রমূলক বাহ্যিক বা শারীরিক নহে। আত্মবিস্মৃতির দ্বারা এই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। সভ্য এই নিয়মে বর্ব্বর হয়।

বর্ব্বরতার কাঁটাও ঠিক থাকে না

আত্মবিস্মৃত জাতি রঙ্গালয়ের অভিনেতাগণের পোষাকী ভাবে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। আধ্যাত্মিক বনাম মানসিক ভাবশুদ্ধি দ্বারা আত্মবিস্মৃতির ওজন কমাইয়া আত্মস্মৃতি বাড়ান যায়। বুদ্ধদেব ইহা বুঝিয়াছিলেন—সেই জন্য তাঁহার বহির্দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছিল—ভাবশুদ্ধির দ্বারাই আত্মস্মৃতি বনাম সভ্যতা অর্জ্জিত হইতে পারে ইহাই বৌদ্ধ সভ্যতার মূলমন্ত্র।

আধ্যাত্মিক ভাবে পশুভাব বর্জ্জিত হইলেই আত্মস্মৃতির ওজন বাড়ে, সভ্য হওয়া যায় অনুকরণ দ্বারা নহে অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। বর্জ্জিত পশুভাবের যতই ওজন বাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বই বর্দ্ধিত হয় আত্মবিস্মৃতির ওজনও কমে।

ভারত ও জাপানের বর্জ্জিত পশুভাব দ্বারা মনুষ্যত্বের বা সভ্যতার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিলে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। জাপান বর্জ্জিত পশুভাবের উর্দ্ধনে দ্বারাই মনুষ্যত্বে উন্নীত হইতেছে—তাহারা মানসিক উন্নতি দ্বারা পশুত্ব বিমোচন করিতে যত্নবান হইতেছে। বাহ্যিক বা পোষাকী ভাবে নহে। সভ্যতার প্রতিষ্ঠান বাহ্যিক ভাবে হয় না—সভ্যতার গৌণ লক্ষণ পোষাকী ভাব মূলক বটে কিন্তু মুখ্য লক্ষণ মানসিক শক্তির উর্দ্ধনে এবং পশুত্বের পরিহার।

সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় জাপানের বর্জ্জিত পশুত্ব বিকাশের ধারা গুলিরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে জাপান মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছেন বর্জ্জিত পশুত্বের মানসিক ওজন বাড়াইয়া—বাহ্যিক পোষাকী ভাবে নহে।

সেই জন্য তিনি ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে দেখাইতেছেন—জাপান আজিও বাহ্যিক বেশভূষায়, চাল চলনে, হাব ভাবে, আহার বিহারে ষোল আনা বাঙ্গালীই হইয়া রহিয়াছেন। কেবল মানসিক ক্ষেত্রে বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতেছেন।

বাঙ্গালী এখন উল্টা পথ বা উল্টা গতি রেখায় ছুটিয়া অগ্রে না যাইয়া ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে মূলোৎপত্তির অভিমুখে ছুটিয়া আত্মবিস্মৃতির বোঝা বাড়াইয়া ভারি করিতেছেন। বাঙ্গালী বর্জ্জিত পশুত্ব মানসিক দিক দিয়া না বাড়াইয়া বাহ্যিক বা পোষাকী ভাবের দিক দিয়া বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতে চলিয়াছে—ইহাতে হইতেছে কি? না—আত্মবিস্মৃতির বোঝা ক্রমশঃই ভারী হইতেছে—মনুষ্যত্ব কমিতেছে—পশুত্ব বাড়িতেছে।

বাঙ্গালী বাহ্যিক ভাবটাই বর্জ্জিত পশুত্বের বৃদ্ধির উপায় ঠিক করিয়া ক্রমশঃ অর্জ্জিত পশুত্বের শক্তি বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। সভ্যতার ওজন না বাড়িয়া কমিতেছে। জাপান মানসিক শক্তির উর্দ্ধন (বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইয়া) করিয়া লইতেছেন। তাহারা চিত্তের ভাবশুদ্ধির দ্বারা মানসিক ভাবে উর্দ্ধনের গতিরেখায় ধাবিত।

বাঙ্গালী চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মানসিক শক্তির উর্দ্ধন না করিয়া বাহ্যিক বেশভূষার অনুকরণপ্রিয়তার দ্বারাই বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতে চাহেন, ইহার ফলে আত্মবিস্মৃতির ওজনই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আত্মবিস্মৃতিই উগ্রতা বা বর্ব্বরতা—সভ্যতা নহে। কৃত্রিম সভ্যতা রঙ্গালয়ের সভ্যতার অভিনয় মাত্র।

এই প্রকার তুলনা দ্বারাই দেখিতে পাইব বাঙ্গালী 'অর্জ্জিত অন্নকষ্ট' উপভোগ করিতেছেন—জাপান নব নব উপায়ে অন্নকষ্ট বর্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃতি বা বক্তৃতা ও বর্ব্বরতামূলে স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত করিতেছেন।

বাঙ্গালী আমিত্বের আকুঞ্চন দ্বারা উন্নত হইতে চাহেন। জাপান আমিত্বের প্রসারণ দ্বারা উন্নতিত হইতে চাহেন—ইহাই বা প্রভেদ, নচেৎ প্রভেদ নাই। বাঙ্গালী যে দিন আমিত্বের প্রসারণের গতি পথ ধরিবে সেই দিন সভ্য ও চিন্তাবীর হইবে পাগলামি ও বর্ব্বরতা ঘুচিয়া সভ্য হইবে।

বাঙ্গালীর বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের কারণ বিশ্লেষণ

আত্মস্মৃতি বনাম জাগরণ

সভ্যতার মাপকাটিতে যে কয়টি মানচিত্র আছে তাহা 'আত্মস্মৃতি,' আত্মবিস্মৃতি, বর্জ্জিত পশুভাব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। সভ্যতার মধ্যে মাপকাটি ছাড়িয়া দিলে অস্থির দণ্ডটির কাঁটা যে ভাগে গিয়া দাঁড়ায়—সভ্যতার ওজন তখন সেই চিহ্নের দ্বারা সূচীত হয়।

ভাষাও কাহার খাতির রাখে না—যাহা সত্য তাহাই ব্যক্ত করে। পার্থিব সভ্যতার বেষ্টনীবদ্ধ জাতি বা সমাজ-স্রোতের মধ্যে একে একে মানদণ্ডটি ডুবাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব—বর্ত্তমান সভ্যসমাজ যতদূর সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

'বর্জ্জিত পশুভাব' যত বেশী বলিয়া মনে হইতেছিল বাস্তবিক তাহা নহে—পশুত্বের দিকেই সূচী লম্বিত হইতেছে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যেমন দেখায় তেমন নয়। পোষাকী ভাবেরই আধিক্য সমধিক।

সভ্য মানব, যে জাতি বা সমাজকে অসভ্য বর্ব্বর বা অর্দ্ধ সভ্য বলেন ঠিক তাহারা তত নহে। ভাষাও দ্বারা উহাদের ওজন বুঝিলে দেখা যায়, তাহাদের বর্জ্জিত পশুভাব নেহাত হাল্কা নহে!—তাহাদের মনুষ্যত্বের ওজন মন্দ নয়। তাহারা পোষাকী সভ্যতার ময়ূরপুচ্ছে আত্মদেহ আবৃত করে নাই। এই কারণে বাহ্যিক দৃষ্টে তাহারা অসভ্যের মতই দেখায়।

ইহাদের আত্মস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে, আত্মবিস্মৃতির ওজন হ্রাস পাইতেছে। পশুভাব প্রকৃতপ্রস্তাবে কমিতেছে। বর্ত্তমান কৃত্রিমতার যৌবনে ইহারা কৃত্রিম সভ্যতার পাল্লা ভারি করিতেছে না। শারীরিক সভ্যতা বাহ্য সভ্যতা অপেক্ষা মানসিক সভ্যতার আদর যাঁহারা করেন, তাঁহারাই কৃত্রিমতা-পূর্ণ যৌবন-যুগ-সভ্য মানবের নিকট অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

সভ্যকে যদি কেহ অসভ্য বলে, তাহাতে সত্যের ওজন কমে না, মানেরও লাঘব হয় না। কিন্তু 'সভ্য'* যদি অসত্যের মোহে বিমোহিত হইয়া তাহার মত পোষাকী ভাবে সজ্জিত হয়, তবেই সত্যের ওজন কমে, নচেৎ নহে।

বর্ব্বরতার 'পোষাকী কায়দা' যদি বাহ্যিক ভাবে ধরিয়া রাখা যায়, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু বর্ব্বরতার ছাপ যদি মানবপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, তবেই মনুষ্যত্বের উপর বর্ব্বরতার বনাম উন্মাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ হয়।

আসুরিক সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগ—যাহা সভ্যতার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আসুরিক সভ্যতা। ইহাতে বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন বড়ই কম, সুতরাং মনুষ্যত্ব ও আত্মস্মৃতিও কম—পাল্লা ভারি হইয়াছে আত্মবিস্মৃতিতে। কাজে কাজেই বলিতে হয়—উন্মাদ ভাব ও পশুভাব বৃদ্ধি হইয়া 'সুসভ্য-বর্ব্বরতা' আখ্যা দিয়াছে—ঠিক নাম কপট সভ্যতা।

'সুসভ্য বর্ব্বরতা' বনাম কপট সভ্যতা বলিলে বুঝা যায়—জাগিয়া ঘুমান। 'জাগিয়া ঘুমান' কথাটা 'আমার মা বন্ধ্যা' গোছের মত, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। প্রকৃত বর্ব্বরতা

*সভ্য—সভ্যভাবযুক্ত মানব।

ভাল, কিন্তু 'সুসভ্য বর্ব্বরতা' অতীব ভীষণ কপটতা—ঠিক বিষকুম্ভপয়ঃমুখ।

এই 'সুসভ্য বর্ব্বরতা' মধ্যে কেবল পশুত্ব কেবল উন্মত্ত ভাব—উহাতে প্রাকৃত অপেক্ষা অপ্রাকৃতের পরিমাণ বেশী। এমন কি চৌদ্দআনাই কপটতা।

পাগলের অনুকরণ করিলে, পাগল না হইলেও লোকে পাগল বলে। সভ্যতার অভিনয় করিতেছি বলিলেও বর্ব্বরতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে মসি লিপ্তের ন্যায় বৈচিত্র্য সমাবেশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সভ্যতা বা বর্ব্বরতা জাতিগত বা বংশগত পদবী নহে যে জাতি বা সমাজ নামান্তে উহা মৌরসি পাট্টা লইয়া বসিয়া থাকিবে। শতবৎসর ভোগ করিলেও সভ্যতায় দখলিকার স্বত্ব জন্মে না। সভ্যতার কতকগুলা বাহ্যিক রীতি নীতি কাঁচারঙ্গের মত 'ছোব্' ধরাইয়া রাখে মাত্র সে সবই পোষাকী—একদম্ বাহ্যিক—মানসিক নহে—বোলে টেকে না—পোড় সয় না!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—আত্মস্মৃতি মানসিক ক্ষেত্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সাড়া দেয় সাড়া নেয়; মানসিক ভাবশুদ্ধির দ্বারাই পশুত্বের বিমোচন হয়—বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন বাড়িয়া উঠে। যেখানে মানসিক বল অপেক্ষা শারীরিক বলই আদৃত, তথায় অনুরণন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত—দেবত্ব অন্তর্গত।

হিন্দু নামক জাতি যখন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ রচনা করিতেছিলেন,—যোগ বিজ্ঞানের উন্নতি চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, জ্যোতিষ, ভেষজ, গণিত, শিল্প, কৃষি, নীতিশাস্ত্রের রচনা দ্বারা মানসিক বলের পরিচয় দিতেছিলেন—তখনকার সেই 'সভ্যতা' বর্ত্তমানে নাই। ইতিহাস ইহাই বলেন। নূতন নূতন কল্পনা, আবিষ্কার ক্ষমতা দ্বারা আত্মস্মৃতি উদ্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন তাহাই হইত।

তাহার পর স্বাধীন কল্পনা ও আবিষ্কার শক্তি যেমন স্থির বা মন্থর হইয়া গেল, অমনি বর্জ্জিত পশুভাবের উদ্বর্দ্ধন না হইয়া আত্মবিস্মৃতি দেখা দিল। পশুত্বের দিকে কাঁটা দুলিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল।

'সভ্যতা' যদি জাতীয় উপাধি হইত, তাহা হইলে হিন্দুর গায়ে উহা মৌরসী পাট্টা করিয়া বসিয়া থাকিত।

আর একটি বৈদিক মন্ত্র রচিত হইল না, জ্যোতিষ, গণিত, যোগ, বৈদ্যক শাস্ত্রের আর একটি শ্লোকও রচিত হইল না! চিন্তাশক্তি যে আছে তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেল। পারদ শোধনের একটি নূতন প্রথার আবিষ্কার হিন্দু করিতে পারিল না। মকরধ্বজের মত একটি ঔষধ আর বৈদ্যক শাস্ত্রপণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন না। চরক শুশ্রুতের মত আর একখানি বিজ্ঞান আর হিন্দুর চিন্তা ও ভাব রাজ্যে সাড়া দিয়া আবিষ্কৃত হইল না। এই রকমে প্রত্যেক দিক দিয়া হিন্দুর স্বাধীন চিন্তা ও আবিষ্কার থামিয়া গেল। এই সময় হইতে হিন্দু বাপ পিতামহের নামে বিকাইতে আরম্ভ করিলেন।

হিন্দু ঐ যুগে সভ্য ছিল—বর্জ্জিত পশুভাব বাড়িয়াই চলিয়া ছিল, মনুষ্যত্বের ওজন ভারী হইতেছিল। আত্মবিস্মৃতির ওজন হাল্কা হইয়া আত্মস্মৃতির পাল্লা ভারী হইতেছিল। কিন্তু এখনও সেই জাতি সেই প্রাচীন সভ্যতার দাবী করিতে চাহেন—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে কলস ঘৃত শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, মোহ বশতঃ তাহাতেই হস্ত প্রবেশ করিয়া ঘৃত

পানের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। ইহাই ভ্রম বা বাতুলতা। সেই পাকা কলসে ঘৃত পূর্ণ করিতে হইবে! তবে ঘৃত পানের আশায় হস্ত প্রসারণ করিলে ঘি মিলিবে, নচেৎ নহে।

যোগ না জানিয়া যোগী, ধন না থাকিলেও ধনী, বিদ্যা না থাকিলেও পণ্ডিত আখ্যা যেমন নিরর্থক—হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার দাবীও তদ্রূপ। এখন হিন্দুর "মামাদের নিয়ে সাতখানি হাল!"

প্রাচীন শাস্ত্রগুলি চর্ব্বণ করিয়া উদ্গার উত্তোলনই বর্ত্তমান পাণ্ডিত্যের চিহ্ন। প্রাচীন আবিষ্কার, প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন চিন্তায়, প্রাচীন ভাবের, প্রাচীন রীতিনীতি-গুলির বাহ্য ভাবেই গ্রহণ করিয়া—প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দাবী করা হয়। তাই ত লোকে শুনে হাসে, দেখে ঠাট্টা করে—"মা না বিয়োল বিয়োল মাসি কাল খেয়ে মল পাড়া পড়শী।"

সভ্যতা ব্যক্তিগত রাষ্ট্রগত নহে

সভ্যতা চিন্তাজগতের বিষয়গত—অর্জ্জন দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হয়। ইহা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত নহে। সমবায় অর্জ্জিত সভ্যতা দ্বারা সমাজ বা জাতিকে সভ্য করে। যে জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যতা সমষ্টিগত পরিমাণের অর্দ্ধেকের উপর সেই জাতিই সুসভ্য। এই প্রকারে সভ্যতার 'পজেটিভ' ও 'সুপারলেটিভ' ডিগ্রি হয়।

পিতা রায় বাহাদুর হইলে, ছেলে যে রায় বাহাদুর হইবে তাহার আশা নাই। মান্ধাতার আমলের হিন্দু সভ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুর উপর বংশাবলীক্রমে বংশগত উপাধির ন্যায় থাকে না। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" বৎ আপনা আপনি সভ্য হইয়াই আছি—এই চিন্তায় হিন্দু বিভোর আছে।

হিন্দু জাতির অনুলোম বিলোম নামক একটা উঠা নামা আছে। উহাও একরকম সভ্যতার উঠানামা:—উহা যে কালের সভ্য-সভ্যের একটা অলঙ্ক ইঙ্গীত!

প্রাচীন পৈতৃক সম্পত্তি উপভোগ করা, আর স্বয়ং উপার্জ্জন দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির পরিবর্দ্ধন করা—এক কথা নহে। পিতা সাধু পুত্র চোর কিন্তু বংশগত পদবী সমান। পিতা সাধু সুতরাং সভ্য, পুত্র চোর সুতরাং বর্ব্বর। উপাধি ও জাতি এক থাকা সত্ত্বেও সভ্যতা এক রহিল না। স্বাধীন চিন্তা ও আবিষ্কার হীন বর্ত্তমান হিন্দু—পৈতৃক পাণ্ডিত্য সভ্য-তায় এখন সভ্য বলিয়া মস্ত একটা 'কেও কেটা'ই হইয়া আছে মনে করেন—সেটা স্বীয় পরমায়ুর মত জ্ঞান।

বর্জ্জিত পশুভাবের ক্রমিক অধিকার লাভ দ্বারা আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে হয়। সভ্য হইতে হয়। এখন, হিন্দু যখন পশুভাব বর্জ্জন দ্বারা আত্মস্মৃতির উপার্জ্জনে অক্ষম তখন তাহার কৃতিত্ব কোথায়! সম্মুখে যে আদর্শ পট বিলম্বিত তাহা বর্ব্বরতার উপরে সভ্যতার ক্ষীণ প্রলেপ দ্বারা অতিরঞ্জিত। বিগত হইতেই আগত জন্মায়—বর্ত্তমান, বিগত ও আগতের মধ্য বিন্দু মিডিয়ম। এই 'মিডিয়ম' যতই আবিষ্কারোন্মুখ হইবে—সেই জাতির ভবিষ্যৎ সভ্যতা ততই ওজনে বাড়িবে।

প্রাচীন হিন্দুর চিন্তা, কল্পনা আবিষ্কার যখন বর্ত্তমান হিন্দুর মধ্যে নাই—কেবল প্রাচীন সভ্যতার চিন্তা, কল্পনা আবিষ্কৃত বিষয়াজগত শ্লোকগুলির তোতাপক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি ব্যতীত যখন সভ্যতর নাই—তখন এই জাতি যে প্রাচীন সভ্যতার বহু সোপানের নিম্নে

অবশ্যিত তাহার আর সন্দেহই নাই! চিত্ত-শুদ্ধিব্যতীত কেবল পৈতৃক 'নামাবলী' গায়ে জড়াইয়া রাখিলে 'সাধু' নাম হয়ত থাকিতে পারে—লোকে ভ্রম ক্রমে সাধু বলিতে পারে, কিন্তু কদিন বলিবে—প্রকৃত সাধুত্ব কি ঐ কেবল পৈতৃক নামাবলী বেষ্টিত হইয়াই লাভ করা যায়?

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কীর্ত্তি-নাম কেবল নামাবলী বাহ্যিক ভাবে গায়ে জড়াইতে বা বাহ্য ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলেই কি সভ্যতা আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে? তাহা নহে, উহা অর্জ্জন করিতে হয়—পৈতৃক ধন বস্ত্রাদি উপভোগের মত উপভোগ করা যায় না ইহা স্বোপার্জ্জিত।

যদি জোর অবরদস্তী করিয়া বলা যায় পূর্ব্ব পুরুষ সভ্য ছিলেন সুতরাং বর্ত্তমানে আমরা সভ্য। তাহা হইলে বুঝা যায় উহা সভ্যতার ভান—কৃত্রিম সভ্যতা—পোষাকী সভ্যতা—মানসিক নহে। এই প্রকার বাহ্যিক সভ্যতা হিন্দুর আর্য্যসভ্যতা বা দেব সভ্যতা নহে—আসুরিক সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা।

এই প্রকারে ভারতীয় সভ্যতা বা বঙ্গীয় সভ্যতা কৃত্রিমতাপূর্ণ—সভ্যতার ভান মাত্র। সভ্যতার ভান ও বাহ্যিকতাই হিন্দুর অর্জ্জিত অন্নকষ্ট বাড়াইয়া দিতেছে। জাপান সভ্যতার ভান ছাড়িয়া অর্জ্জন ও আবিষ্কারের গতি রেখায় ধাবিত। সেই কারণে জাপানের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইয়া ভারতাতিমুখে প্রধাবিত। তাহারা পুরাতন ত্যাগ করে নাই—তাহার উন্নয়ন করিতেছে মাত্র। দশের মধ্যে টেকা দিয়া চলিতেছে তাহাই তাহারা সভ্য কিন্তু পোষাকী হিসাবে জাপান বর্ব্বর এখনও আছে। ইহাতে "সাচ্চা" সভ্যতা নাই—পোষাকী কখন 'সাচ্চা' হইতে পারে না।

ভারত আবিষ্কারহীন, স্বাধীন-চিন্তাহীন হইয়া অসভ্য হইতেছে—ভারতের মধ্য দিয়া দেশ বিদেশের সভ্যতা জাপান ভাবশুদ্ধি দ্বারা মানসিক ভাবে উপার্জ্জন করিতে তৎপর। ভারত তাহাদের পোষাকী বাহ্যিক ফাঁকা সভ্যতা লইতে ব্যস্ত।

জাপান কখন ভারতের সভ্যতায় বাহ্যিক পোষাক স্বীয় গাত্রে স্থান দিবে না। ভারত কেন? কোন দেশেরই সভ্যতার বাহ্যিক বেশে জাপান সজ্জিত হইবে না। স্বীয় জাতীয় ভাবমূলক স্বভাবের উন্নয়ন দ্বারাই জাপান সভ্য হইবে অন্ন অর্জ্জন করিবে। ভারত domesticate হইতে চায়—ঐ সকলের পোষাকী চাল চলনে।

যেদিন দেখিতে পাইব, জাপান পরের পোষাকে নিজের দেহ সজ্জিত করিতেছে—মানসিক গতিপথ হইতে স্খলিত হইয়াছে—সেইদিন বুঝিব জাপান পুনশ্চ বর্ব্বরতা বনাম পশুত্বে পরিণত হইতেছে। তাহারা আত্ম-স্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মবিস্মৃতির কূপে লাফাইয়া পড়িতেছে।

ভারত আত্মবিস্মৃতির কূপে ঝাঁপ দিয়া পশুত্বে পরিণত হইয়াছে বাহ্যিক পোষাকী ভাবই ইহাদের সভ্যতার প্রকৃত পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং 'স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট' উদ্বর্দ্ধিত হইবেই হইবে।

স্বাধীনচিন্তা এবং আবিষ্কারের গতিপথে প্রধাবিত হইলে 'সভ্য' হওয়া যায়। পিতৃ-পুরুষগণ স্বাধীনচিন্তা নব নব আবিষ্কার দ্বারাই 'সভ্য' এই আখ্যা লাভে সমর্থ হইয়া-ছেন—প্রাচীনের উপর নূতনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা 'সভ্যতার ওজন বাড়ে ও ঠিক থাকে।

স্বানিক অন্নকষ্ট প্রকৃত মানসিক ও আবি-ষ্কৃত সভ্যতার তাড়নে ভিন্ন দেশে নীত হয়,

এক স্থানের অন্নকষ্ট অন্য স্থানে বিতাড়িত করিয়া তৎস্থানে যোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের সৃষ্টি না করিতে পারিলে অন্ন অর্জ্জন করা যায় না। পরকে পোষাকী সভ্যতায় ভুলাইয়া স্বয়ং প্রকৃত চিন্তাবীর হইয়া মানসিক ভাবে সভ্য হইতে হয়।

ইউরোপের সভ্যতা পরিবর্দ্ধনের মূলীভূত কারণ তৎস্থানের অন্নকষ্ট ভারতে প্রেরণ বলতঃই হইয়াছে ইহা বলা যায়। যেখানের পোষাকী সভ্যতা যতই ভারতের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া ভারতকে কৃত্রিম সভ্যতার পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিল ততই তাহারা প্রকৃত সভ্য হইল। ভারতকে যোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ইউরোপ সভ্য এবং অন্নকষ্টের হাত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যেদেশে সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা দ্বারা পশুভাব বর্দ্ধিত হইতেছে তথায় 'অর্জ্জিত অন্নকষ্ট' বিকাশ পাইতেছে। ভারত অন্ন সংস্থানের 'মিডিয়ম' —অন্ন সংস্থানের কর্ম্মভূমি—জাপান ইহা বুঝিয়াছে। সেই জন্যই জাপান স্বীয় অন্নকষ্ট ভারতের মধ্য দিয়া অন্যত্র প্রেরণ দ্বারা, অন্নের সংস্থান করিতেছে। সেই জন্যই জাপানের বিলাতী দ্রব্য ভারতের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। জাপানের দুর্ভিক্ষ ধীর গতিতে ভারতের মধ্যদিয়া দেশ দেশান্তরে প্রবেশ লাভ দ্বারা স্বরাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত।

মফঃস্বলের বাণী

ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় ভাবের অন্তর্দ্ধান

যখন সৌসোরবে ঝড় তুফান উঠিয়া আইসে, আকাশ রাশি রাশি মেঘে ভরিয়া যায়, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বায়ুযাহা সম্মুখে পায়, তাহাই উড়াইয়া লইয়া যাইতে থাকে, তখন গৃহহীন উন্মুক্ত পথের পথিক তয় অকর্ম্মণ্য বা পরের অধ্যুষিত যে কোন গৃহ সম্মুখে পায়, তাহারই অভিমুখে ছুটিয়া যায়; তখন বিদ্যুদ্বিভার মত তাহার পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র শান্তিময় কুটীর খানি মুহূর্ত্তের তরে স্মৃতির অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ। আমরা আমাদের গৃহ ছাড়িয়া জাতীয় সমাজ, জাতীয় রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতিচ্ছবি, জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা হইতে বিরত হইয়া, বিদেশীয় সমাজ ও বিদেশীয় রীতিনীতিকে লক্ষ্য করিয়া আদর্শ করিয়া, জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি বিদেশীয় সভ্যতার তুফানে বিদেশীয় আদর্শের সংঘর্ষ আমাদের আকাশের দুই একখানি মেঘ উড়াইয়া লইলেও তৎসঙ্গে আমাদের "আমার" বলিবার যাহা কিছু ছিল সব উড়াইয়া লইতেছে—পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্র খানিও আর বুঝি রক্ষা পায় না। তাই আজ ঘুরে পরিত্যক্ত স্বদেশীয় সমাজ, স্বদেশীয় রীতি নীতি স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, অতীতের স্মৃতিময় প্রকোষ্ঠে মুহূর্ত্তের তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মনে পড়ে এদেশের ভক্তিশাস্ত্রের চরমোৎ-

কর্ণধারন, মনে পড়ে এদেশের "তৃণাদপিসুনীচ" সাধকের দীনতা, মনে পড়ে এদেশের ধর্ম্মে তন্ময়তা। এ দেশের ধর্ম্মে বিলাস ছিলনা, কর্ম্মে কপটতা ছিলনা—একটা আন্তরিকতার এদেশে ভক্তি, দয়া, মায়া, মূর্ত্তিমতী হইয়া ভারতকে ভারতে পরিণত করিয়াছিল। এ দেশের সন্তান, পিতামাতার চরণাম্বিকে নতজানু হইয়া প্রণত হইত, দেবমন্দিরে "সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত" করিত, গুরুজনের চরণরেণু মাথায় লইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত—কর্ম্মে ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এদেশে বিরাজমান ছিল। কিন্তু কোন্ এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে, কোন্ এক মায়াবীর মায়ায় সব যেন অসীম শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। আজ ভক্তির দেশে ভক্তি অন্তর্হিত, শ্রদ্ধা উদাসীনতা বা Nil admirari spirit এ পরিণত আজ কেহ দেববিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেনা, আজ হিন্দুসন্তান আরাধ্য দেবতাকে দূর হইতে অন্ততঃ মানস "প্রণামে"রও পরিবর্ত্তে লোক দেখানো হাত তুলিয়া "নমস্কার" বা সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। আজ শিক্ষিত পুত্র পিতার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লওয়াকে অসভ্যতা মনে করে, পত্নী পতিকে পরমগুরু বা দেবতার চক্ষে দেখাকে "সেকেলে কুসংস্কারে"র মধ্যে গণনা করিয়া থাকে; আজ পিতা "ভেনারেবল ফ্রেণ্ড" (শ্রদ্ধেয় বন্ধু), ও স্বামী প্রাণের প্রিয়তম এয়ার। পরীব ভারতবাসীর শান্তিময় "জয়েণ্ট ষ্টক কম্পানি" বা "যৌথ কারবার" ধীরে ধীরে এদেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে—এখানে কেহ প্রধান পরিচালক নাই, এখানে আর ভরত মিলে না, কেহ আর লক্ষ্মণ হইতে চাহেনা, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদানের মন্ত্রের এখানে কোন প্রভাব নাই এখানে "সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান" "Ours to doanddie" নীতি শুধু সৈন্যবিভাগে ও কবির কল্পনাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। সাম্য স্বাধীনতার বাতাসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রভঞ্জনে ভারতের প্রাচীন শিল্প প্রাচীন সাধনার ফলগুলি একে একে সব ঝড়িয়া পড়িতেছে। ভারতের সমাজ মানুষ তৈয়ারি ও মানুষ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর যন্ত্র ছিল। এখানে যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় মত্ত থাকিতেন, সমাজের দ্বার তাঁহাদের নিকট অবারিত ছিল, যাঁহারা সংসারের সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মের সুখই শাশ্বত বলিয়া মনে করিতেন—মানসিক শ্রম-লব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের ফলগুলি সাংসারিক লোকের মুখে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেন, ভারতের সমাজ তাঁহাদের সকল ভার মাথা পাতিয়া লইতেন—তাই এদেশে ব্যাস-বশিষ্ঠ তাই এদেশে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছে—তাই এদেশের সমাজে ব্রাহ্মণের এত সম্মান তাই তাহার দাত খুন মাফ্। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণের আর সে সম্মান নাই, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বামিত্র জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত অচল। সমাজে তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা নাই, থাকাও কেহ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নহে, এক দীন হীন দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রী "এয়োতীর" চিহ্ন স্বরূপ রক্তসূত্র হস্তে ধারণ করিয়াও কোন রাণীর নিকটে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন আর রাণী সেই অভিমান সূচক বাক্য শুনিয়াও তাঁহাকে যথেষ্ট ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন ছার বা বেদান্তের বিবিধ তত্ত্বোদ্ঘাটনে ব্রতী কোন দীনহীন পণ্ডিত

যদি কোন জমিদারের ঘারস্থ হও, তাহা হইলে তাহার নগদ বিদায় এক পয়সা। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই মনে মনে রাসবিহারী ঘোষ, রতন তাতা জমিদার, মহাজন হইতে চাহে, অর্থ প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা করে। বর্ত্তমান যুগে বিদ্যা, ধর্ম্ম, সাহিত্য সমুদায় একটা "ফ্যাসানে" পরিণত! শত শত যুবক দর্শন লইয়া বিএ, এম এ পাশ করিতেছেন, বিজ্ঞান লইয়া বি, এস, সি, এম, এস, সি, উপাধি লাভ করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কয় জন ঐ সমুদায়কে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন? অধিকাংশই উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়র "ডেপুটী" মুন্সেফ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য লালায়িত; হইতেছেনও তাই; এ সমুদায় বিদ্যার পুঁথিগত যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ শুধু লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর পুত্রগণের তবের জন্য, শুধু বিবাহের বজারে কবির ধারা আকর্ষণের নিমিত্ত শুধু একটা ফ্যাসানের অনুরোধে ও বিস্মৃতির বিশাল কুক্ষি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মাত্র। পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যা। এ দেশের ব্রাহ্মণ সন্তান—তায় বেদান্ত স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন, ঐ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার নিমিত্ত, ঐ সমুদায়কে চিরজীবনব্যাপিনী সাধনা ও জীবনের অবলম্বন করিবার জন্য—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেও অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। আর বর্ত্তমান সময়ে তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেকালে ছিল "বিদ্যা জ্ঞানায়" আর বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছে "বিদ্যা ধনায়"—তথাপি আমরা আমাদের বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার করিতে বিমুখ হই না।

প্রাচীন ভারতে যে কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রকৃত সাধনা ছিল তাহা নহে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে সেই সাধনা ও জ্ঞান প্রচারের প্রণালীও উৎকৃষ্ট ছিল। গ্রামে গ্রামে পুরাণ পাঠকেরা ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিয়া উপাখ্যানচ্ছলে ধর্ম্মের, সাধনের গভীর তত্ত্ব সমূহ বুঝাইয়া দিতেন, কথকেরা কথকতাচ্ছলে আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতেন—ভারতের নরনারী ধর্ম্মভাবে, আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে আর কেহ পুরাণ শুনিবার জন্য সমুৎসুক নহে, কারণ ঘরে ঘরে আজ পুরাণের পরিবর্ত্তে উপন্যাস প্রচলিত—বর্ত্তমান যুগের "শিক্ষিত শিক্ষিতা"গণ সীতা সাবিত্রীর পরিবর্ত্তে কুন্দ নন্দিনীর "করুণ কাহিনী" পাঠেই অধিকতর আগ্রহান্বিত, তাই ঘরে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সীতার পরিবর্ত্তে আমরা স্নেহলতার অভিনয় দেখিতেছি, আজ যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই প্রাচীন ভারতীয় ভাবের অভাব ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়াও কি আমাদের চক্ষুরুন্মীলিত হইবে না, আমাদের চৈতন্যের সঞ্চার হইবে না? এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হইলে আমাদের অনেক ভাল জিনিষ রক্ষা পাইতে পারে, নতুবা দীপ নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে তৈলদানের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার বিস্তার কর, শিক্ষার বিস্তার কর,—এই ধ্বনি এইক্ষণ সর্ব্বত্র শুনা যায়। ভারতের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখেন না, তাঁহারা অন্ধকারে রহিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষাবিহীন হওয়ায় ভারতের অর্দ্ধাঙ্গ রোগ

হইয়াছে, তাহারা না জাগিলে ভারত জাগিবে না,—ইত্যাদি হেতু প্রদর্শনে সর্ব্বত্র বালিকা স্কুল স্থাপনের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ভারতের সাধারণ লোকেরা লেখাপড়া জানে না, তাহারা স্বেচ্ছায় লেখাপড়া শিখে না, অতএব বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্যও প্রস্তাব উঠিয়াছে। সম্প্রতি depressed class এর লোকদিগকে তুলিবার আর এক ধুয়া উঠিয়াছে,—সেখানেও শিক্ষার বিস্তারই প্রধান কার্য্য।

ইংরাজী শিক্ষা হইতেই ঐ প্রকারের ভাব আমাদের মন অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় ইংরাজ সমালোচকেরা আমাদের ভর্ৎসনা করেন,—যে দেশের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত, এমন কি সূর্য্যের আলো হইতেও বঞ্চিত—অন্দর মহল হইতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই,—যে দেশের সাধারণ লোকদের সহিত লেখাপড়ার সম্পর্ক নাই—শতকরা ৯৯ জন মূর্খ, সে দেশের লোকেরা কোন্ মুখে রাজনৈতিক উচ্চ অধিকারের দাবী করে?

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল লাভ ও রাজনৈতিক উন্নতি কামনা—এই দুইটিই এইরূপ যুগপৎ আমাদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে তাড়না করিতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য এইরূপ বিশেষ সাহায্যদান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বত্র পল্লীতে পল্লীতে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা বাড়িতেছে; জেলায় জেলায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; এক এক প্রদেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে; মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ চলিতেছে। এই সমস্ত এই নূতন যুগের ফল। ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশকে ঐসমস্ত দেশের ন্যায় গড়িয়া তুলিবার যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি তাহাতেই বর্ত্তমান শিক্ষানীতির মূল নিহিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত লেখাপড়ার সম্পর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। ইদানীং যত দোকানপাট দেখা যায় তাহাদের কোনটির পরিচালকেরা লেখাপড়া জানে না এরূপ কেহই মনে করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েট যখন মিষ্টান্নের দোকান দিতেছে, সেলাইয়ের কাজ করিতেছে, ধোপার কারখানা খুলিতেছে, জুতা বিক্রয় করিতেছে তখন আর অন্যের কথা কি?

আমাদের ইংরাজ সমালোচকেরা বরং লেখাপড়া শিখিয়াই ঐরূপ কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের উৎসাহিত করিয়া থাকেন, লেখাপড়া শিখিয়া কেবলই চাকরী চাকরী, বা ওকালতি ডাক্তারি করিবে কেন? আমরাও আমাদের দেশের যুবকদের ঐরূপ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার ফলে এইক্ষণ এদেশের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত যাহাতে দু'পয়সা পাওয়া যাইবে মনে করেন সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিতেছেন। এইক্ষণ আর ব্যবসায়ে জাতি বিচার নাই।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ব্যবসায়ে জাতি বিচার উঠাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বে এদেশের এক একটি ব্যবসায় এক একটি জাতির উপর ন্যস্ত ছিল এইক্ষণ লেখাপড়া শিখিয়া যে যা সুবিধাজনক মনে করে তাহাই সে

অবলম্বন করে। ব্রাহ্মণ সন্তান লেখাপড়ার ফলে হুঁড়ি মুচির ব্যবসা ধরিতেও কুণ্ঠিত নহে। আমরা যে দেশের শিক্ষালাভ করিতেছি, সে দেশের শিক্ষার ফল আমরা পাইব,—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যবসায়ে জাতি বিচার নাই, অর্থবল ও তাহার পরিপোষক বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই তাহাদের সামাজিক জাতিবিচার। তথায় মুচি মেথরের ছেলে অর্থবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থাই এইরূপ।

ভারতে বহুকাল ধরিয়া জাতিভেদ চলিয়া আসিতেছে; প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক আচারে ব্যবহারে জাতিভেদ রহিয়াছে। শিক্ষায়ও জাতিভেদ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না; দুই দিকের শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে।

জ্যোতিঃ

৩। অন্ন-সমস্যা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পল্লী সমাজের আর্থিক উন্নতি না হইলে কিছুতেই আমাদের দেশে অন্নচিন্তার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না এবং কি কি উপায় অবলম্বিত হইলে আমাদের তদ্ভাব অভাব দূরীভূত হইতে পারে, আমাদের এক্ষণে তাহাই প্রণিধানের বিষয়।

বঙ্গ দেশের পল্লী সমাজে সামান্য সংখ্যক ভদ্রসন্তান ও অবশিষ্টই প্রায় কৃষিজীবী লোকে পরিপূর্ণ। ভদ্রসন্তান যিনি যাহাই লেখা পড়া করুন না কেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য—একমাত্র লক্ষ্য—পরপদ সেবন অর্থাৎ চাকুরী এবং অবশিষ্ট কৃষিজীবী প্রজাগণের লক্ষ্য, তাহাদের নৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ জমি যাহা কিছু আছে তদ্বারা ঠিক অন্নান সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বের বিধানানুসারে হল চালনা করা।—বর্ত্তমান কালের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত নূতন কিম্বা অভিনব কোনরূপ চাষের উন্নতির চেষ্টা নাই। এজন্য কৃষি সম্প্রদায় দায়ী কিম্বা দোষী নহে। ভদ্র সমাজ—বিশেষতঃ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ এবং তাঁহাদের কার্য্যের পথ প্রসারণ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তদুপযুক্ত অর্থদ্বারা যাঁহারা কার্য্যারম্ভ করাইতে সক্ষম—অথচ তৎকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন—এই দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পল্লী সমাজের দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে এবং ফলতঃ ইঁহারাই সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্বের ক্রমশঃ লোপের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি আমাদের পল্লী সমাজে যতদিন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নিত্য আবশ্যকীয় সংসার যাত্রার ব্যবহার্য্য বিষয়ের প্রস্তুত করণ শিক্ষা দেওয়া না হইবে, যতদিন এইরূপ শিক্ষাকল্পে দেশের মনীষীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ধাবিত না হইবে, ততদিন কিছুতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না।

আমরা সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, এবং পরমুখাপেক্ষিতাই আমাদের অর্থশোষণের সর্ব্বপ্রধান কারণ, নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ দ্রব্য আমরা সততই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি এবং এই গুলিই ব্যবহারের জন্য অন্য দেশ অন্য জাতির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেছি, ইহাতে আমাদের অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদেরই ভোগবিলাসের সামগ্রী হইতেছে।

স্বদেশজাত কাঁচামাল (Raw Materials)

বিদেশে রপ্তানী করিলে যে মূল্য বিনিময়ে লাভ হইতে পারে, রূপান্তরভেদে অন্তরূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পরিণত হইলে তাহাদের মূল্য তদপেক্ষা যে বহুগুণে অধিক ইহা একটী সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এই জন্যই আমরা, পল্লী সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণের হস্ত চালিত মোজা গেঞ্জির কল, পিতল কাঁসার বাসন ও তৈজস পত্রাদির প্রস্তুত করণ শিক্ষা, সাধারণ সূতী মালা কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত ইত্যাদি সাধারণ শিল্প শিক্ষা যাহাতে দেশ মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে আমরা প্রত্যেক স্বদেশ বৎসল মহানুভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ত্তমান কিণ্ডার গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হইতেছে কি না তদ্বিষয়টী আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল হইয়াছে। আমরা বক্ষ্যমান বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

সুরাজ

৪। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

আমরা উন্নতিকামী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকি; উন্নতি সোপানে আরূঢ় বলিয়া সময়ে সময়ে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াও থাকি; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আমাদের উন্নতির পথ দিন দিন যেন কণ্টকাকীর্ণ হইতেছে; আমাদের অবস্থা দিন দিন যেন শোচনীয় হইতেছে, আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্তই হইয়া পড়িতেছি। আমরা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট, উদাসীন দৃষ্টিহীন একথা বলিতে পারি না; আমাদের প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তৃগণ আমাদের কিসে মঙ্গল হইবে তাহার জন্য যাবতীয় উপায় উদ্ভাবনে, ব্যবস্থা করণে সর্ব্বদা অবহিত একথাও অস্বীকার করিলে নিরপরাধী হইতে হইবে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিধানে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আশানুরূপ ফল লাভ হওয়া দূরে থাক আমরা যেন দিন দিন আমাদের লক্ষ্য হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি আমরা যে কি বা কাহার অভিসম্পাতে হীন হইতেছি তাহা জানিনা কিন্তু দারুণ সত্যকে লুকায়িত রাখিলে চলিবে কেন আমাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা যে যথার্থই ঘটিতেছে একথা গোপন করিতে ত পারিব না।

আমরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী নৃপতির প্রজা হইয়া অর্থহীন, আমাদের দারিদ্র্য জগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত; বলিতে জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হয়, অনেকের মতে আমরা নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরিদ্র; আমরা রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি বুঝিতে চাহি না, তবে এটা নিত্য দেখিতেছি যে এক বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে কোন স্থানে অজন্মা হইলেই দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়; ইহা ও ভীষণ দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

আমরা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গ জননীর সন্তান হইয়া জানিনা বিধির কোন বিধানে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া আমাদিগকে গগন বিদীর্ণ করিতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট যেন আমাদের নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্নাভাবে বঙ্গের নানা স্থানের লোকের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহার আলেখ্য ত নিত্যই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, আর এই দারুণ গ্রীষ্মে জলাভাবে কেবল মানুষের নয়, গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণেরও যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার নহে; যাহা কিছু বলিব

আমাই অতিরঞ্জন বলিয়া প্রতীত হইবে; কষ্ট এতই ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ও আবদ্ধ জল নিঃসরণের রীতিমত ব্যবস্থা না থাকায় দেশে নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের নদ নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকাতে উহাদের তীরবর্ত্তী জনপদবাসিগণের পানীয় জলের অভাব অনুভূত হইত না; যাঁহার সামান্য কিছু সম্পত্তি থাকিত তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা মহা পুণ্য কার্য বিবেচনা করিয়া পুষ্করিণী দীর্ঘিকা খননে অর্থব্যয় করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন; ইহার ফলে বঙ্গে জলকষ্ট কাহাকে বলে তাহা জানিত না। কিন্তু কালের কুটীল গতিতে অনেক নদ নদী মজিয়া গিয়াছে দেশের সঙ্গতিশালী লোকের আর আজ কাল জলাশয় প্রতিষ্ঠায় আস্থা নাই, তাঁহাদের মতি গতি নাই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। অনেক ধনাঢ্য হয় ত কোন সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য অকাতরে করিবেন অথচ জলাভাবক্লিষ্ট স্বগ্রামে বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে দুই একটা পুষ্করিণী খননের কথা উঠিলেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন এমন কি বর্ত্তমান জলাশয়গুলির সংস্কার সাধনেও পরাঙ্মুখ. ইহার ফলে প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম সমাগমে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে জলকষ্টের জন্য হাহাকার উঠে এবং বহু নরনারী পঙ্কিল দূষিত বারি পানের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে; স্বাস্থ্য হীন হইতে হীনতর হইতেছে।

আর আমাদের শিল্প। সে কথা বলিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহার ফলে ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে আমরা পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি; দেশের ধন বিদেশীর হস্তগত হইতেছে। আজ বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতির জন্য আমরা পথ পানে চাহিয়া আছি, কই কোতে দুখায়, লজ্জায় অনুশোচনায় ম্রিয়মান, ম্রানমুখ হইতেছি কই! আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকল জিনিসের জন্য নিত্য পরের দ্বারস্থ হইয়া আছি, ইহাতে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হইতেছে কই?

এই ত আমাদের অবস্থার কতক পরিচয় প্রদান করিলাম! সব কথা বলার স্থান নাই; মোট কথা আমরা অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, জলাভাবক্লিষ্ট, দস্যু তস্করের অত্যাচারে ভয় বিহ্বল, আমাদের শিল্প বাণিজ্য নাশ প্রাপ্ত। আমরা অমিত ক্ষমতা শালী ইংরাজ রাজের রাজভক্ত অনুরক্ত প্রজা। আমাদের রাজার রাজ্যে ভগবান অংশুমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হন না এ গর্ব্ব পৃথিবীর আর কোন রাজার প্রজা করিতে পারে? আমাদের রাজার ন্যায় হিতকামী শুভাকাঙ্ক্ষী পৃথিবীতে আর কোনও রাজা আছেন কি না জানি না, জানিতেও চাহিনা; সর্ব্বশক্তিমান যে শক্তিমান ভগবান নৃপতির শাসনাধীনে আমাদিগকে রাখিয়াছেন তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় আমরা যেন চিরকাল থাকিতে পাই। আমরা আর কাহাকেও জানি না, হে ইংরাজ তোমাকেই জানি, তুমিই বলিয়া দাও, কবে আমাদের সুদিন ফিরিবে?

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী

৫। আমাদের করণীয়

এই বিশ্ববিধ্বংসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়া অবধি আমরা ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের

দুরবস্থার কথা ও তন্নিবারণ কল্পে দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রতিনিয়ত শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু এই বাইশ মাস মধ্যে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্টের শিল্প বাণিজ্য কমিশন ও আমাদের মন্তব্য প্রকাশ সমফল প্রসূ হইয়াছে। অথচ দিনের পর দিন আমরা দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইতেছি। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ আজ এক প্রকার অঘট হইয়াছে, যাহা অঘট হয় নাই তাহা অতি দুর্ঘট হইয়াছে। এক পয়সার জিনিষের দাম ২০৲ টাকাও হইতেছে। রং এবং সুঁচের উদাহরণটাই তাহার প্রধান উদাহরণ স্থল। তারপর কাগজ, কাপড়, টীন, চিনি, লবণ, কাচ প্রভৃতির কথা। আমরা ইহার কোনও জিনিষ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করি নাই। গভর্ণমেণ্ট ও কিছু করিতেছেন না। আমরা গভর্ণমেণ্টকে কোনও দোষ আজ কাল দিতে চাইনা কারণ এখন তাহারা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, ভারতবর্ষের ব্যয় বহুল শিল্প বাণিজ্য রক্ষা কল্পে মনোযোগ প্রদানের অবসর তাহাদের নাই। এখন কথা হইতেছে যে, আমরা গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া কি করিতে পারি? অবশ্য পারি অনেক, তদপেক্ষাও পারা উচিত অনেক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় দু একটা কাজ আমরা ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেই না। রক্ষাশুল্ক এদেশীয় শিল্পোন্নতির এক মাত্র প্রধান উপায় এ কথা আজ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। অথচ গভর্ণমেণ্ট সহজে এমন কি ইচ্ছায় সে পথে পদক্ষেপ করিতে পারেন না। কারণ চিরাচরিত অবাধ বাণিজ্য নীতি এমতাবস্থায় Prestige তাহার প্রধান অন্তরায় অতএব প্রজার দিক দিয়া তাহাদিগকে উদ্বোধিত না করিলে তাহারা অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। লাটকাউন্সিলে সার এব্রাহিম রহমতুল্লা, মি দাদাভাই প্রভৃতি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে বেশ জোর করিয়া ধরিয়াছিলেন ফলও যে কিছু না পাইয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবের পশ্চাতে সমগ্র দেশ বর্ত্তমান আছে কিনা তাহা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট তথা ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন নাই! এই দেশবাসীর আত্মরক্ষাকল্পে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে গভর্ণমেণ্টকে জানান কর্ত্তব্য। কোনও কোনও নেতা মনে করিতে পারেন এ সময় গবর্ণমেণ্টকে কোনও আবদার জানাইতে গিয়া বিরক্ত করা উচিত নহে। আমরা বলি সেকথা একান্তই ভ্রমাত্মক ও ভাবাত্মক কারণ ইংলণ্ড এবং মিত্ররাজ্যসমূহ এ বিষয়ে নীরব নহে। প্যারিসে এ যুদ্ধের পরের বাণিজ্য নীতি লইয়া ক্রমাগত আলোচনা হইতেছে এবং সার রিজের প্রশ্নে স্পষ্ট বুঝা যায় সে সমিতিতে ভারতবর্ষকে মাত্রই হিসাবে আনা হইতেছে না। অপর দিকে ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব কমার্স রক্ষা শুল্ক প্রবর্ত্তন কল্পে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন। অতএব অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়ে আমাদের নীরব থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সময় ফুরাইয়া গেলে তখনকার চীৎকার বাতুলের প্রলাপ মধ্যে গণ্য হইবে।

তাই আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের প্রতি সহর প্রতি গ্রাম হইতে সভা সমিতি করিয়া ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। এই সভা সমিতি করিতে কোনও আপত্তির হেতু নাই। নীরব নিস্পন্দ

হতভাগা দেশ আবার একটু কার্য্যকরী পথে অগ্রসর হউক।

সঙ্গে সঙ্গে দেশের বড় লোকগণ নিত্য আবশ্যকীয় একটী আধটী জিনিষের কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হউন। আমরা গতবারে বলিয়াছি এবারও বলি বহু জমীদার এবং ধনী এদেশে আছেন যাহারা ইচ্ছা করিলে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা স্থলে দুএক লক্ষ টাকা নষ্ট করিলেও তাহারা বিপন্ন হন না। দেশের একদল লোক আবার সেই ভাবে বড় লোকদিগের পশ্চাতে একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। আরও শাসন প্রবর্ত্তন ও সঙ্ঘের সেবা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এই কার্য্যগুলি কোনও অংশে ন্যূন নহে। আশা করি অচল দেশ আবার একটু সচল হইবে।

বরিশাল হিতৈষী

সাহিত্য

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিস প্রকৃত মঙ্গলময় নয়
তাই কণ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, শ্রাবণ	দশম সংখ্যা।

আলোচনা

১। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা

মানব সমষ্টির মধ্যে কি করিয়া ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা হয় তাহা অনেকেই গোড়া রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। বড় হইতে সকলেরই ইচ্ছা। সকলেই ইচ্ছা করে আমি বড় হইব, জগতের বুকের উপর অক্ষয় ফলকে আমার নাম চিরদিনের জন্য আঁকা থাকিবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের ছায়ামাত্র আমার চরিত্রের পার্শ্বে স্থান পাইবে না; আমার জননী ও জন্মভূমিকে সকল শক্তির ও কর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া জগতের জলস্থলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই রকম ভাবই প্রকাশ করে। তাঁহারা জল স্থল ও দূরের কথা চন্দ্রসূর্য্যকেও আপনাদের করতলগত করিতে চাহিয়াছেন। বড় হওয়ার

অর্থ ইহা নয় যে, দশ পাঁচ জন আমার অধীন হইয়া থাকুক, আমার আদেশ মত হুকুম তামিল করুক, তাহা হইলেই আমার ক্ষমতার বিকাশ। বিশ্ববিশ্রুত মহাত্মাগণ সেরূপ ক্ষমতাকে তুচ্ছ মনে করেন।

যাঁহারা সমষ্টির সম্মুখে ব্যক্তিত্বের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী চরিত্রগুলির রহস্য ভেদ করিয়া বাহির করা দরকার। জ্ঞানে হউক, কর্ম্মে হউক আর ধর্ম্মেই হউক সকল বিভাগেরই এক একটা ধারা আছে। রুচি অনুসারে এক একজন এক একদিক বাছিয়া লন। সংসারে জন্মিয়া সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হইবে। আমাকে কিছু করিতে হইবে, আমার জন্য এই জগতে কোন কিছু নূতন প্রতিষ্ঠার জন্য এই ভাব না থাকিলে চলিবে না। জগৎ কোন দিন একজনের নিয়ম মানিয়াই চলে নাই। তাহা হইলে মানব সমাজের গতিবিধি অন্যরূপ ধরিয়া চলিত। আকাঙ্ক্ষাই মানবের দেবত্ব লাভের সোপান। একজন জননায়ক তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে যে উন্নতির পথ দেখাইয়া যান পরবর্ত্তী কোন মহাপুরুষের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত জড় সমাজ তাহাই মানিয়া চলিতে থাকে এবং এই নিয়মের দ্বারাই পরবর্ত্তী যুগের কর্ম্মবীরগণ আপনাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সুবিধা লাভ করেন।

অধিকাংশ মানুষই মহাত্মাগণের ভিতরের শক্তির দিকে লক্ষ্য করিতে চায় না। তাহাদের দৃষ্টি অত সূক্ষ্মভাবে দেখিতে চায় না—তাঁহারা কোন বিশেষ শক্তির বলে আপনাদের চরণ চলিতে দেন নাই, শত প্রকার প্রলোভন শত প্রকার অন্যায় অপবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, দারিদ্র্য-ব্যাধি তাঁহাদের মুখে কালিমারেখা পাত করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই এক একটা বিশেষ শক্তি আছে। সেই শক্তিই তাহার সমাজের মেরুদণ্ড। সেই শক্তির দ্বারাই আত্মবোধ জাগ্রত হয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে। সেই শক্তির দ্বারাই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্থিরচিত্ততা লাভ করিয়া তন্ময় হইতে থাকেন। সেই সর্ব্বশক্তি তাঁহাকে আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, অগ্নি, সূর্য্যকে অবধি আপনার করিয়া দেয়। যিনি আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া নীরবে নিশ্চিন্তভাবে আপনার কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তিনিই জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করেন ও তিনিই সেই শক্তি লাভ করিতে সমর্থ। সেই উন্নত, শক্তিলাভী জননায়ক তখন তাঁহার সমশ্রেণীর মানবদিগের নিকট নিজের মত প্রচার করেন। তাহাদিগকে শক্তি দেন—

"তোমারি চরণতলে রহিয়াছে পড়ি
দৈন্যনাশি ধরণীর সমগ্র রতন।"

যাঁহার শক্তি আছে, প্রাণ আছে আপনার যাহা করিবার তাহা নীরবে করিয়া যাইতে ইচ্ছা আছে তিনিই আপনার দেশ, আপনার ধর্ম্মকে, বিশ্বসমাজকে ভালবাসিতে পারেন। তাঁহারা দেশ ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের নিমিত্ত, যাহা প্রয়োজন বোধ করেন তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন। জগতের নূতন খণ্ডসৃষ্টিই তাঁহাদিগকেই প্রকাশ করে। তাঁহারা ধ্রুব ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় শক্তিমান্, অসম্ভবে সম্ভব তাঁহাদেরই ধারণায় আসে। শক্তি ও ভক্তির পূর্ণতাতেই তাঁহারা নূতন কিরণপাত করেন। তাই ভয় ভাবনা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না।

ধ্রুব, বিশ্বামিত্র যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা কয় জনে লাভ করিতে চাহেন?

বিশ্বামিত্রের ন্যায় নূতন রাজ্য গঠনকারী কয়জন ইতিহাসে দেখা দিয়াছেন? মানুষ ও দূরের কথা দেবতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের লীলা প্রদর্শন করিতে তাঁহারাই সমর্থ। শক্তিমান উন্নতিকামিগণ যাহা গঠন করিয়া যান অক্ষমানব তাহা অলীক মনে করে। তাহাদের শক্তি সে তেজ সহ্য করিতে পারে না তাহাদের দৃষ্টি অতদূর পৌঁছিতে পারে না।

আমরা চাই বিশ্বামিত্র যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক মানুষ লাভ করুক। সকলেই নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করুক, নব নব চিন্তা প্রণালী আবিষ্কার করুক, মরিয়া হইয়া জগতে শত শত নূতন রাজ্য গঠন করিতে প্রস্তুত হউক। জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ দুর্ব্বল ও হীনবিশ্বাস মানবের হৃদয়ে অফুরন্ত ভাবে বিরাজ করুক। চিত্তে দুর্ব্বলতার প্রতিষ্ঠা না করিয়া শক্তিমান হইয়া শত শত শক্তিমান মানবের সমষ্টি আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করুক।

* *
*

২। সমাজ সেবক

আমাদের দৃষ্টি যত বেশী দূরে পতিত হইবে, আমরা যত বেশী সূক্ষ্মভাবে দেশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিব ততই সমাজের জন্য সমাজের উন্নতির নিমিত্ত ভালবাসা জাগিবে। আমরা দেখিতে পাইব "সর্ব্বভূতে ভগবানে"র স্নেহ বিরাজমান রহিয়াছে, বিভিন্ন লোকচরিত্রে তাঁহারই মহান ভাবের বিকাশ মাত্র। সমাজসেবক, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাপ্রচারক আমাদেরই বিভিন্ন রুচির পরিচায়ক।

আমরা দেখিতে পাইতেছি—একশ্রেণীর সমাজ সেবক বন্যায় আর্ত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, দুর্ভিক্ষে অন্নদানে সাহায্য করিবার জন্য না যাইয়াও রোগ শয্যায় মুমূর্ষু রোগীর সেবা না করিয়াও কাজ করিয়া যাইতেছেন। সেখানে মানসমাজের যশের লোভ নাই প্রচারের ক্ষেত্র নাই ভবিষ্যৎ গৌরব অর্জ্জনের কোন সুবিধাই নাই। তাঁহারা তাঁহার নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আবেগকে অবধি রুদ্ধ করিয়া যাহাদিগকে সেবা করিতেছেন, তাহারা আমাদেরই আপন হইতে আপন, ভাব ও ভাষার রুদ্ধ প্রস্রবণ অন্ধ, মূক ও বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

যে মহাত্মার চিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক হইতে এই সমাজ প্রীতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি যে প্রকৃত সমাজসেবক ছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আর যাঁহারা তাঁহারই পন্থানুসারে চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাদিগকেও প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারক বলিতে পারি। নিম্নশ্রেণীকে সমাজে উন্নয়ন, অশিক্ষিতে শিক্ষাদান এই গুলিও সমাজ সেবার আধার, কিন্তু মূক-অন্ধ-বধিরকে জাতি নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদান প্রকৃত ভালবাসা, খাঁটি শিক্ষা প্রচারকের কাজ।

স্থাননির্ব্বিশেষে, কোন সহরকে কেন্দ্র না করিয়া ইহাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুত হইলে আমাদের সমাজপ্রীতি বিস্তৃত হইবে। দেশের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কোন স্থান নির্ব্বাচনের প্রয়োজন করে না। কর্ম্মীর কর্ম্ম অনুসারে—তাঁহার সংযম তাঁহার ক্ষুদ্রস্বত্বত্যাগ বুঝিয়া স্থান আপনা হইতেই কেন্দ্র হইয়া পড়িবে। আজ পর্য্যন্তও বড় জোর ২।১টী স্কুল ব্যতীত মূক, অন্ধ, বধিরকে শিক্ষাদানের কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। কুষ্ঠাশ্রম, প্রভৃতিও যেন এইরূপ ২।১টী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

নব নব কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যেমন

ব্যক্তির চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সমাজের উন্নতি অবনতির ক্রম, নূতনের আবশ্যকতা বুঝা যায়। সমাজস্থ ধনী ব্যক্তিদের দান এইরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়া সমাজকে উঁচু করে, ব্যক্তিগত চরিত্রকে আদর্শ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করিয়া দেয়।

সমাজ সেবায় কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা বা মতবাদ নাই। সমাজ সকলের; যিনি যে ভাবে, যত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজকে নিরীক্ষণ করিবেন তিনিই তত উচ্চ সমাজ সেবক হইবেন। ব্যক্তিগত প্রশংসাবাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিলে সমাজ নিজেই তাঁহাকে যশের মুকুট পরাইয়া দিবে। সমাজ কর্ম্মীর একাগ্রতা ও ভক্তিতে রক্ত-মাংস লাভ করে। সুতরাং তন্ময়চিত্ত হইয়া ভাবিতে হইবে—আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত শৈশবের মাতৃক্রোড়, কৈশোরের ক্রীড়াভূমি আজ যৌবনে যেন আমার দ্বারা পরিত্যক্ত বা লাঞ্ছিত না হয়। সমাজ সেবায় ছোট বড় উচ্চ নীচ নাই। সাময়িক বিস্তৃতি ও সঙ্কোচনেই কাহারও মাপ-কাঠি তৈয়ারী হয় না। সমাজ বিরাট মাতৃ-মূর্ত্তিতে বিরাজমানা, যিনি যত বেশী আবদার করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন তিনিই তত বেশী মাতৃস্নেহ লাভ করিবেন। একবার স্থির হইয়া ভাবিলে—শত শত মূক-অন্ধ-বধির ছাত্রসমাজ, শত শত কুষ্ঠাশ্রম আসিয়া চোখের সামনে উপস্থিত হইবে। নূতনের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইবে। সমাজকে উপলব্ধির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না আসিলে জীবনটা জড় হইবে, পরের কথায় একটা ভোগের মরিচিকা আশার উচ্চ চূড়া দেখা দিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

৩। হেতমপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সন্তানের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানের উন্নতি বিধানের জন্য নানা রকম, যুক্তি তর্ক অনেককেই বড় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখন সময় আসে তখন বৈঠকে বসিলে অন্নবিস্তর সকলেই দায়িত্বলাভে ঘরবান হন। তিন বৎসর যাবৎ যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য এত আন্দোলন চলিতেছে তাহার ফলে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কোন চিহ্নই আন্দোলনকারীদিগের দ্বারা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজকার মত দিনে লোকে যে ধনের দোহাই দিয়া কর্ম্মবিরতি দেখায় তাহারও অভাব দেখি না। আমরা প্রতি পদেই লক্ষ্য করিতেছি এই "সুফলা সুফলা" দেশে প্রাণের অভাবে সলিল-পূর্ণ নদ নদী পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইতে পারে। যাহা আমাদের সমাজের পুষ্টিবিধায়ক বলিয়া কোন দিনই ধারণা হয় নাই বিলাতী সভ্যতা সমাজকে শত ভাবে আচ্ছন্ন করিলেও সেই অর্থের অভাবে প্রতিষ্ঠানের অভাব রহিবে এ কথা বিশ্বাস করি না। যখন সমাজ রক্ষক নরপতিগণ ধর্ম্মের জন্য নিঃস্ব হইতে পারিতেন সেই দিনত কোনও ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্রাহ্মণ তৈয়ারীর জন্য ধনীর দ্বারস্থ হন নাই। শত শত ব্রহ্মচারী যাঁহারা হিন্দু সমাজকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে ধনের সম্পর্ক ছিল না। ধনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া এদেশের সমাজশাসন পুষ্ট লাভ করে নাই। যদি কখনও আমাদের দেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইবে। সমাজ রক্ষক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে প্রথমাবস্থায় দীনভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। আজ পর্য্যন্ত আশ্রম

প্রতিষ্ঠার জন্ত কেবল অর্থের কচ্ কচ্ করিতেই কাটিয়া গেল। হিন্দু সন্তানের পিতামাতা যদি সমাজের দিকে ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে আমরা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ত কোন কথাই বলিতাম না। আমরা চাই দেশের ভবিষ্যৎ গৌরবের জন্ত যাঁহারা সন্তান তাঁহারা ব্রাহ্মণই হউন আর বৈদ্য বা কায়স্থই হউন। ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণ সন্তানের গঠনের জন্ত কোন স্থায়ী উপায় নির্দ্ধারিত হইলে সমাজের বিভিন্ন কক্ষেও একটা নূতন জীবন গঠনের উপায় দেখা যাইত। হিন্দু সমাজে সাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও যাঁহারা হিন্দুত্বের ভিত্তির উপর যাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তিনিই যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন এটা নিশ্চয়।

হিন্দু সমাজ বিষম পরিবর্ত্তনের পথে দাঁড়াইলেও সমাজের অধিকাংশ লোকই যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের মতগ্রাহী তাহা বুঝা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ উন্নতির জন্ত যাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানুষ হিসাবে যতটা যাঁহারা ভাব আসিতে পারে তাহা কে না চায়?

সম্প্রতি হেতমপুরে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের গুরুকুল ঋষিকুলের ন্যায় ইহার নাম ধাম খুব জাঁকাল রকমে না দাঁড়াইলেও আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। হেতমপুরের আশ্রমের চারি পাশে যুক্তি তর্ক মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয় নাই তাই কার্য্যক্ষেত্রে ইহার সাত্ত্বিকভাব দেখা দিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পূর্ব্বভাব ফিরাইতে ২।১ বৎসরের কাজ নয়। অধ্যাপকের কার্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য ছাত্রগণের জীবনে স্পর্শ করিলে তবে কোন দিন ইহার সুফল পাওয়া যাইবে। আমরা আশাকরি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ছাত্রগণকে বর্ত্তমান জগৎ হইতে সরাইয়া লইবেন না। এখন হিন্দুর জ্ঞানই একমাত্র জগতের শিক্ষণীয় বিষয় নয়। যদি আবার হিন্দুর জ্ঞান এই সকল আশ্রমের ভিতর হইতেই বাহির হইবে মনে হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার যাহাতে তাহারা দখল করিয়া লইতে পারে তাহার প্রতি অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতাকে নজর রাখিতে হইবে। এই সকল ব্রহ্মচারী যাহাতে বর্ত্তমান গৃহস্থগণের শিক্ষাগুরু হইয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে।

হেতমপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নব্য বঙ্গের নূতন জিনিষ, ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার চারা গাছ। সুতরাং ইহা অধ্যাপকের একাগ্রতায় উক্ত প্রতিষ্ঠাতার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে পুষ্ট এবং বঙ্গবাসীর গাঢ় স্নেহ ও ভবিষ্যৎ আশার উপর বিস্তৃত হইয়া ফলবান হইবে।

* *
*

৪। সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে আমরা যে ২।১ টী প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার কোনই ফল দেখা যায় নাই। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই বিষয় লইয়া আর কোন কথাই হয় নাই। সুতরাং এই পাঁচ বৎসর পরেও তাহার পুনরুত্থাপন পুরাতন বিষয়ের আলোচনা নহে। যাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রথম প্রসূত তাহাও নূতন, আবার যাহা আমাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াও আমাদের চিন্তা বা কর্ম্মের মধ্যে স্থান পায় না তাহার পুরাতন প্রস্তাবও নূতন।

উক্ত সম্মিলনে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহি-

ভাই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছি না কেন তাহাই দেখাইতে চাই।

একে একে তিনটী মূল সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের কার্য্যাবলী এখনও স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই। তবুও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থ রচনার জন্যও এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইলে কিছু হইত বলিয়া আশা করা যায়। এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও, সাহিত্য-প্রীতি গাঢ়ভাব ধরে নাই; এবং সেই প্রীতি বর্দ্ধিত করিতে হইলে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা আদৌ চিন্তিত হয় নাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য কোন উপায় গৃহীত হইয়াছে কি? লোককে ধরিয়া আনিতে হইবে উপযুক্ততা হিসাবে কাজের ভার দিতে হইবে। গ্রন্থ রচনা একটা উদাহরণ মাত্র, মাতৃভাষার প্রচারের জন্য ছোট বড় উপায়গুলি সবই গৃহীত হইবে। আমরা দেখিতে চাই সাহিত্য পরিষদ কতকগুলি বইয়ের গুদাম নয় পরন্তু উহা সাহিত্যরথীর বৈঠক, ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রচারে বোর্ড। দেশে শিক্ষা প্রচারে যে সব অভাব থাকিবে কিছুদিন পর সেগুলি বর্ত্তমান নায়কগণেরই দোষের আশ্রয় লইবে।

আমরা চাই না সাহিত্য-পরিষদগুলি কেবল মাত্র নামে পরিচিত হউক। সাহিত্য-পরিষদ গৃহগুলি বাহিরের একটা ঠাট্ লইয়া বাঁচিয়া থাকুক। সাহিত্য-পরিষদ্ আজ পর্য্যন্ত বৎসরান্তে একবার সম্মিলনেই তৃপ্ত হইবে এটা যেন আমাদের মনে বদ্ধমূল না হয়—তাহাই চাই। সাহিত্য পরিষদ্ শুধু সম্মিলনের ভার না লইয়া দেশে নানারূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। সাহিত্য-পরিষদের পুরস্কার গুলি কেবল মাত্র পুরুষ ছাত্রগণই পাইবে এমন কোন কথা নাই।

বাঙ্গালা দেশে যে তিনটী মূল সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আপাততঃ তাহাদের দ্বারাই কাজ বেশ চলিবে। যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বা নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্য পদক্ষেপ করিবেন তাঁহাদিগকে অন্ততঃ একটা অভাব পূরণ করিতে হইবেই।

বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রচারের বন্দোবস্ত করা দুইই সাহিত্য-পরিষদগুলির উপর নির্ভর করে। আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও নব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গুলির কার্য্যের মধ্যে এইরূপ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন দেখিতে চাই।

দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বোর্ড যতটা ভার লইয়া কাজ করিয়া থাকেন সাহিত্য-পরিষদ গুলি সেই কাজ করিতে পারিবেন। সভ্যগণ সকলেই কৃতী। এক একটী শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালন করা শুধু তাঁহাদের চেষ্টা ও ঐকান্তিকতার উপর নির্ভর করে। সাহিত্য পরিষদগুলির দ্বারা শিক্ষা কার্য্য প্রচারিত হইতে থাকিলে কোন শিক্ষিত লোকই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

সাহিত্য-পরিষদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক কিন্তু সকলেই যদি মামুলী পথ ধরিয়া চলিতে থাকেন—বার কতক বই, প্রত্নতত্ত্বের কলরব আর মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনই উহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে অধিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয় আর কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কি কি নূতনত্ব দেখিতে পাই তাহার আলোচনা করিলে

দেখা অর্থ পরিবর্ত্তন ইহাদের লক্ষ্য নয়, কোন নূতন সৃষ্টি ইহারা চাহে না। নূতনের প্রতিষ্ঠা করে না বলিয়াই ইহারা দেশের মধ্যে পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। সাহিত্য-পরিষদগুলির যাহা অনায়াস লভ্য অন্যের তাহা শ্রম সাপেক্ষ।

দেশের যুবকসমাজ সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয় নাই কেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যরথী চিন্তার মধ্যে স্থান দিলেন না। কোন কোন যুবক হয় ত পরিষদকে আপন করিয়াছেন কিন্তু তবু পরিষদ এখনও দেশের রক্তে পুষ্ট হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষদ বলিলে জন কয়েক শিক্ষিত জ্ঞানী বৃদ্ধের একটা বৈঠকই যেন এখনও বুঝা যায়। যুবক বৃদ্ধ যেন দুই দল দুই দেশের।

* *
*

৫। রঞ্জন শিল্পের ভারতীয় উপাদান

আর্ম্মাণীর রং আবিষ্কৃত হইলে ব্যবসা জগতে যেমন সুবিধা লাভ হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তেমনি অসুবিধাতেও পড়িতে হইয়াছে। আর্ম্মাণীর রং আমাদের কাপড়খেলার একটা বড় উপাদান, আর্ম্মাণীর রংয়ে কাপড়ের পাড় রঞ্জিত হয়, আর্ম্মাণীর রং চিত্রশিল্পের সহায়।

আমরা রসায়ণ বিজ্ঞানে যেমন উন্নত নই ইতিহাসেও প্রায় তদ্রূপ। এই আর্ম্মাণী রং বাহির হইবার পূর্ব্বে আমরা কি ব্যবহার করিতাম, রঞ্জন বিভাগের ও চিত্রশিল্পের অবস্থাই বা কি ছিল ইত্যাদি বিষয় বিশেষজ্ঞের জানা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহার কোন আলোচনাই শুনিতে পাই না।

আমাদের দেশের প্রায় প্রতি জিলাতেই কুসুম ফুল উৎপন্ন হয়। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও আর্ম্মাণী এই সব কুসুম ফুল ক্রয় করিয়া রং বাহির করিয়া বিক্রয় করিত।

বঙ্গীয় কৃষকগণ আজকার মত লাভের বেলা সিকি পয়সাই পাইত বাকি পয়সা আর্ম্মাণীর ধন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। তখন আর্ম্মাণ আড়তদারেরা বেশী মূল্য দিয়া ফুল কিনিত বঙ্গীয় কৃষকের উহাই একমাত্র নগদ আয়ের পন্থা ছিল। কতক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী কারখানার নিমিত্ত তুলাও এই ভাবেই উৎপন্ন হইত। মধ্য ভারতের কৃষকগণের অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না। তারপর আমেরিকার তুলা বাহির হওয়ার পর ভারতের তুলার বাজার বন্ধ হইয়া গেল।

আমাদের কারখানা নাই সুতরাং তুলারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে তুলার প্রয়োজন—গদি, তাকিয়ার জন্য, ইংলণ্ড ফরাসীর দরকার ব্যবসার জন্য, আর্ম্মাণীর দরকার বিস্ফোরকের নিমিত্ত। তিন বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গীয় কৃষক ডাণ্ডি ও ম্যাকেঞ্জারের কারখানাগুলির জন্য রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ডুবিয়া পাট তৈয়ারী করিতেছিল। তাহারা ইহাকেই আপনার বৈষয়িক উন্নতির একটা প্রধান উপায় স্বরূপ মনে করিয়াছিল তাই ভাবিতেও পারে নাই কুসুম ফুলের দশা, তুলার দশা পাটেরও হইতে পারে।

এই ফুল এক সময়ে ৮০।৮৫ টাকায় বিক্রয় হইত। তারপর ১৫।২০ টাকায় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। কেহ এই ফুল গাছের একটা পাতা ছিঁড়িলে রাজদরবারে দণ্ডিত হইত। বঙ্গীয় কৃষক এক একটী করিয়া গাছ খুনিত, ফুল পাকিলে মুটে কৃষকদের একটা মরসুম চলিত। তারপর উহাকে মাড়াইয়া টাকার আকার গোল করিলে কলিকাতার আড়তে পাঠান হইত। ফুলের পরিত্যক্ত তৈলে, কৃষক পরিবারের

রন্ধনাদি কার্য্য হইত। প্রতিবৎসর শীতকালেই এই ফুল জন্মিয়া থাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রকার গাছকে বার্ষিক উদ্ভিদ (annual plant) বলিয়া থাকে।

এই ফুল অল্প বিস্তর এখনও উৎপন্ন হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানবিদগণ আর্থাণীর ন্যায় পরীক্ষা করিয়া লাভালাভ তালমন্দ বুঝিতে পারিবেন। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রং উৎপাদনের কোন উপাদান বা বন্দোবস্ত নাই সেখানে এই রং বিক্রয় হইলেও বেশ সুবিধা হইবে। আর্থাণীর অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে সন্দেহ নাই, কারণ এই সময় দ্রুত পরীক্ষায় ইহার উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে এবং অন্য কারণ আর্থাণ ব্যবসাদারেরা দেশে পৌছাইতে যে খরচ আদায় করিত তাহা হইবে না।

• •
•

৬। বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষণীয় বিষয়

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনের শিল্প জগতের সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি সমূহের কাছে পরিচিত ছিল। ভারতবাসী এশিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে সর্ব্ব পুরাতন। বিভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য হইলেও তাহার শিক্ষনীয় কোন কোন শিল্প বিষয় রহিয়াছে। ভারতের সেই সকল বিষয়ে গুরু হইবার জন্য একমাত্র চীনরাজ্যই উপযুক্ত ছিল। চীন আজও কোন কোন বিষয়ে ভারতের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার ভার লইতে পারে।

চীন ভারতকে সম্মান করিয়াছে। যে যুগে ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা জগৎময় ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই যুগে একমাত্র চীনই ভারতীয় সভ্যতা বিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ অব্দ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের রাজদরবারে ভারতীয় শ্রমণ পণ্ডিতগণই একমাত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া রহিয়াছিলেন। সেই যুগের শিক্ষা-সভ্যতা প্রচারক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চীনকে আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছেন, প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিয়াছেন সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা চীনীয় প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে যত্ন লইতে অবসর পান নাই। চীন তাঁহার শিক্ষনীয় বিষয় সমূহ লইয়া আজও সারা জগতের মধ্যে আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারে। সেই যুগের ভারতীয় সভ্যতা প্রচারক ও পণ্ডিতমণ্ডলী যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন, এইযুগের প্রচারকগণ সেইগুলি সম্পূর্ণ করিয়া তুলুন।

বর্ত্তমান ভারত যেন মনে রাখেন আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধোপকরণ সমূহ আমাদের দেশেও প্রস্তুত হইত। কিন্তু চীনই বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। নাবিকদিগের কম্পাস চীনীয়দিগের আবিষ্কৃত। শিল্প জগতে আমরা প্রাধান্য লাভ করিলেও চীনের কাছে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় অনেকই রহিয়াছে। ভারতবর্ষের হাটে বাজারে গলিতে গলিতে চীনামাটীর বাসন ছড়াইয়া রহিয়াছে। চীনের কাগজশিল্প সভ্যজগতের কাছে এক নূতন জিনিষ। শিল্পজগতে নূতন পথিত সূত্রধরের কাজ আমাদের দেশে ও উন্নত হইলে চীনীয় মিস্ত্রীরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্তব জগতের অধিবাসী আমাদিগকে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, চিনীয় শিল্প শিক্ষা ও চীনীয় প্রণালীতে কর্ম্মশিক্ষা তাহার অন্যতম। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের যেমন চীনে যাইয়া প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান

একটা বড় কাজের মধ্যে ধরা হয়; চীনে যাইয়া চীনীয় বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও আমাদের একটা বড় কাজের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

হিন্দু গৃহস্থের ব্যবহৃত সিন্দূর চীন হইতে আমদানি করা হয়। জার্ম্মানীর খুব ও চীনের সিন্দূর আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে।

এখন আমাদিগকে ভাবিতে হইবে বুঝিতে হইবে পশ্চিম জগতের শিল্প শিক্ষা যেমন জীবনধারণের উপায়, ঘরের কাছে পূর্ব্ব জগতের বিদ্যাও জীবন ধারণের অন্যতম উপায়।

ভারতভূমি যেমন অতীত কাল হইতেই বিভিন্ন ধর্ম্মকে আপনার মধ্যে স্থান দিতে পারিয়াছে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেও আপনার ক্রোড়ে লইয়াছে, ভবিষ্যযুগে জ্ঞানের বিকাশ কালেও তাহার বিভিন্ন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবেই। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ হইতে যাহা কিছু শিক্ষণীয় আছে, ভারতকে তাহাই আয়ত্ত করিতে হইবে। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিনে ভারত পেছনে পড়িয়া না থাকে তাহাই আজ ভাবিয়া, বুঝিয়া, শুনিয়া লইতে হইবে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা—চিন্তনীয় বিষয়। ভারতের মানুষ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ভারতের মাটি উর্ব্বর, ইহা হৃদয়ে অনবরত ধ্বনিত হউক।

* *
*

৭। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যুগ

১৯০৫ সাল হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত যে যুগটা কাটিয়া গেল তাহাতে আমরা ভারতবাসীর বাঙ্গালীর বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি, বিভিন্ন বিষয়ে নাড়াচাড়া, ভাঙ্গাগড়ার ইচ্ছা সবই দেখাইয়াছি। এই যুগ বাঙ্গালীর শক্তির একটা হিসাব লইয়া গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের বিদ্রোহ, দামোদরের প্লাবন ও ত্রিপুরা-বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে, মহান্ সেবা ভাব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দিগের সহিত মিশ্রণ, সাহিত্য সেবার আকাঙ্ক্ষা এইগুলিকেও সামান্য বোধ হইবে সেই যুগে যে যুগ ১৯১৬ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। বাঙ্গালী আজ হয় ত ভাবিতেছেন যাহা করিয়াছেন তাহা বিপুল, যাহা চিন্তা করিয়াছেন তাহা মহান্, অকাট্য,—কিন্তু তাহা নয়। যাহা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। আমাদের জাতির নামে, ধর্ম্মের নামে, পূর্ব্বগৌরবের নামে তাহা অতি ক্ষুদ্র। বিশ্বজগতের কাছে এক কণিকা মাত্র।

ভবিষ্য যুগে শত শত দামোদরের প্লাবন উপস্থিত হইবে, হাজার হাজার নরনারী ত্রিপুরা—বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের ন্যায় প্রাণ দিতে থাকিবে, সত্যের জন্য পদে পদে বিবাদ বিসম্বাদ হইবে—এইগুলি লইয়াই কর্ম্মীর কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। মোট কথা আগামী দশ বর্ষ বাঙ্গালী জাতির এক বিষম যুগ। এইবার আমাদের সাহিত্য চর্চ্চা, রাজনৈতিক আলোচনা, শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা বিরাট ভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। বাঙ্গালী জাতিকে তাহা করিতে হইবেই। আগামী দশ বর্ষই সারা জগতের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার সময় করিয়া দিবে। বাঙ্গালী জীবনের ধারা এই দশ বর্ষেই ঠিক পথ ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। বাঙ্গালী ভারতবাসী দেখিতে পাইবেন তাঁহারা এতদিন যাহা করিয়াছেন তাহারই ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের মন্দির গঠিত হইতেছে।

যেদিন এই যুদ্ধের শেষ হইবে সেই দিন হইতে আমরা ১৯১৬ সালের গণনা ধরিব।

কারণ মহাযুদ্ধের ফলে বিভিন্ন পক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দ্দেশ, ইউরোপীয় যুযুৎসুদিগের মত্ততার পরিবর্ত্তন, দেশ কাল পাত্র হিসাবে শিল্প বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হইবে। বাঙ্গালী জাতিও তাহার উন্নতির জন্য আপন পথ ধরিয়া লইবে। এই দশ বৎসরে বাঙ্গালীর সাহিত্য একটা নূতন পথে চলিবে। লোকের চিন্তাশক্তি পাকা রকমে প্রকাশ না পাইলেও পাকিতে বেশী দিনের অপেক্ষা করিবে না। বাঙ্গালী মাত্রেই সচ্চিন্তা, সদালাপের জন্য ব্যাকুল হইবে। সকলেই আপনার কিছু দেখাইবার জন্য শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের দ্বারা শক্তি অর্জ্জনই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। সমাজের অতি নিভৃত কোণেও ধর্ম্মের শক্তিজাল বিস্তৃত হইয়া সকলকে মানুষ করিয়া তুলিবে। দেশের নরনারী ধর্ম্মের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইলেই পরিপূর্ণ শান্তির দিকে দেশ অগ্রসর হইবে।

আগামী দশ বৎসরে আমরা কতটুকু বড় হইব তাহা অনেকেই এখন ধারণা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ধারণায় মুহূর্ত্তের জন্যও আসিবে না—যাঁহাদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ছায়া মাত্র দেখা যাইতেছে না, যাঁহাদের শিল্পজগতে কোন আসন নাই—যাঁহারা শুধু কাঁচামালের উৎপাদক, সমাজ যাঁহাদের অন্নচিন্তায় চমৎকৃত, মেরুদণ্ড যাঁহাদের ভগ্ন তাঁহারা বড় হইবেন কি ভাবে? আমরা বলিতে চাই মানুষে যাহা করে তাহার মূল্য বেশী নয়, মূল্য হয় মানুষের। সংসার চিরদিনই এই ভাবে পড়িয়া থাকিবে, তাহাকে যে ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিবে সে তাহারই হইবে। এক একজন শক্তিমানের চাপেই সংসার দুলিতে থাকে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের উপর দিয়া তাহারই জয়ধ্বনি ধ্বনিত হয়। সংসার জড়—মানুষ চেতন। সুতরাং শিল্পজগতের কোন বাহাদুরীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের ছাপ না দেখিয়াও জাতিকে ভাল বাসিয়া যাও, আর বিশেষরূপে লক্ষ্য কর বিগত দশ বৎসরের ভিতর মনুষ্যত্বের নামে, ধর্ম্মের নামে শক্তির পূজা ভারতবাসিগণ কিছু করিয়াছেন কি না? আমাদের পিতৃপিতামহের সঞ্চালিত রক্ত স্রোত আমাদের দ্বারা পবিত্র রহিবে কিনা, আমরা মানুষ, জগৎ একথা স্বীকার করিবে কিনা।

মানুষ মাত্রেই, জাতি মাত্রেই প্রথম শ্রেণীর গুণনিচয় লইয়া জন্মে না। অপরকে বড় ভাবিবার সময় নিজের দিকেও তাকাইতে হইবে—আমি জড় সংসার নই আমি চেতন-মানুষ। শিল্প-বিজ্ঞান আমারই চিন্তার ফল। আজকার ভাব বা চরিত্র উন্নত হইয়া মাপকাঠির জন্য কাল অপেক্ষা করিবে না। একমাত্র জড়ই মাপকাঠির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, মানুষ কখনও মাপকাঠির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

বিগত দশ বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভারতবাসী যে অবস্থায় ছিলেন, বিগত দশ বৎসরে তাহা অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন কিনা, এবং পূর্ব্বের তুলনায় মাপকাঠির মধ্যে আছেন কিনা এইটুকু আগে দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে বিগত দশ বৎসরের অপেক্ষা আগামী দশ বৎসরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাঙ্গালী ভারতবাসীর এক নূতন ভাবের পরিচয় হইবে। কোন শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কার না দেখিয়াও তাহাকে বড় বলিয়া বোধ হইবে। তাহার দ্বারা যদি জগৎ কিছু লাভ করে হয়ত উহাই এই শতাব্দীর বিশেষ

গৌরব হইবে তাহা হইলেই কি কম কথা? আগামী দশ বৎসরে যাহারা বাঙ্গলা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিতে বড় দেখিতে চাহেন তাঁহারা বিগত অধ্যায়টী আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লউন, নতুবা আগু হইতে বাধা পড়িবে।

* * *

যুদ্ধের পর আমাদের বৈষয়িক অবস্থা।

যুদ্ধের শেষে বাণিজ্য ব্যাপারে কাহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা যে সকলেই কিছু কিছু না ভাবিতেছেন এমন নহে। আমরা যুদ্ধের পরের কথা আলোচনা করিতেছি—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধির নিমিত্ত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, জগদ্ব্যাপ্ত বাণিজ্য-নীতি আলোচনা করার আপাততঃ আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

যুদ্ধের পর বাণিজ্য ব্যাপারে বর্ত্তমান বাণিজ্যকুশল জাতিমাত্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। তখন অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের লক্ষ্যের মধ্যে দাঁড়াইবে। যাহারা এ যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হয় নাই তাহারাও দু'পয়সা হাতে করিতে আসা যাওয়া করিবে। সমস্ত পৃথিবীটা বাণিজ্যের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত হইবে। মোটের উপর এই যুদ্ধে পৃথিবীর যদি কোন অংশে "ঘা," নাও পড়ে পরে বাণিজ্য-সংগ্রামে সে আর বাদ যাইবে না।

ইংরেজ-ফরাসীর বিপরীত পক্ষের শিল্প দ্রব্য ভারতবাসী যতটা কিনে ততটা অন্যের নিকট হইতে নহে এটা ঠিক। জার্ম্মাণী আমাদের বাজার যে সব জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিতে পারে নাই বা করে নাই অষ্ট্রীয়ানগণ তাহা করিয়াছিল। পুনরায় যে সময় আমরা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার শিল্পাদি লইতে থাকিব সে সময়ে যদি এদিকে বৈদেশিক দ্রব্যের উপর বিশেষতঃ জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান শিল্পের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় কর ধার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা যতটুকু সুবিধা ভোগ করিতেছি তাহার চতুর্গুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিব। সুচ অবধি না কিনিলে চলিবে না, অথচ শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া আমাদের প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়াছে। অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক ধার্য্য হইলেও তাহারা পিছু হইবে না—মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবে। আজ ২ বৎসর যাবৎ উপায় দেখাইতে কেহ ত্রুটি করেন নাই। আমরা দেখিতেছি যদি ভবিষ্যৎ আমাদের এই রকমই হয় তাহা হইলে "নাকের জলে চোখের জলে" এক হইবে। দরিদ্র ভারতবাসীরা নিজেই দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি সুতরাং শ্রমজীবিগণ আর দাঁড়াইতে পারিবে না। তাহাদের অর্থ আমরা ভোগ করিতেছি, আমরাও দাঁড়াইতে পারিব না। এখন দেখিতেছি অশিক্ষিত ও রক্ষণে অক্ষম শ্রমজীবিগণের অর্থ যাহাদের কাছে রক্ষিত তাঁহাদেরই এখন সাড়া দেওয়ার সময়। তাঁহারাই এদেশের লক্ষপতি ক্রোড়পতি—বর্ত্তমান যুগ, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদেরই শক্তির অপেক্ষা করিতেছে।

যে সময় জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য আপনার শক্তিকে এক বিরাট দেহে রক্ষিত করিতেছিল, আধুনিক জাপানীদিগের প্রায় সেই সময়েই পরিবর্ত্তনের যুগ। এক কথায় সেই সময়টা বর্ত্তমান উন্নতিমুখী জাতিসমূহের উন্নতিরই আকাঙ্ক্ষা দিয়াছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী শিল্পের ধ্বংসের জন্য যখন আমেরিকার ব্যবসায়িগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, জাপান ধ্বংস করিতেও ত্রুটিত ছিল না সেই সময় জাপানের সওদাগরগণ তাহাদের

সম্পত্তি মিকাডোর কাছে দান করিয়াছিল। তাহাদের অর্থ সরকারে গৃহীত হয় নাই। তাহাদের পরামর্শে ও তাহাদের ত্যাগের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই নব্য জাপানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পণ্ডিতমণ্ডলী বিদেশ হইতে মানুষ হইয়া আসিলেন। আজ জাপানের শিল্প আমেরিকার শিল্পজগতকে চুরমার করিতে ব্যস্ত। পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বের জাপানীদিগের অবস্থার নীচে আছি। জাপানীদিগের তবুও কিছু ছিল। তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও শিল্পজগতের কাজ এ অবস্থায়ও চলিতে পারে।

বিদেশী কৃতবিদ্য ছাত্র আমাদের যথেষ্ট আছেন, কাজের অভাবে তাঁহারা দেশের জাতের ধরণেই চলিতেছেন। সমাজের একজনেই সকল কাজ করে না। তাঁহারা সম্মুখে আগু হইতে প্রস্তুত, তাঁহাদের পশ্চাতে শক্তি চাই। ব্যবসা সম্বন্ধে তখনকার জাপানীদিগের অবস্থায় আমরা এখন আছি কিন্তু জাপানীদিগের প্রাথমিক অবস্থার কাজ আমরা অনেক পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি।

এদেশের লক্ষপতি ক্রোড়পতিগণ যাহাকে রক্ষণ মনে করিতেছেন তাহাতেই বিনাশ। দেশের লোক যে অর্থের কণিকা পাইয়া ধন্য হইবে ধনীর ধন তাহাতেই সার্থক হইবে। সোটা কতক কারখানা উঠিয়া গেল বলিয়া মনে করিলে চলিবে না এদেশের লোক অকর্ম্মণ্য। একটা শিল্পের পরীক্ষা করিতে তাহাকে বাজারে পছন্দ সই করাইতে ২।১ দিনে হয় না। ২।১টা পেন্সিল বা দেশালাইয়ের কারখানাই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া দিবে না। অভাব বহু, চিন্তা কম, সঙ্গে সঙ্গে পন্থাও রুদ্ধ। যদি এখনও ঠিক উপলব্ধি না হয়, আমরা যে ভিটা মাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিব তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জার্ম্মাণ, অষ্ট্রীয়া, জাপান, আমেরিকা ও পোলাণ্ড অবধি আমাদের রক্ত শোষণ করিতে থাকিবে। তাহারা ভ্যাম্পায়ারের মত আরও ভালবাসা দিয়া সর্ব্বনাশ করিতে আর বেশী দিন দেরী করিবে না। সমানে অসমানে ভালবাসা হয় না। ব্যবসায়ে আমরা রুগ্ন তাহারা মুক্ত, আমরা ভগ্ন তাহারা পুষ্ট, আমরা পরমুখাপেক্ষী তাহারা স্বাধীনজীবী।

যুদ্ধের শান্তি হইলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কোথায় পৌঁছিবে তাহা কি কেহ ধারণা করেন নাই? ধনী সম্প্রদায় এখনই আগুহউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া লউন, প্রকৃত বিদ্বান-বুদ্ধিমান ক্ষুদ্রস্বার্থত্যাগী ব্যক্তির উপর আপনার বিশ্বাস স্থাপন করুন আমরা সর্ব্বত্র যোগ্যতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। আপাততঃ ব্যবসা নিপুণ জাতিসমূহের সহায়তা গ্রহণে যেন ত্রুটী না হয়। বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্যই চেষ্টা করা হউক। উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া অর্থ দান করা উচিত। এক একটী দিন চলিয়া যাইতেছে আর ভবিষ্যতের বিরাট দশন মূর্ত্তি আগু হইয়া আসিতেছে। আর কিছু দিন পর দেশের লোক বুঝিতে পারিবে যাহা রক্ষণ তাহাই বিনাশ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের জাপানী স্বভাব পরিবর্ত্তিত হউক বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা।

* * *

বঙ্গের বাহিরে মাতৃভাষার অর্চ্চনা

আমরা দেখিতেছি আমাদের মাতৃভাষার প্রচার জন্য উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত এবং জেরাদুন হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত

প্রায় প্রসিদ্ধ স্থানগুলিই বাঙ্গালা ভাষার প্রচারভূমি হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী হইবে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি যাহারা বঙ্গের বাহিরে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রচার করিতেছেন তাঁহারাও এই যুগের শিক্ষাপ্রচারক। তাঁহাদের পরিষদ গুলি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইবে নিশ্চয়। আমাদের মাতৃভাষা যারাই হয়ত একদিন সমস্ত দেশ মুখরিত হইবে। সে কথা আজ যুক্তি তর্কের ভিতরে নিহিত থাকিতে পারে, এবং সমস্ত দেশ বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে বিলম্বিও করিতে পারে। আমাদের মাতৃ-ভাষাই হয়ত একদিন ভারতের ভাষা সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রতিনিধি হইয়া এশিয়া মহাদেশের ফরাসী ভাষায় পরিণত হইবে। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যপ্রচারক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য ও ভাষা প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ভারত জননীর সমস্ত পণ্ডিত সন্তানগণ যে তাহাকে আপনাদের করিতে বদ্ধ পরিকর হইবেন সে আশা করিতে পারি।

রঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিগণ ভারতজননীকে নানাভাবে সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা আমাদেরই পিতৃ পিতামহের ভারতবিজয় গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহাদের সাহস, বিদ্যা-বুদ্ধিকে শতভাবে ঐক্যিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়-কলিঙ্গ, বাঙ্গালা-হিন্দুস্থান-পঞ্জাব কোন দেশেরই চিত্রই বাদ যায় নাই। বাঙ্গলার সংসার ভারতীয় ঐতিহাসিক স্তোত্রে মুখরিত; বাঙ্গলার শিশু সন্তান ভারতীয় চিত্র দর্শনে প্রথম দ্রষ্টা।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মীরাট শাখার সভাপতি মাতৃভাষার সেবক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যা বিনোদ, বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কার্য্যবিবরণী পাঠাইয়াছেন আমরা তাহাতে মাতৃভাষার সেবকগণের ভক্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে মীরাট সাহিত্য-পরিষদ ক্রমেই উন্নতির দিকে চলিতেছে। এইরূপ কিছু দিন চলিলে আমরা বোধ হয় আশা করিতে পারি উত্তর ভারতের মধ্যাংশ মীরাট সাহিত্য-পরিষদের দ্বারাই দীক্ষিত হইবে। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে ওরা বৈশাখ অধিবেশনে "হিমালয় দর্শনে" শীর্ষক একটী কবিতা এবং "বোপদেব গোস্বামীর জীবন"—সম্বন্ধে একটি তথ্য বহুল প্রবন্ধ পঠিত হয় এই মাত্র ছিল। বিশেষতঃ ঐ অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ বাবুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবুর জীবনী আলোচনাই উক্ত অধিবেশনের প্রধান বিষয় ছিল।

* *
*

১০। পণ্ডিত রজনীকান্ত

৺পণ্ডিত রজনীকান্তকে আমরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে, প্রত্নতত্ত্ববিদের সভায়, সুপণ্ডিতের আসরে, রসিক পুরুষদের বৈঠকে আর দেখিতে পাইব না।

৺ পণ্ডিত রজনীকান্ত মালদহের অধিবাসী না হইলেও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র মালদহে, তাঁহার শেষ পরিণতিও মালদহে। জন্মস্থানে কিছু আসে যায় না! তিনি মালদহকে কতটুকু ভালবাসিয়াছেন, মালদহ তাঁহার জন্য আপনার বুকের উপর কতটা অধিকার দিয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহাকে মালদহের পণ্ডিত বলিলেই বুঝিয়া লইতে পারি।

মানুষ মাত্রেই যশঃ চায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত ও চাহিতেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় অর্থগৃধ্নু বলিলে যাহা বুঝায় তিনি সে ভাবের যশোলিপ্সু ছিলেন না। তারপর সাহিত্যিক যাহার দ্বারা সমাজে পরিচয় লাভ করেন তিনি সেরূপ কোন কাব্য বা উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি গ্রন্থরচনা করিয়াছেন তাহা রংপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তি। দরিদ্র সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিকের গ্রন্থ "সুপ্তগৌড় লুপ্তগৌড়ের" সঙ্গে ধীরে মিশিয়া যাইতে থাকিলেও অন্ততঃ তাহার এক পংক্তিও "অভিশপ্ত দেশে"র ললাটে বাঁধা থাকিবেই। ঐতিহাসিকগণ দেখিতে পাইবেন উহার একদিকে বিস্তৃত মহানগরীর যশঃসম্ভার অন্যদিকে পণ্ডিতপ্রবরের দুঃখস্মৃতি, মাঝখানে একটা অক্ষয় প্রীতিরেখা রহিয়াছে।

সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মালদহের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়কেই তাঁহার সাহায্যকারী পাইয়াছিলেন। ৺ পণ্ডিত মহাশয় কোন দিন কাহারও সঙ্গে দেখা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন নাই। নিজের ভাবেই তিনি সর্ব্বদা আপনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাহারা আলাপ করিতে চাহিত তাহারা কেহই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। কেহ আহ্বান করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও পণ্ডিত মহাশয়, একটা পুরা জীবনে যে বইগুলি পড়িয়া শেষ করা কঠিন তাহা শেষ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" ইহা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি। তিনি অন্যের (ঐতিহাসিকের) মতামত সাধারণের কাছে প্রচার করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন নাই অন্যকেও সে দিকে টানেন নাই। কথাপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতেন মাত্র।

প্রাচীন গৌড়ের সাহিত্য-ক্ষেত্রের যোগী, পশুপতি, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম শুনিতে পাই, আর আমাদের জীবনে আমাদের মধ্যে বিরল গৌড়ের স্মৃতিরঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়কেই পাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অগাধ জ্ঞানের সামান্যই দান করিয়াছেন। কেহ তাহা আদায় করিবার জন্য আগ্রহান্বিতও হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নব্য মালদহের বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় কিছুদিনের জন্য তাঁহার লিখিত চিন্তার প্রস্রবণ ব্যতীত উত্তরাধিকারীসূত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে আর কিছুরই ধারা বহাইতে পারিবেন না। বসুধা রত্নপ্রসবিণী, কত জন্মিতেছে, জন্মিবে, পণ্ডিত রজনীকান্তের আগেও লোক ছিল পরেও হয়ত কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবে মালদহ গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য সে আসন যে খালি থাকিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়। মালদহের বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুভব করিবেন। কারণ তাঁহাদেরই জীবনকালে মালদহের সাহিত্যক্ষেত্র শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন সাহিত্যসেবীর অভ্যুত্থান না হয় সে পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত আত্মার সম্মানের জন্য তর্পণ হউক। মালদহের সাহিত্যসমাজের জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের আবার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা চলুক।

* * *

১১। দেশীয় পত্রিকার প্রকৃতি

জন সাধারণের অবস্থা জানিবার জন্য কোন সরকারী বিবরণীর দরকার হয় না। দেশের

লোক কি ভাবে আছে, তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ কত তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। সরকারী বিবরণীর পরিবর্ত্তে আমরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিব দেশের লোক কি চায়, তাহাদের কণ্ঠস্বরে কোন সুর অহরহ বাজিতেছে।

সংবাদপত্রগুলির যে সকল স্থান বিজ্ঞাপনের দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহার পৌণে ষোলআনাই ব্যাধির ঔষধের, বাকি কয়টী অন্যান্য রকম ব্যবসার। সংবাদপত্রের কোন স্থানে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই দেশীয় কোন শিল্পালয় বা কোন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

নানা প্রকার ঔষধ—কবিরাজী, পেটেন্ট, মুষ্টিযোগ, বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা পুস্তক, এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিছুই বাদ যায় নাই।

গড়ে এক একটী ঔষধের অন্ততঃ ৩।৪ টী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন খরচ, তাহাদের নিত্য খরচ, দোকান ভাড়া ও লোকের মাহিনা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় দেশের লোক কি ভাবে আছে; কি ভাবে তাহারা মরিয়া বাঁচিয়া দুর্ব্বিসহ জীবন বহন করিতেছে। সকল ব্যাধির মধ্যে ম্যালেরিয়ার দ্বারাই যে তাহারা অধিকতর আক্রান্ত তাহা উহাতেই বেশ বুঝা যায়। কত রকম ঔষধ দেখা দিতেছে, কত বিভিন্ন চিত্তা শক্তি লইয়া ঔষধ বিক্রেতা দেখা দিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নহে। হইবে না তাহারও কারণ আছে। একে অভিশপ্ত দেশ ব্যাধিদ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, রোগ-শোক শত রকমে জর্জ্জরিত করিয়া দিতেছে। তারপর যাহারা ঔষধ প্রস্তুত কারক তাহারা অধিকাংশই উপায়হীন অসময়ে গৃহস্থ। এ শোকভার দূর করিতে গেলে যে নূতন ধন্বন্তরীর প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রগুলিতে দেখা যাইবে ঔষধের বিজ্ঞাপনের ধারা ব্যাধির ধারা ক্রমেই খরস্রোতা। বিভিন্ন দেশের লোক আপনাদের উন্নতির পরিচয় দিতেছে আপনাদের রুচির দ্বারা আমরা রুচির পরিচয় দেই ঔষধে। তারপর আরও দেখা যায় যে বিদেশে ঔষধ প্রস্তুত হয় সেগুলি যেন আমাদেরই জন্য। ভারতবর্ষের বাজারগুলি দেশী বিলাতী ঔষধের গুদাম, দেশী ও বিলাতী ব্যবসাদারদের মিলন স্থান। বিদেশের যে কোন সাজ সরঞ্জাম ভারতবর্ষের জন্যই আবিষ্কৃত হয়।

পৃথিবীর এক এক দেশের এক এক বিষয়ে বিশেষত্ব থাকিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বজায় রহিয়া গেল ঔষধ সেবনে। ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রগুলিকে ব্যাধির ইতিহাসও (History of diseases) বলা যাইতে পারে। শরীর-বিজ্ঞান ও রোগ নিদান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের যে কোন পরিবারকে শিক্ষালয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এইরূপে ব্যাধির ক্রম প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। নিজ জীবন পরিবার রক্ষার উপায় সকলকেই করিতে হয়। কিন্তু শত দৈন্যের মধ্যে ভাবার সময় যে নাই।

১২। হিন্দুর ভবিষ্যৎ সংসার

আমাদের মনে হয় আজকার দিনের হিন্দুর সংসার ভবিষ্যতে আর এ রকম থাকিবে না। আজকার দিনের হিন্দু ও ভবিষ্যতের হিন্দুতে কতটা পার্থক্য হইবে তাহা ভাবিতেই আমরা পুলকিত হইতেছি। সেই ধারণা যে দিন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হইবে, সেই ভাবনাতে যখন হিন্দু সমাজ তন্ময় হইবে তখন হিন্দুর ভবিষ্যৎ যুগের নূতন কিরণ সম্পাতে পৃথিবীও উজ্জ্বল হইবে। আজ হিন্দু আপনাকে বুঝিয়াছেন বুঝিতে চলিয়াছেন ইহাতে চলিবে না, তাহার সমাজ বড়, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান গূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার লক্ষ্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, দূরে অতিদূরে, তাহার আশা বিপুল, সাধারণ মানুষের ধারণার অতীত সুতরাং তাহার ধ্যান ধারণা ক্ষণস্থায়ী হইলে চলিবে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা যে দিন তাহার প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনকে

প্রবুদ্ধ করিতে পারিবে সেই দিন আমরা আবার খাঁটী হিন্দুর সংসার দেখিতে পাইব। প্রত্যেক হিন্দুকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে আমার সংসার আমার সমাজ আমিই ভাঙ্গিব আবার আমিই গড়িব। সত্যের জন্য প্রাণ দান, তুচ্ছ ভয় ভাবনা মায়া মোহ পরিত্যাগ, সকল প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের শক্তির ব্যবহার, আপনাকে জাত মানের গৌরবে গৌরবান্বিত আপনার ধর্ম্ম সমাজ রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিলে মোটের উপর নিজস্ব রক্ষা করিতে হইলে যে সব গুণ ও শক্তির প্রয়োজন যাহা দ্বারা মানুষ মানুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করে সেই সব প্রতি হিন্দুর চরিত্রে, হিন্দুর শয়নে স্বপনে ভাবনার বিষয় হওয়া চাই। যাহার নাই তাহাকে দান করা, যাহার কিছু আছে তাহার নিকট হইতে মাগিয়া লওয়াই প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার্থীর কাজ। যাহা থাকার সম্ভব, যাহাকে না পাইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, হিন্দুত্ব, আত্মবোধ জাগিবে না তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা। তাহার কর্ম্মের প্রতি ভক্তি তাহার চরিত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলেই সব হইবে— আপনার চরিত্র বড় হইবে।

হিন্দুর চরিত্র হিন্দুর সংসার সমাজ বড় হইলে আমরা দেখিতে পাইব হিন্দু সন্তানের জননী চিন্তাশীলা হইয়াছেন, জগৎ গৌরব সন্তান তাহাদের পুণ্যের ফলে লাভ হইয়াছে, পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ ফল লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, ব্যাধির ছায়া মাত্র আর কোথাও দেখা যাইবে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ, দম্ভ, বৃথা দর্প প্রভৃতি যাহা হীনচরিত্রের লক্ষণ তাহার পরিবর্ত্তে সাহস, সংযম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গভীর গুণনিচয় দৃষ্ট হইবে। শিক্ষা দীক্ষা জননীর দ্বারাই প্রচারিত হইবে। ভবিষ্যৎ হিন্দু পরিবারের জ্ঞান আহরণই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। বর্ত্তমান অর্থ চিন্তা জর্জ্জরিত হিন্দু সমাজ অর্থের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া সুস্থ সবল ও সচ্চিন্তান্বিত হইবে। আমাদের সমাজ সেবাধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া হিন্দু গৃহস্থকে ত্যাগের দিকে লইয়া যাইবে। দরিদ্র নারায়ণের সেবা, দেব মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা, কৃষির উন্নতি বিধান, দোল-দুর্গোৎসব, বার মাসে তের পর্ব্ব যাহা হীনতায় হীন হইয়াছে সেই গুলি আবার গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে। শিল্পশিক্ষা বিলাসবাসনা চরিতার্থের কারণ না হইয়া এক নূতন ভাবে জ্ঞানের পরিচয় দিবে। সকল জ্ঞানের আধার প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সমাজ রক্ষক হিন্দু স্বামী অবশ্যই দেখা দিবেন।

হিন্দু পরিবার লক্ষ্য করিলে, তবেই আমাদের সমাজ উন্নতি, তবেই আমাদের সাধনা এক অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় সত্তা ধারণায় দাঁড়াইবে। হিন্দু সেই দিনই হিন্দু হইবেন। যতক্ষণ ব্যাধি দৈন্যের দ্বারা কবলিত, অভাবের তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান, লোভে মোহে আচ্ছন্ন, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হীন, ততক্ষণ হিন্দুর অস্তিত্ব কোথায়?

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পুণ্ড্র শব্দের ব্যুৎপত্তি

পুণ্ড্র শব্দ জাতিবাচক

যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিবাচক শব্দ, তদ্রূপ পুণ্ড্র জাতিবাচক শব্দ। পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় জাতি যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বাস করিত সেই দেশের নামটি পর্য্যন্ত 'পুণ্ড্রদেশ' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পুণ্ড্র জাতির বাস নিবন্ধন সেই দেশটীকে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। কালক্রমে ঐ দেশ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত হয়; এবং পুণ্ড্র দেশের রাজধানীর নাম 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' হয়। এক সময় বর্ত্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক ভূভাগ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' নগরী ছিল।

পুণ্ড্রজনপদের উৎপত্তি

হিন্দুশাস্ত্রে পুণ্ড্রদেশ সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে। যে সময়ে বঙ্গদেশ অনার্য্য নিবাস ছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই সময়ে 'বলী' নামক ক্ষত্রিয় রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র 'পুণ্ড্র' আত্মীয় স্বজনগণ সহ বঙ্গদেশের যে ভূখণ্ডে বাস করেন সেই দেশের নাম 'পুণ্ড্রভূমি' বা 'পুণ্ড্রদেশ'।

পুরাণ শাস্ত্র মতে 'পুণ্ড্র', এই পুণ্ড্রদেশ স্থাপন পূর্ব্বক, তথায় রাজ্যশাসন করেন। পুণ্ড্র বংশধরগণ ও তাঁহার জাতিগণ 'পুণ্ড্র-জাতি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ—দ্বিজ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ।

সেই সময় হইতে বঙ্গের অন্তর্গত পুণ্ড্রদেশ বঙ্গীয় ভূমি হইয়া আর্য্যনিবাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। অনার্য্য নিবাস জনিত পতিত ভূমি, বঙ্গীয় দেশে উদ্ভূত হয়। মনু-শাসনে যে ভূমি অনার্য্য দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং যথায় তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান ছিল, সেই দেশই তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আর্য্যনিবাস এবং বঙ্গীয় ভূমি হইয়া 'পতিত' আখ্যা হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

পুণ্ড্রজাতি বালেয় ক্ষত্রিয়

এই বঙ্গীয় আর্য্যভূমি পুণ্ড্রদেশবাসী 'বালেয় ক্ষত্রিয়'দিগকে ভারতের আর্য্যগণ 'পুণ্ড্র-ক্ষত্রিয়' বলিতেন, এবং তাহাদের আদি নিবাস ভূমিকে পুণ্ড্র-দেশ বলিয়া অবগত ছিলেন।

অঙ্গো, বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতাভুবি॥"

(ভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪।৫০)

"মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়া মাস পঞ্চবংশ করাণ ভুবি॥
অঙ্গ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গ সুহ্ম তথৈবচ।
পুণ্ড্র কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে॥"

(হরিবংশ ৩১।৩৩—৩৪)

ভারত ও হরিবংশ মধ্যে বালেয় ক্ষত্রিয় পক্ষের বিবরণ দেখিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক বালেয় ক্ষত্রিয়গণ এক ক্ষত্রিয় বংশের বিভিন্ন শাখা মাত্র, এবং তাঁহারা প্রথমে

যে যে ভূভাগ শাসন করিতেন, সেই সেই ভূভাগ তাঁহাদের নামানুসারে বিখ্যাত হয়।

'পুণ্ড্র' প্রথমে এক জন ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল, তাঁহার শাসিত রাজ্য 'পুণ্ড্র-দেশ' নামে খ্যাত হয়, এবং তদ্দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ পুণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয়।

পুণ্ড্রী বা পুণ্ডরী জনপদবাসীর সাধারণ উপাধি

পুণ্ড্রদেশের অপর সাধারণ জনগণ, পুণ্ড্র-দেশবাসী বা পুণ্ড্রজনপদবাসী বলিয়া উক্ত হইতে পারে। এই হিসাবে মিথিলার জন-গণকে মৈথিলী, উৎকলের অধিবাসীকে উৎকলী, বঙ্গের অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলা হয়। সুতরাং পুণ্ড্রদেশের সাধারণ জনগণকে সমষ্টিগত ভাবে 'পুণ্ড্রী' বা 'পুণ্ডরী' বলাও যাইতে পারে।

এই হিসাবে 'পুণ্ড্র' একব্যক্তির নাম, জনপদের নাম এবং জনপদবাসীর নামও হইতে পারে; পুণ্ড্রের বংশধরগণ পুণ্ড্রবংশ বা পুণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁহাদের বাসভূমি পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্ররাষ্ট্র।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি

কালক্রমে পুণ্ড্রদেশ 'ভুক্তি' রূপেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পাল ও সেন রাজগণের সময়ের তাম্রশাসন-পট্টে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির উল্লেখ দৃষ্টে ইহাই মনে হয়। 'গৌড়' নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির সীমা মধ্যে ছিল। বিক্রম-পুর পর্য্যন্ত একদা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যান্তঃপাতী ছিল।

পুণ্ড্র শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ তাহা হইলে হইতেছে—পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় বংশ এবং জনপদগত সাধারণ উপাধি।

পুণ্ড্রক—পুণ্ড্র

'পুণ্ড্র' ও 'পুণ্ড্রক' অর্থে তিলক, সম্প্রদায় গত বিভিন্ন প্রকার 'পুণ্ড্রক' দৃষ্ট হয়। তিলকের বর্ণ ও চিহ্ন দর্শনে, পুণ্ড্রকধারী কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা অতি সহ-জেই অবগত হওয়া যায়।

ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি তিলকে নাম দৃষ্ট হয়। তিলকধারী ব্যক্তিকে পুণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রক বলা যায়।

পুণ্ড্র জাতি এই প্রকারের কোন বিশিষ্ট ধরণের 'পুণ্ড্র' ললাটে অঙ্কিত করিত কি না বলা যায় না। প্রাচীন কালে 'তিলক-ব্যবচ্ছেদ' বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। চৌষট্টি বিদ্যার মধ্যে ইহা অন্যতম। অতি প্রাচীন কালে প্রথমে শোভার জন্য তিলক ধারণ করা হইত।

পুণ্ডরীক

অর্থে পদ্মকে বুঝায়। পুণ্ড্রদেশজাত পদ্মকে পুণ্ডরীক বলিত কি না বলা যায় না। পুণ্ডরীক পুষ্পপত্রের আকারের তিলককে প্রথমে 'পুণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্রক' বলিত কি না তাহাও বলা যায় না।

পুণ্ডরীকাক্ষ

পদ্ম-পুষ্প-পত্রের ন্যায় যাহার অক্ষ বা চক্ষু। ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

পুণ্ড্র-ইক্ষু বা পুণ্ড্রেক্ষু

পুণ্ড্রদেশজাত ইক্ষু, চলিত কথায় 'পুঁড়ী-আক' বলে। ইহা দ্বারা মনে হয় পুণ্ড্র দেশে প্রাচীন কালে এক জাতীয় ইক্ষুর কৃষি ছিল।

বৈশ্বামিত্র পুণ্ড্র—দস্যু

বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশটির বংশধরগণ 'অন্ত্যজ' হইয়াছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বৃত্তান্ত আছে।

নন্দিনীক্ষেণজ পৌণ্ড্র—ম্লেচ্ছ

ঋষি বিশ্বামিত্রের নন্দিনী গাভী ছিল, সেই গাভীর ক্ষেণ হইতে পৌণ্ড্র—ম্লেচ্ছের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুণ্ড্র জাতির বিভিন্ন কেন্দ্র

কালক্রমে পুণ্ড্রদেশ কখন আকারে বৃহৎ কখন বা ক্ষুদ্র হইয়াছিল। কাল সহকারে পুণ্ড্রাস্ত ভূভাগ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিভিন্ন শাসনে শাসিত হইয়াছে।

পুণ্ড্র জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বা বিবিধ কারণে পুণ্ড্র জনপদের বহির্ভাগে পুণ্ড্রগণকে বসবাসে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই প্রকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস নিবন্ধন পুণ্ড্র জাতির নামান্তর গ্রহণ বিচিত্র নহে। বংশ পরম্পরায় তাহারা তাহাদের আদি স্থানের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

কাল সহকারে মূল কেন্দ্র হইতে এবং স্বজাতিগণের মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবিধ উপায়ে জীবন যাপন ব্যপদেশে তাহাদের জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে।

ভারতের বহু ধর্ম্মের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া এই জাতি মূল ধর্ম্ম কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন যে হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। পুণ্ড্র জাতির আদি বৈদিক ধর্ম্ম কাল সহায়ে ভারতের অপরাপর জাতির ন্যায় ম্লান হইয়াও গিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন তাহাদের জাতীয় ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষার ক্রম পরিবর্ত্তন কালসহকারে হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। একই জাতিকে এই কারণে বিভিন্ন কথিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে শুনা যায়। পুণ্ড্রজাতিও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন ভাষা ভাষী হইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা-বাসী পুণ্ড্রগণ এই কারণে অন্যান্য জেলায় কথিত ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন তত্তৎ জেলার রীতিনীতি, আচারব্যবহার হাবভাব তাহাদের মধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিভিন্ন সমাজের গঠন করিয়াছে। মূল সমাজ বন্ধন হইতে এই কারণে তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া, বসবাস করিতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাসনকালে সমাজ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু, মোসলেম ও ইংরাজ শাসনের ফলে সমাজের মধ্যে যে সাড়া পড়ে, তাহারই ফল বর্ত্তমান কালে উপলব্ধি হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে পুণ্ড্রী সমাজশাসন, সম্ভবতঃ এই কারণে বিভিন্ন কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং পুণ্ড্র সমাজ, বিভিন্ন স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে দৃষ্ট হইবে।

মূল বৈদিক ধর্ম্ম যদ্রূপ সকল সমাজেই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া বহু উপধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, পুণ্ড্র সমাজের ধর্ম্মও তদ্রূপ

পরিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ ধর্ম্মাচরণের মিশ্রণে নূতনত্ব লাভ করিয়াছে।

যে কারণে মৌলিক জাতির বিবিধ শাখার মধ্যে বিভিন্ন দেশাচার কুলাচার ও ধর্ম্মাচরণের সমাবেশ দ্বারা এবং বৃত্তি জনিত কর্ম্ম দ্বারা অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই কারণ নিচয় এই জাতির মধ্যে বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভব।

একই জাতিকে বিভিন্ন ভূভাগে বাসনিবন্ধন যেমন সেই সেই দেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং সেই সেই দেশবাসীর পরিচয়ার্থ যে উপাধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্ড্রজাতিও সেই একই কারণে বিভিন্ন দেশোপাধি দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছে।

রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উৎকলী প্রভৃতি আখ্যা তত্তৎ দেশে বাস নিবন্ধনই হইয়া থাকে। মূলে তাহাদের জাতিগত ঐক্য ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান রহিয়া যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগ স্থানগত, জাতিগত নহে। জাতি এক হইলেও দেশজ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। কালক্রমে একই জাতীয় সমাজ, দেশ ভেদে পৃথক সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে, এবং এক এক সমাজের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাঢ়ীয় সমাজ, বারেন্দ্র বা উৎকলী সমাজের সহিত, কালক্রমে, দেশক্রমে, পৃথক হইয়াছে বলিয়া, উক্ত সমাজগুলির মধ্যে ছোট বড় ভাব আসিয়া উঠে। সমাজে সমাজে একতার চিহ্ন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহারা যে আদিতে একজাতি এক ধর্ম্মী ও এক সমাজে অবস্থান করিত, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়া পৃথক জাতি বলিয়াই বিবেচনা করে।

এই প্রকারে একই জাতির বিভিন্ন সমাজের গঠন করিয়া পৃথক পৃথক বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করে, এবং পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া, ক্ষুদ্র বেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জাতীয় শক্তির খর্ব্বতা সাধন করে।

এই প্রকারে পুণ্ড্রদেশবাসী পুণ্ড্রগণ, কাল সহকারে বিভিন্ন পৃথক সমাজের বিকাশ দ্বারা জাতীয় একতার বল খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই উপায়ে পুণ্ড্রজাতির বিভিন্ন সমাজ গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিভিন্ন পুণ্ড্র-সমাজের মধ্যে আদৌ সহানুভূতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাহারা যেন পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক সমাজগত পুণ্ড্রগণ, আপন আপন সমাজ যে অন্য সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, রীতি ও আচারগত ভাবে সমাজগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও তাহারা আপন আপন সমাজে যে শ্রেষ্ঠ ইহা মানিয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে তাহাদের মৌলিকত্ব রক্ষা হইতেই পারে না।

এ সমাজ বড় বা কুলীন ও সমাজ ছোট বা অকুলীন বোধ করা কোন সামাজিকের উচিত নহে। আপন আপন সমাজে ছোট বড় ভাব কার্য্য কারণ দ্বারা বিধিবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু অমুক পুণ্ড্রসমাজ, অমুক পুণ্ড্রসমাজ হইতে নীচ বা উচ্চ ভাবা দোষাবহ। ইহাই জাতীয় মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার একমাত্র অন্তরায়।

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ মধ্যে বহু সমাজ-কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা দেশের প্রকৃতিজাত। মূল জাতিগত নহে। সমাজে সমাজে বিবাহ বা ভক্ষ্য ভোজ্যের সংস্রব না রাখিলে বিশেষ কোন ক্ষতি মুখ্যভাবে উপলব্ধি না হইতেও পারে কিন্তু গৌণভাবে যে বিশেষ ক্ষতি তাহা বিবেচনা করা যায়।

যাহাই হউক এক পুণ্ড্রজাতির এক সমাজ যে বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—তাহা অবগত হওয়া যায়। বহুকাল হইতে তাহারা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে নূতন হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পর সমাজগত জনগণ, যে এক জাতি এবং একই জাতির অভিব্যক্তি মূলে উদ্ভিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ইহাও স্বীকার করিতে চাহে না।

"অসৌহি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেনৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ।
ওড্রে চ স্থানভেদেতু ভিন্নাখ্যাঃ পরিকীর্ত্তাতে।
এতেবাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশ
সংজ্ঞকাঃ।"
(কুলতত্ত্ব)

স্থানভেদে জাতীয় সমাজের আখ্যালাভ

এই মতটি যতই আধুনিক হউক না কেন, ইহার মূলে প্রকৃত সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকার ভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন যে ভিন্নাখ্যা লাভ হইয়া থাকে তাহা ধ্রুব।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদ্যেতর সকল জাতির মধ্যে স্থান ভেদে বাস নিবন্ধন বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণাভাব আদৌ নাই এবং সংস্কৃত বচনও আছে।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এক জাতির সংজ্ঞাভেদ দেশ জনিত, জাতি নিবন্ধন নহে।

অপরাপর হিন্দু জাতীয় সমাজের ন্যায় পুণ্ড্র জাতিরও দেশভেদে বাসনিবন্ধন বিভিন্ন আখ্যালাভ হইয়াছে। জাতীয় অনৈক্যের কোন কারণ নাই।

পুণ্ড্রজাতির চারিটি সমাজ

"দক্ষিণোত্তর রাঢ়ীয়ো বঙ্গজ শ্চৌড্র এবচ।
শ্রেণী চতুষ্টয় শ্বেতে পৌড্র জাতি সমুচ্যতে॥"
(কুলতত্ত্ব)

দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ ও ওড্রভেদে চারি সমাজের পুণ্ড্রজাতি দৃষ্ট হয়।

'কুলতত্ত্ব' রচনার কালে পুণ্ড্রজাতির এই প্রকার চারি শ্রেণী ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতেছে। এই বিভাগের দ্বারা দৃষ্ট হইবে একমাত্র রাঢ় দেশেই—উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাঢ়বাসী পৌণ্ড্রগণ উত্তররাঢ়ে ও দক্ষিণ রাঢ়ে বাসনিবন্ধন দুইটি সমাজের গঠন করিয়াছে। বঙ্গজ সমাজ পূর্ব্ববঙ্গ বাসের ফল এবং উৎকলবাসী পুণ্ড্রগণ ওড্র সমাজের অন্তর্গত হইয়াছে।

রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র

মহানন্দার ও ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবাসী পুণ্ড্রগণ রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র। কিন্তু রাঢ় আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—এই কারণে এক রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র আবার উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ভেদে পৃথক হইয়া স্ব স্ব সমাজ গঠন করিয়াছিল।

উত্তর রাঢ়ী পুণ্ড্র সমাজ

মালদহের পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদ, এবং বীরভূমির উত্তরাংশকে উত্তর রাঢ় বলিয়া ধরা চলে। সুতরাং ঐ তিন জেলার আদি পুণ্ড্র সমাজ উত্তর রাঢ়ীয় থাকের অন্তর্গত।

দক্ষিণ রাঢ়া পুণ্ড্রসমাজ

দক্ষিণ বীরভূমি, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হাবড়া, হুগলী দক্ষিণ রাঢ় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই সকল জেলার পুণ্ড্রগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

উৎকলী বা ওড্র পুণ্ড্রসমাজ

উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলের পুণ্ড্রজাতি উৎকলী বা ওড্রসমাজ ভুক্ত হইবার যোগ্য।

বঙ্গজ পুণ্ড্রসমাজ

দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ব্ব-মালদহ, রাজসাহী, যশোহর, ২৪ পরগণা লইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও বঙ্গজ পুণ্ড্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল।

এই চারি পুণ্ড্রসমাজ মধ্যে তিনটি সমাজ স্বকীয় পুণ্ড্র বা বাঙ্গালী পুণ্ড্র বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাতি লাভ করিতে পারে। মেদিনীপুরের পুণ্ড্রসমাজ বর্ত্তমানে দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তর্গত কিন্তু সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা ওড্র পুণ্ড্রসমাজ মধ্যে ধরা হইয়া থাকিবে। কেবল ওড্র সমাজ বাঙ্গালা হইতে ভাষায় সম্পূর্ণ পৃথক।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং উৎকলবাসী পুণ্ড্রসমাজ

বর্ত্তমান কালে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং উড়িষ্যা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পুণ্ড্রসমাজ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূলতত্ত্ব মতে বোধ হইতেছে, পুণ্ড্রদেশবাসী পুণ্ড্রগণ ক্রমে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি ও ওড্রদেশবাসী পুণ্ড্র

ভুক্তি হিসাবে বিভাগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে দক্ষিণ রাঢ় বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। তৎপরে ওড্র দেশান্তর্গত। এই হিসাবে পুণ্ড্রজাতির তিনটি বিভাগ দৃষ্ট হইবে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত পুণ্ড্রগণ আদি পুণ্ড্রদেশ ত্যাগ করিলেও কতক স্বীয় আদি ভূমিতে বাস করিতেছে। কতক বঙ্গজ সমাজ বঙ্গ সমাজেই রহিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ী বর্দ্ধমান ভুক্তিতে বাস করিতেছে। এবং উৎকলী পৃথকই রহিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী পুণ্ড্রসমাজ এবং বঙ্গজ পুণ্ড্রসমাজ এখন বাঙ্গালী রহিয়াছে। কেবল ওড্রসমাজ সম্পূর্ণ অন্যের সমাজ মধ্যে বাস করিতেছে বলিয়া বাঙ্গালী-পুণ্ড্রগণের নিকট পৃথক বিবেচিত হইবে।

এই নিয়মে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমানে বাঙ্গালী ও উড়িষ্যা পুণ্ড্র নামে দুইটি বিভাগ রাষ্ট্র শাসনের ফলে গণিত হইতে পারে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সাময়িক কেন্দ্রভূমি মহাস্থান বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত; তথায় এখন পুণ্ড্রজাতি বাস করিতেছে। তাহারা পুণ্ড্র বর্দ্ধন ত্যাগ করে নাই। মালদহের ও রাজসাহীর পুণ্ড্রগণ এখন পুণ্ড্রদেশেই বাস করিতেছে বলিতে হইবে। রাঢ়বাসী পুণ্ড্রগণ বর্দ্ধমান ভুক্তির অধীন সুতরাং তাহারা আদিস্থান পুণ্ড্রদেশ ত্যাগ করিয়াছে। মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের এবং উড়িষ্যার পুণ্ড্রগণ ওড্রবাসী ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এই চারি শ্রেণী ব্যতীত আরও পুণ্ড্রজাতি ও পুণ্ড্রজনপদ আছে

এই উপায়ে আমরা কয়েকটি পুণ্ড্রজাতির কেন্দ্র স্থানের সন্ধান পাইলাম। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ এবং ওড্র-পুণ্ড্র নামক

চারি শ্রেণী ব্যতীত আরও কতিপয় পুণ্ড্র জাতির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত এই নামের স্বতন্ত্র জনপদ ছিল।

সেই সেই জনপদবাসীগণ পুণ্ড্রনামে খ্যাত ছিল। শাস্ত্রে বিভিন্ন জনপদ ও জনপদবাসী পুণ্ড্রের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিশ্বকোষে পুণ্ড্রদেশের (পুণ্ড্রদেশের-পুণ্ড্রবর্দ্ধনের) যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

পুণ্ড্র দেশের সীমা

"উত্তরে হিমালয় পাদমূল ও তিমিরদেশ, পূর্ব্বে প্রাগজ্যোতিষপুর প্রান্ত, দক্ষিণে বঙ্গ ও সমুদ্রকূল, পশ্চিমে বিহারান্ত ও কৌশিকী নাম্নী নদীর পূর্ব্বকূল", এই সীমা মধ্যস্থ ভূভাগ পুণ্ড্রদেশ বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশ নামে একদা খ্যাত ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রথম পুণ্ড্র নরপতির সময়ের রাজ্যসীমা নহে।

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডের পুণ্ড্রদেশ

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে লিখিত আছে "ভারতের পূর্ব্বাংশে পুণ্ড্রদেশ—সপ্তখণ্ডে বিভক্ত; যথা—গৌড় বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, হস্তের নিকট বনসমাচ্ছন্ন বারিখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, এবং বিদ্যাপাদস্থিত বিদ্যাপার্শ্ব।"

পুণ্ড্রদেশ এতদূর বিস্তীর্ণ ছিল কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখন উপস্থিত হয় নাই।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র প্রাচ্য জনপদ

"প্রাগ্ জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রশ্চ
বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মালা মাগধ গোনর্দ্ধাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ
স্মৃতাঃ।"
(ত্রিকাণ্ড শেষ)

এই পৌণ্ড্র জনপদ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র—পশ্চিমে অঙ্গ বা ভাগলপুর জেলা, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ (ঢাকা মৈমনসিং জেলা), উত্তরে দিনাজপুরের কতকাংশ, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ। (বিশ্ব কোষ)

পৌণ্ড্রিক বা পৌণ্ড্রক

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুহূরাশ্চৈব শকাশ্চৈব
বিশাম্পতে।
অঙ্গ বঙ্গাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা।"
ইত্যাদি (ভাঃ সভা ৫২।১৮)

পৌণ্ড্রিক বা পৌণ্ড্রক নামক দেশ কোথায় তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিশ্বকোষে লিখিত আছে—"দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের উত্তরাংশ এবং হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বাংশে।" ইহার বিশিষ্ট কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুহূর, শক প্রভৃতির সহ উল্লিখিত হওয়াতে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে এই মাত্র। ইহাতে বুঝিতে হয়—পৌণ্ড্রিক পুণ্ড্র দেশের উত্তরাংশ—উত্তর পুণ্ড্র বা পার্ব্বতীয় পুণ্ড্র।

সুপুণ্ড্রক

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা স্তাম্রলিপ্তাঃ সুপুণ্ড্রকাঃ।
দৈবালিকাঃ সাগরকা পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা।"
(ভাঃ সভা ৫২।১৮)

বিশ্বকোষ বলেন—"সুপুণ্ড্রক (দক্ষিণ পুণ্ড্র) বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে অজয়-মহল ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ।" ইহারও ঠিক প্রমাণ নাই।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনই ঐতিহাসিক দেশ

পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রি-পুণ্ড্র জাতি বা দেশের ইতিহাস পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল পৌরাণিক পুণ্ড্র দেশের মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনই ঐতিহাসিক দেশ ও নগর।

কাশপৌণ্ড্র

"কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রশ্চ কলিঙ্গা মগধাস্তথা।"
(ভাঃ কর্ণ পর্ব্ব ৪৬ অঃ)

বিশ্বকোষ বলেন—"কাশ প্রধান পৌণ্ড্র। জনপদ বিশেষ।"

'কাশ পৌণ্ড্র' শব্দ স্থানান্তরে কাশ ও পৌণ্ড্র শব্দ পৃথক পৃথক দুইটি জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাশ প্রধান পুণ্ড্র বুঝাও যাইতে পারে, যথায় কাশ তৃণ পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত। তাহা হইলেও ইহা পুণ্ড্র দেশান্তর্গতই হইতেছে।

পুণ্ড্রী ও পুণ্ড্রক নগর

থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল ও আম্বালা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পুন্ধীর রাজপুত পূর্ব্বে বাস করিত, এখন তাহারা পঞ্জাব শ্রেণীর পুন্ধীর নামে অভিহিত। পুণ্ড্রী, রম্ভা, হাত্রী ও পুণ্ড্রক নগর তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রায় ছাব্বিশ হাজার পুন্ধীর রাজপুতের বাস আছে, তন্মধ্যে প্রায় সাতাইশ হাজার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

পাণ্ড্রোত্থান নগর

বিশ্বকোষে 'পুরাণাধিষ্ঠান' শব্দার্থে লিখিত আছে ইহা কাশ্মীর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, তথায় 'পাণ্ড্রোত্থান' নামক নগর।

পাণ্ড্য দেশ

বৃহৎ সংহিতায় এই দেশ দক্ষিণ দিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাণ্ড্য ঐতিহাসিক দেশ। এখন দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে এই সকল পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রানুরূপ দেশ বা নগরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন সর্ব্বপরিচিত ঐতিহাসিক স্থান।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া

জৈন ষষ্ঠ শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু ৩৪৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি জৈনগণের মধ্যে চারিটি শ্রেণী বিভাগ করেন। তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জৈনগণ বা জৈনসমাজ কে

পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া জৈন শ্রেণী

মধ্যে গণ্য করা হইয়াছিল। এই দেশের জৈনগণ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়' নামে খ্যাত হয়। সকল জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। জৈনগণকে হিন্দুরা 'পাষণ্ডী' বলিত। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিত এবং ঘৃণাও করিত। দেবকোট জৈনগণের তীর্থস্থান। দেবকোটের প্রাচীন নাম 'কোটিকপুর।'

পুণ্ড্র বৌদ্ধ

অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে স্তূপ, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ হয়। অশোকের আত্মীয়গণ এই দেশ শাসন করিতেন। জৈন অনুযায়ী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ৪৬৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে দেবকোটেই নির্ব্বাণলাভ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সময়ে পুণ্ড্রদেশে তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ভ্রমণ করিলে অনুযায়ী জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

৪৩৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবেশী পুণ্ড্রদেশের পদ্মরথ (দেবকোটের রাজা) নামক রাজার রাজত্বকালে শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু, মন্ত্রী সোমশর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সোমশ্রী। তিনি এদেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

অনুযায়ীর পর শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। অশোক যখন

পুণ্ড্রদেশে আগমন করেন সেই সময়ে বুদ্ধদেব যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তথায় স্তূপ, সঙ্ঘারাম, বিহার নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩৩২ সালে দেহত্যাগ করেন।

এই সময়ে পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় জৈন-শ্রেণী তখনও বিদ্যমান ছিল এবং 'পুণ্ড্র-বর্দ্ধন বৌদ্ধ'গণও প্রবল হয়।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের 'পুণ্ড্রার্ক সৌর' সম্প্রদায়

শাকদ্বীপীয় মগবিপ্রগণ পূর্ব্বকালে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। পারস্য দেশকে শাকদ্বীপ বলিত। তথায় ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ছিল। তাঁহাদের সহিত যে চতুর্ব্বর্ণ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'মন্দগ শূদ্র' বলিত তাহারা

"সবিতুঃ পরিচারকাঃ"

নামে খ্যাত হয়। ব্রাহ্মণগণকে 'শাকল ব্রাহ্মণ' বলিত। আমরা দেখিতে পাই শাকদ্বীপিগণের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি অয়ন, দ্বাদশ মণ্ডল ও সপ্ত অর্ক ভেদে কালক্রমে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়াচ্ছোৎ কলা' সকলেই তাঁহাদের প্রশংসা করিত। গৌড় দেশে ইহারা আচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। 'মন্দগ'গণও এদেশে বাস করিতেন।

পুণ্ড্রার্ক

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত বিখ্যাত মন্দিরে (বর্ত্তমানে সূর্য্যপুরের কাঠাম) যে সূর্য্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা 'পুণ্ড্রার্ক' নামে বিখ্যাত ছিল।

সপ্তার্ক—পুণ্ড্রার্ক

"উদ্বঃ পুণ্ড্র, মার্কণ্ডেয়, বালো, লোলঃ
যোগশ্চনাঃ।
শাকদ্বীপী কোণী দেবৈঃ সপ্তাবস্থাং
পূজ্যাশ্চার্কাঃ॥"

কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুণ্ড্রার্ক ও পুণ্ডরীকার্কের

প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উড়িষ্যার 'কোণার্ক' শাখা কর্ত্তৃক কোণার্ক (কনরক) সৌরমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনার্ক মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই পুণ্ড্রদেশে

পুণ্ড্রার্ক বা পুণ্ডরীকার্ক

নামক সূর্য্য মূর্ত্তি সম্বলিত সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রদেশের সূর্য্য মূর্ত্তি সপ্তার্কগণের এক শাখা—'পুণ্ড্র' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ড্রদেশ বাসী সৌর-গণ 'পুণ্ডরীকার্ক' শাখার অন্তর্গত।

বর্ত্তমান কালেও মালদহের পুণ্ড্র বা পুণ্ডরী জাতিকে পুণ্ড্রার্কের উপাসনা করিতে দৃষ্ট হয়। সূর্য্য পূজা ও সূর্য্য পূজার সামগ্রী গৌড়ীয় আচার্য্যগণের প্রাপ্ত অন্য কোন ব্রাহ্মণের ইহাতে অধিকার নাই। বর্ত্তমানে এই প্রথা বিদ্যমান নাই।

মগবিপ্র ও মন্দগ শূদ্র এদেশে ছিল। তাহারা পুণ্ড্রার্ক শাখার অন্তর্গত। এদেশের চতুর্ব্বর্ণও পুণ্ডরীকার্কের মত গ্রহণ করেন। এদেশে ছোট বড় বহু সূর্য্যমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধাইপুরের সূর্য্য মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন।

সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি পাদুকা (হাটিংবুটপরা) মগ ব্রাহ্মণ ও মন্দগগণের মূর্ত্তিও তাহাতে আছে—তাহাদের দীর্ঘ দাড়ী, মস্তকে গম্বুজ-কার টুপী পরান রহিয়াছে দেখায়। এই সকল মূর্ত্তির উপাসকদিগকে পুণ্ডরীকার্কের শাখা মধ্যে গণ্য করা যায়।

এই পুণ্ড্রার্ক ও পুণ্ড্রীকার্কের সহিত পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রীজাতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। মাঘ মাসের রবিবারে এই পুণ্ড্রীকার্কের উৎসব হয়। সুলতান হোসেনশাহী আমলের ভণরাজ খান বিরচিত 'সূর্য্যের ব্রত কথা' নামক পুথি এদেশের প্রধান সূর্য্য ব্রত কথার পুথি। মালদহে এই পুথি যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সংগৃহীত কয়েকখানি ভণরাজের পুথি আছে।

পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রীগণ ঐ প্রাচীন কাল হইতে পুণ্ড্রীকার্কের পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহারা ঐ সময়ে সৌরমত গ্রহণ করিয়াছিল বুঝা যায়। এক সময়ে মগধিগণের সহিত পৌণ্ড্রীয় ব্রাহ্মণগণ বৈবাহিক সম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন দেখা যায়। সেই সময়ে সম্ভবতঃ 'মন্দগ' সূর্য্য পরিচারকগণ এদেশে বাস করেন।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব বংশ

বাসুদেব পুণ্ড্র

হরিবংশানুসারে বাসুদেবের পিতার নাম বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিলেন। একজনের নাম 'সুতনু' অপরের নাম 'নারাচী'। সুতনু বাসুদেবের জননী, কপিল নারাচীর পুত্র। কপিল সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। দেবকী নামক পট্টমহিষীর গর্ভে শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান খুলনা জেলায় যে কপিলমুনি গ্রাম আছে, যেখানে কপিল-মুনির মেলা হয়, সেই স্থানে কপিলেশ্বরী কালীও আছেন। তথায় বাসুদেবের ভ্রাতা কপিলের আশ্রম ছিল।

কিন্তু খুলনা তখন সাগর গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বাসুদেবের এক ভ্রাতা তৎকালে খুলনা জেলায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার যে শিষ্য ছিল ইহাও সম্ভবপর।

এই সময়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত রাজ্যের অধিপতি পৌণ্ড্রকরাজ জরাসন্ধের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। মগধের রাজধানী রাজগৃহে তখন জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম নরপতি। কামরূপে নরক, মণিপুরে কংস নিষাদরাজ একলব্য সহ তখন মিলিত বল।

(মহাভারত সভাপর্ব্ব)

বাসুদেব পৌণ্ড্রক দ্বারাবতী অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাগণের মধ্যে পুণ্ড্রদেশবাসী সকল ক্ষত্রিয়ই ছিল। এই সময় বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাত রাজ্যত্রয় মিলিত পৌণ্ড্রক দেশে বা পুণ্ড্ররাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে মগধ রাজের আশ্রয় লইয়াছে।" (ঐ)

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সময়—'বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাত' এই তিনটি রাজ্য একত্র হইয়া 'পুণ্ড্র-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে রাষ্ট্র কেন্দ্র 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' (?) হইতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ তত্তৎ দেশে বাস করিয়া থাকিবে, এবং বঙ্গপুণ্ড্রের বাসের ক্ষত্রিয় শাখায় বিদ্যমান ছিল।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পক্ষে যাহারা কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া দ্বারাবতী পুরী অবরোধ করিতে গিয়াছিল তাহারা যে কৃষ্ণপক্ষের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিল তাহা অক্লেশে বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মাতুল মথুরাধিপতি কংস যিনি মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা (অস্তি ও প্রাপ্তী নামক দুই জরাসন্ধ কন্যাকে বিবাহ করেন) পুরাণে 'কংশাসুর নামে খ্যাত।

কৃষ্ণদ্বেষী বলিয়া কংস অসুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চেদীপতি শিশুপালও জরাসন্ধ মিলিত-বলের অন্তর্গত ছিলেন। জরাসন্ধও রাজদ্রোহী অসুর ছিলেন। অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ বিরহিত সংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না।

পুণ্ড্র বঙ্গ কিরাতবাসী পুণ্ড্ররাষ্ট্রের নরগণ কৃষ্ণদ্বেষী বলিয়া অসুরাখ্যা পাইয়া থাকিবে। দ্বারাবতী যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হয়েন এবং এই রাষ্ট্র দ্বারকার শাসনাধীন হইয়া পড়ে।

কথিত আছে বলদেব স্বর্ণবিন্দুখচিত বঙ্গদেশনির্ম্মিত গদা ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের লৌহশিল্প উন্নত ছিল। বলদেব পুণ্ড্রদেশে করতোয়াতীরে মহাস্থান নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বাসুদেবপৌণ্ড্রক নিহত হইলে সৈন্যগণ কতক নিহত ও কতক দিগ্বিদিকে পলায়ন করে।

বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ মহাস্থানে বাস করিয়া থাকিবেন। অনেকে বলেন মালদহের গঙ্গাতীরের রামকেলী গ্রাম বলরাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাসুদেব পৌণ্ড্রকবংশ বহুকাল পুণ্ড্রদেশ শাসন করিয়া থাকিবেন। পুরাণাদিতে বাসুদেব পৌণ্ড্রকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কোন উল্লেখ নাই। যেমন পুণ্ড্র বাসের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এইটি বাসস্থান ছিল, তদ্রূপ বাসুদেব ক্ষত্রিয়গণের পরবর্ত্তী কালের কোন ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায় না। অনুমান দ্বারা বাসুদেব ক্ষত্রিয়বংশের অস্তিত্বের কথা বলা যায় মাত্র। সুতরাং বাসুদেব ক্ষত্রিয়গণের বিবরণ পৌরাণিক ভিত্তির অনুমান মাত্র, এবং অস্তিত্বও সম্ভব!

করতোয়া বা বাহদা নদীতীরে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভাই ঋষিরূপে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের লিখিত সংহিতা শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র রচয়িতা ছিলেন।

করতোয়া প্লাবনে সুবর্ণমুদ্রাকার পুণ্ড্রদেশ তৎকালে প্লাবিত হইত। স্কন্দ পুরাণে করতোয়া মাহাত্ম্যে একথা লিখিত আছে। স্কন্দ গোবিন্দের মূর্ত্তি এই দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাশ্মীর রাজতরঙ্গিনীতে কার্ত্তিকেয় মন্দিরের প্রসঙ্গ আছে। পৌণ্ড্রগণ স্কন্দ গোবিন্দের উপাসনা করিত।

এই যুগের পরবর্ত্তী যুগের কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পদ্য রাজ (পোদ)

(পদ্ম জাতি)

"করিয়া চঙ্গর বসাল নগর
রাজার বসত বাটী।
করিয়া আসন পাড়িয়া নিশান
সম্মানে বসাল পদ্য। * * (পদ্ম ?)
সুধর্ম্ম মণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য।"
(ধর্ম্ম মঙ্গল)

"সম্মানে বসাল পদ্য"—শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের এই 'পদ্য' জাতিকে 'পদ্যরাজ' বলিয়া এবং ঐ পদ্যরাজই চব্বিশপরগণাবাসী 'পোদ' জাতি বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক 'পদ্য' জাতি বাচক শব্দ নহে, অর্থবাচক—পুণ্ডরী

* * 'পদ্য' শব্দ ধর্ম্মমঙ্গলকার জাতিবাচকভাবে ব্যবহার করিলেও 'পদ্য' নামে সে সময়ে কোন জাতি ছিল না—'পুণ্ডরী' শব্দ স্থানে পদ্যের মিলনার্থ 'পদ্য' লিখিত হইয়াছে। মূল পুস্তকে 'পদ্য' ছিল। পুণ্ডরীক অর্থ পদ্ম। 'পুণ্ডরী' জাতিকে পুণ্ডরী অর্থাৎ পদ্ম অর্থে লিখিত হইয়াছে।

অর্থে পদ্ম, এই পদ্মাক মুদ্রাকর প্রমাদে 'পদ্য' করিয়াছে। মূল হস্তলিখিত পুস্তকে 'পদ্ম' আছে। পুণ্ডরীক পদ্মহইতে পদ্য হইয়াছে।

'পদ্য জাতি' যে পোদ এবং পদ্যের অপভ্রংশে 'পোদ' হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা চলে। পদ্ম (পুণ্ডরীক) নামের অপভ্রংশে পদ্য বা পোদ হইয়াছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গোপালনগর, চেতলা, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের পদ্য-রাজ গণের সহিত অবস্থান কালে উক্ত জাতির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম।

আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠীগণের মধ্যে অনেকেই পদ্যরাজ ছিলেন। আলিপুর গোপালনগরের মাইনর স্কুলটির সম্পাদক স্বয়ং পদ্যরাজ জাতীয় ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের-সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস মহাশয় আমার সেই সময়ের সহপাঠী ছিলেন।

গোপালনগর একটি বিশিষ্ট 'পদ্য-রাজ' সমাজ। আমি ঐ সমাজের আচারব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত আছি।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নাজরা, উপ্তি, নৈনান, একতারা, ঘটকপুর প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর সম্ভ্রান্ত পদ্যজাতির বাস দৃষ্ট হয়

মিঃ এচ্, এ, গেইট এফ্, এস্ এম্ সাহেব ১৯০১ সালের ভারতের সেনসস্ রিপোর্টে 'পোদ' জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। (এপেণ্ডিক্স)—

পোদ

চাষী.....পশ্চিম বঙ্গ	
ছাঁচি (Chhanchi) ...	ঐ
যশোরী	ঐ
বাসুদেব পৌণ্ড্র	মধ্যবঙ্গ
শাণ্ডপর	ঐ

"The Basudeb Paundra claims descent from the family of Pundra the son of Basudeb. While the Santaparhs say that are descended from Bali Raj, the son of Sutapa. The Basudeb Paundras are divided into two section, the Uttar Rarhi and Dakshin Rarhi. The Santaparhs are also divided into two sections, the Utkal or Oriya and the Bangaj."

(Census Report 1901—Pods)

বাসুদেবপৌণ্ড্র বংশীয় পদ্য

বাসুদেব পৌণ্ড্রগণ পুণ্ড্র বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাহাদের বীজ পুরুষ। এই পুণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

শাণ্ডপর পদ্য বলীরাজ বংশীয় উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী

শাণ্ডপর পদ্য আপনাদিগকে সুতপাপুত্র বলীরাজের বংশধর বলিয়া থাকে। এই বাসুদেব পৌণ্ড্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—উত্তর রাঢ়ী এবং দক্ষিণ রাঢ়ী।

শাণ্ডপর উৎকলী ও বঙ্গজ পদ্য

শাণ্ডপর আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—উৎকলী বা উড়িয়া ও বঙ্গজ।

মেছুয়া ও যশোরী পদ্য

চাষী ও ছাঁচি নামক উচ্চশ্রেণী গুলির মধ্যে মেছুয়া ও যশোরী থাক আছে। ১৯০১ সালের আদম সুমারীর বিবরণী মধ্যে সুচতুর গেট সাহেব লিখিয়াছেন যে—

Census Report 1901 Page 363

"The Koch has sunk considerably since the days of his supremacy and so has the Pod, who claim to be considered a Bratya or follow Kshattriya is doubtless due to a vague reminiscence of the time when this tribe ruled on the banks of the Karatoya"

যাহাই হউক ১৯০১ সালের আদম সুমারীর সময়ে এই জাতির মধ্যে জাতি ও বংশ নির্ণয়ের তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতির বিবরণ সম্বলিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত আবেদনের সারমর্ম্ম রিপোর্টে গৃহীত হইয়াছে মাত্র।

১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টের ৩৭২ পৃষ্ঠায় ৪৯২ প্যারায় দেখিতে পাই—

"The Pods are divided into the higher class, who live by cultivation and call themselves Padma Raj or Bratya Kshattriya, and the fishing Pods. The former claim a higher position which is not usually conceded to them. In Burdwan their touch defiles and they rank very low in consequence.

এবং ১৯০১ সালের রিপোর্টের ৩৮২ পৃষ্ঠায় ৬১৬ প্যারায় লিখিত আছে যে—

"The higher class Pods who live by cultivation and call themselves Padma Raj urge that they are of Kshattritya origin and have no connection with the fish Pods. They have, however, quite failed to establish any racial difference between themselves and the Pods who live by fishing and the connection clearly indicated by the fact that they are still willing to accept the daughter of the fishing Pods, as their wives though they will no longer give them own daughter in marriage to members of that section of the caste."

পদ্ম জাতির মধ্যে যাহারা কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহারা আপনাদিগকে 'পদ্ম রাজ' বলিয়া থাকে এবং তাহারা পতিত ক্ষত্রিয় (ব্রাত্য) গণের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করে। মেছুয়া পোদগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধও হয়। মেছুয়া পদ্মগণের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু কন্যা প্রদান করে না।

এই সূত্রে মেছুয়া পদ্মগণের সহিত এক জাতিত্ব সম্বন্ধ যে বিজড়িত আছে তাহা উপলব্ধি হইতেছে। জাতীয় স্বভাবের উন্নতি ও অবনতি—সংসার যাত্রার প্রকৃষ্ট পথ দ্বারাই ব্যবসা ভিন্ন ভেদ হইয়া; এক জাতির মধ্যে শ্রেণীভেদ সংঘটিত করে।

এক জাতি, কাল সহকারে জীবন-সংগ্রামে জয় পরাজয়ের সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কর্ম্ম দ্বারাই উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান আইসে, কর্ম্মই জীবন যাত্রায় অমৃত।

সামাজিক প্রথায় বা বাঁধাগতের মধ্যে বাঁধা সূত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ বেতালা বা বেসুর হইলে

জাতীয় সমাজ পৃথক হয়। ব্যবসার পার্থক্য হেতু জাতীয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাতি ব্যবসা গত বলিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে।

পদ্যজাতি কর্ম্মদ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারিলে, সমাজ তাহাদিগকে পথ দিবে। আপনাপন সমাজ কেবল যে ব্যবসা ত্যাগ দ্বারাই উন্নত হয় ইহা অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস আর নাই।

আচরিত চিরাভ্যস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, বিদ্যা ও বিজ্ঞান দ্বারা অন্নসংস্থানের সুনীকৃত কর্ম্ম ত্যাগদ্বারা নূতন কর্ম্ম দ্বারা সংসার নির্ব্বাহের নূতন পথ আবিষ্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী এই প্রকারে এক দিকে যেমন দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে তদ্রূপ জাতীয় ব্যবসার উন্নতি দ্বারা বহু স্থানে উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে; এবং জাতীয় ব্যবসার অঙ্গীকৃত করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করার ব্যবসা ও জীবন যাত্রার পথ সুগম হইয়া উঠিতেছে।

পদ্য জাতির যতই শ্রেণী বিভেদ থাকুক না তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ব্যবসা ত্যাগ দ্বারা জীবন যাত্রার পথটি বিপদ সঙ্কুল করিয়া দরিদ্র হইবার প্রয়োজন আদৌ দৃষ্ট হয় না।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যে জাতির নিকট নীচ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, যাহারা দাসত্বই জীবন যাত্রার প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করে সেই ভ্রষ্ট কর্ম্মিগণের মন্ত্রণায় বহু জাতি কেবল মৌখিক উন্নতি সাধনের জন্য দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।

সম্মিলিত শক্তি দ্বারা জাতীয় সমাজগুলিকে দৃঢ়াবদ্ধ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যত বহু দলে বিভক্ত হইবে, ততই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবে। ততই তাহারা হত বল হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িবে। সংখ্যায় কম হইয়া বেইনী বদ্ধ হইলে সে জাতির বা সম্প্রদায়ের কখন উন্নতির আশা নাই।

আদম সুমারীর বিবরণ পুস্তকে—মানচিত্রে 'পোদ' বাসভূমির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, (Map showing the distribution of the Pod caste in Bengal—Page 395 1901 A. D.) ইহাতে দৃষ্ট হয়, ২৪ পরগণা, খুলনা হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোহর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় কমবেশী পোদগণের বাসভূমি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে।

মালদহ, রাজসাহী, মুরসিদাবাদ, বীরভূমি প্রভৃতি জেলায় পদ্য জাতির বাস চিহ্ন প্রদত্ত হয় নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় উক্ত জেলায় পদ্য জাতির বাস নাই।

সেনসস্ রিপোর্টে পদ্যজাতিকে "Half brother of Chadal" ও বলা হইয়াছে। ইহা অন্যায় উক্তি,—এবং পুণ্ড্রজাতিকে Half brothers of pods ও বলা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাই নজির হইবে এবং ভারত বহির্ভূত সুসভ্যদেশের জনগণ এদেশের আদম সুমারীর বিবরণী পাঠ করিয়া বুঝিবে বাঙ্গালী অপদার্থ ও হীনজাতি। বাস্তবিক কি তাহাই। কখনই নহে—যাহারা এ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করেন তাঁহাদের এ যুক্তি শোভা পায় না।

পুণ্ডরী মালি

"In the state of Bud there is a small group of person known as Pundari Mali. They grow flowers and vegetables, * * * but the similarity of name and occupation would seem to suggest their ori-

ginal identity with the Pundaris or Puro of Bengal."

ছোটনাগপুরের এক প্রান্তে 'Bud state' আছে। তথায় অল্পসংখ্যক 'পুওরী মালি' নামক এক জাতি বাস করে। তাহাদের পূর্ব্ব নিবাস কোথায় ছিল তাহা প্রায় অজ্ঞাত—তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন যাপন করে।

কৃষিকার্য্য পুণ্ড্রগণের আদি ব্যবসা না হইলেও বর্ত্তমানে মুখ্যভাবে ব্যবসা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

নবদ্বীপবাসী পুওরিগণ তরিতরকারীর কৃষি করিয়া থাকে—কৃষিকর্ম্ম এই জাতির ব্যবসা—

"In Nadia they are vegetable growers and cultivators and believe that the growing of vegetables was there original occupation" (Cen-Rep. 425, para 711pp.) 1901 A.D

নবদ্বীপ বা নদীয়া জেলার পুওরিগণের মধ্যে যাহারা যে উদ্ভিদের কৃষি অধিক করিত, দেশের লোকে সেই উদ্ভিদের উৎপাদককে উদ্ভিদ সংজ্ঞায় বিভূষিত করিয়া থাকিতে পারে যথা

"In Nadia also there are three sub-caste, but they here know as Begune, piyaza and peto."

বেগুণে, পেঁয়াজে, পেটো পদবী। শান্তিপুরের মধ্যে ব্রাহ্মণ মহলে—গোঁজ, লড়া, পাটী প্রভৃতি পদবী আদিও শুনা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালিত।

তাজা ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ জীবিতও নাই এবং গ্রীস ও রোম মরেও নাই।" এই কথা যুবক ভারতের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই বর্ত্তমান ভারতের ভাবুকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। তবে কথার মারপ্যাঁচে হয়ত এই সত্যটা কিছু ঘোঁয়াটে ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু এই গোঁজামিল ও অস্পষ্টতা আর বেশী দিন টিকিবে না। ভারতের জনসাধারণ শীঘ্রই মরাভারতকে মরা ভারতই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইবেন। ভারতীয় "অমরতা"র আলোচনা সম্প্রতি "ধামা চাপা" থাকিবে।

২। এই লেখকের রচনায় ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন আলোচনাপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছে। প্রণালীটা ভারতবর্ষে নূতন—পুরাপুরি নূতন-নয়—কথঞ্চিৎ নূতন। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্বের যাচাই সুরু হইয়াছে। তাহার ফলে আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা আজকাল নূতন কাণে শুনা হইয়া থাকে। নবীন চন্দ্র দাস বলিতেছেন—"আধুনিক মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের হাত এড়াইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে আর "চুক্তি" করে না—স্বীয় বুদ্ধিবলে বিশ্বশক্তির সহিত "বুঝা পড়া" করে—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে।" "শুনিতে পাই মানুষ প্রথম অবস্থায়

নিরাকার ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না—পূজা করিবে কাহার? সুতরাং পণ্ডিতগণ নিজেদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা বলে মূর্খের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণের জন্য নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন। • • • কিন্তু • • • নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ বা উপনিষৎকারগণের দ্বারা এত সংখ্যক অদ্ভুত দেবদেবীর সৃষ্টি ও যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। খুব সম্ভব এই সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি নিম্নস্তরের জাতিগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল। • • • ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজ ধর্ম্ম ও পূজা পদ্ধতি আর্য্য ও অনার্য্যের অথবা সভ্য এবং অসভ্যের মিশ্রণজাত।" এই আলোচনা প্রণালী এন্থ্রপলজি বা নৃ-তত্ত্বের সামিল। আজকালকার পণ্ডিত মহলে আত্মা, পরকাল, ভগবান ইত্যাদির আলোচনা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার গোড়ার কথা নয়। গোড়ার কথা আচারতত্ত্ব, কুসংস্কার-তত্ত্ব, ভূতুড়ে গল্প, এক কথায় লৌকিক ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার। এই সকল কথা বুঝিয়াই আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হওয়া যুক্তি সঙ্গত। ইহাতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অথবা আধ্যাত্মিকতার গৌরব কিছু মাত্র কমিবে না। মানুষ যে পশু এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে মাত্র। তাহা না বুঝা বেকুবি। তাহার ফলে মানুষের দেবত্বও আরও স্পষ্ট হইয়াই উঠিবে। নৃতত্ত্বের দিক হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের বিশ্লেষণ সুরু করিলে আর একটা মস্ত লাভ হইবে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশটা পরিষ্কার হইতে থাকিবে। দেখিতে পাইব যে প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের জীবন যাপনের রীতিনীতি বদলাইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাইব যে, "মাৎস্যন্যায়", অন্তর্বিদ্রোহ বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ, ঘরোয়া লড়াই এবং রক্তারক্তি ভারতবর্ষে অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। ইহা ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা নয়—দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। আর দেখিতে পাইব যে, হিন্দুত্ব এবং হিন্দু-সমাজের দলভেদ, জাতিভেদ, বিধিনিষেধ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই মাৎস্য-ন্যায়ের প্রভাবে নানা যুগে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস না বুঝিলে ভারতের ধর্ম্ম-তত্ত্ব, জাতিভেদ, বর্ণসঙ্কর এবং সামাজিক অনুশাসন বুঝা যাইবে না। এই সকল কারণে যুবক ভারতে নৃতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

৩। 'গৃহস্থে'র "আলোচনা"য় "নব হিন্দুত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "গৃহস্থ" প্রচার করিতেছেন—"হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কেবল প্রত্ন-তত্ত্বের কোষাগার নহে। ইহা হিন্দুত্বের নূতন জীবনের উৎস। • • • যে হিন্দুত্ব আজ ভারত প্রত্যাশা করিয়া আছে তাহা কেবল একটা শাস্ত্রগত সূত্র নহে। নব হিন্দুত্ব একটা জীবনের ধারা। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগে এই হিন্দুত্ব নূতন প্রেরণা, নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবে। এই হিন্দুত্ব হিন্দুকে জগতের মধ্যে কেবল একটা ব্যতিরেক বা "এক্সেপ্‌শন" করিয়া ঘিরিয়া রাখিবে না। এই নূতন জীবন ধারার স্রোত বিশ্বমানব সাগরের মধ্যে যাইয়া পড়িবে, এবং এই জীবনের প্রেরণায় হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া লইবে—সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইবে।" পৃথিবীতে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেলে পিটিবার আখড়া হইতে নবজীবন

গজাইয়াছে কিনা খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কাশীর নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক ভারত তাজা এবং সরস আদর্শের নাগাল্ পাইবেন কি না তাহাও এক্ষণে আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় টাট্‌কা মাল যোগাইতে পারেন—ভাল কথা। আর যদি এই প্রতিষ্ঠান মরা পচা ও বাসি মালেরই গুদাম ঘর হইয়া থাকে তাহাতেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।

আসল কথা "নব হিন্দুত্ব"—দুনিয়ার লোকের পাতে দিবার উপযুক্ত ভারতধর্ম্ম—বর্ত্তমান জগতের একটা শক্তি স্বরূপ ভারতবাসীর দর্শন ও জীবন। এই হিন্দুত্ব, এই ভারতধর্ম্ম এবং এই দর্শন ও জীবনের কথাই যুবক ভারতের সকল আন্দোলনের ভিতরকার কথা। এই নবীন হিন্দুত্বের আলোচনা খোলাখুলি বোধ হয় এখনও কেহ করেন নাই। কিন্তু অন্ততঃ বিগত দশবৎসরের সকল প্রচেষ্টাই এই "নূতন জীবনের উৎস" হইতেই বাহির হইয়াছে। যুবক ভারত আগাগোড়া বর্ত্তমান-নিষ্ঠ এবং ভবিষ্যপন্থী বা "ফিউচারিষ্ট"। "গৃহস্থ" নব্য ভারতের ফিউচারিজ্‌ম্-তত্ত্বটা অর্থাৎ "ভবিষ্যবাদ"ই স্পষ্টভাবে ধরিয়াছেন।

যুবক ভারত "আর্কিওলজি" প্রত্ন-তত্ত্ব বা কবরতত্ত্ব বা মরাতত্ত্ব বা অতিকঙ্কালতত্ত্বও আলোচনা করিয়া থাকেন। মরা ভারতের কবর এবং চিতাভস্ম খুঁড়িয়া আমরা ভাল, বরাহমিহির, রসরত্নসমুচ্চয়, রাজপুত, "পাহাড়ী" চিত্রশিল্প, "সর্দ্দাই [illegible]র" কৌটিল্যনীতি, ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্রচোল্‌কে বাজারে দাঁড় করাইয়াছি। কালিদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ইত্যাদির আদর দিন দিন বেশ জমকাল করিয়া তুলিতেছি। কথায় কথায় যুবক ভারত অতীতের নজির বাহির করিয়া থাকেন—অতীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সকল ক্ষেত্রেই তুমুলভাবে দেখা দিয়াছে। তাজা ভারতে বাসি ভারতের কথা এত বেশী হয় কেন? কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন তবে বুঝি যুবক ভারত অতীতেই ডুব মারিল রে! বস্তুতঃ ইয়োরোমেরিকার কোন কোন পণ্ডিতমহলে এই ধরণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বিশ বৎসর হইতে একটা মজা দেখিতেছেন। সকল ভারতবীরই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে অতীত ভারতের বুলি শুনাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের ঝুলিতে ছিল বেদান্ত। পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিলেন সে কথাত জানি। ততঃ কিম্?" ব্রহ্মেন্দ্রনাথ লণ্ডনের "বিশ্বমানব পরিষদে" জবাব দিলেন—"অহিংসা" এই খানেই শেষ নয়। আজ রবিবাবুর নামে দুনিয়ায় ভারতের নাগরা বাজিতেছে। কিন্তু নাগরার আওয়াজে শুনা যায় কেবল তথা কথিত "মিষ্টিসিজ্‌ম্।" আর সিংহলের ভাবুক কুমারস্বামীও বিলাতে বসিয়া ভারতশিল্পের অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দের যোগতত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের কবীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকানেরা ভারতের এক সুর শুনিতে পাইলেন। পুরাণা ভারতের কথা—মরা ভারতের কথা—এবং সেই পুরাণা ভারতেরও অকেজো দিকটা। দেখিয়া শুনিয়া পাশ্চাত্যেরা হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন—"যাক্, বাঁচা গেল। নব্য-ভারত আজও সেই খাড়া বড়ি থোড় লইয়া মাতিতেছে। সুতরাং ইহারা জগতে নবশক্তি আনিতে পারিবে না। মরাভারতের কবর "পাতা" প্রভৃতির মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই জমাট বাঁধা মঞ্চের উপর আর নবজীবন গজিতে পারিবে না। অতএব ভারতবর্ষের

ব্যয়টা খরচের খাতায় লেখ। ভারতের ত্রিশকোটি নরনারী জগতের কোন কাজে লাগিতেছে না। হিন্দুস্থান বিশ্বশক্তির বহির্ভূত সৃষ্টিছাড়া মুৎপিণ্ড বিশেষ।"

"বিদেশীয়েরা যুবকভারত সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিতেছেন—দেশীয় লোকেরাও অনেকটা এই রূপই সন্দেহ করিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের "ভবিষ্যবাদে" প্রত্নতত্ত্বের মূল্য কত খানি? যুবকভারত অতীত কথাকে কোন্ কানে শুনিতেছেন? আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যুবক ভারত অতীতের জন্য অতীতের আদর বিন্দুমাত্র করেন না। পুরাণো আধ্যাত্মিকতার বড়াই আমাদের "ভবিষ্যবাদে" এক কাঁচ্চাও নাই। আমরা মোগল ভারতের গৌরব যুগ, অথবা গুপ্ত-বর্দ্ধন-পাল চোল-সেন আমলের হিন্দুত্ব, অথবা কালিদাসিত আর্য্যাবর্ত্তের এবং আন্ধ্রশাসিত দাক্ষিণাত্যের ভারতকীর্ত্তি অথবা মৌর্য্য ভারতের জীবন, দর্শন ও ধর্ম্ম সবই বাতিল বিবেচনা করিয়া থাকি। এই সকল হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া যুবক ভারত হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহে না। যুবক ভারত বৃহত্তর কালিদাসের বৃহত্তর হিন্দুত্ব গড়িবে এবং বৃহত্তর উপনিষৎ, বৃহত্তর গীতা ও বৃহত্তর বেদান্ত রচনা করিয়া জগতে বৃহত্তর আধ্যাত্মিকতা আনিবে। আর এই বিরাট সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান যুগের মানবজাতি জগতের সর্ব্বত্র উদ্দীপনা লাভ করিতে পারিবে। যুবক ভারত দুনিয়ায় এক প্রধান শক্তি হইয়া থাকিবে। বিশ্ববাসীর বিবেচনায় হিন্দুস্থান আর "অতীতের দেশ" মাত্র পরিগণিত হইবে না।

তথাপি তাজা ভারতে বাসি ভারতের বুলি এত বেশী আওড়ান হয় কেন? "জবাব অতি সহজ। প্রথম কথা এই যে, আমরা বনিয়াদি ঘরের লোক। এই কথাটা দুনিয়ায় স্বীকৃত হয় না। আমাদের কুলজী পুথি বাহির করিয়া তাহা স্বীকার করাইতে চাই। উনবিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের পুরাণো ভারতখানাকে বেকুব নরনারীর দেশ বিবেচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কুসংস্কার নকল করিয়া আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরাও পুরাণো হিন্দুস্থানকে অকর্ম্মণ্য চরিত্রহীন এবং মরা স্ত্রীপুরুষের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়াছেন। এই কুসংস্কারের ফলে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী পূর্ব্ববর্ত্তী চৌদ্দ-পুরুষের নিন্দা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং দুনিয়ায় মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। কাজেই পাশ্চাত্য এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের কুসংস্কার ধ্বংস করা ভবিষ্যবাদী যুবকভারতের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। আমরা দেখাইতে চাহি যে, আকবর, প্রতাপাদিত্য, শাজাহান শিবাজী, আওরাংজেব, তানসেন, আবুফজল, রামদাস, বিদ্যাধর, বাজীরাওয়ের ভারত ষোড়শ ও সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপ হইতে কোন অংশে খাটো নয়। পাশ্চাত্য নরনারীর যতগুলি দোষ ছিল ভারতবাসীর দোষ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য নরনারীর গুণ যতগুলি ছিল ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের গুণ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। আমরা ঘরে ঘরে কামড়া কামড়ি করিয়াছি—ইয়োরোপীয়েরা ঠিক সেইরূপ কামড়াকামড়ি করিয়াছেন। আমাদের আওরাংজেব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন—হিন্দুতে মুসলমানে লড়াইয়াছেন। আওরাংজেবের সমসাময়িক ফরাসী নরপতি জগদ্বিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুই অবিকল এই মোগল সম্রাটের জুড়িদার ছিলেন। ফরাসী

বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯) ইয়োরোপের যে অবস্থা ছিল ভারতেরও তখন সেই অবস্থা ছিল। সুতরাং মোগল মারাঠার যুগ ভারতের নিন্দনীয় যুগ নয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা তুলিলেও বুঝিতে পারি যে, ইয়োরোপের মানুষ দেবতা নয়, এবং ভারতের মানুষ আনোয়ার নয়। যুগে যুগে ইয়োরোপীয়দের যতগুলি দুর্ব্বলতা সবলতা ছিল ভারতবাসীরও ঠিক ততগুলি দুর্ব্বলতা সবলতা ছিল। রক্তমাংসের মানুষ ইয়োরোপে হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গাহিত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কুসংস্কারে মজিত। রক্তমাংসের মানুষ ভারতেও হাসিত কাঁদিত, নাচিত, গাহিত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কুসংস্কারে মজিত।

এই কথাটা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এক শতবৎসরের প্রভুত্বের ফলে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমাদের পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করিতে অনেকটা নারাজ। এই জন্য যুবক ভারতের প্রথম অস্ত্র "হিষ্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম্" এবং "কম্পারেটিভ হিষ্টরি" অর্থাৎ "ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী" অথবা বিশ্ব সমালোচনার ইতিহাসের প্রয়োগ। বলা বাহুল্য এই আলোচনা প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের স্থান খুব বড়। বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্বের "ব্যাখ্যা" ও তাহাই এই বিচার প্রণালীর জীবন। এই কারণে যুবক-ভারত বাসি-ভারতের কথা ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে বাধ্য। ব্যাখ্যা কার্য্যে "প্রাণ-বিজ্ঞান" (বায়লজি) যুবক-ভারতের প্রধান সহায়। দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে চাগাইয়া তোলা হইতেছে—কিন্তু অতীত কি অতীত বেশে দেখা দিতেছেন? দেখা দিলেও সেই অতীত বর্ত্তমানের আলোকে ও উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে না কি? বস্তুতঃ যুবক ভারতের হাতে অতীত নবজীবনের একটা উপকরণ মাত্র। অধিকন্তু ইহা একমাত্র উপকরণ নয়। যুবকভারত নানা উপকরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বই যুবক-ভারতের ল্যাবরেটরি—মরা-ভারত অর্থাৎ ভারতের প্রত্নতত্ত্বটা বাদ পড়িবে কেন? বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়া পুরাণা ভারতের শক্তিপুঞ্জ ফেলিয়া দিলে বেকুবি করা হইবে। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত দিতেছি। মান্ধাতার আমলের গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক দর্শন, ও গ্রীক চিত্র প্রণালীই ষোড়শ শতাব্দীর নবীন ইয়োরোপ গড়িয়া ছিল। ইয়োরোপের মনু এরিষ্টটল খৃঃ পূঃ ৩৮৪-২২। তিনিই বেকন-অবতারে (১৫৬১-১৬২৬) নবরূপে দেখা দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে "রেণাসাঁস" বা নবজন্মের ব্যাপারটা আগাগোড়া মরা-গ্রীসেরই নবজীবন লাভ বৈ আর কিছু নয়। মরা হাড়েও ভেল্কি খেলান যায়। মরা হাড় ফেলিয়া দেওয়া চতুর মানুষের কার্য্য নয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন ইয়োরোপে একটা বিরাট আন্দোলন হইয়া গেল। উহা ফরাসী-বিপ্লবের ও নেপোলিয়ানী যুগান্তরের সমসাময়িক ১৭৮৯-১৮১৫। নাম রোমান্টিক আন্দোলন। জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সর্ব্বত্রই এই আন্দোলনে নরনারী নবজীবন লাভ করিয়াছে। ভিতরকার কথা খতাইয়া দেখিলে বুঝি যে এই আন্দোলনও অনেকাংশে মরা জিনিষেরই চাঙ্গান মাত্র। রোমান্টিক আন্দোলনের ভাবুকগণ মধ্যযুগের গল্প গুজব বীর কাহিনী "রেলিক্স্" অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব এবং অতীত কথার সরস ব্যাখ্যা ও রংচঙ্গান টিপ্পনী

সাজাইয়াই কিন্তীমাত করিয়াছিলেন। আর্ণাণ হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) এবং বিলাতী ব্লটের (১৭৭১-১৮৩২) কথা অনেকেরই জানা আছে। সাহিত্যবীর গেটে (১৭৪৯-১৮৩২) গট্‌জ্ নামক ষোড়শ শতাব্দীর এক আর্ণাণ ডাকাইত-বীরের জীবন বৃত্তান্ত নাটকাকারে প্রচার করেন। ইহা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইয়োরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। পুরাণা "নিবেলুঙ্" গাথাই ভাবুক আর্ণাণির জীবন ছিল। গে'টের "ফৌষ্ট" কাব্য ও এই ধরণেরই প্রত্নতত্ত্বের এক সদ্ব্যবহার।

কয়েকদিন হইল ইতালীতে ভাবুক প্রবর ম্যাজিনি (১৮০৫—৭২) মধ্যযুগের দান্তে-সাহিত্যকে (১২৬৫—১৩২১) নব-জীবনের ফোয়ারা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক ফরাসীদের "লামিজারেব্‌ল্ গ্রন্থ (১৮৬৩) দুনিয়ার জনসাধারণের পুরাণ এবং দরিদ্রের গীতা স্বরূপ। ভবিষ্যবাদের এই টাট্‌কা বিশ্বকোষ খানা যাঁহার রচনা তাঁহার কাব্য নাট্য গদ্যেও মধ্যযুগ বহু কথা কহিয়াছে।

ভারতে বিক্রমাদিত্যের কালিদাস ও তাঁহার কুমার সম্ভব এবং রঘুবংশ রচনা করিতে যাইয়া পুরাণা মালেরই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার মধ্যযুগে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস অতীতকে "ফিউচারিজমের" উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের "আদি কবি" বাল্মীকি দিগ্‌বিজয়ী গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে নববেশে দেখা দেন। আবার মোগল ভারতের রেনাসাঁস বা নবাভ্যুদয় কালে তাঁহার নূতন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

মরা হাড়ে ভেল্কি খেলান দুনিয়ার কবি সম্রাটগণের কার্য্য। মরা জিনিষের সদ্ব্যবহার "পূর্ত্ত স্থবি"গণের মাল মশলায় কায়দাকলান অতীতকে জাগান, প্রত্নতত্ত্বকে জীবনীতত্ত্বে দাঁড় করান কালিদাস-দান্তে-সেক্‌সপীয়ার-গেটে-হিউগোর অমর কীর্ত্তি। অতীত অতীত-বেশে আসেন না—ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য নবরূপে দেখা দেন। কাজেই যুবক ভারতের ভবিষ্যবাদে অতীত-নিষ্ঠা বিচিত্র নয় অতি স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, যুবক ভারত দেখাইতে চাহেন যে, অতীত ভারত কোনদিনই সৃষ্টি ছাড়া দেশ ছিল না। অন্যান্য মানবসমাজের সঙ্গে হিন্দুস্থানী মানবসমাজের লেনদেন প্রচুর ছিল। হিন্দুত্ব চিরকালই বিশ্বশক্তির বিরাট ঘূর্ণিপাকের মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিপাকরূপে বিরাজ করিত। দুনিয়ার হিন্দুসমাজ তাহার দাতব্য দান করিয়াছে। দুনিয়া হইতে হিন্দুসমাজ নব নব উপকরণ লাভ করিয়াছে। জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারতের নরনারী একাকী জীবনধারণ করে নাই। কাজেই বর্ত্তমান যুগে যুবক ভারত হিন্দুত্বকে যে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার উপর দাঁড়াইতে হিন্দুত্ব অতি সহজেই সমর্থ হইবে। বহুযুগে বহু যুবক ভারত হিন্দুত্বকে নব নব কর্ম্ম ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। হিন্দুত্ব প্রত্যেক ডাকেই সাড়া দিয়াছে। এই জন্যই হিন্দু সভ্যতা অমর। ভারতের জীবন ও দর্শন কোন দিনই জগতে পশ্চাৎপদ ছিল না—আজও পশ্চাৎপদ থাকিবে না। ইহাই হিন্দুত্বের বিচিত্র অমরতা। ভবিষ্যপন্থী বর্ত্তমাননিষ্ঠ জাতি মরিতে পারে না—যুগে যুগে নব নব শক্তি হজম করিয়া অগ্রসর হয়। ভারতের জীবন ও দর্শন প্রথমে এশিয়ার নরনারীকে খাড়া করিয়া তুলিবে-তাহার পর ইয়োরামেরিকার জীবন ও দর্শনের সঙ্গে বুঝা পড়া

করিবেন। জগতের ভবিষ্যৎ মানব সমাজ সেই নবীন হিন্দুত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। প্রত্নতত্ত্ব হইতেই যুবক ভারত এই ইঙ্গিত পাইতেছেন। এই জন্যই "বায়লজির" সেবক হইয়াও আমরা "আর্কিও লজি"তে মাতিয়াছি। যত্ন ভারতের আসল মূর্ত্তি যতই পরিষ্কার হইতে থাকিবে ভবিষ্যৎ সন্ধানিগের কার্য্য ততই সহজ হইয়া পড়িবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

জড় ও শক্তি তত্ত্ব

(MATTER AND ENERGY)

আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূততত্ত্বের সাধারণ আলোচনা করিয়াছি; গভীরভাবে আলোচনা করি নাই। সম্প্রতি ঐ বিষয়টিই একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিব।

যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল নহেন, যাঁহারা ভূত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন দিন ভাবেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ভূত বা জড় জিনিসটা এতই সরল ও সহজবোধ্য, যে তৎসম্বন্ধে চিন্তা প্রয়োগ পণ্ডশ্রম মাত্র। নেত্র উন্মীলন মাত্রেই যখন উহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন উহা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা মূঢ়তার পরিচয়।

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ভূত বা জড় বস্তুটা এত সহজবোধ্য জিনিস নহে। ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে; ইহার স্বরূপ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে ও চলিবে।

দেখা যাউক ভূত বা জড় বলিতে আমরা কি বুঝি। অন্য কথায় কার্য্য নাই; ব্যবহারিক বুদ্ধিতেই দেখা যাউক উহার স্বরূপটা কেমন? যাহার জগতে যাহার দেশ ব্যাপ্তি (entension) আছে তাহাই ভূত বা জড়। অর্থাৎ যাহা স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহাই জড়। কিন্তু ছায়াও ত স্থান অধিকার করিয়া থাকে; তবে ছায়াও কি জড়? তাহা ত নয়; ছায়া অবশ্য—আলোকের অভাব। অতএব বলিতে হইবে জড়ের লক্ষণটি ঠিক হয় নাই।

কেহ বলিবেন যাহার ব্যাপ্তি আছে ও গতি (motion) আছে, তাহাই জড়; কিন্তু এ লক্ষণটিও ছায়াতে প্রযুক্ত হইতে পারে। ছায়াও চলে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়।

অপর কেহ বলিবেন, গতি থাকুক আর না-ই থাকুক, দেশব্যাপ্ত ও ভারী হইলেই উহা জড় হইবে। যে বস্তু স্থান অধিকার করিয়া থাকে ও ভারী তাহা নিঃসন্দেহে জড়বস্তু।

এ লক্ষণটি অনেকটা ঠিক। কিন্তু ভারীত্ব জড়ের একটা আগন্তুক ধর্ম্ম—একটা নৈমিত্তিক গুণ, স্বাভাবিক (essential) গুণ নহে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে জড়বস্তুর ভারীত্ব থাকে না; পৃথিবীর কেন্দ্রাতিদেশেই উহার ভারীত্ব থাকে। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রগত হইলে কি জড় বস্তু অ-জড় হইয়া যাইবে? অতএব জড় বস্তুর জড়ত্ব ভারে নহে। পৃথিবী বা

তদ্বিধ কোন একটা বৃহৎ বস্তুর সামীপ্যেই জড় বস্তুর ভারীত্ব। ১।

তবে বলিব, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই জড়। অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহাদিগের যাহা গ্রাহ্য তাহাই জড় বস্তু। কিন্তু তাহাও বলা যায় না; কেন না প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন; চক্ষু যাহা দর্শন করে, কর্ণ তাহা শুনিতে পায় না; কর্ণ যাহা শুনিতে পায়, চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না; নাসিকার যাহা গ্রাহ্য, ত্বকের তাহা গ্রাহ্য নহে; সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়কে জড় বলিবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়কে জড় বলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে জড় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এবম্বিধ স্বতন্ত্রতা যেখানে বিদ্যমান সেখানে স্বতন্ত্র বস্তুগুলিকে একত্র করিতে না পারিলে, কোন বাহ্য বস্তুকেই সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না; এবং ঐ বস্তুতে একত্ব বুদ্ধির উদয় ও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সংযোজক কোন পদার্থ স্বীকার করিলেই তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিবে, এবং এই সংযোজক পদার্থকে জড়বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই জড়,—এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তে পরিণত হইবে।

আবার যদি বলা যায়, এই সংযোজক পদার্থটি জড় নহে, পরন্তু শক্তি স্বরূপ—শক্তিই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধকে সংযুক্ত করিয়া ঐ সংযোগকে একত্ব প্রতীতির অবলম্বন করিয়া তোলে;—তাহা হইলেও অন্য প্রকার সমস্যা উপস্থিত হয়। বলা হইয়াছে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়গুলিই জড়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ নহে বলিয়া জড়ের অতিরিক্ত একটা জিনিস, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শক্তি পদার্থটা যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, এবং জড়ও নহে, তখন উহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

পক্ষান্তরে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধকে জড় না বলিয়া জড়ের গুণ বলিয়াই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও গুণীস্থানীয় জড়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের যে পরিচয় নাই, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ইন্দ্রিয় জানে গুণকে, গুণীকে নহে, তবে গুণীকে জানিবে কে? গুণী যদি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া গুণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ঐ গুণীস্থানীয় জড় আর জড় থাকে না, আত্মার সংজ্ঞাভেদ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আত্মা হইতে উহাকে পৃথক বা বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করা যায় না। আর যদি গুণীস্থানীয় জড় স্বয়ং প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? যাহা হউক, এ সকল দার্শনিক সমস্যা পরিত্যাগ করিয়া আমরা একবার বিজ্ঞানের দিক হইতে জড়ের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। তবে একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের সংজ্ঞা বা স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মভাবে কোন কথা বলেন নাই। জড় বস্তুর সত্তা তাঁহারা মানিয়া লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উহার স্বরূপ সম্বন্ধেই তাঁহাদের পরীক্ষা ও অপরীক্ষা প্রযুক্ত হয়। জড়ের স্বরূপ লইয়া সকল বৈজ্ঞানিকই যে একমত, তাহা বলা যায় না। জড় পরীক্ষায় আরম্ভ হইলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

১। Matter, Et er and motion by Dolbear; বিজ্ঞান ৪০১ পৃঃ।

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে জড় মাত্রা কণিকার সমষ্টি (aggregate of mass-points)। কি প্রকারে এই মাত্রাবিন্দুগুলির উদ্ভব হয় প্রথিতনামা লর্ড কেলবিন (Lord Kelvin) তাহার একটা বিবরণ দিয়াছেন। উহা সংক্ষেপতঃ এই প্রকার। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে একটা অপরিচ্ছিন্ন, অনবরোধক নিরতিশয় দ্রব পদার্থ (continuous, frictionless, perfect fluid) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতঃ ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই পদার্থটির নাম ঈথর (ether)। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ এই অপরিচ্ছিন্ন পদার্থের অংশাবচ্ছেদে এক প্রকার ভ্রমিচক্রের (vortex-rings) উৎপত্তি হয়। এই ভ্রমিগুলি স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। সূক্ষ্মতম ভ্রমিগুলিই পরমাণুবাদীর পরমাণু স্থানীয়। অনেক ভ্রমি একত্র মিলিয়া স্থূল ভূত নির্ম্মাণ করে। পরমাণু স্থানীয় সূক্ষ্মতম ভ্রমিচক্রগুলি ঈথরেরই সূক্ষ্মতম মাত্রাবিন্দু। মাত্রা অর্থে পরিমাণ (quantity) কিন্তু এখানে মাত্রা ঈথরেরই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিমাণ। এই পরিমাণ বা মাত্রার ইংরাজী নাম mass। এই মাত্রাই জড়ের জড়ত্ব। ইহাই জড়ের স্বরূপ। কিন্তু এই মাত্রা নির্গুণ, অতএব স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। শক্তি সম্বন্ধেই উহা সগুণ জড় বস্তুরূপে প্রকাশিত।

যাহা হউক, এই মাত্রাতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার মূলীভূত যে ঈথর বস্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। কেন না বিজ্ঞান জগতে ঈথরের স্থান কোথায়—এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বোধ না থাকিলে বিশ্বব্যাপারের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই ঈথরের স্বরূপ এখনও বৈজ্ঞানিকগণ নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। অনেকে মনে করেন ঈথর পদার্থটি জড়ের উপাদান বটে, কিন্তু স্বয়ং জড়ধর্ম্মী নহে। কেন না জড় বলিতে যে সকল ধর্ম্ম বুঝা যায়, ঈথর তৎবিপরীত ধর্ম্মী। কেহ বলেন উহা তড়িন্ময় পদার্থ, কিন্তু তথাপি উহা জড় নহে। তড়িৎ জড়ের উপাদান, অথচ স্বয়ং অ-জড়। অতএব ঈথরের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করা ও উহার বিশেষণগুলিকে সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা নিতান্তই উচিত। এক্ষণে তাহাই করা যাউক।

১। ঈথর যে perfect fluid, তাহার অর্থ কি?

ইহার অর্থ এই যে, ইহা এত দ্রব যে ইহার মধ্যে চলন্ত কোন বস্তুই ইহা কর্ত্তৃক ঘর্ষণ জনিত বাধা প্রাপ্ত হয় না। অন্যান্য দ্রব পদার্থই তন্মধ্যস্থ চলন্ত বস্তুর বাধা জন্মায়। অন্য সকল দ্রব পদার্থেরই ঘর্ষণ জনিত বাধা দিবার ক্ষমতা আছে। কেবল ঈথরের সেই গুণটি নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনবরোধক (absolutely frictionless) পদার্থ। শীতকালে ধূমপান পান করিয়া সেই ধূম জোরে মুখ হইতে নিষ্কাশিত করিলে, দেখা যাইবে, উহা কুণ্ডলীর আকারে আকাশ মার্গে উত্থিত হইতেছে। এই কারণ বায়ুতে (primitive fluid) সেই প্রকার ঘূর্ণ্যমান কুণ্ডলীর বা ভ্রমি চক্রের (vortex-rings) উৎপত্তি হয়। কিন্তু ধূমের কুণ্ডলী বায়ুর ঘর্ষণে যেমন বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঈথরের কোন প্রকার ঘর্ষণ শক্তি না থাকায়, ঐ ভ্রমি চক্রের মূর্ত্তিগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। নিরতিশয় দ্রব (perfect fluid) হইলেও আবর্ত্তের বেগে ভ্রমি-চক্রের কাঠিন্য উপজাত হয়। বাস্তবিক কাঠিন্য (hardness, rigidity) গতি-বেগ জনিত গুণ বিশেষ।

২। বলা হইয়াছে এই অনবরোধক দ্রব পদার্থের ভ্রমি-চক্রই স্থূল জড় রূপে পরিণত হয়। বেশ কথা। কিন্তু এতাদৃশ পদার্থে ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি সম্ভাব্য কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। সচরাচর অল্প বিস্তর দ্রব পদার্থে (imperfect fluids) এ প্রকার ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি-নিবৃত্তি আমাদের পরিচিত। সে সকল স্থলে যে যে কারণে ঐ ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি হয় তাহার কতকটা সেই সেই দ্রব পদার্থের আত্মগত; আর কতকটা তাহার বাহ্য। আত্মগত বা আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে দ্রব পদার্থের অসম্পূর্ণতা (imperfection) ঘর্ষণ (friction) এবং সংশক্তি (viscosity) বাহনীয়। যে দ্রব পদার্থে এই ধর্ম্মগুলি নাই; তাহাতে যে ঘূর্ণীর উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণ কি? ঈথর বস্তুতে এমন কোন ধর্ম্মই স্বীকৃত হয় নাই। উহাকে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। সে অবস্থায় তাহার ভ্রমি-চক্রের উৎপাদক যোগ্যতাই অসিদ্ধ। পণ্ডিত Flint বলেন:—

"But a perfect fluid can neither explain its own existence nor the commencement of rotation in any part of it. Rotations once commenced in a perfect or frictionless and incompressible fluid would continue for ever, but it never could naturally commence. There is nothing in a perfect fluid to account either for the origin or cessation of rotation, and consequently nothing, on the vortex-atom hypothesis, to account either for the production or destruction of an atom of matter. The origin and cessation of rotation in fluids are due to their imperfection, their internal friction, their viscosity." (Theism pp. 114—115).

অপরিচ্ছিন্ন (continuous) এবং নির্ব্বিশেষ (homogeneous) বাহন পদার্থের (medium) যদি অংশ বিশেষে কোন আবর্ত্তগতিই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও ইহার নিষ্প্রতিরোধত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব হেতু, স্থানচ্যুতির পরে ইহার পূর্ব্বোত্তরকালীন অবস্থার কোন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হইবে না। সুতরাং ঘূর্ণীর বৈচিত্র্য বা বৈষম্য সম্ভবপর হইবে না। এক অখণ্ড স্বগতভেদ শূন্য ঈথরই অবশিষ্ট থাকিবে। Karl Pearson (১) বলেন;

"Treating the ether not as a conception but as a phenomenon, we find it difficult to realise how a *continuous* and *same* medium could offer any resistance to a sliding motion of its parts, for the continuity and sameness would involve, after any displacement, every thing being the same as before displacement. The idea of a perfect jelly appears to involve some change in structure as we magnify smaller and smaller elements larger and larger. Finally, any relative motion of translation as distinct from one of relation seems excluded by the idea of absolute incompressibility.

১. Grammar of Science p. 324.

এ প্রকার দ্রব পদার্থে যদি ভ্রমির (rotation) উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও সে ভ্রমিগুলির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈলক্ষণ্য রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। যে বস্তু অল্পাধিক পরিমাণে দ্রব—যাহার সংশক্তি গুণ আছে—তাহাতেই ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যে বস্তু অতি অল্প পরিমাণে দ্রব, তাহাতে উৎপন্ন ভ্রমি-চক্রের স্থায়িত্ব অল্পকাল ব্যাপী; এবং যে বস্তু অধিক পরিমাণে দ্রব, তদুৎপন্ন ভ্রমি চক্রগুলি অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী; কিন্তু যে বস্তু নিরবচ্ছিন্ন রূপে (perfectly) দ্রব, ভ্রমি-চক্রোৎপাদক কোন দৃষ্ট হেতুর কার্য্যকারিতা সম্ভবপর নহে। পণ্ডিত Ward বলেন :—

Vortex-rings in an absolutely perfect fluid would remain self-identical and undistinguished for ever vortex-rings in an indefinitely perfect fluid would so remain, not for ever but indefinitely long. But, *per contra*, vortex-rings in an indefinitely frictionless fluid could be originated through such processes as we find setting up vortices the imperfect fluids about us ; on a perfect fluid such processes would have no hold."

৪। ঈথর এক অখণ্ড পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত। যে বস্তু অখণ্ড তাহা সাবয়ব (atomic) হইতে পারে না। কেন না, যাহা সাবয়ব, তাহা ক্ষুদ্রতম অবয়বের (component parts) সংহতি মাত্র। সংহত বা সাবয়ব বস্তুমাত্রেই অস্ত ও অনিত্য। যাহা অস্ত ও অনিত্য, তাহাকে জগতের মূল প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এবং সাবয়ব বস্তুর অবয়ব নিরপেক্ষ সত্তা সিদ্ধ নহে। এমন কি উহার অবয়ব রাশিই সত্তাশীল; অবয়ব সত্তাতিরিক্ত সত্তা উহার নাই। ঈথরকে যৌগিক বা সংঘাত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আরও এক দোষ আসিয়া পড়ে। উহার অবয়বের মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। এই ব্যবধান অবশ্য শূন্য (empty space)। তাহা না হইলে—অর্থাৎ এই ব্যবধানের মধ্যে যদি অন্য ঈথরের সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধেও ঐ প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে। এই প্রকারে অনবস্থা regresses and infinitism) দোষ উপস্থিত হয়। আবার অবয়বান্তর্গত ব্যবধান শূন্য হইলে সর্ব্ব ভৌতিক বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ব্যবধানের এই শূন্যের ভিতর দিয়া হয়, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু ভৌতিক বস্তুর এই নিরালম্ব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া action at a distance বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ। ইত্যাদি কারণে সাব্যস্ত হইয়াছে ঈথর অখণ্ড বস্তু। অর্থাৎ ইহার অবয়ব নাই। বেশ কথা।

এখানে আপত্তি এই;—যাহার অবয়ব—অংশ নাই, এমন বস্তুর ভ্রমি বা ঘূর্ণী কেবল কোন অংশাবচ্ছেদে হইতে পারে না। উহা বস্তুত যাবত-দ্রব-বৃত্তি হওয়াই উচিত। ঈথরের অংশ না থাকায়, ঐ ভ্রমিগুলিকে অংশ বিশেষে সমুৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা ন্যায় সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ ঈথর নির্ব্বিশেষ বস্তু; উহার অংশ বিশেষ কল্পিত হইলেও, ঐ কল্পিত অংশেরও কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না; কেন না তাহাতে নির্ব্বিশেষত্বের হানি হয়।

ইত্যাদি হেতু বশতঃ বলিতে হইবে ঈথরের ঘূর্ণী ব্যাপ্যবৃত্তি, অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। অর্থাৎ ঈথরের অখণ্ড আলোড়নে বা ঘূর্ণনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি হইবে না। ঈথর তাহার অনন্ত বিস্তৃত কায় লইয়া স্বয়ং একাকার ভাবে ঘূর্ণ্যমান হইবে। এক অখণ্ড, সমাকারে ঘূর্ণ্যমান পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইবে না। খণ্ড খণ্ড জড় বস্তুর উৎপত্তি হইবে না—বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইবে না। পূর্ব্বেও যে নির্ব্বিশেষ ছিল, এখনও সেই নির্ব্বিশেষ থাকিবে। এক্ষণে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন ইহা হইতে জগৎ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কতদূর সম্ভাব্য।

৪। ঈথরের গতির অর্থাৎ আবর্ত্ত গতির (rotation) উৎপত্তি সম্বন্ধেও সন্দেহ বিদ্যমান। প্রথমতঃ ঈথর নির্ব্বিশেষ পদার্থ এবং অনন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তাহার বাহিরে কোন বস্তু নাই। যদি বাহিরে কোন বস্তু না থাকে, যদি পারিপার্শ্বিক না থাকে, তবে ঘাত প্রতিঘাতের অভাবে নির্ব্বিশেষ বস্তুর সাম্যভাবের বিচ্যুতি অসম্ভব। অগত্যা বলিতে হইবে ঈথরে যে গতি বিদ্যমান তাহা অনাদি; অর্থাৎ গতি ঈথরের স্বাভাবিক ক্রিয়া; ঈথর যতদিন, উহার গতিও ততদিন। কিন্তু যেহেতু ঈথর নির্ব্বিশেষ বস্তু, সেই হেতু ইহার গতিও সর্ব্বত্র সমাকার (uniform); গতির প্রকার ভেদ ও বৈচিত্র্য তবে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? বাহ্যকারণ না থাকায় ঐ গতি চিরকাল অভিন্নরূপে চলিতে থাকিবে; এবং ইহার দিক (direction) ও হার (rate) সর্ব্বদা একই প্রকার থাকিবে; তাহার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হইবে না। পক্ষান্তরে এই ঈথর যদি গোড়া হইতেই নিশ্চল থাকে, তবে তাহার গতি মন্দাই বাহ্যকারণ নিরপেক্ষ অব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে। পণ্ডিত Stalls বলেন:—

But apart from this, it is plain that the derivation of the forms and movements of the stiller and planetary systems from a primordial homogeneous mass uniformly diffused through out space is impossible. In the first place, such a mass must be either at rest or in uniform motion, and this state of rest, or uniform motion according to the most elementary principles, could be changed only by extraneous impulses or attractions. And there being no 'without' to the all —embracing cosmos or chaos, the original state of rest or uniform motion would necessarily be perpetuated. (Concepts of Modern Physics.)

মহামতি Clifford তাঁহার "Lectures and Essays" নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩৮ (f) পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

"A true explanation describes the previous unknown in terms of the known; thus light is described as a vibration, and such properties of light as are also properties of vibrations are thereby explained. Now a perfect fluid is not known a thing, a pure fiction. The imperfect liquids which approximate to it, and from which

the conception is derived, consist of a vast number of small particles perpetually interfering with one another's motion..... Thus a liquid is not an ultimate conception, but is explained—it is known to be made up of molecules and the explanation requires that it should not be frictionless. The liquid of Sir William Thompson's hypothesis is continuous, infinitely divisible, not made of molecules at all, and it is absolutely frictionless. It it as much a mere mathematical fiction as the attracting and repelling points of Boscovich.

৬। ঈথরকে যে দ্রব (fluid) পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সে বর্ণনাও সত্য হইতে অনেক দূরে। দ্রবত্ব, কাঠিন্য, বাষ্পীয়ত্ব তরলত্ব, প্রভৃতি ধর্ম অবয়বের সংস্থান সংঘটিত। নিরবয়ব পদার্থে তাহাদের আরোপ সর্বথা অযৌক্তিক। ইহারা নির্দিষ্ট ধর্ম (definite qualities); কিন্তু ঈথর অনির্দেশ্য; সুতরাং দ্রব, কঠিন, বাষ্পীয় ইত্যাদি কোন প্রকার বিশিষ্টতাবোধক বিশেষণই তাহাতে প্রযোজ্য নহে। অধ্যাপক Lodge বলেন—

"Ether is often called a fluid, or a liquid, and again it has been called a solid.....but none of these names are very much good; all these are molecular groupings and therefore not like ether; but let us think simply and solely of a continuous frictionless medium possessing inertia, and the vagueness of the motion will be nothing more than is proper in the present state of our knowledge.—The Ether and its functions.

৭। যদি আমরা অধ্যাপক Lodge এর অনুরোধে ঈথরকে উক্ত লক্ষণে লক্ষিত করি তাহা হইলে ফলে কি দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে, ঈথরে ও শূন্যে (space) কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না। ঈথর যেমন অসংকোচ্য (in compressible) অবিস্তার্য (ineaxtensible) নির্বাধ (frictionless) নির্ব্বিশেষ Structureless এবং অনন্ত (infinite) শূন্যও সেই প্রকার বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য না থাকায় ঈথরবাদ শূন্যবাদে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহাই কি বিজ্ঞানের চরম পরিণতি?

কেহ উত্তর করিতে পারেন—এ সকল ধর্মে ঈথর ও শূন্যের কোন ভেদ নাই বটে, কিন্তু ঈথরের মাত্রা (mass) বা জড়ত্ব (inertia) আছে, শূন্যের তাহা নাই। এই মাত্রা বা জড়ত্বই উভয়ের ভেদক ধর্ম। এ কথার জবাবে অধ্যাপক Ward যাহা বলিয়াছেন অনতিবিলম্বে তাহা বিবৃত হইবে। আপাততঃ এই ঈথর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিরোমণি Haeckelএর মতটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

মহাত্মা হিকেলও ঈথরের ঐ প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করেন। তবে কেলবিনের ন্যায়, তাহাতে ভ্রমি-চক্রের উদ্ভব হয়, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঈথরে একটা শক্তি আছে, যাহাকে সাম্যতা প্রবৃত্তি বা প্রবণতা (tendency to con-

densie—to contract)। এই প্রবণতা বশতঃ ঈথর সমুদ্রে অসংখ্য সান্দ্রতার কেন্দ্র (centres of condensation) সমুৎপন্ন হয়। অণাট বাঁধিবার তারতম্য হেতু ঐ কেন্দ্র নিচয়ের আয়তনের হ্রস্ব দীর্ঘতা ঘটে; কিন্তু ঐ কেন্দ্রগুলির আয়তন অনপায়ী। ইহারা পরমাণুবাদীর পরমাণুর অনুরূপ। অনেকগুলি কেন্দ্র সম্পিণ্ডিত হইয়া মহৎ পরিমাণ পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। ইহাদের প্রভাব সন্নিহিত অপরাপর পিণ্ডের উপর প্রসারিত হয়। এই প্রণালীতে মৌলিক ঈথরের সাম্যাবস্থাও বিপর্যস্ত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র বস্তুর অভিব্যক্তি হয়। (১)

উপরি-উক্ত মতের বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি আছে। "Religion as a credible doctrine" নামক গ্রন্থ প্রণেতা Mallock তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম আপত্তি এই :—

The ether, as we have seen, is structureless, homogeneous, the same always and everywhere. Why then, if it tends to condense into ponderable matter at all, does it tend to condense in one place more than in another? How do the atoms which result from its condensation acquire that variety of character to which their subsequent contributions are due? In a word, how does absolute simplicity resolve itself into specific complexity?

তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি :—The elementary substance either consists of minute separate particles, or it is continuous. If it consists of disjoined atoms, separated by empty spaces, all action must be "an action at a distance" which science rejects as absurd and impossible. If it is continuous yet the atoms of ponderable matter arise from it by condensation then we are postulating condensation and rarefaction in a substance which has no particles to be pushed closer together or thrust wide asunder. But the elementary substance must be one or the other so that in either case we accept a contradictory proposition."

ইহার তাৎপর্য্য এই প্রকার। ঈথরীয় পরমাণুর মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করিলে শূন্যের মধ্যদিয়া জগতের ক্রিয়াদি হয় ইহাও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, এবং যে বস্তুর পরমাণু নাই, তাহার সান্দ্রভাব কল্পনা ইহাও অবিরোধী। এই বিকল্পের যে পক্ষই ধরা যায়, এই প্রকার সমস্যা দুর্নিবার হইয়া পড়ে।

এক্ষণে দেখা যাউক, শূন্য হইতে ঈথরের পার্থক্য কোথায়। বলা হইয়াছে ঈথরের মাত্রা বা জড়ত্ব আছে, শূন্যের তাহা নাই; সুতরাং ইহাদ্বারাই ঈথরকে শূন্য হইতে পৃথক করিতে হইবে। আচ্ছা জড়ত্ব বা

(১) The Riddle of the Universe—R. P. A. series pp. 77-78 and 81. (মূলপ্রকৃতির নাম "Prothyl")।

আছে জিনিসটা কি, উহা নিরূপণের উপায় কি ?

"পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব। এই ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর মাত্রা নিরূপিত হয়। যে কোন দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয়, অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জ্জন করে। যদি সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের বস্তু সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে উভয়ের বস্তু অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার বস্তু অল্প যেটার বেগ অল্প হইবে সেটার বস্তু অধিক • • • • • • পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয় তাহাতে অল্প বস্তু ও যাহা অল্প বিচলিত হয় তাহাতে অধিক বস্তু আছে। দুই সমান বস্তু সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগই অর্জ্জন করে। বস্তু পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়। ওজন করিয়া বস্তু নির্দ্দেশের চেষ্টা অনুচিত, কেননা, স্থানভেদে তাহার তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহা জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। • • • পূর্ব্বে বলিয়াছি ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন; ঘোড়া থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত।"*

ত্রিবেদী মহাশয়ের বাক্যগুলির অর্থ বুঝিতে আমার একটু গোল হইতেছে। তিনি একবার বলিতেছেন "ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব"; আবার বলিতেছেন "বস্তুই জড়ের জড়ত্ব।" অতএব গোল হইতেছে ব্যাপারটা কি! ক্ষমতাই কি বস্তু? আমরা কি বলিতে পারিব, জড়ত্ব – ক্ষমতা = বস্তু? আবার উদ্ধৃত বাক্যের শেষাংশ দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন inertiaকেই জড়ত্ব বলিতেছেন। কিন্তু inertia ক্ষমতা নহে, বরং ক্ষমতার অভাব। জড়ের জড়ত্ব কি? Mass। Mass কি? মাত্রা বা পরিমাণ। কিসের পরিমাণ? ইহার উত্তরে যদি বলা যায়, quantity of matter অর্থাৎ জড়ের মাত্রা, তাহা হইলে ফলে এই প্রকার দাঁড়ায়—জড়ত্ব—জড়ত্বের মাত্রা। কিন্তু ইহার কোন অর্থ হয় না। অতএব mass অর্থে মাত্রা বলিলেও, কিসের মাত্রা, তাহা না জানিতে পারিলে জড়ত্বের কোন ধারণা হয় না। সেইপ্রকার Mass অর্থে 'বস্তু পরিমাণ' গ্রহণ করিলেও যে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুটির স্বরূপ জানা না যাইবে সে পর্য্যন্ত জড়ত্বের কোন পরিস্ফুট ধারণা হইবে না। মনে রাখিতে হইবে আমাদের প্রশ্ন "জড়ত্ব কি?" সুতরাং জড়ের ভাষায় উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না।

যাহা হউক এই mass বা বস্তুমাত্রা জিনিসটা কি তাহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ-ভাবে চিন্তা করা যাউক। পণ্ডিতবর Ward এই বস্তুতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"To each body a number is to be assigned, such that the changes of their motion are inversely proportional to these numbers. Such number answers to the mass of the

* জিজ্ঞাসা ৪০২, ৪০৭, পৃঃ।

body to which it belongs. Its determination, of course, in any real case involves measurement, and is the business, not of abstract dynamics, but of experimental physics. The actual number again depends on the standard employed, but, once so determined, by dynamical transaction with the standard it is determined once for all for every other dynamical transaction with other masses numbered according to the same unit. The appropriateness of defining mass as quantity of intertia, i.e. as the measure of that tendency to persistence of the *motor status quo* which preceded the particular dynamical transaction under investigation, is thus evident, for the greater the mass, the less in any given case the change of motion that ensues ; the less the mass the greater the change of motion—kinematically estimated of course. Thus, if the mass of one of the two bodies is infinite, its kinematic circumstances are unaltered ; if the mass of one be zero, that of the other, however small, under goes no acceleration ; where both are equal, the acceleration of both are equal ; and so for every other case. So far then from falling under the category of substance, a mass as it occurs in abstract dynamics is but a coefficient affecting the value of the acceleration to which it is affixed. *

উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে mass=inertiaর মাত্রা। এ জিনিসটার mass অধিক, ইহার অর্থ এ জিনিসটার inertiaর মাত্রা অধিক। কিন্তু এই inertia একটা দ্রব্য (substance) নহে, একটা অভাবাত্মক ধর্ম (negative property)। ইহাকে ক্ষমতা বলা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য। আমার মনে হয় সঙ্গত নহে, বরং ইহাকে ক্ষমতারাহিত্য বলিলে সত্যের অনেক কাছাকাছি হয়। ইহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। ইহার অর্থ "inability of matter to alter its existing state." কিন্তু ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি হইবে ঠাহর করিতে পারিতেছি না।

বোধ হয় ইহাকে 'স্ব-ভাব-স্থিতি-সংস্কার' বলা যাইতে পারে। এই সংস্কার আছে বলিয়াই চলন্ত দ্রব্য নিজের বেগ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না, একই ভাবে চলিতে থাকে ; অথবা স্থির দ্রব্য গতিশীল হইতে পারে না। অতএব স্ব-ভাবের পরিবর্তন করিতে না পারাই inertiaর বা স্ব-ভাব স্থিতি সংস্কারের অর্থ।

গতির বেগ দ্বারা এই সংস্কারের নিরূপণ করা চলে বটে, কিন্তু সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধেই উহা সম্ভবপর। যেখানে দ্রব্যটি অসীম, সেখানে থাকা ছিবার ও থাকা যাইবার কথা

* Naturalism and Agnosticism.—p.p. 59. Vol. I.

উঠিতে পারে না। ঈথরের mass থাকিলে তাহাও যেমন অপরিমেয়, ঐ সংস্কারের মাত্রাও তেমনি অপরিমেয়। কিন্তু অপরিমেয় মাত্রা এই দুটা শব্দ পরস্পর বিরোধী। অপরিমেয়ের সম্বন্ধে মাত্রা শব্দ ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অসীম দ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে পরিমাণ গুণের পর্য্যায় হইয়া দাঁড়ায় (quantity becomes quality)।

এক্ষণে যদি আমরা প্রশ্ন করি জড়ের জড়ত্ব কি? তাহার উত্তরে বলা যায় mass, অর্থাৎ quantity of inertia, অর্থাৎ স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কারের মাত্রা। তাহা হইলে জড় হইতেছে তদ্বিশিষ্টতা, অর্থাৎ ঐ সংস্কার বিশিষ্টতা। তাহাই জড় যাহা ঐ সংস্কার বিশিষ্ট।

কিন্তু এই সংস্কার বিশিষ্টতার দ্বারা অসীম দুইটি পদার্থের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করা দুরূহ। ঈথর অসীম; শূন্যও অসীম; এস্থলে যদি বলা যায় এই সংস্কার বিশিষ্টতা থাকায় ঈথর শূন্য হইতে ভিন্ন তাহা হইলে বাস্তব ভেদ নিরূপিত হয় না। কেন না, পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সংস্কারটি অভাবাত্মক ধর্ম্ম (negative property)। এই অভাবাত্মক ধর্ম্ম দ্বারা ইহাকে শূন্য হইতে ভেদ করা যায় কি প্রকারে? যদি কেহ আপত্তি করেন, "শূন্য নিজেই অভাবাত্মক; ঈথর ভাবাত্মক সুতরাং ঈথর শূন্য হইতে পারে না।"—ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য, ঈথর অতীন্দ্রিয় পদার্থ; শূন্যও অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ঈথরের সত্তা প্রমাণাধীন, শূন্যের সত্তাও প্রমাণাধীন। যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈথরের সত্তা সিদ্ধ হইবে, সে ধর্ম্ম দ্বারা শূন্যের সত্তাও সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা ঈথরের সত্তা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়, সে সকলগুলি অভাবাত্মক ধর্ম্ম। একটিও ভাবাত্মক নহে। ঈথর নিরবয়ব (structureless), নির্ব্বিশেষ (distinction less), অপ্রতিরোধক (frictionless), অসংসক্তি (wanting in viscosity), অসংকোচ্য (incompressible), অবিস্তার্য্য (inextensible), অসীম (infinite)। এক্ষণে কেবল দেখিতেছি ঈথর mass আছে। কিন্তু এই mass ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি উহা স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কারের মাত্রা। স্বভাবস্থিতি সংস্কারের অর্থ, স্বভাবের অন্যথাভাব করিবার অক্ষমতা (inability to alter its existing state)। সুতরাং ইহাও অক্ষমতার পরিচায়ক। ইত্যাদি কারণে ঈথরকে শূন্য হইতে ব্যাবৃত্ত করিবার উপায় কি?

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে, শূন্যের সান্দ্রত্ব (density) নাই, ঈথরের সান্দ্রত্ব আছে; ইহাই উহার ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম! সান্দ্রত্ব বিশিষ্টতাই ঈথরকে শূন্য হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। এ আপত্তিও অসার। কেননা, ঈথরের সান্দ্রত্ব, অনুভবের হিসাবে, কিছুই নহে। উহার কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন নাই। বিশেষতঃ গতি-বিজ্ঞান অনুসারে গতি সান্দ্রত্ব-সাপেক্ষ নহে সুতরাং সান্দ্রত্ব থাকিলেও উহার সার্থকতা নাই। উহা না থাকিলেও যাহা হইত, থাকিলেও তাহা হইতে পারে; উহার অস্তিত্ব ঈথরের বিশিষ্টতার নিয়ামক নহে। আবার নিরবয়ব দ্রব্য সান্দ্রতা বিশিষ্ট কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ঈথর হইতে ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি যেমন একটা পুথক ও বিস্ময়কর ঘটনা; শূন্য হইতে উহার উৎপত্তি তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কার বিষয়টা কি ও তাহার দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারে কি না Ward তাহার সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন তাহা পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ উদ্ধৃত করা গেল।*

কেহ বলিতে পারেন ঈশ্বরকে নিষেধমুখে (negatively) লক্ষিত না করিয়া বিধিমুখেও (positively) লক্ষিত করা যায়। ঈশ্বর মাত্রা বিশিষ্ট (massive), নিয়তসান্দ্র (of constant density), নিরতিশয় চলত্বভাব (perfectly mobile), অত্যন্ত এক রস (absolutely homogeneous) অত্যন্ত দ্রব (perfectly fluid)—এ প্রকার বলিলে ঈশ্বরকে ভাবমুখেই ব্যক্ত করা হয়। নিষেধ মুখে বর্ণনা একটা কথার মারপেঁচ মাত্র, তাহাতে উহার সত্তার বাধা হয় না। এ আপত্তিটি আপাতরমণীয়, কিন্তু বিচারসহ নহে। ঈশ্বরের বিশেষণগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিলে ইহারা যে নিষেধমুখী বিশেষণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে সকল ভাবমুখী বিশেষণ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে, তাঁহাদের বিশেষণ গুলির সহিত একত্র গ্রহণ করিলে, ঐ ভাবমুখী বিশেষণগুলিও নিষেধমুখে পর্য্যবসিত হয়! বিশেষতঃ সাপেক্ষ ভাবের সহিত (with relative ideas) নিরপেক্ষ ভাবের (absolute ideas) সংমিশ্রণে প্রতি-

* "Inertia is a qualitative term and in its primary sense of inability or incapability is obviously negative. So young defined inertia as the incapability of matter to alter its existing state except under the influence of some external cause. To allow that this universal plenum has inertia then does not remove its indeterminateness. Before it can be determined in any way, some cause must intervene from without, and such intervention will not admit of physical description. Such cause is of the nature of creation or miracle; it is neither a force in the sense of attraction or repulsion by which Boscovich and Kant sought to explain matter, nor is it force in the modern sense of mass-acceleration. In other words, in the kinetic ideal of matter we shall find that the notion of mass is used with two distinct and inconsistent connotations. Abstract Mechanics, as we have seen, sets out from definite masses or bodies having assignable positions, between every two of which there are dynamical transactions. *Two* masses, that is to say, measure each other by their mutual accelerations; in other words, mass is a strictly quantitative notion, and as such implies a relation to a standard. Not only is mass in this wise always a relative quantity, but it is relative again in implicating the correlative notion of moving forces or stress between masses which, as just said, is the only means of determining mass. If we attempt to apply this notion of mass to a universal homogeneous plenum, it lapses back into merely the qualitative notion of incapability of change evenly diffused through all immensity. And definite forces—necessarily present where there are definite masses to interact—seem here excluded. . Every thing chemical or thermal or electrical is excluded, for the medium is throughout homogeneous and structureless. In like manner gravity, elasticity, and cohesion seem incompatible with absolute inviscidity and uniform density. Accordingly, to secure stability, when this medium is churned up into a labile ether it must be provided with a fixed boundary or be extended to infinity. Mathematically these alternatives may come to the same thing, though the latter, *i.e.*, infinite extension, seems the simpler and less arbitrary of the two, again showing how little there is to choose between a vacuum and this plenum (Naturalism and Agnosticism Vol. I—p. 133.)

পক্ষে বস্তুটি আরও দুর্ব্বোধ্য করা হয়, সুগম করা হয় না। দ্রব ভাবটি সাপেক্ষক; কিন্তু উহার বিশেষণটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষক। এই প্রকার অন্যত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে ঈথরের এমন কোন ধর্ম্মই উপপন্ন হইতেছে না যদ্দ্বারা উহাকে শূন্য হইতে বিশেষিত করা সম্ভবপর। ঈথরে inertia অর্থাৎ স্বভাব স্থিতি-সংস্কার আছে। যাহা এই সংস্কারের আশ্রয়, তাহা তদতিরিক্ত বাহ্যশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহার প্রবৃত্তি তাহার স্বাধীন নহে, অন্য হইতে আগত। এমন বস্তুর সংক্ষোভ বা আবর্ত্ত পরাধীন। যাহার প্রবৃত্তি ও সত্তা পরতঃ সিদ্ধ, তাহাকে জগতের মূল প্রকৃতি বলা সঙ্গত কি না সুধীগণের বিচার্য্য। গতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র বাধিত হয় বলিয়া ঈদৃশ বস্তুর স্বাধীন প্রবৃত্তি ও স্বীকার করা যায় না।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

রবির রবি

কোথাও সে ত লুকায়ে নাই জ্বালিছ মিছে প্রদীপচয়
সে ত গো নহে ঘন তমসালিপ্ত,
অতীন্দ্রিয় করেছে তারে আলোর ভূমা, অভাবে নয়
ভানুর ভানু সে যে গো মহাদীপ্ত।

অমৃতরবি জ্বেলেছে যেবা সেকি গো কভু আঁধারে রয়,
আলোকজালে হারালে পথভ্রান্ত,
ভানুরে কেবা হেরিতে বলো প্রদীপ জ্বালে গগন ময়,
আলোর ভূমা হয়েছে তব শ্রান্ত।

তাহার পানে চাহিতে ওগো ঝলসি যাবে তোমার চোখ
আগুন হয়ে উঠিবে সারাগাত্র,
যে আঁখি তব ঝলসি যায় সে আঁখি তব দগ্ধ হোক্
চাহিতে হবে তবুও অহোরাত্র।

যে আঁখি তব তাহার তেজ সহিতে কভু পাবেনা হায়
দগ্ধ হলে সে আঁখি সমিধ,
অন্তরে যে খুলিবে তব নূতন আঁখি উজল ভাষ
সৌম্য হবে চন্দ্রালোক স্নিগ্ধ।

ফুটিলে সেই মনের আঁখি ইন্দু হয়ে দীপ্যমান
সে যে গো প্রাণকুমুদে সুধা বণ্টে
কঠোর তপে স্নেহের আঁখি কোটির গন্ত হইলে ম্লান
প্রাণের আঁখি হেরে গো নীলকণ্ঠে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পদাবলী

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজার সদৃশ কবি খুব কম। তাঁহার মত এত পদ মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে আর কেহ রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। সে গুলি বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গালী পাঠকবর্গের গোচরীভূত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল রাজসাহী—ঘোড়ামারানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় আমা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়া মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী বিভিন্ন খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবনী প্রভৃতি তৎকর্ত্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৃহস্থেও সৈয়দ মর্ত্তুজার সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

সম্প্রতি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করিতে করিতে একখানি অতি প্রাচীন 'রাগনামা' (সঙ্গীত গ্রন্থ) আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান বহুল কবির বহুল পদাবলী সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পদগুলি বাছিয়া লইয়া অদ্য 'গৃহস্থের পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পদগুলি যেমন পাইয়াছি, বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া তেমনই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

রাগ—ধানশী।

আমি সে তোহ্মার নাথ আহ্মি সে তোহ্মার।
সবে মাত্র বুলিএ আহ্মার। ধু।
মনে জানে তনের কথা কারে বা বুঝাইমু।
আহ্মার ধন তোহ্মারে দিআ তোহ্মার দৈআ যৈমু॥
বার মাসের তের ফুল ফুটিআ গৈল ডালে।
আমার প্রভু ঘরে নাই ফুল গাথিআ দিমু কার গলে॥
বার মাসের তের ফুল ফুটিছে স্থাবরে।
দুই নারীর করম দোষে ফুল ঝরিআ ঝরিআ পড়ে॥
ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ী মধ্যে ক্ষীর নদী।
উড়ি জাইতুম সাধ করে পাখা না দে(ই) বিধি॥
হৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে এহি বার বার।
ঝরিল বৃক্ষের পত্র ন লাগিব আর॥ ১।

রাগ—ধানশী।

দারুণ পুষ্প হামো না বোলাএ।
দারুণ জাউ মোর ধরান না জাএ ॥ ধু।
একতি শশুরি মোর বহুল সতীন।
সব তেল ভাগ্যবতী হাম তেল হীন ॥
বসন চরাইমু অঙ্গে মুড়াইমু কেস
ঘরে ঘরে পুষ্প লাগি করিমু উদ্দেশ ॥
শিঙ্গা ফুকিমু রে ভুমুক বাজাইমু।
দেশে দেশে পুষ্পার লাগি ভিক্ষা মাগি খাইমু ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে হাম অভাগিনী।
জীবনের সাধ নাই তেজিমু পরানি ॥ ২।

———

রাগ—মালব।

সজনি গো সই তুহ্মি নাকি আহ্মারে বোল।
কালিআ কাহ্নর বাঁশী বোলে কথ রোল ॥ ধু।
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয়।
তেকারণে কানাইর বাঁশী রাধার নাম লএ ॥
চূড়াএ শিখণ্ডী পুষ্প অলখর কালা।
বআনে পুরল বাঁশী কদম সে হেলা ॥
শুনিতে বাঁশীর ধ্বনি পিকরব জিনি।
হেলাএ হরল মন কুলের কামিনী ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে আধা সোণা বাঁধা।
নাম ধরি ডাকে বাঁশী মোর নাম রাধা ॥ ৩।

———

রাগ—ধানশী বেলাবলী।

আনি আনি অগো রাই
কালা আইবে আহ্মারে ছমুআই ॥ ধু।
কালা আইব নাএ নাএ আহ্মি আইমু তরে।
কালার আহ্মার হৈব দেখা ঐ কদম তলে ॥
ঐ কুলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী।
উড়ি আইতুম সাধ করে পক্ষ না দে(ই) বিধি ॥

ঐ কুলে বাজাএ বাঁশী ঘরে বসি শুনি।
কিরূপে হইমু পার কোলে আছু মণি॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে শুন বনমালি।
পাপিআ পুসিআ জৌবন কারে দিমু ডালি॥ ৪।

রাগ—রামক্রিয়া ভাটীয়াল

সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না।
আর জীব না রে সখি আর জীব না॥ ধু।
পূআ পূআ করিআ বালুসে দিলুম কোর।
উলটি পলটি দেখম পূআ নাহি মোর॥
কলসীত জল নাহি জমুনা বহু দূর।
চলিতে না চলে পাও চরণে নেপুর॥
ঘরে আছে গুরু জন তারে না ডরাই।
মনের ভরমে আমি কানুরে হারাই॥
কেহো বোলে কালা কালা কেহো বোলে শ্যাম।
মুছলমানে কলমা পড়ে হিন্দু বোলে রাম॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে প্রেম অনুদিন।
রাধা কানুর এক প্রাণ শরীর নহে ভিন॥ ৫।

রাগ—কানাড়া

রে শ্যাম তোহ্মার মুরলি বড় রসিআ। ধু।
উচ্চ স্বরে বাঁশী বাজে কুলের কামিনী সাজে
কোটি কোটি চান্দ পড়ে খসিআ॥
তোহ্মার হৃদের মাঝে অমুল্য রতন আছে
দেখিলে গোপিনী নিব কাড়িআ।
নন্দের ছাওআল বুলি পদ্মে করে ঠেলাঠেলি
কেলিআ কদম্বতলে বসিআ॥
সাধিতে আপনা কাজ ভাত নাহি কুল লাজ
জলের নিঝরে রৈলাম বসিআ।
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে পর কি আপনা হএ
কলঙ্ক রহিল জগ ভরিআ॥ ৬।

রাগ—নট গান্ধার।

মন মোর কি দিআ বান্ধিমু।
আজু কালু করি মন কথেক ভাবিমু * ॥ ধু।
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর।
প্রিআ বিনয়ণে মোর ঝুরে নিরন্তর ॥
আপনা করম দশা কি বুলিমু কারে।
খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে ভেজিলুং সংসার।
পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার ॥ ৭।

রাগ—তুরি ভাটিয়াল।

শ্যাম আর না লএ মনে।
ত্রিভুবন মোহন রূপ লাগিছে নয়নে ॥ ধু।
মণিময় কুণ্ডল কর্ণেতে দোলে।
নব রঙ্গ বনমালা হিআর মাঝে লোলে ॥
চরণে শরণ লৈলুম ন ভাসিঅ ভিন।
সহজে অবলা মুঞি পরের অধীন ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে রসময় শ্যাম।
চরণে শরণ লৈলুং পাইআ নিজ নাম ॥ ৮।

তুরি গৌরী আছোয়ারী।

মজাইলু রে জাতি রসিআ নাগরের হাতে। ধু।
তুহ্মি বন্ধু বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে।
কলঙ্ক রহিল রাধের গোকুল সমাজে ॥
এক হাতে শুআ বন্ধু আর হাতে পান।
জাহার বন্ধুআ তুহ্মি তাহার পরাণ ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে প্রেমের জ্বালা কালা।
ষোল শত গোপিনীর মধ্যে রাধা গলার মালা ॥ ৯।

---

* 'ভাবিমু' স্থলে 'ভাড়িমু' (ভাঁড়িমু) ও পাঠ করা যায়। ভাঁড়িমু—প্রবঞ্চনা করিব।

ঠশা মালশী রাগ।

সই বোলম্ মুই জীব না লো কানু আনিআ দে।
কালার ভাবে চিত্ত বেআকুল আকুল করিআছে॥ ধু।
চুয়া নহে কলা নহে দধি মাখিআ খাইতুম।
কনক দাপন নহে মুক্তি নয়ন ভরি চাইতুম॥
কাম সিন্দুর নহে রে মুক্তি তুলি দিতুম সীথে।
বন্ধুর ভাবে চিত্ত বেআকুল অঙ্গ ছাইছে বিষে॥
চান (চাম্প) বেকা কান বেকা ঐ কদম তটে।
চাম্পা কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে ঘটের কামনা।
মথুরা পুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা॥ ১০।

তুরি পটমঞ্জরী।

জৌবন গেল মোর রে। ধু।
হেদে রে সজনী সই রে দুঃখ হৈল সার।
হারাইলু লাখের জৌবন না পাইমু আর॥
আবাল আছিলু ভালে কি হৈল বাড়িআ।
দিনে দিনে বাড়ে জৌবন পাঞ্জর ভেদিআ॥
হাটে জাম মুক্তি ঘাটে জাম মুক্তি মুখে আঁচল দিআ।
কথ কাল রাখিমু জৌবন লোকের বৈরী হৈআ॥
অভাগী খোঁআরি (?) লাগি না আইল অমরা (?)।
হখনা পুষ্পের মাঝে না পড়ে ভ্রমরা॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে শুন বনমালি।
পালিআ পুসিআ জৌবন কারে দিলু ডালি॥ ১১।

রাগ—পঞ্চম সিন্ধুরা।

বন্ধু মোরে ছুইঅ না।
ছুইঅ না রে নন্দের ঘরের কালা কানুরে মোরে ছুইঅ না॥ ধু।
কদম তলে থাক কানুরে কদম পুষ্প চাইআ।
প্রাণি হরিআ নিল আমে বাঁশীটি বাজাইআ॥
কদম তলে থাক কানুরে বাজাও মোহন বাঁশী।
বাঁশীর ঘরে খসি পড়ে রাধের কাজের কলসী॥

রাজ পথে থাক কাহুরে কর বাটোআরি।
ছাড়ি দেঅ নেতের আকল বন্ধু তাজিব ঘাঘরি।
মাঠে থাক ধেনু রাখো রাখোআলের মতি।
তুহ্মি নি রাখিতে পার বন্ধু সুজনের পিরীতি॥
আন্ধারে সে আইস বন্ধু আন্ধারে সে জাও।
কথ ধন দিআ করি বন্ধু ফিরিআ ন চাহ॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে পিরীতি তোহ্মার।
মদনের ঘাত আহ্মি নারি সহিবার॥ ১২।

রাগ—আহীর।

মালিনিরে তৈ জারে তোর কুল।
সোআমী ঘরেত নাহি চিত্ত বেআকুল॥ ধু।
এক হাত্তে শত শঙ্খ আর হাত্তে ক্ষীর।
একলি (একলি) শঅনে মোর আখি বহে নীর॥
গলার গলিআ (?) মোর শীথের সিন্দুর।
কেবা হরি নিল মোর পাএর নেপুর॥
মন্দিরে আছএ মোর খাট সিংহাসন।
কোন বিধি হরি নিল গাএর ওক্কন॥
চারি মাস বারিষা মুক্তি আছিলু ভাল।
মাঘ ফাল্গুনের শীতে বুকে লাগে শাল *॥
কাহাকে না পাম লাগ কহিআ † পাঠাম।
আনল গরল বিষ খাইআ মরি জাম॥
হৈঅদ মর্ত্তুজা কহে করমের পাক।
তম গেলে হরি আইলে পাইবা পহু লাগ॥ ১৩।

রাগ—জালালি।

কি আজু কুদিন ভেলিএ।
ছাড়িআ গোকুল নন্দলাল মথুরা চলি আ গেলিএ॥ ধু।
আজু মথুরা উজর ভেলিএ।
গোকুল মলিন আজু রাজিএ॥
মর্ত্তুজা গাহিএ কহএ সারএ।
নন্দসুত বাটোআর কানু নিচ্চএ॥ ১৪।

* অবশিষ্ট পদাবলী বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

আবদুলকরিম সাহিত্য-বিশারদ।

---

* 'শাল' স্থলে 'ঝাল'—পাঠান্তর।
† 'কহিআ' স্থলে 'বুলিআ'।

ডোমরাইলের চিড়ে ঐতিহাসিকের কথায় ভিজেনা

মালদহের গোপালভোগ, খিরসাপাতী, বৃন্দাবনী প্রভৃতি আম পাকিয়া প্রায় শেষ হইয়া গেল। চিড়ে, মাড়া দিয়া আম সেবার একটা মহৎ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহাদের ভাগ্য ভাল তাঁহারা মালদহের আম ও ডোমরাইল বা ডমরুলের হাটের চিড়ে দিয়া ক্ষীরসহ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

'অমরতী' অঞ্চলের নাগরাইনগণ ইংরেজ বাজারের হাটে মাড়া, ছাতু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। মালদহের যাঁহারা খাস অধিবাসী তাঁহারা একমুঠা ডমরুলের হাটের চিড়া না হয় অমরতীর নাগরাইনদের মাড়ার সহিত খিরসাপাতী, গোপালভোগ মাখিয়া হাসিমুখে উদরগহ্বর পূর্ণ করিতেছেন। ঐতিহাসিকদের ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে না।

ডমরুলের চিড়ে অমরতীর মাড়া মালদহের উত্তরার্দ্ধের, বিশেষ পুরাতন মালদহ, ইংরেজ বাজার মকদমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভদ্রলোক সকলেই একদিন না একদিন খাইয়াছেন। অনেকের মনে আছে আবার অনেকের খাইয়াও মনে নাই।

ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত 'ডোমরুল' বা 'ডোমরাইলের' হাটের চিড়া বা 'অমরতীর' নাগরাইনদের হাতের 'মাড়া' ও ছাতু কিম্বা তাহুইখানের চিড়া সেবা করেন নাই। কিন্তু মালদইয়া আম সম্ভবতঃ না খাইলে তাঁহার ঐতিহাসিকত্বের দাবিই কমিয়া যাইবে।

'চিড়ে কোটা ব্যবসা'—কেবল কৌশলে খেংলাইয়া চেটা করিবার প্রয়াস। যাঁহারা চিড়ে কোটেন তাঁহারা গোটাকে ভাঙ্গেনও না, গুঁড়োও করেন না কেবল পদদলিত করিয়া চেপ্‌টা করেন।

অমরতীর মাড়া, ডোমরুলের চিড়ে এখন দরিদ্রের অন্নসংস্থানের পন্থাবিশেষ মাত্র। সেখানে ত আর পাল বা কৈবর্ত্ত নগরী নাই! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এখন টেনে বুনে—ঐতিহাসিকগণ সেই প্রাচীন স্থানগুলিকে স্বীয় স্বীয় অনুসন্ধান গণ্ডীর মধ্যে ফেলিতে ব্যস্ত! বিক্রমপুর-রামপাল-রামাবতী-জগজ্জল-ডমর-লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুনগর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি মহাস্থানগুলি স্থান চ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় ঐতিহাসিকগণের যখন এই 'দ্বন্দ্ব' বাধিয়াছে তখন চিংড়ি পুঠি গোছের ঐতিহাসিকগণের আর কথা কি বলিব! আমরা যে চিংড়ি পুঠির সামিল।

রামাবতীর সংস্থান লইয়া মৈত্র মহাশয় প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ কয়েক মাস ধরিয়া অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। তাহাতে বারেন্দ্র মধ্যেই পুনর্ভবা ও করতোয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানেই পালনরপতি-প্রতিষ্ঠিত রামাবতীর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সুযোগ্য মৈত্র মহাশয় যখন বরেন্দ্র মধ্যে রামাবতীর প্রতিষ্ঠায় তৎপর, তখন তিনি যে অমরতীর 'মাড়া' কখন আহার করেন নাই তাহা সুনিশ্চয়।

আপনাপন মতবাদ সহজে কেহ নস্যাৎ করিয়া দিতে রাজি নহেন। কয়েক বার ধরিয়া তিনি রামাবতী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হউক না কেন জগদ্দল ২৪ পরগণায়, হউক না কেন রামাবতী বরেন্দ্রে বা সমুদ্রতীরে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের বাঙ্গলাটা এখেপে থাকিলেই হইল এখন যে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাও ভারতের বাহিরে চলিয়াছে! বিক্রমপুর লইয়া কত কথাই উঠিল। পৌড়ও হয় ত মালদহে থাকিবে না।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য বলিয়াও ঐতিহাসিক ভিত্তি হারাইতে হারাইতে মুখ চাহিয়া রক্ষা পাইয়াছে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের রমতী রামাবতী নাও হইতে পারে—রামাবতী ও অমরতী বা রমতী মালদহের বা সিলাবাড়ী হইতে যে অধিক দূর নহে, তাহা শ্রীধর্ম্মমঙ্গল থাকিলেও বিশ্বাস যোগ্য না ও হইতে পারে। রাজতরঙ্গিনীর তরঙ্গ আবহকমত বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের তুফান তুলিয়াছে—গরজে গরজ ঢেলা বহেন—গরজ বড় বালাই! আমাদের গরজ নাই—হলেও ভাল, না হ'লেও ভাল।

'আর্য্যাবর্ত্তে'—জগদ্দল, ডমরনগর (ডমরাইল—ডোমরুল) রমতী (রামাবতী) প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন স্থান সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। জগদ্দল-মহাবিহার রামাবতীর নিকটে বা অনতিদূরেই ছিল বলা হইয়াছে। নদীপ্রবাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—একথা অলীক কি সত্য তাহার প্রমাণ দিব কি করিয়া। পূর্ণিয়ায় জগদ্দল, মালদহের দুই তিনটি জগদ্দল, দিনাজপুরের জগদ্দল, ২৪ পরগণার জগদ্দল প্রভৃতি জগদ্দল এবং মালদহের 'একডালা,' নদীয়ার 'একডালা,' ঢাকার 'একডালা' এখন আছে। মালদহের 'একডালা' প্রাচীন, বিলমধ্যস্থ নূতন বস্তী—স্থলটা সকল রকমে পুরাতন সে নামটার সন্ধান—ডোমরুলের চিড়ে বাঁধিয়া খুঁজিতে যাইতে হইবে। ম্যাপে বা লোকমুখে তাহার শীঘ্র সন্ধান মিলিবেনা। অমরতীর জগদ্দল এখন নাই।

রমতী বা অমতীর (অমরতী) নিকটে অদ্যাপীভাবে বিরাজিত যে 'ডমর নগর' সে কথা বোধ হয় কোথাও বলা হয় নাই। ডোমরোলের হাট-টা এখন নদীর ওপারে দিনাজপুরের সীমায় বসিয়াছে। কিন্তু সুযোগ্য ঐতিহাসিক ৺ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডোমরুলের চিড়ে খাইয়া থাকিবেন এবং হয়ত মানচিত্রে নদীর ওপারে হাটের সংস্থানটিই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এক পা এদিকে, নদীর ধারে মালদহের সীমায় কিছু প্রাচীন স্মৃতি দেখা যায় কিনা হাটুরিয়াগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। হাটে গিয়া কাজ নাই! উদারতা ও স্বার্থশূন্যতা বা হুঁ এ হুঁ দেওয়া ভাবটা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবের ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেই—ডোমরুলটি হাটে কি নদীর দুইধারে কি নদীর পশ্চিম তীরে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন।

বর্ত্তমানে ডোমরাল বা ডমরুলের হাটটা এপারে নয়, তাহাত স্বীকার করিতেই হইবে। এখন ম্যাপে না হয় একটি বিন্দুতে 'ডমরাইল' নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—কিন্তু উহার সীমা ও বিস্তার কোন দিকে কতদূরে ছিল তাহার একটা কথাও ত ভাবিতে হইবে। পরগণে রুকনপুর রাজহাট ও অপর অপর পরগণাগুলি দেখিলে ক্ষতি কি? উত্তরার্দ্ধ মালদহেই যে, প্রাচীন কীর্ত্তিনিকেতনগুলি বিদ্যমান ছিল।

অমরতীও যে, পিছলী, গঙ্গারামপুর, ভগীরথপুর, নাগরাইল, সোনাতলা, রুকনদহর

প্রভৃতি লইয়া বা আরও কতদূর লইয়াছিল তাহা কে বলিবে। গৌড়হাও হইতে গঙ্গা-রামপুর পিছলী পর্য্যন্ত ও পাণ্ডুনগর পর্য্যন্ত একটা জনস্রোত ছিল তাহা আজিও প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুয়া নদীর ওপার—অমরতী, গঙ্গারামপুর নদীর এপার। তাহার পর তখন প্রভৃতি কতিপয় নদীর ওপারে। পাণ্ডুনগর হইতে কিছু দূরে নদীর এপারে ওপারে জগদল বিহারের স্থান। এপারে ভগ্নস্তূপ ওপারে জগদল গ্রাম (নূতন বস্তী)। ইহা ছাড়া আরও 'জগদল' আছে। অমরতীর জগদল নাই। কালিন্দী ও বড়গঙ্গার প্রবাহে কাটিয়া গিয়াছে—বস্তীও নাই। যখন কালিন্দী বর্ত্তমান খাতে ছিল না, তখন টোদোয়রে—বল্লাল কাকঠান দেখা যাইত। পিছলী গঙ্গারামপুর নাগরাইন কঠাল—টোদোয়ার দুই ক্রোশ ব্যবধান হইলেও এক ছিল। গড় দেখিলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়।

যেখানে বল্লাল কাঠান—গৌড়হাও তাহার পরপারে—দূরে ছিল। 'গৌড়হাও' গড়টির উচ্চভূমি বইড়হাট, হাতিতা লইয়া তিন ক্রোশ হইবে। প্রাচীন চিহ্নে সুচিহ্নিত। এখন পালের ভিটা খাকবস্তির ম্যাপে আছে। সেইটাই যে পালদের গৌড় নয় তাহা ত কেহ বলিতেছেন না।

এই গৌড়হাও—হইতে হাতীতা লইয়া যে সীমা তাহার পরই—কিছুদূরে 'তোমরাইলের হাট'—সে হাট পাণ্ডুনগর হইতেও দূরে নহে। বরেন্দ্রের ও গৌড় (পাল) নগরের অতি সন্নিকটে কিন্তু অনাদীভাবে নয়।

পালদিগকে পরাজয় করিয়া পালগৌড়-সীমার কিছুদূরে যে কৈবর্ত্তনগর 'ভমরপুর' তাহা ত দেখিলেই দেখা যাইবে। পাল-গৌড়ের পরিখার সহিত পরিখা মিলাইয়া যদি 'ভমর উপপুর' প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।

অমরতীর গায়ে বা রামাবতীর প্রাচীরে প্রাচীর মিলাইয়া 'ভমর' নগর প্রতিষ্ঠার কথা রামচরিতেও নাই আমিও কোথাও বলি নাই। পালগৌড়ের ও কড়িরআইল ভীমের আলালের মধ্যে ভমরনগর। ঐ পথেই পাল-গৌড় হইতে কৈবর্ত্তনগরী 'ভমর' দিয়া বরেন্দ্রের মুখ্য একটা পথ ছিল, তাহা ম্যাপেও দেখা যায় —'অকুস্থলে' গিয়া দেখিলেও দেখা যায়। ঐ পথেরদক্ষিণে'বরেন্দ্র'নগরের স্থান—মানচিত্রেও 'বরেন্দ্র' বলিয়া একটা স্থান লেখা আছে।

রামাবতীর (অমরতী) পূর্ব্বে বর্ত্তমান মুচিয়া ষ্টেশন হইতে উত্তরে পুত্তনের বিল—তাহার পশ্চিমে পূর্ব্বতন মালদহ হইতে একটা গড় পাণ্ডুয়ার দিকে একটা সূর্য্যপুরের কাটাল দিয়া পুত্তনের দিকে গিয়াছে। পূর্ব্বে বুলবুলচণ্ডী ঐ দিক দিয়াই কিছু উত্তরে পুত্তনের ম্যাপ বিখ্যাত পুনর্ভবা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড গড় বা আইল। ঐ আইলের নাম পুত্তনের আইল। এটা পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বে আই-লের উপর। কড়ির আইল নামক সাঁকো তাহার কিছু উত্তরে যাইলেই তোমরাইলের হাট এবং তাহার উত্তরে—একটা 'জগদল'। এ জগদলের সহিত অমরতীর জগদলের কোন সম্বন্ধ নাই। সুযোগ্য মৈত্র মহাশয়েরও রামবতীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে জগদল কয়েকটি আছে।—এখানে মকদুম সাহেবের তাকিয়া নাই।

সুযোগ্য ডীল শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়—"The Palas of Bengal" নামক প্রবন্ধ যাহা ১৯১৫ সালের Memoirs of the A. S. Bengal এ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই—

Ramauti is an exact transliteration of Ramavati....., and the identity of Ramauti with Ramavati has been made certain by the discoveries of Babu Haridas Palit in the Malda district. This gentleman has industriously searched the environment of Ramavati and has traced the following villages leaving ancient names Amrauti or Ramauti (Ramavati) Jagadala (Jagaddala), Damral (Damara)." (Page 91).

ইহাতে বিশেষ কিছুই বাধ আসে না কিন্তু ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"I have since been informed by Pandit Rajanikanta Chakarvarty of Malda, and Babu Akshaykumar of Rajshai that Babu Hari das' identification of Amarti with Ramauti is not correct. I am also informed that there are no villages called Jagdala or Damral near amarti in the malda District." (Ibid).

এই ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত পণ্ডিত মহাশয় ও বিখ্যাত মৈত্র মহাশয়ের উক্তির বিষয় যাহা ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই লইয়া একটু বলিব। বুঝি অমরতীর 'মাড়া' আর ডমরাইলের চিঢ়া আমার ভাগ্যে নাই।

"Haridas' identifications of Amarti with Ramauti is not correct."

ইহা কিসের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইল তাহাত মৈত্র মহাশয়ের 'রামাবতী' ও পণ্ডিত মহাশয়ের—'গৌড়ের ইতিহাস' পাঠেও বুঝিলাম না!

ইংরেজবাজার (English Bazar) হইতে কিছু পশ্চিমে 'বাপ্‌বাড়ী'; উহার অনতিদূর পশ্চিমে প্রাচীর চিহ্নাঙ্কিত স্থলে—অমৃতী নালার ধারে অমৃতির হাট। ম্যাপও আছে —লোকেও বলে এবং স্বয়ং অমৃতীর 'মাড়া' ও গোপালভোগের সহিত খাইয়াছি।

ধর্ম্মমঙ্গলও বলেন—"বামে থুয়ে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী"—রমতী হইতে পূর্ব্বমুখে লাউসেন কর্পূরধবজের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছিলেন। পুরাতন মালদহ ও গিলাবাড়ীর কিছু পশ্চিমেই অমৃতী সুতরাং—এইটিই রমতী। আইন আকবরীর মতেও লক্ষণাবতীর অতি সন্নিকটে 'রমতী'। রমতীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে—লক্ষণাবতী। ডাল, চাল, ঘি, মসলা, জল দিয়া অগ্নিপক্ক করিলেও যদি খিচুড়ী নাম না পায় তাহা হইলে আর কি করিব।

'Damral' অমৃতীর (অমরতীর) নিকটে নহে—হইতেও পারে না—নন্দী মহাশয় রামচরিতেও সে কথা বলেন নাই! 'পাল-গৌড়' ও বরেন্দ্র মধ্যে কৈবর্ত্তরাজ-প্রতিষ্ঠিত 'ভমরনগর' অমরতীর সহিত যে অভাবীভাবে থাকিবে তাহা ত আমি না। সেদিনকার মালদহের সীমা বিভাগে ডমরুলের হাট বা ডমরাইলের হাট দিনাজপুরে পড়িতেছে কিন্তু ডমরাইলের প্রাচীরস্মৃতি যে আধুনিক মালদহের নাকের উপর ত্রণের মত রহিয়াছে। ম্যাপ দেখিলে কি 'Damral' মালদহে মিলিবে?

হুযোগ্য মৈত্র মহাশয় না হয় ডমরুলের চিঢ়ে ও গোপালভোগের সহিত মিলিত করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু

গুরুদেব তুল্য বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় ভমরুলের-হাটের চিড়া দিনাজপুরের বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন হাট-টা দিনাজপুরের সীমান্তে,কিন্তু মালদহে যে প্রাচীন ভমরুল! চিড়েটি সহিতই বুঝি ভমরুলের সম্বন্ধ—চিনিটকেরকৃপায় উদর তৃপ্তি হয় কিন্তু ইতিহাসে গড়িয়া উঠে না।

"Amarti ও Ramauti এক নয়"!—আইন-ই-আকবরির কথা ও ধর্ম্ম মঙ্গলের 'কাউর যাত্রার' 'বামে পুবে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী'—পূর্ব্ব মুখে রমতী হইতে বুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা ত আমার মনগড়া নয়!

'জগদ্দল বিহার' অমরতীর নিকটে মালদহে নাই। নাই ত সত্য—অমরতীর অবস্থাটা কি হইয়াছে সেটা কি দেখেন নাই?—চৌদ্দ আনা গঙ্গাপ্রবাহে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে বা কোন প্রনষ্ট নদীতীরে ছিল তাহার প্রমাণ 'অকুস্থলে' যাইলেই দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মপুর, কর্ম্মঠ গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে জগদ্দলও গিয়াছে এখন 'বেয়াড় ভূমি'। আমি স্থানীয় বৃদ্ধগণের নিকট একটা বড় মন্দিরের কথা শুনিয়াছি যাহা অমৃতীর পশ্চিমে জয়-মহলের দিকে ছিল। একটা বড় বুদ্ধ মূর্ত্তিও গঙ্গারামপুরের কাঁঠাল তলায় পড়িয়া আছে। সেটি নাকি ঐ রকমের মন্দির হইতেই মসজিদের জন্য আনিত। পাঁচটা জগদল যে জেলায় আছে সেখানে যে ঐ বৃদ্ধগণের কথা মিথ্যা একথা আমি বলিতে পারি না।—আমিও আর্য্যাবর্ত্তে বলিয়াছি—এখন নাই—গঙ্গাপ্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তি-নাশার কাহিনী দুদিন পরে ঐতিহাসিকগণের নিকট চিড়ের মত চেপটা হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভমরুলের চিড়ে, অমরতীর 'মাড়া'র সন্ধান না পাইলে খিরসাপাতী আমের সহিত মিলিবে না। 'কথার দ্বারা যদি চিড়ে ভিজে' তবে পূজনীয় ঐতিহাসিক রাখাল বাবুর—'The 'Palas of Bengal'এর ১১৩ পৃষ্ঠার প্যারাটি সত্যসত্যই ফলায়ের উপযুক্ত হয় নাই, তাহাই বলিতে হয়—এবং ইতিহাসের মত ভিজে নাই শুকই রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত।

যুগধর্ম্ম—নাম সঙ্কীর্ত্তন

"নাম্নস্ত যাদৃশী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরে।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥"

বৈষ্ণব কবি গাহিলেন "নামের এতদূর শক্তি যে একবার মাত্র নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিলে, যত পাপ ধ্বংস হয়, জীব জীবনে তত পাপ করিতে পারে না।" নামের এই শক্তি বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি নাম সঙ্কীর্ত্তনের উৎকর্ষ দেখাইলেন।

জগতে আসিয়া জীব ক্রমাগত মায়ার ক্রীড়নকরূপে আপন পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে বহুদূরে পড়িয়া কেবল অপরিচিত, চির বিচ্ছিন্ন জীবের সহিত সংমিলিত হইতে চেষ্টা করে। প্রবাসের সাথীগণকেই আপন জানে, তাহাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য

সকল রকম কার্য্যই অনুষ্ঠিতভাবে সম্পাদন করে। তাহাদের সুখে রাখিবার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা, নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি কোন অপকর্ম্মকেই অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে না, যদি তৎ সাধনে কিছু অর্থাগম হইয়া ভোগ সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

যখন দস্যু রত্নাকর, ব্রহ্মা ও নারদকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে তাঁহাদিগকে বন মধ্যে ধৃত করে তাঁহারা এরূপে নরহত্যা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রত্নাকর বলিয়াছিল "পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনের অন্য উপায় না থাকায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করি।"

নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন" আচ্ছা, বৎস তাহা যেন হইল, কিন্তু এরূপ কার্য্যকে পাপ বলিয়া তোমার মনে হয়?"

রত্নাকর। নিশ্চয়।

নারদ। তবে তোমার এ পাপের ভাগী কেহ হইবে কি? যাও বৎস, গৃহে যাও, যাহাদিগের জন্য এই পাপ রাশি সঞ্চয় করিয়া নিশ্চয় নিরয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে কি না।

রত্নাকর তখন হাসিয়া বলিল "বেশ, ঠাকুর তুমি ত খুব সেয়ানা। কিন্তু আমায় এত বোকা পাও নাই যে তোমাদের ছাড়িয়া যাইব, আর তোমরা পলাইবে। তাহা হইবে না।"

নারদ উত্তর করিলেন "বৎস, আমাদিগকে বৃক্ষ লতার দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও আর আমরা সত্য করিয়া বলিতেছি যতক্ষণ না তুমি প্রত্যাবৃত্ত হও, ততক্ষণ আমরা এইখানেই অপেক্ষা করিব।"

তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া দস্যু আপন আলয়ে গমন করিয়া পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র সকলকেই ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল "আমি তোমাদের জন্য এত পাপ করিতেছি, তোমরা কেহ কি এ পাপের ভাগ লইবে?"

পিতামাতা উত্তর করিলেন "তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়া আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমার কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করা। তোমার কর্ত্তব্য করিতেছ। আমরা ও পাপ করিতে বলি নাই। আমরা কেন ভাগী হইব?

স্ত্রী-পুত্রও বলিল "তোমার কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করা, তাহাতে পাপই কর বা পুণ্যই কর, আমাদের তাহাতে কি?"

দস্যু এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল ও সত্বর বন মধ্যে আগমন করিয়া ব্রহ্মা ও নারদের বন্ধন মোচন করিয়া বলিল "ঠাকুর, আমি মহাপাতকী, কেহই আমার পাপের ভাগী হইবে না। আমার উপায় কি হইবে? এই বলিয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হইল। তাঁহারা তাহাকে দিব্যজ্ঞান দিয়া রক্ষা করিলেন। এই রত্নাকরই ভারতের প্রধান ও প্রথম কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা এই প্রবাসের সাথীগণকে সুখে রাখিবার জন্য যাহা কিছু করি, সে সকলের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, আর কাহাকেও তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে না। তাহাত আমরা বুঝি না। এমনি অন্ধ আমরা, এমনি জ্ঞানহীন, সব জানিয়া শুনিয়াও ঠিক পথ ধরিতে পারি না। মায়া আসিয়া ভুলাইয়া দেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে
মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

এই দুস্তর মায়া সাগর পার হইবার এক মাত্র উপায় ভগবানের শরণাগতি। এখন

এই শরণাগতি কিরূপে আসে? তাঁহার পাদ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারি যুগের সাধন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের, কারণ সাধনা শক্তি অনুসারে হইয়া থাকে। সত্যে বাহু পর্য্যন্ত সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ ছিল, সে সময়ের সাধনা কেবলমাত্র ধ্যান, ত্রেতায় ধ্যানের শক্তি জীবের কমিয়া আসিয়াছিল বলিয়া যজ্ঞের দ্বারা, কর্ম্মপথে জীব ভগবানের শরণাগত হইত। আরও শক্তি হ্রাস হইলে, দ্বাপরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেবা দ্বারা ভগবল্লাভ হইত, তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। কলিতে পাপ পূর্ণাধিকার বিস্তার করিলে, জীবের কোন শক্তি রহিল না তাই শাস্ত্র বিধান দিলেন—

"কৃতে তদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরি
কীর্ত্তনাৎ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে বিভিন্ন প্রকারের সাধনা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কলিতে এক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সে সমস্ত ফল লাভ হইবে। কলির নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সাধনা। আর দ্বিতীয় সাধনা নাই।

এই হরি কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয়? নরোত্তম দাস ঠাকুরকে তাঁহার প্রভু শিক্ষা দিয়াছিলেন যে ঊর্দ্ধরেতা না হইলে, যোগ আশ্রয় না করিলে হরি কীর্ত্তন ঠিক হয় না যথা :—

"হরি যদি চাও কর যোগ অনুষ্ঠান
যোগমার্গ সার পন্থা শাস্ত্রের বিধান।"
রত্নাকর।

কিন্তু সংসারী লোক ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে না। যোগপথও অতি কঠিন পথ। আর সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইলে এ খেলা চলে কি? তাই শাস্ত্রকার বলিলেন—

"বস্তু শক্তিঃ ন বুদ্ধিমপেক্ষতে।"

নাম যে রূপেই কর, নামের কার্য্য নাম করিবে। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনলে হস্তার্পণ করিলেই তাহা দগ্ধ হইবে। গরল পান করিলেই মৃত্যু হইবে, ইহার কারণ অকারণ দেখিয়া ফল নাই। গরল পানে কেন মরিবে এ প্রশ্নের উত্তর নাই। গরলের শক্তি জীবের প্রাণনাশ করা, সে তাহা করিবেই। সেইরূপ নামের যে পাপহারী, কল্মষনাশী শক্তি, যেরূপেই নাম কর, জিহ্বায় একবার উচ্চারিত হইলেই হইল। নামের কার্য্য নাম করিবে। একবার নাম উচ্চারিত হইলেই তোমার হৃদয়ের সকল কালিমা বিদূরিত হইয়া হৃদয় মন পবিত্র হইয়া নামীর আসনের উপযুক্ত হইবে, কারণ নাম ও নামী, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। নাম করিতে করিতে নামে রুচি আসে, নাম হৃদয়ে দৃঢ় হইয়া যায়, তখন নামীর উদয় হয়। নামের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি যুগলকিশোর রূপ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। তখন নামকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর নিজ দেহ, দেহাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া নাম সুধাপানে বিভোর, বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া যায়।

নাম ধরিয়া না ডাকিলে কি কেহ সাড়া দেয়? তোমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তবে তুমি শুনিতে পাইবে। অযাচিত কে কোথায় প্রেমদান করিয়া থাকে—ভাল বাসিয়া থাকে? সংসারী জীব তাহা পারে না, কারণ তাহাদের জন্মই স্বার্থ বিজড়িত—কিছু প্রতিদানাশা না থাকিলে কেহ কোন কার্য্য করে

না। আমাদের মতন করিয়া ধরিয়া লইলেও, তাঁহাকে ডাকা চাই। সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, প্রতিদানাশা বর্জ্জিত হইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন কেবল ব্রজদেবীগণ, তাই তাঁহাদের "পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—ত্যাগ করিয়া এক পদও বাড়িতেন না। তাঁহাকে না পাইলে গোপীগণ জীবন্মৃতা হইত, নিমেষে যুগবোধ করিত "ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্" এবং সেই সরল প্রাণা, সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজদেবীগণ না হইলেও তাঁহার বাস হইত না। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী রাস শব্দে ব্যাখ্যা করিলেন "রসস্য বিদুষোরং ইতি রাসঃ" তুলা যেমন ধুনিয়া লইতে হয়, সেই "রসো বৈ সঃ" সর্ব্ব রসের আকর তিনি, সেই রসসাগর উন্মথন করিয়া তবে নিষ্কাম প্রেম লাভ হয়। যেমন দুগ্ধ উন্মথন করিলে ক্ষীরের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ সেই রসসাগরকে মথিত আলোড়িত করিতে পারিলে তবে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "Love for loves' sake" বলে।

এই নিষ্কাম প্রেম অতি দুর্লভ—মাত্র ব্রজদেবীগণের মধ্যে ছিল। কলিপাবন নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রেমধন অকাতরে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। সেইজন্য বহুতর মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা ও আমাদের বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে। নতুবা গূঢ় রহস্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের রহস্য ভেদ করিবার শক্তি জীবের হইত না। হরি সঙ্কীর্ত্তনই এই কৃষ্ণপ্রেমের জননী। নাম ভিন্ন নামীর উদ্দেশ পাওয়া যায় না, কারণ আমরা নামরূপ উপাধিধারী, তাই নামরূপ বিবর্জ্জিত কোন বস্তু আমাদের ধারণার অতীত। তাই মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়াছেন।

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ, তদ্ বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ তুমি রূপ বিবর্জ্জিত আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল স্তব বাক্যের অতীত, আমি মুখের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি, হে জগদীশ, মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন।"

এখানে মহর্ষি স্পষ্টই বলিতেছেন যে তিনি "নিরাকার, তিনি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্য মনের অতীত বস্তু ও সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে পুরাণাদিতে কল্পনার দ্বারা হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মায়াময়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন কারণ গুণময় দেহ ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে না, তাই নাম ও রূপ দ্বারা তাঁহার অসীমত্বকে সসীমত্বে আনয়ন করিয়া তবে আমাদের বুদ্ধিগম্য করা যাইতে পারে। তাই নামের এত প্রয়োজন, আর নাম ও নামী অভেদ "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তাই নাম সঙ্কীর্ত্তন এত প্রয়োজনীয়। তাই মহাপ্রভু জগতে অকাতরে, জাতিনির্ব্বিশেষে এই নামসুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

স্বয়ং মহাপ্রভু এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের উৎকর্ষ দেখাইবার কারণ এক সময়ে কয়েকটি শ্লোক বলিয়াছিলেন তাহার প্রথমটি এই :—

"চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি
নির্ব্বাপনং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্।"

"পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিজয়-লাভ করুক" এই বলিয়া কীর্ত্তনের গুণ বলিতেছেন "সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তদর্পণ সুপরিষ্কৃত হয়। মহাদাবাগ্নি স্বরূপ ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপী কুমুদকে যে প্রস্ফুটিত করে, সেই চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ কৌমুদী বিতরণকারী, কৃষ্ণ প্রেমের জননী, আনন্দ-হ্লাদিনী শক্তি বৃদ্ধিকারী, নিত্যতত্ত্ব প্রেমাস্বাদের কারণ স্বরূপ, সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি-কারক এই কৃষ্ণকীর্ত্তন বিজয়লাভ করুক।"

এই কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্ব জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়া, সাংসারিক সকল অভাব দূর করে। আবার বলিতেছেন :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

"হে ভগবন, তোমার এমন কৃপা, যে মুখ্য গৌণাদি ভেদে নাম বহু প্রকার দিয়াছ এবং সেই নামে সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়াছ। নাম সঙ্কীর্ত্তনের সময় অসময়ও রাখ নাই তথাপি আমি এমনি হতভাগ্য যে এমন নামেও আমার অনুরাগ নাই।"

নামে সর্ব্বশক্তি নিহিত করিয়াছেন। এই সর্ব্বশক্তি সমন্বিত নাম একবার মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে যে আনন্দ, জগতের শত সহস্র সম্ভোগে নিমগ্ন হইলেও সে আনন্দের লেশ মাত্রও পাওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

"অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।
শতভার সুবর্ণ গো কোটি কর দান
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।
শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।"

এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রই এই অপার সংসারে একমাত্র সার বস্তু। নাম করা চাই কিন্তু এই নাম করাই কঠিন। কিরূপে নাম করিতে হয়? নাম করিবার কালাকাল নাই বটে কিন্তু কিরূপে করিলে এবং কিরূপ হইলে নামগান করিবার উপযোগী জীব হইতে পারে? তাই মহাপ্রভু বলিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু না
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণের অপেক্ষা নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানীর মানদ হইলে তবে হরি নাম উচ্চা-রণের অধিকারী হইতে পারা যায়। ইহা বড় কঠিন কথা। সংসারের শত সহস্র স্বার্থ পূর্ণ, অহঙ্কারে স্ফীত মোহান্ধ জীব, কিরূপে আত্মাভিমান বর্জ্জন করিয়া তৃণের ন্যায় সুনীচ হইবে? বৃক্ষকে যে ছেদন করে, তাহাকেও ছায়াদানে সে বিরত হয় না, সেই তরুর ন্যায় সহিষ্ণু কিরূপে মানব জীব হইতে পারে? সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ না করিলে "তরোরিব" সহিষ্ণু মানব হইতে পারে না? "অমানীনা মান দেন"—

যে ব্যক্তি সমাজে সম্মানের উপযুক্ত, তাহাকে ত সকলেই মান্য করেন, যে অনুপযুক্ত তাহাকে মান দেওয়াই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব-হীন ব্যক্তি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী নয়।

নাম সঙ্কীর্ত্তনের বলে, অহরহ নাম করিতে করিতে দম্ভ, অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া যায়। তখন স্বতঃই নামকারী বিনয়ী ও নির্ম্মৎসর হয় তখন হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তির বলে জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, সেই পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেবের নিত্যলীলা-গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া অনন্তকাল সেবা-নন্দ ভোগে ধন্য হইতে পারে। নামের শক্তিতে হৃদয়ের অপূর্ণতা ঘুচিয়া যায় কারণ নাম সর্ব্বদাই পূর্ণ।

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি। যাহা পূর্ণ তাহার অণুকণা পর্য্যন্তও পূর্ণ শক্তি ধারণ করে। বিন্দুমাত্র অমৃত পানে কি জীব অমর হয় না? অমৃতের ভাণ্ড পূর্ণ থাকিলে তাহাতে যে শক্তি, বিন্দুতেও সেই শক্তি। এক কলস জলের যে গুণ, যে শীতলতা, এক বিন্দু জলেরও সেই গুণ সেই শীতলতা। বিন্দুমাত্র বিষপানে কি জীব মরে না? সেইরূপ এই নামে সর্ব্ব-শক্তিমানের পূর্ণশক্তি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিরাজিত, তাই নাম করিতে করিতে হৃদয়ে নামের শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়, সেই শক্তি বলে নামীকেও লাভ করা যায়। ইহা মুখে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে অনুভূতির বিষয়। মন স্থির করিয়া মনে মুখে এক করিয়া সরল প্রাণে একবার ডাক দেখি, তাহা হইলেই আমার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বীজস্বরূপ নামে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজিত।

"বীজের মধ্যে বটগাছটি
আছে যেমন আঁকা,
ঐ নামের মধ্যে আছে
তেম্‌নি চূড়া ধড়া বাঁকা।"

নাম বীজস্বরূপ, এই নামরূপ বীজে ভক্তি-বারি সিঞ্চনের দ্বারা ভক্ত যে মহান্ মহীরুহ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নামবীজ ভক্তিবারিদ্বারা কৃষ্ণফল উৎপত্তি। তাই আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন নাম ভিন্ন গতি নাই।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামের কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"
বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সাধনা। সুর-তান-লয় গঠিত বাক্যের দ্বারা ভগবানের গুণানু-কীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন। শাস্ত্র বলেন সুর স্বয়ং ব্রহ্ম। নাদই পরমা বিদ্যা। এই নাম প্রণবাত্মক। এই প্রণবের সুরে বিশ্ব ভরিয়া আছে। অহরহ এই সুরে প্রকৃতি আপন অধীশ্বরের স্তুতি করিতেছে। এই মাত্র মূল সাধনা। তাই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের এত মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাই।

নামের শক্তিতে অত্যন্ত দুষ্কৃতকারীও সুকৃতিপরায়ণ হইয়া যায়। কারণ নাম শুদ্ধ ও পবিত্র। "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং" নামের এই পবিত্রতাহেতু নাম করিতে করিতে নামকারীরও হৃদয় অমল, কলুষ বিহীন হইয়া যায়। "তিন লক্ষপতি" যবন হরিদাস এক সময়ে একস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ নাম জপে নিমগ্ন ছিলেন। তথাকার রাজা রামচন্দ্র খাঁন ঈর্ষ্যাবশতঃই হউক বা হরিদাসের শক্তি পরীক্ষার্থেই হউক পরমাসুন্দরী এক বেশ্যাকে

তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সর্ব্বালঙ্কারে দেহ ভূষিত করিয়া মোহিনীমূর্ত্তিতে এক বেশ্যা হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। জপ শেষ হইলে মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া হরিদাস আবার জপে মনোনিবিষ্ট করিলেন। জপ শেষ করিতে নিশাও শেষ হইল, সুতরাং রমণী বিফল মনোরথ হইয়া সে দিনের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই রূপে তিন দিন সে সাধুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হরিদাসের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাহার দুর্ব্বাসনা চলিয়া গেল। সে তৃতীয় দিবসে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সাধুর চরণে কৃপাভিক্ষা করিল। হরিদাস তাহাকে উদ্ধার করিলেন।

যে বেশ্যা, রমণীসুলভ কোমলতা বা ধর্ম্ম যাহার প্রাণে বিন্দুমাত্রও নাই, আজীবন যে অসঙ্কোচে পাপকার্য্য সাধন করিয়াছে, আপন ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া শত পুরুষের সেবা করিয়াছে, নামের বলে বহুদিনের সঞ্চিত তাহার হৃদয়মল বিদূরিত হইয়া গেল। সে নাম পাইয়া ধন্য হইল। একবার নাম করিলে কোটি কল্পের পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। শত সহস্র বৎসরের মলিনতামাখা লৌহ খণ্ড একবার মাত্র স্পর্শমণি স্পর্শেই সুবর্ণ কান্তি ধারণ করে। নামের এমনি শক্তি, নিজের সর্ব্বশক্তি দিয়া নামকে পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া, একবার নাম উচ্চারণেই সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে ও মরমের মলিনতা বিধৌত করিয়া দেয়। তখন নামবলে পরিমার্জ্জিত, সুপরিষ্কৃত হৃদয়ে নামীর উদয় হয় ও সেই রূপ দর্শনে ভক্ত বিভোর হইয়া যায়। সেই জন্য বৈষ্ণবের নবধা সাধনের মধ্যে "শ্রবণ ও কীর্ত্তন" প্রথম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥"

নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিধান জীবের মহামঙ্গলের হেতু কারণ সারাদিন সংসারের কটু কথায় সন্তোষের মধ্যে বাস করিয়া ও তৎপ্রসঙ্গে কালযাপন করিয়া প্রাণ পরিম্লান হইলে, ভগবৎ কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণে সে মলিনতা বিদূরিত হয়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন—

"আন কথা না কহিবে, আন কথা
না শুনিবে।"

আমাদের পল্লীগ্রামের মধ্যে আজ কাল দেখিতে পাই যেখানে পাঁচ জন নিষ্কর্ম্মা লোক একত্রিত হইয়াছে, সেই খানেই তাস, পাশা বা পরনিন্দা, এই সমস্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই আমরা এত অবনত। জগতে যত উন্নত জাতি আছে, চাহিয়া দেখ, তাহাদের মধ্যে এক ও নিষ্কর্ম্মা লোক অতি বিরল, অথবা যাহারা নিষ্কর্ম্মা তাহারা নিজের চেষ্টাতেই বিব্রত। আমাদের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই যাহা আছে তাহাও শত গ্রন্থীযুক্ত। তৈলাভাবে গৃহলক্ষ্মীর কেশ উলুবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই স্বয়ং বেশ হাস্য-পরিহাসাদি ও তাস পাশা লইয়া দিনাতিপাত করেন। শ্রীপুত্র অনাহারে কষ্ট পাইতেছে চক্ষে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

তাই শাস্ত্রকার বিধান দিলেন যখনি সময় পাইবে, অবসর যখনি হইবে, ব্যর্থ কথা না কহিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ কর, হরিগুণ গান কর

ইহকালে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে ও পরকালে সদ্গতি হইবে। অহোরাত্র তাই নামজপের বিধান দিয়াছেন। চিরজীবন অভ্যাস থাকিলে শেষের সে দিনেও নাম ভুলিবে না। অহরহ জিহ্বায় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এমনি অভ্যাস হইয়া যাইবে, যে নাম আর জিহ্বা ত্যাগ করিবে না। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকর্ম্ম ত্যাগ করিলেও জিহ্বায় নাম রহিবে। তাহাই প্রার্থনীয় কারণ গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে
কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা
তদ্ভাবভাবিতঃ।"

মৃত্যুকালে যে ভাব লইয়া দেহত্যাগ করিবে, সেই ভাবানুসারে পরজন্মে তোমার গতি নির্দ্ধারিত হইবে। শেষ সময়ে যদি ভগবৎ-ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, তদ্গতি লাভ হইবে। অজামিল অতি দুর্ব্বৃত্ত ও দুষ্কৃতকারী হইলেও, যমদূতের ভয়ে নিজ পুত্র "নারায়ণ"কে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া তাহাকে বিষ্ণুদূতে লইয়া গেল। তবুও সে ঈশ্বরবোধে "নারায়ণ" বলে নাই। তাই বলিয়াছি "বস্তু শক্তিঃ ন বুদ্ধিমপেক্ষতে" জানিয়াই কর আর না জানিয়াই কর, হেলায় কর বা শ্রদ্ধায় কর, নামের কার্য্য নাম করিবে। তাই একবার নাম উচ্চারণ করিলেই তাহার সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া গেল কারণ "নাম্নস্ত যাদৃশী শক্তিঃ" ইত্যাদি।

তাই নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিগত ভারতবাসীর একমাত্র সম্বল। সে জানে তাহার কেহ না থাকিলেও, কাঁদিয়া মনোবেদনা জানাইবার তাহার একজন আছেন, তাঁহাকে ডাকিলেই তাহার সর্ব্ব দুঃখ বিনষ্ট হইয়া বিমল আনন্দে মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই দরিদ্র ভারত তাঁহাকে ডাকে—পাঁচ জন মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে খোল করতালি সংযোগে তাঁহার গুণগান করে, আর চিত্তাদগ্ধ প্রতপ্ত প্রাণ শীতল করে। তাই তাহার কাছে নাম এত—প্রিয়তম বস্তু। আর "শ্রীকৃষ্ণ" এই অক্ষর কয়টি মুখে উচ্চারিত হইবা মাত্রেই লোক মুক্তি পায়, কোন ব্রত, নিয়ম বা পুরাচরণাদি কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন হয় না যথা :—

"আকৃষ্টিঃ কৃত চেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং
চাংহসা
মাচাণ্ডালমকে লোক সুলভো বশ্যশ্চ
মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ।

শ্রীকৃষ্ণ নামরূপ মন্ত্র রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদায়ী সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহা পাওয়া যায়। নাম ও নামীর অভেদত্ব হেতু নামীর পূর্ণ শক্তিমত্তা নামে আরোপিত আছে, তাই নাম করিতে করিতে নামের বলে নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই বলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্ হইলেও নামকারীকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। সংসারের শত সহস্র প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে নাম মাত্রই অভেদ্য বর্ম্মস্বরূপ নাম বর্ম্মে জীব আচ্ছাদিত হইলে, মায়ার বা রিপুর তীক্ষ্ণ সায়কজাল তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না পরন্তু নাম বলে বলীয়ান নামকারী অবহেলে রিপুর শাসনকে পদদলিত করিয়া, মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। নাম সর্ব্বসিদ্ধির সোপান। নাম চতুর্ব্বর্গদাতা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই

চতুর্ব্বর্গই নামে লাভ হয়। নামে সিদ্ধ হইলে জীব ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যেমন বড় বড় জাহাজ আপনিও পারে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককেও পার করিয়া দেয়, "সেইরূপ নামে সিদ্ধ হইলে নামকারী স্বয়ং ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে এবং সেই অমূল্য নামধন বিতরণ করিয়া বহু জীবকেও মোক্ষধামে লইয়া যায়। তাই মহাপ্রভু বলিলেন এই নামে "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" নামের প্রতি অক্ষর অমৃতময়, নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে" তাই নাম সাধনার এত প্রয়োজন সর্ব্ব-শাস্ত্রে কথিত হয়। এই নাম শক্তির বলে "তিন লক্ষ পতি" যবন হরিদাস বাইশ বাজারে কোড়া খাইয়া মহাত্মা যিশুর ন্যায় বলিয়া ছিলেন "হে রাম, আমার নির্য্যাতনকারিগণকে ক্ষমা করুন। উহারা জানে না কাহাকে মারিয়াছে।

নামই জগৎ সৃষ্টির মূল। আনন্দই যদি সৃষ্টির মূল হয়, তাহা হইলে নাম ও নামীর সম্মিলনই এই বিশ্বের জননী। নাম ও নামী, শ্রীমতী ও শ্রীমান, শক্তি ও শক্তিমান, অভিন্ন বলিয়া দুইয়ের মিলনই হ্লাদিনী পরাশক্তির স্থান এবং এই দুইয়ের সম্মিলনেই মহারাস প্রতিষ্ঠিত। কারণ আনন্দই সর্ব্বময়। এই আনন্দই বিশ্বজনীন প্রেমের জননী এবং এই আনন্দই সর্ব্বশক্তি সমন্বিত নাম। নামই সকল আবৃত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নামে পবন চলে, রবি শশী আপন কিরণ জাল বিস্তারে জগৎ পুষ্ট করে, নাম বলেই গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব পথে বিচরণ করিয়া প্রকৃতির কার্য্য সাধন করে। নামে নদী চলে, পাখী গায়, এই বিশ্ব এক মহান সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপ—নামে ভরিয়া আছে। অহরহ প্রকৃতি এই নাম নাদ স্বরে ধ্বনিত করিতেছে, তাই আদি পুরাণ বলিলেন—

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্।
ন নাম সদৃশ ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ।"

কোন সাধনাই এই নাম সাধনার তুল্য নহে কারণ শ্রীভাগবৎ বলিতেছেন

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম।"

"মধুর হইতে মধুরতর, সকল মঙ্গলের আলয় এই কৃষ্ণ নাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় এক-বার উচ্চারণ করিলেই জীব উদ্ধার পায়। এই নাম মাত্র যাহার সার, জগতে সেই শ্রেষ্ঠ জীবকারণ জীবমাত্রেই এই নামের বশীভূত, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন

"জীবের স্বভাব হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"

সুতরাং জীবমাত্রেই বৈষ্ণব পদবাচ্য। আর এই নাম সর্ব্বত্যাগী সাধুগণ সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন যথা শ্রীভাগবতে ১০।১।৪ শ্লোকে বলিতেছেন—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র মনোহভিরামাৎ
ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।"

"পশুঘাতী কিরাত বা আত্মহত্যাকারী ব্যতীত কোন ব্যক্তি, ভোগ-তৃষ্ণা বর্জ্জিত মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক উপগীয়মান, ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ, শ্রবণ ও মনের সুখদায়ক, উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন হইতে বিরত হয়?" মহারাজ পরীক্ষিত উক্ত কথা বলিয়া হরি কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিলে শ্রীশুকদেব উত্তর করিয়াছিলেন

"বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রশ্নকর্তারং শ্রোতৃংস্তৎপাদ সলিলং যথা॥"
১০।১।১৯

"ভগবান বাসুদেবের চরণ জল যেমন যিনি সেচন করেন যাঁহাকে সেচন করা যায়, আর তদুভয়ের সঙ্গী, এই ত্রিবিধ পুরুষেরই পবিত্রতা সম্পাদন করেন; তাঁহার কথা বিষয়ক প্রশ্নও তদ্রূপ প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।"

নামকারী, শ্রোতা এবং শুনিতে ইচ্ছুক যাহারা, এই তিন জনকেই নাম পবিত্র করিয়া দেয়। নামেই চতুর্ব্বর্গ সংস্থিত। এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রই যুগধর্ম্ম। ইহাপেক্ষা অন্য সাধনা আর নাই। শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে জীবের যে ফললাভ হয়, একবার নাম উচ্চারণে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। ভক্তের নিকট এই নাম বড় মধুর। সতী স্ত্রীর নিকট স্বামীর নামটি যেমন অতি মধুর বার বার শ্রবণেও যেন তৃপ্তি সাধন হয় না, সেইরূপ এই নাম একবার অভ্যাস করিতে শিখিলে আর জিহ্বা ছাড়ে না, তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন

"সইরে কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলা গো আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
যদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।"

এই মধুমাখা নাম একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, আত্মানুভূতি আসে ও সেই বলে ভক্ত অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রাণারামের আনন্দঘন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত হইয়া যায়। নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি লক্ষ জন্মাধিক কাল কাটিয়া যায়, তথাপি সে অনন্ত মহিমার কণিকামাত্রও বর্ণন হয় না। হৃদয় রঞ্জন নামীর এই মধুর নাম তাই জীবের একমাত্র সাধনার সার বলিয়া মহাপ্রভু জগতকে শিখাইলেন। দুঃখময় জীবের আত্মবিস্মৃতি দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার কারণ এই নামরূপ মহৌষধি প্রদান করিলেন। জীব নামৌষধি পানে ভবব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যাহাতে বিশ্বধামে অনন্ত সম্ভোগের মধ্যে অনন্তকাল বাস করিতে পারে তাহাই বিধান করিলেন। কলিতে এই নাম মাত্র সাধনা। অন্য সাধনা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাই যুগধর্ম্ম ইহাই জীবের একমাত্র গতি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রান্সভালে ভারতবাসী

নেটাল হইতে সর্ত্তবদ্ধ মজুরীগিরি শেষ করিয়া কতিপয় ভারতবাসী ট্রান্সভালে আসিয়া বাস করিতে থাকে। এখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা ভারতবাসী অধিকতর বুদ্ধিমান হওয়াতে তাহারা নানা রকমের

বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালস্থ বুয়রগণ একটি সুনহরী কানুন (Golden Law) প্রস্তুত করেন যে, ট্রান্সভাল প্রদেশে কোনও ভারতবাসী ভূমির অধিপতি হইতে পারিবে না। এই আইন ভারতবাসীর উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে কিন্তু ইহাতে বিচলিত না হইয়া ভারতবাসিগণ আপনাদের উন্নতি বিধানের জন্য কটিবদ্ধ হয়। ইহারা ট্রান্সভালের সুপ্রসিদ্ধ নগর জোহান্সবর্গের সমীপবর্ত্তী স্থান ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লয় এবং তদুপরি 'বস্তি' নির্ম্মাণ করে। ইহা ছাড়া প্রিটোরিয়া বোক্সবর্গ ও জর্মিষ্টন প্রভৃতি নগরেও তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ট্রান্সভালের ছোট বড় ব্যবসা তাহাদের হাতে আসে। দেশের ধনের এক প্রধান অংশ তাহারা প্রাপ্ত হয়। ভারতবাসিগণের কতিপয় শ্রেষ্ঠ গুণপনাও ইহাদের অধিকতর কষ্টের কারণ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসিগণের উপর এক একটি করিয়া বিপদ পতিত হয়। বুয়র রাজকর্ম্মচারিগণের বুদ্ধির দোষেই এই সকল বিপদ ও কষ্ট উপস্থিত হয়। এই সকল লোক ভারতবাসিগণের রীতি নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া নানা প্রকারের অন্যায় অত্যাচার করিত। এই দুঃসময়েও ভারতবাসিগণের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, বুয়র রাজ্যে সত্যতার বিস্তার হইলে তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তাহারা বিশ্বাস করিত, ভারতবর্ষ ইংরাজের রাজ্য, তাহারা ঐ রাজ্যের প্রজা, সুতরাং তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবামাত্র ভারতগভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধান করিবেন। বুয়র গভর্ণমেণ্টের অত্যন্ত ঘৃণিত অত্যাচারের কথা জানিয়া বৃটিশরাজদূত সার কোনিংহাম গ্রীন, দুর্গত ভারতবাসিগণকে সর্ব্বদা সহায়তা করিতেন। কিন্তু বুয়র গভর্ণমেণ্ট মিঃ গ্রীনের কথা বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করিতেন না। এজন্য মিঃ গ্রীন নিরুপায় হইয়া ভারতবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে তদ্গণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান করেন।

বুয়র যুদ্ধে ভারতবাসী

ভারতবর্ষ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। যদিও বৃটিশ উপনিবেশ নেটাল ও কেপকলোনিতে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রবাসী ভারতবাসিগণের উপর উত্তম ব্যবহার করা হইত না তথাপি যুদ্ধারম্ভ হইবামাত্র এখানকার ভারতবাসিগণ ইংরাজগণের পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। শ্বেতাঙ্গের যুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গের মিলিত হইবার অধিকার নাই এজন্য তাহারা সম্রাটের জয়ের জন্য যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের অনেক রাজন্যবর্গ এই যুদ্ধে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তথাপি ভারতবাসিগণ আহত সিপাহিগণের সেবা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করেন। প্রথমে ইংরাজগণ এই সহায়তা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, পরে বারম্বার ভারতবাসিগণের প্রার্থনাতে কেবলমাত্র আহত সৈনিকগণের সেবা শুশ্রূষা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। জগতের কোথাও কি এমন জাতি আছে যাহারা রাজভক্তিতে ভারতবাসীর সমকক্ষ হইতে পারে? একটি পরাধীন জাতি বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াও রাজার জাতির শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে, ইতিহাসের কোথাও কি এরূপ উদাহরণ পাওয়া

যাইবে? শেষে গভর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে ভারতবাসিগণ তৎক্ষণাৎ একটি সেবকদল সৃষ্টি করেন। স্বজাতিবৎসল গান্ধী ইহাদের নেতা নিযুক্ত হন। এই সকল ভারতীয়গণ রণক্ষেত্রে অনবরত অগ্নিস্রাবী কামানের ভীম গর্জ্জন, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন, এবং উন্নত তরবারির নীচ হইতে আহত সৈনিকগণকে আনিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এই যুদ্ধে ভারতবাসিগণ ইংরাজ সৈনিকগণের যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনীতিবিদ্‌গণ পর্য্যন্ত সকলেই করিয়াছিলেন। ডরবন হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্র 'নেটাল এডভারটাইজার' ভারতবাসিগণের প্রবল শত্রু ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ভারতবাসীর সহায়তা দেখিয়া পুরাতন শত্রুতা ভুলিয়া যান। পত্রের এক অঙ্কে লিখিত হয় যে, ভারতবাসিগণ ত বৃটিশ সম্রাটের প্রজা, বৃটিশসম্রাট্ কখনও ইহাদের এই আত্মসমর্পণ ভুলিবেন না। ভারতের রাজপুরুষগণ যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব তখন তাঁহারা অন্য প্রকারে ইংরাজ সিপাহিগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজগণের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে ৮০০০ গোরা অফিসার সৈনিক, ৩০০০ মনুষ্য ৬৭০০টী ঘোড়া ১৬০০ খচ্চর ও টাট্টু ১০০০০ গরম কোট, ৪০০০০ খাদ্য রাখিবার থলিয়া ৪৫০০০ টুপি, ৭০০০০ জোড়া জুতা, ২৬৫০ জীন, ৪৬০ জন-কারিগর ও ২৬৫০ জন মিস্ত্রি প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া ২৬৫০টী অশ্ব, দেশীয় রাজগণের অশ্বারোহী সৈন্য ও সৈন্য সমূহ প্রেরিত হয়। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে ট্রান্সভাল ইংরাজের অধিকারে আসে।

ভারতীয়গণের হর্ষ ও বিষাদ

ট্রান্সভাল ইংরাজ রাজ্য হওয়াতে ভারতবাসিগণের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। তাহারা সর্ব্বদা নানারূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। ভারতবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে এক্ষণে তাহাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তাহাদের এই বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক যে, যুদ্ধে ভারতবাসী ইংরাজ রাজের জন্য যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, সেই উৎসর্গের পরিবর্ত্তে তাহাদের এই দুঃখ দূর করিবার জন্য ইংরাজ রাজ বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তাহারা এই আশায় নিমগ্ন হইয়া মনে করিত যে, শীঘ্রই পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তি লাভ করিবার দিন অতি নিকটে আসিয়াছে। এই প্রকারে উহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দের প্রবাহ চলিতে থাকিত। কিন্তু দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, ভারতবাসিগণের এই আশা নিরাশায় পরিণত হয়। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বুয়রদিগের অনুকরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা বুয়রদিগের ন্যায় ভারতবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি বুয়রগণের রাজত্বকালে ভারতবাসিগণকে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত, ইংরাজের রাজত্ব কালে তাহা অপেক্ষাও ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যে সকল দুঃখের নাম মাত্রও বুয়র রাজত্বকালে ছিল না, বৃটিশ রাজত্বকালে সেই সকল দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতবাসিগণের দাবী দাওয়ার উপর ভীষণ আক্রমণ হইতে থাকে। ইহাতে ভারতবাসীরা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তথায় 'ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' নামক একটি সভা স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত জয়রাম সিংহ বর্ম্মা উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং লাল বাহাদুর সিংহ,

বজ্র আত্মারাম খ্যাস, ডোমন, বল্লভরাম ঝীনাভাই দেশাই, পি, কে, নাইডু প্রভৃতি ৪২ জন ইহার সভ্য নিযুক্ত হন। ভারতবাসিগণের দাবী দাওয়া রক্ষা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতীয়গণের বাসস্থান হরণ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জোহান্স বর্গের মিউনিসিপ্যালিটি—এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন জারী করেন যে, যেখানে যেখানে ভারতবাসিগণ বাস করে সেই সেইস্থান গ্রহণ করিয়া তাহাতে বাজার বসান হইবে। এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ শুনিবামাত্র ভারতীয়গণের হৃদয়ে ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা সকলে পরিতাপ করিতে থাকেন। যে সকল ভূমি বুয়র গভর্ণমেণ্ট ৯৯ বৎসরের জন্য ভারতবাসীদিগকে ইজারা দিয়াছিল, সেই সকল ভূমি আজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত সর্ত্ত শেষ হইতে না হইতেই কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। এর চেয়ে বেশী জুলুম আর কি হইতে পারে? ভারতবাসিগণ দুঃখিত অন্তঃকরণে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ও নানা রকমে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবুও তাহারা ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হইবে কেন? ভারতবাসীদিগের পক্ষ হইতে লোকমান্য গান্ধী এই মহা অন্যায় পূর্ণ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বড় বড় উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ ইহাদের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। সাধারণ রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ পদাধিকারিগণের নিকট পর্য্যন্তও আপনাদের দুঃখের লাঘব করিবার জন্য প্রার্থনা করে। এমন কি বিলাতের পার্লামেণ্টেও এই বিষয় গোচর করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের প্রার্থনাতে কেহই মনোযোগ প্রদান করেন নাই, সব প্রার্থনা বিফল হয়। পরিশেষে ভারতবাসিগণের বাসস্থান ইংরাজদিগের বাসস্থানের শামিল করা হয়। ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভূমির মূল্যের চতুর্থাংশ প্রদান করা হয়

ভারতবাসিগণের জমী গ্রহণ করিয়া জোহান্সবর্গের মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিণী স্বাস্থ্যরক্ষিণী সভা (Public Health Committee) আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, যেস্থানে কাফ্রিগণ বাস করে, তাহা ভারতবাসীকে প্রদান করা হইবে। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ উক্ত সভার সভাপতিকে জানান যে, কাফ্রিগণের বাসস্থানে ভারতবাসিগণকে বসিতে দেওয়া ঠিক নয়, উহা শ্বেতাঙ্গ বস বাসের উপযোগী। এই প্রতিবাদে স্বাস্থ্য রক্ষিণী সভা সমমতাবলম্বী হন ও পূর্ব্বমত পরিহার করেন।

এই উপনিবেশ শ্বেতাঙ্গগণের। ইহাদের ইচ্ছানুযায়ী সভার কার্য্য পরিচালিত হয়। যে যে স্থানে উক্ত সভা ভারতবাসিগণকে বসাইবার জন্য ঠিক করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে হেড্ পোষ্ট অফিস পৌণে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। যে আইন অনুসারে ভারতীয়গণের বাসস্থান কাড়িয়া লওয়া হয়, সেই আইন অনুসারে পুরাতন বাসস্থানের নিকট নূতন বস্তি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয়গণ খুব আন্দোলন করিতে থাকেন কিন্তু তাহাদের বৃথা চীৎকার কাহারও কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয় না। এক্ষণে ভারতবাসীকে অন্যান্য জাতির ন্যায় পৃথক ভাবে বসান হইতেছে। এই সময়ে যে সকল ভারতবাসী যেখানে যেখানে বসবাস করিয়া আছে, আদেশ পাইবা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে স্থান তাহাদিগকে খালি করিয়া দিতে হইতেছে।

জোহান্সবর্গে মহামারী

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জোহান্সবর্গের চতুর্দ্দিকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হওয়ায় নগরের আবর্জ্জনা সমূহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইলে ভারতীয়গণের পল্লীতে প্লেগের আবির্ভাব হয়। এই পীড়াতে অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া অনেক লোক মরিতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে ৫১ জন ভারতবাসী যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরিয়া যায়। এই অনর্থক মৃত্যু দূরীভূত করিবার জন্য সমাজ-সেবক গান্ধী, বি মদনজীত, ডাক্তার গোডফ্রে ও বাবু জয়রাম সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়া পীড়িত ভারতবাসিগণের উত্তমরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে এই পীড়ার সংবাদ সাময়িক সমাচার পত্রে প্রকাশিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টকে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ভারতবাসিগণের পল্লীতে পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া এই আদেশ প্রদান করেন যে, কেহ যেন পল্লীর বাহির হইয়া না আসে। গভর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্যের জন্য ভারতবাসীর প্রায় সকল রকম ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়। তাহারা উদ্যম বিহীন হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। এই অবসরে জননায়ক গান্ধী গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভারতবাসিগণকে আহার্য্য সামগ্রী প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। কিছু দিন পরে ভারতবাসিগণকে তথা হইতে ক্রীস্প্রুট নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহারা এক মাস অবস্থানের আদেশ প্রাপ্ত হয়। তার পর কোরন-টায়ন নামক স্থানে এক মাস বাস করিতে বলা হয়। তাহাদিগের অবস্থানের জন্য তথায় ছোট ছোট তাম্বু খাটান ছিল। এই স্থানে কেহই রোগাক্রান্ত হয় নাই। সকলকে এজন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পর অনেক লোক ট্রান্সভালে বাস করিতে আরম্ভ করে, আর কতক লোক নেটাল ও ভারতবর্ষে চলিয়া আসে। নেটাল যাত্রিগণকে পাঁচদিন চার্লিষ্টন কোরনটায়নে থাকিতে হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহাদের পল্লী জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ট্রান্স-ভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়রাম সিংহ বর্ম্মা স্বদেশ যাত্রা করেন। ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাঁহার স্থানে শ্রীযুত লালবাহাদুর সিংহ সভা-পতি নিযুক্ত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক এক্ট

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়াবাসিগণের জন্য এক অপমানজনক আইন প্রস্তুত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আপন আপন নাম রেজেষ্টারী করিয়া লইবার জন্য বাধ্য করা। ঐ সঙ্গে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক দশ অঙ্গুলির ও একত্রে চার চার অঙ্গু-লির সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ অঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিতে হইবে। এই আইনে স্পষ্টভাবে ভারতীয়গণের পক্ষে 'কুলী' শব্দ প্রয়োগ-ই উপযুক্ত হইবে। চোর, লম্পট ও আততায়ি-গণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসিগণের উপর হইতে থাকে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পুরাতন ভারতবাসিগণকে আপন আপন নাম রেজেষ্টারী করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত-

বাসিগণের দেশে বসবাস করা রহিত করেন। এ স্থানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ প্রথম হইতেই ভারতবাসিগণের উপর দুর্ব্যবহার করিতে থাকেন, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে, কষ্ট সহ্য করিয়াও ভারতবাসী আপনাদের বাসস্থান খালি করিতে অনিচ্ছুক তখন তাঁহারা আর এক নূতন আইন গঠিত করিয়া কঠোরতার সহিত তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। এ স্থানে বহুদিন হইতে ভারতবাসী আপনাদের অধিকার সংস্থাপন করিয়া রহিয়াছে, অল্পলাভ লইয়া সন্তাদরে জিনিস বিক্রয় করিতেছে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়িগণ বৃথা আড়ম্বরের জন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এক্ষণে নূতন আইনের দ্বারা উহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে। কি সুন্দর আইন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! জগতের আর কোথাও কি কেহ এইরূপ অদ্ভুত আইনের কথা শ্রবণ করিয়াছেন? তখন বুয়র যুদ্ধের সময় বলা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে আর এখন যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে রাজ্যাধিকার আসিয়াও ভারতবাসীর দুঃখ দূরের পরিবর্ত্তে আরও অধিক দুঃখের সৃষ্টি হইল। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিয়া ভারতবাসীর রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তার উপর নানা অত্যাচার ভারতবাসীকে দুঃখের অঘোষ পাশে আবদ্ধ করিতে লাগিল। এই আইন অনুযায়ী ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকগণকে নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে এবং এসিয়াটিক রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট নামক একখানি পরওয়ানা সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখিতে হইবে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিলেই তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা দেখাইতে হইবে এবং এই আইন ভঙ্গকারীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

বিলাতে প্রতিনিধি

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই আইন প্রস্তুত হয় আর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহার অনল চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইন প্রস্তুত করিয়া সম্রাটের মঞ্জুরের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঐ সময় স্থানীয় ভারতবাসী ও বিলাতে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চাহে। হিন্দুগণের পক্ষ হইতে লোকমান্য গান্ধী এবং মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মিঃ আলী প্রেরিত হন। ইঁহারা বিলাতে গমন করিয়া ভারত সচিব ও ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ এলগিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার হেনরীকটন প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সভ্য এবং কতিপয় ভারত হিতৈষী ইংরাজ ইঁহাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সমাচার পত্র সমূহও ভারতবাসিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য পরামর্শ দান করেন। স্বয়ং সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও আইনের প্রতিলিপির উপর দস্তখৎ করা মুলতবী রাখেন। ইহাতে আশা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীদিগের ভাগ্য ফিরিলেও ফিরিতে পারে। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সভ্যগণ (Laboural Members) ভারতবাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ইঁহারা গভর্ণমেণ্টকে খোলাখুলি পরামর্শ দেন যে, ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য শীঘ্রই চেষ্টা করা উচিত। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে

নিরাশ হইয়াছিল তথাপি একবার বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তথাকার কর্তৃপক্ষকে তাহাদের দুঃখের কথা শুনান বাকী ছিল, এক্ষণে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহার ফলের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এ সময় কিছু সহৃদয়তার লক্ষণও দেখা যায়। যখন ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধি ভারত সচিব লর্ডমলির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন ভারত সচিব, প্রতিনিধির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আইনের প্রতি লিপির উপর তীব্র আলোচনা করেন। শ্রমজীবি পক্ষের ৬০জন সভ্য একটি সভা করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সমর্থন করেন। এদিকে এই প্রকার প্রবল আন্দোলন হইতে থাকে আর ওদিকে বিলাতেও ভারতীয় প্রতিনিধির অনুকূলে আন্দোলন আরম্ভ হয়। শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীগণ ইহা সহ্য করিতে অসমর্থ হন। তাঁহারা এই মহৎ কার্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করিতে থাকেন। যখন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড এলগিনের সমীপে ভারতবাসীর প্রতিনিধি গমন করেন, তখন তিনি প্রতিনিধির উপর সহানুভূতি দেখাইয়া একটি বিস্ময়জনক কথা বলেন, তাহাতে ডেপুটেশন সভ্য চমকিত হন। মাননীয় এলগিন বলেন, "প্রবাসী ভারতবাসিগণ এই মর্মে আমার নিকট তার করিয়াছে যে, ডেপুটেশনের সহিত তাহাদের মতের মিল নাই, তাহারা উক্ত সভ্যের সহিত বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রাখিতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য এই সংবাদ যেরূপ আশ্চর্যজনক, সেইরূপ অবিশ্বাসযোগ্য। যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর উপর অন্যায় অত্যাচার নির্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে, তখন তাহা দূরীভূত করিবার জন্য যে মতভেদ হইবে ইহা সম্ভব পর নহে। কোনও নীচ প্রকৃতির লোক এই দুষ্কার্য করিয়া থাকিবে ইহা আশ্চর্য নহে। বিশেষতঃ যাহারা ভারতবাসীকে ঘৃণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে তাহারাই যে এইরূপ করিতে পারিবে না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লর্ড এলগিনের মত বিচারনিপুণ লোক কিরূপে এই মিথ্যা খবর বিশ্বাস করিতে লইলেন। এরূপ তুচ্ছ কথায় বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে।

আন্দোলনের প্রস্তাব

বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নানারূপ প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। শেষে আইনের প্রতিলিপিতে সম্রাট স্বাক্ষর করিলেন। যখন ভারতবাসীর প্রার্থনা পদদলিত করিয়া আইন পাশ করা হইল, তখন ভারতবাসীরা আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থির করিলেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য আপনার স্বাভাবিক গতি লঙ্ঘন করিয়া বিপথে ধাবমান হইতে পারে, কিন্তু আমরা কখনও আমাদের এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিমুখ হইব না। আমরা কিছুতেই এই অপমানজনক আইন স্বীকার করিয়া লইব না। যদি আমাদিগকে ইহার জন্য জেলে যাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর তথাপি মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নামে কলঙ্ক অর্জন করিব না। মান অপমানের ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবাসীর আত্মশক্তি জাগিয়া উঠে। আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হইতে থাকে। ভারতবাসী হয়ত ভাবিতেছে, তাহাদের এই দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্ব দেখিয়া ইংরাজ জাতি কিছু নরম হইবে। ইংরাজজাতির অন্তঃকরণ কখন

ও এত নীচ হইবে না যে, কোন জাতির মনুষ্যত্বকে তাহারা পদদলিত করিবে। নেটাল এবং ট্রান্সভালের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সভা করিয়া ভারতীয়গণ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে থাকে। দরখাস্তের সভাস্থলে এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞা অটল ভাবে রক্ষা না করিবে, সে ব্যক্তি কোটী কোটী ভারতবাসীর অপমানকারী ও জননী জন্মভূমির পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপকারী অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি অন্যায় পূর্ব্বক জেলে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই জেলকে আরাম ভবন মনে করিতে হইবে। আপনার সম্মান রক্ষার জন্য জীবন বলি প্রদান করিতে হইবে। আমাদের উপর এর চেয়ে অধিক আর কি অত্যাচার হইতে পারে? আমরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও জমি কিনিতে পাই না, মাল গুদামে প্রদান করিয়া, বৃটিশ ভারতের প্রজা হইয়াও আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই! ইহা যদি অন্যায় না হয় তাহা হইলে আর কি অন্যায় নামে অভিহিত হইবে? ট্রান্সভালের ভারতীয়ের জন্য সকল হইতে জেল গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। এই অপমান সাধারণ অপমান নয়, ভারতীয় ডাক্তার ও ব্যারিষ্টারগণকেও দশ দশ অঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিতে হইবে। বৃটিশ পতাকা লক্ষ্য করিয়া সভা বলিতে থাকে—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমরা এই পতাকার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমাদের প্রতিষ্ঠা, আমাদের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে বাক্য অদ্যি পালন করা হইতেছে না। আমরা কি এই আইন অস্বীকার করিয়া নিজদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিব? জগতে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতির রাণা তাঁহার প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ আইন প্রচার করেন নাই। উক্ত সভাতে নিম্ন লিখিত কবিতাও গীত হয়—

রেভীক,

কত কাল রবে আর নিদ্রায় মগন,
জড়তা আলস্য বশে হারায়েছ সব,
উঠ এবে, নবোৎসাহে ঘোর নিদ্রা ত্যজি,
ভবিষ্যত আশা তব অতীব মহান।
ঐ দেখ সন্ধী তব হয় আগুয়ান,
লক্ষ্য পথ অতীব নিকট; পাইয়াছ
সময় উত্তম, কর ব্যবহার তার।
বুদ্ধিমান চিন্তাশীল জন,
যবে আসে সময় উত্তম,
বিধা করে সমুদ্রেরে চক্ষের নিমিষে,
পর্ব্বত কাটিয়া নদী করে প্রবাহিত।

সন্ধির চেষ্টা

যে সময়ে এই প্রকার ঘোর আন্দোলন চলিতে থাকে, সে সময় ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট সন্ধি করিবার জন্য সুপারিশ করিতে থাকেন। তখন এই সর্ত্তে সন্ধি হয় যে, ভারতবাসী প্রসন্নতা সহকারে আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করিলে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট এই আইন রহিত করিয়া দিবেন। যখন আইন যথোচিত সংশোধনের কথা বলা হয়, তখন কতিপয় ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করেন। ভারতীয়গণ এই সর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করেন যে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট পরে এই আইন রহিত করিয়া দিবেন। পরন্তু নাম রেজেষ্টারী করা হইয়া গেলে এ সম্বন্ধে কিছুই করা হয় না, বরং প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, এরূপ সর্ত্তে সন্ধির কথা বলা হয় নাই। যখন ভারতবাসীরা ইহা অবগত হইলেন যে, ট্রান্স-

ভাল গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন, তখন তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ইহার উপর আশ্চর্য্য এই যে, ট্রান্সভাল পার্লামেণ্টে যে নূতন আইনের প্রতিলিপি উপস্থিত করা হয়, সেই আইনে স্পষ্ট বলা হয় যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মের প্রথম ভাগে যে সকল লোক প্রসন্নতা সহকারে আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছে, সেই সকল লোকই বাণিজ্য করিবার কিম্বা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা পরওয়ানা না লইয়া দেশের মধ্যে ব্যবসা করিবে, তাহাদের ৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০০ টাকার অর্থদণ্ড কিম্বা দুই বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড হইবে। প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা, তার উপর আবার ভয় প্রদর্শন। ইহাতে জনসাধারণ সাতিশয় রুষ্ট হয়। জোহান্সবর্গ, প্রিটোরিয়া প্রভৃতি নগরে সার্ব্বজনিক সভা হয় আর সকলের সম্মতি অনুসারে ইহা নির্ণীত হয় যে, রেজেষ্টারীতে কিছুতেই নাম লেখান হইবে না। ইহা ছাড়া সহস্র ভারতবাসী, বৃহৎ সভাস্থলে আপনাদের সনদকে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেয়, সহস্র ভারতবাসী সভা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র পাঠায় যে, গভর্ণমেণ্টরচিত সন্ধিপত্রের নিয়মাবলী তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না।

সত্যাগ্রহের লড়াই

যখন ভারতবাসী নবীন উদ্যমে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন গভর্ণমেণ্ট আন্দোলনকারী নেতা ও ছোট বড় সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে প্রেরণ করিতে সুরু করেন। নূতন আইন অনুসারে দেশ পরিত্যাগের আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে শ্রীযুক্ত হরিলাল গান্ধির একমাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এ সময় স্বজাতিবৎসল গান্ধি স্বয়ং বলিতে থাকেন যে, চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া, আপনার দেশবন্ধুগণের দুর্দ্দশা দেখার চেয়ে যদি আমার সমস্ত জীবন জেলে অতিবাহিত হয়, তবু তাহাও শ্রেয়স্কর। যখন ভারতবাসিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশবহিষ্কৃত করিবার আদেশ প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়, তখন ভারতবাসীরা এই আধুনিক আদেশকে ভঙ্গ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে যদি ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করিবার দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় যে কোন রকমে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সাজা লইবার জন্য মনস্থ করেন।

পাঠকগণ, এই প্রকারে সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইয়া ভারতবাসীরা, ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্টকে আপনাদের নির্ভয়তা ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ট্রান্সভালের চালচলন খুব সরগরম হইয়া উঠে। প্রবাসী ভারতবাসিগণ যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে জানিয়া শুনিয়া ট্রান্সভালের এই অত্যাচারী আইন ভঙ্গ করার জন্য আনন্দে কারাভোগ করিতে থাকেন ও সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট মিঃ রুস্তমজী পার্শী, মিঃ হাউদমহম্মদ এবং মিঃ আব্দুলিয়াকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও ১১ জন ভারতীয় নেতার দেশবহিষ্কৃতির আজ্ঞা হয়। এই আদেশ ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহারা পুনরায় ট্রান্সভালে চলিয়া আসেন। ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্ট সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সমস্ত প্রবাসী

ভারতবাসী এই সকল সুশিক্ষিত ধনাঢ্য পুরুষগণের এই প্রকার কারাদণ্ডের আদেশকে মহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। জেলে প্রেরিত দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ট্রান্সভাল ও নেটালের সমুদয় গুদাম বন্ধ করা হয়। ডরবন, জোহান্সবর্গ, ও প্রিটোরিয়াতে ভারতবাসিগণের সার্ব্বজনীন সভা হয় ও বিলাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট দুঃখসূচক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। প্রবাসী ভ্রাতৃগণের প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত মোহন দাস করমচান্দ গান্ধিও গ্রেপ্তার হন। তাঁহার সঙ্গে আরও ৫ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহারা সব নেটাল হইতে ট্রান্সভালে গমন করিতেছিলেন। ট্রান্সভালস্থ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পারসীগণ সকলে একত্রিত হইয়া দৃঢ় সাহসসহকারে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। মিঃ সোরাবজী পারসী দেশ পরিত্যাগের আদেশ লঙ্ঘন করাতে এক মাস কঠোর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। জেল হইতে মুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহের শপথ পূর্ণ করেন। তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া ৫০ পাউণ্ড জরিমানা কিম্বা তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মিঃ সোরাবজী অর্থদণ্ড না দিয়া কারাগৃহবাস স্বীকার করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্য রণক্ষেত্রে নিজের রক্ত প্রবাহিত করিতে ও অকাতরে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এমন অনেক বেতন ভোগী ভারতীয় সিপাহী ট্রান্সভালে বাস করিতেন। ইঁহারা সকলে একমত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন যে, ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে রচিত এই অন্যায়পূর্ণ ও মহাঅসুখী আইন ভারতীয়গণ কখনও মানিয়া লইবে না। ভারতবাসীদের উপর এই আইন প্রয়োগ অপেক্ষা আফ্রিকার যে ভূমিতে আমরা ব্রিটেনের বিজয়ের জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আমাদিগকে দাঁড় করাইয়া গুলি দ্বারা মারিয়া ফেলা হউক।

বিলাতে লর্ড এম্পথীল, সার মঙ্গলজী ভাওনগরী ও সাউথ আফ্রিকার কমিটি ভারতীয়গণের পক্ষে ঘোর আন্দোলন করিতে থাকেন। অনেক সভা ভারতীয়গণের দুঃখ দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ প্রদান করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসনের মুখপাত্র সার ফিরোজ শাহ মেহতা, ভাইসরয় ও ভারত সচিবের নিকট এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করেন যে, "সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ও ধনাঢ্য ভারতীয়গণকে বৃটিশ প্রজার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বত্র রক্ষা করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইতে দেখিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ দুঃখিত, ক্ষুব্ধ ও সন্তপ্ত হইয়াছেন। অন্য কোন দেশে যদি ভারতীয়গণের প্রতি এইরূপ অপমানজনক ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশেই উহাদের সহায় কেহ নাই। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের এই অনুচিত ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। এজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষে মধ্যস্থ থাকিয়া প্রবাসী ভারতবাসিগণকে এই অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আইনের কবল হইতে মুক্ত করুন। লণ্ডনে ভারতীয়গণের একটি বিরাট সভা হয়, উহাতে

বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,—"আজকাল দেশনেতা গান্ধি মহাশয়কে বুয়র গণের অধীনে পাথর ভাঙ্গিতে হইতেছে। কিছু চিন্তা নাই, দেশসেবার পথে কণ্টক ছড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের জন্য আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। লোকমান্য গান্ধির সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে, আর আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, লোকমান্য গান্ধি যেন সর্ব্বদা আনন্দ মনে ও সুস্থ চিত্তে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে থাকেন।"

সত্যাগ্রহের ধুম ধাম

স্থানে স্থানে অনেক প্রকারের সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া, প্রবাসী ভ্রাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইতে থাকে। কিন্তু দিনের পর দিন তাহাদের কষ্টের মাত্রা বর্দ্ধিত হইল। সার ভেষ্ট রিভার, আপনার মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ট্রান্সভালের ভারতবাসিগণ অতিশয় বদমায়েস, যদিও তাহাদিগকে প্রায় সমুদয় সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, তথাপি তাহারা অধিকতর সুবিধা পাইবার আশায় এইরূপ গণ্ডগোল করিতেছে। রুটবেও প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন করিয়াও চুপচাপ বসিয়া আছেন। ইহাতে এইরূপ মনে হয় যে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া স্বীয় সদ্বিবেচনা ও ঔদার্য্যের গুণে সমুদয় মীমাংসা করিয়া দিবেন। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের অপক্ষপাত ও ঔদার্য্যের ভাণ দেখিয়া ভারতীয়গণের ইহা দৃঢ় অনুভব হয় যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই আশ্বাস বাণী কখনও বিশ্বাসে পরিণত হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসন্তোষ জনক আন্দোলন যথাপূর্ব্ব চলিতে থাকে। প্রবাসী ভারতবাসিগণের সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টও কিছু ঘাবড়াইয়া যান। পুনরায় সন্ধি হইবার গুজব উঠে, কিন্তু মিলিয়া মিশিয়া সন্ধি করার কথা সব নিষ্ফল হয়। প্রবাসী ভারতীয়গণের বাণিজ্যের পরওয়ানা রহিত করিবার আইন রচিত হয়, ইহাতে নেটালে পুনরায় অসন্তোষের সঞ্চার হয়। বাবরটনে ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া উহাদের উপর অভিযোগ আনীত হয়, এবং প্রত্যেককে ২৫ পাউণ্ড জরিমানা কিম্বা দুই দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সকলে জরিমানা প্রদান না করিয়া জেলে যাইতে রাজি হন। জর্মিষ্টনের বাবু লালবাহাদুর সিংহ, বাবু হজরা সিংহ ও শ্রীযুত নাজেপা নাইডুকে আন্দোলনের নেতা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পুনরায় এই সাহসী পুরুষগণ নেটালে প্রবেশ করেন। এই হেতু ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর ঔপনিবেশিক আইন ভঙ্গকরার অপরাধে তিন তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হেডলবর্গের মিঃ ভরাত, মিঃ সোমনাথ, মিঃ বি, পটেল, মিঃ মহম্মদ হাজী, মিঃ ইস্মাইল, মিঃ কাসিমজী, ইস্মুলজী, মিঃ হোসেন সুলেমান, মিঃ মুসা মহম্মদ সীদাত প্রভৃতি সজ্জনগণ; জোহান্সবর্গের মিঃ নাদির শাহকামা, মিঃ মুল্লাকি রোজ, ইণ্ডিয়ান পোট অফিসের ভূতপূর্ব্ব ক্লার্ক মিঃ বাপুজী, মিঃ উমরজী, মিঃ গৌরীশঙ্কর ব্যাস, মিঃ ডেভিড অরনেষ্ট, মিঃ সোলোমন অরনেষ্ট, মিঃ বল্লভরাম মিঃ এম কেসী প্রভৃতি; জর্মিষ্টনের মিঃ কে, কে, পটেল, মিঃ সাহজী আকুজী; বালফরেণ্টের মিঃ মনজী নাথুভাই, মিঃ মহম্মদ পটেল প্রভৃতি সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া

গভর্ণমেণ্ট জেলে প্রেরণ করেন। পরিশেষে ট্রান্সভালের প্রত্যেক নগরে এই ধরপাকড় আরম্ভ হইতে থাকে। ইহার পরে ভারত মাতার সুসন্তান লোকমান্য গান্ধি গ্রেপ্তার হন। ইহার উপর সত্যাগ্রহের অভিযোগ আনীত হয়। তিনি জোহান্সবর্গের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে নিজের জবানবন্দীতে বলেন যে, আমার নাম রেজেষ্টারী না করার অপরাধে এই দ্বিতীয় বার আমার উপর অভিযোগ আনীত হইয়াছে, এই অভিযোগ আমি প্রসন্নতা সহকারে স্বীকার করিয়া লইতেছি। আমি জানিয়া শুনিয়া এই অমানুষিক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এই অন্যায় পূর্ণ আইনের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানের জন্য অনেক ভারতীয়গণকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আমি শান্ত চাহিতেছি, কিন্তু ইহার বিপরীত করা হইতেছে। আমি এই জুলুমী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জেলে গমন করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। এই বিষয়ে আমি অধিক হইতে অধিকতর অপরাধী হইতে পারি। ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার রায়ে বলেন যে, মিঃ গান্ধির সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যে আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এজন্য আইনের ব্যবস্থানুযায়ী আমি মিঃ গান্ধিকে ৩ মাস কারাদণ্ড প্রদান করিতেছি।

কয়েকজন ভারতীয় যুবক ইংরাজের পাচকের কাজ করিতেছিল, তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা সত্যাগ্রহ ছাড়িয়া দাও, নতুবা কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইবে। উহারা সাফ জবাব দেয় যে, কাজ ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত নহি। কত ফেরীওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়, আর তাহাদের উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়া জেলে প্রেরণ করা হয়। কল কথা, ভারতবাসীরা, আপনাদের স্বার্থত্যাগ, সাহস ও বীরত্বের খুব পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০ জন ভারতবাসী জেলে প্রেরিত হয়, আর প্রায় ১০০ জনকে দেশ বহিষ্কৃতির হুকুম প্রদান করা হয়।

জেলের কাহিনী

ভারতীয় কয়েদীকে জেলে যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, উহার উদাহরণ কেবল একটি মাত্র বৃত্তান্ত হইতে পাঠকগণ অবগত হইবেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল ৬৫ জন ভারতীয় কয়েদীকে বালকরস্ট হইতে জুট পোর্টের জেলে প্রেরণ করা হয়। দিনে ১০ টার সময় বালকরস্টে তাহারা ট্রেণে চড়ে ও রাত্রি ৯টার সময় জুটপোর্টে পৌঁছে। ঐ রাত্রিতে তাহাদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া হয় না। দুইটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে সকলকে পশুর মত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উহাদের রাত্রি অতিবাহিত হয়। সকালে উহাদিগকে খাইবার জন্য বেলুনের চাউল ও কুমড়ার তরকারি প্রদান করা হয়। খাইবার সময় ইহারা অনেকবার জেলের অধ্যক্ষের নিকট অভিযোগও করে, কিন্তু অধ্যক্ষ সাফ জবাব দেন যে, তোমাদের উপর এইরূপই কঠিন ব্যবহার করা হইবে; তবেই তোমাদের অহঙ্কার নষ্ট হইবে, তবেই তোমরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে সমর্থ হইবে না। কিছু দিন পরে ইহাও বন্ধ করিয়া দিয়া কাফ্রিদিগের খাবার

দেওয়া হয় ও তরকারী খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেবল চাউল খাইতে খাইতে কতলোক পীড়িত হইতে থাকে। পীড়িতাবস্থায় অনেকে জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। জেলের কর্ম্মচারী এই অবস্থাতেও কিছুমাত্র দয়া না করিয়া কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য সমূহ করাইতে আরম্ভ করেন। কয়েদী কাফ্রিগণকে পীড়িতাবস্থায় আধ সের দুধ খাইতে দেওয়া হইত, কিন্তু ভারতীয় কয়েদিগণকে দুধ দেওয়া হইত না। পায়খানাতে এক সঙ্গে ২০ জনকে বসাইয়া দেওয়া হইত। স্নান করিবার জন্য কাফ্রিগণের স্নানাগারে যাইতে হইত। কোন কথা-জিজ্ঞাসা করিলে অফিসার অতিশয় রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন। অধ্যক্ষও ফুলী প্রভৃতি খারাপ শব্দ ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মের উপর কোনরূপ খেয়াল না করিয়া মাংস প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থ খাইতে দেওয়া হইত। মারপিট করা, গালাগালি দেওয়া প্রত্যেক সাধারণ কথার মধ্যে পরিগণিত হইত। ফলকথা কাফ্রি কয়েদিগণের চেয়েও ভারতীয় কয়েদীগণের খারাপ দশা হইয়াছিল। এইরূপ কষ্ট প্রদান করার প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া এই সকল লোক আইন স্বীকার করিয়া লইবে এবং পুনরায় কখনও জেলে আসিবার নাম পর্য্যন্তও করিবে না।

সহানুভূতিসূচক সভা

এই ঘৃণিত অত্যাচারের জন্য ডরবন, পীটর মেরিট্‌স্‌বর্গ, লেডিস্মিথ, জোহান্সবর্গ, প্রীটোরিয়া, বাবরটোন, কেপটাউন, কীম্বর্লী, ইষ্টলণ্ডন, পোর্টএলিজাবেথ প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন নগরে নগরে সার্ব্বজনিক সভা হয় এবং সত্যাগ্রহিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

এ সম্বন্ধে 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস,' 'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' ও 'ট্রান্সভারোমেন্স এসোসিয়েসনের' অধিবেশন হয়। ট্রানিনাড, মরিশস্, ফিজি প্রভৃতি স্থানের ভারতবাসীরা সত্যাগ্রহিগণের দুঃখে শোক প্রকাশ করেন। লণ্ডন নগরে সত্যাগ্রহিগণের বিষয়ে একটি সভা হয়। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেক নগরে ভ্রাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার জন্য সভা করা হয়। বোম্বায়ের একটি সুবৃহৎ সভাতে ট্রান্সভালের শ্রীযুক্ত পোলক উপস্থিত ছিলেন। পোলক মহোদয় আপনার বক্তৃতায় বলেন যে, ট্রান্সভালের ভারতবাসিগণ জননী জন্মভূমির প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছেন। তাঁহারা জেলের মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তথাপি স্বদেশের নামে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা স্বদেশবাসীর ভরসা করেন, এমন এক্ষণে আপনাদের নিকট তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনারা তাঁহাদের সহায়তা না করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা "প্রাণ যায় তবু বচন না ত্যজি" এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা তো অতি গৌরবের কথা। কিন্তু বলুন তো আপনারা তাঁহাদের শোকার্ত্তা স্ত্রী ও সন্তানগণকে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তাঁহারা আমাকে কেবল ইহা বলিবার জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্তই সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আপনারা কি ইচ্ছা করেন যে, তাঁহারা এই সব সহ্য করেন? আপনারা এইরূপ বলিতে কি প্রস্তুত আছেন?

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত গান্ধি লণ্ডনের নিউরিফর্ম ক্লাবে বক্তৃতা

দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে শারীরিক বল প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মিক বলদ্বারা যে বিরোধ করা হয়, তাহাতে সাহস ও বীরত্বের অধিক আবশ্যক হয়। ভারতবাসিগণ মানসিক বল প্রয়োগ দ্বারাই ট্রান্সভাল-গভর্ণমেণ্টের সম্মুখীন হইয়াছিল; এইরূপ উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় মিলিবে না।

ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসঘাতকতা

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের হর্ত্তা-কর্ত্তা জেনেরল স্মট্‌স্ স্বজাতিবৎসল গান্ধিকে ডাকিয়া বলেন যে, এ সময় আপনি আইন স্বীকার করিয়া লউন। পরে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে এই আইনের উচিত সংশোধন করা হইবে। লোকমান্য গান্ধি জেনেরল স্মটসের মত উচ্চপদস্থ শাসন কর্ত্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন উচিত মনে করিয়া নাম রেজেষ্ট্রারী করিতে স্বীকার করিলেন। তাঁর আশা এই যে, গভর্ণমেণ্ট এই ঘৃণ্য আইন রহিত করিয়া দিবেন। সে সময় সকল ভারতবাসী প্রসন্নতা সহকারে আপন আপন নাম রেজেষ্ট্রারী করিতে থাকেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আইন রহিত করিবার কোনই ব্যবস্থা করেন না; তাহা যথাপূর্ব্ব বজায় থাকে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভারতীয়গণের হৃদয়ে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হয়। সকলে ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টকে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ধিক্কার দিতে থাকে। কত অবোধ লোক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বলিতে থাকে;—আপনি কেন জেনেরল স্মটসের নিকট হইতে লেখা পড়া করিয়া লন নাই? ইহাতে গান্ধী উত্তর দেন যে, জেনেরল স্মটসের মত উচ্চ পদস্থের কথায় বিশ্বাস না করা আমার অনুচিত হইত, আর যখন ভারতীয়গণ ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টকে রণক্ষেত্রে ফেলিয়া দিয়াছে, তখন নীচে পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। আমরা যেমন একবার গভর্ণমেণ্টকে ফেলিয়া দিয়াছি সেইরূপ অনেকবার করিতে পারিব। এ সময় সত্যাগ্রহের স্বরূপ সাক্ষাৎরূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে ভারতীয়গণের ক্রোধাগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অনুমান হইতে লাগিল, শীঘ্রই যেন ভয়ানক সংগ্রাম হইবে।

মাননীয় গোখলের আগমন

যে সময় ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ও প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে দিন দিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে সময় ভারতবর্ষ হইতে মাননীয় গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ইংলণ্ড হইতে কেপটাউনে পদার্পণ করেন। আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের দশা নিরীক্ষণ করেন। তথাকার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শত শত অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। যখন তিনি নেটালে ৩ পাউণ্ড করপ্রদানকারী ভারতীয় মজুরগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্থানীয় ইংরাজগণ তাঁহার বক্তৃতা মন দিয়া শুনিতে থাকেন। তিনি দরবনের টাউন হলে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। উহা ভারতীয়গণ পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করিতে পায় নাই। তিনি বক্তৃতাতে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণের কুটীল ব্যবহার সম্বন্ধে খুব আলোচনা করেন। প্রিটোরিয়ায় গমন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সংহতির প্রধান মন্ত্রী জেনেরল বোথা, জেনে-

রল ষ্টউস ও রাজস্ব সচিব মিঃ চিশারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩ পাউণ্ড ঘুনী করকে রহিত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। ভারতবাসিগণের অন্যান্য দুর্দশার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা দূরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা-সংহতির উপরোক্ত তিনজন মন্ত্রী এই কর রহিত করিবার ও ঔপনিবেশিক আইন সংশোধন করিয়া দিবার জন্য মিঃ গোখ্‌লের সন্নিধানে প্রতিশ্রুত হন। মাননীয় গোখলে চারি সপ্তাহের অতিথি ছিলেন। তাঁহাকে মিষ্ট ব্যবহারে প্রসন্ন করা হয়। তিনি নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ গোখলে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে সকলের মনে ধারণা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদয় কষ্ট শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া শুভ দিনের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীসেবাভিক্ষু জীবন।

ভিখারী

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কে তুমি কোথায় যাও হে মহা তাপস !
ললাটে উদার ভাব,
ভাবনার নাহি ভাব,
প্রশান্ত মূরতি তব, প্রফুল্ল মানস
চির-মধুময় যথা ফুল্ল তামরস।

কিছুতে আকাঙ্ক্ষা নাই অপার বাসনা,
লোকে ফেলে দেয় যাহা,
সুখে তুলে লও তাহা,
সংসারের হাব ভাব কিছুই জান না,
কাল কি হইবে তার নাহিক ভাবনা।

কে কোথায় পড়ে আছে, কেবা দেখে তায় !
অবিশ্রাম চলে যাও
কার পানে নাহি চাও
সম্মুখে মহান্ বিশ্ব পবিত্র আভায়,
পশ্চাতে যাহাই থাক্ কিবা আসে যায় !

চলেছে পথিকবর সাগর সন্ধানে,
জগতের কোলাহলে
মন তার নাহি ভুলে,
মেতেছে হৃদয় তার সাগরের গানে,
মোহিত পাগল প্রাণলহরীর তানে।

শ্রীযশোদানন্দন ঘোষ।

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

(৮৭৪ পৃষ্ঠার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বাহাদুর সা

(১৭০৭—১৭১২)

আরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লাম গৌরব ম্লান হইয়া পড়িল। বাহাদুর সাহের সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সরকারী ও ব্যক্তিগত জনহিতকর কার্য্যসমূহ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। বাহাদুর সাহ সুশিক্ষিত ছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজ ভালবাসিতেন ১; তবুও আমরা তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে কেবল মাত্র দুইটী কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘটনাই দেখিতে পাই। প্রথম কলেজটি ঘাজিউদ্দিন এবং দ্বিতীয়টী খাঁ ফিরোজ জং কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। খাঁ ফিরোজই পরে তাঁহার মাদ্রাসার ভিতরে (১১২০ হিজিরা) ১৭০৮ অব্দে সমাহিত হইয়াছিলেন ২। ঘাজিউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফজার পিতা। তিনি আরংজেবের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বাহাদুর সার দরবারে প্রধান আমীরদিগের অন্যতম ছিলেন। দিল্লীতে আজমীর গেটের (ফটকের) সন্নিকটে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কলেজের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার নিজের কারুখচিত স্মৃতিসৌধ এবং একটী মস্‌জিদ ও স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল বড় বড় ইমারৎ সাজাহানাবাদের বড় বড় ইমারৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, কিন্তু ১৮০৩ অব্দে যখন ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রাচীরের সংস্কার হয় তখনই ঐ গুলি আধুনিক দিল্লীর সংলগ্ন হইয়াছে। একটী সুন্দর ফটকের ভিতর দিয়া ঐ বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। ফটকের দেয়ালের সঙ্গে যে সকল গোলাকার কুঠরী ছিল সেগুলিকে মাদ্রাসার ছাত্রগণের রাসাঘর মনে হইত। ১৭৯৩ অব্দে অর্থাভাবে কলেজটী উঠিয়া যায় ৩। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্ম্মার্থে দেয় ভূসম্পত্তি যেরূপ একই বেষ্টনীর মধ্যে একটী উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠাতার সমাধি স্তম্ভ, একটী আবাসগৃহ, এবং শিক্ষাগৃহ যাহাদের জন্য শিক্ষকদিগকে ভার লইতে হইত এইগুলি প্রতিষ্ঠাতার জীবিতকালেই নির্ম্মিত হইত; একটী কলেজ, একটী সমাধি স্তম্ভ এবং ঘাজিউদ্দিনের সমাধির উপর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়া একই বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া সেইরূপ কতকগুলি নমুনার মধ্যে একটী নমুনা দেখাইয়া ছিল।৪ ঘাজিউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত কলেজটী সম্প্রতি বাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে৫।

---

1. *Zubdatul-Tawarikh*, by 'Abdul Karim, p. 70.
2. *Mirati-Ahmadi*, vol. i, p. 410.
3. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 264; Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 44; Francklin's *Shah 'Alam*, p. 200.
4. Fanshawe's *Delhi Past and Present*, p. 64.
5. Francklin's *Shah 'Alam*, p. 200.

এই সম্রাটের রাজত্ব সময়ে কানৌজে আর একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত মাদ্রাসার কর্ণধার মরাবি নাম ছিল। মৌলবী আলিমুদ্দিন এবং মৌলবী নাইমুদ্দিন এই বিদ্যালয়েই তাঁহাদের পাঠ শেষ করেন১। এই মাদ্রাসার নামের সঙ্গে প্রায় এই রকমের অন্য কোন নাম যুক্ত হওয়া উচিত হয় নাই। যেমন—তারিখি ফরুখাবাদী গ্রন্থের প্রণেতা মহম্মদ ওয়ালিউল্লা কর্তৃক ফরুকাবাদে পরবর্তী সময়ে [ফরুকল-মরাবী ফবউল মকাখির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।২

মহম্মদ সা

(১৭১৯—১৭৪৮)

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোনীত সম্রাট মহম্মদ সা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করার পর দেশে অশান্তির সূত্রপাত এবং ঠিক কিছুকাল পরেই নাদির সাহের আক্রমণ সত্ত্বেও দেশের এমন একটা সজীব আকৃতি দেখা যাইতেছিল যাহাতে মন আপনা হইতেই আনন্দ পাইত। অম্বরের রাজা এবং জয়পুর রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সেবাই জয়সিংহের প্রতিভা সেই সময় বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই বিশেষ আকর্ষণ করে। তিনি বেধশালাগুলি কেবলমাত্র জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং কাশীতেই নির্মাণ করান নাই। দিল্লীতেও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎ নির্মিত বেধশালাটী মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মহম্মদ সার রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা জয়সিংহের প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভ এখনও দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদিও কখনও ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই এবং উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই জাট, দস্যুগণ অত্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল তবুও ইহা যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে যথেষ্টই রহিয়াছে ৩ এই বেধশালার হইতে বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যে বিখ্যাত জ্যোতিষ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল উহা মহম্মদ সাহী তালিকা নামে পরিচিত ছিল; উক্ত তালিকা জয়সিংহের তত্ত্বাবধানে মির্জ্জা খাইরুল্লা ও সেখ মহম্মদ মুহদিস্ কর্তৃক লিখিত হয় এবং তালিকাতে যে রকম লিখিত আছে, ১১৫৪ হিজীরাব্দে (১৭৪১ অব্দে) দুইটী গ্রহের মিলনের ফলেই তালিকার সত্যতা প্রমাণিত হয়।৪ দিল্লীর বেধশালায় একটী বৃহৎ জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পাত্র আছে যাহা জ্যোতিষচর্চ্চা এবং সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত, উহা জয়সিংহের সম্রাট যন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রহগণের দূরত্ব ও দিগংশ(Azimuth)নির্দ্ধারণের নিমিত্ত জ্যোতিষ পাত্রের দ্বারা এবং যে কোন বৃত্তের পরিধির পরিমাণে অঙ্কিত ছিল। ইহা সত্ত্বেও দুইটী গোলাকার সৌধ এবং একটী ছোট দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র ছিল।৫ ১৭২২ অব্দে সম্রাট মহম্মদ সার রাজত্ব সময়ে নবাব সরদুদ্দৌলা একটী মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন একটী মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।৬

---

1. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 227.
2. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 295.
3. Stephen's *Arch. of Delhi*, p. 269 ; Fanshawe's *Delhi Past and Present*, p. 247.
4. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 56 ; *Siyarul-Mutaakhkhirin*, vol. iii, p. 220.
5. Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 45 ; Stephen's *Arch. of Delhi*, pp. 269 ff ; Garcin de Tassey's *Sayyid Ahmad*, pp. 167-174 ; and Fanshawe's *Dilhi Past and Present*, p. 247.
6. *Asarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad, ch. iii, p. 81.

যখন নাদির সা দিল্লী আক্রমণ করেন তখন তিনি ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যায় দিল্লীকে বিধ্বস্ত করেন। তবসিরাতুল নাজি-রিন ১ গ্রন্থে লিখিত আছে যে যখন তিনি রৌশনুদ্দৌলার মাদ্রাসা বসিয়াছিলেন তখন এই আদেশ প্রচার করেন। যাহা হউক অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা বর্ণন করেন যে যখন নাদির রৌশনুদ্দৌলার মসজিদে বসিয়াছিলেন তখন মাদ্রাসাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই হত্যা করিবার আদেশ দেন। যেরূপই হউক নাদির দিল্লীর অপরিমিত ধনের সঙ্গে রাজকীয় লাইব্রেরীটী সহ পারস্যে প্রত্যাগমন করেন। মোগল সম্রাটগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই লাইব্রেরীতে গ্রন্থ রাখিয়া আসিতেছিলেন।২ দুরদৃষ্ট তাই এই সকল মূল্যবান গ্রন্থের কতকগুলি পরে অত্যন্ত কম মূল্যে পারস্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সাহ আলম

দেখা যাইতেছে যে, মোগল রাজবংশ, নাদিরের লুণ্ঠনের ফলে, রাজপরম্পরায় সংগৃহীত পুস্তকের মূল্যবান পাঠাগারটী হারাইলেন। উক্ত লাইব্রেরীটী (১৭৫৯-১৮০৬) দ্বিতীয় সাহ আলমের রাজত্বকালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কারণ ইব্রাত নামাতে উল্লেখ আছে যে নরাকৃতি সয়তান গোলাম কাদির সম্রাটের চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করে, লুণ্ঠনের ৩ দিন পূর্ব্বে মণিকুট্টীমে প্রবেশ করে, উহা হইতে একটী লৌহ সিন্দুক, ও একটী মণিপূর্ণ বাক্স এবং লাইব্রেরী হইতে কয়েক খানি কোরআন্ ও ৮টী বড় বড় বাক্সপূর্ণ বই লইয়া যায়।৩

হসন রাজা খাঁ অযোধ্যার আসফুদ্দৌলার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাহ আলমের রাজত্বকালে ফরুকাবাদে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ খাইরাবাদী উক্ত মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন।৪

স্ত্রীশিক্ষা

মুসলমান ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিও যে যত্ন লওয়া হইত তৎসম্বন্ধে আমাদের কতিপয় প্রমাণ আছে। নিঃসন্দেহ যে, স্ত্রীশিক্ষা পর্দ্দা-প্রথার দ্বারা বিষমভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু যেখানে যুবতী শিক্ষার্থিনীরা প্রেরিত হইত সেখানে কোন অবরোধকতা ছিল না। আমরা জাফর সরীফ হইতে অবগত হই যে বালিকারা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। তিনি কানুনি ইস্‌লাম ৫ গ্রন্থে বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, বালক অথবা বালিকা যে হউক কোরআন্ পাঠ শেষ করিয়া আহুত সভাতে শিক্ষককে উপঢৌকন দিত। গ্রন্থকার আরও বলেন যে, যখন কোন বালক বা বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত, তখন সাধারণ বিধি হেতু শিক্ষক একটী ঈ-দী (ঈদ সম্বন্ধে কোন কবিতা)

1. *Tabsiratul-Nazirin*, MS. in ASB, by Sayyid Muhammad-i-Biigrami, p. 443.
2. Martin's *Miniature Painting and Painters of India, Persia and Turkey*, vol. I. pp. 58, 77.
3. *'Ibrat-Namah*, by Faqir Khairuddin Muhammad, Elliot viii, p. 249.
4. *Tarikhi-Farrukhabadi*. MS. in ASB, leaf 124.
5. *Qanuni-Islam*, pp. 47-50.
6. *Ferishta* vol. iv. p. 236.

অথবা চিত্রিত কোন কাগজে শিশুদিগের প্রতি আশীর্ব্বাদ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতেন। উক্ত লিখিত বিষয়টী শিশু পিতামাতার সম্মুখে পঠিত এবং তাঁহারাই শিক্ষককে উপঢৌকন দিতেন যখনই ছাত্র কোন বই পড়িতে আরম্ভ করিত—তখন শিক্ষককে ভোজন করাইতে হইত, উহাকে ছবক বলা হইত; এবং পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে অর্দ্ধ দিবস বিদ্যালয়ের কাজ হইত। যুবতী শিক্ষার্থিনীরা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হইত ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শিক্ষার্থিনী বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ প্রথার প্রমাণ ব্যতীত আমরা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ়া আউতামাসের উত্তরাধিকারিণী রাজিয়া (রিজিয়া) একজন শিক্ষিতা সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। আরও দেখা যায় যে, সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন, যিনি ১৪৬৯—১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি আপন প্রাসাদের মধ্যে পৃথক পৃথক আফিস, দরবার এবং ১৫ হাজার স্ত্রীলোক এক সময়ে থাকিত। এই সকল বিভাগের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী সঙ্গীতজ্ঞ, স্তোত্রপাঠকারিণী স্ত্রীলোক, এবং নানাপ্রকার বৃত্তি ও ব্যবসায়ারী পুরুষেরা ছিলেন।"[১] তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদিগকে প্রাসাদে রাখিতেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় ঐ সকল শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে প্রাসাদের মহিলারা শিক্ষা পাইতেন।

মোগল বাদশাহদিগের সময়েও যে অন্ততঃ রাজকুমারীদিগকেও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত তৎসম্বন্ধেও কতিপয় প্রমাণ আছে; এবং তাঁহারা যে অন্যের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া মরিতেন সে ধারণার কোন কারণ নাই।

বাবরের কন্যা গুল-বদন-বেগম হুমায়ুন নামা লিখিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যদিও তাহার লিখিত নিদর্শন কিছুই নাই তথাপি তিনি যে বিদুষী মহিলা ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। আরও জানা যায় যে, গুল-বদন তাঁহার নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন।[২] হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী, তাঁহার ভ্রাতা গুলরুখের কন্যা সলিমা সুলতানাও একজন বিদুষী নারী ছিলেন। তিনি মখ্‌ফি ও (অজ্ঞাত) নামে অনেক পারসী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর আকবরের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আকবরের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী মাহম আনগা একজন সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং দিল্লীতে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবরের সময়ে রাজ পরিবারের মহিলাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হইত এইরূপ প্রতীত হয়; কারণ তাঁহার ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে আকবর মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকটী কক্ষ পৃথক রাখিয়াছিলেন।[৩]

জাহাঙ্গীরের পত্নী সর্ব্বজন পরিচিতা নুরজাহান পারসী ও আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিতা ছিলেন,[৪] এবং তিনিই তাঁহার স্বামীর জীবদ্দশায় শাসন প্রণালী পরিচালন করিয়াছিলেন।

1. *Humayun-Namah* of Gul-Badan Begam, by A. S. Beveridge, p. 76.
2. Malleson's *Akbar*, p. 185; Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 309.
3. Smith's *Fathpur Sikri*, Pt. i, p. 8. Mr. Havell has also given a plan in his *Handbook of Agra etc.*, where the school also appears.
4. *The Nineteenth Century*, 1899, p. 756 (article by Justice Amir Ali).

ইহাতেই, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকর্ম বুদ্ধিতে তাহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং যথেষ্ট শিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহল পারস্য ভাষায় বিদুষী ছিলেন এবং উক্ত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগমও শিক্ষিতা ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজেই তাঁহার সমাধি স্তম্ভের জন্য ফলক লিখিয়াছিলেন; উহা গভীর নম্রতা এবং চূড়ান্ত সরলতা পূর্ণ। উহাতে এইরূপ আছে—

"ঘাস এবং সবুজবর্ণ দ্রব্য ছাড়া আমার সমাধিক্ষেত্র আর কিছুতেই আবৃত হইবে না কারণ দরিদ্রের সমাধির আবরণের জন্য ঘাসই যথেষ্ট। সাজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম—ফকির, পথিক এবং চিস্তীর সৎ পরিবারের শিষ্য—ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" ১

তিনি নিজামুদ্দিন অলিয়ার সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করিয়া তদুপরি এই ফলক স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সত্তি-উন্নিসা নাম্নী বিদুষী মহিলা জাহানারার গৃহ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি কোর আন আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি মমতাজ মহলের স্ত্রী-নাজির ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে সাম্রাজ্ঞী, দরিদ্র পণ্ডিতগণের কন্যাদিগকে, ভগবৎ তত্ত্ববিদ্ এবং ধার্মিকগণকে বৃত্তি এবং এককালীন দান দিতেন। ২ আরংজেবের পাঁচ কন্যার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা জীবউন্নিসা বেগম শিক্ষিতা কুমারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং কোর-আনে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি পারসী এবং আরবী ভাষাও জানিতেন এবং চিত্রিত হস্তাক্ষরে তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত, কবি ও লেখকদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জীব-উন্নিসাকে অনেক মূলগ্রন্থ ও বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লিখিত পুস্তক সমূহও উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আরংজেবের তৃতীয়া কন্যা বদরুন্নিসা যদিও কোর-আন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল তথাপি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত অতটা শিক্ষিতা ছিলেন না। ৩

যদিও ভারতীয় মুসলমান রমণী ও রাজকুমারীগণ শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেনের মুসলমান মহিলাদের মত জেইনাব, হামদা, ফতিমা আয়সা, মরিয়ম প্রভৃতি ৪ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই তথাপি আমরা যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বেশ ধারণা হইবে যে, ভারতীয় মুসলমান মহিলারা শিক্ষায় হেয় নহেন; এবং তাঁহাদের তুলনায় ভারতীয় মহিলাগণের নির্জ্জনে অবস্থান বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, কিছুকাল তাঁহারা যে উন্নতি দেখাইয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়

অবশ্য এই সকল উদাহরণ কেবলমাত্র ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান বংশধরগণ অনুসরণ করিতেন। অতএব এখন আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান মহিলাগণ সাধারণতঃ যেরূপ ধারণা হয় অতদূর অজ্ঞ ছিলেন না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

---

1. Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 116.
2. Prof. J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib*, pp. 151 173.
3. *Maasiri Alamgiri (Bibl. Indica)*, pp. 568 ff.
4. Justice Amir 'Ali's *Short Hist. of the Saracens*, p. 560 ; Conde's *Arabs in Spain*, vol i, p. 484.

মফঃস্বলের বাণী

বাঙ্গালীর এত রোগ কেন ?

অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী যাহার সঙ্গেই দেখা হয়—কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই আর বলে না—"ভাল আছি।" বাস্তবিক, আমাদের এক-দিকে অন্নের ভাবনা সহস্র বিভীষিকা লইয়া যেমন দেখা দিতেছে, অন্য দিকে তেমনই আমরা দিন দিন রোগ চিন্তাতেও অস্থির হইতেছি।

কেন এমন হইল ? বঙ্গদেশে এত রোগের বৃদ্ধি হইল কেন ? এই যে তোমার আশে পাশে এত লোক—উহাদের স্বাস্থ্য সম্পদের গর্ব্ব কোথায় গেল ? বাঙ্গালীর শরীর এমন ব্যাধি মন্দির হইয়া পড়িল কেন ? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, আসিডিটি ও ডাইবিটিসের প্রভাব কেন ? ইহার উত্তরে তোমরা যাহাই বল না কেন, আমাদের মনে হয়—এ রোগ বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ—দেশোচিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। কথাটা একটু খুলিয়া বলা যাক্।

আমাদের দেশে আগে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, নানা কারণে সে ব্যবস্থা এখন উল্টা-ইয়া গিয়াছে। আগে এদেশের ব্যবস্থা ছিল—প্রাতঃস্নান ও পুষ্প চয়ন উদ্দেশে—প্রাতর্ভ্রমণ—সেই যে গঙ্গার কূলে কূলে—"আপহিরৈতি" মন্ত্র—প্রাতঃস্নান নিরত পুরু-ষের কণ্ঠ হইতে সন্ধ্যার ছলে ধ্বনিত হইত, তুমি হিন্দু—তোমাকে আজ সে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইতে হইবে কি ? হিন্দুর প্রাতঃসন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা—ঋষির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কল্পনা—সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জলের স্তুতি বন্দনা। শরীর ধারণ করিতে হইলে, এই তিনটিই ত চাই ;—আলোক, বাতাস, জল,—হিন্দুর বেদে, পুরাণে, দর্শনে, বিজ্ঞানে —অমৃতের সহোদর নামে অভিহিত। এই আলোক বাতাস জল—দেহ জগতে পিত্ত, বায়ু, শ্লেষ্মা ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উহারই নাম সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এসব কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বুঝান যায় না। এখন যে কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

আগে লোকে প্রাতঃস্নান ও প্রাতর্ভ্রমণ করিত। স্নানের জন্য নদীতে গমন, সন্ধ্যা-হ্নিক ফুল তোলা প্রভৃতির জন্য—দেবালয়ে-গমনে, উদ্যান ভ্রমণে—লোকের দেহ স্বাস্থ্যের অকৃপাতায় সুরক্ষিত হইত। তা'রপর মধ্যাহ্ন ভোজন, মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম। বৈকালে বিষয় কর্ম্ম, সূর্য্যাস্তের পর আবার সেই সন্ধ্যার ছলে নদী তীরে—বিমুক্ত বায়ু সেবন। এ সব ব্যবস্থা বাঙ্গালীর দেহের অনুকূল ছিল। কাজেই তখনকার বাঙ্গালীর অজীর্ণ, অম্ল, বা বহুমূত্র হইত না। মুসলমান শাসন কালে এবং ইংরাজ রাজ্যের প্রথমাবস্থায়ও এই ব্যবস্থা ছিল। লর্ড ক্লাইব হইতে ব্লাক ওয়ার পর্য্যন্ত—দিনে দুইবার কাছারি করি-তেন। তখন বাঙ্গালীর দেহ—এমন জীর্ণ শীর্ণ ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠে নাই।

এখন আফিস আদালত, দোকান পসার, হাট বাজার সমস্তই মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। সূর্য্যের দীপ্তি যত বৃদ্ধি পায়—লোকের শারীরিক পরিশ্রমও তত বৃদ্ধি

পাইতে থাকে! কর্ম্মক্ষেত্রের তাড়নায় লোকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে—ক্ষুধার উদ্রেক না হইতেই আহার করিতে বাধ্য হয়। এই পূর্ব্বাহ্নে—আহার অম্ল ও অজীর্ণের কারণ নয় কি?

তারপর বিশুদ্ধ বায়ু। বাঙ্গালীর দেহে আর বিশুদ্ধ বায়ুর স্পর্শ আনন্দ-পুলক সঞ্চার করে না। মধ্যাহ্নের মধুর সন্তপ্ত প্রভাবের সময়—বাঙ্গালীকে জুতা, মোজা, গেঞ্জি, জামা, চোগা, চাপকান পরিয়া—আহারের অব্যবহিত পরেই—কর্ম্মভূমে প্রবেশ করিতে হয়। বস্ত্র স্তূপের গরমে দেহ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে! এ অবস্থায় পরিপাক যন্ত্রটা কতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তাহা আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাত্রের আহারেও ঐরূপ গোলযোগ! সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কুপিত পিত্তের প্রসাদে নৈশ আহার অম্লাজীর্ণ সম্ভব বিষে পরিণত হয়। তাই এখন বাঙ্গালীর দেহে—এত অজীর্ণ, এত উদরাময়, এত গ্রহণী, অতিসার ও কোষ্ঠ-বদ্ধতার প্রাদুর্ভাব। যে দেশে প্রাতঃস্নান প্রাতঃ ভ্রমণের ছলে—বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে বিছানা হইতে উঠিবার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে—বেলা ৯টা পর্য্যন্ত জামাজোড়ায় গাত্র আচ্ছাদন। যে দেশে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তুষার পাত হয়, ৯টা পর্য্যন্ত সূর্য্যের মুখ দেখিবার যো নাই—সে দেশের ব্যবস্থা এ দেশে চালাইলে, তাহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ একখানি উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের ভদ্রতা রক্ষিত হইত। আমাদের এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে হইলে,—গায়ে কোট কামিজ ওয়েষ্ট কোট না চড়াইলে সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয় না! ইহাতেই ত দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে!

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

২। আমাদের ছাত্রবর্গ ও বিচারপতি উড্রফ

কে তুমি হে বীরহৃদয় এই অভিশপ্ত বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের তপ্ত প্রাণের অবসাদ যবনিকা উত্তোলন করিয়া শান্তির উষীর প্রলেপ মাখিয়া দিলে! কে তুমি তোমার স্বদেশ-বাসিগণের প্রচলিত বয়স্যুস সংস্কারের বিরুদ্ধে এমন ন্যায়ের কুঠার উত্তোলন করিলে! বন্ধু তুমি শাস্ত্রদ্রষ্টা উদার হৃদয় বিচারপতি। কোন্ ভারতবাসী তোমায় বন্ধুবরের ন্যায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধারণা না করে, যে ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষ মৃত! কে আজ দুঃসাহসিক বলিতে পারে আমরা মৃত নহি, জীবিত, জাগ্রত? তুমি কোন্ সাহসে, কি বলে, বল, যে শক্তির অংশ আমাদের ছাত্রবৃন্দ মৃত নহে সঞ্জীবিত? যখন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বার্থ রক্ষার নামে আত্মহত্যা করিতেছি, যখন আত্মরক্ষার নামে ভয় ভীত প্রাণে অহরহ মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছি তখন কেমনে বলিব আমরা জীবিত? তুমি ফ্রেণ্ডস সানরাইজ লিটারেরী ক্লাবে (Friends Sunrise Literary Club) এ বলিলে 'Those who are dead believe themselves to be dead—Is the Indian student dead?"—যাহারা মৃত তাহারা নিজদিগকে মৃতভাবে—ভারতীয় ছাত্র কি মৃত? তুমি বলিয়াছ You saw in the students the commencement of a future of great worth—(ছাত্র-দিগের মধ্যে ভবিষ্যতের মহতী আশা দেখিতে পাই) একথা কে অস্বীকার করিবে? এমন

আশা কাহার নাই ? তবে আজকাল চারিদিক হইতে ছাত্র কলঙ্কের যে তীব্র কলরব উঠিতেছে তাহাতে দুর্বল প্রাণ আমরা নীরব না হইয়া পারিনা, তুমি সে নীরবতা ভঙ্গ করিলে বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞ। জানি আজ আমাদের ছাত্রবর্গ অনেক দুঃসাহসের দুষ্কার্য্যের কলঙ্কে কলঙ্কিত—কিন্তু যখন দেখিতে পাই অক্টোবর যোগে, বাথরপল্ল দুর্ভিক্ষে, বর্দ্ধমান প্লাবনে, মেসোপটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে বিপদবরণ করে তখনও কি বুঝি তাহারা মৃত। যখন দেখিতে পাই তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাণে ত্যাগের মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি দিক্ বিভাসিত করিয়া তুলে, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহারা ক্ষুধিত আত্মীয়ের জন্য কপর্দ্দক গ্রহণ করে না—তখন প্রাণে কত ভক্তি আসে! আবার যখন দেখি বরপণ গ্রহণে অভিভাবকের তুণে তাহারা অক্ষয় ধনু তখন প্রাণে বেদনা পাই—নরহত্যার কলঙ্কে যখন তাহাদের হস্ত কলুষিত, দেখিতে পাই প্রফেসর প্রহারে তাহারা কলঙ্কিত হস্ত, তখন প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। সারজন উডরফ বলেন—

The students had been much criticised of late but if he judged them right they would not be depressed over it. For himself he was not alarmed at their condition. Nothing in the world was perfect nor wholly worthless as the Sanskrit proverb ran. Every good quality carries with it the liability of certain defects. The broad way of looking at matters was to see whether the qualities outweighed the defects The students had faults who has not ? but these were connected with certain qualities of energy and self-respect which they had acquired and which are in themselves praiseworthy. Of course all wished the defects away but speaking for himself, he would rather they had these faults than that they should be torpid, servile and lacking in self-respect. For himself he saw in the students the commencement of a future of great worth."

"ছাত্র-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখন খুব সমালোচনা চলিতেছে।—কিন্তু আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে, আমাদের মুহ্যমান হইবার কোনও কারণ নাই। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ত ভীত হইবার কোনও কারণই দেখি না। সংস্কৃত প্রবচনে আছে—জগতে কিছুই পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পক্ষান্তরে, মূল্যহীন নহে।—প্রত্যেক গুণের সঙ্গে দোষের সম্ভাবনা থাকে। উদারভাবে ইহাই দেখিতে হয়, দোষের অনুপাতে গুণের পরিমাণ অধিক কি না ?—(মহাকবি কালিদাসকে মনে পড়ে)—ছাত্রদিগেরও দোষ আছে। কাহার নাই ? কিন্তু সেই দোষের সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা ও শক্তির বিকাশ আছে।—তাহা তাহাদের স্বোপার্জ্জিত, তাই প্রশংসনীয়। কাহার ইচ্ছা নয় যে, দোষগুলি তিরোধান করুক ? আমি বলি বরং তাহাদের দোষ থাকে থাক, কিন্তু তাহারা যেন জীবনীশূন্য, তামসিক-ভাবাপন্ন, দাসপ্রকৃতি ও আত্মমর্য্যাদাহীন না হয়।

আমি ত ছাত্র-সমাজে মহান্ ভবিষ্যতের সূচনা দেখিতেছি।"

তাই আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে হতাশ প্রাণে ব্যথিত প্রাণে গঙ্গার সুশীতল সীকর সিক্ত মৃদুপবন হিল্লোলে বহিয়া যায়—তাই বলিতে ছিলাম হে মহামতি তোমার উদারতা ও বীরতাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবান করুন আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল যুবক-বৃন্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস সফল হউক।

বরিশাল হিতৈষী।

৩। জীবিকার্জ্জনে শিক্ষা

সংসারে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহ, তাহার সমুচিত ব্যয় ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এই তিনটি লইয়াই গৃহস্থদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। আপনার আমার নিত্য অর্জ্জন, নিত্য ব্যয় চলিতেছে। এইজন্য আমরা যাহা করিতেছি তাহার ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে অনেকেই তাহা ভাবি না।

অন্য দেশের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। এই বঙ্গদেশে প্রথমতঃ অর্থোপার্জ্জনের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেই আমাদের অনেকে ভ্রম করিতেছেন। তাঁহারা স্কুল কলেজের পড়াকেই অর্থোপার্জ্জনের উপায় ঠিক করিয়া থাকেন। অনেক অভিভাবকের মুখে শুনা যায়—'ছেলেটি অন্ততঃ মেট্রিকিউলেশন পাশ না করিলে অন্নের জোগাড় করিবে কি করিয়া? বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা সার্টিফিকেট পাইলে হয় ত কোন অফিসে ২০।২৫ টাকার চাকরী পাইবে।' মেট্রিকিউলেশন পাশ করিলে এফ এ পড়াইয়া ওকালতি বা এফ এ পাশ করিলে বি এ পড়াইয়া বি এল পাশ করাইবার কথাই তাঁহারা ভাবেন। এইরূপে হয় চাকরী, নয় ওকালতিই দেশের শিক্ষিত যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষাকে অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায় স্থির করা মারাত্মক ভ্রম। এই দুর্নীতি অল্পদিন মাত্র এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষ জাতি-ভেদের দেশ। জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ এখনও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বেশ প্রবল আছে। পূর্ব্বে এক একটি ব্যবসায় এক এক জাতির একচেটিয়া ছিল। পুস্তক পড়িয়া কাহারো কোন ব্যবসা শিখিতে হইত না। পাশ্চাত্য রাজ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও বিদ্যাচর্চ্চাকেই তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। সেখানকার কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী বিদ্যানুশীলনের সাহায্য লইয়া থাকেন মাত্র। ওকালতি ও ডাক্তারী ব্যবসায়ে বিদ্যাচর্চ্চার আবশ্যক বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য রাজ্যের লোকেরা ঐ দুইটিকে সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র অবলম্বনীয় ব্যবসায় করেন নাই। তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিকেই অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন। তাঁহাদের সমাজও সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছে।

এদেশে যে কোন শিল্পের বা ব্যবসায়ের সহিত পূর্ব্বে লেখা পড়ার সংস্রব ছিল না। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ ত এদেশের প্রবাদ বাক্য। অধুনা সকল ব্যবসায়ী লেখাপড়ার আশ্রয় লইতেছেন সুতরাং লক্ষ্মীও তাঁহাদেরে ছাড়িয়া যাইতেছেন। যে কোন ব্যবসায়ে উন্নতি সাধন অধীত গ্রন্থ-সাপেক্ষ নহে। এদেশেই বলুন, আর অন্য দেশেই বলুন, যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে বা শিল্পনৈপুণ্যে বিপুল অর্থ আয়ত্ত করিতেছেন স্কুল কলেজের বিদ্যা চর্চ্চার সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি অল্প। এদেশের

রামধন, তারিণীচরণ, ঢাকার পলিমিক্কা, কলিকাতার ষটকৃষ্ণ, মাড়োয়ারীদের ভগবান-দাস, বোম্বাইর তাতা, আমেরিকার রেগ্যণ্ বা ব্রিটনের রথচাইল্ড, রক্‌ফেলার, কার্ণেগি প্রভৃতি যাঁহার নামই করুন তাঁহারাই কার্য্য-প্রণালী আমাদের উক্তি সমর্থন করিবে।

স্কুলে পড়িয়া শুনিয়া বাল্যকাল হইতে আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল যে লেখা পড়া না শিখিলে মানুষের মনুষ্যত্বই বিকাশলাভ করে না। মূর্খলোকের কোন সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। তাহারা জগতের কলঙ্ক-স্বরূপ। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরে একটি স্বর্ণকার আমাদের সে ভ্রম অনেকটা ঘুচাইয়া দেয়। গয়নাপত্রের কারুকার্য্যে তাহার বিচক্ষণতায় কত সৌখিন ইংরাজ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইতেন, কথাবার্ত্তায় সাংসারিক কাজেকর্ম্মে তাহার চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তৎপূর্ব্বে দশ বৎসরের মধ্যে কখনো মনেও করিতে পারিয়াছিলাম না যে লোকটার বর্ণজ্ঞান নাই। কিন্তু সত্য সত্যই একদিন ধরা পড়িল—তাহার নিজের দলিলে সে নিজের নামটাই লিখিতে পারিল না।

তৎপর এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চাকে অর্থাগমের উপায়স্বরূপ করিয়া আমরা তাহাকেই কলঙ্কিত করিতেছি। শুধু বিদ্যাচর্চ্চার অধঃপাত নহে, আমাদেরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের বিদ্যাচর্চ্চা আমাদের অনেকের জাতিগত ব্যবসাবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা কেহই স্বধর্ম্মানুমোদিত ধনাগমের পথ অনুসরণ করিতে চাহি না, কেবলই পরের অনুকরণে—পরের সুখ সৌভাগ্যের প্রলোভনে আত্মহারা ও ভ্রমান্ধ হইয়া বৃথাই ছুটাছুটি করিতেছি।

পল্লীগ্রামের এক নিরক্ষর কৃষকও আমাদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার করিয়া দিয়াছে। স্বকর্ম্মনিষ্ঠা ও পরিমিতাচারের ফলে এক কালের নিঃস্ব কৃষক আজ ২০.২৫ হাজার টাকার লগ্নি কাজ করে। পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে সংসার করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এত টাকা, তোমার এই সুন্দর বুদ্ধিমান নাতিগুলিকে পড়াও না কেন? সে উত্তর দিল,—বাবা! ইহারা আমার স্বীয় কাজকর্ম্ম বেশ করে, খায়দায়ও ভাল, আধিব্যাধিও খুব কম ভোগে। লেখা পড়া শিখিলে ইহারা বাবু হইবে, বদমায়েসি করিবে, ব্যারামে ভুগিয়া আধমরা হইবে, আর আমার টাকাগুলি উড়াইবে,—অবশেষে ভিক্ষা মাগিবে। দরকার নাই আমাদের এই লেখাপড়ায়।

বস্তুতঃ এদেশের যে সমস্ত শিল্পকার্য্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল তাহাদের জন্যও শিল্পীদিগকে স্কুল কলেজে পড়িতে হইত না। শিল্পীরা সকলেই নিরক্ষর ছিল। শুধু তাহা কেন, বর্ত্তমানে আমরা স্কুল কলেজের শিক্ষাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি, অর্থাৎ এই শিক্ষা না হইলে সংসারের কোন কাজই চলিবে না বলিয়া যে মনে করি, এরূপ জ্ঞান এদেশে পূর্ব্বে কখনো ছিল না; এবং তাকিয়া দেখিলে এখনো উহার ততটা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইবে না। কর্ম্মনিপুণতা ও প্রকৃত জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

জ্যোতিঃ।

৪। ভারতের শিক্ষাসমস্যা

কিছুদিন হইতে এ দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে প্রায়ই আন্দোলন আলোচনা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অমুক অমুক দেশে এত লোক সাক্ষর, আর এ দেশে এত লোক

নিরক্ষর বলিয়া একটা আক্ষেপের সুর উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে—যেন অন্ততঃ আক্ষরিক বিদ্যা বা বর্ণপরিচয়ও নিরক্ষরতা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই "শিক্ষা" জিনিষটা কি, আমাদের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষীগণ শিক্ষাবিষয়ে বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, আর আমাদের দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা কিছু পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহা বিদ্যালয়কক্ষে কিরূপে ছাত্রদিগের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, কি করিলে ছাত্রদিগকে ভাষা, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এই সমুদায় উচ্চবিষয় লইয়াই লিখিত—তাহাও আবার বিলাতী ঋষিগণের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। কোথাও স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিদ্যুদ্বিকাশ নাই।

আজ কাল যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তারস্বর উঠিয়াছে তাহা এদেশ প্রচলিত। আধুনিক শিক্ষা যাঁহার জীবন যে ভাবে গঠিত তিনি যে সেই ভাবেই বিশ্ব দর্শন করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের আত্মপ্রকৃতিই বহিঃপ্রকৃতি-বোধের মানদণ্ড। সুতরাং আমরা যে শিক্ষা অর্থে যে কামস্কাট্‌কা ও হনোলুলুর অবস্থান জানি, পরের মুখে পরের দেশের গুণবর্ণনা, বিজ্ঞানের দুই চারি পাতা, বিদেশী দর্শনের দুই চারি পাতা, জ্যোতিষের যৎকিঞ্চিৎ এবং উচ্চগণিতের প্রথমাঙ্কর কয়েকটি গণিয়াই আমাদের পরব গ্রাহিতাকে প্রকৃত বিদ্যাবত্তা বলিয়া মনে করিব, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখিয়াও দেখি না, এ বিদ্যা-বহ্নি সংসারের তাপে প্রজ্বলিত হওয়া দূরে থাকুক, একেবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার স্কন্ধে পতিত হয় তখন দেখি, এই সমুদায় অধীত বিদ্যাগুলি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধস্মৃতি অর্দ্ধবিস্মৃতির তরল অন্ধকারে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—কখন কখন দেখি, গুয়াটিমালা-টিটিকাকা-প্যারাবোলা-হরবোলার দল অন্ধকারময় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাদের স্মৃতির মন্দিরে উঁকি মারিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছে—কখন কখনও বা লাফিং গ্যাস প্রেতলোক হইতে নির্গত হইয়া উকীলের কক্ষে হো হো সোঁ সোঁ করিয়া হাসিয়া হাসাইয়া অনন্ত সমীরণে মিশিয়া যাইতেছে। কখন কখন বা "ম্যাগনাচার্টা" ভূত আসিয়া এমনই ভাবে স্কন্ধে চাপিয়া বসে যে আমরা ভুলিয়া যাই, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে, ভারতীয় জাতি স্বাধীন বৃটিশ জাতি নহে—"ম্যাগ্‌নাচার্টা"র অন্তরালে অবস্থিত শাণিত কৃপাণের প্রভা ভারতে পতিত হইলে পুলিশ, প্রেমের শিকলি পরাইয়া সাদরে লইয়া যাইবে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আমাদের এ শিক্ষা কি শিক্ষা? না শিক্ষার অগ্নিমান্দ্য?

আবার যে বর্ণপরিচয় বা আক্ষরিক শিক্ষাকেও আমরা স্পৃহণীয় বলিয়া মনে করি, সেই "ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা"র ফলে দেখিতেছি কৃষকনন্দন কৃষিবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া সিগারেট ধরিয়াছে, শিল্পিকুমার শিল্পাদিকে অপমানজনক মনে করিয়া পাঁচ সাতটাকায় "মুহুরীগিরি"র জন্য ঘুরিতেছে, আমাদের মহিলাগণ স্ত্রী ও মাতৃধর্ম্মকে দাসীপণা মনে করিয়া "আয়ার" কোলে সন্তানসমর্পণ পূর্ব্বক নাটক নভেলে মনোনিবেশ করিয়াছেন আর কুমারী বা অজাতসন্তানা যুবতীগণ কুসুমবন্ধিনী অভিনয়ে বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিতে-

ছেন। পাঠশালায় যাইয়া দেখি বার চৌদ্দ-বৎসরের কিশোরগণকে "একে বলে হাত, আর একে বলে পা" প্রভৃতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও শিক্ষণীয় "কর্ম্মসঙ্গীত" শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহারই নাম কি লোক-শিক্ষা বা তথাকথিত "মাস্ এডুকেশন"?

আধুনিক শিক্ষার এই অবস্থা দেখিয়া প্রাণ স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে চায়, শিক্ষা জিনিষটা কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষার আদর্শই বা কি? যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করা হয়, মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক প্রকৃত সুখপ্রাপ্তিই শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিকবিদ্যাই আমাদের শিক্ষার মানদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এই সমুদায়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিকবিদ্যার উৎস, দর্শন, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্র এবং ব্যবহারিক-বিদ্যার জনক বিজ্ঞানের আলোচনা অপরিহার্য্য। কিন্তু স্বল্প-পরিসর মানব জীবনে এই সমুদায়ের সবিশেষ আলোচনা একরূপ অসম্ভব। যাহাকে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালন করিতে হইবে, যাহাকে অর্থোপার্জ্জনই জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহার পক্ষে দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা অসম্ভব এবং অধর্ম্ম। যাহার উপরে দশজনের প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত, সে যদি মাতালের মত দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায় মত্ত থাকে তাহা হইলে গৃহে "হা অন্ন হা অন্ন" রব উঠা অনিবার্য্য। তাই আমাদের দেশের অনেক কৃতবিদ্য যুবক দর্শন বিজ্ঞানের উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী, মুন্সেফী বা ডেপুটীগিরিতে জীবনের সকল শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিতেছেন—দর্শনবিজ্ঞান আর তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারিতেছেনা, তাঁহাদের সাধনা অন্য আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহাদের অবসরের সঙ্গীত, নিশীথের ক্ষণিক ও নিভৃত বংশী-ধ্বনি। আবার যাঁহারা এই আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে লক্ষ্মীর উপাসক হইয়াও সুযোগের অভাবে শক্তি ও ভক্তি শূন্য হইয়াও বাণীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এ দেশে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, বিদ্যা ফলবতী হইতেছে না।

প্রাচীন ভারতে এই নিমিত্তই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ব্রাহ্মণগণ দর্শন-বিজ্ঞান লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, সমাজ তাহার ফল ভোগ করিত। সংসারের লোক সমাজের লোক ব্যবহারিক-বিদ্যা লইয়া, অর্থোপার্জ্জন লইয়া তদ্বিষয়ে উন্নতি সাধন করিত আর ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সাধনা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান সহজভাবে সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদান্ত প্রভৃতি কঠিন দর্শনশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাদির আলোচনা করিতেন ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ রচনা করিয়া দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ জনসাধারণে প্রচার করিতেন। এই উপায়েই ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও দয়া, মায়া, আতিথেয়তা ও ভক্তি প্রভৃতি নানা গুণ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের লোক এই দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছে, রাজা ও প্রজা ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই রূপেই হিন্দুসমাজ গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে, এই রূপেই প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষা বা "মাস এডুকেশন" বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগেও স্বার্থজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, ভক্তি শাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র (স্মৃতি) প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া ছিন্নবস্ত্রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন, এ দেশের টোল দোকান নহে—টোলে "ফী" নাই—অধ্যাপককে ছাত্রদিগের আহার্য্যও সংগ্রহ করিতে হয়। এ দেশের "টোল" এ দেশের বিনা-বেতনের "রেসিডেন্সাল ইউনিভারসিটী"। এ দেশের সমাজ তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন আমরা ইহাদিগকে সমাজের গলগ্রহ বলিয়া মনে করি! ইহারা জগতের কোনই খবর রাখেন না, লড়াইয়ের খবর বলিতে পারেন না, কামস্কাট্কা ও হনোলুলুর বিবরণ বলিতে পারেন না, এডিসন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বার্ত্তা আওড়াইতে পারেন না, ইহাদের পল্লবগ্রাহিতা নাই, ন্যায় বেদান্ত ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি "সে কেলে" বিদ্যার আলোচনায় ইহারা তন্ময়, জ্ঞান যে কি করিয়া প্রাচীন হয় তাহা ইহাদের বুদ্ধির অগম্য—ইহারা মনে করেন, যাহা সত্য, তাহা শাশ্বত, তাহা অবিনাশী, তাহা চিরনমস্কৃত।

আমাদের মনে হয় যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ প্রলোভনশূন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে আকর্ষণশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া সমাজের কল্যাণে সাধনক্ষেত্রে ব্রতী হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষেও জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র, কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হইতে হইলে অর্থের প্রতি আকর্ষণ শূন্য হইতে হইবে। এ পথে অর্থ নাই, এ পথে লক্ষ্মী পরিভ্রমণ করেন না। আর যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন তাঁহাদের পক্ষে দর্শনাদি গভীর তত্ত্বসমূহের জন্য মস্তিষ্ক ব্যয় না করিয়া ভূগোল খগোলে সময়ক্ষেপ না করিয়া মিক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিবিধ শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি অর্থকারী ব্যাবহারিক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যিনি যে পথে যাইবেন, তাঁহাকে সেই পথের শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা—নতুবা ক্ষুদ্রমস্তিষ্কে বিশ্বজ্ঞান প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে পণ্ডশ্রম, অর্থব্যয় ও "অজীর্ণ" রোগোৎপত্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা।

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ।

গৃহস্থ

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার প্রাণ
পুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কণ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, ভাদ্র	একাদশ সংখ্যা।

আলোচনা

১। মনুষ্যত্বের শিক্ষা

শিক্ষা এবং মানুষের বিষয় ভাবিতে গেলে মানুষকে দেবতাবোধে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। মানুষ নেপোলিয়ন সৃষ্টি করিয়াছে, মিলের জন্ম দিয়াছে। মানুষ রাজা হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে, বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মানুষ তাঁহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া লয়েল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে—এত বড় শক্তি মানুষের। বিস্মিত হইতে হয় বটে।

আমরা পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিজেকে গঠন করিতেছি। সেইটাই আত্মগঠন। আত্মগঠন করিতে পারিলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, ইতিহাস রচনা করিতে পারিব, যুগযুগান্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম, জীবন, সমস্ত আমার মধ্যে টানিয়া রাখিতে পারিব। বীজ কি একদিনের বীজ? একটি বীজের মধ্য দিয়াই ত চিরকালের উদ্ভিদ জন্মিতেছে। মানুষও একদিনের জন্য

নহে—এক বৎসরের জন্ম নহে। লক্ষ লক্ষ যুগের জীবনধারা একক মানুষকে ধারণ করিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া তাহার সেই চির-কালের সফর বায় করিতেছে।

আমাদের রামমোহন রায়ের মধ্যে কি এই যুগব্যাপী মানুষটি ছিল না? বঙ্কিমচন্দ্র কি মাত্র ৫৫ বৎসর বাঁচিয়াই ক্ষান্ত রহিয়া গিয়াছেন? সেই ৫৫ বৎসরের আরও ২১ বৎসর গত হইতে চলিল—তিনি এখনও মরেন নাই। না জানি আরও কত বৎসর তিনি বাঁচিবেন।

সুতরাং আমরা দুই একদিনের জন্ম এই পৃথিবীতে আসিয়াছি এমন মিথ্যা কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবনের গুরুত্ব উপেক্ষা করিও না। যে মানুষ নেপোলিয়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, বল কি সে দুই দিনের জন্ম আসিয়াছে? যে মানুষ বেদের মন্ত্রে স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারিয়াছে সে মানুষ কখনও মরিতে আসে নাই। শোন আকাশ বলিতেছে, মানুষ তুমি মরিতে এস নাই। আমি চির-কাল তোমার মস্তকোপরি এই নক্ষত্র খচিত নীলচন্দ্রাতপ খুলাইয়া দিব। কবি বলিতেছে, এই প্রেমের রাজ্য—এই পৃথিবী মানুষের চিরকালের লীলাক্ষেত্র, এখানে কেহ মরেনা—

"Nothing will die,
All things will change
Through eternity—"

আমাদের ঋষি আমাদের আশীর্বাদ করিতেছেন, বলিতেছেন, তোমরা যে অমৃতের পুত্র—তোমাদের ভয় নাই। আমাদের কবি আমাদিগকে আশায় উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন, "প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ।" এই যে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ, ইহার সঙ্গে পার্থিব জগতের পূর্ণ সমাবেশেই শিক্ষার সার্থকতা। চোখের সম্মুখে প্রকৃতির পুষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়া ফুটিয়া আছে। এই বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃ প্রকৃতির সন্ধি করিতে হইবে। বাহিরের ফুলের সঙ্গে মনের ফুল ফুটাইয়া এক গভীর শান্ত সৌন্দর্যের সূত্রপাত করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা।

* *
*

২। অতিমানুষের মূল্য

"মানুষ উঠ্‌ছে—ভগবান নামছেন," বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু এই ওঠা-নামার মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। একই অবস্থার দুইরূপ বর্ণনামাত্র। মানুষই উন্নতি করিতে করিতে অতিমানুষের মত বিবেচিত হইতে থাকে—ভগবান মানুষেরই একটা অবস্থাবিশেষ। তাহা ছাড়া ভগবান বলিয়া আরওকি—একটা কিছু আছে কি? তবে উন্নতির শেষ দেখে না বলিয়াই—শক্তির চরম পরিচয় পায় না বলিয়াই মানুষ কোথাও তাহার পাঁড়ি টানিতে পারে না, সে মনে করে একটা অসীম অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেই শক্তিকেই সে ভগবান বলিয়া অভিহিত করে, ভয় করে, ভক্তি করে। কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া কি সেই শক্তির অবস্থিতি সম্ভব? প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যেই কি সেই শক্তির বিকাশ নহে? এই শক্তির মধ্যে ভিন্নের তারতম্য দেখিতে পায় বলিয়াই মানুষ ইহার চরম কোথায় ধরিতে পারে না, তাই বলে, শক্তি অসীম, শক্তি অনন্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান মানুষেরই একটা অবস্থাবিশেষ। এ অবস্থারও শেষ নাই। কারণ অতি মানুষ হইতে অতি মানুষে মানুষ

ক্রমাগত উন্নীত হইতে পারে। এদিক দিয়াও সে অনন্ত অর্থাৎ ভগবান অনন্ত।

অতি মানুষের রূপ আমরা পার্থিবের মধ্যে দেখিতে পাই, অতি মানুষের রূপ আমরা সন্তানের মধ্যে দেখিতে পাই, আবার যিনি মানুষ হইয়াও নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন, তিনিও হয়ত অতি মানুষ।

ঘোরতর পাপী, ঘোরতর পুণ্যবান দুইই ভগবানের ভক্ত—দুইই স্বর্গফল লাভ করিয়া থাকে—আমাদের পুরাণেতিহাসে এইরূপ কথাই আছে। আমার মনে হয়, তাহারা অতি মানুষ বলিয়াই তাহাদের ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, কারণ ভগবান যে তাহাদের নিজেরই অবস্থা।

চরম ভিন্নি ছাড়া আর কাহারও কথা গণনার মধ্যে আনা হয় না। তাহার পূর্ব্বে মানুষ যে দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এইটা ভাল, ঐটা মন্দ, এইটা করিব, ঐটা করিব না ইত্যাদির বিতণ্ডায় পড়িয়া ঘুরপাক খায়। কিন্তু যেটাই থাকুক সেইটাই যদি হৃদয় দিয়া একবার ধরে এবং তাহাকে প্রাণে মনে জীবনে অনুকরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তবেই তাহার বিকাশ চরম ভিন্নির দিকে ধাবমান হয়।

কিন্তু যাহারা ততখানি পৌঁছিতে পারে না, তাহারা কি তবে ব্যর্থ? তাহারা কি তবে ভগবানের বিকাশ নহে? না তা কেন? সব সফল, সকলেই আংশিক ভগবান। তুমি আমি সমাজের মনগড়া মাপকাঠি দিয়া যেটাকে ব্যর্থ মনে করি, ঘৃণ্য ভাবি, সেটা সত্যসত্যই ব্যর্থ নয়, তাহারও একটা মূল্য আছে, সেটা সত্যসত্যই ঘৃণ্য নয়, তাহার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্য আছে। ভুল করিয়ো না, পাপ পুণ্য সমাজেরই সৃষ্ট পদার্থ। চরম দৃষ্টিতে "তুল্য মূল্য সবাকার"।

• •
•

৩। সেবা ও শিক্ষা

আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি। দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এইগুলিকে আমাদের আশ্রয় করিয়াছি। আমারই সুবিধার নিমিত্ত এইগুলিকে প্রয়োজন মত টানিতেছি অপ্রয়োজনে সরাইয়া দিতেছি। টানা ছাড়া, ভাঙ্গা গড়া, কে না চায়? আপন শক্তি জাহির করিতে, মানুষের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সকলেই চায়। সকলেরই ইচ্ছা হয় পরবর্ত্তী কালের জন্য আমার নামটী অক্ষয় হইয়া থাকুক—সে আশা যাহার আছে তিনিই আপনাকে খাঁড় করাইতে পারেন। আশা, উদ্যম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সাহস, সংযম প্রভৃতি পুরুষের গুণ ব্যতীত কেহ বড় হইতে পারে না। এই সকল গাছ হইতে পড়ে না অথবা দেবতার উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া বসিয়া কাঁদিলেও মিলে না। আমাদের মধ্যেই এইগুলি রহিয়াছে। বিকাশের জন্য নানা ভাবের ক্ষেত্রও রহিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশের নিমিত্তই এই সকলের সৃষ্টি, পশুর জন্য নয়। মানুষে পশুতে এইখানেই প্রভেদ। যাহারা মানুষের মত আকার ধারণ করিয়াও পশুভাবাপন্ন তাহাদের সঙ্গেও পশুর একটু প্রভেদ আছে। পশু চিরদিনই পশু, মানুষ চিরদিনই পশু থাকে না। সময়ে সে মানব-সমাজেও দেবতাকে আহ্বান করিতে পারে। সুখ ভোগ, অত্যাচার গ্রহণ, শক্তিহীনতার প্রমাণ এবং স্মৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়া গত কল্যের বিষয় উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করাও তাহার কর্ম্ম নয়। মানুষের চরিত্রে যখনই অপ্রয়োজনীয় উদাস ভাব আসে, সে যখন প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বিচার করিতে বসে, তখনই দুঃখ হয়, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া

চিন্তিত হই। তখনই বুঝি তাহার দর্শভাব লোপ পাইয়াছে, বিস্মৃতি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাই বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার চরিত্র সমালোচনা করিলে চলিবে না। সমালোচক ও সমালোচ্য এক ভাবের না হইলে অঙ্গুলি সঙ্কেতের অবসর কোথায়? ধীর চলস্তিতে তাহাকে ধাক্কা দিতে হইবে, তাহার আমোদের আসর ভাঙ্গিয়া দিয়া মনে উত্তেজনার সঞ্চার করিতে হইবে, তবুও তাহাকে উঠাইতে হইবে, মার খাইয়াও তাহাকে টানিতে হইবে। হউক সে অত্যাচারী ক্ষুধার্ত্ত, হউক সে দুর্দ্ধর্ষ মহাবলশালী, হউক সে ক্ষীণজীবী, অথবা হউক সে আমার নীচাশয় আত্মীয় পরিজন—তাহাকে চাই-ই। কার্য্যারম্ভে ভাবিতে হইবে সে আমারই আত্মীয় স্বজন, আমারই দেশবাসী বিদ্বান-বুদ্ধিমান, আমারইত প্রতিবেশী; তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে তাহারই তালর জন্ত। তারপর যখন তুমি মহদুদ্দেশ্ত লইয়া উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছ তখন আর আপন পর কি? মহাশক্তির আহ্বানে সাড়া দিবার নিমিত্ত, তাহাকে কর্ম্মের উপযুক্ত করিবার জন্ত, তোমার পথের পথিক করিতে—তাহার ঘোর তমঃ দূরীকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ অবধি সকল কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। তোমার উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত দেবতার সঙ্গে যুদ্ধেরও প্রয়োজন হইতে পারে মানুষ ত দূরের কথা। আমরা হিন্দু, দেবতাই আমাদের শত্রু, দেবতাই আমাদের পরম মিত্র, দেবতারাই আমাদের আদর্শ।

যে পরের ভার কাঁধে লইবে মানুষের ত কথাই নাই, সমস্ত জগতের যেখানে যাহা প্রয়োজনীয় আছে, তাহা তাহাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে।

হীন বিশ্বাস, অসংযত, দুর্ব্বল মানুষকে, আমারই অনুবর্ত্তীকে বুঝাইব দৌর্ব্বল্য তোমার শোভন নয়, ভীরুতা তোমার ভূষণ নয়, চাপিয়া থাকা তোমার ধর্ম্ম নয়, মনুষ্যত্বের নামে পশুত্বের পূজা তোমার উদ্দেশ্ত নয়, স্মৃতি রাখিয়া, আশা রাখিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়কে বিস্মৃতির ও হীনজ্ঞানের দ্বারা চাপা দেওয়া তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এই দেশের মাটি তোমারই কর্ম্মভূমি। তুমি একটা মানুষ তোমার জন্মটা শুধু একটা ভেল্‌কি বাজির জন্ত নয়, সময়ে সময়ে মৃত্যুর প্রার্থনা করাই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাজ নয়, আবিল ভোগের জন্ত তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি পশু নও—আহার নিদ্রাই তোমার চরম নয়। মানুষে মানুষে যেখানে সমতা আছে যে সকল গুণের দ্বারা মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হয় তাহাই তোমার লক্ষ্য। তোমার সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, তোমার ধর্ম্মভিত্তি তোমার হৃদয়ে কতখানি গাঁথিয়া উঠিয়াছে তাহা নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিকাশ করা, তোমার ইতিহাসের ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর ও ভক্তশ্রেষ্ঠগণের চরিত্রবল প্রস্ফুটিত করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্ত। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের চর্চ্চা, সমাজ সমস্যার মীমাংসা, শিক্ষাপ্রচার এবং রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের পরিচালন তোমার উদ্দেশ্ত।

সময় আমাদের খুবই কম। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় সন্নিকট। আমাদের শাস্ত্রবাক্য আছে "গৃহীতৈব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে মনুষ্যত্বের অর্জ্জনে ভয় ও দুর্ব্বলতার দ্বারা হইবে না। আমরা বুঝিতে চাই অন্তকে বুঝাইতে চাই মহাশক্তি আমার প্রাণের তারটী

বাজাইয়া আমাকে যে পথের পথিক করিতে চায়, তাহাই সভ্য, তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই প্রেয়, তাহাতেই ধর্ম্মের বিকাশ, অধর্ম্মের বিনাশ, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা, দুর্ব্বলতার বিসর্জ্জন।

৪। আমাদের বিচার-বুদ্ধি

প্রতি বৎসরই কংগ্রেস কনফারেন্সের সভাপতি মনোনয়ন ব্যাপারে দেশময় একটা হট্টরোল চলিতে থাকে। বাঙ্গলা দেশে শারদীয় পূজা যেমন ছেলে মহলের একটা আমোদের বিষয়, শিক্ষিত বৃদ্ধ মহলে কংগ্রেস কনফারেন্স ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তবে এই দুইটীর মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য না আছে এমন নহে। শারদীয় পূজায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রচার করিয়া বেড়ান না অথবা পূজা দাতার প্রতিবেশী বা গাঁয়ের লোক দল বাঁধিয়া অন্য পক্ষকে বলেন না আমাদের প্রতিমা ভাল, সাজ সজ্জায় ঢং আমাদেরই উত্তম। কংগ্রেস কনফারেন্সের কর্ত্তাদের ঐখানটায়ই যত গোল।

সমাজ, ধর্ম্ম, ও গৌরব লইয়াই দেশ, এই গুলি অল্পবিস্তর সকল দেশেরই আছে। পশুও এই দেশেরই তাই বলিয়া ধর্ম্ম বা গৌরবে তাদের কোন ধারই নাই। তার আছে সমাজ মাত্র তাও প্রাণী বিশেষে পার্থক্য আছে। সুতরাং পশুমাত্রেই সমাজবদ্ধ নয়।

আমরা দেশের উন্নতি চাই, দেশের গৌরবকে আবার তাজা করিয়া নবীন ভাবে উপলব্ধি করিতে চাই, আমাদের সমাজে মানুষ চাই আমরা যে সবই খাঁটী চাই। তাই কতকগুলি হ য ব র ল লইয়া বাস করিতে চাই না, এ ধারণা সকলেরই আছে। যখন দেশ চাই, দেশের গৌরব চাই তখন ব্যক্তিগত আধিপত্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে আমাদের লক্ষ্য থাকিবে কেন? যাহাতে দেশ উপযুক্ত লোকের দ্বারা ভূষিত হইতে পারে তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য।

তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে লইয়াই এই দেশের অস্থি, পঞ্জর, মেদ, মাংস শিরা, শোণিতবিন্দু। অবশ্য এমন দিন আমাদের আসে নাই যে দিন দেশের প্রতিনিধি সকলের অভিমতে মনোনীত হইবেন, তবুও দেশের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, হয়ত তাঁহারা রাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই অথবা সমাজ বিজ্ঞানে বা শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য উৎকৃষ্ট চিন্তার পরিচয় দেন নাই তথাপি, তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হয় কেন? সম্পাদকগণ সভ্য জাতির গৌরবের বিষয় তাঁহারাও এ বিষয়ে পৃথক পড়িয়া থাকেন কেন? আজ যাঁহারা সভাপতি হইয়া দেশের গৌরববৃদ্ধি করিতে ব্রতী, তাঁহারা দেশের কোন্ কোন্ বিষয়ে জনসাধারণের কাছে পরিচিত? পরবর্ত্তী-যুগের সন্তানগণ তাঁহাদের অভিভাষণ ও বক্তৃতাপাঠ ব্যতীত আপনাদের জীবন পথে আর কি সহায় পাইবে? প্রতিনিধিগণ গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে সমস্ত দেশ তাঁহাদিগকে জানায় না কেন?

এক একটী বৎসর সভা সমিতি লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে আর পরহিতব্রত নায়কগণ দেশ রক্ষার জন্য জীবন দান করিতে আগু হইতে থাকেন। বাঙ্গলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র হইতে এক একজন প্রতিনিধি দাঁড়াইয়া পড়েন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত ভাবের বক্তা, কেহ হয়ত বাগ্মীতা কণ্ঠের ডঙ্কা বাজাইয়া রাখিয়াছেন আবার কেহ হয়ত নীরব কর্ম্মী। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই কি তাঁহাদিগকে জানে শুনে? হয়ত এক ভাষা-

তাহী ব্যক্তিই আপন প্রদেশে বিশেষ পরিচিত নহেন। এদিকে বোম্বাই হয়ত বাঙ্গালাকে আসন দিলেন, বাঙ্গালা হয়ত যুক্তপ্রদেশকে টানিলেন। সভাপতিগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে বরণ করেন তাঁহারা ছাড়া আর সম্পূর্ণ দেশটা কি তাঁহাদের তুলনায় একটা অজ্ঞ অদভ্যের বিচরণ ভূমি? সকলেই যে তাঁহাদিগকে জানিবে এমন কোন কথা নাই। ইহাতে উভয় পক্ষেরই ত্রুটী আছে। কিন্তু কংগ্রেসাদি সভা সমিতির সভাপতিগণ আজ যেমন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছেন, পূর্ব্বে যদি তদ্রূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠাযত্নেষ্টা করিয়াও থাকেন তবুও প্রত্যেকের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা সাধারণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ দেশের জনসাধারণ যেন তাহাদের সভাপতিকে জানিয়া শুনিয়া লইতে পারে। এক এক প্রদেশের এক এক জনের উত্থান সত্ত্বেও যেন মনোমন্থনে পার্থক্য দেখা যায় এবং দেশবাসী দূরে থাকিয়া ইহার রহস্য বুঝিতে পারে না যে, মাদ্রাজী পঞ্জাবীকে ডাকিতেছে কেন। তাই আমরা বলিতে চাই প্রতিবৎসরেই যখন একজন দক্ষ সভাপতিরই আহ্বান হয় তখন সকলে এক বাক্যে একজনকে আহ্বান করে না কেন? উপযুক্ত যে, সে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত, তাহার আসন টিকিবেই, তাহার প্রতিষ্ঠা হইবেই। দেশের মুখপাত্র সংবাদ পত্র প্রভৃতি তাঁহাদিগকে ডাকেনা কেন? সভাপতিগণ যখন আপনা হইতেই সাজসরঞ্জাম প্রদর্শন করিতে থাকেন তখন মনে হয় দেশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মভোগই প্রধান উদ্দেশ্য তাই তাঁহারা অপেক্ষা করাকে সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। "যার যখন হতেছে সময় রঙ্গ ভূমির অভিনয়" তিনি তখনই দেখা দেন কিন্তু বৎসর মধ্যেই আর তাঁহাদের অনেকেরই সাড়া পাওয়া যায় না—সে কেবল আজ।

আজ কংগ্রেস রাখাটা যেন একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইতেছে সে প্রাণ আর প্রীতি ঢালে না। যাক, তবুও যদি কোন দিন এ মন্দিরের পূজারীভাবে উমেশচন্দ্র, লাল মোহন, গোখলে, রমেশ দত্তের মত কেহ আবার দেখা দেন এই যা আশা।

* * *

৫। সাহিত্যসম্মিলনের কাজ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশই আপনাদের মাতৃভাষার উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। ইহার ফলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য নূতনের সঙ্গে পুরাতনের যোগ করিয়া দিবে। প্রাচীন কবি, বাদক, গায়ক, শিল্পী ও লেখককে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিবে। প্রাচীন সমাজসেবক ও সাধু মহাপুরুষদিগের ত্যাগনিষ্ঠা, সংযম ও সেবাদ্বারা সমাজ গতির ধারা কিরূপ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার বিবরণও বেশ ফুটিয়া উঠিবে। আমাদের সমাজ পুরাতন। এই পুরাতন সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আজ নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য নানা শ্রেণীর-সেবক, নানা ভাবের ভাবুক দিতে পারিতেছে। এই ভাবুকতা আমাদের মধ্যে বেশ প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু সমুদয় দেশ এখনও সেভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই। শুধু প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ ও স্থান নির্ণয়ের দ্বারাই ইতিহাস পুষ্ট হয় না, নব্য ইতিহাসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঐ গুলিই

একমাত্র উপাধান নহে। তবুও বাঙলা দেশে প্রাচীনকে বুঝিবার জন্ত যতটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে আর কোন প্রদেশে তেমন ভাব খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশকে বুঝিবার নিমিত্ত কেবল উড়িষ্যা, পঞ্জাব ও গুর্জ্জর-সম্মিলিত মহারাষ্ট্রকেই দেখিতে পাইতেছি না। হিন্দুস্থান ও অন্ধ্র, সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু ভাষার ভিতর দিয়া আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখাইয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বাঙলার প্রান্ত হইতে সুদূর রাজপুতনার সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দী প্রদেশ দাঁড়াইতে চাহিতেছে, শুধু ভাষার উপর। আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া জ্ঞানদানের জন্ত ততটা আগ্রহ আজও দেখাইতে পারে নাই। সমগ্র দেশে যদি মনুষ্যত্ব সাধনের জন্ত একটা দেবভাব আসিয়াছে তাহা হইলে গতি অমন মন্থর কেন? যে ভাবে যে ভাষায় যে স্পন্দনে মানুষ সজীবতা লাভ করে আমরা তাহাদিগকে পাইয়াও এমন নিশ্চল কেন? তাহার একমাত্র কারণ সাহিত্যসেবা বা স্বদেশের উন্নতির জন্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করিতেছেন যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের ছাড়িয়া আর বেশীদূর পৌঁছাইতে যেন ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা যে, শিক্ষা চাহেন তাহা সত্য। শিক্ষাই মানুষকে দেবত্বে পরিণত করিবে, কিন্তু বড় জোর নৈশবিদ্যালয়ই তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষাপ্রচারের পন্থা হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের এই সময়ও যে এইভাবে বসিয়া থাকা তার কারণ শুধু নিজেদের মধ্যে এমন শক্তি নাই যাহার দ্বারা নিজেরা শক্তি দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আর দশজনকে খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তারপর সে শক্তির তিপারীও নাই। আমরা সবই চাই বিপুল, কিন্তু যে শক্তিতে শক্তিমান মনে করি, সে শক্তিতে আর কুলায় না। তাই আজ সর্ব্বত্র নিরাশা, কর্ম্মে বীতস্পৃহা, গড়িয়া না উঠিতেই ফলের দিকে লক্ষ্য দৃষ্টি, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস।

যে শক্তির প্রয়োজন তাহা দূরে রহিয়াছে। তাহাকে কেহ কাছে টানিতে চাহে না। সস্ত ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই এই অনিচ্ছার কারণ। বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন জননায়কের চরিত্রে যদি এই প্রকার শক্তিহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে সমাজ স্থির থাকিবে কি করিয়া? কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বীতস্পৃহ হওয়ার চেয়ে প্রতিষ্ঠায় উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তাহাতে উদাসীন না হওয়াই যোগ্যতমের কার্য্য।

দেশ জন-সংঘকে লইয়া, জনকয়েককে লইয়া নহে—ইহা সকলেই বুঝেন। যাঁহারা কোনদিন কর্ম্মের সেবক হন নাই, একটা মৌখিক ভালবাসাকে জাতীয় জীবনে কর্ম্মের সহায় করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সর্ব্বত্র নিরাশ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা জনসাধারণকে টানিতে চাই কিন্তু যখনই দেখিতে পাই তাহারা ভাষার মারপ্যাচ শিখে নাই, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার করিতে জানে না অমনি দূরে সরিয়া যাই। তাহারা প্রাণহীন কি না সেটা ভাবি না ভাবিবার ধারও ধারি নাই।

আমরা কি আশা করিতে পারি—আজ যাহারা আমাদিগের কটাক্ষে পতিত, অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত তাহারা কোন দিন আমাদেরই পাশে বসিবে আমাদেরই মত সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবে? সেইদিন আমা-

দের সাহিত্য-সমাজ পুষ্টিলাভ করিবে। যতই অনুসন্ধান চলুক সাহিত্যের প্রকৃত ভাব সেই দিন দেখা দিবে। সমগ্র বঙ্গ, হিন্দুস্থান, পঞ্চনদ, দ্রাবিড় এই বিষয়টা উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। বিশাল ভারতের জন্য যত শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার শতগুণ চাই। যত জন নায়ক দেখা দিয়াছেন তাহাপেক্ষা শতাধিক নায়কের অভ্যুত্থান চাই।

আজ পর্য্যন্তও কেহ ভাবিলেন না সাহিত্য-সম্মিলন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নয়, জনসমাজের। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত তাহারা আজ পর্য্যন্তও ইহার স্বাদ পাইল না। পরিচালকগণ তাহাদিগকে ডাকেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা উপেক্ষিত তাহারা কি করিয়া একাদন লাভের জন্য দাবী করিবে।

বাঙ্গলা দেশে ত চাই-ই—হিন্দুস্থান প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের সাহিত্যসমাজে কাহাকেও যেন বাদ দেওয়া না হয়। কে বিদ্বান বুদ্ধিমান তাহার বিচার আজ নহে। কাহার প্রাণ কতটুকু, ভাবে কাহার চক্ষু হইতে কতটা অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় তাহাই দেখিতে হইবে। যাহার সাহিত্য তাহাকে বাদ দিয়া অনুসন্ধান হয় কি? অজ্ঞাত অশ্রুত অনেক থাকিবেই।

* *
*

৬। দ্বারপণ্ডিতের কর্ত্তব্য

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের দেশের রাজদরবারে পণ্ডিতগণ সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। রাজা-বাদশাহগণ কেবল মাত্র রাজ্য-রক্ষার্থে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন না, পরন্তু যথেষ্ট অর্থ বিদ্যাদানের জন্যও ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের সভা ও দরবার সর্ব্বদাই পণ্ডিতগণের দ্বারা শোভিত থাকিত। প্রথাটা আজও চলিয়া আসিতেছে। আজও দেশের জমিদারদিগের আশ্রয়ে দ্বারপণ্ডিত প্রতিপালিত হইতেছেন। সদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয় কাজে আসুক বা না আসুক অগত্যা ব্যয়টা সার্থক। প্রথাটা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু তাঁহাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ হইতে আমরা পাইতেছি কি? যিনি অর্থ দান করিতেছেন তিনি হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন কিন্তু একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না কি আমি অর্থের বিনিময়ে, উচ্চের রক্ষার প্রতিপালনে পাইতেছি কি? আর যিনি অর্থ বা দান গ্রহণ করিতেছেন, তিনিও নিজেকে প্রশ্ন করিতে পারেন না কি আমি অর্থের বিনিময়ে দিতেছি কি?

আমরা বলিতে চাই না এই সকল পণ্ডিতগণকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহা অর্থ সকল করুন। আমরা চাই শত শত দ্বারপণ্ডিত আবার এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য প্রচার করুন। প্রাচীন রাজা-বাদশাহগণের নাম স্মরণ করিয়া ভূম্যধিকারীদিগের গৃহ জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলুন। কিন্তু আজকার দুর্দ্দিনে, আমাদের সাহিত্যিক দৌর্ব্বল্যের দিনে তাঁহারা যে নীরব তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির ফলাফল কোথায়?

কালিদাস-ভবভূতির উত্তরাধিকারী আজ কোন্ নবীন মহাকাব্য রঘুবংশ-রামচরিতের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন? আজ আর কোন দিগ্বিজয়ী শঙ্কর অথবা বল্লভাচার্য্য আগমন করিবেন না, আজ আর কোন কালিদাস রাজসভায় আগমন করিয়া কাব্য নৈপুণ্যে চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উপহার লইতে আসিবেন না, তবে দ্বারপণ্ডিত, সভাপণ্ডিত করিতেছেন কি?

দ্বারপণ্ডিত অথবা সভাপণ্ডিত ভূম্যধিকারীর গৃহে উজ্জ্বল নক্ষত্র সন্দেহ নাই—

"বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" তিনি হয়ত প্রাচীন অথবা নব্যন্যায়ের উপাধিধারী অথবা প্রাচীন স্মার্ত্তের বর্ত্তমান বংশধর। কিন্তু তাঁহার পরিচয় কোথায়?

এত আক্ষেপের পর আমরা বলিতে চাই কি?—আমরা বলিতে চাই পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবেন তাহা বচনে হউক আর রচনাতেই হউক এক রকমে তার প্রকাশ চাই-ই। যদি বিদ্যা ও বিদ্যার্থীকে উৎসাহ দেওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহার সার্থকতা দেখিতে পাই না কেন? বিদ্যাদানের কাছে অর্থদান কিছুই নয়, আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী টাকা পয়সার দিকে নজর না দিয়াও আপনাদের বক্তব্য দান করিয়া গিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। আজ সংরক্ষণ-নীতির আংশিক প্রচলন সত্ত্বেও ভূম্যধিকারী আপনার জ্ঞান-কোষে কি অমূল্য জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন?

আমরা কথার জোর বাড়াইবার জন্য বলিতেছি না, শত শত দ্বারপণ্ডিত আবার এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য প্রচার করুন। আমরা চাই আজকার দিনে যে সাহিত্য, যে কাব্য রচনার প্রয়োজন তাহাই হউক। তাই বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিতেছি না। নূতনের সঙ্গে পুরাতনকে নূতন চক্ষে দেখিতে হইবে তাহার সার্থকতা বাড়াইবার জন্য নব্য জ্ঞানের বিস্তৃতি আবশ্যক।

সুতরাং টাকার মতে টাকা খরচ হইল "কাজের বেলা রক্তা দেখিব কেন"? যাহাতে টাকা সার্থক হয়, পরিশ্রম সার্থক হয়, দান ও গ্রহণ সার্থক হয় সে দিকে নজর রাখিয়া "সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতির" প্রচলন চেষ্টা হয় না কেন? আমরা চাই কেহ যেন শক্তি লইয়া কুণ্ঠে না হয়, বুদ্ধি রাখিয়া জড় না হয়, ধন লইয়া কৃপণ না হয়। বুদ্ধির দোষে অথবা এই গুলির প্রয়োগ অথবা স্বেচ্ছাচার না হয়। সকল সময় নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে, ভাবিতে হইবে আমার নিজের নিজত্ব কতটুকু? এই ভাবনার মধ্যেই ত্যাগ ও ভোগ, ইহার মধ্যেই আপনার ও পরের চিন্তা সমভাবে বিরাজমান, ইহারই মধ্যে তমঃ ও রজঃ অবস্থিত। ধনী ব্যক্তির নির্ধনের যে প্রয়োজন, নির্ধনের ও বুদ্ধিমানের এবং বুদ্ধিমানের ও ধনীর সেই প্রয়োজন। সুতরাং অথবা অথবা স্বেচ্ছাচার দ্বারা পরিচালিত হইলেই দেশবাসী বলিবে সমাজকে ঠকাইয়া ধনী ধন ভোগ করিতেছেন, শঠতা ও প্রবঞ্চনার ইহাই নামান্তর মাত্র, বিদ্বান বিদ্যার নামে মাথায় মুকুট পরিয়া অজ্ঞান ও অশিক্ষায় দেশকে অন্ধ করিয়া দিতেছেন।

* *
*

৭। হিন্দু পরিবারে ছাত্রাবাস

হিন্দু পরিবারের বিশেষত্ব কোথায় তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে কত বড় চিন্তাশক্তির উপর ভিত্তি পত্তন করিয়া হিন্দুর শক্তি গড়াইয়া রহিয়াছে। হিন্দু পরিবার একটা বিরাট সংঘের খণ্ড পুঞ্জশক্তি। বর্ত্তমান যুগে যাহাকে 'অরগেনিজেসন' বা গঠিতদল বলে হিন্দুর সমাজ পুরাকাল হইতেই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছে। একটী দলে যেমন একজন নেতা থাকেন হিন্দু পরিবারও সেইরূপ এক-জন বিচক্ষণ ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেখাইবার সুবিধা নাই। পরিবারের কর্ত্তাকেও সময়ে পরামর্শ লইতে হয়। বিভিন্ন পরিবারে যে সকল উৎকৃষ্ট নীতি প্রতিপালিত হয়, সমাজে তাহার

বিকাশের জন্য যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। হিন্দুর পরিবারে সন্তানগণ শৈশব হইতে পিতার শাসন ও মাতার কোমলতায় বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়কে সরস রাখিতে পারে। বালো তাহাদের গণিত বা মানসাঙ্ক শিক্ষার জন্য গণিতের আর্য্যা মুখস্থ করিতে হয় না, তাহারা ব্যবহারিক গণিত যাহা শিক্ষা করে উত্তরকালের জন্য তাহাই মস্তিষ্ককে উর্ব্বর করিয়া দেয়। নীতি শ্লোক তাহার চরিত্র গঠনের শিক্ষক, তোতাপাখীর মত সেই সরল প্রাণে যাহা শিক্ষা করে তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে পদে পদে মনে জাগ্রত হইয়া সুপথে চালিত করে।

হিন্দু ছাত্রের জীবন বিদেশ যাপনে ব্যস্ত ইহা হিন্দুসন্তানের পক্ষে নূতন বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আজ তবুও ডাক বিভাগের ও যাতায়াতের সুবিধা দৃষ্ট হয় কিন্তু তখনকার দিনে কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, নদী পার হইয়া উপযুক্ত গুরুগৃহের উদ্দেশ্যে তাঁহারা গমন করিতেন। পিতা মাতাকে শারীরিক কুশল-সংবাদ দেওয়ারও সুবিধা ছিল না। আপন পরিবারের পিতা মাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের রাজ্যে নূতন পিতামাতার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য তাঁহারা ছুটিয়া যাইতেন, সেখানে একটী নূতন সংসারকে আপন করিতেন, পরের অধীনে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয় তাহাই শিক্ষা করিতেন।

চিরদিন কখনও একভাবে যায় না। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। শিক্ষা-ক্ষেত্রের উপযুক্ত বন্দোবস্তও হইল, কিন্তু হইল না কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রের উপযুক্ত বিধান আর ঘুচিলনা ছাত্র-জীবনের অর্দ্ধ-দৈন্য। যাহা হউক বাসস্থানের বিধান হইল, ভারতীয় ছাত্র-জীবন টোলবাস পরিবর্ত্তন করিয়া মেস্-জীবন লাভ করিল। ইহার ফলে আমরা গার্হস্থ্য জীবনের কোন লাভই দেখিতে পাই না তবে কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে যার দেশের বারটী ছাত্র একস্থানে মিলিতে পারিয়াছে বারজনকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তাহাও যে নূতন কথা নয়। এই ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় নালন্দা, ওদন্তপুরী, ও বিক্রমশীলার মঠে কত হাজার হাজার ছাত্র একত্র বাস করিত। মেসের জীবনের ভালবাসা ততদিন যতদিন তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে।

যে সকল ছাত্র বিদেশে বা মেসে বাস করে প্রথমতঃ আহার সম্বন্ধেই তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়। দরিদ্র ভারতীয় সন্তানের আহার্য্য লইয়াই যত গোল। পরিবারে যথেষ্ট পয়সা খরচ না করিয়াও খাওয়া দাওয়া রুচিকর হয়। বৎসরে দুইবার অবকাশে গৃহগমনের সুবিধা হইলেও আবার পরিবারে যাইয়া শান্তি-লাভ করিতে পারিলেও বৎসরের নয়মাস তাহাদিগকে মাটী খাইয়া থাকিতে হয়। ছাত্রে ছাত্রে পরিচয়টা যত নিকটতর বোধ হয়, তাহাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা ততবেশী নিকটতর হয়। উহাই চিরদিন স্মৃতিতে থাকিয়া যায়। কিন্তু আজ সেই অভাব বেশী রকম রহিয়া গিয়াছে। ভিন্ন দেশের রীতি নীতি ভিন্ন পরিবারের সন্তান-চরিত্র গঠন প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা নাই।

তাই আমরা বলিতে চাই বিভিন্ন গ্রন্থাদির আলোচনা দ্বারা যেমন জ্ঞান পুষ্ট হয়, বিভিন্ন প্রকার রুচিকর ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্যের সমবায়ে তাহাদের দেহেরও পুষ্টিলাভ আবশ্যক। নানা-রূপ অভিজ্ঞতা লাভেরও একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন কালের ছাত্র-প্রতিপালন ব্যাপারটা কালধর্ম্মে একপ্রকার অভাবনীয় বিষয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে

উহা যেন টোলের অধ্যাপকদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে বিদেশী দরিদ্র ছাত্রগণ স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট আহার পাইয়া থাকেন। এইরূপ অন্নদান ব্যবস্থা সকল স্থানেই হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ এই প্রস্তাব করিব যাঁহারা নিজ অর্থব্যয়ে বিদেশে অবস্থান করেন তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা কোন পরিবারে হইলে, সে পরিবার আর্থিক ক্ষতি-গ্রস্ত হইবেন না। ইহাতে ছাত্রও নিজের সম্বন্ধে কতকটা সুবিধা পাইবেন, গৃহস্থও আপনার আপদ বিপদে একজন সহায় পাইবেন। এরূপ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগতেও আছে। বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রগণ পরিবারে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন, বিভিন্ন দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় হয়, সভ্যতা পদ্ধতি জানা যায়। তবে একটা কথা এই তাঁহারা যে ঘর ভাড়া নিয়া থাকেন সেটা ব্যবসার খাতিরে। আমাদের দেশে সেটা যেন ঠিক অন্যতম বিলাতি নকল হইয়া দাঁড়াইবে এবং ভারতীয় পরিবারগুলি এক একটা টাকার বাজারে পরিণত হইবে। মোটের উপর সে ভাব হজম হইবে না। এখন দরিদ্র ছাত্রদের ব্যবস্থা কি হইবে? উহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয়। 'গরীবের কপাল চিরদিনই পোড়া' একথা সকলেই জানে। সুতরাং তাহারা যদি বিদ্যা শিক্ষা করিতে না পাইল তাহা হইলে ধনীর অর্থের সদ্ব্যবহার কোথায়? এদেশের গৌরব কোথায়?

অবশ্য কোন কোন ব্যক্তি দরিদ্র ছাত্রের অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই পদ্ধতিটা দেশময় প্রচারিত হইলে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইবে। আয়ের দিক দিয়া ভারতীয় কোন মধ্যবিত্ত পরিবারই সচ্ছল নহেন। প্রত্যেক পরিবারে আপনাদের প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যেটা বাঁচে বা বিলাসিতার জন্য ব্যয়িত হয় সেটা সমাজের প্রাপ্য। টোল, মকতব, চতুষ্পাঠীর প্রাপ্য উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং সমাজের দাবী আর নাই। যে দেশ দীন, অনাহারে যাহার তনুক্ষীণ, জীর্ণশীর্ণ যাহার অনবরত স্পন্দিত, সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে ব্যয়ই তাহার অর্থনীতি পাঠের ফল। সেই দেশে বিলাসিতা উপহাসের বস্তু, যাহে ব্যয় তাহার অনুপযুক্ত জীবনের পরিচয় দেয়—কর্ম্মক্ষেত্রে সমাদরের কালে। "ঘরে যার খেতে নাই তার শুতে রাজা পাটা"র কি প্রয়োজন। যদি কখনও সৃষ্টিকর্ত্তার চক্রে আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের পালা আসে, আমাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পথে দাঁড়ায় তাহা হইলে তখন ভোগটা শোভনীয় হইবে। ক্ষমতাবান ভোগ করিবে ইহা সৃষ্টিকর্ত্তারই অভিপ্রেত। ভোগ্য বস্তু ক্ষমতাবানের ভোগের জন্যই অপেক্ষা করে। অতএব আপাততঃ ওরূপ ভোগ বিলাসিতার নামান্তর। উহার দিকে দৃষ্টি দিলে হিন্দুসমাজ বিনাশের গর্ত্তে পতিত হইবে। এখন বাজে খরচের সময় তাহার নাই। বাজে খরচ বন্ধ করিয়া সেই অর্থে যাহাতে কোন রকম সদনুষ্ঠান হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা প্রত্যেক পরিবারের এখন কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি, হিন্দু পরিবার দরিদ্র ছাত্রের অবস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়া একটা সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করুন। তাঁহাদের এই সচ্চেষ্টার অভাবে দরিদ্রের শুষ্ক প্রাণের, অকৃত্রিম ভালবাসা প্রভৃতি গুণ যেন চাপা পড়িয়া না যায়, তাহার প্রাণটা যেন অন্নদাতার উপকারে ভরপুর থাকিয়া সমাজে আদর্শের সৃষ্টি করে।

অন্নদাতাকেও মনে রাখিতে হইবে আমার

পরিবারের লোক, অন্নগ্রহীতাকেও মনে রাখিতে হইবে, আমার নিজের পরিবার। তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকিবে না।

সহরে বাবুগিরি ছুটিয়া গিয়া অনেকগুলি সন্তানের বিকাশ হইবে। অনেক স্থানে ছাত্রগণ নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাতে করিতে লজ্জা বোধ করে। সে সব দূরে গিয়া নিজের অবস্থার সমতা সাধিত হইবে। ভবিষ্যতে ছাত্রসম্প্রদায় খাওয়া দাওয়া চলা-ফেরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা প্রকারে অসুবিধা বোধ করিবে। তাহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা যদি মানসিক সুবিধা লাভের প্রতি-কূল হয় তাহা হইলে এ জাতি নীচ মাথা তুলিতে পারিবে না। নানা প্রকার ব্যাধি লুক্কায়িত থাকিয়া ছাত্র-জীবনে ধ্বংসের কারণ হইয়া তাহাদের পিতা মাতার দুর্দ্দশা বাড়াইতেছে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা-পন্ন ছাত্রদিগের জন্য ছাত্রাবাস সুবিধাজনক হইতে পারে কিন্তু যাহারা খাটিয়া খাইবে মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া যাহাদের পরিশ্রমের নিদর্শন দিবে মোট কথা যাহারা আপনার চিন্তা করিতে করিতে পরের জন্যও এক আধটুকু করিতে ইচ্ছা রাখে তাহাদের ভবি-ষ্যৎ প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই মঙ্গল সাধিত হইবে।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি ইহা একদিন প্রকৃত ভাবে কার্য্যে পরিণত হইবেই। অজ্ঞান দ্বারা শিক্ষার উৎসাহদান কিছু কাল এক রকম বন্ধ আছে কিন্তু একবার আরম্ভ হইলে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আমাদের আপনার হইতে আপনার হইয়া পড়িবে। আপনার পরিবার হিন্দু সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপনার মা বাপ ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা প্রত্যে-কেরই প্রাপ্য। কিন্তু হিন্দুর স্নেহ ভালবাসা অত্ত সূত্র-ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া গেলে হৃদয়টা প্রকৃত প্রশস্ততা লাভ করিবে কি?

* *
*

৮। উড়িষ্যার সাহিত্য সাধনার পন্থা

ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের মধ্যে উড়িষ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান, ধন যাহার একটা কিছুর অভাবে দারিদ্র্যের সূচনা করে, উড়িষ্যা সেগুলিদ্বারা জর্জ্জরিত। উড়িষ্যা এতদিন বাঙ্গালার সঙ্গে ছিল তাই তাহার সত্তা উপলব্ধির কোন প্রয়োজন হয় নাই। উড়িষ্যা ভাবিতেও পারে নাই, তাহার অস্তিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ কোন দিন উপস্থিত হইবে। ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের কোন কিছুই যে তাঁহার কাছে হেয় নয় ইহাই বুঝা যাইতেছে। উড়িষ্যা নিজের কোন খোঁজ না রাখুক, নিজের ভাতভাইয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর না থাকুক কিন্তু যাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই খোঁজ রাখিতে হয় তিনি কখনও দূরে থাকিতে পারেন কি? তাই সুপ্ত উড়িষ্যার আজ জাগরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার লুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবানের নিকট হইতে তাহার উত্থানের আদেশ আসিয়াছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িষ্যার অতীত হীন নহে, উড়িষ্যার অতীত বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন। ভারতের তৃণ অবধি অতীতের স্মৃতি লইয়া জীবিত, উড়িষ্যা ত দূরের কথা। নিজের যাহা কিছু কুৎসিত হউক না কেন তাহা অন্যের রুচিকর না হইতে পারে তাহাতে ক্ষতি কি? কুৎসিতকে সুশ্রী করিতে

হইলে, অন্যের চেয়ে হীন, দীন এই কথা যদি মনে থাকে, তাহা হইলে হীনতার পঙ্কে না ডুবিয়া, উঠিতে হইবে। নব্য উড়িষ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অতীত উড়িষ্যার আশ্রয় লইতে হইবেই। এইবার উড়িষ্যার ইতিহাসের নূতন অধ্যায় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাহিত্য-সমিতি গঠনের প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় জীবনে ক্ষতিস্তম্ভ অসম্ভব। জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত কিরূপ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজন তাহা উড়িষ্যার কর্ম্মী পুরুষদিগকে বলা বাহুল্য। কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গলাদেশ নানাদিকে উন্নত হইতে পারে কিন্তু তাহার মজ্জায় মজ্জায় যে গোয়েন্দাকাহিনী ও কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসের মোহ জড়িত রহিয়াছে তাহা যেন উড়িষ্যার অনুকরণীয় না হয়! গোয়েন্দা-কাহিনী পাঠ করিয়া জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দাগণ প্রাধান্য লাভ করেন নাই; কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিয়া বঙ্গীয় যুবক-সমাজের গতি কি আকার ধারণ করিতেছিল তাহা আজ বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রচারের যুগে ঠিক ধারণায় না ও আসিতে পারে। নব্য উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ সংসার গঠনের জন্য আদর্শ চরিত্র, প্রয়োজনীয় বিষয় এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ের অবতারণা করার প্রয়োজন। উপন্যাসদ্বারা সাহিত্য উন্নত হয় কিন্তু সুরুচির পরিবর্ত্তে বাঙ্গলাদেশের ঘটতলার অনুকরণ না করাই শ্রেয়ঃ। উড়িষ্যার চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা শীঘ্রই দেখিতে চাই উড়িষ্যার সাহিত্যে কাঠিন্য বর্ণের আহ্বান করা হইয়াছে। নব্য উড়িষ্যার শিক্ষার্থিগণ সাহিত্যে আর পেছনে না থাকিয়া যাহাতে উৎকলসাহিত্য প্রচারিত হয় তাহার দিকে নজর দিন। উড়িষ্যাকে নানাভাবে গড়িবার এই প্রকৃষ্ট সময়।

উড়িষ্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, অনধ্যায়ী বংশের, দরিদ্রের সন্তানগণকে ডাকিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-সম্মিলনী, বিচার-সভা, নৈতিক শিক্ষাদান সমিতি গঠিত হউক। এইগুলিই বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে সঞ্জীবিত ও কর্ম্মপ্রবণ করে। ছাত্রদিগের চরিত্রে যাহাতে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া হিন্দুত্বের মনুষ্যত্বের বিকাশ করে তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। যে কোন শিক্ষাপ্রণালী ধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইলে প্রতিপদেই নিরাশা, অশ্রদ্ধা, অঙ্কুরে ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া নিজের জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবে এবং সমগ্র উড়িষ্যা সমাজ তাহার কর্ম্মের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ধ্বংসের অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেরী করিবে না।

যাহা হউক আমরা চাই উড়িষ্যার সর্ব্বত্র সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হউক। আপাততঃ সাহিত্য-সম্মিলনের সৃষ্টি করিয়া অর্থব্যয় করা অপেক্ষা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের সম্মিলনে সাহিত্য-সেবাই অধিক প্রয়োজনীয়। প্রতি তীর্থে ও দেবমন্দিরে, সরোবরের কূলে কূলে, গ্রাম ও নগরবাসিগণের প্রতি মহল্লায় এবং সমুদ্রের উপকূলে সর্ব্বত্র এই সাহিত্য-সাধনার কথা প্রচারিত হউক, প্রত্যেকের সাধনা হউক—ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম, বঙ্গীয় সাহিত্যের অংশী, আমাদের মাতৃ-ভাষাকে গাঁড় করাইতেই হইবে।

উড়িষ্যার এই সাহিত্য প্রচারে যে প্রতিবন্ধক না আছে এমন নহে। উড়িষ্যার অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই জমিদারদিগের

দ্বারা পীড়িত। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা উড়িষ্যায় আসর খুব বেশী জমে নাই সুতরাং দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের দ্বারা প্রচার কার্য্য চলিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে অর্থের প্রয়োজন সেইখানেই বাধা পড়িবে। সুতরাং আমরা বলিতে চাই উড়িষ্যার জমিদার ও রাজাগণ উড়িষ্যার মূর্খতা দোষ দূর করিয়া প্রাচীন রাজগণের গৌরবের ভূমিকা আশ্রয় করুন। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের যুগে উড়িষ্যার লুপ্ত শিল্প তাঁহাদের উৎসাহে ও সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত হউক। অন্ততঃ ভারতের একটি প্রদেশ পূর্ণ অঙ্গ থাকিলে তাঁহাদেরই কলঙ্কের সূচনা করিবে। সাহিত্য সমাজে উড়িষ্যার স্থান হইবে না। ধনীর ধন ও দরিদ্রের সাধনা একত্রিত হইয়া নব্য ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন উড়িষ্যা বরণীয় ও মহনীয় হউক।

* *
*

৯। ব্রাহ্মণ-সমাজের কর্ত্তব্য

চারিদিকের লোকই ব্রাহ্মণ-সমাজকে আহ্বান করিতেছে। ব্রাহ্মণ-সমাজ যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন তাহা নিশ্চয়, নতুবা এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির প্রয়োজন ছিল না, ব্রাহ্মণ-সমাজ আজ সভা সমিতির আয়োজন করিতেন না।

তর্জ্জনী হেলিত কাহার? ব্রাহ্মণের। যিনি জ্ঞানে প্রবীন, শোকে ধীর, অত্যাচারে বজ্রহস্ত, দুঃখে সান্ত্বনাদানকারী, কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অচল, যুবকের ন্যায় কর্ম্মকুশল, প্রৌঢ়ের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বৃদ্ধের ন্যায় স্থিরমস্তিষ্ক তিনিই ত ব্রাহ্মণ! ঐগুলি যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় হীন ছিলেন না। তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তস্রোত যেখানে বা যাঁহাদের মধ্যে প্রবাহিত তাঁহারাও লাভ করিতে পারেন। যাহা ছিল, যাহার সন্ধান পাওয়া যায় তাহাকে আয়ত্ত করিতে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

মাসিক 'ব্রাহ্মণসমাজে' ব্রাহ্মণ জাতির অভ্যুত্থানের সাড়া যেন পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা জানিতে চাই ব্রাহ্মণ সমাজ আপনাদের অভ্যুত্থানের জন্য কোন্ কোন্ উপায় গ্রহণ করিলেন। আমূল পরিবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ-সমাজের দ্রুত উন্নতির জন্য তাঁহারা কোন্ পথ ধরিতেছেন? একজন ব্রাহ্মণকে দাঁড়াইতে দেখিলেই বুঝিব ব্রাহ্মণের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমাজ গতি চালিত করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

যে শক্তির বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, যে শক্তিতে তিনি অমিততেজা, যে ক্ষমতায় তিনি ধরণীর রাজাধিরাজগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন সেই শক্তি আর কত দূরে! সেই শক্তি লাভ ত দূরের কথা সেই পথের পথিক হইতেই যে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন—তাহার দিকেই বা কয়জন অগ্রসর?

ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহার দরিদ্র নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিধি গ্রহণ করিলেন? অশিক্ষিত বা অবজ্ঞাত হইতে থাকিলে তাহারা একটা নূতন সম্প্রদায় হইয়া পড়িবে।

ব্রাহ্মণ সমাজ সমাজবিধির পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহাদের দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। যেন, পঠির উচ্ছেদ—এত সামান্য কথা। যে সম্প্রদায় এইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন তাঁহাদের ভাবের চেউ আর বেশীদূর গড়াইবে না কি? আমাদের মনে হয় যাহারা আজও সমাজের ভাবনার মধ্যে আসে নাই তাহাদের উত্থান

ব্যতীত এ সকল চিন্তাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত হইবে না। সম্প্রতি এই চিন্তাগুলি যাঁহাদের দ্বারা প্রসূত তাঁহারা শুধু নাড়াচাড়া করিবার অধিকার ব্যতীত আর নূতনত্ব কিছুই দেখাইতে পারিতেছেন না, কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে শক্তিতে আমরা শক্তিমান সে শক্তিতে আর কুলায় না। এটা অক্ষমতার কথা বটে কিন্তু আজকার মত দিনে লজ্জার কথা নয়। আজ চেষ্টার যুগ। প্রকৃত কর্ম্মের টান পড়িয়াছে কিন্তু কর্ম্মীর অনুষ্ঠানের সময় এখনও যেন হয় নাই। এ তরঙ্গ যেখানে যাইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িবে সে স্থানে আজও ঢেউ পৌঁছে নাই।

সমাজের বিভিন্ন অংশ যতই কেন উন্নতিমুখী হউক না কেন ব্রাহ্মণ-সমাজের উন্নতির উপরই যে তাহাদের কর্ম্মপ্রণালী কতকটা নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রাহ্মণ সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপথ অতি জটিল। সমস্ত সমাজটাকে নিঃস্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা চালনা করিতে হইবে। একদিন ছিল যেদিন দেশবাসী জ্ঞানপিপাসু হইয়া ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিত, জ্ঞানলাভ করিয়া ধর্ম্মপথের জন্য প্রস্তুত হইত আজ আর সেই দিন নাই। আজ বিভিন্ন ধর্ম্মের মতবাদ তাহাদিগকে তরলীকৃত করিয়া দিতেছে। আজ ব্রাহ্মণের বলিলে চলিবে না, যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মগ্রাহী তাহারা ছুটিয়া আসিবেই। খৃষ্টিয়ান মিশনারীর মত ব্রাহ্মণ কোনদিন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, আজও ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার কাজ নয়। ধর্ম্মদান উদ্দেশ্য।

আজ দেশবাসী ধর্ম্ম চায় কিন্তু দেয় কে? কালের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণকেও তাঁহার পথ ঘুরাইতে হইবে। যে, ধর্ম্ম চাহিবে না তাহাকে বুঝাইতে হইবে, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে। বৈতালিকের ন্যায় রজনী শেষে তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাইতে হইবে। তবে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন তখনই যদি লোক আবার ঘর ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের কুটীরে আসে। চিরদিন একভাবে যায় না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণগণ কি ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কি ভাবে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী লোকের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন তাহারও একটা ইতিহাস দেখা দরকার।

দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইতে, ধর্ম্মের জন্য আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এমন কি সর্ব্বস্ব দান করিতে যেন দেশবাসী কুণ্ঠিত না হয়; ব্রাহ্মণকে তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। এই দেশে যাহার জন্ম এই দেশের কীর্ত্তি, এই দেশের প্রতিভা যাহার গৌরবের বস্তু এই দেশের জলবায়ুতে যাহার পুষ্টি এই দেশের ফল জল যাহার জীবন মরণের সহায় সেই দেশের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া দেশবাসীকে ধর্ম্মপথে আহ্বান চিরদিন করিয়াছেন, আজও করিবেন। ধর্ম্মদানে কালাকাল নাই যাত্রা তাঁহার ক্ষেত্র বুঝিয়া চলিবেন।

১০। আমাদের অবস্থা

আমাদের দেশের লোক অনাহারে মরে কেন, রোগে ভুগে কেন, জল বিনা হাহাকার করে কেন তাহার কথা কেহ কখনও ভাবিয়াছেন মনে হয় না। জানিনা, তাহারা পিতাপিতামহের অতিথি সেবা, বর্ত্মের ধারে ধারে জলসত্র প্রতিষ্ঠা এবং রোগে শোকে

উপহাস বা অনাদর করিয়াই আজ ব্যথিত, অভুক্ত হইয়া দিন কাটাইতেছে কি ?

আজও যাহার ঘরে অতিথির অশ্রদ্ধা হয় না, কোন দিনই যাহারা আর্ত্তকে শরণ দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই আপনার জীবনকে মুঠোর মধ্যে রাখিয়া, নিজের আহার্য্য অপরকে দান করিয়াছে অতিথি যাহার কাছে দেবতা, আজও যাহারা স্থানে স্থানে জলসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বংশগত দেশ প্রচলিত রীতির অনুষ্ঠান করিতেছে, বিলাতী ঔষধের প্রচলন হইলেও গৃহকর্ত্রীগণ জড়ি বড়ি লইয়া হাজির থাকেন তাহাদের দেশের লোক আজ এ অবস্থায় কেন ?

সময়ের পরিবর্ত্তন বড় ভয়ানক। ভারতীয় শিল্পরাজির ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমহ্রাসের ফলেই যে আজ দেশ নগ্ন এবং উন্মাদগ্রস্ত তাহা যে কোন লোকেই বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের ভীষণ-মূর্ত্তি যখন সম্মুখে দাঁড়ায়, অনাহারে যখন হস্তপদ দুর্ব্বল হইয়া হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রায় স্থগিত করিতে থাকে তখন কাহার না মনে হয় এ অদৃষ্টের দোষ নহে ?

বাগ্দেবীর অভিশপ্ত আশীর্ব্বাদের ফলে তাঁহার সেবকগণ যে ভাবে দিন কাটাইয়া যান এই হতভাগা দেশবাসিগণ তাঁহাদের পথের পথিক হইবার মতও শক্তিলাভ করিতে পারে নাই, হয়ত তাহা অঙ্কুরিত হইতেই পারিল না, আবার যাহাদের শক্তির স্ফুরণ হইতেছিল তাহারাও বিকাশ পাইল না। তাই আজ আর ভাটিয়ালগান নূতন কণ্ঠ হইতে বাহির হয় না, গ্রাম্য মাঝি নদী-বক্ষে নৌকারোহণে আপনার চিত্তকে শান্ত করিবার মত নূতন উপাদান কিছুই পায় না। সায়ংকালের পল্লীবৈঠকে নূতন ধরণের বাউল সঙ্গীত রচিত হইয়া গায়কের কৃতিত্ব এবং শ্রোতাদের কর্ণক্লান্ত মনকে বিমোহিত করে না। আজও যাহা হইতেছে, যাহা হইল, তাহা আর বেশী দিন টিকিবে না। আমাদের প্রতিবেশী গায়ক, বাদক, কবি বিভিন্ন গৃহকর্ম্মে পটু গৃহস্থগণ আর বেশী দিন সাহিত্য জগতে দাঁড়াইতে পারিবে না। হাহাকার ও অশ্রুবিসর্জ্জনই শেষ পরিণতি হইবে।

চীনা কবিদের প্রকৃতি-নিষ্ঠা *

এই পর্য্যন্ত প্রায় হাজার লাইন চীনা কবিতা দেখা গেল। নানা রসেরই আস্বাদন করা গিয়াছে। সকল রসেই প্রকৃতি কিছু না কিছু ভিজান পাইলাম। চীনা কাব্য চাখা সুরু করিতে না করিতেই প্রকৃতির গন্ধ পাওয়া যায়। চীনারা প্রকৃতি-নিষ্ঠ জাতি।

কালে ভোলে অবলে-দুখে সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন। চীনারা সেইরূপ শয়নে স্বপনে নিশিজাগরণে প্রকৃতির চর্চ্চা করিয়া থাকে। প্রকৃতির অংশ বাদ দিলে বোধ হয় চীনা কবিতার বার আনা বাদ পড়িবে। শোক সাহিত্যে প্রকৃতি পাইয়াছি—হর্ষ সাহিত্যেও প্রকৃতি পাইয়াছি। খেয়ালে খোসগল্পে প্রকৃতি পাইয়াছি—বনবাসে নির্ব্বাসনে প্রকৃতি পাইয়াছি—যুদ্ধ যাত্রায় প্রকৃতি পাইয়াছি—বিরহে প্রকৃতি পাইয়াছি—মিলনে প্রকৃতি পাইয়াছি। চীনের সকাল দেখিয়াছি—মধ্যাহ্ন দেখিয়াছি, সন্ধ্যা দেখিয়াছি, নিশীথ দেখিয়াছি। চীনের শরৎ দেখিয়াছি, বসন্ত দেখিয়াছি, গ্রীষ্ম দেখিয়াছি, শীত দেখিয়াছি, আর বৃষ্টিপাতও দেখিয়াছি। চীনের নদীর ধার চোখে পড়িয়াছে, শ্যাত শ্যাতে জঙ্গলা বনভূমি চোখে পড়িয়াছে, বিকট মরু প্রান্তর চোখে পড়িয়াছে, বাগবাগিচা চোখে পড়িয়াছে। চীনা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র রবি শশী চোখে পড়িয়াছে—চীনা ঘরাতলের মাছি মশাও চোখে পড়িয়াছে।

চীনা কাব্যে ফাল্গুনের আগে পাগল করা আমের বন পাই নাই। পাইয়াছি পীচ্ পেয়ারের ফুলের খোসবুই। ক্রৌঞ্চ-মিথুন, অথবা চক্রবাকযুগল অথবা চকোর চকোরী চোখে পড়ে নাই। পড়িয়াছে ম্যাণ্ডারিণ হংস ও ম্যাণ্ডারিণ হংসী। তমালপাশে কনকলতা চীনে দেখা গেল না। দেখা গেল শাখায় শাখায় জড়াজড়িওয়ালা এক বিচিত্র তরুবর। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে আর চীনের প্রকৃতিতে বোধ হয় এইটুকুই প্রভেদ। খুঁজিলে অবশ্য আরও অনেকই পাওয়া যাইবে। কেন না চীনের আয়তন সুবৃহৎ। কাজেই চীনা কাব্যে অনেক নূতন জঙ্গলতা জীবজন্তুর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য যাহা কিছু সবই আমাদের যেন ঘরের কথা।

চীনা কবি জোনাকির মিটি মিটি আলো দেখাইয়াছেন—মাছরাঙার উড়া দেখাইয়াছেন—আকাশের গায়ে হাঁসের ঝাঁক দেখাইয়াছেন। চীনা গ্রীষ্মের সারস ও "গাল," চীনা শরতের পদ্ম ও কুমুদ, চীনা আকাশের ছায়াপথ, চীনা সূর্য্যাস্তের সোনালী আভা, চীনা জলাশয়ে গিরিশৃঙ্গের প্রতিবিম্ব, চীনা চাঁদের রজতকিরণ, চীনা বর্ষার ঝম ঝম, চীনা নিশীথের পেঁচার ডাক, চীনা মরুর ভীষণ পবন, চীনা মেঘের কালো বরণ, চীনা জলাশয়ে নলের বন, চীনা সাঁঝের খগ কাকলী, চীনা তরিতায় নৌকার সারি, চীনা শস্যের মধুর হাসি—সবই দু একবার পাইয়াছি। আর এই সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। পাহাড়ের সবুজ রং, নীল রং, ভীষণ দৃশ্য

* "হিমালয়ের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

কমনীয় দৃশ্য, জলাশয়ের ভীমমূর্ত্তি, মধুর রূপ, আর চাঁদের বাহার—এ গুলিও আমাদের নূতন নয়।

চীনা হৃদয়ে প্রকৃতির কোন্ কোন্ বস্তু সব চেয়ে বেশী আদরের? প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু চিত্রশিল্পের বহু নমুনা দেখিয়া আর কাব্যের প্রমাণ লইয়া মনে হয় যে, বাঁশের সারি অথবা ঝোপ, চীনাদের অতি প্রিয়। পাহাড়ের শোভা নানা ভাবে ইহারা উপলব্ধি করিয়াছে। ঘরিয়ার দৃশ্য যেন চীনা পারিবারিক চিত্রের একটা আট পৌরে জিনিস। হংস-মিথুন চীনা দাম্পত্য জীবনের পরম পবিত্র বস্তু বলাই বাহুল্য। এমন কি বিবাহের সময়েও বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ এক জোড়া হংস হংসী অদল বদল করিয়া থাকে। মেপ্‌লপাতার লালপাতার কথা বোধ হয় ইহারা বেশী পাড়ে না—কিন্তু পীচের গন্ধ শুঁকিতে ইহারা যেরূপ নাই লালায়িত। আর মাছধরা এবং শিকার করার শখ চীনা জীবনের একটা মস্ত খেয়াল।

"আম জাম নারিকেল খেজুর কাঁঠাল, চাঁপা শেফালিকা বক তমালের ঝাড় সারি সারি আছে বন করিয়া আঁধার।" ইত্যাদির ক্যাটালগ করিয়া গেলেই প্রকৃতিনিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য এই ক্যাটালগেরও মূল্য আছে। কাব্যের কোন কোন স্থানে এইরূপ এক ক্যাটালগের মূল্য লাখ টাকা। কিন্তু চীনা কবিরা জীবন্ত ও তরুলতার নাম বা তালিকা করিয়াই সন্তুষ্ট নন। ইহাঁরা এই গুলির রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে "চাখিয়া" দেখিয়াছেন। ইহাঁদের দেখিবার ক্ষমতা আছে—এক একটা বস্তুকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে—নিজের জীবন মাখাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে জীবন্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। চীনা কাব্যের ভিতর আসিয়া নদ নদী পর্ব্বত সাগর তরুলতা পশু পক্ষী আমাদের মানব সংসারেরই অধিবাসী হইয়া রহিয়াছে। এক একটা মানুষ জগতে তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইয়া বর্ত্তমান। একবার যাহাকে দেখিব তাহাকে ভুলিতে পারিব না। প্রত্যেক নরনারীরই একটা বিশেষত্ব নিজস্ব কিছু না কিছু আছে। আমরা চীনা কাব্যের প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকেও ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিত্বময় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নিজস্বভরা ভাবে পাইতেছি। এক জলাশয়ে আমার আত্মা যাহা পাইল অন্য জলাশয়ে তাহা পাইল না। এক সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল অন্য সন্ধ্যায় সে তরঙ্গ উঠিল না। চীনা কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মাখাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্র দেখিতেছি। কোন সময়ে চাঁদ আমার এক গেলাসের ইয়ার—কোন সময়ে চাঁদ দেখিবা মাত্র দেশের কথা মনে পড়ে। নিশীথে কোথাও বা, খানা পীনা ভোজ, কোথাও "দুখিনীর আঁখিতে বরষা দ্রবে।" ফড়িং দেখিয়া একবার মনে হইল "আহা কি মজার জীবন!" আর একবার মনে হইল "ক দিনের প্রাণ?" একটা ফুল রাখিয়া দিলাম অসংখ্যবার "ছাড়াছাড়ির" বেদনা মনে করিবার জন্য। ফুলটা অমর হইয়া রহিল। আর একটা ফুল ইয়াংসিকিয়াঙে ভাসিয়া কতদূর যাইতেছে কে জানে? অমনি ভাবিলাম "দুনিয়ার চরম সত্য কখনও বুঝা যাইবে কি?" কাকের পাখা চোখে পড়ে সুন্দরীর চুল তার চেয়েও কালো সপ্রমাণ করিবার জন্য। আর পাখীর সন্ধ্যাকালে বাসায় ফেরা দেখে মনে হয় "হায় আমি একাকিনী।"

পল্লবীজের লাল কেশর দেখিতেছি কেন? ওটা আমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই ফুটিয়া বলিয়া। বাদলকে দূত করিতেছি—মেঘকে দূত করিতেছি—হংসীকে দূত করিতেছি। ইহারা সকলেই বিরহের সহচর। গগনমণ্ডলে দেখিতেছি হয় গান বাজনার সঙ্গত না হয় প্রেমিক-যুগলের আড্ডা। সহরের বাহিরে আসিবামাত্র নিম্ন শরীরে মুক্ত বায়ুর প্রভাব বুঝিতেছি—মাঝিরা সারি গান ধরিতেছে। চীনা প্রকৃতি-সাহিত্যে কবিদের চামড়ার চোখ্ কানও দেখা গেল—আমার "মরম", হৃদয়, প্রাণ এবং ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা সেই আত্মাও পাওয়া গেল। অতএব চীনা কবিরা দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির সভায় বিনা বাক্যব্যয়ে কুলীনের প্রাপ্য পান সুপারি যাচি করিতে পারেন।

এতক্ষণ যে সকল কবিতা দেখিয়াছি সেগুলি পুরাতন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরের কোন নিদর্শন পাই নাই। এক্ষণে একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটা লিখিত। চীনে সরকারী চাকরী পাইতে হইলে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া পার হইতে হয়। ছাত্রেরা কবিতা রচনায়ও পাশ হইতে যায়। এই কবিতাটা একজন কৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীর রচনা। কবিতার নাম "ছাত্রের পর্য্যটন।" ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের "নাটিং" কবিতায় যে ভাব ইহারও তাই। বস্তুতঃ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের প্রকৃতি-"পূজা" এই চীনা কবির প্রকৃতি-পূজা হইতে গভীরতর নয়। চীনা কবিতাকে প্রকৃতিপূজক মাত্রেই তাঁহাদের "ও" স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রকৃতিকে জীবন্ত সহচরী বিবেচনা করা, প্রকৃতির প্রভাবে জীবন গঠন করা, ইত্যাদি সকল তত্ত্বই এই রচনায় সংক্ষেপে পাইতেছি।

বাঁধা থাকতে পার্‌ল না আর
হস্তর খানায় কেতাব নিয়ে
নীল আকাশের মরকত ভুঁয়ে
চোখের চটক্ রঙবেরঙে
হৃদয় তাদের আকুল আজি
তাওার হ'তে প্রকৃতি মায়ের
ছাড়ল তারা পুথি পত্র,
বেরুল তারা ছটাপুটি কর্‌তে
ক্রোশের পর ক্রোশ চলে তারা
কোথাও কুল্‌কুল্ নদীর ধারে
কানে তাদের দরিয়ার গান,
পদ্মার পরে তারা বসে,
জমিন্ পরে পাহাড় বিরাট্,
দুনিয়ার এই চিড়িয়া খানায়
চলায়, বসায়, মরায়, বাঁচায়—
তারই ফলে সিজিল্ মিছিল্
দেখে শুনে ভেবে বুঝে
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌লো রক্ত
স্বর্গের কথা, মর্ত্ত্যের জিনিষ,—
এমনতর আপনার এসব
বিশ্বেশ্বরের পূজাকালেও
হ'লই বা সেউল শ্বেত পাথরের
নীল্-চাল্‌কান্-আঁটা ছাত্রের দল,
আর ছিপ্ হাতে নাড়্‌তে নদীর জল।
সাদা মেঘের মেষ বিচরে,
বসন্তের হাত ধরণী পরে।
চাখ্‌তে তারা নূতন জীবন,
আন্‌তে নব শক্তি রতন।

টোল মাস্ত্রাসার তকেরা ফরাস্ ;
পায় যেখানে সবুজ ঘাস।
বসে' কোথাও গাছের তলায়,
কোথা বা গিরির কোরার গায়।
নিঃশ্বাসেতে মধুর পবন—
ধরায়, ফুলে যাহার বহন।
উর্দ্ধে আশ্‌মানের অসীম ওসার ;
জ্যান্ত জীবের হরেক বাহার,
সবারই ভিতর শক্তি রাজে,
যেথায় নইলে গোলমাল্ বাজে !
চমক্ তাদের লাগ্‌ল প্রাণে ;
শিরায় শিরায় রক্তের টানে।
আজকে এরা হ'ল নিজের,
কখনো বুঝা হয়নি তাদের।
পাইনা মানুষ এমন জীবন,—
কিম্বা পল্লীর দেবায়তন !

প্রকৃতির সতেজ কোয়ারায় স্নান করিয়া ছাত্রেরা ঘরে ফিরিতেছে। এই পর্যটনের প্রভাব জীবনে থাকিয়া গেল। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই প্রভাবের চিত্র। "লুসী", "ড্যাফোডিল্‌স," "হাইল্যাণ্ড গার্ল", "সলিটারি রীপার", "এডুকেশন অব্ নেচার" ইত্যাদির নাম সুপরিচিত।

অবশেষে অনিচ্ছাতে
কিন্তু তারা ভুল্‌বে নাক
পথে পড়ল অনেক অনেক
আর স্রোতস্বতীর কূলে কূলে
অনেক কালের চাপা হ্রদয়
গলা ছেড়ে গাইল তারা
কখনো তারা গায় দল বেঁধে
তালে তালে আওয়াজ তাদের
শুনে তাদের গানের ধ্বনি
চাষা হয় চিড়িয়া সকল
ছোঁড়ার দলের গানের তালে
গেয়ে গেয়ে দিনকে বিদায়
কীট পতঙ্গ হিংস্র সবে
সবার গীতই পূর্ণ এবে
পশ্চিমেতে আস্তে আস্তে
অমরদিগের রাজ্য এবে
বেদিয়ান হ'তে প্রকৃতির
উঁচু খেয়াল আর নয়া রোশনাই

ফিরল তারা ঘরের দিকে ;
পূজ্‌তে প্রকৃতি দেবীকে।
লম্বা "সরল"-গাছের বন,
"উইলো" কত কালো বরণ।
এতক্ষণে খুল্‌ল দুয়ার ;
নামজাদা গান সব বারবার।
একা একা কখন বা গায়,
শীতের বাতাস বয়ে নে যায়।
গাঁ-পুকুরের দরিয়ার
ভেঙে গ্রীষ্মের তন্দ্রাভার।
গাওয়া সুরু করে চাষীর দল,
দেয় এইরূপে ধরাতল।
এরাও দেয় যোগ সন্ধ্যাগীতে ;
বিশ্বপতির জয় ধ্বনিতে।
রবি ডুবে যায় ধরায়,
ভেসে উঠ্‌ল আলোর বন্যায়।
খস্‌ল পুত গোলক ঘড়ির,
বাসিন্দা হ'ল ছাত্র হৃদির।

এই সুরের কবিতা ও গান চীনা সাহিত্যে প্রচুর। সুরটা নিতান্তই আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাবে এই সুর পাশ্চাত্য মহলে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই সুর ছিল না। সাবেক কালের প্রকৃতিসাহিত্যে এই রস পাওয়া যায় না। প্রকৃতিকে খোলাখুলি শিক্ষয়িত্রী ও প্রিয় সখী বিবেচনা করা বর্ত্তমান ইয়োরোপের পক্ষে নূতন বস্তু।

"দেখে শুনে ভেবে বুঝে চমক তাদের লাগল প্রাণে,
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌ল রক্ত শিরায় শিরায় বানের টানে।"

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ গানে প্রচার করা প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়ায় অসংখ্য হইয়াছে। ইহা এশিয়াবাসীর এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ও প্রথম স্বীকার্য্য তত্ত্ব।

রোমান্টিক সাহিত্যের প্রকৃতি জীবনময়ী। জীবনময়ী বলিয়া মানুষের মত প্রকৃতিরও সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে। আর এই জন্যই সে মানুষের সুখ দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে সমর্থ। এই জন্যই সে মানুষকে হাসাইতে নাচাইতে কাঁদাইতে পারে। এই জন্যই তাহার প্রভাবে মানুষ জীবন গঠন করিতে সমর্থ। এই সকল কথা আমাদের রামায়ণে গোটা কালিদাসী সাহিত্যে এবং মধ্যযুগের পদাবলীতে মুটী মুরকীর সমান মামুলি। বিলাতের ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ইয়োরোপে এই তত্ত্ব নূতন প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতিকে মানুষের জন্য ইস্কুল মাষ্টারেণী করিলে জীবনের বিকাশ কিরূপ হইবে তাহার নানা চিত্র ইনি দিয়াছেন। একটা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বালিকার খেলা হবে হরিণীর প্রায়;
শ্যামল প্রান্তরে অথবা পাহাড়ে
মাতিয়া আনন্দে যে হরিণী লাফায়।
তুফান উঠিলেও কাঁপাতে ধরার,
সুষমা দেখিবে বালা সে কাঁপায়?
কুমারীর অঙ্গ উঠিবে গড়িয়া
তুফানের সাথে তার নীরব ভালবাসায়।
হর্ষ শুধু প্রাণ-বাড়ান বাসায় হিয়ায়
থাকবে; তাতেই পুষ্ট হবে বাড়্‌তি-গরিমা;
কুমারীর বক্ষ ও স্ফীত হবে তায়।"

এই ধরণের কুমারী জীবন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক। চীনা "ছাত্রের পর্য্যটনে" ও এই আকাঙ্ক্ষাই পাইলাম।

"হৃদয় তাদের আকুল আজি চাখ্‌তে তাজা নূতন জীবন,
তাতার হ'তে প্রকৃতি মায়ের আন্‌তে নব শক্তি রতন।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

শ্রাদ্ধ ও স্মৃতি

মানবের আত্মায় আত্মায় একটা বন্ধন আছে। তাই পিতা মাতার সম্মুখে সন্তান-হৃদয় অকৃত্রিম ভক্তিতে স্বতঃই নত হয়ে যায়, সন্তানকে দেখ্‌লে পিতামাতার হৃদয় সন্তান-বাৎসল্যে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে, তাই ভাই ভগ্নিতে অতুল ভালবাসা, পতি-পত্নীতে সরল উদার পবিত্র গভীর প্রেম; তাই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হ'য়ে একে অন্যকে ভাল বাস্‌তে পারে, একের আনন্দে অন্য আনন্দিত হয়, একের শোকে অন্য মর্ম্মন্তুদ মানস যাতনা ভোগ করে, দুঃখার্ত্তের দুঃখ এবং বিপন্নের বিপদ নিবারণে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কর্‌তে পারে। কেবল মানুষের আত্মায় আত্মায় এই বাঁধন নয়, এই বাঁধন বিশ্বজীবের আত্মায়। তাই, বিদ্যাসাগরের প্রাণ বাছুরের কষ্ট দেখে কেঁদে উঠেছিল, তিনি অন্যের মত দুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। ইহার কারণ সমুদয় জীবজগৎ সেই বিরাট পুরুষ সচ্চিদা-

নন্দের প্রাণে প্রাণবান্, তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যশালী। সুতরাং বিশ্বজীবের আত্মিক যোগ অনিবার্য্য। মানবের প্রাথমিক বাষ্টি জ্ঞান সমুদয় জগতের জ্ঞানের ভিতর দিয়ে গিয়ে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর্‌বে বা পরমাত্মায় লীন হ'বে—এই হচ্ছে মানবের চিরন্তন সাধনা। এই আত্মিক যোগ ধারা থেকেই মানবের জ্ঞান বিকাশ আরম্ভ হয়। আত্মার যোগ রক্ষণের চেষ্টা যে করে, তাহারই মধ্যে এই বন্ধনটি সুদৃঢ় হ'য়ে যায় এবং জীবাত্মা ক্রমশঃ নিকট হ'তে নিকটতর হয়ে আসে; আর যাহারা যে বাঁধনকে দৃঢ় ক'রে তুলতে চায় না, তাহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ হ'য়ে উঠে এবং সেই পাষাণের নীচে, দয়ামায়া স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি—জীবাত্মার বন্ধনের বা সম্বন্ধের বিবিধ প্রকাশ নিদ্রিত অবস্থায় মাথা গুজে পড়ে থাকে সে ক্রমশঃ জীবজগৎ হ'তে পৃথক হয়ে পড়ে। তাই সাধু মহাত্মা দের প্রাণ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের (যাহারা আমাদের কাছে নগণ্য) দুঃখ দেখলেও আকুল স্বরে কেঁদে উঠে; আর আমরা সোদর ভাইয়ের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা বা অনশন কষ্ট দেখেও গভীর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারি, বড় জোর গভীর দুঃখ প্রকাশক একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের ত্যাগ করে থাকি। কারণ দয়া-মায়া-স্নেহ-ভক্তি-রূপ আত্মিক সম্বন্ধটা আমাদের হৃদয়ে সুপ্তাবস্থায় আছে বলেই ওর ডাক আমরা শুনতে পাই না।

জীবজগতে আমাদের লৌকিক সম্বন্ধগুলি যত কাছাকাছি হয়, আত্মার সম্বন্ধটাও আমাদের কাছে ততই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ অতীব সুস্পষ্ট, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তার চেয়ে আরও কম পরিস্ফুট, এবং যাহাদের সহিত আমাদের কোন, লৌকিক সম্বন্ধ নাই তাহাদের সহিত আরও কম পরিস্ফুট। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পিতা মাতার সহিতই আত্মিক যোগটা স্পষ্টতম এবং নিকটতম। কারণ—"আত্মাবৈ পুত্র নামাসি" "তদ্যথা আত্মা ভবতি যদস্মিন্ আয়তে পুনঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র পিতারই আরেক সংস্করণ। সেই জন্য পিতা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ, এবং পুত্রও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কত কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে থাকে। এ রকম আদান প্রদান করে উভয়েই পরস্পরের ইহলোকে ও পরলোকে জ্ঞান বিকাশে ও অন্যান্য মঙ্গলবিধানে সাহায্য করে। এবং সেই জন্যই বোধ হয় পরলোক-গত আত্মার স্মৃতিরক্ষা ও তৎপ্রতি সম্মান দেখানোর বিশেষ বিশেষ বিধিব্যবস্থা সভ্য, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সব সমাজেই আছে। অবশ্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুপাতে সেই বিধিব্যবস্থাগুলির আদর্শের তারতম্যও আছে এবং থাকিবে। সাধারণ ভাবে দেখলে এই স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারকেই হিন্দুশাস্ত্র শ্রাদ্ধ বলেছে। শ্রদ্ধার সহিত যাহা দেওয়া বা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদিগকে বা অন্যান্য গুরুজনদিগকে যাহা শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া যায় তাহা শ্রাদ্ধ নয়। তা হ'লে অনেক গ্রন্থকারই অশেষ ভক্তি ভাজন পূজ্যপাদ পিতৃতুল্য ব্যক্তিদিগের পবিত্র নামে ভক্তির চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে, এবং সোদরপ্রতিম বন্ধুবর-দিগকে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়ে তাহাদের শ্রাদ্ধ করে ফেলতেন। যদিও

বর্ত্তমানে এরূপ সাহিত্যিক শ্রাদ্ধের হৌরাত্ম্য চলেছে বটে, তবুও conservative বা রক্ষণশীল শাস্ত্রটা এ রকম উৎসর্গ ও উপহার দেওয়াটাকে শ্রাদ্ধ বল্‌তে চায় না। তা হলে আজ শ্রাদ্ধের ব্যয়ের কোঠায় একটা অখণ্ড মওদাকার অস্তিত্ব শোভা পেতো। অবশ্য অনেকের জীবিতকালেও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হয়ে যেত এই যা গণ্ডগোল। যা হোক শাস্ত্রিক শ্রাদ্ধের অর্থ হয়েছে প্রেতাত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ ও তদানুসঙ্গিক ব্যাপার।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও চিরন্তন সাধনা হয়েছে—সে যেখান থেকে এসেছে সেই শেষ স্থানে যাওয়া, বা দার্শনিক পরিভাষায় পরমাত্ম জ্ঞান লাভ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়া, অথবা জীব শিবে পরিণত হওয়া। তদুদ্দেশে মানুষ তাহার জীবনের প্রথম প্রভাতের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই জ্ঞানার্জ্জন করে আস্‌ছে। জ্ঞানার্জ্জনের একটা বিশেষ ধারা আছে। সুতরাং ইহাকে ক্রমবিকাশের ধারা বলা যেতে পারে। জীবের জ্ঞানার্জ্জন বা ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রথমতঃ তিন বৃহৎ পর্য্যায়ে বিভাগ করে, প্রত্যেকটিকে আবার সাত সাত অন্তর্পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অন্তর্পর্য্যায় গুলিকেই ভূর্ভুবস্ব প্রভৃতি লোক বলা হয়। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা স্থূল জগতের স্থূল শরীর পরিত্যাগ ক'রে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ সমন্বিত দেহধারণ করে সূক্ষ্ম জগতে চলে যায়। আমাদের এই স্থূল জগতের অন্নাদি ভোগ্য বস্তু তখন তাহাকে স্পর্শ করতেও পারে না। সহসা পার্থিব কর্ম্মধারা ছিন্ন হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পার্থিব জীবাত্মার ভক্তি শ্রদ্ধা ও তৃপ্তিই তখন তাহার নিরাশ্রয় নিরবলম্ব অবস্থায় তাহার কাছে পৌঁছয় এবং তাহার জ্ঞানবিকাশের সাহায্য করে থাকে। তাই শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ড শয্যা ছোড়্যাদি দান ও ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণচণ্ডাল সাধুসন্ন্যাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত ও চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয়াদি দ্বারা তৃপ্ত করে থাকে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার অকৃত্রিম ভক্তি ও ইহলৌকিক জীবাত্মার তৃপ্তিই পরলোকের আত্মাকে শান্তিদান ও জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করে। তাই হিন্দুরা বছর বছর পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে থাকে। এইরূপেই হিন্দুরা পরলোকে প্রেতাত্মার জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করেছে ও ইহলোকে তাহার স্মৃতিরক্ষা করেছে।

বর্ত্তমানে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান ক'রে প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর ও স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতেছে। মৃত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু তিথিতে স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান করার প্রথাটা বোধ হয় খাটি ইউরোপীয়। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা বিলাসিতা, ও আধিব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভিনব বস্তুটারও আমদানী হয়েছে। এ পদ্ধতিটি ভারতীয় সমাজের সহিত কতদূর খাপ খেয়েছে জানি না, তবে ইহারও একটা মূল্য আছে। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে, স্মৃতিসভাগুলি বুঝি কতগুলি নিষ্কর্ম্মা ও বাক্যবাগীশ লোকের সময়ক্ষেপের একটা বিশেষ উপায় মাত্র। অবশ্য কার্য্যকলাপ দেখেই ধারণাটা হয়েছিল। বছর বছর সকলে একত্র হয়ে মৃত ব্যক্তির কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ ও গুণাবলীর আলোচনা করে,

কখনো বা আপন মনগড়া সদসৎ অর্থ ক'রে নিজের বাগ্মিতার পরিচয় দেয় মাত্র। ইহাতে প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। একদিন স্মৃতি-সভাগুলি এ রকমই অনুষ্ঠিত হ'য়ে আস্‌ছিল। গত ১২ই শ্রাবণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সে ধারণা বদ্‌লে গিয়েছে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি যে স্মৃতিসভারও একটা সার্থকতা আছে। ইহার দ্বারাও material work এবং Spiritual gain দুই-ই হয়।

আমাদের অনেকের হৃদয়ই পাষাণময় ব'লে, কোন একটা উচ্চভাব বা মহনীয় আদর্শ স্থায়ী হ'তে পারে না; জোয়ারের জলের মত অমনি আসে আর অমনি চলে যায়। কিন্তু সেই উচ্চভাব বা আদর্শ পুনঃ পুনঃ হৃদয় সম্মুখে উপস্থিত হ'লে ক্রমে তাহা স্থায়ীত্ব লাভ কর্‌তে পারে না। স্মৃতিসভায় আলোচিত মৃত ব্যক্তির গুণাবলী—তাহার অসাধারণ প্রতিভা, মেধা, অসম সাহস ও অধ্যবসায়, কার্য্যক্ষমতা ও আত্মোৎসর্গ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজনানুরাগ, দয়ামায়া স্নেহ-প্রীতিভক্তি-বিশ্বাস ও সর্ব্বোপরি পূতচরিত্র—ইহার প্রত্যেকটি অন্ততঃ তখনকার জন্য আমাদের উপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করে বসে, তাহার জীবনাদর্শ আমাদের প্রাণে প্রাণে—একটা স্বর্গীয় প্রেরণা জাগিয়ে দেয়, একটা বিরাট্ মহত্ত্ব এসে আমাদের হৃদয়সিংহাসন দখল ক'রে তাহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশ জারী কর্‌তে আরম্ভ করে। তখন আমরা সেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে প্রত্যেকেই এক একজন বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ হ'য়ে যাই। এ বছর বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় তাই প্রত্যক্ষ অনুভব করা গিয়াছে। যেমনি বন্যা পূর্ব্ববঙ্গের অসংখ্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীকে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে উদ্ধারার্থ যথাশক্তি অর্থ ও বস্ত্র প্রার্থনা করেছিলেন, অমনি যেন দীনবন্ধু আর্ত্তসেবানিরত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের আত্মা দিব্য সিংহাসন থেকে নেমে দেহধারণ ক'রে উদাত্তস্বরে বলে উঠেছিল—তোমারই ভাই, তোমারই মায়ের মত শত শত প্রৌঢ়া, তোমারই ভগিনীর মত শত শত রমণী, তোমারই সন্তানের মত শত শত সন্তান মা বাপ ভাইয়ের চোখের সম্মুখে—হা অন্ন হা বস্ত্র বলে চিরতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে চলেছে, আর তুমি নেহাৎ উদাসীনের মত চেয়ে দেখবে? যে যাহা পার সাহায্য কর। হাত পেতে এসে দাঁড়ায় নাই, বিদ্যাসাগরের তেজোময় আত্মা যেন জোর করে এসে টাকাকড়ি, চাদর ঘড়ি নিয়ে গেল; আর সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে থাকল। সকলের প্রাণে তখন যে প্রেরণা আস্‌ছিল, তাহা নিজেই বোধ হয় কেহ জান্‌তে পারে নাই। তাহার আবরণে ধরে রাখার চেষ্টা বৃথা। কেহ কেহ হয়ত ইহাকে ঝোক্ বল্‌বেন; কিন্তু ইহা ঝোক্ হইলেও এ ঝোক্ স্বার্থপর হিংসা-দ্বেষময় জগতের নয়, এ ঝোক্ দিব্য, এ প্রেরণা দয়াময় প্রেমময় ভগবানের হৃদয় প্রকোষ্ঠে ঘুমোয়। এই যে পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা পীড়িত অঞ্চলেই অসংখ্য নরনারীর সেবা কর্‌তে রামকৃষ্ণমিশন প্রাণপাত চেষ্টা কর্‌ছে একেও ঝোক্ বল্‌বেন? বর্দ্ধমান জলপ্লাবনে যাহারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ ক'রে বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল একেও ঝোক্ বল্‌তে চান্? এই যে প্রতীচ্য জগতে—যেখানে ঈশ্বরের শত্রু রক্তপিপাসু লক্ষ লক্ষ সৈন্য একটা নেহাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বশে, একটা জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে এসে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিতেছে—

সেখানেও যাঁহারা আপনার নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ক্লিষ্ট আহত সৈন্যদের সেবা করতে গিয়েছে তাঁহারও কি (মারাত্মক) ঝোঁকের বশে গিয়েছে? এটা যদিও ঝোঁক্ হয়, তবুও এই ঝোঁকের বশ না মিলাতে মরতে পারলে অমর হওয়া যায়। মাঝে মাঝে এ রকম এক একটা দিব্য প্রেরণা এসেই মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে মানুষ এখনও দয়ামায়াহীন নিরেট পশু হয় নাই, মানুষ এখনও মানুষ। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শিখিয়ে দিতেছে যে স্বার্থ হিংসা দ্বেষের ভিতর দিয়েও মানব-প্রাণে প্রেমের অমৃত ধারা বহিতেছে; পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবন ও অন্নকষ্ট শিক্ষা দিতেছে যে জলের বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর প্রাণে পবিত্র মানব-প্রেমের বন্যাও এসেছে আর বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের আত্মাও তারই আগে আগে ভেসে চলেছে। তাই আমরা সেদিন বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় তাঁহার আত্মারও সাড়া পেয়েছিলাম। যাহারা পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসবে বেলুড়মঠে বা যোগোদ্যানে গিয়েছেন তাহারা জানেন যে স্মৃতিসভা বা স্মৃতি-উৎসবের অর্থ কি। যখন পঞ্চ সহস্রাধিক দীন দরিদ্র পীড়িত নরনারী আনন্দে কেহবা 'আলুর দম' 'কপির ডালনা' কেহবা 'দই' 'মোহনভোগ' চেয়ে নিয়ে সাধ মিটিয়ে খাচ্ছে, যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর স্বেচ্ছাসেবকেরা অবিরত পরিশ্রমেও কাতর না হয়ে সকলকে ভোজ্যাদি দিয়ে যায়, আর সেই হর্ষোৎফুল্ল চীৎকার ও সংকীর্ত্তন ধ্বনির মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক স্বামী সারদানন্দ ও তাঁহার সহযোগিগণ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া তখন মনে হয় না কি যে স্বয়ং নারায়ণই এই দীন দরিদ্র মূর্ত্তি ধরে আমাদের কাছে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত ভাগ্যবানই সেই দরিদ্র নারায়ণকে চিন্‌তে পারেন।

যেখানে শ্রাদ্ধ স্মৃতি-সভা বা স্মৃতি-উৎসবের এই উদ্দেশ্য থাকে এবং এই উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করতে পারে, সেখানেই ওগুলির সার্থকতা আছে, নতুবা লক্ষ টাকা ব্যয় কর্‌লেও পিতৃশ্রাদ্ধ হয় না, টাকার শ্রাদ্ধই হয়; আর গলাবাজি ক'রে "অগ্নিময়ী ভাষায়" সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেও তাহা বাতুলের প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান দেখানোও হয় না, সমাজেরও কোন উপকার হয় না। *

শ্রীশশিভূষণ পাল।

---

* গত ১২ই শ্রাবণ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে মেট্রোপলিটান কলেজে দরিদ্র বিদায় ও কাঙ্গালী ভোজন হয়েছিল। কয়েকজন অধ্যাপক এ বিষয়ে খুব তত্ত্বাবধান দিয়েছিলেন। বৈকালে তাঁহাদেরই উদ্যোগে অমৃতা রাম-মোহন লাইব্রেরী গৃহে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু সহরের দু'চার জন গণ্যমান্য লোক ছাড়া কাহাকেও সভায় দেখা যায় নাই (অবশ্য ইহারাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং অন্য জাতির কাছে বিদ্যাসাগরের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেন)। সভায় সভাবিক টাকা চাঁদা উঠেছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষ পীড়িত বস্ত্র নারীর সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণমিশনের হস্তে দেওয়া হয়েছে।

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(৮৯৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বাঙ্গালার পুণ্ড্রজাতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুণ্ড্রজাতির বিভিন্ন অঙ্গ

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ী পুণ্ড্র এবং বঙ্গজ পুণ্ড্র বর্ত্তমান বাঙ্গালী পুণ্ড্র মধ্যে গণ্য। বাঙ্গালার সকল জেলাতেই এই জাতি বিদ্যমান নাই। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে কোন কোন জেলায় পুণ্ড্রজাতির বাস আছে।

পুণ্ড্রজাতির বাসস্থান

"The Pundaries or Puro are found mainly in Birbhum, Malda, Rajshahi and Murshidabad."

(Census Report Page. 425, —Para 771)
A. D. 1901

পুণ্ডরী বা পুণ্ড্রোজাতি প্রধানতঃ বীরভূমি, মালদহ, রাজসাহী এবং মুরশীদাবাদ জেলায় বাস করে।

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, বগুড়া নবদ্বীপ ও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং ভূষণা গ্রামে পুণ্ড্রজাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা সংখ্যায় অতিশয় কম এবং নগণ্য। ভূষণা সমাজ মন্দ নহে। তত্রাচ এই জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

পুণ্ডরী বা পুণ্ড্রো (Puro) জাতির সহিত পোদ (পদ্ম) জাতির অভিন্নতা সম্পাদনের জন্য মিঃ গেট যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন।—"The name seems to indicate that they are in reality Pods, but by residence at a distance from the head quarter of the caste, they have gradually come to lose connection with it, and the Puro of Malda profess to know nothing of the Pods of the 24 Parganas, though they admit that they belong to the same caste as the Puros of Birbhum." (C. Rept. Page 425, Para 771—Pundari (Puro) A. D. 1901)

পুণ্ডরী বা পুণ্ড্রো নামের সহিত পোদ (পদ্ম) নামের সাদৃশ্য দর্শনে বলিতে চাহেন পুণ্ড্রারা প্রকৃত প্রস্তাবে পোদ জাতির এক শাখা মাত্র। কিন্তু মালদহবাসী পুণ্ড্রোরা চব্বিশ পরগণার 'পোদ'গণের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা বলিয়া থাকে। কিন্তু মালদহের পুণ্ডরিগণ বীরভূমের পুণ্ডরীদিগকে স্বজাতি বলিয়া অবগত আছে।

কুলতত্ত্বের বচনটি সেনসস্ রিপোর্টের মন্তব্যের আনুকূল্যই করিতেছে বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে—

"অসৌহি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ॥
ওড্র চ স্থান ভেদেষু ভিন্নাখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতে।
এতেষাক্ত যুক্তা যে যে তেঽপি তদ্দেশ
সংজ্ঞকাঃ।"
(কুলতত্ত্ব)

একই জাতির জনগণ, ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশগত সংজ্ঞা প্রাপ্তি বিচিত্র নহে।

উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও উৎকলী পুণ্ড্রগণ দেশ ভেদে জাতীয় আখ্যা লাভ করিয়াছে।

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ পুণ্ড্রগণ পুণ্ড্র বা পুণ্ডরী ও পুড়া নামে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও ওড্রবাসিগণ পুণ্ডরী বা পুড়া নামে খ্যাত নহে বর্ত্তমানে পদ্ম ও শাস্তপর নামে খ্যাত। পদ্ম শব্দ 'পদ্ম' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পুণ্ডরী বা পদ্ম হইতে পদ্ম হইয়াছে।

ওড্রদেশে 'শাস্তপর' এবং দক্ষিণ বঙ্গে পোদ বা পদ্মরাজ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গের পোদ ও শাস্তপর উড়িয়া ওড্র-পুণ্ড্র বলিয়া বিবেচনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' ও ওড্র-পুণ্ড্রগণই বর্ত্তমানে 'পদ্ম' জাতি।

ওড্র গত পুণ্ড্রগণের কোন পরিচয় রাঢ়বাসী পুণ্ড্রগণের অজ্ঞাত থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্বের কথা কুলতত্ত্বে ও সেনসস্ রিপোর্টেও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে পোদ ও শাস্তপর পোদ জাতির ক্রিয়ার দর্শনে ওড্র-পুণ্ড্রের অস্তিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত 'পদ্ম' জাতির সন্ধান বর্ত্তমানে অপ্রাপ্ত হইলেও পদ্ম যে পোদ তাহা সহজেই অনুমান করা চলিতে পারে। তাহারাও বাসুদেব পুণ্ড্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানে সমুৎসুক হইয়াছে। বাসুদেব দ্বাপর-যুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন, সেইজন্য জনপদের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব এবং বাসুদেবের পুত্র, পুণ্ড্রক বাসুদেব ও বসুদেবের পুত্র দুই বাসুদেবের পার্থক্য সম্পাদনের জন্য পুণ্ড্রক বাসুদেবকে 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' বলা হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৯০১ সালের আদম সুমারির সময়ে প্রত্যেক জাতি স্বীয় স্বীয় 'জাতি মালার' গঠন করিতে তৎপর হয় এবং আপন আপন সমাজস্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ যে জাতি-মালা গঠন করিয়াছিল, তাহা পৃথক পৃথক সমাজগত জাতীয় উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রদর্শনমূলক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

মালঞ্চবাসী পুণ্ড্রগণ রাঢ়বাসী পুণ্ড্র হইতে যে শ্রেষ্ঠ তাহার পরিচয় প্রদানার্থ ব্যস্ত হইতে দেখা গিয়াছিল এবং মালঞ্চস্থ দুই শ্রেণীর পুণ্ড্রগণ এই সময়ে ও একমতাবলম্বী হইতে পারে নাই। ইহা মঙ্গলের চিহ্ন নহে। জাতি এক, একথা স্বীকার করিলে কোন দোষস্পর্শে না সমাজ পৃথক ও রহিয়াই যাইতেছে। পুণ্ড্র একটি জাতি—পুঁড়া, পুণ্ডরী, পোদ বা পদ্ম উহার নামান্তর মাত্র।

এক জাতির মধ্যে পৃথক সমাজ বিদ্যমান থাকা দোষাবহ নহে বরং স্বাভাবিক বলিয়াই বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যেই এই প্রকার বিভিন্ন সমাজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুলীন মৌলিক ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে, উচ্চ নীচ ভাবও বর্ত্তমান কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিতে এক, পৃথক নহে। "বার রঙ্গপুতের তের হাড়ী" থাকিলেই হইল। জাতীয় বল ক্ষীণ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

পদ্য জাতি, বানের ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাষ নিবন্ধনই, স্বীয় বংশপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বলীপুত্র পুণ্ড্র ক্ষেত্রজ পুত্র কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেব ক্ষত্রিয় ঔরস জাত পুত্র।

যাহাই হউক, ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

বলীপুত্র বানের পুণ্ড্রগণ সত্যাস্ত কালের সমকালীন বলিয়া ধরা যায়। রামচন্দ্রের সময়ে পুণ্ড্ররাজ্য এবং পুণ্ড্রক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল।

পুণ্ড্রক বাসুদেব দ্বাপরান্তের লোক, তিনি সুপ্রাচীন পুণ্ড্রদেশের যখন অধিপতি হয়েন, সেই সময়ে পূর্ব্ব পুণ্ড্রবাসী ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

পুণ্ড্ররাজ্য শাসিত রাষ্ট্র, কাল সহকারে বানের ক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিতই হউক বা অন্য কোন রাষ্ট্রপতির দ্বারাই শাসিত হউক, দ্বাপরান্ত কালে পুণ্ড্রক-বাসুদেব কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল ইহা পৌরাণিক মত।

পুণ্ড্ররাষ্ট্রের বানের ক্ষত্রিয়গণ দ্বাপরান্তে সংখ্যায় বর্দ্ধিতই হইয়া থাকিবে। যখন পৌণ্ড্রক-বাসুদেব পুণ্ড্ররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন তখন তিনি যে সূত্রেই রাষ্ট্রপতি হউন না কেন, তাঁহাকে বানের ক্ষত্রিয় প্রধান পুণ্ড্ররাজ্যই শাসন করিতে হইয়াছিল, এবং বাসুদেবের সহিত অন্য এক সম্প্রদায়গত ক্ষত্রিয়ের পুণ্ড্রাধিকার অসঙ্গত নহে।

এই সময়ে বানের ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য মন্দীভূত হইয়া বাসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয় বা যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় নেতা বাসুদেবের শাসনকাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাসুদেবকে পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্রপতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইয়াছিল। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জাতি বানের জাতি হইতে পৃথক হইলেও ক্ষত্রিয় ছিল। এই সময় হইতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জাতিও পৌণ্ড্রক জাতি এবং বানেরাও পৌণ্ড্রকজাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে একমাত্র কুলপরিচয় ব্যতীত পৃথক করিবার অন্য উপায় ছিল না।

সুতরাং বানের বা অন্য ক্ষত্রিয় জাতি পুণ্ড্রদেশে বাস নিবন্ধন পুণ্ড্রবাসী হইয়া পড়ে। ভিন্নরাষ্ট্রের জনগণ পুণ্ড্ররাষ্ট্রবাসিগণকে পুণ্ড্রবাসী বা পৌণ্ড্রক * বলিত।

পুণ্ড্রের অপত্যার্থেই হউক বা পুণ্ড্রদেশবাসী বলিয়াই হউক—তৎকালে পুণ্ড্র জনপদবাসী মাত্রেই 'পৌণ্ড্রক' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ভিন্নবংশীয় বাসুদেব 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

পুণ্ড্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি জাতিও 'পৌণ্ড্রক' এই যৌগিক আখ্যা পাইয়াছিল। মৈথিলী ব্রাহ্মণ, উপাধির মত। পুণ্ড্রদেশবাসী জনগণই 'পৌণ্ড্রক' বিশেষণে বিশেষিত হইত।

সত্যান্তে বানের ক্ষত্রিয় প্রভাব পুণ্ড্রদেশে ঘটে, তৎপরে বাসুদেব ক্ষত্রিয় প্রভাবের অভ্যুদয় হয়। বাসুদেব ক্ষত্রিয় রাজ্য যখন পুণ্ড্ররাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইল সেই সময় আজিকার দিন হইতে পাঁচ সহস্র বৎসরের মধ্যে বা পরে ঘটিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক বংশবিবরণ এবং ইতিহাস বর্ণন অসম্ভব।

* পুণ্ড শব্দে অপত্যার্থেই ফক্ প্রত্যয় করিয়া 'পৌণ্ড্রক' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

এই সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং সামাজিক ইতিহাসের মূলোদ্ঘাটন করা একেবারেই অসম্ভব। এই ইতিহাসের ধারা কিছুতেই স্পষ্টতর ভাবে দেখা দিবে না। সংযোজক সূত্র বহুবার বহুস্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—'Missing link' এবং সন্ধান কিছুতেই মিলিবে না।

ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য সেই প্রাচীন যুগে ইউরোপীয় সভ্যতা নবপ্রস্তরাস্ত্রে সোপানে আরোহণ করিতেছিল। সেই যুগের পৌণ্ড্রেতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনার মধ্যে সহস্র ভ্রম এবং তৎপ্রাকার কল্পনা বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে।

কুলতন্ত্র এই কাল হিসাবে নগণ্য। তত্রাচ কুলতন্ত্রের রচনাকালে বঙ্গদেশের প্রবাদ ও জাতিগণের যে কুলজী বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালীন পুণ্ড্রসমাজের বিভাগ দর্শনেই লিখিত হইয়া থাকিবে।

এই হিসাবে ওড্রবাসিগণ যে এই পৌণ্ড্রক-গণের শাখা তাহা দৃষ্ট হয়। তাহারা উত্তর-দেশ হইতেই দক্ষিণে সমুদ্রকূলে গিয়া বাস করিয়াছিল, কিন্তু কবে গিয়াছিল তাহার ইতিহাস নাই।

চব্বিশপরগণা ও অপরাপর জেলাবাসী বঙ্গজ, রাঢ়ী এবং উৎকলী পুণ্ড্রের বসবাস হেতু বঙ্গজ, শাস্তপর, এবং পোদ (পদ্ম) একত্রে মিলিত হইয়া নূতন জাতির বিকাশ করিয়া থাকিবে। উড়িষ্যার শাস্তপর ওড্রপুণ্ড্র দক্ষিণবঙ্গে বাস কালে 'পান্দ্য' * জাতিতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। বর্ত্তমানে তাহার নিদর্শনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

আদম সুমারির রিপোর্টে সেই কারণে পোদদিগকে প্রকারান্তরে 'Half brothers' পুণ্ড্রী বলা হইয়া থাকিবে। 'ওড্রপুণ্ড্র' ও 'বঙ্গজ পুণ্ড্র'গণই 'পদ্ম' জাতি।

একই জাতি স্থানভেদে পৃথক শ্রেণী হইতে পারে—উচ্চ বা নীচ হইয়াও অবস্থান করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরে "পাশ্চাত্য কায়েত" নামক এক অপরাধী নিম্নস্তরের জাতি দৃষ্ট হয়। তাহারা কায়স্থ শাখা হইতে ছিন্ন হইয়া কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি বলে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সমাজে তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বর্ত্তমান কায়স্থগণ হইতে বহু নিম্নে হতমানে অবস্থিত রহিয়াছে।

মূলস্থানের পুণ্ড্রবিগণের সহিত দক্ষিণ ও ওড্রবাসিগণের পার্থক্য অসম্ভব নহে। পুণ্ড্র-পদ্ম বা শাস্তপর ওড্র পুণ্ড্র সমাজের সহিত উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ পুণ্ড্রগণের সহিত সমাজগত ভাবে আদৌ সংস্রব নাই ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৌলিকতা হিসাবে জাতিগত হিসাবে যে তাহারা পৃথক নহে ইহা স্বীকার করিলে কোন দোষ বা অপরাধই হইতে পারে না। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা একজাতি কুলতন্ত্র ইহাই বলিয়া থাকে।

বিশেষতঃ কুলতন্ত্রে যে ওড্র-পুণ্ড্রগণের কথা আছে তাহা অস্বীকার করিয়া বেদ পুরাণের অতি প্রাচীন ঘটনার মধ্যে বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য বিধান কতদূর সম্ভব তাহা ঐতিহাসিক-গণই বিচার করিবেন।

বেদ পুরাণের সহিত পুণ্ড্রজাতির যে সম্বন্ধ তাহা উচ্চাঙ্গের ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু 'কুলতন্ত্রের' মর্ম্ম এই সূত্রে উপেক্ষিত

* পূর্ব্বে 'পদ্ম' শব্দ 'পোদ' শব্দে ব্যবহৃত হইত না—'পদ্ম' শব্দ পুণ্ড্রী শব্দের ভেদ মাত্র। পুণ্ড্রী বা পুণ্ড্রো শব্দই 'পোদ' হইয়াছে।

হওয়া দোষাবহ ও নিন্দনীয়। কুলতন্ত্রকে মান্য করিতেই হইবে। বেদ পুরাণাদি হইতে বর্ত্তমান পুণ্ড্র জাতির বংশ ধারা একেবারে লুপ্ত বা অজ্ঞাত।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে—উৎকলী শান্তপর পুণ্ড্র সমাজ যদি বর্ত্তমানে বিদ্যমান থাকে তাহা 'শান্তপর-পণ্ড' বলিয়াই অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হইবে। উহারাই 'বঙ্গে ওড্র পুণ্ড্র'

উৎকলী কায়স্থ 'মুদ্রাবয়নিক্' জাতি কায়স্থ কিন্তু তাহাদের সমাজ বিভিন্ন, সে সমাজের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজিক ভাবে সংসৃষ্ট নহে, তত্রাচ জাতিগত ভাবে এক একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেই প্রকার সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজপুণ্ড্র সমাজ যেমন সমাজগত ভাবে পৃথক তদ্রূপ ২৪ পরগণা ও উৎকলী পুণ্ড্র সমাজ ও পৃথক। কিন্তু জাতিগত ভাবে এক।

কুলতন্ত্রের মতানুযায়ী উৎকলী পুণ্ড্র শাখার কিয়দংশ এবং বঙ্গীয় পুণ্ড্র সমাজের কিয়দংশ এবং অপরাপর পুণ্ড্র শাখার মিশ্রণে ২৪ পরগণার 'পদ্য' শাখার বিকাশ ও উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজগত ভাবে সকল দেশের পুণ্ড্র পৃথক কিন্তু জাতিগত হিসাবে এক।

সকল দেশের বিভিন্ন আখ্যাধারী পুণ্ড্র শাখা আদৌ পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্র শাখার শাখা প্রশাখা মাত্র। মূল কাণ্ড হইতে পৃথক হইয়া পৃথক পৃথক মহীরুহে পরিণত হইয়া পৃথক হইয়াছে।

বাঙ্গালী পুণ্ড্র শাখা

বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাস নিবন্ধন পুণ্ড্রগণের বহু শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজ পৃথক পৃথক বেষ্টনীর মধ্যে বহুকাল হইতে অবস্থান করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কাহার খোঁজ খবর পর্য্যন্ত রাখে নাই।

সেনসস্ কার্য্যের ফলে এক্ষণে বিভিন্ন বঙ্গীয় পুণ্ড্র শাখার সন্ধান প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজ হইতে কুল-পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু কোন সমাজই পূর্ব্বাপর পুণ্ড্র জাতির সমাজের সংযোগসূত্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রদান করিতে পারিবে না, ইহা অসম্ভব কখন যে সম্ভব হইবে ইহা বিশ্বাসও হয় না।

"Missing link" শত স্থানে বিদ্যমান। কেবল বর্ত্তমান জাতিবাচক পদ বা শব্দ দ্বারা বৈদিক যুগের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে মাত্র। এই বিরাট পুণ্ড্র জাতিটি যে লোপ পায় নাই ইহা নিশ্চয়! কিন্তু তাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচয় দিবার কোন উপায়ই নাই।

বিরাট পুণ্ড্র জাতি এক স্থানে আবদ্ধ নাই ইহা নিশ্চয়, ভারতের বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্মান্তর দ্বারা কত পুণ্ড্র ভিন্নাখ্যা ও ভিন্ন জাতি হইয়া গিয়াছে—তাহার ইতিহাস নাই।

যাহারা মূল কুলস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে বাস করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যার নির্ণয় অসম্ভব। তাহারা নিজের জাতি মধ্যে বিলীন হইয়াও গিয়াছে। যাহারা বর্ত্তমান আছে, তাহারা মূলধর্ম্ম ও জাতি এবং জাতিগত কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথকই হইয়া পড়িয়াছে।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পর হইতে এই পুণ্ড্র জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ইতিহাসে বা পুরাণে লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই পুণ্ড্র জাতি আর রাষ্ট্রীয় শাসকরূপে দেখা দেয় নাই। দিলেও হয় তাহাদের ইতিহাস নাই, নয়

বিলাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় অবস্থায় সহস্র সহস্র বৎসর এই বঙ্গদেশে বাস করিয়া পৃথক জাতি, পৃথক সমাজবেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্রভাব গ্রহণ করিয়াছে।

একমাত্র কুলতত্ত্বের প্রভাবে এই সুপ্রাচীন জাতির নূতন পরিচয় বদ্ধমূল হইয়াছে। 'পুণ্ড্র জাতি যে আছে' একমাত্র গ্রন্থের প্রমাণ স্থলে কুলতত্ত্বই প্রধান।

কুলতত্ত্বকে অমান্য করিলে পুণ্ড্র জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ অসম্ভব হইয়া যাইবে। কেবল উহারই প্রভাবে যাগযজ্ঞের পুণ্ড্রজাতিকে এই সহস্র সহস্র বৎসর পরে কুলতত্ত্বের প্রভাবে চিনিতে পারা যায়।

সহস্র সহস্র বৎসরের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন প্রভাবে জাতিগত ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্ম বিপ্লবের মধ্য দিয়া একটি জাতি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না। পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

পরিবর্ত্তননীতি প্রভাবে পুণ্ড্রজাতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে এই জাতিই উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার শাস্তপর জাতি এবং পোদ বা পদ্য। বঙ্গে উহারাই পুণ্ড্র, পুণ্ডরী বা পুড়ারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মালদহের পুণ্ডরী জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

ছোট পুণ্ড্র এবং বড় পুণ্ড্র ভেদে উত্তররাঢ়ে দুই শ্রেণীর পুণ্ডরী বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় পুণ্ডরী এবং ছোট পুণ্ডরীর দুইটি সমাজ। বড় পুণ্ডরী আদৌ গৌড় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী। বগুড়ার পুণ্ড্রগণও মহাস্থান কেন্দ্রের পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী। বাঙ্গালার পুণ্ড্রগণ বঙ্গজ পুণ্ড্র, ইহারাও বহু পূর্ব্বে পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী ছিল। কুলতত্ত্বে ইহারা 'বঙ্গজ পুণ্ড্র' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বড় পুণ্ড্র গৌড় ও বরেন্দ্রবাসী—ছোট পুণ্ড্রগণ বীরভূম 'পাকুড়' হইতে আসিয়া এতদ্দেশের মুরশিদাবাদ এবং মালদহে বাস করে। সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামার সময় বা রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহারা মালদহে আসিয়াছে। সেই কারণেই মালদহের বড় ভাগের সহিত তাহাদের সমাজগত ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তাহারা কুলতত্ত্বের হিসাবে 'দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্র' এবং মালদহের বড় ভাগ উত্তর রাঢ়ীয় পুণ্ড্র।

সমাজ হিসাবে 'বড় ভাগ' 'ছোট ভাগ' হইতে পৃথক কিন্তু জাতিগত ভাবে পৃথক কখনই নহে।

বীরভূম ও মুরশিদাবাদবাসী পুণ্ড্রগণ দক্ষিণ রাঢ়ী। এই দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণ, মালদহের ছোট ভাগের সহিত অভিন্ন। ছোট ভাগ দক্ষিণরাঢ়ের পাকুড়ীয়া শাখার অন্তর্গত। মালদহে বাসনিবন্ধন দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণের সহিত—বীজসম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজসাহী, নবদ্বীপ, বগুড়া প্রভৃতি জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' শ্রেণীর অন্তর্গত। নবদ্বীপ ও রাজসাহীর সহিত পারিপার্শ্বিক জেলাগত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায়, মালদহ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্র সংস্রব উক্ত জেলাদ্বয়ের সহিত অসংসৃষ্ট থাকিতে পারে।

নবদ্বীপ, বগুড়া, রাজসাহীর পুণ্ড্রগণ 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' শাখার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। কালসহকারে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে বিভিন্ন কারণে আগমনিগম হেতু একই জেলায় পৃথক পৃথক পুণ্ড্র সমাজের বিকাশ-সাধন হইয়াছে।

বাঙ্গালার সকল জেলাবাসী পুণ্ড্রগণের সহিত আদি কুলস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত

সম্বন্ধ বিজড়িত হইয়াই রহিয়াছে। জেলাগত, কালগত, এবং সমাজগত ভাবে তাহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

মালদহের বড় পুণ্ড্র মধ্যে অনেকেই বরেন্দ্রবাসী ও গৌড়বাসী, বরেন্দ্রভূমে এখনও বড় পুণ্ড্রের বাস আছে এবং বরেন্দ্রস্থ ভাঙ্গন ও পুনর্ভবা তীরমধ্যস্থ ভূখণ্ড হইতে অনেকে দক্ষিণে আগমন করিয়াছে।

মালদহ, রাজসাহী, নবদ্বীপ, বীরভূম এবং মুরশিদাবাদের পুণ্ড্রগণের মধ্যে কৃষিই প্রধান।

মালদহের দুই শ্রেণীর পুণ্ড্র মধ্যে কুলীন মৌলিক ভাব বিদ্যমান আছে। রাজসাহী প্রভৃতি স্থানেও এই ভাব দৃষ্ট হয়।

উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজপুণ্ড্র মধ্যে কুলীন মৌলিক ভাব এবং বংশগত মর্য্যাদা যথেষ্ট আছে। সামাজিক ভাবে তাহারা বহু কুলপ্রথা, সমাজ প্রথার নিয়ম পালনে বাধ্য।

মালদহের বড় থাকের মধ্যেই পরস্পর অন্ন গ্রহণ প্রচলিত নাই। ছোট থাকের মধ্যেও ঐ প্রকার দৃষ্ট হয়। জেলাগত পুণ্ড্র সমাজ মধ্যে এই প্রকারের ভেদনীতি বদ্ধমূল রহিয়াছে—"বার রজপুতের তের হাঁড়ী"—পুণ্ড্র জাতির মধ্যে দেখা যায়।

প্রত্যেক জেলায় পুণ্ড্র সমাজ মধ্যে বিভিন্ন রীতি নীতির প্রচলন থাকিলেও প্রায়ই এক রকম দেখা যায়।

বিবাহ চূড়াকরণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মমূলক সংস্কারগুলি সকল বঙ্গীয় পুণ্ড্র মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পুণ্ড্রগণ পূর্ব্বে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের আচরণ করিত, তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও অদ্যাবধি কুলধর্ম্মানুসারে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গ্রাম্য-দেবতার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিষহরি এবং মঙ্গলচণ্ডীর প্রাধান্য নিতান্ত বদ্ধমূল ছিল। বর্ত্তমানে বহুস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা জাতীয় অধঃপতনের চিহ্ন নহে—জাতীয় ভাব রক্ষার চিহ্ন মাত্র, ইহা পরিত্যাগ করিলে প্রাচীন ভাবও সঙ্গে সঙ্গে ত্যক্ত হইয়া যাইবে।

কেবল যে বাঙ্গালী পুণ্ড্র সমাজই বিষহরি এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও উৎসবে এবং গীতে বিভোর হইয়াছিল তাহা নহে।

হিন্দু বাঙ্গালী মাত্রেই চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং সময়েও ঐ প্রকার বিষহরি মঙ্গলচণ্ডীর পূজার পক্ষপাতী ছিল।

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পাতুলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥"
* * * * (চৈতন্য ভাগবত)
"বাসুকী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।" (ঐ)

এই সকল ধর্ম্মভাব সাময়িক সার্ব্বজনীন্ কোন জাতিগত বা সমাজগত ভাব বিজ্ঞাপক নহে। কেবল যে পুণ্ড্রসমাজই উক্ত দেবীর পূজা করিত তাহা নহে বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই কালধর্ম্মের বশে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

মোটের উপর বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সংস্কার সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন নহে।

পুণ্ড্রজাতির কৃষি প্রধান

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণের কৃষিকার্য্যই যে প্রধান অবলম্বন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই জাতি বাঙ্গালার 'নবশাখ' জাতির ন্যায় কৃষিকার্য্যই করিয়া থাকে, স্বহস্তে হলচালনায় কোন আপত্তি নাই। কৃষিকার্য্য এবং হলচালনা পরিত্যাগই যে উন্নত জাতির লক্ষণ তাহা নহে।

হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কৃষি কার্য্য বৈশ্যজাতির কর্ম্ম মধ্যে গণ্য থাকিলেও, সেই কালেই শ্রেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের মধ্যে কৃষিকার্য্য দেখা গিয়াছিল—শিল্প ও বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষিকেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন।

অন্ন-সংস্থানার্থ কৃষিকর্ম্ম দোষাবহ নহে, 'কৃষি পরাশর' নামক কৃষিশাস্ত্রে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। কালক্রমে কৃষিকার্য্য হীনকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া দেশের দুরবস্থার চরম হইয়াছে।

দাসত্ব অতি নীচ কার্য্য, এই নীচ কার্য্য গ্রহণ দ্বারা সভ্য হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে কৃষি অবলম্বন করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। হলচালনা ও কৃষি, দাসত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য হীন কর্ম্ম অপেক্ষা মূল্যবান্।

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ কৃষি কর্ম্মোপজীবী ইহা তাহাদের জাতীয় লক্ষণ :—

"ধাতা বণী হিতরত সুধনা দেব সেবকঃ।
কৃষি কর্ম্মোপজীবী চ ষড়বিধ পৌণ্ড্র লক্ষণম্।"
(কুলতত্ত্ব)

কুলতত্ত্বের রচনাকালে পুণ্ড্রজাতি কৃষি-প্রধান জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় পুণ্ড্রগণ মাত্রই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। যদিও বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য উপেক্ষিত হয় নাই, তত্রাচ উহা নগণ্য বলিয়াই বোধ হয়।

রেশমকীট পালন

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ মধ্যে কোন কোন জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালন আরম্ভ করিয়াছে। এ ব্যবসা তাহাদের জাতিগত ব্যবসা কি না বলা যায় না। তবে মালদহ, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পুণ্ড্রগণ তুঁতের কৃষিসহ রেশমকীট পালন করিয়া থাকে।

রেশমসূত্রপ্রস্তুতকরণ

রেশমগুটি বা কোয়া (Cocoons) হইতে 'খাই' বা চর্কার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করে। এই প্রকার রেশমসূত্র-শিল্পকে "খাই কাটা" বলে। পুণ্ড্রগণ খাই কাটে, এবং পলু (পীলু রেশমকীট) পোষে।

তাঁতের কার্য্য

পুণ্ড্র সমাজের মধ্যে তাঁতের কার্য্য অতি প্রবল ছিল। সকলেই তাঁত বুনিত। মটকা, মসৃক, সূতী ও রেশমী বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। কার্পাস সূত্র হইতে তাঁত সাহায্যে বস্ত্রবয়ন অতি প্রাচীন আর্য্যগণের কার্য্য ছিল।

কৃষিকার্য্য মধ্যে তরিতরকারী ও শাক সব্জীর উৎপাদনে এই জাতি স্থান বিশেষে দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে।

কলাবাগান, আমবাগান ও তরিতরকারীর ক্ষেত্রগুলি পরিপাটিরূপে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

মালদহের পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালনে তৎপর ও সুদক্ষ, রাজসাহী জেলার গুরেপাড়া ও গঙ্গারামপুরের পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালন করে তত্রাচ তথায় কৃষি প্রধান। মুর্শিদাবাদের পুণ্ড্র সমাজ এবং বীরভূমির পুণ্ড্রগণও রেশমকীট পালন করে।

নবদ্বীপ, বগুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার পুণ্ড্রগণ অপরাপর কৃষির সহিত মুখ্যভাবে তরিতরকারীর কৃষি করিয়া থাকে।

"In India also there are three sub-castes but they are here known as Beguna, Piyaza and Peto".

পিয়াজিয়া, বেগুনে ও পেটো পদবী কৃষি-গত, জাতিগত নহে। শান্তিপুরে অনেক

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোঁজ, বড়া, উপাধি দুই হয়—ইহা পরিহাস পদবী মাত্র।

"In Nadia they are vegetable growers and cultivators and believe that the growing of Vegetables was their original occupation" (Census Report. Page 425, Para 771 1901 A. D.)

নবদ্বীপের পুণ্ড্র সমাজ একমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের জাতীয় কর্ম্ম।

"Their (Pundaris) usual occupation in Malda is the cultivation of the mulberry plant and the rearing of silk-worms, but some are Zamindars, occupancy and not-occupancy raiyots and land less labourers".

সকল জেলানিবাসী পুণ্ড্রগণই কৃষিকে মুখ্যকার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান-কালের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পুণ্ড্র জাতির মধ্যে উকীল, মোক্তার, ও কেরাণী-জীবী দুই হইতেছে।

জমিদারের গোমস্তা, পাটোয়ার, নায়েবী প্রভৃতি কার্য্যও ইহারা করিয়া থাকে। বীর-ভূমের পুণ্ড্রগণের মধ্যে জমিদার, রেশম কুঠিয়াল ও আড়তদার অনেকেই আছে। বীরভূমের মধ্যে শিক্ষিত লোক যত, অন্য জেলায় পুণ্ড্রগণের মধ্যে তত দুই হয় না। মালদহের মধ্যে উকীল, মোক্তার, সব্‌এ্যাসি-ষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছে, কেহ কেহ কেরাণীর কাজও করে।

পুণ্ড্রগণের উপাধি

বাঙ্গালার পুণ্ড্রগণের মধ্যে 'দাস' উপাধিই অধিক, কিন্তু মণ্ডল, চৌধুরী, সাহা ঢল, সরকার পুরকাৎ, সাহ, বারিক, প্রামাণিক, সরকার প্রভৃতি উপাধিও দৃষ্ট হয়।

পুণ্ড্রজাতির গোত্র সংখ্যাও বহু, বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ আশী প্রকার গোত্র সংখ্যায় হইবে। প্রত্যেক জেলাবাসী পুণ্ড্রগণের মধ্যে এই সকল গোত্রের লোক দৃষ্ট হয়।

"In Malda there are five exo-gamous gotras, Chandra Rishi, Ala Rishi, Mug Rishi, Tula Rishi and Kashyapa Rishi, said to be named after the spiritual guides of the original families from whom the present, members of the caste claim descent."

(C. Rept. 1901, Page 425, Para 771)

মালদহবাসী পুণ্ড্রগণ মধ্যে বড়ভাগ পুণ্ড্রগণ, সরকার দ্বারা তাহাদের জাতিত্ব সম্বলিত কুল পঞ্জিকা প্রদান কালে কেবল মাত্র পাঁচটি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

চন্দ্র ঋষি, আলা ঋষি, মুগ ঋষি, তুলা ঋষি এবং কাশ্যপ ঋষি এই পাঁচটি গোত্রের মাত্র নাম করিয়াছিল। বাস্তবিক পাঁচটি গোত্র নাই —গোত্র অনেক আছে, মালদহের পুণ্ড্র অধ্যায়ে সকল গোত্রের নামোল্লেখ করা হইবে।

ঐ পাঁচ গোত্র কেবল মাত্র কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পুণ্ড্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে।

ছোট খাক পুণ্ড্রকে বাদ দিয়া সম্ভবতঃ এই আবেদন পত্র লিখিত হইয়াছিল, কারণ বড় খাক তাহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করে নাই। গোত্রের নামোল্লেখ ব্যাপারে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে।

পরবর্ত্তী সেনসস্ কালে আমি মালদহে উপস্থিত ছিলাম, তৎকালে ছোট ও বড় থাক গণ আবেদন করিয়াছিল। ১৯০১ সালের রিপোর্ট মধ্যে বড় থাক আপনাদিগকে 'পুণ্ড্র' এবং ছোট থাককে পুণ্ড্রীক এবং অপর জেলার জনগণকে 'সুপুণ্ড্র' নাম প্রদান করিয়াছিল।

"Their endogenous groups are reported from Malda viz. Pundra, Poundrik and Supundra. The first two it said, are found in Malda and the third in Birbhum." (Ibid)

মালদহের পুণ্ড্রগণ যে ব্যবস্থাও করিয়াছিল তাহা প্রকৃত নহে। সমাজগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

মালদহ বা উত্তররাঢ়ীয় এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণ মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় বড়ভাগ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ছোট থাক পুণ্ড্র বাস করে।

এমন কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই যদ্দ্বারা বড় ভাগই 'পুণ্ড্র' এবং ছোট ভাগ 'পৌণ্ড্রিক' এবং দক্ষিণরাঢ়ী বীরভূমবাসী ক্ষত্রিয়গণ 'সুপুণ্ড্র' নামে পরিচিত হইতে পারে।

এই প্রকার বলিবার উদ্দেশ্য—বাসের ক্ষত্রিয়গণই 'পুণ্ড্র', এবং ইহারা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দ্বারপাল কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে গমনে বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা আদি পুণ্ড্র বংশীয়। ইহা ভ্রম মাত্র।

দ্বিতীয় পৌণ্ড্রিক বাসুদেব বংশীয়; বর্ত্তমান ২৪ পরগণার পদ্মরাজগণ এই বংশীয় বলিয়া দাবী করিতেছে।

পুণ্ড্রিক বা পুণ্ড্রীক বাসুদেব-বংশ আদি পুণ্ড্র নহে, দ্বাপরান্তে বাসুদেব পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রপতি হইয়া ঐ পুণ্ড্রীক বাসুদেব আখ্যা পাইয়াছিলেন। মালদহের ছোট থাককে ভ্রম ক্রমে ঐ 'পুণ্ড্রীক' বেষ্টনীর মধ্যে ধরা হইয়াছে।

এই স্থলে ছোট থাকের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অঙ্গা, বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা সহাস্তথা।
সুজাতয়ঃ শ্রেষ্ঠিমন্ত শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহরুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽথ সহস্রশঃ।"

(ভারত-সভা ৫২ ১৬ ১৭)

উত্তর পুণ্ড্রদেশবাসী 'পৌণ্ড্রিক' এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী 'পুণ্ড্র' অন্যান্য সুজাতি, শ্রেষ্ঠিমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন।

পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্রিক শ্রেণী এই প্রকারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পুণ্ড্র মূলতঃ বাসের ক্ষত্রিয়—ইহারাই পুণ্ড্রদেশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা সত্যযুগান্ত কালের কথা।

দ্বাপরান্তে—পৌণ্ড্রিক বা পুণ্ড্রীক বাসুদেব পুণ্ড্রদেশের নরপতি হইয়াছিলেন। ইনি মহামতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—পুণ্ড্রদেশে বাস নিবন্ধন পুণ্ড্রীক বা পৌণ্ড্রিক আখ্যালাভ করিয়াছিলেন।

বাসের পুণ্ড্র অপেক্ষা এই বংশ পরবর্ত্তী কালের, এবং পুণ্ড্রদেশের উত্তরাংশের নিবাসী বলিয়া বিশ্বকোষে লিখিত আছে। বাস্তবিক ছোট ভাগ দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ, বড় ভাগই উত্তররাঢ়ীয়।

বীরভূমবাসিগণকে সুপুণ্ড্রক বলা হইয়াছে বাস্তবিক তাহারা দক্ষিণ রাঢ়ীপুণ্ড্র।

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা আন্ধ্রপুণ্ড্রকাঃ।
বৈবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈলবাস্তথা॥"
(সভা—৪২।১৮)

'সুপুণ্ড্রকা' দাক্ষিণাত্যবাসী এবং ইহারাই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্রিক শ্রেণী হইতে অবশ্য হীন হইবারই কথা। কিন্তু কয়েকটি সুলক্ষিত হস্তী দিয়া ব্যাপ্রাপ্ত হন।

ছোট ভাগ মালদহের পুণ্ড্র সমাজের উত্তরবাসী, পুণ্ড্রগণ মধ্যবাসী এবং বীরভূম পুণ্ড্রদেশের দক্ষিণ সুতরাং তথাকার অধিবাসিগণ 'সুপুণ্ড্রক' হইবারই কথা। এই ক্ষুদ্র ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই প্রকার শ্রেণীভেদ হইয়া থাকিবে। 'সুপুণ্ড্রক' জাতি যদি থাকে তাহা হইলে তাহারা 'শুদ্র-পুণ্ড্র' হইবারই সম্ভব।

এই সকল উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান সমাজগত হইলেও সমীচীন নহে। আপন আপন সমাজে সকলেই শ্রেষ্ঠ।

মূলতঃ বলিতে হয় কোন্ সমাজ পৌণ্ড্রিক, কোন্ সমাজ পুণ্ড্র, এবং কোন সমাজ 'সুপুণ্ড্র' তাহার আদৌ ইতিহাস নাই।

বর্ত্তমানকালে ঐ প্রকার ত্রিপুণ্ড্রের ভেদাভেদ ও উচ্চ নীচ ভাব কেবল কল্পনামাত্র। কুলতত্ত্বের মত বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতেই হইবে—ইহা বর্ত্তমান পুণ্ড্রসমাজের পরিচয় জ্ঞাপক একমাত্র মৌলিক গ্রন্থ।

কুলতত্ত্বের মতে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রিক ও সুপুণ্ড্রের কোন কথাই নাই। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং শুদ্র শ্রেণীর কথা আছে মাত্র।

সুতরাং বর্ত্তমান বাঙ্গালী পুণ্ড্রমধ্যে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ এবং মিশ্র শুদ্র শ্রেণীই দৃষ্ট হইতেছে। ইহার অতিরিক্ত কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

গোত্র, সমাজ ও জাতি সম্বন্ধে পুণ্ড্র সমাজ পূর্ব্বে কোন আলোচনাই করে নাই, বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে তাহা স্বার্থ বিজড়িত থাকায় ঐতিহাসিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়া হইতেছে না।

জাতিগত ভাবে উচ্চ নীচ শ্রেণীর সৃষ্টি করা বর্ত্তমানে অসম্ভব কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিবার প্রয়াস তর্ক ও যুক্তির বহির্ভূত।

একেত ঐতিহাসিকগণ পুণ্ড্রজাতির অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন। আদম সুমারির রিপোর্টেও সেই কথা ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয়। এমত স্থলে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রিক ও সুপুণ্ড্র শ্রেণীর কল্পনা হাস্যকর বলিয়াই উপলব্ধি হইবে।

দ্বাপরান্তে, এই চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্ড্র জাতির যে শ্রেণী বিভাগ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধিই দুরূহ। চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস যে জাতির অন্ধকার—সে জাতিকে ঐ প্রকার পৌরাণিক এবং বৈদিক বিভাগে বিভাগ করা অসম্ভব। সে চেষ্টার প্রয়োজনই বা কি? আমরা পুণ্ড্র আমাদের পূর্ব্ব বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ আমরা বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়—ইহাই কি যথেষ্ট নয়? আমরা সেই জাতি ইহার আবার প্রমাণ কি দিব?—আমরা সেই জাতি ইহাই জানি।

কুলতত্ত্বের মত গ্রহণ দ্বারা পুণ্ড্র জাতির সমাজ ও জাতি মীমাংসা মাত্র সম্ভব, নচেৎ আর অন্য উপায় নাই। পুণ্ড্র জাতি এক, কেবল—উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও শুদ্র নামে শ্রেণীভেদ আছে মাত্র। আমরা সকলে এক জাতি।

পুণ্ড্র জাতি কোন্ বর্ণের—আলোচনা অধ্যায়ে তাহার যথাসাধ্য বিবরণ প্রদত্ত

হইবে। জাতিমালার বচনগুলিরও মীমাংসার প্রয়োজন হইবে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া,নদীয়া, যশোর, পূর্ণিয়া, দক্ষিণবঙ্গ, উৎকল যেখানেই যে নামে পরিচিত থাকুক না কেন—কেহ পুড়া, কেহ পুত্তরী, কেহ পদ্ম, কেহ পোদ বলিয়াই নামকরণ করুক না—মোটের উপর এই বঙ্গোদ্ভবাসী পুত্রগণ এক জাতি।

শ্রীহরিদাস পালিত।

সমাজ প্রসঙ্গ—পণপ্রথা

আবার সেই কথা—পণপ্রথা! স্নেহলতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আলোচনাটি যেমন রসপূর্ণ বোধ হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। পুরাতনের দোষই এই! তথাপি এই আলোচনার বিরাম নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, সে সকল কথা আর না বলাই ভাল। বলিলেই বা শুনিবে কে? পূর্ব্বে পণপ্রথার বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা তাহার কুফল বুঝিয়া। এখন সেই সকল কথা পাল্টাইয়া বলিতে গেলে অনেক পাঠকই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "আবার সেই কথা—পণপ্রথা!"

যিনি তাঁহার পাস-করা ছেলেকে কত পণে কন্যাকর্ত্তার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারা যায় এ বিষয়ে গোপনে দিবারাত্র গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিবেন, "পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত আমাদের মঙ্গল নাই।" সুতরাং পণপ্রথার কুফল সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে প্রথায় অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই, যে প্রথায় আমরা মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, যে প্রথার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত আমাদের উন্নতি লাভ অসম্ভব, সেই কুপ্রথাকে আমরা পরম স্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছি কেন? নৈতিক অবনতি ইহার একমাত্র কারণ। পানাসক্ত ব্যক্তি জানে মদ খাইলে মানুষকে কিরূপ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়, তথাপি সে মদ খায়। আমাদেরও অবস্থা এইরূপ হইয়াছে সেইদিন, যেদিন আমরা হিন্দু সমাজের নাম দিয়াছি "বাঙ্গালী সমাজ"। আজ অশান্ত ইয়ুরোপ বংশরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য চিরন্তন যে সকল আচার নিয়ম রক্ষায় অসমর্থ হইয়াছে, শান্ত হিন্দু আমরা সেই আদর্শে সমাজ গঠন করিয়া সংস্কারের নামে সংহারে উদ্যত হইয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষাই কার্য্য। ধর্ম্মে আঘাতের ফলে যে সংস্কার হিন্দু তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, ইহাই হিন্দুর অন্তরের কথা। বাহিরের অশান্তি হিন্দু সমাজে অন্তরের ভাবের কাছে পৌঁছিতে পারে না। এই জন্যই বিধবা বিবাহ সমাজ সংরক্ষণের পক্ষে আমরা যতই মঙ্গলজনক মনে করি না কেন, প্রস্তাবটি অন্তরে প্রবেশ করিলেই কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে,—প্রবল হইতে প্রবলতর যুক্তির ছাপ সেখানে লাগে না। জাতীয় সংস্কারের ইহাই বিশেষত্ব। ঝড় উঠিলে নদীর জল নাচিয়া উঠে—উপরে, নীচে তাহা একই ভাবে বহিয়া যায়। সমাজের স্রোত এই ভাবেই বহি-

তেছে। হিন্দুসমাজ অবিশ্রান্ত ঝড়-তুফানে পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে. উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটিয়াছে,—বাহিরের বেশ বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল প্রকৃতি একচুলও এদিকে বা ওদিকে যায় নাই, যতদিন পর্য্যন্ত একজনও প্রকৃত হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন যাইবে না।

পণপ্রথার সমর্থনের জন্য এ সকল কথা বলিতেছি না। কিরূপে এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজের হাড়ে-মাসে জড়িত হইয়াছে, তাহারই আভাস দিতেছি মাত্র। পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত রকমের অকাট্য যুক্তির অবতারণা করা যাউক, এই প্রথার উচ্ছেদসাধন কিরূপে অসম্ভব হইয়াছে, তাহাই বলিব।

পণপ্রথার উচ্ছেদসাধনের অন্তরায় কি? প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, সালঙ্কারা কন্যা দানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। বসনভূষণে সাজাইয়া গুছাইয়া যৌতুকসহ কন্যাদান পূর্ব্বেও ছিল। ছিল না কেবল অসমর্থ কন্যা কর্ত্তার উপর পাত্রের পিতার অযথা জুলুম। কিন্তু এই জুলুমের জন্য দোষী কে? ধনী ও দরিদ্র লইয়াই সমাজ। সমাজে ধনীর সংখ্যা কম, দরিদ্রের সংখ্যা বেশী। দরিদ্র চাহে সামাজিক আচার-ব্যবহারে ধনীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে, কিন্তু ধনী মুখে কোন কথা না বলিলেও পিছাইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে বংশগত সম্মানের পরিবর্ত্তে ধনগত সম্মানের আদর এযুগে বাড়িয়াছে। বংশগত সম্মানও এযুগে একেবারে যায় নাই। ক্রিয়া-কলাপে পংক্তিভোজন কালে ধনীরা স্বজাতীয় দরিদ্রদের সহিত এখনও মিশিয়া থাকেন, দরিদ্রের টানা হুঁকায় দুইটান দিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিরত হ'ন না; কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যবহারেই সম্প্রকাশ হয়, এতখানি নীচতা তাঁহাদের মধ্যে নাই, যে, সকল সময়েই তাঁহাদিগকে দরিদ্রদের সহিত তুল্য-রূপে ব্যবহার করিতে হইবে,—চলন বা সে স্বজাতীয়, বংশগত "প্রেষ্টিজ" (মর্য্যাদা)টা কোন মতেই যে নষ্ট করা যায় না! সকল ধনীই পুত্রের বিবাহে মোটা রকমের যৌতুক লন না, কিন্তু মাত্র রূপ ও শীল দেখিয়া কয়জন ধনী দরিদ্রের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা ধনীরাই হিসাব খতাইয়া দেখিতে পারেন। গভীর নৈরাশ্যে অশ্রু মোচন করিয়াও দরিদ্রেরা আকাশকুসুম পাইবার জন্য ব্যস্ত। হইলাম বা দরিদ্র, তাহা বলিয়াই মেয়েটাকে গলায় ঘড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে ত পারি না—দরিদ্র কন্যা-কর্ত্তার অন্তরের কথা ইহাই। ধনীরাও এই সুযোগে নিজের অযোগ্য পুত্রকেও নীলামে চড়াইয়া দেন। এ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় "ব্রাহ্মণ সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বোধ করি।

এখন দেখিতে হইবে বরপণরূপ সমাজের ব্যাধি দূর করিবার জন্য কোন্ বৈদ্য কিরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং সেই সেই ঔষধ প্রয়োগে সুফল প্রসূত হইতে পারে কি না। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা অনেকেই করিয়াছেন, কাহারও ব্যবস্থাপত্র অপর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা আমার মত অ-বৈদ্যের পক্ষে শোভন নহে; বিশেষতঃ ব্যবস্থাপত্রে দোষ বাহির হইলেও, যে ব্যবস্থার মূলে সাধু সঙ্কল্প বিদ্যমান, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও সুফল সহজে পাওয়া যায় না, এবং সুফল ফলিলে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রাবণের প্রবাসীর "বিবিধ প্রসঙ্গে" "বরপণ" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, "পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করা চাই। এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে নাই বা চলিবে না, ভাবিয়া, আঁৎকিয়া উঠিলে চলিবে না। এরূপ আদর্শ বিবাহ আগে ভারতবর্ষে কোন কোন স্থলে হইত; পাশ্চাত্য দেশেও অনেকস্থলে হয়, কিন্তু সকল স্থলে নয়। বরপণ ও কন্যাপণ-রূপ নীচতা ও বর্ব্বরতা নাশের ইহাই এক মাত্র অমোঘ অস্ত্র। এই অস্ত্রলাভ ও প্রয়োগ করিবার জন্য সকল সমাজের লোক প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন।"

বর্ত্তমান যুগে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় চিন্তাশীল লেখক এবং নির্ভীক সমালোচক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অতিবিরল, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কথাই ভাবিয়া দেখা উচিত।

তিনি যে "পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া" বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহা আমাদের সাধ্যের সীমার মধ্যে আছে কি না, আগে তাহাই দেখিতে হইবে।

হিন্দুরা এই ব্যবস্থাকে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করে কেন? যে কোন ব্যবস্থা—প্রাচ্যই হউক আর পাশ্চাত্যই হউক—সুফল প্রসব করে, তাহাই সর্ব্বজন গ্রাহ্য। কুইনিন জ্বরের মহৌষধ, কিন্তু সকল রকমের জ্বরেই ডাক্তারেরা কুইনিনের ব্যবস্থা করেন না। রোগীর অবস্থা এবং রোগের গতি দেখিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে সমাজের গতি ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজের অবস্থার কথা বলিতে হইলে, অনেক গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। শতসহস্র লোক লইয়া যে সমাজ, সেই সমাজে প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব। জাতি পাতি খুঁজিলে চরিত্রবান, তায়নিষ্ঠ ব্যক্তি কয়জন পাওয়া যায়? ঘরে ভাত নাই, হৃদয়ে বল নাই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই, অথচ "হামবড়" লোকের সংখ্যা হুহু বাড়িয়া উঠিতেছে। বাহ্যিক বেশবিন্যাসে আমরা ভদ্রলোক সাজিয়াছি। মুখের কথায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে, কিন্তু ধর্ম্মপথে চলেন কয়জন? ধর্ম্ম কোশাকুশির মধ্যে নাই, তুলসী কাষ্ঠের মালার মধ্যে নাই, টিকির মধ্যেও নাই। যাহাতে আত্মার প্রসার বাড়ে, পরকে নিজের বলিয়া ভাবিবার শক্তি আসে, সংযম শিক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষের দেহের মনের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। নারীদের ত কথাই নাই,—তাহারাও সকল কাজেই পুরুষের মুখাপেক্ষী সমাজের এই দুর্দ্দিনে একটা কথা মনে জাগিতেছে—নয় মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।

পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে বরপণ ও কন্যাপণ রূপ নীচতা ও বর্ব্বরতা অপেক্ষাকৃত সহজে বিনষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে যথার্থ ভালবাসার প্রতিষ্ঠান অসম্ভব। রূপের নেশা ও ধনের মোহ যে সমাজের অঙ্গভূষণ, জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিবার সুযোগ পাইলে সে সমাজে জাতি বিচার

উঠিয়া যাইবে। কারণ, এই সুযোগে ব্রাহ্মণের কন্যা শূদ্রের পুত্রের রূপে, ধনে, ব্যবহারে বা আর কিছুতে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিবে না, এমন কোন যুক্তি নাই। জাতি বিচারই যে সমাজের ধর্ম, সেই সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তিই এই জন্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করে না। এই রকমের প্রস্তাব শুনিলে একাকারের আশঙ্কায় হিন্দুরা ত আঁৎকিয়া উঠিবেই। যে সমাজে জাতি বিচার নাই, এই ভাবের বিবাহ পদ্ধতিতে সে সমাজ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহা সংস্কার নহে—সংহার।

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন, "দেখা যাইতেছে, যে ছেলে ইংরেজী শিখিয়া যত পাশ করে বিয়ের বাজারে তাহার দর তত চড়া হয়।" কথাটা খুবই সত্য। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা দেশে বড় কম। তাহাদের সংখ্যা বাড়িলে ক্রমে ক্রমেই দরটা কমিতে পারে।" যত শীঘ্র এখানে ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা বাড়িলে দেশের গৌরব বাড়িবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ তাহাতে কি পরিমাণে উপকৃত হইবে, চিন্তার বিষয়।

দেখা যাইতেছে, ইংরেজি লেখাপড়া শিখা আজ কাল চাকুরীর জন্য। ইংরেজি জানা অল্প সংখ্যক ছেলেরাই চাকুরীর বাজার যে রকম গরম করিয়া তুলিয়াছে, ইহার চতুর্গুণ ছেলে ইংরেজি জানা হইলে চাকুরীর বাজার একেবারে "লাল" হইয়া উঠিবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বি-এ পাস করিলে ডেপুটিগিরি পাইবার আশা করিতেন, এখন বি-এ পাস করিয়া অনেকের ভাগ্যে কেরানীগিরিই জুটে না। ফলে অনেকে বি-এল পাস করিয়া কেহ কেহ ছয় মাসে গাউনের খরচই তুলিতে পারেন না। শিক্ষা বিভাগেও উপযুক্ত আদর নাই। পাঠ্যাবস্থায় দরিদ্র পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করিয়া শেষে চল্লিশ টাকার ইস্কুল মাষ্টারিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। অনেকে আবার অল্প বেতনে জমিদারের ঘরে ইন্সপেক্টর, সার্কেল-অফিসার, নায়েব ইত্যাদি পদ লাভ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের সঙ্গে সুপারিস পত্র সংগ্রহ করিয়া দরখাস্ত পেশ করিতেছেন। পদ একটি, উমেদার অনেক; কাজেই অনেককে হতাশার দীর্ঘ শ্বাস সম্বল করিয়া ঘরে ফিরিতে হইতেছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহাই।

তাহার পর ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা যত বাড়িবে, পাত্রের বাজার দর তত কমিবে। অর্থাৎ এখন যে টাকায় ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস করা পাত্র পাওয়া যায়, কালে সেই দরে হইবে বি-এ পাস-করা পাত্রের। কিন্তু তাহাতে পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন কিরূপে হইবে! মেয়েটির ভরণ পোষণের কোনরূপ কষ্ট না হয়, ইহা ভাবিয়াই কন্যাকর্ত্তা সাধারণতঃ পাত্র নির্ব্বাচন করেন। অর্থাৎ পাত্রের উপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কন্যাকর্ত্তা দর যাচাই করেন। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারের ফলে ম্যাট্রিকুলেশন্ হইতে এফ-এ, এফ-এ হইতে বি-এ, বি-এ হইতে এম-এ—ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে সাধারণ গৃহস্থ কন্যাকর্ত্তাদিগের লক্ষ্য পড়িবে। সাধারণ গৃহস্থরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা সমাজকে যে দিকে চালাইতেছেন, সমাজ সেই দিকেই চলিতেছে।*

* খুব ধনী এবং খুব দরিদ্র এই সমস্যার বাহিরে আছেন। ধনীরা পণ বলিয়া যাহা লন বা দেন, তাহা

যাইতেছে, ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা বাড়িলেই পণ প্রথার কঠোরতা হ্রাস হইবে, এরূপ আশা নাই।

"কন্যারা চলিত আইন বা সামাজিক রীতি অনুসারে যদি পিতার ধনের আংশিক উত্তরাধিকারিনী হইত, তাহা হইলে বরপক্ষ পণের জন্য হয়ত এত কষাকষি করিত না।" অনুমান মাত্র। তাহা হইলে পণপ্রথা সাধারণতঃ টাকার আকারে না দাঁড়াইয়া জমি, বাড়ী জমিদারী এবং কোম্পানির কাগজের আকারে দাঁড়াইত মাত্র।

স্ত্রীজাতির দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা ভাল; পুরুষ জাতির দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মন্দ। ইহাতে সাম্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। এ ব্যবস্থাতেও পুত্রের পিতারই লাভ, কন্যার পিতার অবস্থা—হ'য়ে উপর কুমড়া, অথবা কুমড়ার উপর দা!—পরিণাম ফল একই। স্ত্রীধনেএখন স্বামীর কোনই অধিকার নাই—আইনের কথা বলিতেছি। তথাপি যে সমাজে বিবাহিতা কন্যার অলঙ্কার বেচিয়া খাইবার প্রলোভন আছে, সে সমাজে কন্যা অর্থের পরিবর্ত্তে ভূসম্পত্তি আনিলে তাহাও ছলে, বলে বা কৌশলে বোল কড়াই কাণা হইবে না, বলা যায় না। পুত্রের পিতার বা অন্য অভিভাবকের এবং জামাতার অভাব মোচন ও স্বভাব পরিবর্ত্তন না হইলে কন্যার সুখের কল্পনা নিষ্ফল। পিতার ঐশ্বর্য্যে কন্যা অংশতঃ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া পতিগৃহে আসিলে বহুবিবাহের পথ অনেকখানি রুদ্ধ হইতে পারে। বহুবিবাহের জন্য দোষী প্রধানতঃ কুলীনরা, কিন্তু আজকাল অনেক ধনশালী বাঁকি কুলীনদিগকে তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। বহুবিবাহের দোষ আর যাহাই থাকুক, ইহাতে পণের কষাকষি নাই!

অধিকন্তু এ ব্যবস্থায় অনেক বড় ঘর ফেরার হইবে। ধনিনী তথা মানিনী পত্নীর হাতে দরিদ্র পতির লাঞ্ছনার আশঙ্কা নাই, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ—বর্ত্তমান শিক্ষার দোষেই হউক, বা অন্য কিছুতেই হউক—পুরুষের আদর্শে পতিপরায়ণা রমণীর সংখ্যা এ বাজারে বড়ই অল্প। এই প্রকারের রমণী পিতৃধনে ধনিনী হইলে সমাজে বিবাহবন্ধন উচ্ছেদ প্রথার সৃষ্টি হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে। এই সকল কারণে মনে হয়, কন্যা চলিত আইন বা সামাজিক রীতি অনুসারে পিতার ধনে আংশিক উত্তরাধিকারিণী হইলে সমাজে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

তাহার পর কন্যাকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিলে কি হয়, দেখা যাউক।

এইরূপ ব্যবস্থায় পণপ্রথা অচিরাৎ উঠিয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? এই ব্যবস্থায় সমাজে যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বাড়িবে তাহা রোধ করিবার উপায় কি? অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—দেশপ্রচলিত কথায়—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করবে ট্যাঁস ট্যাঁস।" একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখশান্তি বিধানের জন্য হিন্দু সমাজে যে সকল আচার নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথা তাহাদের

তাহাদের খোসমেজাজের পরিচায়ক মাত্র। দিলেও কোন কথা নাই, না দিলেও কোন কথা নাই। আর যাহারা খুব দরিদ্র, তাহাদের আবার পণ সমস্যা কি? তাহারা নিজেও যেমন হা ঘরে তাহাদের মেয়েগুলোও পড়ে তেমনই হা-ঘরের—হা-ঘরের হাতে।—লেখক।

অসম্ভব। একজন বাল্যকালের সঙ্গী, অপর পরিণত বয়সের সঙ্গী,—ভালবাসার প্রবলতর আকর্ষণ কোথায়? বাল্যবিবাহের দোষ যতই থাক, তাহার গুণ এই, জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, যাচাই করা ভালবাসার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, সময়ের প্রতীক্ষাও করিতে হয় না। দেখা যায়, অনেক চরিত্রহীন যুবক বিবাহের পর হঠাৎ "চরিত্রবান" হইয়া উঠে। প্রথম অবস্থায় ইহার কারণ রূপের নেশা বলা যাইতে পারে। রূপের নেশার আকর্ষণ যতখানি, আদর তাহার শতাংশের একাংশও নাই, সত্য, কিন্তু এই রূপের নেশাই কালে প্রকৃত ভালবাসার পথ দেখাইয়া দেয়।

কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতে হইলে তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সংযমী করিতে হইবে, তবেই সেই কন্যা যে পরিবারে যাইবে, সেই পরিবারকে সুখী করিবে। কারণ, শিক্ষার গতি এখন ফিরিয়াছে। ইব্‌সনের থিয়রী এখন অনেক মেয়ের মগজে ঢুকিয়াছে। সেই জন্যই সন্তান প্রতিপালনের ভার এখন দাসীর উপর, রন্ধনশালার ভার পাচক ব্রাহ্মণের হাতে, স্বামী এখন প্রেমের নভেলের নায়ক। সুতরাং পুরুষরাও এখন মেয়েদিগকে অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রীরূপে দেখে না। তাহারা বুঝিয়াছে স্ত্রীজাতি বিলাসের একটা বস্তু মাত্র। এমন অবস্থায় মেয়েদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে তাহাতে পণপ্রথার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, হিন্দুসমাজে কেলেঙ্কারী বাড়িবে।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্তু কিরূপ শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে আবশ্যক সে আলোচনা কয়জন করিতেছেন? নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া শিক্ষয়িত্রী সাজাইবার কি প্রয়োজন? তিনি শিক্ষয়িত্রী হইবেন সুসন্তান প্রসবে, সন্তান প্রতিপালনে, রন্ধনকার্য্যে সকল রকমের গৃহ কর্ম্মে। হিন্দুনারীর বিকাশ মাতৃরূপে। যে হিন্দুনারী পুরুষের অধিকার-লাভে যতটুকু হাত বাড়াইয়াছেন, তিনি পুরুষের চক্ষে ততটুকু অবজ্ঞার পাত্রী হইয়াছেন। দোষ পুরুষের নহে, দোষ সমাজে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার চেষ্টায়। উপযুক্ত শক্তি উপযুক্ত কাজে বাহিত হউক, তবেই সমাজের মঙ্গল হইবে সকল সমস্যার সমাধান হইবে। শিক্ষার বিভ্রাটে পুরুষের সহিত নারীর প্রতিযোগিতায় সমাজে দুর্ব্বলতা বাড়িতেছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই আলেয়ার আলোকের পিছনে ছুটিয়াছে, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করিবে কে?

তবে কি পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব? পণপ্রথা কেন, সকল রকমের কুপ্রথা সেইদিন হিন্দুসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে, যেদিন দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির দ্বারা হিন্দুর ঘরে ঘরে অন্নের সংস্থান হইবে; যেদিন এই ভারতের আকাশপবন সামগানে আবার মুখরিত হইবে; যেদিন প্রকৃত কর্ম্মী যুগাবতার সমাজের প্রকৃতি বুঝিয়া আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কারে ব্রতী হইবেন।—সেই দিন!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শঙ্কা যদি করিতে হয় করিগো যেন তাঁরে
অতি দারুণ ভীতিরও যিনি ভীতি,
দুর্জ্জনের পীড়নকারীজনের যেন দ্বারে
দাঁড়াতে কভু না হয় মোর প্রীতি।

(২)

শরণ যদি লইতে হয় লইতে যেন পারি
শরণের শরণ্য রাজা পায়,
যিনি সকল রাজার রাজা ধর্ম্ম মহারাজা
সকাশ যেন তাঁহারি কৃপা চায়।

(৩)

মিত্র যদি লভিতে হয় তাঁহারে যেন লভি
মিত্র যিনি বিপদে সুখে দুঃখে,
ডাকিলে দীনবন্ধু বলে ইঁদে পুলক রবি
করিয়া পড়ে শান্তি যারা বুকে।

(৪)

বিপদে আমি ডরিলে ওগো রাখিতে পারি লিখি
মধুসূদন নামটী হৃদে যদি,
অপমানও যে ভূষণ হবে সঁপিতে যদি লিখি
সকল ফল সে পদে নিরবধি।

(৫)

লজ্জা মোরে কে দিবে বল লজ্জা নিবারণে
বুকেতে যদি রাখিতে পারি বাঁধি
কাঁদাতে মোরে পারে কে বল যদি গো নারায়ণে
পরাণ ভরে ডাকিতে পারি কাঁদি।

(৬)

একেরে পেলে সকল যেন সেই সে ধন চাহি
তাঁহারি কৃপা পিয়াসী ওগো আমি,
সব গীতের বিরাম যেথা সেই যে নাম গাহি
জীবন বীণা যায় গো যেন থামি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

(৯৪৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্থ অধ্যায়

নূতন আইন রচনা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কেপটাউন নগরে সংযুক্ত পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়, ইহাতে ভারতীয়গণের দুঃখ দূর করিবার কথা দূরে থাকুক, বরং পুরাতন স্বত্বসমূহ লোপ করিয়া আরও অধিক কঠিন নিয়ম সমূহ সংযোজিত করা হয়। তথাকার নেতা জেনেরল হরজোগ বলেন যে, "প্রথমে আমি বুয়র জাতিকে রক্ষা করিব, তারপর ইংরাজের রক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দিব। ইংরাজের সুবিধার জন্য কখনও নিজের জাতির সুখ ও সুবিধাসমূহ নষ্ট করিতে পারি না। ইংরাজ সম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন দুর্ব্বল ভারতবাসীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার বিবেচনাই চলিতে পারে না। নূতন আইনে একটি নিয়ম রচিত হয় যে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পশ্চাতে আগত কোন ভারতীয় মজুর এখানকার ভূম্যধিকারী বলিয়া আদৌ পরিগণিত হইতে পারিবে না, এবং স্বদেশে গমন করিলে পুনরায় এ স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। এখন পর্য্যন্তও এই দেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসী বিনা বাধায় কেপকলোনীতে যাইতে পারিত, কিন্তু নূতন আইনে বিধান রচিত হয় যে, যে সকল ভারতবাসী ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান হইবে, কেবল তাহারাই কেপকলোনীতে যাইতে সক্ষম হইবে। ট্রান্সভালে কোন ভারতবাসীকে যাইতে হইলে লিখিয়া দিতে হইবে যে, সে তথায় গিয়া কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পাইবে না। কেবল মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের অধিকার সে প্রাপ্ত হইবে। তিন পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ টাকার বার্ষিক কর যথাপূর্ব্ব রহিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা আর একটি ভয়ানক নিয়ম রচিত হয় যে, যে ধর্ম্মে একটির অধিক বিবাহ হইতে পারে, এইরূপ বিধান আছে, সেই ধর্ম্মানুযায়ী কৃতবিবাহ অপ্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানকে আপনার বিবাহ আদালতে যাইয়া রেজেষ্টারী করিতে হইবে। এই বিচিত্র আইন অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের একাধিক বিবাহিতা স্ত্রীকেও রেজেষ্টারী করা হয় নাই। এরূপ বিবাহিতা স্ত্রীকে, রক্ষিতা স্ত্রী স্বরূপে ও তাহাদের সন্তানগণকে জারজ সন্তান বলিয়া অভিহিত করা হইবে। সংযুক্ত পার্লামেণ্টের মিঃ মায়নর, মিঃ চেপলীন, মিঃ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি সদস্যগণ এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। নেটাল ও ট্রান্সভালে ভারতীয়গণ সভা করিয়া এই নূতন আইন রহিত করিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করেন, কিন্তু কাহারও প্রার্থনাতে মনোযোগ না দিয়া আইন পাস করা হয় ও সম্রাটের

স্বীকৃতির জন্য উহার প্রতিলিপি লণ্ডনে প্রেরিত হয়। এদিকে ভারতবাসিগণ লর্ড মাণ্ডষ্টোনের নিকট টেলিগ্রাম দ্বারা প্রার্থনা করেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে ঘোর অমঙ্গল ও অপমানজনক এই আইনে সম্রাট যেন স্বাক্ষর না করেন। লর্ড মাণ্ডষ্টোন আইনের প্রতিলিপিতে সম্রাটের স্বাক্ষর করাইয়া প্রবাসী ভারতবাসিগণকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেন।

মিঃ কাছলিয়ার পত্র

'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র সভাপতি মিঃ কাছলিয়া লোকমান্য গান্ধির অনুমতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন যে, সংযুক্ত পার্লামেণ্টে ভারতীয়গণের জন্য যে নূতন আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সভ্য জাতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও অপমান জনক। এই হেতু আইনে নিম্নলিখিত সংশোধন হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ হইবে।

(১) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঔপনিবেশিক আইনের সংশোধিত ধারার পশ্চাতে আগত ভারতবাসীকে এ স্থানে বাস করিতে দিবার ও ভারতবর্ষে গমন করিলে পুনরায় তথা হইতে এ স্থানে ফিরিয়া আসিতে দিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসীকে কেপকলোনীতে যাইতে হইলে, আগে যেরূপ আইন প্রচলিত ছিল, সেইরূপ আইন পুনঃ প্রচলন করিতে হইবে।

(৩) হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের রীত্যনুসারে বিবাহকে ন্যায় বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

(৪) ষ্টীয়েটে যাইবার জন্য ভারতবাসিগণকে যে মোলামিগিরী করিবার দর্ত লিখিয়া দিতে হয়, তাহা রহিত করিতে হইবে।

(৫) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পশ্চাতে যে সকল ভারতবাসী এখানে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ টাকা কর গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে। এই করের জন্য নির্ধন ভারতবাসী অসীম কষ্ট ভোগ করে, ইহা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মাননীয় গোখ্‌লের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন।

(৬) পুরাতন ও নূতন আইনে ভারতীয়গণ যেন সম্পূর্ণ ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হয়।

আন্দোলনের প্রস্তাব

মিঃ কাছলিয়ার এই উচিত প্রার্থনাতে, গভর্ণমেণ্ট আদৌ মনোযোগ দেন না। ভারতবাসীর মনে ইহাতে অতিশয় উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। তাহারা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে আরম্ভ করে। যদ্যপি প্রবাসী ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধে এই আইন রচিত হয় এবং তাহাদিগকে এই আইন স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করা হয়, তথাপি ভারত সন্তান নিরাশ অন্তঃকরণেও ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে নাই, বরং ইহার প্রতিবিধানের জন্য সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ করিবার সংকল্প করে। এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্য কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পারসী, কি খৃষ্টান, সমস্ত জাতি ও সমস্ত ধর্ম্মের লোক কটিবদ্ধ হয়। লর্ড এম্পথীল ও মাননীয় গোখ্‌লে এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আন্দোলন করিতে থাকেন। মাননীয় গোখ্‌লে পীড়িত হওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ হেনরি

পোলক তথায় প্রেরিত হন। এ বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ রাজপুরুষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এখানেও লোকমান্য গান্ধী এই আইন সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য কটিবদ্ধ হন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নগরেও এই বিষয়ে সভা হইতে থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ সার ফিরোজশাহ মেহতা ভারত গভর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট জন-সাধারণের পক্ষ হইতে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পত্র লিখেন যে, এই সভা রাজরাজেশ্বর সমীপে নতশিরে প্রার্থনা করিতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সংযুক্ত পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত আইন কার্য্যে পরিণত না হইতে দিবার জন্য সম্রাট যেন বাধা প্রদান করেন।" এইরূপে নূতন আইনের প্রতিকূলে সর্ব্বত্র আন্দোলন হইতে থাকে।

উদ্বোধন

"হে হিন্দী ভাষী, আর কতকাল শুইয়া থাকিবে? তুমি অলস নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছ, দেখিতেছ না, তোমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল? হিতৈষিগণ, তোমাকে জাগাইতে জাগাইতে ক্লান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তোমাকে জাগাইবার জন্য আর কোন্ ব্যক্তি আগমন করিবে; ঐ দেখ তোমার নৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর হে হিন্দীবাসিগণ, কেবল আলস্যে ও প্রমোদ নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছ, ঐ দেখ সংযুক্ত পার্লামেণ্টে কি কঠিন আইন প্রস্তুত হইতেছে, তোমার ভাবী দাওয়া কিছুই থাকিবে না, তোমার সব অধিকার নষ্ট হইবে। এই আইনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিও না। সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া তোমাদের সাহস প্রদর্শন কর। নূতন কমিটিকে অর্থদ্বারা সাহায্য কর। তাঁহারা তোমার দাবী রক্ষা করিবেন। হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ ভবানী দয়াল তোমাদের নিকট মিনতি করিতেছেন যে, তোমরা একবার ঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ কর।"

সত্যাগ্রহের আরম্ভ

লোকমান্য গান্ধী ও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নূতন ঔপনিবেশিক আইন সংশোধন করিবার জন্য যে সমস্ত আলোচনা চলিতেছিল, শেষে কিন্তু তাহার কিছুই সমাধান হয় নাই। এই জন্য পুনরায় সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ হয়। মিসেস গান্ধী আপনার শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই আইন অনুসারে আমি কি আপনার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগণিত হইব না? গান্ধী উত্তর দেন যে, নূতন আইন অনুসারে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কিম্বা তোমার গর্ভজাত পুত্রও আমার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই কথা শুনিয়া মিসেস গান্ধী বলেন যে, এমন পৈশাচিক আইনের দেশে না থাকিয়া চলুন আমরা স্বদেশে চলিয়া যাই। মাননীয় গান্ধী বলেন, স্বদেশে চলিয়া যাওয়া দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যখন আমাদের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতার উপর এই বজ্ররূপী আইনের পতন হইবে, তখন দেশে থাকিয়া কি লাভ? মিসেস গান্ধী পুনঃ পুনঃ স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন যে, আপনি কি আমাকে এই আইনের বিপক্ষে বিরোধ করিবার জন্য জেলে যাইতে আদেশ করিবেন? গান্ধী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন যে, তোমার শরীর ভাল নয়, জেলে বড় কঠিন কাজ করিতে হয়, তোমার দুর্ব্বল শরীরে জেলের কষ্ট সহ্য হইবে না। শেষে পত্নীর বারবার অনুরোধে তাঁহাকে জেলে যাইবার অনুমতি প্রদান

করেন। সকলের প্রথমে ১৬ জন লোকের একটি দল ডরবন হইতে প্রস্থান করে, তাহাতে চারিজন মহিলা ছিলেন। প্রথম মিসেস গান্ধী ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় মিসেস ডাক্তার মতিলাল ব্যারিষ্টার, তৃতীয় মিসেস ছগনলাল, ও চতুর্থ মিসেস মগনলাল। নিম্নলিখিত পুরুষগণ ছিলেন, 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসে'র সহকারী সভাপতি পারসী রুস্তমজী শেঠ, গুজরাতী ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক ছগনলাল, রঘুগোবিন্দ, রাওজী ভাই পটেল, মগন ভাই পটেল, সোলোমন রাম্পেন, গোবিন্দ্রাজ, শিবপূজন, সুপ্‌রামী, মদুলাইট, রেওয়াশঙ্কর, গোকুলদাস ও রামদাস গান্ধী। যৎকালে এই ১৬ জন দলবদ্ধ হইয়া ট্রান্সভালের সীমানায় উপস্থিত হন, সে সময় ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের নিকট হইতে সনন্দ দেখিতে চাহেন। সনন্দ না দেখানর ফলে সকলকে তিন দিনের মধ্যে ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ হয়, কিন্তু ইহারা এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রত্যেককে তিন তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। সকলে কারাবাসের আদেশ শুনিয়া আনন্দিত হন।

মিঃ বজ্রির জেল

প্রথম দল জেলে গেলে পর লোকমান্য গান্ধী ডরবন হইতে মিঃ বজ্রীকে সঙ্গে করিয়া জোহান্সবর্গে গমন করেন। ডরবন ষ্টেশনে মিঃ বজ্রিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহুসংখ্যক ভারতবাসী উপস্থিত হন। যখন মিঃ বজ্রি মেরিৎসবর্গের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেখানেও কতিপয় ভারতবাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বেদধর্ম্ম সভার সভ্য বাবু পদ্ম সিংহ এখানে তাঁহার সহিত মিলিত হন। ড্রেন হাউজার নামক ষ্টেশনে মিঃ বজ্রিকে দেখিবার জন্য অনেক ভারতবাসী একত্রিত হন। এখানে মিঃ ভবানী ও মিঃ চন্দু সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের জন্য সম্মিলিত হন। যৎকালে ইঁহারা বালফরষ্টে উপস্থিত হন, সে সময় ঔপনিবেশিক শাসন কর্ত্তা বিনা সনন্দে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার অপরাধে ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যেককে তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ বজ্রি ৩২ বৎসর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছেন। ইঁনি শাহাবাদ (আরা) জেলার হেতমপুর গ্রামের অধিবাসী। 'ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র ইনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। জোহান্সবর্গে এক সময়ে ইহার অনেক জমি জায়গা ছিল। মিঃ চেম্বরলেনের নিকট প্রিটোরিয়া নগরে যখন এক ডেপুটেশন গমন করে, তখন মিঃ বজ্রি তাহাতে একজন প্রতিনিধি ছিলেন। মিঃ বজ্রি তাঁহার স্বদেশবাসীর কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন বলিয়া অধিক লোক প্রিয় ছিলেন।

জোহান্সবর্গে সত্যাগ্রহ

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ কাছলিয়ার সভাপতিত্বে অতিশয় সমারোহের সহিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র এক অধিবেশন হয়। লোকমান্য গান্ধী সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য একটি উত্তেজনা উৎপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ এল, ডব্লিউ রীচ ব্যারিষ্টার, মিঃ কেলনবেক, মিঃ জোজফ রোগন ব্যারিষ্টার, মিঃ আলী নায়ডু প্রভৃতি সজ্জনগণ ইহার সমর্থন করেন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের চীফ রিপোর্টার,

'আর্য্যাবর্ত্তের' সংকারী সম্পাদক ভবানীদয়াল প্রভৃতি সমাচার পত্রের সংবাদ দাতাগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাতে সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা ভঙ্গ হইলে 'ইলষ্ট্রেটেড ষ্টারে'র সংবাদ দাতা, প্রতিনিধিগণের চিত্র গ্রহণ করেন। ঐ দিন 'ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েসনে'র অধিবেশন হয়। তথায় ভারতীয় রমণীগণ সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে সম্মিলিত হইবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হয়েন এবং কারারুদ্ধ রমণীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। রবিবারে এই সভা হয় আর সোমবারে মিঃ প্রাঞ্জী দেশাই, সুরেন্দ্রনাথ সেঠ ও মণিলাল গান্ধী প্রভৃতি মজুরের বেশে বিনা পরওয়ানায় ফেরী করিবার জন্য বাহির হন। তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াও সেদিন গ্রেপ্তার হইতে পারেন নাই। এদিন নিরাশ অন্তঃকরণে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয় দিন কমিশনর ষ্ট্রীটে ইহারা গ্রেপ্তার হন, ইহাদের প্রত্যেককে সাত সাত দিনের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জেল হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ইহারা ঐরূপ ভাবে ফেরী করিতে আরম্ভ করেন, এজন্য দ্বিতীয় বার প্রত্যেককে দশ দশ দিনের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এইরূপে মিঃ রাজু ও বীলী দণ্ডিত হন।

মিসেস ভবানীদয়ালের প্রস্থান

মিসেস গান্ধীর জেলে যাইবার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মিসেস ভবানীদয়াল অতিশয় দুঃখিত হন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর নিজের এক বৎসরের বালক রামদত্ত বর্ম্মাকে ক্রোড়ে লইয়া জোহান্সবর্গে গমন করেন। তিনি তথায় লোকমান্য গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উভয়ে নিম্ন লিখিত কথাবার্ত্তা হয়।

গান্ধি—আপনি কি জেলে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?

মিসেস ভবানী—হাঁ, প্রসন্ন মনে।

গা—জেলে ভাল কাপড় পাওয়া যাইবে না।

মিঃ ভঃ—আমি জেলের কাপড়কে উত্তম পরিধান বলিয়া মনে করিব।

গা—সেখানে নিজের ইচ্ছামত খাওয়া পাওয়া যাইবে না।

মিঃ ভঃ—আমি জেলের আহারকে উত্তম খাদ্য বলিয়া মনে করিব।

গা—তথায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

মিঃ ভঃ—আমি সকল রকমের কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।

গা—আপনি কেন জেলে যাইবেন?

মিঃ ভঃ—নিজের স্বত্বের জন্য।

গঃ—আপনার কোন্ স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে?

মিঃ ভঃ—যে নূতন আইন প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় স্ত্রীগণকে রক্ষিতা স্ত্রী বলিয়া বুঝা যাইবে।

গা—আপনি আনন্দের সহিত জেলে গমন করিয়া ভারতের যশ ও কীর্ত্তি বিস্তার করুন।

ইহার পরে মিসেস ভবানীদয়াল, 'তামিল বেনিফিট সোসাইটি'র সভাপতি মিঃ নাইডুর গৃহে গমন করেন। সেখানে সত্যাগ্রহী মহিলাগণের একটি প্রীতিভোজ হয়, এবং সত্যাগ্রহী মহিলাগণের চিত্র গ্রহণ করা হয়।

জোহান্সবর্গের বীরাঙ্গনা

জোহান্সবর্গের ভারতীয় রমণীগণ সীমা বিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহারা যে পূর্ণা বীরাঙ্গনা ছিলেন ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ

ছিল না। লোক মাত্র স্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে জেলের কষ্ট সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করেন। তাঁহারা বিন্দুমাত্র দুঃখের কথা না ভাবিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। মিসেস নাইডু, মিসেস ভবানীদয়াল প্রভৃতি ১১ জন মহিলা আপনাদের স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও গৃহ পরিবার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রমণীর ক্রোড়ে ছোট ছোট ছয়টি বালক বালিকাও ছিল। মিঃ কেলনবেক ইহাদের সঙ্গে গমন করেন। এই সকল বীরাঙ্গনা নির্ভয় অন্তরে ক্রীষ্টেটে প্রবেশ করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে সত্যাগ্রহী জানিয়া ছাড়িয়া দেন। এই সকল রমণীগণ নিরাশ হইয়া ক্রীনিখনে চলিয়া যান। তথাকার প্রবাসিগণ এই সকল বীরাঙ্গনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করেন। ইহারা বলেন যে আমরা এক্ষণে ফিরিয়া ঘরে যাইব না, এস্থানে বিনা পরওয়ানায় ফেরী করিয়া গ্রেপ্তার হইব। ক্রীনিখনের প্রবাসিগণ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া ফেরি করিবার সমুদয় জিনিস তাঁহাদিগকে যোগাড় করিয়া দেন। ইহারা ফেরি করিয়া যে পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যাগ্রহী ফণ্ডে জমা প্রদান করেন। এই বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' লিখিয়াছিলেন যে, ডোহান্সবর্গের ১১ জন মহিলা আপনাদের সন্তানকে কোলে লইয়া দেশের জন্য ফেরি করিয়া বেড়াইতেছেন, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া ভারতীয়গণ কি উত্তেজিত হইবে না? এই মহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশই তামিল জাতীয়া ছিলেন, কেবল মিসেস ভবানীদয়াল বিহারের অধিবাসিনী ছিলেন। যদি ইহারা জেলে যাইবার জন্য চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা উঁহাদের কিছুই করিতে পারিতাম না. তাঁহারা নিজেদের অপমানের প্রতিশোধার্থ এই আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। যখন ভারতীয় রমণীগণ আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তখন ভারতের জাতীয় গগনে সূর্য্যাস্ত হয় নাই। এই সকল বীরাঙ্গনার দ্বারা ভারতবাসী এই মহান যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আপনাদের নাম ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। যখন এই সকল বীরাঙ্গনা জেলে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন, তখন আমাদের যুদ্ধে বিজয় হইয়াছে এরূপ ভাবা উচিত।

ক্রীনীখনে কুচ

যৎকালে এই সকল বীরাঙ্গনা গ্রেপ্তার হইবার জন্য নানাপ্রকারের চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইলেন না, তখন তাঁহারা ১০ই অক্টোবর তথা হইতে চার্লিষ্টনে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। ডোহান্সবর্গের সুপ্রসিদ্ধ নেতা মিঃ অস্বী নাইডু ইহাদের সঙ্গে গমন করেন। ইহারা ক্রীনীখনের ব্যবসাদারগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ব্যবসাদারগণ ইহাদের সকল প্রকারে সহায়তা করেন। এইরূপ ঠিক হয় যে, যে গ্রামে সত্যাগ্রহিগণ গ্রেপ্তার হইবার জন্য গমন করিবেন, সেই গ্রামের প্রবাসিগণকে তাঁহাদের ভোজনাচ্ছাদন ও রেলের মাশুল প্রদান করিতে হইবে। যদি তথাকার অধিবাসিগণ ইহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে সত্যাগ্রহিগণ পায়ে হাঁটিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। ক্রীনীখনের অধিবাসীরা, সত্যাগ্রহী বীরাঙ্গনাগণকে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহারা

যখন বিদায় হন তখন গাড়ীভাড়া প্রভৃতি প্রদান করেন।

জমিষ্টনে সত্যাগ্রহ

৩রা অক্টোবর জমিষ্টন হইতে ছয়জন স্ত্রীলোক ও ২০ জন পুরুষ গ্রেপ্তার হইবার জন্য বহির্গত হন। সকলের হাতে ফল ও ফুল প্রভৃতির টোকরি ছিল। ইহারা সমস্ত সহর ফেরি করিয়া বেড়ান, কিন্তু গ্রেপ্তার না হওয়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করেন। ষ্টেশন মাষ্টার ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গই হউক অথবা শ্বেতাঙ্গই হউক, কেহই এখানে বিনা পরওয়ানায় ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। ষ্টেশন মাষ্টারের কথায় তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান না করিয়া টেলিফোন দ্বারা মিঃ গান্ধির নিকট সম্মতি প্রার্থনা করেন। মিঃ গান্ধি উত্তর দেন যে যদি তাঁহারা বিনা বাধা হাঙ্গামায় গ্রেপ্তার হইতে পারেন তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। মিঃ গান্ধির এই সম্মতি অনুযায়ী তাঁহারা প্লাটফরমের উপর খাড়া রহেন। নিরুপায় হইয়া ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। ইহাদের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া জমিষ্টনে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেবল ছয় ঘণ্টাকাল হাজতে রাখিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সিপাহীর উপর আদেশ প্রদত্ত হয়। হতাশ অন্তরে সত্যাগ্রহীরা আপন আপন গৃহে চলিয়া যান। এই বিষয়ে 'রেড ডেলি মেল' লিখিয়াছিলেন যে, জমিষ্টনের ভারতবাসীর জন্য জেলে স্থানাভাব হইয়াছে। 'ট্রান্সভাল লীডার' লিখেন যে ভারতবাসী এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সকল সত্যাগ্রহিগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।—মিসেস বন্ধু, মিসেস নন্দন, মিসেস মাতাবদন, মিসেস ষষ্ঠষর, মিসেস মহাবীর ও মিসেস বিহারী প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ; ভবানী-দয়াল, বাবু লালবাহাদুর সিংহ, পূজারী গোলাব দাস, ত্রিলোকী সিংহ, রঘুবর, গয়াদীন মহারাজ, উমরাও সিংহ, শিবপ্রসাদ, রামনারায়ণ ওলেহারিয়া প্রভৃতি পুরুষগণ। জমিষ্টনে নিরাশ হইয়া ভবানীদয়াল প্রভৃতি ৭ জন সত্যাগ্রহী ফ্রীনীষ্টনের কুচে সম্মিলিত হন।

বালকরষ্টে প্রস্থান

এই ১১ জন স্ত্রী ও ৮ জন পুরুষের দল নেটালের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। বালকরষ্টের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা নেটালে প্রবেশ করিবার অধিকারপত্র দেখিতে চাহেন। সনন্দ না দেখানর জন্য সকলকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ঐ রাত্রির জন্য আটকাইয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন দুই প্রহরের সময় সকলকে ডাকিয়া রাজস্ব সচিবের তার পড়িয়া শুনান হয়। তারের মর্ম্ম এই যে, গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহেন না, ইহারা যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। রাত্রিতে সত্যাগ্রহীরা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট খাবার ও কম্বল প্রার্থনা করেন। কম্বল না দিয়া তাঁহাদিগকে বিলাতী রুটী খাইবার জন্য দেওয়া হয়। দারুণ শীতে অতিশয় কষ্টের সহিত তাঁহাদের রাত্রি অতিবাহিত হয়।

দ্বিতীয় দিন গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সত্যাগ্রহিগণ নিরাশ হন এবং তথা হইতে চার্লিষ্টনে গমন করেন আর ঐ রাত্রি মিঃ বলী ভাইয়ের ঘরে অতি-বাহিত করেন। তৃতীয় দিন চার্লিষ্টন হইতে নিউকাসেলে রওনা হন। নিউকাসেলের ষ্টেশনে সত্যাগ্রহিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারতবাসিগণ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া-

ছিলেন। যখন ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত হয়, তখন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ষ্টেশন নিনাদিত হইতে থাকে। সত্যাগ্রহিগণকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে পূর্ব্ব হইতে কয়েক খানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা গাড়ীতে না গিয়া পায়ে চলিতে থাকেন ও তথায় মিঃ ডি, লাজরসের গৃহে অতিথি হন।

বালকরষ্টে সত্যাগ্রহিগণের জেল

মেরিৎসবর্গের মিঃ গান্ধসিংহ, মিঃ মতিলাল, মিঃ ঠুঠাপ্রেমজী পটেল ও মিঃ ত্রিলোক নাথ প্রভৃতি বিনা সনদে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার জন্য তিন তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। টোংগাটের মিঃ গোকুল দাস গান্ধি, মিঃ নাইডু, মিঃ পেরুমল, মিঃ জানকী, মিঃ সূর্য্যপাল সিংহ ও মিঃ আব্দুলকে ৬ই জানুয়ারী এবং ভেন হাউজরের মিঃ রামরত্ন মহারাজ, মিঃ লক্ষ্মণ ও মোহনকে ১০ই জানুয়ারী ট্রান্সভালে প্রবেশ করার অপরাধে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। মিসেস লেখ মহতাব, তাঁহার মাতা ও পরিচারিকা জেলে যাইবার জন্য বালকরষ্টে আগমন করেন। এই স্থানে গভর্ণমেণ্ট এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন। মিসেস লেখ মহতাবকে জোরে ধাক্কা দিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইতে চাহিলে তিনি কিছুতেই ছাপ প্রদান করেন না। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট এই তিন জনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবার দণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু ইহারা পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট তিন জনের প্রত্যেককে তিন তিন মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেন। এই প্রথম মুসলমান মহিলা যাঁহারা সত্যাগ্রহের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিলেন। এই তিনজন ছাড়া আর অন্য কোন মুসলমান মহিলা জেলে গমন করেন নাই। এজন্য মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে মিসেস লেখ মহতাবের আসন সর্ব্ব প্রথমে।

নিউকাস্‌লে বিরাটসভা

১৮ই অক্টোবর 'নেটাল ইষ্টনেস্' নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, ১৫ই অক্টোবরে নিউকাস্‌লে একটি বিরাট সভা হয়, মিঃ সীদাত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ রবিন্সন প্রভৃতি ইউরোপীয়ান সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ অলী নাইডু ভারতবাসিগণের উপর কৃত অত্যাচারের বর্ণন করেন। এই অত্যাচারকে পদদলিত করিয়া পেষণ করিবার জন্য সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের আবশ্যকতা বক্তৃতাতে বিশদরূপে বলা হয়। ইহার পরে আর্য্যাবর্ত্তের সহকারী সম্পাদক মিঃ ভবানীদয়াল অতিশয় ওজস্বিনী ভাষায় সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন। মিঃ ইকরহীম, মিঃ সীদাত, মিঃ লাজরস, মিসেস নাইডু, মিসেস মুবগণ, মিসেস পি, কে, নাইডু প্রভৃতি পুরুষ ও মহিলাগণ সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের সমর্থন করেন। ঐ দিন তথায় সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার পরিচালক নিযুক্ত হন। সভাপতি—মিঃ আই, সীদাত, সেক্রেটারী মিঃ ইকরহীম, কোষাধ্যক্ষ মিঃ আহমদ, অন্যান্য সদস্য—মিঃ লাজরস, মিঃ রেটী, মিঃ পিল্লে, মিঃ চৌধী, মিঃ করিম, মিঃ খাকী, মিঃ সুলেমান ও মিঃ সীদাত দাউদজী। সভাস্থলে কয়েকজন ভারতীয় জেলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ধর্ম্মঘট আরম্ভ

১৪ই অক্টোবর মিঃ অলী নাইডু ও ভবানী দয়াল প্রভৃতি পুরুষগণ ১১জন মহিলা সমভি-

যাহাতে নিউক্যাসলের রেলওয়ে ওয়ার্কসে গমন করেন। মিঃ অধী নাইডু তামিল ভাষাতে ও মিঃ ভবানী দয়াল হিন্দি ভাষাতে ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময় কোন নিরপেক্ষ লোক ষ্টেশন মাষ্টারকে জানায় যে সত্যাগ্রহী লোকগণ আপনার মজুরদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছে। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখানে কি করিতেছেন? সত্যাগ্রহিগণ উত্তর দেন, আমরা আপনার মজুরগণকে এই উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট তোমাদের উপর ধার্য্য তিন পাউণ্ড কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। ষ্টেশন মাষ্টার বলেন আপনাদের উপর গণ্ডগোল বাধাইবার অভিযোগ আনীত হইবে। সত্যাগ্রহীরা বলেন, আপনার যেরূপ খুসী আমাদের উপর অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন। আমরা মজুরগণের উপর কিছু জোরজবরদস্তি করিতেছি না, যাহারা কাজ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছি না, কিন্তু সকলকেই ধর্ম্মঘট করিবার পরামর্শ প্রদান করিতেছি আর এই পরামর্শ অবশ্যই আমরা প্রদান করিব। অবশেষে ষ্টেশন মাষ্টার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকিয়া মিঃ অধী নাইডু, মিঃ ভবানী দয়াল ও রাম নারায়ণ প্রভৃতি নেতাগণকে গ্রেপ্তার করান। অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীগণ আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করাইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল মনোরথ হন। স্ত্রীগণ পুলিশদিগের সাক্ষাতে উচ্চৈঃস্বরে মজুরদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার উপদেশ প্রদান করেন ও পুলিশকে বলেন, যেমন পুরুষগণ সকলকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন সেইরূপ আমরাও সকলকে উত্তেজিত করিতেছি। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পুলিশ কেবল ৩ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, আর সমস্ত রাত্রি তাঁহাদিগকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখে। দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ইহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহারা পূর্ব্বের কথার পুনরুক্তি করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত শুনিয়া প্রথম অভিযোগ রহিত করিয়া দিয়া আদেশে রেলওয়ে ওয়ার্কসে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেককে দুই দুই পাউণ্ড করিয়া জরিমানা করেন। সত্যাগ্রহিগণের নিকট টাকা ছিল না এজন্য তাঁহারা উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া কারাবাস দণ্ড প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, চলিয়া যাও, যদি আমার জরিমানা আদায় করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে উহা আদায় করিয়া লইব। ইহার পর সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আদালতের বাহিরে দর্শকগণের অতিশয় ভিড় হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে ভারতীয় মজুরগণের ধর্ম্মঘটের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

ধর্ম্ম ঘটের বৃদ্ধি

এই সকল সত্যাগ্রহিগণ মুক্ত হইয়াও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া 'করেনী কোলরী' নামক স্থানে গমন করেন। তথায় ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য মিঃ অধী নাইডু ও ভবানী দয়াল তামিল ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রভাবে উক্ত কয়লার খনির প্রায় শতাধিক মজুর ধর্ম্মঘট

করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে রাত্রি ১০টার সময় মিঃ কেলনবেক, মিঃ অস্বী নাইডু, ও ভবানী দয়াল বৈলঙ্কীর কয়লার খনিতে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও দুই লোক টেলিফোন দ্বারা কয়লার খনির অধ্যক্ষকে সংবাদ দেয় যে, আপনার মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করাইবার জন্য কয়েকজন সত্যাগ্রহী নেতা তথায় গমন করিতেছে, আপনি সাবধান থাকিবেন। উক্ত খনির অধ্যক্ষ সত্যাগ্রহীদিগকে নানারূপ কুবাক্য বলিয়া চাবুক দ্বারা প্রহারের ভয় দেখান। উক্ত রাত্রিতে তাঁহারা নিউকাসলে ফিরিয়া আসেন। মিঃ কেলনবেক জোহান্সবর্গ রওনা হন আর মিঃ হেনরী পোলক ধর্ম্মঘটকারিগণের সাহায্যের জন্য নিউকাসলে আসিয়া উপস্থিত হন। নিউকাসলে পুরা দমে ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। হাসপাতাল, লৌওয়ী, হোটেল ও খনির মজুরগণ এমন কি মেথর পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মঘট করে। দলে দলে ধর্ম্মঘটকারী নরনারী নিউকাসলের রাস্তার উপর বেড়াইতে থাকে। সত্যাগ্রহ এক্ষণে ধর্ম্মঘটের রূপ ধারণ করে। গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘটকারিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। শ্বেতাঙ্গ অধিপতিগণের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকেনা। অনেক মজুরকে চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। বৈলঙ্কীর খনিতে একজন মজুরকে জীবিতাবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই সকল কারণে ধর্ম্মঘটের অগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর গভর্ণমেণ্টের আদেশে ভবানী দয়াল গ্রেপ্তার হন। ঐ দিন ইহাদের নামীয় অভিযোগ নিউকাসলের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হয়। স্ত্রী পুরুষে প্রায় তিন চারিশত জন আদালতের চারিদিকে দণ্ডায়মান ছিল। আসামী আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করেন। ভবানী দয়ালের মাথায় টুপি দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টুপি খুলিয়া রাখিতে বলেন। তিনি বলেন মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতির টুপি মাথায় দিয়া আদালত গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ভবানী দয়াল উত্তরে বলেন, আমি জাতিতে হিন্দু, আমি জাতীয় টুপিই পরিধান করিয়াছি, সুতরাং এ টুপি কিছুতেই খুলিতে পারি না। এই জবাব শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আর কিছু বলেন না। ভবানী দয়াল আপনার জবান বন্দীতে বলেন, যে সময় আমাদের পূজনীয় নেতা মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে এদেশে আসেন, তখন জেনেরেল বোথা, জেনেরেল স্মটস্ ও মিঃ কিণর তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিয়া দিবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। এজন্য আমি ভারতীয় মজুরগণকে উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড খুনী কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা ধর্ম্মঘট বাহাল রাখ। মিঃ শিবপ্রসাদও এইরূপ জবানবন্দী করেন। ইহার পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হেড্ কনষ্টেবল প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সকলেই বলেন যে, ভবানী দয়াল সত্যাগ্রহিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নেতা, সকলেই জানে যে, ইহার জন্যই আজ নিউকাসলে এইরূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এই গুরুতর অপরাধের জন্য ইহাদের কঠোর দণ্ড পাওয়া উচিত। পরিশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার লিখিত রায় পড়িয়া শুনান। তাহার সারাংশ

এই,—"তোমরা যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা তোমাদের সিদ্ধ হইবে না। তোমরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু প্রকারান্তরে তোমরা ব্যবসায়িগণের ব্যবসা নষ্ট করিতেছ। তোমাদের উপদেশ শুনিয়া কত হতভাগ্য স্ত্রী ও পুরুষ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, উহারা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে। ইহার দায়ী তোমাদিগকেই হইতে হইবে। আজ পর্য্যন্তও তোমাদের জন্য কোনও কঠোর আইন প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে তাহা রচিত হইবে। এই অপরাধের জন্য আমি তোমাদের প্রত্যেককে তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করিতেছি।" দণ্ডের কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহাস্য বদনে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যেমন এই অভিযুক্ত-ব্যক্তিগণকে আদালত হইতে লইয়া যাওয়া হয় অমনি মিঃ গুলাব দাস, ও মিঃ রঘুবর আসিয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেকাওয়নওকে বলেন যে, আমরা উভয়েই সত্যাগ্রহী আপনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করুন! তাঁহাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিয়া তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া নিউকাসেলের শত শত ধর্ম্মঘটকারীদের দ্বারা জেল পরিপূর্ণ হয়। ২০শে অক্টোবর স্থানাভাব বশতঃ সমস্ত সত্যাগ্রহিগণকে তথা হইতে মেরিৎসবর্গের জেলে প্রেরণ করা হয়। সত্যাগ্রহীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিউকাসেলের ষ্টেসনোপরি মিঃ পোলক প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম্মঘটের প্রভাব

নিউকাস্‌লে ধর্ম্মঘট খুব প্রবলাকার ধারণ করে। লেভিস্মিথ ও ডার্ভীপর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের উত্তাপ অনুভূত হয়। ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০ জন ধর্ম্মঘটের ফলে বন্দী হয়। ট্রান্সভালের ১১ জন বীরাঙ্গনা ধর্ম্মঘট বিস্তার করিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করেন এজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। এই বীরাঙ্গনাগণ জবান-বন্দীতে বলেন যে, আমরা ট্রান্সভাল হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভারতীয় মজুরগণকে আমরা ইহাই উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিয়া দেন সে পর্য্যন্ত তোমরা কোনও কাজ করিতে যাইও না। আমরা মজুরদের উপর কোনরূপ বল প্রয়োগ করিতেছি না, কেবল উহাদিগকে বুঝাইয়া কাজ পরিত্যাগ করাইতেছি ম্যাজিষ্ট্রেট সমুদয় শুনিয়া প্রত্যেককে তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ পোলক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের আদেশ শুনাইবার সময় মহিলাগণের উপর যেরূপ খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেন, সভ্যজনের পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। এই বীরাঙ্গনাগণ জেলের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সুখী হন এবং আনন্দের সহিত জেলে গমন করেন। জেলে যাইবার সময় এই মহিলাগণ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীর নিকট বলিয়া পাঠান যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করেন, সে পর্য্যন্ত লড়াই যেন বন্ধ না হয়। যে সকল বীরাঙ্গনা নিউকাসেলে কঠোরদণ্ড প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নাম যথা,—(১) মিসেস ভবানী দয়াল, (২) মিসেস অমী নায়ডু (৩) মিসেস এন, পিল্লে, (৪) মিসেস কে, এম, পিল্লে (৫) মিসেস এ, পি, নায়ডু (৬) মিসেস কে, সি, পিল্লে (৭) মিসেস পি,

যে, নাইডু, (৮) মিসেস এন, সি, পিল্লে, (৯) মিসেস আর এ, মুদিরাম, (১০) মিসেস এম পিল্লে (১১) মিসেস এম, বি, পিল্লে। দুইজন বালক বালিকা যাহারা আপনার মাতার সহিত জেলে গমন করে তাহাদের নাম, বালিকা—মিসি শেষুমা নাইডু, মিসি রাজুমা পিল্লে ও আঙ্গল পিল্লে। বালক—রামদত্ত শর্ম্মা, সভাপতি পিল্লে ও বেলু নাইডু।

এ সম্বন্ধে ২৯শে অক্টোবরের 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' গুজরাটী ভাষায় 'সাথাস ঔরতো' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। উহার সারাংশ এই, ট্রান্সভালের বীরনারীগণ বহুদিন হইতে জেলে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে নিউকাসলে ধূমধামের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া জেলে উপস্থিত হইয়াছেন। এ খবর আমরা গত সপ্তাহে প্রদান করিয়াছি। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, এই বীরাঙ্গনাগণ স্ত্রীনীযনের সীমানাতে গ্রেপ্তার হইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টাতে সফলকাম না হইয়া গ্রেপ্তার হইবার জন্য ফেরীওয়ালীর বেশে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এখানেও গ্রেপ্তার হইবার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া বালকরষ্টের সীমানাতে গমন করেন, কিন্তু সেখানেও গ্রেপ্তার না হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত নিউকাসল ও তাহার চতুর্দ্দিকে ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার উপদেশ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের উপদেশ ভারতীয় মজুরগণের উপর মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, চারিদিকে ধর্ম্মঘটের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম হইতেই ইহাদের উপর গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টি ছিল। এই বীরাঙ্গনাগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সত্যাগ্রহিগণের ভরপুর

নিউকাসলের ব্রহ্মমোহন, ভাগীরথী, রামধেলাওন, কক্কা, স্বামবর, রামপ্রকাশ, গোকুল, চীনাপন, মুন্নু ও শেখফরীদ; ধরবনের হরস্বামী পিল্লে, রামকৃষ্ণ, পণ্ডাইয়া ও ইয়েগনী সবেস টিপে, চার্লিষ্টনের রামস্বামী গবন্ধর ও পুনস্বামীকে ২৪শে অক্টোবর তারিখে ট্রান্সভালের সীমানায় প্রবেশ করিবার অপরাধে তিন তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। মেরিৎসবর্গের হনুমন্ত বেকট স্বামী, ধরবন ও নিউকাস্‌লের ডোমনীক্লেন্সীল, কন্দাস্বামী, বেজীবল মুডলী, পেন মথন মৌরাস্বামী, কোকফ মেরীয়ম ও গয়াদীন মহারাজ; জোহান্সবর্গের সুব্রহ্মণি পিল্লে, অনামলে, বীরাক্লেন্সীস ও মণিলাল গান্ধীকে ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। যখন মিঃ গান্ধির পুত্র শ্রীমান্ মণিলাল গান্ধি দেখিলেন যে, আমি এই বেশে থাকিলে গ্রেপ্তার হইব না, তখন তিনি মিরজাই, ধুতি, চাদর ও পাগড়ী পরিধান করিয়া ভারতীয় পোষাকে বালকরষ্টে আসিয়া উপস্থিত হন। ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা ইহার এই নূতন পোষাক দেখিয়া চিনিতে না পারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ প্রাণজী দেশাই নিউকাসলের ভারতীয় ধর্ম্মঘটকারিগণের সহায়তা করার অপরাধে ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। মিঃ লালমহম্মদ ও মিঃ পিল্লে এইরূপে দণ্ডিত হন। ডেন ষ্টাউবরের ৩৪ জনকে

ধর্ম্মঘট করার অপরাধে ৬ই দুই মাসের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। নিউকাসেলের ২০০ জন মজুরকে লইয়া মিঃ অস্বী নাহড়ু ট্রান্সভালের সীমানাতে আসিয়া উপস্থিত হন। বৈলজীর কয়লার খনির মজুর সুন্দর ও যন্ত্রের প্রত্যেককে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সুন্দরের বয়স ১৭ মাত্র। ইহাদের মধ্যেও একদল জেলে যাইবার জন্য রওনা হয়।

এই সময়ে সুযোগে শ্রীযুত গান্ধি রাজস্ব সচিব জেনেরল স্মটস্‌কে পত্র লিখিয়া জানান যে, "যদি আপনি ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ভারতীয় মজুরগণকে পুনরায় কার্য্যে যোগ দিবার পরামর্শ প্রদান করি।" জেনেরল স্মটস ইহার কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। নিউকাসেলে ১৬০ জন ভারতীয় মজুর কার্য্যে না যাওয়ার অপরাধে ছয় ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। নিউকাসল হইতে যখন ভারতীয় মজুরগণ জেলে যাইবার অভিপ্রায়ে বালকরষ্টে আসিতে থাকে, তখন দুইটী বালকের মৃত্যু হয়। অত্যধিক শীতের জন্য একটি বালকের মৃত্যু হয় ও অপরটি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। প্রথম বালক মরিবার সময় তাহার মাতাকে বলে যে, "মা যে মরিতে যাইতেছে, তার জন্য কেন দুঃখ করিতেছ, যে জীবিত আছে তার জন্য চেষ্টা কর।" বালকের বাক্য কি মর্ম্মস্পর্শী! ভারতীয় বালক ব্যতীত অন্য কোন দেশের বালকে এইরূপ সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। দেশসেবার জন্য দুইটি বালকের আত্মসমর্পণ দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান রহিবে। নিউকাসল, ডাণ্ডী, লেডিস্মিথ ও চার্লিষ্টন প্রভৃতি স্থানে শত শত ভারতীয় মজুর গ্রেপ্তার হইয়া জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা এক্ষণে কঠিন। যখন জেলে স্থান কুলাইয়া উঠিল না, তখন গভর্ণমেণ্ট মজুর গণের ডিপো'কে জেলে পরিণত করেন। ঐ জেলে বেচারা ধর্ম্মঘটকারিগণ কয়েদ হইতে থাকে ও তাহাদিগকে লইয়া গিয়া কয়লার খনিতে কাজ করান হয়।

লোকমান্য গান্ধির গ্রেপ্তার

৬ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি ৪০০০ চারি হাজার মজুরকে ট্রান্সভালের সীমানা পার করাইতে থাকেন। ঐ সময়ের দৃশ্য বড়ই করুণাব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে ভারতবাসী বালকবৃদ্ধের সীমানাতে প্রবেশ করিতে থাকে, স্ত্রীগণ আপনাদের ছোট ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া সীমানা পার হইতেছে এবং পুরুষগণ আপনাদের খাইবার জিনিস মাথায় করিয়া সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মনে হইতেছে, যেন একটি বৃহৎ সেনাদল কোন দেশ বিজয় করিবার জন্য সানন্দে গমন করিতেছে। সেনাপতি মিঃ গান্ধি উহাদিগকে প্রবল সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে চলিবার উপদেশ প্রদান করিতে করিতে গমন করিতেছেন। স্ত্রীগণকে এই যাত্রাতে লওয়া হইবে না এইরূপ প্রথমে মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দেশ সেবায় প্রবল আগ্রহ দেখিয়া বাধা দেওয়া হয় নাই। ঐ সময় ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যে, এই সব স্ত্রীগণের শরীরে সীতা ও গার্গীর পবিত্র রক্ত-স্রোত বহিতেছে। আনন্দধ্বনি ও বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে এই সেনাদল ট্রান্সভালের সীমানায় প্রবেশ করে, ও বালকবৃন্দ নগরের বাহিরে যাইয়া আপনাদের আড্ডা গাড়ে। পুলিস ইহাদের কিছুই

করিতে পারে না। দ্বিতীয় একদল নিউ-কাসেলের দিক হইতে আসে, চার্লিষ্টন নগরে ইহাদের আড্ডা ছিল। মিঃ কেলনবেক এই দলকে সঞ্চালন করিবার জন্য চার্লিষ্টনে গমন করেন। মিঃ গান্ধি, প্রথম দলের সহিত ছিলেন, ঐ দলে একটি লোক ভিড়ে চাপা পড়িয়া মারা যায়। ট্রান্সভালের সীমানাতে ৫০০০ ভারতবাসী একত্রিত হয়। শ্বেতাঙ্গগণ ইহাদের সহিষ্ণুতা, ইহাদের সাহস, ও ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন ও আপনাদের হৃদয়ের সহানুভূতি জানাইতে থাকেন। ৬ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি পামফোর্ড নামক স্থানে গ্রেপ্তার হন ও অবশিষ্ট দলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আপনাদের কুচ জারী রাখে। দ্বিতীয় দিন মিঃ গান্ধিকে বালফণ্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে হাজির করা হয়। তাঁহার উপর অনধিকারী লোককে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনীত হয়। মিঃ গান্ধি জামিনের জন্য প্রার্থনা করেন, সরকারী উকিলের নানারূপ আপত্তির পর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৫০ পাউণ্ড (৭৫০ টাকার) জামিনে খালাস দেন। মহাত্মা গান্ধি তৎক্ষণাৎ আপনার যে দল কুচ করিয়া যাইতেছিল তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। প্রিটোরিয়া হইতে একটি টেলি-গ্রামে প্রকাশিত হয় যে, গভর্ণমেণ্ট এই দলকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের বিক্ষোভের কারণ হইবেন না। মিঃ গান্ধি গ্রেপ্তার হইয়া গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে একটি তার প্রেরণ করেন—সত্যাগ্রহের প্রধান প্রচারককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। কিন্তু এই সঙ্গে আমি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই নির্দ্দয়তা ব্যঞ্জক। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই দলে ১২২ জন স্ত্রীলোক ও ৫০টী বালক রহিয়াছে। ইহাদিগকে কেবল মাত্র জীবন রক্ষার জন্য অল্প অল্প খাইতে দেওয়া হইতেছে। এই অবস্থাতে গভর্ণমেণ্ট আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ন্যায় ও দয়ার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। বিগত রাত্রিতে আমাকে গ্রেপ্তার করা হই-য়াছে, ঐ সময় আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এজন্য হয়ত উহারা অতিশয় রাগান্বিত হইবে। আমি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে উক্ত দলে সম্মিলিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করুন, কিম্বা গভর্ণমেণ্ট সকলকে রেল গাড়ীতে চড়াইয়া 'ট্রান্সভাল ফার্ম্মে' পৌঁছাইয়া দেন এবং ঐ সঙ্গে তাহাদের ভোজনেরও ব্যবস্থা করুন। যদি ঐ সকল লোকগণের মধ্যে, বিশেষতঃ স্ত্রী ও বালকের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে গভর্ণ-মেণ্টকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে। ৭ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি হাওর টাউনের সমীপে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাকে হাজির করা হয়। মিঃ গান্ধি বিচারের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মিঃ গান্ধি তথা হইতে মুক্ত হইয়া আপনার দলে আসিয়া যোগ দেন। ভাণ্ডীর ম্যাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা লইয়া গ্রেনফন্টাস নামক স্থানে তৃতীয়বার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে ভাণ্ডীতে লইয়া আসা হয়। গান্ধির দলকেও গ্রেপ্তার করিয়া রেলগাড়ীতে বসাইয়া নেটালে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কোনও ভারতবাসী বালকরূপে প্রবেশ করিতে না পায় এই উদ্দেশে তথায় সেনা নিবাস স্থাপন করা হয়। নিউকাসেলের নিকটবর্ত্তী বৈলসীর কয়লার খনিতে একজন ভারতীয় মজুরকে তাহার শ্বেতাঙ্গ মালিক জীবিতাবস্থায় মারিয়া ফেলে। মেকেমাস্ত গান্ধি গ্রেপ্তার হইলে ভারতীয়গণের মধ্যে আন্দোলনের তুফান বহিতে থাকে। মাউন্ট এরকোম, বেকলম, টোঙ্গাট, প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মঘটের আগুন ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠে। হরবনের মিঃ সোরাবজী পাবসী, ও মিঃ মতিলাল দীবান মজুরগণকে কার্য্যে পুনরায় যোগ দিবার জন্য উপদেশ দেন, কিন্তু কেহই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনাদের ধর্ম্মঘট বরাবর বাহাল রাখে।

শ্রীসেবাভিক্ষু জীবন।

জড় ও শক্তিতত্ত্ব

(২১৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ঈথর জড় বা অ-জড় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ?

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে ঈথর অ-জড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কেন না জড়ের যে সকল ধর্ম্ম থাকা চাই, ঈথরের তাহা নাই। জড় ঈথর সম্ভূত—ঈথরের কার্য্য কিন্তু নিজে জড় নহে। পণ্ডিত Dolbear তাঁহার Matter, Ether and Motion নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—"If, then, the ether fills all space, is not atomic in structure, presents no friction to bddies moving through it, and is not subject to the laws of gravitation, it does not seem proper to call it matter," কিন্তু আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিকগণ যদি একটু যুক্তিবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন তাহা হইলে শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহারা কতকটা সতর্ক হইতে পারেন। যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁহারা যাদৃচ্ছিক শব্দপ্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু পরিশেষে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জড়ের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একটা কাল্পনিক পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। তাঁহাদের স্বীকৃত ঈথরে যে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না, সে দোষ ঈথরের নহে, তাঁহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞার। ঐ সংজ্ঞা অতি সঙ্কীর্ণার্থক। কিন্তু পারিভাষিক জড় সংজ্ঞা ঈথরে প্রযোজ্য না হইলেও, চেতনার বিরোধীত্ব প্রযুক্ত ঈথর কেন অচেতন হইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে না; এবং যাহা সচেতন—তাহাই দৃশ্য—প্রতিভাস—সুতরাং জড়, একথা অক্লেশে মনে করা যাইতে পারে। আর ঈথরই বা পারিভাষিক জড় সংজ্ঞার বাহিরে পড়িবে কি প্রকারে? mass বা inertia বিশিষ্টতা যখন অপরাপর বাহ্য দ্রব্যের ন্যায়, ঈথরেও আছে, তখন

ঈথর অবশ্যই জড়শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব Dolbear যে বলিয়াছেন "it does not seem proper to call it matter," তাহা বিস্ময়জনক। আমি বরং আর একটু সতর্ক হইয়া বলিতে চাই—"it does not seem proper to call it existent."। আমরা পূর্ব্বে যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছি তাহা হইতে ঈথরের অসত্তাই (non-existence) যেন সমর্থিত হয়। অতএব জড়বাদের চরম সীমা শূন্যবাদ। পণ্ডিত Dolbear সেই কথাটি বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন, মনে হয়। প্রত্যয়লব্ধ উপকরণ হইতে নিকৃষ্ট কল্পনা দ্বারা প্রত্যয়গুলির উৎপাদকরূপে আমরা কতকগুলি মূল ধারণার উপনীত হই এবং ঐগুলিতে আত্মসত্তার অধ্যাস করিয়া বাহ্য স্বতন্ত্র বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াই ব্যবহারিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। ঈথর, পরমাণু, তড়িৎ, ঘট, পট, মঠ, প্রভৃতি সমস্তই এই প্রকারে সত্তাশীল। যাহা হউক, ও প্রস্তাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আজ কাল আবার বৈজ্ঞানিক মহলে একটা নূতন সুর আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি রেডিয়ম নামক এক প্রকার ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার গাত্র হইতে নাকি অনবরত তাড়িতকণা অবিরত ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এই তাড়িতকণাগুলির বেগ অতি বেশী। ইহারা জড় পদার্থ কি না তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং ইহাদের ভারীত্ব আছে কি না তাহাও এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহাদের চঞ্চল অবস্থায় থাকা দিবার ও থাকা খাইবার ক্ষমতা আছে, ইহা জানা গিয়াছে। যতক্ষণ এই কণাগুলি স্থির থাকে ততক্ষণ উহাদের জড়ত্ব অর্থাৎ থাক্কা দিবার ও থাক্কা খাইবার ক্ষমতা থাকে না। অত্যন্ত বেগে ছুটিলেই উহাদের জড়ত্ব জন্মে। বেগ যত বেশী হয়, জড়ত্বও তত বাড়িতে থাকে। ইত্যাদি দেখিয়া অনেকে জড়পদার্থের পরমাণুগুলিকে তাড়িৎকণার সংহতি বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন; ইহারা বিবেচনা করেন, এক একটি পরমাণু বহুসংখ্যক তাড়িত কণার ঘূর্ণী। ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ঐ কণাগুলি অত্যন্ত বেগে ঘুরিতেছে তাই উহাদের জড়ত্ব। এই জড়ত্ব যখন উহাদের বেগ সম্ভূত, তখন জড়ের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচার্য্য। ১

উক্ত তাড়িত কণার সহিত ঈথরের সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হইতে পারে ঈথর বস্তুটি তড়িন্ময়; হইতে পারে নিজে তড়িন্ময় না হইলেও উহা হইতে তাড়িত কণা নির্গত হইয়া থাকে। এই তাড়িতকণার ইংরাজী প্রতিশব্দ electrons। ঈথর অখণ্ড বস্তু (continuous medium) এবম্বিধ পদার্থ হইতে তাড়িত কণা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, সে প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজনীয় (there remains the question of the formation of these electrons themselves from a continuous medium)। কিন্তু এ মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এতাবৎ আমরা জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রকার আলোচনা করিলাম তাহা হইতে এইটুকু দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান একটা সৎ

১ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুমহাশয়কৃত 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য।

পদার্থের অন্বেষণ করিতেছে; এবং ঈথরে সেই সৎপদার্থের আভাস পাইতেছে। কিন্তু ঈথর তত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে সেই সৎ পদার্থ কি না তাহা কোন মতে বলা যায় না। উহার পরিণতি শূন্য বাদে (physical nihilism)। এক্ষণে অন্য তত্ত্বের মতবাদটা পরীক্ষা করিতে হইবে। সে তত্ত্বের সিদ্ধান্তে জড়তত্ত্ব শক্তি-তত্ত্বে পর্য্যবসিত। জড়ের স্বরূপ লইয়া, অন্য একদল বৈজ্ঞানিক যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ইহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, যাহাকে জড় বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ বলের অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তাঁহাদের মতে জড়কে বিশ্লেষণ করিলে জড় বলতত্ত্বেই (force) পর্য্যবসিত হয়। ইহারা বলেন যাহাতে আমাদের আজ্ঞাপেশী প্রযুক্ত বলকে (muscular effort) প্রতিরোধ (resist) করে, তাহাই জড়। কিন্তু বলের প্রতিরোধে কেবল বলেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদতিরিক্ত কোন পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। বল দ্বারাই বল প্রতিরুদ্ধ বা প্রতিহত হয়। সুতরাং বলিতে হইবে জড়ের স্বরূপ (essence) বল। জড়ীয় ধর্ম্মগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

১। জড়ের দেশব্যাপ্তি (extension) আছে। কিন্তু দেশব্যাপ্তির অর্থ সেই স্থানে অন্য বস্তুর প্রবেশে বাধা দেওয়া। বস্তু যে পরিমাণে চলিষ্ণু, সেই পরিমাণেই উহা দেশের অংশ বিশেষে প্রবিষ্ট হইতে পারে, বা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

২। প্রতিরোধকতা (resistance)। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৩। কাঠিন্য (hardness)। ইহা অবয়বের মিলন প্রবণতা; সুতরাং বলের বাচক।

৪। গতি (motion) বল প্রয়োগেই জড় গতিশীল হয়।

এই প্রকার বিশ্লেষণে দেখা যায় জড়ের স্বরূপ বল। এই বল নিরপেক্ষে কোন জড় পদার্থই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, ব্যোমকে আমরা কখনও অনুভব করি না। যাহা অনুভবের বিষয় তাহা, উহার ধাক্কা—গতি—বলক্রিয়া। এই ধাক্কা অনুভব করিয়া—গতি দর্শন করিয়া—উহার আধাররূপে যাহা কল্পনা করি তাহাই লৌকিক হিসাবে জড়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ ধাক্কা—গতি প্রভৃতি বলেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। এই বলের ধারণাটাকে বাদ দিয়া আমাদের জড়ত্বের ধারণাই সম্ভবপর নহে।

মহামতি Herbert Spencerএর সিদ্ধান্ত এই প্রকার, তাহা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি। তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত Fiske বলেন—

"Since we cognise any portion of matter only in an aggregate of co-existent positions which offer resistance to our muscular energies, since it is primarily by virtue of such resistance that we distinguish matter from empty space, it follows that our idea of matter is built up of experiences of force, and that the indestructible element in matter is its resisting power or the force which it exerts."[২]

২ Cosmic Philosophy vol. I, p. 282.

বিখ্যাত পণ্ডিত Faraday ও Boscovich প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জড়কে এই ভাবে বলতত্ত্বে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিশারদ Helmholtz বলেন—

"It is manifest that when applied to nature the conceptions of matter and energy are not to be separated. Pure matter would for the rest of nature be a thing of indifference, since it would never determine any change in this or in our senses. Pure energy would be something that ought to exist and yet again ought not to exist, for the existent we call matter..... Both conceptions are abstractions from the actual formed in the same way; we can in truth perceive matter only through its energies, never in itself." ৩

Helmholtzএর কথায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি ব্যতীত জড় আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তবে Helmholtz শক্তির অতিরিক্ত একটা জড়ের সত্তায় অপ্রত্যয় করিতেছেন না। কেন যে করিতেছেন না তাহার কোন কারণও বুঝা যাইতেছে না। ব্যবহারের অনুরোধে কি সহজাত সংস্কারের প্রেরণায়—তাহা স্পষ্টতঃ তিনি বলেন নাই। কিন্তু শক্তি ব্যতীত যদি জড়কে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তায় অস্বীকার যে একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার তাহা ত মনে হয় না।

অধ্যাপক Tait মহোদয়ও শক্তি ও জড়ের দ্বৈত সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শক্তিকে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে তাহার ভারে জড় একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়াছে। তিনি জড়কে শক্তির আধাররূপে কল্পনা করেন। অথচ এই বিশুদ্ধ আধারের ধারণা যে হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। আধারের সত্তাই আধেয়সময়, একথা তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে জড় যে শক্তির আধার, এ প্রকার ধারণার কোন মূল দেখা যায় না। আধারকে আধেয় হইতে পৃথক ভাবে না জানিলে একটিকে আধার ও একটিকে আধেয় রূপে কি প্রকারে জানা যাইবে? শক্তি লইয়াই আমাদের কারবার। শক্তিই বাহ্য জগতের উপাদান বলিয়া গণ্য; জড়ের নাম উল্লেখ না করিয়া, ইঁহাদেরই মতে, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির প্রণালী ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এ স্থলে কাল্পনিক একটা সত্তার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু বলের কথা আরম্ভ করিয়া শক্তির কথা আনিয়া ফেলিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা হয় ত পড়িয়া মনে মনে হাসিবেন। ভাবিবেন লেখকের বল ও শক্তির পার্থক্যজ্ঞান নাই। উভয়কে একত্র মিশাইয়া একটা গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। বিজ্ঞান যাহাকে শক্তি বলে তাহা energy অর্থাৎ কার্য্য করিবার ক্ষমতা। বল(force) অন্যবিধ পদার্থ। একথা আর করিয়া লেখক অবৈজ্ঞানিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

কথাটা ঠিক। তবে লেখক বৈজ্ঞানিক নহেন, দার্শনিকও নহেন, সুতরাং তাঁহার এ প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। তবে মূল কথাটায়

৩ Introduction to his Essay on the 'Conservation of Energy'

বিশেষ গোল হয় নাই বোধ হয়। হয় জড়কে বলে পর্য্যবসিত করা হউক, না হয় শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হউক। জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা ইহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত সেইটুকুই আমার দেখাইবার ইচ্ছা। পারিভাষিক হিসাবে এখানে শক্তি ও বল ভিন্ন হইলেও বস্তুগত্যা ভিন্ন হইতেছে না। Dynamics এর নিকট বলেরও স্বাতন্ত্র্য নাই; সেখানে উহা গতির উৎপাদক ও নিবর্ত্তকরূপে পরিকল্পিত হয় নাই। অনুভবের দিক দিয়া দেখিলে শক্তি ও বলের বৈজ্ঞানিক প্রভেদ স্বীকার্য্য কি না সে কথাটাও বিচার্য্য। শক্তি বা বল ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু নহে not a datum of sensation, বুদ্ধি পরিকল্পিত সামান্যভাব মাত্র (a mere concept)। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই ভাবটি গতির—বিকৃতির, সম্ভাবনা মাত্র (a mere potentiality of changes) পর্য্যবসানযোগ্য, কিন্তু এই সম্ভাবনা মাত্রকেই বাস্তব সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুকূল চিন্তা কুণ্ঠিত হয়। সে যাহা হউক। যে সকল বৈজ্ঞানিকের কথা বলিতেছিলাম তাঁহারা এই বল বা শক্তিকেই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেন। তাঁহাদের মতে যাহা কিছু দেখা শুনা যায় এই বল বা শক্তি তাহার মূল।

অপর সম্প্রদায় বল বা শক্তি উভয়কেই উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের মতে জগতে যাহা কিছু অনুভবের বিষয় যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য—সমস্তই গতি—স্পন্দ—চাঞ্চল্য। যাহাকে শক্তি বা জড় বলা হয়, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নহে। তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কেবল গতির সহিত। Romanes বলেন—"All our knowledge of the actual world is a knowledge of motion. For all the forms of energy have now been proved to be but modes of motion; and even matter, if not in its ultimate constitution, at all events is known to us only as changes of motion all that we perceive in what we call matter is change in modes of motion. [৪]

এমন কি Pure molar and molecular mechanics এর প্রধান লক্ষ্যই প্রকৃতি রাজ্যের বাস্তব ও কাল্পনিক গতির বর্ণনা করা। জড়ের রহস্য উদ্ঘাটন বা কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণ করা ইহাদের অবান্তর উদ্দেশ্য। এই প্রকার গবেষণার পরিণতি গতিবাদে—অনুভূয়মান গতিতত্ত্বে। এই হিসাবে অনুভূয়মান গতি ব্যতীত ও গতির রূপান্তর ব্যতীত দুনিয়ায় আর কোন বস্তু নাই। উত্তাপ এক প্রকার গতি (a mode of motion); স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) এক প্রকার গতি; আলোক এক প্রকার গতি; চৌম্বক শক্তি এক প্রকার গতি; এমন কি বস্তুমাত্রা (mass) পরিণামে, একটা অনির্ব্বাচ্য পদার্থের এক প্রকার গতিতেই গিয়া দাঁড়ায়—যে পদার্থটি না কঠিন, না তরল না বায়বীয় না পিণ্ড, না পিণ্ডসমষ্টি, না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না নিষ্পন্দ (a mode of motion of something that is neither solid nor liquid nor gas, that is neither itself a body nor an aggregate of bodies, that is not phenomenal and must not be nominal—Ward.)

৪ Mind and Motion and Monism.—p. 23.

উক্ত মতবাদটিকে যুক্তির অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিতে গেলে, উহা শূন্যবাদে না হয় আত্মবাদে পর্য্যবসিত হয়। যদি গতি বা স্পন্দ বা পরিবর্ত্তনকে কোন বস্তুর গতি, স্পন্দ বা পরিবর্ত্তনরূপে ধারণা করা না যায় তবে গতিকে—স্পন্দকে—পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন-রূপেই ধারণা করা যায় না। অপরিবর্ত্তনীয় কূটস্থ কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ও তুলনা ব্যতীত পরিবর্ত্তনের বোধই সম্ভব। সুতরাং এই গতির মূলে এই পরিবর্ত্তন রাশির ভিত্তি স্বরূপ যদি একটা স্থায়ী কিছু না থাকে—যাহা এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যেই স্থির অপরিবর্ত্তনশীল—তবে গতিজ্ঞান অসম্ভব। এই অপরিবর্ত্তনীয়—স্থির বস্তুটিকে যদি বাহ্যজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করা যায়—তাহা হইলে, গতি থাকিলেও উহা জ্ঞানাতীত—কল্পনাতীত ভাবেই থাকিবে। তখন শূন্য হইতে ইহাকে প্রভেদ করিবার হেতু না থাকায় উহাকে শূন্য-অসৎ বলিয়াই ধরা যাইবে।

আর যদি একটা নিত্য অপরিণামী বস্তুসত্তা বাহিরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জড়—বা গতি প্রভৃতির কোন ভাবেই ধারণা করাই উচিত নহে; কেননা তাহা নিজে জড় বা গতিশীল না হইয়াও আমাদের মনে জড়ত্ব বা গতিবোধের উপকরণ উপস্থাপিত করিতে পারে। গতি বা স্পন্দকে আমার ক্রিয়া বলিয়া—কৃতিত্ব (activity) বলিয়া বুঝিতে পারি, কেননা কৃতিত্ব কাহাকে বলে আত্ম-কৃতিত্ববোধে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। বাহ্যক্রিয়া বা কৃতিত্বকে আত্ম-কৃতিত্বের বোধে ক্রিয়া বা কৃতিত্ব বলিয়া বুঝি। এই আত্মকৃতিত্বের বোধ অপরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত না হইলে, কোথাও ইহার জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। বিচক্ষণ পণ্ডিত Kant বলেন—

"We should not recognise the moving forces of matter, not even through experience, if we were not conscious of our own activity in ourselves, exerting acts of repulsion, approximation &c."

ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এক মহান আত্মতত্ত্বের কর্ত্তৃত্ব (activity) রূপে আমরা জগতের যাবতীয় গতি, স্পন্দ পরিবর্ত্তনকে বুঝিতে পারি। আত্মকৃতিত্ব ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর কৃতিত্ব আমাদের অপরোক্ষ ভাবে জানা নাই। সুতরাং আমাদের কৃতিত্ব যেখানে কল্পনা করিতে পারি না, সেখানে অন্য আত্মার কৃতিত্ব কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য। তাই অনেক দার্শনিক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া-ছেন :—

"জড়স্পন্দ ক্রিয়ায়াং যা শক্তিঃ সা
কর্ত্তৃতাত্মনঃ।"

অতএব গতিবাদ এই হিসাবে আত্মবাদে পর্য্যবসিত, তাহা বুঝা যাইতেছে। বাস্তবিক জড়বাদ, শক্তিবাদ, গতিবাদ, ইত্যাদি বহুবিধ মতবাদের প্রচার দেখিয়া আমার মনে বেদান্তের প্রাচীন ঋষির—

"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"

এই অমূল্য বাক্যটি নিতান্ত সার্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

জড় ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে মতদ্বৈধম্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সমস্বরে জড় ও শক্তির নিত্যতা প্রচার করিয়া থাকেন। আপাততঃ সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যদি

ঈশ্বর হইতে জড়ের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, এবং যদি ঈশ্বরকে জড়ের স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে জড় কি প্রকারে অজ, নিত্য, হ্রাসবৃদ্ধির অতীত, হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জড়ের পরমাণু লক্ষ লক্ষ তাড়িত কণিকার সংহতি মাত্র। এই তাড়িত কণিকাগুলি মূলতঃ বোধ হয় ঈশ্বরের বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে ইঁহাদের মতে সমস্ত জড় বস্তুই অজ ও বিনশ্বর। রাসায়নিকের মূল ভূতগুলিও সুতরাং ঈশ্বরীয় কণিকাতে পর্য্যবসিত হইতেছে। জলকে উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া, ও বাষ্পকে জলে পরিণত করিয়াই জড়ের নিত্যত্ব, ও অজত্ব সপ্রমাণ করা হয় না। আরও নিম্নে, আরও সূক্ষ্মে উপনীত হইতে হইবে। একেবারে মূলে না পৌঁছিলে, জড়ের নিত্যতানিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হঠকারিতা মাত্র।

যাঁহারা জড়ের নিত্যতাবাদী, তাঁহাদের বিশ্বাস রূপান্তরিত জড়ের সমস্ত টুকরাগুলি অবিকল কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে দেখা যাইবে, উহার কিছু মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই, কেবল রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

এই নিত্যতা প্রমাণের মানদণ্ড নিকৃতি। নিকৃতিরও তোলে ঐ রূপান্তরিত বস্তুর পরিমাণ যদি অরূপান্তরিত অবস্থার পরিমাণের সমান হয়, তবেই বুঝিতে হইবে বস্তু উভয় অবস্থায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

এ যুক্তিটি আপাতরমণীয়। সহজেই নির্ভুল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ইহাকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সতর্ক বিচার আবশ্যক।

১। কোন্ দ্রব্যে কতগুলি তাড়িত কণিকা আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে। তাড়িত কণিকার সংখ্যা না জানিলে, রূপান্তরিত অবস্থায় দুই একশত তাড়িত কণিকা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঈথরের আত্মসাৎ হইয়াছে কি না তাহা ঠাহর করা যাইবে না।

২। তাড়িত কণিকা ধরিবার ছুঁইবার জিনিষ নহে যে, তাহাকে গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহাদের গণা পড়া গড় ধরিয়া (average) হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কণিকার হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটিলে, বস্তুর ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি ধরিবার উপায় নাই।

৩। বস্তুর তাড়িত্ব, উহার অবয়ব সংস্থানের ফলে ঘটে কি না; তাপাদির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।[৫]

৪। যে প্রক্রিয়া বশে ঈথর হইতে তাড়িত কণিকা বিগলিত হয়, সেই প্রক্রিয়া বশে, রূপান্তর গ্রহণ কালে, বস্তুর অন্তর্হিত পরমাণুর পরিবর্ত্তে অভিনব তাড়িত কণিকা আসিয়া সেই শূন্যস্থান পূরণ করে কি না, ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যে পরিমাণ তাড়িত-অণু ঈথরে বিলীন হইয়া গেল, সেই পরিমাণ তাড়িতাণু যদি উহার সন্নীর হইতে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, তাহা হইলে, বস্তুর ওজন সমান হইলেও নূতন বস্তুর অভ্যুদয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

৫ অধ্যাপক Tait বলেন—"Weight is an accidental property, connected with the presence of another mass of matter." অধ্যাপক লজ বলেন বস্তুর ওজন অবয়বসংস্থান ও তাপ নিরপেক্ষ কিনা, ঠিক বলা যায় না।

৫। বস্তুর তাত্ত্বিকই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে; এক একটি বস্তু গুণরাশির সমষ্টি মাত্র। এমত স্থলে যদি পনর আনা গুণ বদলাইয়া যাইয়া, কেবল তাত্ত্বিকের মাত্র সাম্য থাকে, তাহা হইলে বস্তু অক্ষিত থাকে কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ একটি বস্তু যদি অন্যান্য সকল গুণেই অপর একটি বস্তুর বিপরীত হইয়া কেবল গুরুত্বে উহার সমতুল হয়, তাহা হইলে উভয় বস্তুর একত্ব প্রতিপাদন করা যায় কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৬। আমাদের ব্যবহারিক গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু জড়ের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার বাহিরে জড় বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহার গণনা না করিয়া, জড় অবিনশ্বর, জড়ের ভাণ্ডার অক্ষয় ইত্যাদি বাক্য প্রযোজ্য কি না বিবেচনা করিতে হইবে।

৭। জড়ের উৎপত্তি যখন প্রমাণসিদ্ধ, উহার ঈথরে বিলয়ও যখন সপ্রমাণ, তখন কি প্রকারে বলা যায়—জড় অজ নিত্য শাশ্বত?

৮। বিশ্বজগতের পরিমাণ (mass) নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়,—ইহার অকাট্য প্রমাণ ও সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে, এই পরিমাণ স্থির ধ্রুব কি না তাহা অবগতির উপায় কি? এবং এই অকাট্য প্রমাণ ও সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে বস্তুমাত্রাকে জড়বস্তু (matter) হইতে বিভিন্ন করিয়া বিচার বা পরীক্ষা করিতে হইবে।

৯। যাহাকে একান্ত সৎ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে তাহা যে জড়-তাত্ত্বিক বিশিষ্ট জড়—হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছু হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত এ সত্য প্রতিপন্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিবৃত্তির জোহাই দিয়াই বস্তুমাত্রার অজত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারিবেনা (when some one shall have shewn that what exists must exist as matter is necessarily ponderable matter, then, but not before, the old maxim *Ex nihils nihil fit* and the appeal to the balance will be relevant to the question).

১০। জড়ের স্বরূপ এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। জড় বাস্তবিক কি জিনিষ—বাস্তবিক উহা শক্তির অতিরিক্ত জড় বলিয়া একটা কিছু কি না সেই বিষয়ই যখন সন্দিগ্ধ, তখন উহার পরিমাণ অচ্যুত, নিত্য, এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি বুঝা দুঃসাধ্য।

১১। দেখিতে হইবে যে বস্তু তুলিত হইবে তাহার পরিমাণ ও যে বস্তুর মাপে তুলিত হইবে তাহার পরিমাণ—এ উভয়ের একটা বিশিষ্ট অনুপাত আছে কি না; যদি উভয়ের পরিমাণ সমান অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে, তাহাদের অনুপাত ঠিকই থাকিবে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও, সেটা ধরা পড়িবে না "(if both these quantities, were to vary, in the same proportion, their ratio, of course, would remain unaffected hence it can afford us evidence of such Variation. We assume however, that our standard is fixed, or what comes to the something *for metrical purpose* that, if there is any variation, it is a uniform variation through out the universe)."

১২। একটি সরোবরের জলরাশি সর্ব্বদাই

যদি সমতল রেখা নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে ঐ জলরাশির পরিমাণ স্থির। ইহা যদি সত্য কথা বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে আমাদের দৃশ্য জগতের উপরিভাগের বস্তুরাশি সর্ব্বদাই সমান বলিয়া বস্তুরাশির ক্ষয় নাই অনুমান করা কতদূর সত্য, তাহাও বিচার্য্য।

১৩। জড় কিম্বা শক্তির অক্ষয়ত্ব পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য; উহার স্বতঃসিদ্ধতা নাই; সুতরাং উহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

জড়ের অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বিবেচ্য, শক্তির অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধেও সেই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে। তবে সংক্ষেপতঃ দুই চারিটি আপত্তির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি অর্থে মুখ্যতঃ কার্য্যকরী শক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহার অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, শক্তি নানাবিধরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। জগতে সর্ব্বদাই শক্তির আনাগোনা চলিতেছে কিন্তু তাহাতে শক্তির পরিমাণের ইতর বিশেষ হইতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির যাবতীয় মূর্ত্তি কুড়াইয়া সঙ্কলিত করিলে দেখা যাইবে, উহার পরিমাণের ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই। সর্ব্বদা এক রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোন না কোন স্থানে অন্য রকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। শক্তি পক্ষে এই সমানতা কিরূপ? এক রকমের শক্তি খরচ করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অন্যরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ঐ দুই মূর্ত্তিভেদকে সমান বলা যায়। এখানে সমানতার অর্থ তুল্যমূল্য (equivalent)। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বা সজাতীয়তা নাই। বিনিময়ের হার বাঁধা থাকিলেই কারবার চলিয়া যায়। যতক্ষণ এই হার বজায় থাকে, ততক্ষণ শক্তির অবিনাশিতাই ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু মূল্য সমান থাকিলেই যে বস্তু সমান হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। পণ্ডিত Ward বলেন—

"The Bank of England issues notes equivalent in value to the gold in its cellars, and pays the gold out again to whoever presents the notes, and is so far unconcerned as to all the transactions that have intervened. Whether these transactions were many or few, domestic or foreign, industrial or financial—is of no amount. So here: our ignorance of one or many possible transformations does not affect the main doctrine, provided we never find a transformation in which energy appears or disappears unaccounted for.

২। একটা নির্দ্দিষ্ট সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষয়, বিনাশশীল হইলেও, যদি প্রত্যেক ক্ষয় ব্যক্তির স্থানে অভিনব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে—যেমন সমষ্টি স্থিরই থাকে; শক্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে।

৩। শক্তিকে যে নিত্য, অনপায়ী বলা হয়, তাহা কেবল কার্য্যকরী শক্তি—কেবল

সক্রিয় শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হয় না। শক্যতা (potential energy) যাহাকে প্রকৃতপক্ষে শক্তি বলিতে পারা যায় না—যাহা শক্তির কার্য্য করিবার সম্ভাবনা মাত্র (capacity for capacity for work), তাহাও শক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। দ্বিতীয়তঃ অপসারিত (dissipated) শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তি কার্য্য করিবার ক্ষমতা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে—যাহাকে কার্য্যে লাগাইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে—তাহাও এই শক্তিতত্ত্বের পরিবারস্থ বলিয়া গৃহীত। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ভৌতিক যন্ত্রের অভ্যন্তরে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রচ্ছন্ন শক্তি (latent energy) আছে, এই প্রকার কল্পনা করিয়া তাহাকেও এই শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত ধরা হয়।

এই বিভিন্ন প্রকারের শক্তিগুলিকে সঙ্কলিত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কেবল কার্য্যকরী শক্তির সমষ্টিকে নিত্য বলা সম্ভবপর নহে জানিয়াই অপ্রকাশস্বরূপ শক্তির কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক যে শক্তি গতিগত নহে, পরন্তু স্থিতিগত; অর্থাৎ যাহার কার্য্য বিরুদ্ধ—অতএব ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—তাহাকে শক্তি বলা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। শক্তির কার্য্য যেখানে নাই, সেখানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকতা বিরুদ্ধ। বৈজ্ঞানিকগণ যখন তখন গতিহীন বা কার্য্য হীন শক্তির (potential energy) কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা গতিহীন বা কার্য্যহীন তাহা যে শক্তিরূপেই অবস্থান করে তাহার প্রমাণ কি? ভবিষ্যমান শক্তির অর্থ যে শক্তি বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু উপযুক্ত কারণ সমবায়ে উৎপন্ন হইবার যোগ্য। কিন্তু উৎপন্ন হইবার যোগ্যতা এক কথা, আর উপজাত অন্য কথা। উপজাত কার্য্যই যদি শক্তি শব্দের কার্য্য হয়, তবে অনুপজাত কার্য্য অবশ্যই অ-শক্তি অর্থাৎ শক্তির অভাব হইবে। বিজ্ঞানের মতে শক্তি—energy—কার্য্যগত বা কার্য্যকরী ক্ষমতা (capacity for doing work)। তাহা হইলে ভবিষ্য শক্তি (potential energy)—কার্য্যগত বা কার্য্যকরী ক্ষমতার যোগ্যতা। কিন্তু এটা যেন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়। শক্তির নিত্যতাবাদে কিন্তু হেঁয়ালীটাকে হেঁয়ালী বলিয়া ধরা হয় না। পণ্ডিত Ward বলেন—"we must remember too that this assumed constancy is only kept on its leg at all by counting in, first, the so-called *potential* energy which is not actually energy at all nor mechanically of the same dimensions—capacity for work and capacity for capacity for work not being on a par; by counting in, secondly *dissipated* energy, which is capacity for ever devoid of opportunity; and by allowing, finally, that an every material system there is an in-determinate amount of *latent* energy, of which nothing is known."

এখানে আরও দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে কথা কয়েকটি এই। বৈজ্ঞানিকগণ বাস্তব শক্তি (actual energy) ছাড়াও শক্তির সম্ভাবনাকে (potentiality) শক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত

করিতে বদ্ধপরিকর। যে শক্তির ক্রিয়া নাই তাহাকেও শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যেখানে কারণে শক্তির অনুমান করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সেখানে কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহেন। হাইড্রজেন ও অক্সিজেন পরিমাণ বিশেষে মিশ্রিত হইলে জলীয়ত্বের উদ্ভব হয় সেখানে আমরা ঐ বায়বীয় পদার্থদ্বয়ের একটি না একটিতে জলীয়ত্বশক্তি বিদ্যমান ছিল, মিশ্রণে তাহার বিকাশ হইল মাত্র। কিন্তু এখানে বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা আপত্তি করিয়া বলেন—না, তাহা নহে। ঐ পদার্থদ্বয়ের একটিতেও জলীয়ত্ব শক্তি ছিল না, কেননা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যদি আমরা বলি জলীয়ত্ব যখন শক্তিরূপে থাকে তখন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না, ঐ শক্তি কার্য্যগম্য; কার্য্য দর্শনেই উহা অনুমিত হইবার যোগ্য,—তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করা হয়। অথচ শক্তির যেখানে পরিচয় নাই—সেখানেও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অবাধে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারেন, দেখা যাইতেছে। তবে সকল সময়ে যে সে কল্পনা তাঁহারা করিতে চাহেন না তাহাও ঠিক; কিন্তু সেটা অপরের বেলায়! বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কেবল শক্তি ও জড় ব্যতীত জগতে তৃতীয় বস্তুর সত্তা স্বীকারে অনিচ্ছুক। সুতরাং জলোৎপত্তিস্থলে বলিতে হইবে, হয় অভিনব জড় উৎপন্ন হইয়াছে, না হয় অভিনব শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে—কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে নূতন জড়েরও উৎপত্তি নাই, নূতন শক্তিরও উৎপত্তি নাই। তবে এই জলটাই কি মিথ্যা বস্তু নহে? যাহা হউক এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। সুতরাং আর চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। *

জড়, শক্তি বা গতিরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি—জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে উহাদিগকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্কল ও অধ্যাস ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। বাহ্যজগৎ আত্মপ্রতীতির অতিরিক্ত নহে। প্রতীতিগুলিকে যেন পিণ্ডিত করিয়া আত্মা হইতে নিক্ষিপ্ত (projected) করিয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্ট। বাস্তবিক সৃষ্টি শব্দের অর্থই ছুঁড়িয়া ফেলা (projection)। কেবল ছুঁড়িয়া ফেলা নহে, আত্মার একত্ব—কর্তৃত্ব প্রভৃতিকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুলিতে আরোপ করা। ইন্দ্রিয় বৃত্তির বা প্রতীতির উৎপাদকরূপে বাহ্যবস্তুকে জানিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কেন না ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা প্রতীতিগুলিই প্রাপ্ত (given), উৎপাদকটি প্রাপ্ত নহে। উৎপাদকটি অনুমিতও নহে, নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির জ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। উৎপাদক ও উৎপন্নের নিত্য

* According to ostwald's definition, the concept of energy would comprehend not only these potentialities, but actual work as well; he thus calmly postulates, that the causes and effects of work are of the same nature as work itself. Now is it evident that the cause of a phenomenon need be homogeneous with the phenomenon itself? Is not one of the most serious objections to the machanical theory that from the fact that heat electricity, &c, *can cause* motion, it draws the conclusion that heat, electricity & are motions?—The Idealistic Reaction against Science-Energetics by Prof. Aliotta.

সম্বন্ধ আমাদের অযৌক্তিক। তবে উৎপাদকটি একটি কল্পিত পদার্থ ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই কল্পনারই বা উপকরণ কি? বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বা প্রতীতিগুলিই উহার উপকরণ। তাহা হইলে যাহাকে যাহার উৎপাদকরূপে সপ্রমাণ করিতে যাওয়া হইতেছে, তাহা তদুৎপাদন গঠিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে; এবং এই কল্পিত মূর্ত্তিটিকে আত্মসত্তা—আত্মএকত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র সত্তাশীল বলিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, তাহার অবাস্তব যুক্তিতে ইহাই সপ্রমাণ।

কেহ যদি বলেন, "তথাপি একটা বাহ্য সত্তা স্বীকার্য্য, কেন না অন্যথা ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বা প্রতীতিগুলি অবিরত উৎপত্তি-বিনাশশীল; সুতরাং উহারা অবশ্যই একটা সত্তা কর্ত্তৃক উৎপন্ন। কিন্তু আমরা নিজে উহাদিগকে ত উৎপাদন করি না, তাহারা অনেক সময়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উৎপন্ন হয়। এমত স্থলে বাহ্যসত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় কি?" ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য—উহারা উৎপত্তি-বিনাশশীল বটে, এবং উহারা কোন সত্তা কর্ত্তৃক উৎপন্নও বটে; কিন্তু সে সত্তা যে আমাদের বাহিরে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে? যদি তর্কের খাতিরে একটা বাহ্যসত্তা স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও তাহা কেবল 'অস্তি' এই মাত্র বলা যাইতে পারে; তাহার প্রদত্ত প্রতীতিগুলির সহিত তাহার কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। তাহাতে যে গুণাবলীর কল্পনা তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপকরণে গঠিত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কেন না, উহারাই জ্ঞাত, সে সত্তাটি জ্ঞাত নহে। তাহার বিশিষ্টতা কেবল প্রতীতির ভাষায়। সুতরাং তাহার যাহা কিছু গুণ তাহা আমাদেরই প্রদত্ত। ঐ গুণগুলি উহারই স্বরূপ নহে; কাজে কাজেই উহাকে নির্ব্বিশেষ সত্তা বলিতে হয়; কিন্তু নির্ব্বিশেষ সত্তাকে কারণ রূপে বিশিষ্ট না করিলে, উহাকে প্রতীতির উৎপাদক বলা যায় না। সুতরাং উহাকে সৎ বলিয়াও প্রতীতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এবম্বিধ বাহ্যসত্তা স্বীকারের সার্থকতা কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রস্তাবান্তরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। প্রস্তাবের উপসংহারে আমি বলিতে চাই সমস্ত বাহিরের বস্তু নহে। একটা সমস্ত যে অবশ্যই আছে, কি বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক সকলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে দেখা যাইতেছে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে সমস্তর সন্ধান পাওয়া গেল না। বাহিরে খুঁজিয়া তাহার সাড়া মিলিল না। প্রথমতঃ পরমাণুকেই সমস্ত বোধে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; পরে বুঝিলাম ভুল করিয়াছি। উহা সমস্ত নহে, বিকারী পদার্থ। খুঁজিতে খুঁজিতে ঈথরে যাইয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম তাহার ধারণা দ্বিবাদ সঙ্কুল, পরস্পর বিরোধী, সন্দিগ্ধ। ছাড়িয়া দিয়া শক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম; শক্তি গতিরূপে বিলীন হইয়া গেল। গতিকে কি সমস্ত বলিয়া স্বীকার করিব? না, তাহাও ত পারি না। গতি প্রত্যয়সমষ্টি কতকগুলি অনুভূতি পরম্পরার সমষ্টি ব্যতীত গতিকে ত আমরা জানি না। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? যাহাকে সমস্ত বলিব, তাহা কি প্রমাণাধীন, প্রমাণ সাপেক্ষ হইতে পারে? তাহা পারে না? তাহা নিশ্চিতই সর্ব্বপ্রমাণ নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইবে? যে হেতু তাহা

সকলের উপজীব্য—আশ্রয়—অবলম্বন, সেই হেতুই তাহা সর্ব্বপ্রমাণের উপজীব্য, স্বতঃসিদ্ধ। যাহা ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত নহে, যাহাকে প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহা আর কিছু হইতে পারে, কদাচ সত্য হইতে পারে না। এমন সত্য কি বহু হইতে পারে, একাধিক হইতে পারে? কখনই নহে। যদি বহু হয়, তবে সেই বহুর অন্তর্গত প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবে কি প্রকারে? প্রত্যেকেই যদি স্বতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তবে উহাদের ভেদক ধর্ম্ম কি! ভেদক ধর্ম্ম না থাকায় সেখানে বহু পরস্পরের সহিত মিলিয়া একই হইয়া যায়। দেশ কালকেও এই ভেদক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা অসাধ্য; কেন না, ইহারাও স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে, সেই স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুর আশ্রয়েই ইহাদের সিদ্ধি। সুতরাং সেই স্বতন্ত্র স্বয়ংপ্রভ সত্য এক ভিন্ন দুই হইতেই পারে না। বাহিরে খুঁজিলে এবম্বিধ সত্যের সন্ধান কেন মিলিবে? যাহাকে "বাহিরের সত্য" মনে করিয়া পরীক্ষা চালাইতেছি তাহা আমাদের মনঃ কল্পিত, ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত সত্য। তাহা প্রকৃত পক্ষে সত্যই নহে। ঈথর বল, জড় বল, শক্তি বল, বল বল,—সমস্তই জ্ঞান-বেদ্য, জ্ঞানবিধৃত, জ্ঞানাশ্রয় সিদ্ধ; সুতরাং উহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই; স্বয়ংসিদ্ধতা নাই বলিয়া উহারা নিরপেক্ষ সৎপদার্থ হইবার অযোগ্য। অথচ সকলের মনে সত্যের একটা আভাস আছে বলিয়াই, আমরা তাহার অন্বেষণ করিয়া থাকি। প্রকৃত সত্য যাহা স্বয়ংপ্রভ সকলের অবলম্বন তাহা বাহিরের মরীচিকার লভ্য নহে। প্রজ্ঞানেত্রে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই প্রতিপন্ন হইবে। [১]

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

পো-চুইয়ের "বীণাওয়ালী" *

কোন চীনা সমালোচক একটা কবিতার নিম্নলিখিত তারিফ করিয়াছেন:—"রচনার ভাষা দেখিয়া মনে হয় যেন ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। এই কবিতার পাঠকের হৃদয় এক বিচিত্র পুলকে ভরিয়া উঠে। সেই আবেগ স্বর্গীয়—তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। বৌদ্ধদের সুপরিচিত "সমাধি"র সঙ্গে সেই মনোভাবের তুলনা করা চলে। এইরূপ কবিতা হাজার বৎসরে একটা লেখা হয়।"

এই "লাখে হাজারে একটা" কবিতার নাম "বীণাওয়ালী"। কবির নাম পো-চুই (৭৭২-৮৪৬)। ইনি হান্-যুর সময়কার লোক। চীনে কবিরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত—এবং সকলেই প্রায় বড় চাকুরে। আর সময়ের ফেরফারে অনেকের কপালেই দুই একবার করিয়া নির্ব্বাসন বা বনবাস ঘটে। পোও মফঃস্বলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সিয়াংশান্ নামক স্থানে পো আড্ডা গাড়েন। এইখানে

১ "Outside of spirit," says Bradley in his 'Appearance and Reality' "there is not, and there cannot be, any reality and the more that any thing is spiritual so much the more is it veritably real."

(* "হিমাচলের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়)

আর আটজন কবির সঙ্গে তিনি বেনামী জীবনযাপন করিবার সুযোগ পান। লীর "ছয় ইয়াংয়ের" মত পোর "দিয়াং-শানের নয় বুড়া" চীনা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বনবাসে যাইবার পথে পো এক গৃহে অতিথি হন। সেখান হইতে পুনরায় যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে নৌকায় বসিয়া বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। এই ঘটনাটা চীনা কাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। আইল্‌স্ এই কবিতার বিবরণ দিয়াছেন গদ্যে ক্র্যান্‌মার-বিড দিয়াছেন পদ্যে। কিন্তু এই বিবরণে খাঁটি চীনা কথা কতখানি আছে আর ইংরেজির কৌতুক কতখানি আছে তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন।

অনুবাদ মাত্রেই মূলের ঝাড়াবাছা ও কাটা-ছাঁটা আবশ্যক হয়। কবি হয়ত এক প্রকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—অনুবাদক হয়ত আর এক রূপক ব্যবহার করিলেন। অথবা কবি হয়ত কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করেনই নাই; কিন্তু অনুবাদক তাঁহার ভাষাভাষিগণের পক্ষে বিদেশী কথাগুলি সহজবোধ করিবার জন্য দুই চারিটা নূতন শব্দ বসাইয়া দিলেন। এইরূপে বিদেশী মাল স্বদেশী দ্রব্যে পরিণত হয়। সকল অনুবাদ সাহিত্যই এই ধরণের "শোধন করা" জিনিষ—স্বদেশী ছাঁচে ঢালাই করা বিদেশী মাল—অর্থাৎ "এডাপ্টেশন"। আমি চীনা কবিতার ইংরেজি এডাপ্টেশন পড়িয়া তাহার আবার বাঙ্গলা এডাপ্টেশন করিতেছি। সুতরাং পো-চুইয়ের আত্মার সিও চট্‌কান হইতেছে বলিতে বাধ্য। তবে চীনা হৃদয়ের তারে তারে বীণার তারের মতই সূক্ষ্ম গভীর সকল প্রকার ঝঙ্কার উঠে—অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিব—

আসিলাম রজনীতে　　নদীর ধারে
　　মেপ্‌ল্ তরুর তলায়;
ফুলের মতন তার　　পাতা লাল বরণ
　　শরতে একলা গজায়।
হল শেষ এবে　　বিদায় বচন,
　　বসিলাম নৌকাপরে;
নেমে গেল বন্ধু,　　সব নীরব নিঝুম,
　　ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না নদী-বক্ষ ভরে।
বীণা সেতারের　　তারে নাইক ধ্বনি
　　মদিরায় আনন্দ হিয়ার;
বন্ধু ফিরে যায় ঘরে;　　হঠাৎ কানে
　　ঝঙ্কার প্রবেশিল বীণার।
থমকিল বন্ধু　　অতিথি অচল
　　কোথা হ'তে আসে তান?
জনহীন দরিয়ায় কেবা বাজায় বীণ?
　　বুঝি প্রকৃতির গান?
কাছে আসিল তাসি তরী এক খানা,
　　নীরব তাহার ভিতর,
সলজ্জ রমণী এক　　সওয়ারি তাহার'
　　মাত্র বীণা সহচর।
বলা হ'ল তারে　　আসিয়া এ দলে
　　বীণায় শুনাতে গান;
তরা পেয়ালায়　　বাতির আলোয়
　　গুল্‌জার আবার উৎসবের স্থান।
বহু সাধা সাধির পর　　অপরিচিতা
　　ছাড়িল সে নিজ তরী;
বীণায় ঢাকিয়া মুখ　　দাঁড়ায়ে আসরে
　　উপরোধ রক্ষা করি'।
এইবার তারে হাতের আঙুল পড়িল—
　　একবার দুইবার তিনবার
　　তারেতে আঙুল তার
　　চাড়া দিল কাঁপিয়া;
　　বীণাতে আওয়াজ হায়
　　উঠিল না ধ্বনিয়া।

তারপর সুরু হল হৃদয়ের গান,
সে গানে শুনিলাম বিষাদের তান ;
দ্রুত অঙ্গুলিতে সে মাথা নোয়াইয়া
আশাহীন ভাষা পরাণের ব্যথা—
গেল যেন গাহিয়া।
এই মৃদু এই ধীর
গতি অঙ্গুলির ;
বিচিত্র সুরের খেলা
লঘু গম্ভীর।

উচ্চ ধ্বনিতে শুনি ঝম্ ঝম্ ঝরঝার স্বর ;
কানে কানে কথা প্রায় কোমল খাদের ;
চড়া-নরম এক সঙ্গে যেন মুক্তার মর্ম্মর
পাথরের রেকাবিতে পতন-কালের।

কভু সে দেয় সুর তরল ঢালি
কোঁপে যেন পাখীর কাকলী ;
ধীরে তাহা যায় নামিয়া
নদী সম নীচু দিকে বহিয়া।
তারপর থামিল বীণা একবার,
চরম আবেগভরে স্তব্ধ অন্তর ;
বরষের আলিঙ্গনে প্রিয়া ধরিয়ার
নিস্পন্দ জমাট যেরূপ হৃৎকম্পর।
আবার পড়িল আঙুল বীণার তারে ;—
ষোড় সওয়ারের বর্ম্মের ধ্বনি
ঠেকিলে শত্রুর অস্ত্রে ;
অথবা আওয়াজ ছিঁড়ি পর যেমন
শুনায় রেশমী বস্ত্রে ;
কিম্বা কল্সী ভাঙিলে
জল গড়ায় যে শব্দে।
শুনিলাম সে সব তান শেষ ঝঙ্কারে।
এই গেল বীণাওয়ালীর গুণপনার বর্ণনা।

তারপর সে আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল—
বিরাজিল নীরবতা ;
স্থির রহিল মৃদু পবন ;
স্রোতস্বতীর বুকে ঢালে
শরতের চাঁদ রজত কিরণ।
দীর্ঘ শ্বাসিল রমণী, কহিল বিষাদের পূর্ব্বে :—
"রাজধানীতে পাহাড়ের কোলে
শৈশব কাটে মোর গর্ব্বে।
তের বছর বয়স কালেই আমার
গানের বাজনায় গৌরব
ছড়িয়ে দিল সহরের মাঝে
ওস্তাদ কীর্ত্তির সৌরভ।
রূপসীরা সবে হিংসায়
মরে দেখিয়া আমার সুখ,
যুবকের দলে আড়া আড়ি চলে
বাড়াতে আমার সুখ।
ছোট এক গানে লভিতাম
কত অমূল্য উপহার—
মদিরা-সিক্ত লাল রেশমী বাহুরা
আর সোনার অলঙ্কার,
কিম্বা রূপার "পিন্" ঘন ঘন
"বাহবা"র ধ্বনি সহ ;
বসন্তে শরতে ঐরূপ
হাসি খেলা অহরহ।

এই জীবনের তুলনা—
"আমার সুষম কোমল হৃদয়
সহেনি কখনো রবির কর,
আমার মনের কামিনী
পাপড়ি সহেনি ভ্রমর চরণভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জ্যোছনা আলোকে নয়ন মেলিত।" ইত্যাদি।

তাহার পর কিরূপ হইবার কথা ?—
"সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

পো-চুইয়ের বীণাওয়ালীও "প্রভাত কিরণে"র খেলাধূলার পর সহসা চেতনা পাইতেছেন এই চেতনা কিছু অন্য রকমের।

ভাই গেল কাল্
প্রদেশের যুদ্ধে ;
মৃত্যু হ'ল মাতার ;
রাত যায় দিন আসে,
দিন যায় রাত ;
লাবণ্য মোর টিকে না আর।
লোকের ভিড় নাই আমার দুয়ারে,
থাকিল দু এক জন ;
পতিত্বে বরিলাম ব্যবসাদারে ;
মনাগমে তার মন।
হৃদয়ের পিপাসা নাই তাহার,
না বুঝে সে বিরহ ;
ফেলে' মোরে চা কিনিতে
স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ।
একাকিনী দশমাস ক্ষুদ্র তরী
বাহি রাত্রিকালে ;
সুখের স্মৃতি আর আঁখি ভরা জল
বুঝি মোর কপালে !

এই বৃত্তান্তে বিষাদটা ঘনাইয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। "ফেলে মোরে চা কিনিতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ।" এই তথ্যের উপর হাহুতাশ খানিকটা হাস্যাস্পদ হইবারই কথা। কাজেই ঘোরতর "ট্রাজেডির" "ভাঙা হৃদয়" "বীণাওয়ালী"তে পাইলাম না। যাহা হউক নির্ব্বাসিত কবিবর বিরহিণীর দুঃখে নিজ দুঃখেরই চিত্র দেখিতে পাইতেছেন।

বীণার করুণ তানে
হৃদয় আমার
গিয়াছিল গলিয়া।
ব্যথিত পরাণের
এই মরম কথায়
ছিঁড়ে গেল যেন হিয়া।
বলিলাম তারে "বাছা,
কপাল দুজনারই এক ;
দুর্ভাগ্যেতে বন্ধু মোরা !
রাজধানী ছেড়ে গতবর্ষে
পৌঁছিলাম এ দেশে
অর গায়ে আত্মহারা।
এ মুলুক শ্মশান প্রায়,
বীণা সেতারের ধ্বনি
হেথা কেহ না পায় শুনিতে।
জমলা নদী কিনারায়
বেঁড়ে বাঁশ ও লম্বানলের সারি ;
তারি মাঝে হইতেছে জীবন
যাপিতে।
দিনে বা নিশায়
সাড়া শব্দ নাই হায় !
মাত্র এক বিকট ডাক
নৈশ চিঁড়িয়ার,
অথবা হাহাকার
অলক্ষী পেচার।
অথবা শুনিতে পাই
পাহাড়ী সঙ্গীত,
পাড়া গেঁয়ে বংশীধ্বনি
বেসুর বেতাল।
আজ কতদিন পরে
শুনি বীণার আলাপ
ভাবিতেছি স্বর্গে যেন
কেটে গেল কাল।
অতএব কৃপা করি
বস একবার,
আরেক খানা গেয়ে দাও
যাইব লিখে কাহিনী তোমার।

পো-চুই, নিতান্তই বে-রসিক দেখিতেছি। ঘোড়া বা কড়িং সাম্‌নে রাখিয়া চিত্রকরেরা ছবি আঁকায় হাতে খড়ি দেয়। পো-চুই

বীণাওয়ালীর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতেই তাঁহার কাহিনী লিখিয়া রাখিতে চাহিতেছেন! গল্প হিসাবে রচনাটা জমাট বাঁধিল না। বিরহিণীর দুঃখ আর নির্ব্বাসিতের দুঃখ হয়ত ওজনে সমান। কিন্তু পো এই সমতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। গল্পের ভিতর বিরহের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই—আর বনবাসের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই। ঠিক যেন হপোহরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালী হুঁকা হাতে দুঃখ করিতেছেন—"আরে! কি বলিব দুঃখের কথা। পনর মাস ধরে ভুগিয়ে মরছি হাতে পয়সা নাই যে ওষুধের ব্যবস্থা করি। যাক্ দেখ্‌ছি তোমার কষ্টও আমারই মত। তোমার গরুটা আজ খোয়াড়ে আটক। বড়ই আপশোষের কথা। আমাদের ব্যথা আমরা ছাড়া আর কেহ বুঝবে না।" পোর গল্পে শিল্প নৈপুণ্য নাই—আটপৌরে জীবনের কথা সাদাসিধা ভাবে বলা হইয়াছে। মামুলি কথা লইয়া অতি উচ্চ অঙ্গের কারবার দেখান আছে গেটের হার্ম্যান ও ডরোথিয়ায়। তাহার তুলনায় বীণাওয়ালীকে পো ফেল মারিয়াছেন বলিতে হইবে। তবে বীণাধ্বনীর বর্ণনাটা মূলে নিশ্চয়ই "লাখে হাজারে এক।" অনুবাদের অনুবাদে "সমাধি" উপভোগ করা অসম্ভব। গদ্যাংশের কথা ছাড়িয়া দিলে কবিতাটা সত্য সত্যই উঁচু দরের। জীবনের একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা সরলভাবে ফলাইয়া লেখা হইয়াছে। বস্তুতঃ এটা গল্পের কবিতা নয় নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়া কবি তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি দেখাইয়াছেন। সেই প্রীতি স্পষ্টই ফুটিয়াছে।

এতক্ষণ রমণী
দাঁড়ায়ে ছিল।
অনুরোধে এইবার
বসে' গাহিল।
এ আওয়াজ তবু
কেবল করুণ কোমলে,
তা শুনি সকলের
আঁখি গলিল
আমার বুকও ভিজিল জলে।

চীনা জাতি খুব সঙ্গীত প্রিয়। ইহাদের সাহিত্যে গান বাজনার তারিফ অনেক দেখা যায়। আর মাছ ধরা, শিকার করা নদীর কিনারায় আড্ডা গাড়া ইত্যাদিও চীনাদের অতি প্রিয় কার্য্য। কিন্তু বোধ হয় নাচের আদর কিছু কম।

নির্ব্বাসন হইতে ফিরিবার পর পো রাজ-দরবারে বড় বড় চাকরি পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমরবিভাগের সচিব হন। কাব্যে জ্ঞানের অপেক্ষা পো বড়। সুতরাং লী ও তুর সঙ্গে পোকেই "ত্রিবীরে"র দলে ফেলা যুক্তি সঙ্গত। পো তাঙ্ আমলের এক শ্রেষ্ঠ কবি। "বীণাওয়ালী"র মত তাহার আরও অনেক নাম জাদা কবিতা আছে। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রচনার বিষয় মিং হুয়াঙ ও তাইবেলের প্রেম। এই বিষাদাত্মক প্রেমের কাহিনী চীনা সাহিত্যের শকুন্তলা।"

৬১৮ হইতে ৯০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঙ্ বংশের রাজত্ব কাল। এই তিনশত বৎসরের ভিতর যত কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৪৮৯০০টা সংগৃহীত আছে। এইগুলি ৯০০ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।

চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন চীনা সমজদারের মত নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

"শি-কিঙ (খৃঃ পূঃ ৫০০) সঙ্কলিত তিনশত গীত সাহিত্য-বৃক্ষের শিবড় স্বরূপ। এইগুলি বন্‌ফিউন্সিয়াসের সংগ্রহ। সু-উ এবং লী-সিহের কবিতা "বুক্কাণ্ডে"র প্রাথমিক অবস্থা। ইহারা দুইজন এক সময়ের লোক

—হান্ আমলের প্রথম অর্দ্ধে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইহাদের কাল। হান্-আমলের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বিশেষতঃ কিয়েন-এনের রাজত্ব কালে (১৯৬ খৃঃ অঃ) কাণ্ডটা বাড়িতে থাকে। এই সময়ে কয়েকজন নামজাদা লেখকের আবির্ভাব হয়। ২২০ হইতে ৪৮১ পর্য্যন্ত ছয়, রাজবংশের আমল। এই সময়ে চীনা কাব্যতরুর শাখা প্রশাখা জন্মে এবং পাতা গজাইয়া উঠে। অবশেষে তাঙ্ আমলে শাখা প্রশাখা এবং পত্রের সমধিক বিকাশ হয়। অধিকন্তু ফুল ও ফল এই যুগের উৎপত্তি। অর্থাৎ সাহিত্যতরু এই সময়ে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। চীনাকাব্য আলোচনা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "পুরাণা শি-কিঙ্ বাদ দিও না। তাহা হইলে চীনা সাহিত্যের গোড়ার কথা বুঝিতে পারিবে না। আর গোড়ার রস না পাইলে ডালপালা ফুল ফলের গৌরব উপভোগ করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ চীনের কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে চীনা বেদব্যাস ও মনুর বচনগুলিও কাছে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ শি-কিঙে অনেক সরস কবিতা পাওয়া যায়। সেগুলি তুচ্ছ করা চলে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ভারতীয় মুসলমানরাজগণের সাহিত্যসেবা
ও
শিক্ষাবিস্তার

(৯৫২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আকবর

পাঠান রাজবংশের এবং আকবর পর্য্যন্ত মোগল রাজবংশের প্রধান প্রধান সম্রাটগণের মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে পাইয়াছি, আকবর তাঁহাদের অন্যতম। আমরা সম্প্রতি তাঁহারই রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আকবর তাঁহার রাষ্ট্রনীতি এবং বিদ্যোৎসাহিতার জন্য সমভাবে বিখ্যাত। যাহাহউক কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণন করিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন। নোয়[১] উদাহরণ স্বরূপ কোন একজন অজ্ঞাত লেখকের লেখার উপর নির্ভর করিয়া নিরক্ষর সত্ত্বেও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। 'তুজাকি জাহাঙ্গীরী' এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রদর্শন করিতেছেন :—

"আমার (জাহাঙ্গীরের) পিতা, বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষতঃ হিন্দুস্থানের পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন তথাপি অনবরত পণ্ডিত ও চতুর লোকদিগের সহিত আলাপের ফলে তাঁহার ভাষা এতদূর মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, কেহই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিয়া লইতে পারে নাই, তিনি

১ Noer's *Akbar*, vol. ii, pp. 56, 243.

সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। এমন কি তিনি গদ্য রচনা করিতে ও কবিতার সৌন্দর্য্য বুঝিতে এতদূর পারগ ছিলেন যে, তদপেক্ষা অধিকতর কৃতী লোকেরও তাহা ধারণা করা অসম্ভব।" ১

এইখানে সম্রাট্ তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বিবৃত হইতেছেন এবং তাঁহার আত্মজীবন চরিত তুজাক স্বীকার করে যে, তিনি—"সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন।" অন্যদিকে ওয়াকি আতি জাহাঙ্গীরী, রাজবংশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অন্য একখানি আত্মজীবন চরিত গ্রন্থ, বলে যে, যদিও আকবর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিলেন না, তথাপি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় প্রসঙ্গে এতটা অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জ্ঞানের যে কোন বিভাগের, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন ইহা (ওয়াকি আতি) স্বীকার করে না। প্রমাণটী এইরূপ:—

"এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত আমার পিতার (আকবর) বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করা একটা বাধা রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি, বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সঙ্গ করিয়াছিলেন সত্য; এবং যদিও তিনি ঐ সব সঙ্গ হইতে জ্ঞানের কোন বিশেষ সুবিধা লাভ না করিয়াও থাকেন, তথাপি তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার সৌন্দর্য্যবোধ জ্ঞান এইরূপ লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যে তাঁহার উদারচরিত্র ও পদের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত নয় সে তাঁহাকে যে কোন জ্ঞানবিষয়ে গভীর পণ্ডিত বলিয়া ধারণা করিতে পারে।" ২

উপরোদ্ধৃত দুইটী বিবরণই দুইটী বিভিন্ন মতের উপর স্থাপিত। ইহাদের যে কোন একটী কতকগুলি পুস্তকের মধ্যে দেখা যায় এবং সেগুলি জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। যথা—ইক্‌বাল নামা, তারিখি সলিম সাহী, জাহাঙ্গীর নামা ইত্যাদি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণীতেও পাওয়া যায়। যাহাহউক আকবর নিরক্ষর ছিলেন এই বিবরণটী অনেকগুলি কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। হুমায়ুন তাঁহার পুত্রের গৃহ-শিক্ষকস্বরূপ আবদুল লতিফকে নিয়োগ করেন, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবদুল লতিফ রাজসভায় আগমন করেন নাই। যাহা হউক এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য আবদুল লতিফ নির্জ্জনতা উপভোগ করেন এবং ইহা আদৌ মনোমত হয় না যে, হুমায়ুন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আকবরের অভি-ভাবক বৈরাম খাঁ ভবিষ্য সম্রাটের শিক্ষাদান অবহেলায় স্থগিত রাখিয়া ছিলেন। দেখা যায়, বৈরাম পরে আবদুল লতিফকেই আকবরের শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৩] আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, পীর মহম্মদ খাঁ[৪] এবং হাজী মহম্মদ খাঁ[৫] ও তাঁহার শিক্ষকদ্বয় ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত অথবা "অজ্ঞ" হইয়া কোন লোক পণ্ডিত

১ *Tuzuk-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 33; *Tuzuk-Jahangiri*, translated by Lowe, p. 26, Fasc. i, *(Bibl. Indica)*

২ *Waqi'ati Jahangiri*, Price's transl. (1829), pp. 44, 45.

৩ Noer's *Akbar* vol. i, p. 127.

৪ *Ferishta* vol. ii, pp. 193, 201; Elphinstone, vol. ii, (ed. 1841), p. 262.

৫ *Ferishta* vol. ii, p. 194.

ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা অনুধাবন করিতে কিংবা তাঁহাদের তর্ক উপলব্ধি করিতে অথবা তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে, এবং সাহিত্য রচনার সৌন্দর্য্য উপভোগে আদৌ সমর্থ হয় না। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা সম্বন্ধে আবুল ফজল যে কোন রকমে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি আকবরের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে কতকগুলি সঠিক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৫৪২ খৃঃ অব্দের ২০ নবেম্বর যে দিন সম্রাট, ৪ বৎসর ৪ মাস ও ৪ দিনের হইলেন ১ সেদিন তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং মৌলবী আলিমুদ্দিন তাঁহাকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২

হুমায়ুন স্বীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা শুভমুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন কিন্তু যখন সেই সময় আসিল আকবর বালক সুলভ আমোদে কোথায় যে লুক্কায়িত রহিলেন তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আলিমুদ্দিন দীর্ঘকাল শিক্ষক ছিলেন না। আকবর পায়রা উড়াইতে বিশেষ আসক্ত বলিয়া তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে মৌলানা বায়জিদ নিযুক্ত হইলেন। পরে তাঁহাকে সামরিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত মুনিম খাঁ নির্ব্বাচিত হইলেন। ৩

এই সকল প্রমাণ পাইয়া আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আকবর বর্ণজ্ঞান রহিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে ইতিহাসে সুপণ্ডিত এবং কবিতা রচনায় ও হাফিজের কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করিতে দক্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ৪

আকবর ভারতীয় রূপকথা শুনিতে খুব ভাল বাসিতেন। উহার কারণ মীর হুসেন বেশ দক্ষতার সহিত ৩৯০ টী গল্প রচনা করেন এবং প্রত্যেকটী গল্প সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত ছবি দ্বারা তাহাদিগকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলেন। ৫ তিনি সারা জীবনটা তাঁহার বই পাঠের দিকে নজর দেন নাই। প্রত্যেকদিনই কোন একজন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহাকে বিভিন্ন বই পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তিনি মন দিয়া গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ শুনিতেন। যেখান পড়া হইয়া যাইত

---

1 Humayun also went through the same ceremony as noticed above.

2 *Akbar Namah*, vol. i, (Beveridge), ch. xliv, p. 518. The remarks of Mr. Beveridge are important in this connection, as they are directed towards the solution of this perplexing question "The truth as far as it can be seen through the mare of Abul Fazl's rhetoric seems to be that Akbar was an idle boy, fond of animals and out-door amusements, and that he would not learn his lessons. This corroborated by Jahangir's description of him as an unlettered man, and one who in his youth was fond of the pleasures of the table. It seems probable, too, that Akbar never knew how to read and write. This seems extraordinary in the son of so learned a man as Humayun, but apparently the latter was not to blame for this. We are told that A'zamuddin, the first teacher, was removed for his addiction to pigeon-flying. This was a taste he communicated to his pupil, if indeed the boy did not inherit it from his great-grandfather 'Umar Shaik."—*Akbar-Namah*, vol. i, (Beveridge) p. 518 n.

3 Noer's *Akbar* (transl. by Annette S. Beveridge), vol. i, p. 125.

4-5 Elliot iv. p. 294; and *Ferishta* vol. ii, p. 260.

সেস্থানের শেষে তারিখসহ চিহ্নিত করিয়া রাখিতেন এবং পঠিত পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠককে কিছু দিতেন। শ্রবণে এইরূপ দ্রুত উন্নতির ফলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; এবং আবুল ফজল বলেন যে, "কচিৎ কোন বিশেষ চিন্তাকর্ষক বিজ্ঞান-গ্রন্থ অথবা ইতিহাস সম্রাটের নিকট পড়া হইত; কিন্তু তিনি ঐ সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও কিছুমাত্র ক্লান্ত হইতেন না, বরং সর্ব্বদাই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া শুনিতেন। ১ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই একাধিকবার তাঁহার নিকট পঠিত হয়—

অখলাক ই—নাসিরী,
কীমিয়া ই—সা আদত,
কাবুস—নামা,
মুনৈর সম্বন্ধের গ্রন্থাবলী,
গুলিস্তান,
হকীম সনাই প্রণীত হদীকৃল,
মানাকীর মসনাবী,
জাম—ই—জাম,
বৃত্তান,
শা—নামা,
সেখ নিজামীর মসনবীর
মৌলানা জামী ও খুসরুর গ্রন্থাবলী,
খাকানী আনওয়ারীর দীবান এবং কতক-গুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ২

গুরুতর ও জরুরী রাজকীয় কর্ত্তব্য সত্ত্বেও রাত্রির একাংশ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের জন্য ব্যয়িত হইত; কিন্তু সম্রাট তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞানলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আনন্দের সহিত কিছু সময় দার্শনিক, সুফী এবং ঐতিহাসিকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইতেন। তাঁহারা গভীর বিষয়ের আলোচনায় ভোজনে ব্যাপৃত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমাজ পছন্দ করিতেন, এবং আহূত সভাতে চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তর্ক, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, এবং ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়—মোটের উপর "যাবতীয় পার্থিব পদার্থের বিষয়েই উৎসাহ দিতেন।" এই জ্ঞানানুরাগ তাঁহার ফতেপুর সিক্রির নবনির্ম্মিত অট্টালিকার বিখ্যাত ইবাদত খাঁ নির্ম্মাণের কারণ হইয়াছিল। এই অট্টালিকা রাজকীয় উদ্যানে স্থাপিতছিল। ইহার চারিটি বড় বড় ঘরের পশ্চিমটীতে সৈয়দ অথবা জ্যোতিষীর বংশধরগণ বাস করিতেন, দক্ষিণটীতে পণ্ডিতসমাজ (উলমাস) উত্তরটীতে সেখ ও ভাবুকগণ এবং পূর্ব্বটী সম্রান্ত ও রাজদরবারের কর্ম্ম-চারিগণের যাহার অভিমত পূর্ব্বোক্ত এক বা একাধিক শ্রেণীতে সমর্থন করিত তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। বিশেষপরায়ণ যাহারা সভাতে আসন এবং শ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়াছিল তাহাদের জন্য পৃথক্ কুঠরী ছিল। প্রতি শুক্রবারে ও রবিবারে এবং ধর্ম্মরাত্রেও সুফী, ডাক্তার, প্রচারক, আইনব্যবসায়ী, সিয়া, সুন্নী, ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নিউপাসকগণ এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের পণ্ডিতগণ রাজকীয়

1 *Ferishta* vol. ii, p. 280.

2-3 For the above information, *vide* Blochmann's *A' ini-Akbari*, p. 103; ani-Gladwin, p. 85. 'Abdul Qadir, in his *Muntakhabul-Tawarikh*, tells us that Naqib Khan often used to read before the Emperor the book called *Hayat-ul-Haiwand* [*Muntakhabul-Tawarikh*, by 'Abdul Qadir, p. 207, vol. ii, translated by W. H. Lowe (*Bibl. Indica*)].

সমিতিতে আমন্ত্রিত হইতেন এবং প্রত্যেকেই নির্ভয়ে তাহার তর্ক ও যুক্তি উত্থাপন করিতেন। "বিজ্ঞানের গভীর সমস্যা, ইতিহাসের কুতূহল বিষয় এবং প্রকৃতির আশ্চর্য্য বিষয়সমূহ তাঁহার চির আলোচনার বিষয় ছিল।" কখন কখন তর্ক খুব বেশী জাঁকিয়া উঠিত ১ এবং এত গোলমাল ও চীৎকার হইত যে, রাজসভায় শ্রোতাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। সুতরাং কোন ঘটনা উপলক্ষে তিনি তারিখি বাদাউনির প্রণেতার নিকট দমনকারী শক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদিও এই সভাগৃহে অত্যন্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসা হইত তথাপি কোন কোন সময় সম্রাট মৌলানা আবদুল্লা সুলতানপুরী নামে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির বিরক্তির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে হাজী ইব্রাহিম এবং আবুল ফজলকে তর্ক করিবার নিমিত্ত তৎসমক্ষের আমোদ নষ্ট করিতেন।

আকবর তর্কস্থলে মৌলানার রাগোদ্রেকের জন্য তাঁহাকে থামাইয়া দিতেন এবং আশ্চর্য্যজনক শব্দ ব্যবহার করিতে ও বক্র দৃষ্টি করিয়া বিদ্রূপ হাস্য করিতে তাঁহার বন্ধুবয়কে সঙ্কেত করিতেন। কিন্তু এই রকম ঘটনার ফলে তর্ক এত গভীর ভাবে দাঁড়াইত যে, গোয়ার ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রী রাডল্‌ফ্‌ (রডলফো আকাভিভা ২) তাঁহার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিতেন, এবং ভারতীয় পণ্ডিতদিগের পরাজয়ের জন্য বুদ্ধিমত্তার মল্লক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। এই সকল বিষয়ে সম্রাট্‌ খুব উদার ছিলেন, এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁহার অন্যায্য নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিত তিনি তাঁহার নিকট হইতে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়কে প্রশস্ত রাখিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীয়দিগের দরবার গৃহের সভাতে গমন করিয়া তর্কে স্থান গ্রহণ করার ফলেই তাঁহার এই কথা বলা হইতেছে না অন্যান্য আরও অনেক কাজেই তাঁহার উদারতা দেখা যায়। এইরূপ ঘটনা উপলক্ষে ইয়োরোপীয় পাদ্রিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইতেন। রাজা যুবরাজ মুরাদকে খৃষ্টের জীবনী কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া কার্য্যতঃ প্রতিপালন করিতে এবং আবুল ফজলকে ঐগুলি অনুবাদ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইবাদত খানাতে লিখিত আছে যে, কোন এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে আবুল ফজল প্রস্তাব করেন রাজাই ধর্ম্মজীবন ও মসজিদের একমাত্র চালক হইবেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই বটিকার ন্যায় নানা প্রতিবাদ আরম্ভ হইল, কিন্তু মুফতাহিদ্‌ (আইন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা) উপাধিধারী আইন প্রবর্ত্তক, সম্রাটের নিকট ইহার মীমাংসা পাঠাইয়াছিলেন। ৩

ইবাদত খানাতে আছে, সভা যাঁহাকে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেন সম্রাট্‌ তাঁহাকে এক মুষ্টি আসরফি বা টাকা দিতেন। যাহাহউক যাঁহারা এই ভাবের

1 The accounts differ as to the days on which the meeting took place.

2 Specimens of the discussion are given in the Persian work *Dabistan*.

3 *Vide* Blochman's *A'ini-Akbari*, vol. i, p. 167; and Murray's *Discoveries and Travels in Asia*, vol. ii.

কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে রাজি হইতেন না শুক্রবার প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে এক এক মুষ্টি টাকা দান করা হইত।

ইবাদত খানাতে উল্লিখিত আছে অনেক সময় দুপুর রাত্রির পর পর্য্যন্তও তর্ক চলিত এবং কখন কখন সম্রাটের সভাপণ্ডিতের যখন প্রাতঃসূর্য্যের নূতন কিরণ বিচার গৃহের উৎফুল্ল সভ্যগণের সম্মুখে পতিত হইত তখন সভা ভঙ্গ হইত। ১

এইরূপ সারগর্ভ যুক্তিতর্ক সমূহের অনুধাবন করিয়া স্বীয় জ্ঞানের সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে সম্রাটের যথেষ্ট উৎসাহ থাকিলেও এই সকল জ্ঞানের প্রকাশক সাহিত্যের পুষ্টির জন্যও তাঁহার উৎসাহ কম ছিল না, এবং ইহাই দেশের বিরাট অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছিল।

সম্রাটের আদেশে সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থরাজি পারশী এবং হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছিল।

১৫৮২ খৃঃ অব্দে মহাভারতের পারশী অনুবাদের জন্য আদেশ হয়। সম্রাট কয়েক জন পণ্ডিত হিন্দুকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যাখ্যা কার্য্যের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; তিনি স্বয়ং নকিব খাঁর অর্থবোধের জন্য কয়েকরাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। তিনি, 'তারিখি বাদাউনী'র প্রণেতা আবদুল কাদিরকে তাঁহার ব্যাখ্যা কার্য্যে সহায়তা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ৩।৪ মাসের মধ্যেই ১৮ অধ্যায়ের ২ অধ্যায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মুল্লা শী এবং নকিব খাঁ এক অংশ ও সেই সময়ে সুলতান হাজী থানেশ্বরী অন্য অংশ অনুবাদ করেন। শেখ ফয়জী গদ্য ও পদ্যে ঘসড়া অনুবাদের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ২ অধ্যায়ের বেশী অনুবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপর হাজীই ফয়জীর কাজ করিতেছিলেন কিন্তু একশত পাত শেষ না করিতেই কার্য্য বন্ধ হইল।

এই অনুবাদ বিরাট গ্রন্থের একটী চুম্বক স্বরূপ হইয়াছিল। উহা রজ্‌ম নামা (লড়াই গ্রন্থ) নামে অভিহিত হয় এবং পরে উহার চরিত্রগুলি সুন্দররূপে লিখিত হইয়া চিত্রেরদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। আবুল ফজল দুই পাতা ব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া দেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই কিনিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ২

চারি বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে আবদুল কাদের রামায়ণের পারশী অনুবাদ সম্পাদন করেন। ৩

হাজী ইব্রাহিম সরহিন্দী অথর্ব্ববেদের, ৪ ফয়জী লীলাবতীর, মুকুন্দ খাঁ গুজরাটী জ্যোতির্বিজ্ঞানের একখানি ভাষ্য তাজকের, মীরজ খাঁ খানান ওয়াকি আত্তি বাবরীর তুর্কী ভাষার এবং মৌলানা শা মহম্মদ সাহাবাদী কাশ্মীরি ভাষায় কাশ্মীরের ইতিহাসের পারস্যানুবাদ করেন। ৫ আবদুল কাদের অমিউল রসীদীর অনুবাদ করেন।

1 Gladwin, p. 559, f.n.

2 For all the above information *re* Ibadat Khanah, *vide Tabaqati-Akbari*, Elliot v, pp. 390-391 ; *Tarikhi-Bada'uni* (or *Muntakhabul-Tawarikh*), Elliot v, pp. 517-519 and 526-529. Abul Fazl's *Akbar-Namah*, Elliot vi, pp. 59, 60.

3 Gladwin's *A'ini-Akbari*, p. 85 ; and *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v, pp. 537, 538.

4 *Tarikhi-Badauni*, Elliot v, p. 539.

5 'Abdul Quadir says that the work of translation was first entrusted to a learned Brahman a convert to Muhammadanism, who came from the Deccan, and to 'Abul Fazl, and next on Haji Ibrahim. Lowe's *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. ii, p. 216.

আরবী ভাষায় লিখিত জ্যোতিষিকপাঠ মুবারুল বুলদানকে মুল্লা আব্দল তলা, কাশিমবেগ, সেখ মুনাব্বর এবং আবদুল কাদের প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।১ হরিবংশেরও পারস্যানুবাদ হয় এবং তৎসঙ্গে নক্ষত্রা মুত্তাকা ও মৌলানা হসন ওয়াইস কলিয়া দমনা নামে পঞ্চতন্ত্রের পারস্যানুবাদ করেন। এই পণ্ডিতগণের অনুবাদ অতিশয় কঠিন হইয়াছিল কাজেই আয়ার-দানিশ নামে একটী সহজ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্রের দ্বারা সুবোধ্য করিয়া লয়লা ও মজনুর আদর্শে কাব্যে নল-দময়ন্তীর পারস্যানুবাদ রচিত হয়।

যখন শীরগড়ে, অন্তত কনৌজে, হরবার ছিল, সেই সময় আবদুল কাদেরকে বত্রিশ সিংহাসনের গদ্য ও পদ্যানুবাদের নিমিত্ত সম্রাট উপদেশ প্রদান করেন। একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কাদেরকে ভাষান্তরিত করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি রচিত হইবার পর বিরদ অঙ্কজা নামা নামে পরিচিত হয়; নামের দ্বারাই গ্রন্থখানির রচনার তারিখ ইঙ্গিত করিতেছে।২ শা নামা পদ্যে রচিত হয় এবং হমাতুল হাইবানের অনুবাদ হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি আবুল ফজল 'গোসপেলে'র (খৃঃ ধর্ম্মবাণীর) অনুবাদের ভার লইয়াছিলেন।৩

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বাবরের রাজত্বকালে উলাবেগ কর্ত্তৃক যে জ্যোতিষ তালিকা প্রস্তুত হয় তাহার একাংশ আমীর ফথুল্লা সীরাজীর তত্ত্বাবধানে অনূদিত হয়, এবং সংস্কৃত গ্রন্থাবলী কিষণঘোষী, গঙ্গাধর এবং মহেশমহানন্দের অনুবাদ আবুল ফজল সম্পাদন করেন।৪ ১৫০০ খৃঃ অব্দে বাবরের জীবনচরিত আবদুল রহীম খাঁ খানান কর্ত্তৃক তুর্কী হইতে পারস্য ভাষায় পরিবর্ত্তিত হয়।৫

নকিব খাঁ এবং আরও কয়েকজন একত্রিত হইয়া তারিখি আলফি ৬ অর্থাৎ সহস্র বৎসরের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। নির্ব্বাচন কার্য্যে মৌলানা আব্দল তাইফাবীর যথেষ্ট দাবী ছিল। জাফর বেগ এবং আসফ খাঁ ইহাকে সম্পন্ন করেন।৭

1 'Abdul Quadir made an abridgement of the history of Kashmir, which is said to have been translated from the original Hindi by Mulla Shah Muhammad Shahbadi, and was called *Rauzahi-Tahirin*, but apparently not the *Rajtarangini*, for the translation of that work is usually attributed to Maulana Imamuddin. According to Professor Willson there were frequent remodellings or translations of the same work, but among those he notices he does not mention the one by Mulla Shah Muhammad Shahabadi; *vide* Elliot v, p 478; *Asiatic Researches*, vol. xv, p. 2; and Blochmann's *A'ini-Akbari*, vol. i, p. 103.

2 *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v, p. 478.

3—4 *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v. pp. 483, 484 and 513.

5 Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 104.

6 Elliot iv, p. 218.

7 "The Literary circle which followed the Imperial Court appears to have been peculiarly active during its sojourn at Lahore. It was here that the voluminous history of Muhammadanism from the earliest period up to the thousandth year of the Hijri era compilled by the order of the Emperor was finished and revised; and it was here that the translation of the *Mahabharata* and the *Rajtarangini* into Persian was undertaken," p. 10, *A Brief Account of the History and Anquities of Lahore*, 1873 (author not mentioned)—(in the Calcutta Imperial Library).

তৈমুরের বংশধরগণের প্রত্যেকেরই জীবন চরিত লেখা সম্বন্ধে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, বাবর এবং জাহাঙ্গীর তাহার উদাহরণ। কিন্তু যাহারা নিজেদের জীবনচরিত লেখেন নাই তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে জীবনচরিত এবং কার্য্যকলাপের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্য মন্তব্য রাখিয়া দিতেন। এইটী আকবরের সম্বন্ধে দেখা যায়। ওয়াকি নবীশ সম্রাটগণের কার্য্যকলাপের দৈনিক তালিকা রাখিতেন উদাহরণ স্বরূপ, তিনি যাহা খাইতেন বা পান করিতেন, যে সকল বই তাঁহার কাছে পড়া হইত এবং এইরূপ যাহা কিছু হইত। কোন একটী বিবরণ রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে দৈনিক কার্য্যতালিকা আকবর এবং তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুমোদিত হইত। ওয়াকি নবীশের এই কাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাটগণের রাজত্ব সময়েও বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আবুল ফজল বলেন ইহার দ্বারা কোন সন্দেহ প্রতিপালিত হয় নাই।

সম্রাট্ তাঁহার পুস্তকাগারে যথেষ্ট বই রাখিতে খুব যত্নবান ছিলেন, সকল প্রকার পুস্তক রাখা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধ্যে ছিল। রাজকীয় পাঠাগারের কতকগুলি বই স্ত্রীলোকদিগের মহলে এবং অবশিষ্ট বাহিরের ঘরে থাকিত। তাঁহার পাঠাগারের সুশৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং পুস্তকমাত্রেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। ১

সম্রাট গুজরাট জয়ের সময় ইতিমাদ খাঁ গুজরাটীর পুস্তকাগারটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকাগারে অনেকগুলি দামী বই ছিল, সেইগুলি রাজকীয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয় এবং সেই সময়ে সম্রাট পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বিতরণ করিয়াছিলেন। আবদুল কাদিরও অপরূপ মস্‌ঘটের একখণ্ড উপহৃত হইয়াছিলেন। ২

ফয়জী ও মৃত্যু সময়ে ৪৬০০ খণ্ড পুস্তকের একটী লাইব্রেরী রাখিয়া যান। তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানীয় ছিল সেই গুলিকেই অত্যধিক ব্যয়ে এবং অনিয়মিত যত্নে নকল করা হয়। সেইগুলির অধিকাংশই তাহাদের গ্রন্থের প্রণেতাগণের জীবনী ছিল অথবা অনেকগুলিই অন্ততঃ তাহাদের সমসাময়িক তাম্রকারগণের নকল বই। সমস্ত বই সম্রাটের লাইব্রেরীতে নীত হইল এবং তিনটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের তালিকা ও সংখ্যা করা হইল। প্রথম ভাগে কবিতা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ

---

1 *Tarikhi Badā'uni*, Elliot v, p. 519 ; *Tarikhi-Akbari* M.S. in ASB, leaf 58.

2 It is gratifying to learn that the houses at Fathpur Sikri of both Faizi and Abul Fazl, which stand very near each others are being used as a Zilla School, and have not now been appropriated to some other purpose (*vide* Smith's *Fathpur Sikri* pt. iii, p. 29).

3 *Tarikhi-Badā'uni*, Elliot v. p. 548. Though we learn that there was an Imperial Library, which grew richer in its collection by additions made by the Emperor, we are quite in the dark as to the number of volumes in it, and hence unable to it with the libraries established at such centres of Muslim learning as Cordova, Cairo, Merv, Bukhara, Baghdad, etc. For an account of these libraries see Justice Khuda Bakhsh Khan's *Islamic Libraries*.

এবং সঙ্গীত, দ্বিতীয় ভাগে ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, সূফী মতবাদ, বিজ্ঞান জ্যোতিষ এবং জ্যামিতি; তৃতীয় ভাগে বহু ভাষ্য, বহু প্রবাদ কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ এবং আইন গ্রন্থ। ঐ সকলের মধ্যে ফয়জীর সংগৃহীত ১০১টী 'নল-দময়ন্তী'র কবিতা ছিল। ১

আগ্রার দুর্গের ভিতর যে ঘরটীতে পাঠাগার ছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। মাননীয় হ্যাভেল উহার অবস্থিতি সম্বন্ধে বলেন :—

"এই সকল (অর্থাৎ সমসময়ের সন্নিহিত আকবরের ছোট ছোট ঘরগুলি) অতিক্রম করিয়া, আমরা একটী লম্বা ঘরে প্রবেশ করিলাম উহাই লাইব্রেরী বলিয়া ধারণা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ঘরটী হইতে চিত্র-সজ্জা উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয় নাই।" ২

আমাদের বলা অনুচিত নয় যে, যখন পাঠাগারগুলিতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়, রাজকীয় পাঠাগারের বইগুলি উদাহরণার্থ এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থ কিরূপ চিত্রিত হইয়াছিল। পারস্য ভাষার গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলী বিখ্যাত চিত্রকরগণের দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত 'তুতিয়া হয়জা' অত্যধিক উদাহরণের জন্য ১৪০০ চিত্রে শোভিত হইয়াছিল; এবং এইরূপ অনেক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই সুসজ্জিত হইয়াছিল, যথা—চঘিস্-নামা, আকবর-নামা, ইকবাল-নামা, রজম-নামা ও (মহাভারত), রামায়ণ, নলদময়ন্তী, কলীলা-দমনা (পঞ্চতন্ত্র) এবং পঞ্চতন্ত্রের সহজ পারস্যানুবাদ অনবর-ই-সুহিল।

চিত্রবিজ্ঞানে সুদক্ষ শিল্পিগণ গ্রন্থগুলির পত্রের সীমা রঞ্জিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থের বাঁধাই কার্য্যের উপরও যথেষ্ট কারিগরী করা হইয়াছিল। ৪

জ্ঞানালোচনার চেয়ে কলাবিদ্যার প্রতিও আকবরের অনুরাগ কম ছিল না। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই তিনি চিত্রশিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন, এবং তাঁহার আদেশে চিত্রশিল্পিগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা ক্রমেই তাঁহাদের শিল্পের উন্নতি করিতেছিলেন। সম্রাট্ একটী চিত্রশিল্পালয় স্থাপিত করেন, সেখানে শিল্পিগণ সমবেত হইয়া শিল্পের দ্রুত উন্নতি দেখাইতে ছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহেই দারোগাগণ প্রত্যেক শিল্পীর চিত্র সম্রাটের নিকট আনিতেন; সম্রাট তাহাদের দক্ষতানুসারে বেতনবৃদ্ধি ও অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করিতেন। রাজদরবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পিগণ মীর সৈয়দ আলী

---

1 E. B. Havell's *Handbook to Agra and the Taj, Sikandra Fathpur-Sikri and the Neighbourhood*, p. 66.

2 "The famous manuscript of *Razm-Namah* is said to have cost Akbar about £40,000—a sum which in our days would be much greater. It is now at Jaipur (see Martin's *Miniature Painting and Painters of India, Persia, and Turkey*, vol. i, p. 127).

3 Gladwin's *A'ini-Akbari*, p. 87.

4 Blochman's *A'ini-Akbari*, pp. 96 off.; Gladwin, p. 89. For a list of painters in Akbar's Court, and their paintings still preserved, see Martin's *Miniature Painting, etc.*, vol. i, pp. 127—131.

ওস্তাজী, খাজা আব্দুল সমদ শীরীকলম সীরাজী
দশবন্ত (জনৈক পাল্কীবাহকের পুত্র)
বসাবন,
কেশু,
লাল,
মুকুন্দ,
মুস্কিন,
কস্মাক ফরগ,
মাধু,
জগন,
মহেশ,
খেমকরণ,
তারা,
সান্ওলা
হরিবংশ এবং
রাম।

দরবারের সকল প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতিকৃতিই দরবারের চিত্রশিল্পিগণের দ্বারা অঙ্কিত হইয়া বৃহৎ পুস্তকাকারে বাধান হইয়াছিল। ১

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

জন্মান্তর

কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত কোন পদার্থ নাই, একথাও প্রকৃত নহে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হইলেও প্রকৃত মীমাংসকগণ যুক্তি, চিন্তা ও তর্কাদি সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতীত অনেক বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জন্মান্তর এই প্রকার একটি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়াই যে ইহা অপ্রকৃত, একথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের দেহের মধ্যেই চৈতন্য, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অংশগুলি ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও ইহাদের অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা প্রবাহমান বায়ু দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি। এইগুলি যেমন যুক্তি চিন্তাদির সাহায্যে স্বীকার করিতেছি, জন্মান্তর সম্বন্ধেও যদি সেই প্রকার সু-যুক্তিমত কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে জন্মান্তর নাই বলিবার কোন কথা থাকে না। এখন আমাদের এই জন্মই শেষ, কি আবার জন্মান্তর আছে, তাহা বুঝিবার জন্য জন্মান্তর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযুক্তাবস্থাকেই জীবিত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, সুতরাং ইহাদের অসংযুক্তাবস্থার নাম মৃত।* এখন একটি প্রশ্ন এই যে, মৃতের অর্থাৎ অসংযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার মধ্যে জন্মান্তর হয় কাহার?

যদি দেহের বলা যায়, তবে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত মানবদেহ সমাধি কিম্বা অগ্নি সহায়ে ধ্বংস করিয়া ফেলা

১ For the above information, *vide* Blochmann, pp. 107, 108.

হয়, সুতরাং তাহার আর পুনর্জন্ম কি হইতে পারে? ইন্দ্রিয় সমূহের জন্মান্তর হয়, শাস্ত্রে একথাও উল্লেখ হয় নাই। আত্মার জন্ম-মৃত্যু দুই-ই নাই, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আর আত্মার জন্ম মৃত্যু না থাকিলে মনেরও জন্ম জন্মান্তর থাকিতে পারে না; কারণ মন আত্মা বা চেতনার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযুক্ত রহিয়াছে, তাই যেখানে আত্মার অভাব রহিয়াছে সেখানে মনেরও অভাব আছে এবং মনের অভাব জন্য তাহার কার্য্য, চিন্তা, স্মৃতি, তর্কাদিও কিছুই নাই, যেখানে চেতনা-শক্তি অন্ধ, সেখানে মনও দুর্ব্বল। সুতরাং চেতনার ন্যায় মনেরও জন্মান্তর থাকিতে পারে না। আর যদি বল আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই চারিটিরই একত্রে জন্মান্তর হয়, তবে তাহারও প্রমাণাভাব হইবে। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি তো সকল জীবেরই নষ্ট হইয়া যায়। আরও এক কথা এ পর্য্যন্ত এমন কোন জীব বা মানব জন্ম গ্রহণ করে নাই, যাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীব বা মানবের তুল্য আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট। আত্মা, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়াই জীব, ইহাদের যখন পৃথক সমবেত কাহার জন্মান্তর গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন জন্মান্তর হয় কাহার?

এই প্রকার প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক, সেই প্রকার ইহাও স্বাভাবিক প্রশ্ন যে, শুভ হউক, অশুভ হউক যাহা একটা আমরা অনুভব করি, তাহা কোন একটা নিষ্পন্ন কার্য্যের পরিণাম ফল; তবে শুভ কার্য্যের পরিণামে শুভ এবং অশুভ কার্য্যের পরিণামে অশুভ ফলভোগই স্বাভাবিক। সেই প্রকার যেখানে শুভ এবং অশুভ উভয়বিধ কার্য্যই বর্ত্তমান সেখানে তাহার পরিণাম ফলও শুভাশুভ মিশ্রণে গঠিত হয়। আর যেখানে কোন প্রকার কার্য্য নাই, সেখানে তাহার পরিণাম ফলও কিছু নাই বুঝিতে হইবে। যদি তাই হয়, তবে যে গৃহবিত্তহীন দরিদ্র সন্তানকে ধনবান কর্ত্তৃক পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে শিশুর এমন কোন কার্য্য বা চেষ্টা নাই যাহাতে সে ধনীর পুত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে। জন্মান্তরবাদী বলিবেন, যদি তাহার কোন কার্য্য না থাকে, তবে এই কার্য্য পরিণাম কোথা হইতে আসিবে। তবে এই কার্য্য যখন ইহ জন্মে দেখা যাইতেছে না, তখন যে কোন পূর্ব্ব এক জন্মের কার্য্য আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবশ্য এখানে একটি কথা বলিতে পারা যায় যে, অপুত্রক ধনীর চেষ্টায় বা দরিদ্র পিতার চেষ্টা ফলে দরিদ্র সন্তান অর্থবান হইতেছে। একের কার্য্যফলতো অন্যে ভোগ করে, পিতার সম্পত্তি বা ঋণ কি পুত্রে যায় না? সেই প্রকার পিতার অথবা ধনীর চেষ্টায় দরিদ্র সন্তান ধনবান হইতেছে বলিতে পারা যায় না কি?

কিন্তু এ যুক্তিতেও আমাদের সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। যে দরিদ্র সন্তানটি ধনীর পালিত পুত্ররূপে গৃহীত হইতেছে, তাহার ন্যায় শত সহস্র সন্তান দেশে আছে। তাহার অপেক্ষা রূপবান মহৎ কুলের দরিদ্র সন্তানের অভাব না থাকিতে পারে, ধনীও অপর স্থানে সন্তান অনুসন্ধান করিয়াছেন, অন্য দরিদ্র পিতাও নিজ পুত্রের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই সমুদয় অন্যের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একটি মাত্র শিশু ফল ভোগী হইল কেন? মাত্র ইহাই নহে, একই পিতা মাতার জাত এবং

সমান মাতৃ পিতৃ স্নেহে লালিত পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত সন্তান সমূহের বল, বুদ্ধি, বর্ণ, স্বর, আকৃতি, প্রকৃতি, ভাগ্য প্রভৃতির পার্থক্য হইতে কি আমাদের জন্মান্তরের কর্ম্মফলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না?

অবশ্য পিতামাতার খাদ্য, পান, বিহার, কালধর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য কারণের বিভিন্নতা হইতে জাত সন্তানের বল, বর্ণ, আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য সম্পাদিত হয় সত্য, কিন্তু এই যে আহার বিহারাদির বিভিন্নতা, যাহা এক পুত্রের জন্মকালে হীনভাবে, অপর পুত্রের জন্মকালে উন্নতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া পুত্রদ্বয়ের ভাগ্যবিপর্য্যয় সম্পন্ন করিতেছে, তাহা দৈব বা পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের ফলভোগ জন্য নহে কি? নতুবা এক পুত্রের জন্মকালে পিতা মাতার আহার আচার অনিশ্চিত, কালই বা অনুকূল হইবে কেন; আর অপর পুত্রের জন্মকালে সেই পিতা মাতারই নিশ্চিত আহার বিহার, কালধর্ম্মই বা প্রতিকূল হইবে কেন? এইরূপ কাহার বিনা চেষ্টায় পরকীয় সম্পত্তি প্রাপ্তি, কাহার বা দৈবাদেশ প্রাপ্ত ঔষধে স্বাস্থ্যলাভ, সমচেষ্টায় একবিধ কার্য্যে ব্যক্তিবিশেষে ফলবিশেষ প্রভৃতি দেখিয়াও কি আমরা জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের কথা ভাবিয়া অন্যায় করি?

রাম ও শ্যাম দুই জন যমজ ভাই, তাহাদের আকারগত সাম্য এত বেশী যে, সাধারণে অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কে রাম আর কে শ্যাম। কি এ প্রকার আকারগত সাম্য প্রবল হইলেও যমজ সন্তানের প্রকৃতিগত বৈষম্য বহুপরিমাণে থাকে, ইহা আমরা বহুক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পাইয়াছি। এই আকৃতিগত সাম্য ও প্রকৃতিগত বৈষম্য ইহ জন্মের কোন কার্য্য ফলে কি পূর্ব্ব কোন জন্মের কার্য্যফলে তাহা চিন্তার বিষয় নহে কি? এই সমুদয়ের মীমাংসা করিতে হইলে জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইবে।

জন্ম শব্দের অর্থ উৎপত্তি, সুতরাং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই প্রাপ্ত জন্ম বা জাত পদার্থ। জল একটি উৎপন্ন পদার্থ, বিজ্ঞান সাহায্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় জল ছিল না, কিন্তু জলের পূর্ব্বে বায়ু ও তাপ ছিল। এই বায়ুর অংশবিশেষের সহিত তাপের অংশবিশেষের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ এখনও এই উপায়ে বায়ু বিশেষের সহিত তাপের অংশ বিশেষের সংযোগ করিয়া জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই জলের জন্ম-পরিচয়। এখন একটি কথা এই যে, ভূগর্ভ হইতে সুদূর নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বায়ু ও তাপ অবস্থিত রহিয়াছে, এই বায়ুর মধ্যে জল উৎপাদক বায়ুর অংশও আছে, তাপও আছে, আর ইহাদের যে সংযোগ নাই,—এ কথাও বলিতে পারা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে সর্ব্বত্র জলময় দেখিতে পাই না কেন? দেখিতে পাই না তাহার কারণ, বায়ুর যে অংশবিশেষের সহিত যে পরিমাণ তাপের সংযোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়, তাহার অভাব আছে, তাই সর্ব্বত্র জলময় দেখা যায় না। তবে যেমন অভাব আছে সেই প্রকার ভাবও থাকে। যেখানে অভাব থাকে সেখানে যেমন জলের জন্ম নাই, সেই প্রকার সেখানে ভাব আছে সেখানে তাহার জন্মও রহিয়াছে। সে কারণেই আকাশ হইতে ভূগর্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জলের জন্ম বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহার জন্ম বা উৎপত্তি আছে তাহার মৃত্যু

বা অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। জল উৎপন্ন পদার্থ, তাই তাহার অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ও তাপের যে অংশ-বিশেষের সংযোগে জল উৎপন্ন হয়, পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জলের অভাবে বায়ু ও তাপের সেই অংশের পুনরুদ্ভব হয়। ইহা হইতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বায়ু তাপের অংশবিশেষের মৃত্যু বা অভাবে জল উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু সেই জলের মৃত্যু বা অভাবে বায়ু এবং তাপের সেই অংশের পুনরুদ্ভব হইতেছে। আবার পুনরুদ্ভূত সেই বায়ু ও তাপের অংশ বিশেষের সংযোগ করিলে পুনর্ব্বার জলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপায়ে প্রতিপন্ন হইতেছে জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতির জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম রহিয়াছে। এখন উৎপন্ন জল, বায়ু, তাপাদির মৃত্যুর পর যে পুনর্জ্জন্ম সম্ভবপর হইতেছে; উৎপন্ন পদার্থ মাত্রের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হইবে না কেন?

কিন্তু এ বিষয়ে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জড় পদার্থ জলের উপমা হইতে অচেতন জীবের পুনর্জ্জন্মের বিচার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। চেতন ও জড়ের একটা পার্থক্য তো আছে?

জড় কাহাকে বলে? জড় শব্দের অর্থ অপ্রজ্ঞ বা অচেতন। আমরা যাহাকে চেতন বলিয়া জানি সেই রাম-শ্যামরূপী জীবের সমুদয় অংশই চেতন কি তাহাতে জড়ের অংশ কিছু আছে তাহা দেখা যাউক। আমরা রাম বা শ্যামের ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তাহার চেতনার পরিচয় পাই, তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিচয় পাই, কিন্তু একদিন সেই রাম-শ্যাম এমন অবস্থা পাইবে, যে দিন সে আর কোন চেতনার পরিচয় দিতে পারিবে না, জ্ঞান-কর্ম্ম কিছুই থাকিবে না। লোকে এই অবস্থাকে মৃত্যু বলে। সুতরাং মৃত রাম আর চেতন নহে, তখন সে জড়মাত্র। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে রাম-শ্যাম কেহই মাত্র চেতন নহে, চেতন ও জড়ের সংযোগ মাত্র। এখন যে জলকে আমরা মাত্র জড় পদার্থ বলিতেছি, তাহাতে যে চেতনার কোন অংশ নাই, তাহা কে বলিতে পারে? যে জলের সাহায্যে আমাদের চেতনা রক্ষিত হয়, যাহার অভাবে চেতনা বিলুপ্ত হয়, তাহাতে চেতনার কোন অংশ নাই বিশ্বাস হয়কি? জলে চেতনা না থাকিলে অচেতন জল হইতে আমাদের চেতনা সম্পাদিত হয় কি প্রকারে? জল কেন আর্য্যগণের মতে তাপ, বায়ু, আকাশ, মৃত্তিকা উদ্ভিদাদি সৃষ্ট সমুদয় পদার্থই সচেতন, কেবল যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার বিকাশ হয়, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্ব্বলতা বা হীনতার জন্য ইতর পদার্থের চেতনার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না।*

এখন জিজ্ঞাস্য রাম, শ্যাম বা মৃত জীবের চেতনা, মন, ইন্দ্রিয় বা দেহ ইহাদের কোন্ অংশের পুনর্জ্জন্ম হয়। প্রথমে দেখা যাউক দেহের জন্মান্তর হইতে পারে কি না। মৃত-দেহ সমাধি বা চিতাগ্নি দ্বারা অভাব হইলেও নিঃশেষ হয় না; পরন্তু রূপান্তর গ্রহণ করে।

গর্ভাশয়ে পিতার শুক্র ও মাতার আর্ত্তব সংযোগে আমাদের দেহ গঠিত হইয়া থাকে। এই দেহবীজ শুক্র ও আর্ত্তব মানবের নিত্য গৃহীত খাদ্যের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* এ সম্বন্ধে ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মুকুলে' প্রকাশিত 'পদার্থের চেতন অচেতন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

শুক্রার্ত্তবের উপাদান খাদ্যসমূহ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজ দুগ্ধ-মাংসাদি হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাণীজ খাদ্যাংশও মূলতঃ উদ্ভিদ হইতে গঠিত, কারণ খাদ্য আকারে গৃহীত উদ্ভিদ্ হইতেই উদ্ভিদভোজী প্রাণীর রস, রক্ত, মাংস, চর্ব্বাদি সমুদয় দেহই গঠিত হইয়া থাকে। আবার উদ্ভিদেরা ভূগর্ভস্থ রস গ্রহণ করিয়া উৎপত্তি, পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ করে। আর্য্যঋষিগণের মতে এই রস আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশবিশেষ। যেহেতু এই আকাশাদির কোন একটির অভাবে বীজ বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতে পারে না। এই উপায়ে জগতের প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশবিশেষ, রস আকারে প্রথমে বীজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। * এই কারণেই আর্য্য-ঋষিগণ দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জল যেমন যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, রূপান্তরে আবার তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার দেহও রূপান্তরিত অবস্থায় কতক অংশ মৃত্তিকা, কিছু জল, কিছু বায়ু, তাপ ও আকাশ পরমাণুরূপে পরিণত হয়।

সমাহিত বা ভস্মীভূত দেহ এই উপায়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও তাপাদিতে পরিণত হইলে, সেই অংশগুলি পুনরায় উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া খাদ্য আকারে এবং অন্য উপায়েও জীবগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া দেহগঠনের উপাদান রূপে পরিণত হয়। ব্যাধিদূষিত দেহের দূষ্য পদার্থগুলি সমুদয় দেহের সহিত মৃত্তিকা-জলাদিরূপে রূপান্তরিত হইলেও তাহার দূষিতভাব বহুদিন পর্য্যন্ত পরিণত মৃত্তিকা জলাদির মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক দোষ উদ্ভিদ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়; সেকারণেই সমাধি স্থান বা তৎসংলগ্ন ক্ষেত্র হইতে ঔষধ বা খাদ্যাদির উপকরণ সংগ্রহ আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি—দেহের জন্মান্তর আছে; তবে রামের সম্পূর্ণ দেহ শ্যামের বা কোন শৃগাল কুকুরের সম্পূর্ণ দেহাকারে পরিণত না হইতে পারে, পরন্তু অনেক জীবেরই দেহের অংশ বিশেষরূপে জন্মিতে পারে।

পুকুর বা অন্যতম জলাশয়ের জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মে রূপান্তরিত হইয়া বায়ু ও তাপের অংশে পরিণত হয় এবং তাহার পর যখন উহা পুনরায় জলের আকার প্রাপ্ত হয়; তখন যে তাহা সেই জলাশয়েই পড়িবে, এমন নহে। পুকুরেও কিছু পড়িতে পারে, ক্ষেত্রেও পড়িতে পারে আবার বৃক্ষ পত্রে দুই দণ্ডের জন্য জল আকারে থাকিয়া পুনরায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে পারে। দেহও সেই প্রকার জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কতদিনে, কোথায় কাহার আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলা যায় না।

অবশ্য দেহের এই প্রকার জন্মান্তর গ্রহণের সহিত প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্মান্তর গ্রহণ সূচিত হয় না, কিন্তু জীবের জন্মান্তরের সহিত দেহের এই প্রকার জন্মান্তর গ্রহণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ এই রূপান্তরিত দেহাংশ লইয়াই জীবের দেহ গঠিত হইয়া থাকে আর জীব-চেতনা স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য দূষিত বা অদূষিত উপাদানে গঠিত দেহে আশ্রয় লাভ করিয়া তত্তাত্তত ফলভোগ করিয়া থাকে।

এখন ইন্দ্রিয়সমূহের জন্মান্তর হইতে পারে কি না দেখা যাউক। যে যুক্তিতে দেহের

* এ সম্বন্ধে ১৩২০-সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার গৃহস্থে প্রকাশিত 'যৌগিকতত্ত্ব' প্রবন্ধে সবিশেষ বলা হইয়াছে।

জন্মান্তর সূচিত হইতেছে সেই মুক্তিতেই ইন্দ্রিয়ের জন্মান্তর সূচিত হইবে। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ একবিধ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ধ্বংসে বা রূপান্তর গ্রহণে একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবের দেহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলিও মৃত্তিকাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশ লইয়া গঠিত হয়; কেবল মৃত্তিকাদি স্থূল অংশের উপাদানে দেহ ও সূক্ষ্ম অংশের উপাদানে ইন্দ্রিয়সমূহ গঠিত হয়, ইহাই প্রভেদ মাত্র। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-গুলি আকাশাদি পদার্থের অংশবিশেষ সমবায়ে গঠিত হয় বলিয়া এই পঞ্চ আদি পদার্থের নিজস্ব গুণ শব্দ, স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা পাঞ্চ-ভৌতিক আহার বিহার হইতে স্থূল ভৌতিক উপাদানের ন্যায় সূক্ষ্ম ভৌতিক অংশ প্রাপ্ত হই, সেকারণেই আহার বিহারের উৎকর্ষ-অপকর্ষতা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তিরও সবলতা অথবা দুর্ব্বলতা পাইয়া থাকি। সুতরাং দেহের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং হানি যখন একই উপায়ে সম্পাদিত হইতেছে, তখন পুনরুৎপত্তি যে একই প্রকারে ঘটিবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

অতঃপর আত্মা ও মন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাম, শ্যাম কোন জীবই মাত্র চেতন নহে, জড় ও চেতনার সমবায় মাত্র। ভারতীয় মনস্বি-গণ এই চেতনাকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই আত্মা 'জ্ঞ' অর্থাৎ জ্ঞানময়; কিন্তু এই জ্ঞানের প্রকাশ মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই চেতনার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই কারণেই 'জড়-চেতন' সমবায়ে গঠিত রামের যে চৈতন্য প্রকাশ থাকে, ব্যাধি বা স্বভাব ধর্ম্মে দেহের হীনতা আসিয়া ইন্দ্রিয় ও মন বিমলিন হইলে, রামের আর সে চেতনার প্রকাশ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মার জন্ম-মৃত্যু দুই-ই নাই, কিন্তু জন্ম মৃত্যু না থাকিলেও অন্য প্রকারে তাঁহার দুইটী ভাব আছে; একটি নিষ্ক্রিয়, অপরটি ক্রিয়া-শীল। এই নিষ্ক্রিয় ভাব ক্রিয়াশীল জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে সে ভাব জানিবার উপায়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যানুসন্ধিৎসু ঋষিগণ মাত্র মৌখিক উপদেশ দেন নাই। যিনি সে ভাবে সাধনা করিয়া নিজে নিষ্ক্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা জানিতে সমর্থ হইবেন; আর যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথে না গিয়া কোন যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাবের স্বরূপ বুঝি-বার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা বিফল প্রযত্ন হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। আত্মার ক্রিয়া-শীল ভাবই ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগ পদার্থে অবস্থান করিয়া জীব নামে অভিহিত হন এবং সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষাদির দ্বারা জীবের চেতনার পরিচয় প্রদান করেন। আর যাহা তাঁহার নিষ্ক্রিয় ভাব, তাহার কর্ম্ম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, লোভাদি কিছু নাই, কেবল জড়ের সহিত চৈতন্যের মাত্র সম্বন্ধ যুক্ত থাকে। এই সম্বন্ধ হইতে মৃত জড়-দেহের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় হানির জন্য সুখ, দুঃখাদি কিছু থাকে না। এজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"করণানি মনোবুদ্ধি র্বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিচ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধি রেবচ।
নৈব প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলং।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তন্মতে নাস্তি কিঞ্চিন।"

চরক, শাঃ ১অঃ

অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারা করণ। ইহাদের সহিত সংযোগে কর্ত্তার কর্ম্ম, সুখ, ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। কেবল মাত্র কর্ত্তা বা জীবাত্মা কর্ম্ম নিষ্পাদনে বা কর্ম্মফল ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন না। সংযোগেই এই সমুদয় হয়, সংযোগ ব্যতীত কিছু হয় না।

আত্মার এই ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয় ভাব দুইটি হইতে আর্য্যঋষিগণ তাঁহার তিনটি ক্রম বা অবস্থার পরিচয় পাইয়াছেন। নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, বিভুরূপী পরমাত্মা; আর ক্রিয়াশীল ভাব হইতে ষড়্‌ধাতুকী চতুর্ব্বিংশতিকী অবস্থা।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন আকাশ, তাপ, জল, বাতাস কিছুই ছিলনা, আর্য্যঋষিগণ সে সময়ে নিত্য, অব্যয়, অনন্তরূপী একমাত্র পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কারণ সেই কর্ত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই কর্ত্তাও সৃষ্টির পূর্ব্বকালে নিষ্ক্রিয়, সূক্ষ্মতম হইতে সূক্ষ্ম ছিলেন, তখন তিনি জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-অচেতন উভয় ভাবের অতীত ছিলেন। অথচ তাঁহাতেই জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-অচেতন সমুদয় আশ্রয় করিয়াছিল। সূক্ষ্ম বীজে যেমন জড় ও চেতন উভয় অংশই বিদ্যমান রহিয়া কালে বৃক্ষের প্রকাশ হয়, সেই প্রকার জড়-চেতন সমবায়ী আত্মার ক্রিয়াশীল অবস্থায় তাঁহা হইতে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। সুতরাং, সৃষ্টির বীজ সূক্ষ্মভাবে পরমাত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাঁহাতে লীন থাকে। আর ক্রিয়াশীল অবস্থায় প্রকাশ হয় মাত্র। এই জন্য মহর্ষিগণ "আদি-র্নাত্যাত্মানঃ ক্ষেত্র পরস্পর্যমনাদিবৎ" বলিয়া আত্মা এবং ক্ষেত্র উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

সৃষ্টির মূল যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম পরমাত্মায় অবস্থিত ইহা আমরা অনুভব করিতেছি মাত্র। তাহার পর এই সূক্ষ্ম বা প্রথম অবস্থা হইতে সৃষ্টিপ্রবাহ যত বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই অনুপাতে সূক্ষ্ম ও ক্রমশঃ স্থূলে পরিণত হইয়াছে। তাই আকাশ পরমাণু হইতে স্থূলতর বায়ু, বায়ু হইতে স্থূল তাপ, তাপ হইতে স্থূল জলের এবং জল হইতে স্থূলতর মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। সূক্ষ্মের এই স্থূল পরিণতি হইতে চেতনা অংশের ও স্থূল ও স্থূলতর—ষড়্‌ধাতুকী ও চতুর্ব্বিংশতিকী অবস্থা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন আত্মার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মন অন্যান্য সৃষ্ট বা প্রকাশমান পদার্থের ন্যায় পরমাত্মায় লীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে স্থূল চেতনা—ষড়্‌ধাতুকী ও চতুর্ব্বিংশতিকী আত্মার সংযুক্ত থাকিয়া কার্য্যকরী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চেতনার সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন জন্য যে অংশের উপর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি নির্ভর করে তাহাই 'মন' নামে অভিহিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন পরমাত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব হেতু কোন কার্য্য ছিল না, তখন বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তারও আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং মনেরও বিকাশ হয় নাই। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার সৃষ্টির জন্য প্রথম ক্রিয়াশীলভাব আসিয়াছি—জ্ঞানে। ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় যিনি জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ের অতীত ছিলেন, ক্রিয়াযুক্ত হইয়া তিনিই জ্ঞানময় হইলেন, কারণ সৃষ্টির জন্য জ্ঞানই প্রথম আবশ্যক। এইখানেই তিনি "ঋ" অর্থাৎ জ্ঞানময় নামে কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞানের ধারণার জন্যই মনের আবশ্যক হইয়াছিল। পরমাত্মা জ্ঞান-অজ্ঞান উভয় ভাবের অতীত স্বীয় স্বভাব

পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় রূপে স্বভাবের বিকৃতি পাইলেন, তখন সেই বিকৃতির পরিচয় হইল মনে। এজন্যই মনকে আত্মার বিকার বলা হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞানময় আত্মা মনের সাহায্যে কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব দেখিয়া যখন অহং অর্থাৎ আমিত্ব অনুভব করিলেন, তখন তিনি নিজকে বহুত্বে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাতে নিহিত সূক্ষ্ম অড়াংশ—আকাশ, বায়ু, তাপ, জল ও মৃত্তিকা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের অবয়ব গঠনের উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম জড়পদার্থের সহিত চেতনার সংযোগেই তাঁহার ষড়ধাতুকী অবস্থা। আত্মার এই ষড়ধাতুকী অবস্থায় মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, সমুদয় আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত এই অবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দ, স্পর্শাদি উপভোগের উপায় নাই।

এই সমুদয় উপভোগ জন্য ও সৃষ্টিপ্রবাহ বৃদ্ধির সহিত উক্ত ষড় অংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া যখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জ্ঞান কার্য্যকরী—অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সেই ষড়ধাতুকী আত্মাই এই স্থূল দেহে জীবাত্মা বা চতুর্ব্বিংশতিকী আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জীবাত্মা স্থূলদেহে রূপ রসাদি উপভোগ জন্য মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই উপভোগে কোথাও ইচ্ছা কোথাও দ্বেষ উপস্থিত হইয়া কখন বাসনার উদ্ভব কখন বা নিবৃত্তি আনয়ন করে। এই প্রকারে কামনা হইতে কামনান্তরের সৃষ্টি হইয়া পুনঃ-পুনঃ ইন্দ্রিয় সঞ্চালন ও ইন্দ্রিয় বিষয়-রূপ-রসাদি উপভোগের ইচ্ছা যেখানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানে তাহার উপভোগ জন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি প্রভাবে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি হানি হয়, তখন ঐ সমুদয় জীর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ-রসাদি উপভোগ সুচারুভাবে সম্পাদিত হয় না; অথচ পূর্ব্ব সংস্কার জন্য বাসনার কিছু অভাব হয় না, বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্যতা হেতু স্বীয় কার্য্যে শক্তিহানি জন্য জীবাত্মা জীর্ণ দেহেন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তখনও তাঁহার বাসনা সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, অথচ দেহ ও ইন্দ্রিয় অভাবে উপভোগ হয় না।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূলের ধ্বংস পুনরায় সূক্ষ্মে পরিণতি, বায়ু, তাপ, জলের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম ষড়ধাতুকী আত্মা রূপ-রসাদি উপভোগ জন্য যে স্থূল দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ব্বিংশতিকী আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দেহেন্দ্রিয় যখন নষ্ট হইল, তখন অবিনশ্বর আত্মা পুনরায় ষড়্ধাতুকী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তশ্চাব্যক্ততাং পুনঃ।"

অর্থাৎ সেই অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ততা প্রাপ্ত হন এবং ব্যক্তভাব নষ্ট হইলে অব্যক্ত ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হন।

জীবাত্মা দেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মাবস্থা হইতে বাসনা উপভোগজন্য যে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করেন, সে সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

সম্পূর্ণ ধাতু পুরুষের এবং বিশুদ্ধ শোণিত গর্ভাশয়া সম্পন্না নারীর—

"যদা ভবতি সংসর্গ ঋতুকালে,
যদা চানয়োস্তথৈব যুক্তয়োঃ
সংসর্গেতু শুক্র শোণিত সংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়
গতং জীবোবেক্রামতি
সত্ত্ব সম্প্রয়োগাৎ, তদা
গর্ভোহভিনির্ব্বর্ত্ততে।"

চরক, শাঃ ৩য় অধ্যায়—

যখন ঋতু শুদ্ধির পর মিলন হয় এবং যখন উভয়ের এই প্রকার যুক্তি হইতে গর্ভাশয়ের শুক্র-শোণিত সম্মিশ্রিত হয়, তৎকালে (ষড়-ধাতুকী অবস্থায় স্থিত) জীবাত্মা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে মনোবেগে গর্ভাশয়গত মিলিত শুক্র শোণিতকে প্রাপ্ত হন, তখন গর্ভের উৎপত্তি হয়।

দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি জরা ব্যাধি প্রভাবে নষ্ট হইলে মন কিছু নষ্ট হয় না, কারণ মন ঐ গুলির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে। তাহা জীবদেহে যেমন জীবাত্মার সংযুক্ত ছিল, আত্মার দেহ ত্যাগের পরও সেই প্রকার সংযুক্ত থাকিবে। এই মনের অবস্থিতি হেতু পূর্ব্বের সকল প্রকার অতৃপ্ত বাসনা আত্মায় থাকিয়া যায় এবং এই অতৃপ্ত বাসনার উপ-ভোগ জন্যই আত্মার আবার স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। এই প্রকার দেহান্তর সংযোগ কালে চেতনার বাসনানুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রহণের আবশ্যক হয়। এই আবশ্য-কানুযায়ী দেহের গঠনকার্য্য সম্পন্ন জন্য জীবের ত্যক্ত প্রাপ্ত দেহাংশ মৃত্তিকা, জল, তাপাদির ও খাদ্যাদির ভিতর দিয়া শুক্র শোণিতাখ্য দেহের বীজরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ইহাই জন্মান্তর ব্যাপারের ভিত্তি। এখন ইহা হইতে রাম-শ্যামরূপী জীবের কোন্ অংশের জন্মান্তর সিদ্ধ হইতেছে দেখা যাউক। পূর্ব্ব আলোচনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে রাম শ্যাম বা জীবের দেহের ও ইন্দ্রিয় সমূহের জন্মান্তর হয়, কিন্তু জীবের দেহেন্দ্রিয়ের এই প্রকার জন্মান্তরে অপরের সম্পূর্ণ দেহেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি না হইতেও পারে—এমন কি হয় না একথাও বলিতে পারা যায়। জীবের মন সংযুক্ত চেতনা অংশের পুনর্ব্বার দেহ গ্রহণে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল প্রকৃতি যে পরজন্মে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ অতৃপ্ত বাসনা উপভোগ জন্যই যদি জীবাত্মার জন্মান্তর গ্রহণ আবশ্যক হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের যে সমুদয় দেহী তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহার অভাব থাকিবে। এই কারণেই ভূতপূর্ব্ব কোন জীবের প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান কোন জীবের প্রকৃতির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ও আত্মা প্রকারান্তরে সকলেরই জন্মান্তর হইয়া থাকে। এই প্রকারে সকলের জন্মান্তর স্বীকৃত হইলেও মনযুক্ত চেতনার দেহান্তর গ্রহণেই প্রকৃত জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকা-রের উদ্দেশ্য নির্ভর করে বলিয়া ইহাকেই জন্মা-ন্তর বলা হয়; তবে দেহেন্দ্রিয়ের জন্মান্তরের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে এই মাত্র। এখন দেহীর এই প্রকার জন্মান্তর স্বীকারের সার্থকতা কি দেখা যাউক। জীবের মন যুক্ত চেতনার জন্মান্তর হয় অতৃপ্ত বাসনার পূর্ণভোগের জন্য, আরও তাহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণকালে বাসনানুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে হয়। এই বাসনা শুভ হইলে শুভ ফলভোগ জন্য শুভ অর্থাৎ সুস্থ সবল দেহেন্দ্রিয়ের আবশ্যক হইবে, আর অশুভ

হইলে অশুভ ফলভোগ জন্য বিকৃত দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। শুভাশুভ কার্য্যসমূহ হইতেই শুভাশুভ প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরদিন সৎকার্য্যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নিয়োগ করিয়া শুভফল উপভোগ করিয়াছে ও শুভ কামনার প্রবৃত্তি পাইয়াছে, তাহার চৈতন্য অবশ্যই দেহ ইন্দ্রিয় ত্যাগ কালে পূর্ব্ব সংস্কার বশে শুভ প্রবৃত্তি লইয়া যাইবে ও শুভ বাসনার উপভোগ জন্য সুন্দর সবল দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টফল লাভ করিবে, আর চিরদিন অশুভ কার্য্যে নিয়োগ জন্য শুভ চিন্তার অভাবে যাহার চিত্ত কলুষিত, তাহার চেতনা অসৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় অশুভ ফলপ্রদ দেহেন্দ্রিয় লাভ করিবে। যখন সদসৎ বাসনার জন্য চেতনা অংশকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় অংশও যখন সদসৎ কার্য্যফলে অদৃষ্ট ও দুর্দৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যে কোন জীবের পরবর্ত্তী জন্মের শুভাশুভ ফললাভের সহায়তা করে, তখন জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখিয়া দুষ্প্রবৃত্তির দমন করিতে পারিলে এই রোগ-শোক-তাপ জর্জ্জরিত মরবাসীর কোন স্বার্থকতা নাই কি?

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

সাহিত্য পরিচয়

ঝাঁসিফুল—একখানি গল্পের বই—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

গল্পপ্লাবিত বাঙ্গলা দেশ সাময়িক এক একজন গল্প লেখকের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। গল্প লেখকের অভাব নাই গল্পের বইয়েরও অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় বই লেখা ব্যাপারটা প্রধানতঃ ব্যবসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ ধর্ম্ম সমাজ বলিয়া কেহ আর বড় একটা খোঁজ রাখেন না। আমাদের দেশের লোক এখন গল্পের পূজক, গল্পের লেখক গল্পের ভাবে ভরপুর। সুতরাং দশখানির মধ্যে একখানি তেমন বই চাই দশের মধ্যে একজন তেমন লেখক চাই যিনি শুধু সমাজ গতির পরিবর্ত্তন, সমাজ-আদর্শের সৃষ্টি করিতেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। গল্পের ভিতর দিয়াই সাহিত্যের প্রচার বিজ্ঞানের বিকাশ, ইতিহাসের আলোচনা সম্ভব হউক বা লেখকের শ্রম পণ্ড উদ্দেশ্য বৃথা হইয়া পড়িবে।

দেবেন্দ্র বাবুকে সাহিত্যসেবিগণের একজন এবং বাজারের দশখানি গল্পের বইয়ের ভিতর তাঁহার রচিত 'ঝাঁসিফুল'কে একখানি উৎকৃষ্ট গল্পের বই বলিতে পারি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট বলিয়া সমালোচনা শেষ করা সহজ বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য তাহার গতি একটা আছেই। সমালোচনা করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ। বই হাতে পড়িয়াছে ভাল মন্দ না বলাও অন্যায়। দশের আলোচনার উপরই গ্রন্থকারের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে।

গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ রচনায় ভাষা হইয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া সকলকে আপনার সঙ্গে টানিয়া লইতেছে। সে টানে অনেকেই বাদ পড়িবেন না—আমরাও পড়ি নাই। গ্রন্থে অন্যান্য ত্রুটী থাকিলেও এইটুকুই বিশেষত্ব এইটুকুই ভবিষ্যৎ সাফল্যের সূচনা করিতেছে। সমাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত নূতন পথ, নূতন ধাঁচা

ধরিয়া দাঁড়ান এবং অন্যকে আকর্ষণ করাও গুরুর একক্ষায় উদ্দেশ্যের বিফলতাই সূচনা করে।

যাহা হউক সম্প্রতি 'বাসিফুল' সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনার পূর্ব্বে সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিমত দিলেই উহার অন্তরের কথা ফুটিয়া বাহির হইবে। ফুল চিরদিনই তাজা থাকে না—প্রথম দৃষ্ট সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তাহার একদিনের কথাই মনে চিরদিন জাগাইয়া রাখে। দেবেন বাবু একটী মাত্র বাসিফুলের যে সৌরভ আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা ভবিষ্যতের আরও নানা বর্ণের নানা সৌরভের তাজা ফুলের প্রার্থী। ফুল দেবতার ভোগ্যবস্তু। সাহিত্য-সংসারে বাসিফুল তাজা ফুলের ন্যায় একটা উন্মাদনা আনিয়া দিক্।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বাসিফুল' উল্লেখযোগ্য পুস্তক। এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কি হইলে ছোট গল্প পূর্ণতা লাভ করে সে কথা এখন বলিব না, এ পুস্তকে সকল গল্প পূর্ণতা লাভ করে নাই—প্রথমটি ও শেষেরটি যেমন হইয়াছে, মাঝের গুলি তেমন হয় নাই। আজি কেবল 'বাসিফুলের' ভাষার কথা বলিব—ইহার ভাষা অতুল্য বলিলেও অতিরঞ্জন হইবে না। আজি কালি সবুজভাষা, নীলভাষা, পীতভাষার বৈচিত্র্যে চোখে ধাঁধা লাগিতেছে, সাদাভাষার কারচুপি আর দেখিতে পাই না। এই গ্রন্থে তাহা পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছি। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"মানব হৃদয়ে একদিন না একদিন বসন্তের বিকাশ হয়। যেদিন পাখীর প্রমত্ততান সুপ্ত প্রাণ জাগাইয়া তোলে; যেদিন ফুলের গন্ধ মদিরার ন্যায় মনে মত্ততা সঞ্চার করে; যেদিন ভৃঙ্গ গুঞ্জনে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠে; যেদিন সমীর সংস্পর্শে অন্তর নবরাগ রঞ্জিত কিশলয়ের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, যেদিন কিশোর যৌবন রূপের ডালি লইয়া উপান্ত দেবতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহে; যেদিন ব্যাকুল বাসনা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আরাধ্যের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, তৃষিত চিত্ত মিলনের সাগর সঙ্গমে স্নাত হইবার নিমিত্ত অধীর হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়।"

দেখিবেন বসন্তের ও যৌবনসুলভ মানব হৃদয়ের একত্র সমাবেশের কি সুন্দর বায়স্কোপ চিত্র। যে চিত্রে শ্রীমতী বলিয়াছিলেন "বাঁশী কাণে বাজে বা প্রাণে বাজে"—এ সেইরূপ চিত্র, মধুকর মালতী মুকুলে বসিয়া গুন্ গুন্ করিতেছে—হৃদয়ের মাঝে কে যেন কিসের লাগি সেই মধুর সুরে সুর মিলাইয়া—গুন্ গুন্ করিতেছে। সাহিত্যের অপূর্ব্ব বায়স্কোপ এটাও দেখাইতেছে ওটাও শুনাইতেছে। নব কিশলয় কাঁপিতেছে, আর বসন্ত সমীর যেন আনন্দে অঙ্গস্পর্শ করিতেছে, সাধারণ জড় বায়স্কোপ কেবল দেখা যায়, দেবেন্দ্র বাবুর এই অপূর্ব্ব সাহিত্য বায়স্কোপ দেখা যায় শুনা যায় স্পর্শ করা যায়। দেবেন্দ্র বাবু এইরূপ লেখা লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন, এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য হইলাম।"

মফঃস্বলের বাণী

বাঙ্গালীর কি হইল?

আজ বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে "হা অন্ন হা অন্ন" আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে কেন? অতীতের সেই ক্ষেত্র সেই নদনদী সেই পরিশ্রমী কৃষককুল বিদ্যমান তবুও কেন বাঙ্গালী উদরান্নের জন্য এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত! এ দুর্দ্দশা তাহাদের স্বকৃত দোষের ফল। তাহারা বহুমূল্য কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাঁচ লইবার জন্য ব্যস্ত। কি করিলে দেশের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে কি উপায়ে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে, কি করিলে কৃষককুল সুস্থকায় ও কার্য্যক্ষম হইবে, কি করিলে ধ্বংসোন্মুখ গোজাতির রক্ষণ হইবে, এই সমুদায় আবশ্যকীয় ও আলোচ্য বিষয়গুলি আমরা উপেক্ষা করিতেছি। যদিও এই সমুদায় বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের কর্ম্মবীর সন্তানগণ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তথাপি কোনও সুফল ফলিতেছে না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনে যতগুলি কঠিন ও আশু প্রয়োজনীয় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্ব প্রধান। উদরে অন্ন নাই গৃহে লক্ষ্মী নাই পরিধানে বস্ত্র নাই অথচ ডেলিগেট কার্ড পাইয়া সাহিত্য সভায় ছুটিয়াছি। গৃহে পুত্রটি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে—নব্য যুবকের স্ত্রীটি নব্য রোগে আক্রান্ত, মাতা চোখে দেখেন না পিতা হৃদ্রোগ, আর ঘরেও অন্ন নাই এত চিরন্তন প্রথা। অন্যদিকে সভ্যটি দুইটী কবিতা লিখিয়া কবিতার বিকট উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে ছুটা ছুটি করিতেছে। অন্য দিক হইতে দলে দলে নামধারী সভ্যগণ বিভিন্নরঙের জাতীয় পতাকা লইয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন কায়স্থ সভা ক্ষত্রিয় সভা প্রভৃতি কত কি সভায় ছুট পাট করিয়া দীর্ঘশ্বাসে ছুটিয়াছেন! বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাঁহারা সভাপতির অভিভাষণ, অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণের ওজস্বিনী বক্তৃতা, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রভৃতি শুনিয়া মনে করিলেন দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিল; এবার আমরা মানুষ হইলাম। সভা করিয়া দুর্ভিক্ষরাক্ষসীকে তাড়াইব, প্রবন্ধের মন্ত্র আওড়াইয়া ম্যালেরিয়া প্রেতিনীকে বিদূরিত করিব ওজস্বিনী বক্তৃতায় গ্রামের নদনদী ও পুষ্করিণীগুলিকে বর্ষার যৌবন আনিয়া দিব; শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া শুনিতেছেন ভাবিতেছেন আর "যমসি মধুরাং গচ্ছতি" করিতেছেন এবং উৎফুল্ল হইয়া মাঝে মাঝে করতালি দিতেছেন সভা ভাঙ্গিল সভামণ্ড আবার অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। সভ্যমহোদয়গণ গৃহাভিমুখী হইলেন। দেশহিতৈষণার ভাব স্রোতে ও সামাজিক উন্নতি সাধনের উদ্যম-প্রবাহে ভাটা পড়িল। ভাটা এক বৎসর চলিল। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের প্রারম্ভে জোয়ার ছুটিল। এত বড় বিকট অপ্রাকৃতিক জোয়ার! তোমার জোয়ার ছয়মাস আর ভাটা ছয়মাসই থাকুক, জোয়ার মাত্র একমাস রহিল কেন? নদীর জোয়ার ও ভাটা দুইতো সমকাল স্থায়ী! সমাজ নীতিত প্রকৃতির সত্তার বাহিরে নয়। কোনও বক্তা বা শ্রোতা গৃহে ফিরিয়া

শুনিলেন পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; পিতার পণ নিবারণী প্রথার প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইয়া গেল রজতখণ্ডের মোহিনী-মূর্ত্তি কল্পনা নেত্রে ভাসিতে লাগিল পুত্রটীকে দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। মেয়েটি যেমন বয়স্থা হইয়া উঠিল আবার সভায় যোগ দিয়া পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিলেন। তখন আবার পণ প্রথার প্রতিজ্ঞার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, কন্যার উড়ন্তবসনের বাতাসে ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল; হৃদয় আবার উত্তপ্ত হইল। উষ্ণ শোণিতপ্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল! সেই আগুনে প্রতিবাসী সামাজিক ভ্রাতৃবৃন্দের নির্ব্বাপিত অগ্নিকণা পুনরুদ্দীপিত করিতে চেষ্টা পাইলেন! চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অগ্নি নাই, জ্বলিবে কিসে? সভাটির পূর্ব্বাবস্থারই ন্যায় তাঁহাদের আছে শুধু ভস্ম। বুকের আগুন বুকেই জ্বলিল; তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কন্যাটিকে বিদায় করিতে হইল। এই কি সভার উদ্দীপনা ও সাধনা?

অন্য দিকে ব্রাহ্মণ সভার সভ্যমণ্ডলী ভারতীয় সমুদয় ব্রাহ্মণের উন্নতিসাধন-কল্পে মহামিলনের জন্য; কায়স্থ সভ্যগণ চাতুর্ব্বর্ণিক কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলনের ও একতা বন্ধনের জন্য বেশ মোটা মোটা প্রস্তাবনা করিলেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবনা গৃহীত হইল। ইহা কি সভ্যগণের "ভাঙ্গা ঘরে চুনকাম করা নয়? সভ্যগণ একতা নিবন্ধনে সচেষ্ট; ব্রাহ্মণেরা উন্নতিকল্পে প্রাণপণে সভা করিতেছেন; নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নাই; ছেলেটি গায়ত্রি ভুলিয়া গিয়াছে পৈতা হয়ত পকেটস্থ হইয়া রজকগৃহে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইসেন্স (Licence) প্রাপ্ত মেছ—যোড়িংয়ে 'সুট' আহার করিতেছেন গৃহের রত্নগুলি যদি এমন তবে গৃহসজ্জার উপায় কি? দেশে পুরোহিত নাই, যাঁহারাও আছেন তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করিয়া সেই গুলি বেশ সযত্নে মূলতবি রাখিয়া 'বিদ্যাস্থানে ভবেদ্বচঃ' মন্ত্র পড়িতেছেন। এই কি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব? আধুনিক অধিকাংশ ব্রাহ্মণই 'থার্ড ক্লাসের ইট' দেশে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ও প্রণম্য ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা ভাবের বিপাকে পড়িয়া থার্ডক্লাস ইট দ্বারা সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে সচেষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মার কলঙ্ক রটাইতেছেন।

কায়স্থের ঘরে ঘরে গৃহবিচ্ছেদ নিজের ভাইকে সরাইয়া দিয়া সস্ত্রীক নব্যজগতে কবিত্বময় রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন; তাঁহারাই আবার চাতুর্ব্বর্ণিক মিলনের জন্য ব্যস্ত! এরূপ মিলন কি সম্ভব? সমাজ ক্ষেত্রে সংসারের প্রতি সত্যের ভিতরেই সমাজের সমস্ত গুণগুলি নিহিত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত প্রাণেই ও পবিত্র সংসার বন্ধনেই সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টির উন্নতি না হইলে কি সমষ্টির উন্নতি সম্ভব?

আমরা এখন ভাঙ্গাঘরে চুণকাম করা চাই না। আমরা চাই—ছোট খাট শান্তির নিকুঞ্জবনে একখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী পর্ণকুটীর। আমরা ক্ষণিক সামাজিক উন্মাদস্রোতে প্রবল-বেগে ভাসিতে চাই না; আমরা চাই ক্ষুদ্র কুটীরে সংসারের ক্ষুদ্র প্রবাহিনীর মৃদুমন্দ-স্রোতে অবগাহন করিতে। আমরা প্রস্তাবনা চাই না; আমরা চাই সাধনা; আমরা ঘরের জিনিষ ফেলিয়া দিয়া এরূপ সভায় ছুটাছুটি করিতে চাই না; আমরা চাই—প্রতি গৃহে শান্তিময়ী সভা ও সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপন। আমরা অনৈসর্গিক উপায়ে সমাজের আয়তন স্ফীত করিয়া শেষে স্ফোটকাক্রান্ত হইতে চাই না। আমরা চাই ক্ষুদ্র গৃহে দীর্ঘকায় হইয়াও সুস্থ ও সবলদেহে আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় পরম পদ চিন্তা করিতে। আমরা চাই পবিত্র সংসার বন্ধন। আমরা চাই প্রেমের পবিত্রতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের কঠোরতা আর ভক্তির নীরবতা।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

সাধনা

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়
তাই কণ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড
সপ্তম বর্ষ

১৩২৩, আশ্বিন

আলোচনা

১। আবাহন

আহ্বান করিব কাহাকে? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহার আশ্রয়ে আছি, যাঁহাকে আহ্বান করিতেছি আজ আবার নবীনভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে কি মা, এস!

সন্তান নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়, কোলের ওটান স্নেহ দূরে গিয়া মমতার সূত্র বৃদ্ধি করে, সে তো তোমার আমার পক্ষে, সংসারী মানুষের কাছে। এস একবার ভাবি মা কি সেই—যিনি চতুর্ভুজা-দ্বাত্রিংশৎকেশরী-পৃষ্ঠ বিহারিণী, যিনি দেবদানবের যুদ্ধে কভু চামুণ্ডা, কভু বা শঙ্করবুকে দণ্ডায়মানা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাত্রী কালিমাময়ী মা। তাঁকে তুমি আমি ডাকিয়া লইব কি করিয়া, আজ তুমি আমিই তাঁর আহ্বানে মিলিত। আমাদের সুখ-দুঃখ, তন্দ্রা-নিদ্রা যত কিছু করণীয় সবই যেন ভুলিয়া যাইতেছি। দীর্ঘ প্রবাসী, দুঃখ কাতর সন্তান আজ মায়ের কাছে সমাগত।

দীর্ঘ বরষের কত সুখের কাহিনী আজ আমাদের হৃদয় হইতে উথলিয়া উঠিতেছে, কত দুঃখের স্মৃতি আমাদের পঞ্জর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুখ তখনই যখন হসন হসন হাসিয়া তুচ্ছ ভাবি, ঝড়-ঝটিকার আক্রমণ খর্ব্ব করিয়া বাধা বিঘ্নকে দলিত করিয়া মা বলিয়া ছুটিতে চাই। আর দুঃখিত হই তখন যখন ভাবি সৃষ্টির সময় যে আবেশ লইয়া জন্মিয়াছি তার কিছুই করি নাই, আমাদের চারিদিকে শত শত অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়াও মানুষের মত আজ হইয়া সেগুলিকে বরণ করিতে পারিতেছি না, "নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্ব্বল" কেবল ভয়-ভীতির বৃদ্ধি করিতেছি তাদের দূরীকরণের কোন উপায়ই করিতেছি না, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চরের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেশ আমাকে চালাইতে চাহিতেছে আর আমি অনবরত কেবল উপেক্ষা করিয়া সময় চাহিতেছি।

ক্লান্তসন্তানের জননীর কাছে বেশী বলা অনাবশ্যক তাই আর বলিতে চাহিনা—আজ আমরা শয্যাগত, দেহ আমাদের অস্থিসর্ব্বস্ব, বদনমণ্ডল বিশুষ্ক, চলনে মূর্চ্ছিতপ্রায়, জীর্ণ ও জীর্ণ মূর্ত্তিই আমাদের আলোচনার বিষয় ব্যাধির সংবাদ বহন করাই আমাদের কর্ম্মময় জীবনের অন্যতম কাজ।

বাঙ্গালী-ভারতবাসি! আজ তুমি আমি মাকে পূজা করিব ভাবিয়াছি, কিন্তু পূজা করিতে জান কি? বাঙ্গালার পুষ্পোদ্যান কোথাও শুকাইয়া গিয়াছে, কোথাও বা জলে ডুবিয়া আপন অস্তিত্বের সন্ধান পাইতেছে না, তবে কি পূজা করিবে না? আছে তোমার আমার পক্ষে এক উপায়, এতদিন যাহা বলিয়া ভাবিয়াছি, তারই আবেগস্রোতে সমস্ত হৃদয় আমাদের ভিজিয়া যাক, আর তারই মধ্যে সন্তর্পণে ভক্তিটুকু দিয়াই পূজা করিব। উহা দুঃখ ও আশার তাপে-জলে বর্দ্ধিত সুতরাং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের খর কিরণ অথবা বর্ষার ভীষণ প্লাবন তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।

কর্ণ-শিবি রাজার দেশের মাটির উপর দাঁড়াইয়া, দুর্ভিক্ষ-ব্যাধির করাল-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াও একবার বলি—সে কথা তুমি আমিই বলিতে পারি মায়ের পূজায় আমরাই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতে পারি। তবেই না আমাদের শুষ্ক কণ্ঠের অস্ফুট স্বরে মায়ের শুষ্ক মুখ হাস্যময় হইবে।

এই দেশে যদি জন্মিয়াছ আবার একবার মা বলিয়া ডাক! মা ডাকিতে দ্বিধা কেন, একবার ক্ষীণ কণ্ঠের ভিতর দিয়া প্রাণপণে ডাক—মা! আজ যিনি জড়ভাবে দণ্ডায়মানা কাল তিনিই চেতনভাবে রক্ষাকর্ত্রী, আজ তুমি যাহাকে লইয়া সাকার নিরাকারের তর্কে ব্যস্ত কাল তুমিই তার ভাবে বিভোর হইবে।

মা আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত করুন, সাহস সংযম ও ত্যাগের দ্বারা পুষ্ট করুন, স্মৃতি ও প্রীতির দ্বারা আমাদিগকে দীপ্তিমান্ করুন, শৌর্য্য-বীর্য্য ও সেবাধর্ম্মের দ্বারা শিক্ষাদান করিয়া কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলুন তাহা হইলে তুমি আমি সর্ব্বত্রই উপলব্ধি করিব "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশেই মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, আমাদের হৃদয় দৌর্ব্বল্যেই মায়ের বিসর্জ্জন।

* *
*

২। ইতালীয় সাহিত্য

লাটিন উদ্ভূত ভাষার মধ্যে প্রভেঁসাল, ইতালীয়, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষাই সর্ব্ব-

প্রধান। ইহার মধ্যে প্রভেঁসাল ভাষাতেই সর্ব্ব প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের যখন সূত্রপাত হয় তখন প্রভেঁসালি সাহিত্যের গৌরব-রবি ঠিক মধ্যাহ্ন গগনে উঠিয়াছিল। উহার প্রকৃতি-গত একতা, স্থানগত সান্নিধ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বশতঃ আদি ইতালীয় সাহিত্য প্রভেঁসাল সাহিত্যের ছত্রছায়ই জন্মে এবং ঐ ছায়ায়ই বর্দ্ধিত হয়।

খৃঃ অব্দ ১২২০ সালের পূর্ব্বে প্রকৃত ইতালীয় সাহিত্যের সূত্রপাত লক্ষিত হয় না। এমন কি এই সময়েও প্রকৃত ইতালীতে ইতালীয়ের আবির্ভাব হয় নাই। সিসিলী দ্বীপের রাজধানী পালার্মো নগরে, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের উৎসাহে সর্ব্ব প্রথম ইতালীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইতে থাকে। এই ইতালীয় সাহিত্য-সম্পদ কবিতামূলক, প্রভেঁসাল সাহিত্যের আভাষ ইহাতে বিশেষ অনুভূত হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের ভাষা টাস্কানীতে প্রচলিত অনুভাষার সদৃশ। ফ্রেডেরিক স্বয়ং কবি ছিলেন। সিসিলীবাসী অন্যান্য কবির মধ্যে সিয়েলো দাল কামো সর্ব্ব প্রধান। "প্রণয়ী এবং প্রণয়িনীর আলাপ" ইহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। জাকোপো অন্য একজন সিসিলীয় কবি। যাদ্যভাবোধ ইহার প্রধান অন্তরায় কিন্তু কবিত্ব বিষয়ে ইনি অগণ্য নহেন।

ইতালীয় সাহিত্যান্বিত এক স্ফুলিঙ্গ সিসিলী হইতে টাস্কানীতে আসিয়া পড়ে। ঘটনা অনুকূল থাকায় এই স্ফুলিঙ্গ ক্রমেই আয়তনে বাড়িয়া দীপ্ত সাহিত্যালোকে সমুদয় টাস্কানী এবং ইতালীর অন্যান্য অংশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কয়েকটী রাজনৈতিক ঘটনা এই দীপ্ত এবং সুস্থির সাহিত্যালোকের প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূল হইয়া উঠিল। হোহেনষ্টাউফেন রাজবংশ ইতালীতে নির্ম্মূল হইলে পর টাস্কানীতে প্রবল প্রতাপান্বিত এমন কোন একটী রাজকুল বা রাজা রহিল না যাহার একেশ্বরত্বে সমুদয় সন্নিহিত রাষ্ট্রকুল, একীকৃত হইবে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকুল মধ্য ইতালীকে বিশেষতঃ টাস্কানীকে যেন এক স্বাধীনতার মন্ত্রপূত জালে বেষ্টন করিল। সাধারণতন্ত্রের মূল প্রকৃতি জনসাধারণের রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় জীবনের উচ্চ অংশে ও আলোচনায় প্রবেশাধিকার। সাধারণের এই প্রবেশাধিকারের ফলে সাধারণের ভাষা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে লাগিল। লাটিনে কাব্য-রচনা করিলে কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকে বুঝিত, কিন্তু জনসাধারণের ভাষায় লিখিত হইলে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকে উহা বুঝিত। আরও সাধারণতন্ত্রের ফলে দেশভক্তি এবং নিজ নিজ বাসভূমির গর্ব্ব যেমন জনসাধারণের মুখে প্রচারিত হইত তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাবুক কবিগণের হৃদয়ে জনিত। আর হৃদয়ের এই স্বজনশীল উত্তাপ মাতৃভাষায় নিঃসরণ করিয়াই যেন কবিকুল সার্থক মনে করিতেন।

এই জাতীয়তাপূর্ণ, জনসাধারণের ভাষায় লিখিত ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে। দান্তে যে ইতালীর সর্ব্বকালীন কবিকুলের শিরোমণি তা নয়—তিনি ইতালীয় সাহিত্যের আদি কালের কবি এবং চিরজনের জন্য ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে একজন।

কিন্তু আদিম কালের ঘোরতর অরণ্যভূমি এককালেই জনপূর্ণ, স্বীয় ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, জ্ঞানালোকে দীপ্ত নগরীতে পরিণত হইতে

পারে না। একদল লোক অরণ্যকে প্রান্তরে পরিণত করে। সর্ব্বপ্রথমে হয়ত ঐ প্রান্তরে গরু মহিষাদির উপভোগ্য ঘাস ভিন্ন অন্য কিছু বা কোন শস্য জন্মে না, ক্রমে হয়ত ঐ ভূমিতে শস্য জন্মিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। ক্রমে নগরীতে কৃষি, শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান আসিয়া সভ্যতার পরিচয়ত্ব গ্রহণ করে। ইতালীয় সাহিত্যে দান্তের স্থান জগদ্বিখ্যাত, সমুদ্ধ নগরীর ন্যায়। কাজেই এই নগরী এক চোটেই অরণ্যানী হইতে মধ্যে তুলে নাই মধ্যে অরণ্য পরিষ্কারান্তে প্রান্তর এবং ক্রমে শস্যভূমিরও কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই অন্তর্বর্ত্তী কালের কবির মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান—

১। গুইটোনে ডি আরেট্‌সো

অল্প বয়সে ইনি প্রণয়-কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রেম কবিতাগুলিকে অনেক বিষয়ে পেট্রার্কের উপযুক্ত পূর্ব্বানুকালিক কবিতা বলা চলে। মধ্য বয়সে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ঘ অনুকূল "কাভালিয়েরি ডি সান্টা মারিয়া" নামক ভ্রাতৃকুলের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর তিনি নীতি, ধর্ম্ম এবং মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কবিতা লিখিতেন।

২। গুইডো গুইনি চেল্লি

ইহাঁর জন্মস্থান "বলোনা"। ইহাঁর কাব্যগুলি পূর্ব্বপূর্ব্ব কবিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী ভাবপূর্ণ। প্রভেঁসাল ভাষার কবিগণের প্রণয়-কবিতা গুলির গাম্ভীর্য্য খুব কম। কিন্তু গুইডোর প্রণয়-কবিতা সমধিক ভাবপূর্ণ, তেজ প্রকাশক এবং সম্মান-উৎপাদক।

অন্যান্যের মধ্যে "গুইডো দেল্লে কলোন্নে" এবং "গাইকো বি ফিলিপ্পোত্ত" নাম উল্লেখ যোগ্য। অধিকাংশ সাহিত্যেরই আদি বিকাশ কবিতায়। ইতালীয় সাহিত্যের পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। দান্তের "ভিটা নুওভা"র পূর্ব্বে প্রকৃত ইতালীয় গদ্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু "ভিটা নুওভা"র গদ্যেরও পূর্ব্বে ব্রুনেত্তোর ইতালীয় গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ত্রেসরে লাটিনি"র "টেসোরেট্টো" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইনি তত্তৎকালের সর্ব্বজ্ঞ (Encyclopaedist) বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, "টেসোরেট্টো"তে ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। "ত্রেসরে লাটিনি" কবিতায় একটি স্বপ্নের বিবরণ দেন। দান্তের ডিভাইন কমেডির গঠন কল্পনা ইহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ব্রুনেত্তো লাটিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বিখ্যাত ইতালীয় লেখক। দান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য যে কয়জনের নাম উল্লিখিত হইল উঁহারা সকলেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। কাজেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শীর্ষে উঁহাদের নাম লিখিতে পারা যায়।

* * *

৩। ব্যাঙ্কের কাজ

ব্যাঙ্ক জিনিষটা কি তা দেশের অন্ততঃ মধ্যবিৎ অবস্থার সকল লোকেই জানেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক-কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং ব্যাঙ্ক জিনিষটার যাবতীয় কার্য্য প্রকরণ অতি অল্প লোকেই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। উত্তম জামিন (Security) দিলে "ব্যাঙ্ক হইতে মহাজন অপেক্ষা অল্প সুদে টাকা পাওয়া যায়, একথা কার্য্যতঃ বা মৌখিক অনেকেই জানেন। কিন্তু মহাজন, অর্থাৎ যে সহজে টাকা ধার দেয় সে চামাকে যেমন চামড়া হইতে মাংস খুঁচিয়া বাহির করে এবং

মুদি যে রকম পিঁপড়া মারিয়া গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঠিক সেই ভাবে সুদ আদায় করে। তাহার মধ্যেও দৃষ্টি-রোচক দালানে অবস্থিত তন্ত্রবেশী কেরাণী কর্তৃক বিভূষিত এবং প্রায়ই সশস্ত্র প্রহরী কর্তৃক দিবারাত্রি সুরক্ষিত ব্যাঙ্কের মধ্যে যে তফাৎ কিছুই নাই—উভয়েরই মধ্যে যে উদ্দেশ্য, কার্য্য এবং এমন কি কার্য্য-প্রণালীও অন্ততঃ অনেকটা এক—একথা বলিলে অনেকেই হয়ত তন্ত্রভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন এবং হয়ত গুপ্ত অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য স্বীকারসূচক শির সঞ্চালন করিবেন। কাজেই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কি কি বিষয়ে মহাজন এবং ব্যাঙ্ক এক। মহাজন জায়গা-জমি বা গহনা "বন্ধক" রাখিয়া টাকা ধার দেয়। টাকার রীতিমত সুদ লয়। অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে "বন্ধক" রাখা জিনিষের উৎপাদ্যের ভাগী হয়। ব্যাঙ্কেরও এক কাজ অবিকল এইরূপ। ধার টাকার প্রয়োজন—ব্যাঙ্কের সন্তোষের মত জামিন লইয়া উপস্থিত হইলেই প্রচলিত সুদে টাকা দিতে প্রস্তুত হইবে। ব্যাঙ্কের ও মহাজনের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রত্যেকেরই কার্য্যকারিতার বিভিন্নতায়। মহাজন হয়ত সুদের লোভে বা ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় বা বন্ধুতার সূত্রে জামিনের ভালমন্দ বিচার না করিয়া টাকা ধার দিবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের বন্ধুতা করিবার সময় বা অবসর অতি অল্প। যদিও ব্যাঙ্কও বন্ধুতার খাতির কখন কখনও দেখায় সে কেবল মিষ্টবাক্যে গ্রাহক তুষ্ট রাখিবার জন্য। আরও ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা নিজ উত্তমর্ণগণকে চাওয়া মাত্র টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাজেই যে রকম জামিন প্রয়োজন হওয়া মাত্র নগদ টাকায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে ও স্বল্পায়াসে পরিবর্ত্ত করা যায় সেই রকম জামিনে মাত্র টাকা ধার দিতে হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে ব্যবহারের এই পার্থক্য থাকিলেও ব্যাঙ্ক ও মহাজনের মধ্যে সাদৃশ্য এই—উভয়েই জামিন লইয়া টাকা ধার দেয়। উভয়েই টাকার সুদ লয়।

কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ কেবল জামিন লইয়া টাকা ধার দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাঙ্কের অন্যবিধ কার্য্যকলাপ দেশের অন্য একটী ব্যবহারের সাহায্যে সহজে বুঝা যায়। উহা পোষ্ট অফিস। সকলেই জানেন ন্যূনপক্ষে ২৫৲ টাকা লইয়া যে কোন পোষ্ট অফিসে গেলেই পোষ্ট অফিস উহা রাখিবে। পোষ্ট অফিস একখানি বহিএ এই ঋণ-স্বীকার করিবে। উহাতে কত টাকা জমা রাখা হইল তাহার জন্য একদিক ও কত টাকা তুলিয়া লইল তাহার জন্য অন্য দিক নির্দ্ধারিত আছে। অন্যান্য বিস্তারিত নিয়মাবলীতে এখন আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা দরকার যে সাধারণতঃ চাওয়া মাত্র টাকা লইবার বন্দোবস্ত করিলে পোষ্ট অফিস গচ্ছিত টাকার উপর কোন সুদ দেয় না।

ব্যাঙ্কেরও অন্যবিধ কাজ এই। যাহার গচ্ছিত রাখার মত টাকা আছে তিনি কোন ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা রাখিতে পারেন। টাকা কি ভাবে লওয়া হইবে সেই অনুসারে ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার উপর সুদ দেওয়া বা না দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ চাওয়ামাত্র টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে পোষ্ট অফিসের ন্যায় ব্যাঙ্কেও কোন সুদ দেওয়া হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অন্তরে টাকা তোলার নিয়ম করিলে ব্যাঙ্কে সুদের বিভিন্নতা কিরূপ তাহা স্থানান্তরে বিশদভাবে বলা হইবে। এখন মাত্র এই কথা উপলব্ধি করান উদ্দেশ্য

যে, ব্যাঙ্কে পোষ্ট অফিসের ন্যায় টাকা রাখা চলে। টাকা তোলার পার্থক্য অনুসারে ব্যাঙ্ক এই টাকার উপর সুদ দিয়া থাকে, না ও দিয়া থাকে।

পোষ্ট আফিসে টাকা রাখিলে যেরূপ এক-খানি পুস্তক দেওয়া হয়—ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে সেইরূপ টাকা জমা এবং টাকা তোলার হিসাব রাখার জন্য একখানি পাস বুক (Pass book) টাকার মালিককে দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা প্রকৃতপক্ষে তোলা হয় এক একখানি চেক দিয়া এই চেক বুকের প্রত্যেক পাতায় চার পয়সার ষ্ট্যাম্প থাকে। ইহাতে ব্যাঙ্কের নাম ছাপা থাকে এবং গচ্ছিত-কার যাহাকে টাকা দিতে চান তাহার নাম এবং কত দিতে চান তার পরিমাণ লিখিবার মত স্থান থাকে। গচ্ছিতকারকে অবশ্যই নাম সহি করিতে হয়। যাহার নামে গচ্ছিত-কার চেক কাটান সে নাম সহি করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে লিখিত পরিমাণ টাকা আদায় করিতে পারে। এখন, ব্যাঙ্কের স্বরূপ প্রকাশক দুইটী কার্য্য প্রণালী নিদ্ধারণ করা গেল—ব্যাঙ্ক জামিন লইয়া সুদে টাকা ধার দেয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা যায়। ঐ টাকা তুলিবার রীতির বিভিন্নতা অনুসারে ব্যাঙ্ক কখন এই টাকার উপর সুদ দেয় কখন সুদ দেয় না।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া সামান্য চিন্তা করিলে এবং মানুষ কি ভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চালায় তাহার জ্ঞান সামান্য মাত্র রাখিলে —অনেকগুলি প্রশ্নই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ঐ প্রশ্নগুলি অবশ্যই সত্বর তুলিব এবং যথাসম্ভব উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক বিষয়ে একটী সাধারণ নীতি স্মরণ করা আবশ্যক। ব্যাঙ্ক জিনিষটা হাঁড়ি ঘটীর মত একটা প্রত্যক্ষ জিনিষ। উহাকে বুঝিতে চাহিলে যদি নীতি (Theory)র অবতারণা করা হয় তাহা হইলে সকলেরই বৈধ্য-চ্যুতি হইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্রের বিষবৃক্ষেরও দু এক অধ্যায়ের পরই তিনি পাঠককে সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন। তাহার লোভটা সাধারণ হইলেও তাহার উপার্জ্জন এবং আলোচনা তৃপ্তিকর হওয়া স্বাভাবিক নয়। কাজেই এই প্রথম নীতিটী সহিষ্ণুতার সহিত আয়ত্ত করিতেই হইবে।

যা বলা হইয়াছে তা এক কথায় বলিতে গেলে ও দেশের মুদ্রার কথা না বলিলে—টাকার আদান প্রদানই ব্যাঙ্কের কাজ। কাজেই টাকা জিনিষটা কি তা সর্ব্বপ্রথম বুঝা প্রয়োজন। কথাটা অর্ব্বাচীনের প্রলাপের মত শুনা যাইতে পারে। টাকা কে না চিনে, টাকা তঙ্কা রুপেয়া প্রভৃতি নামের বিভিন্নতাও যে না বুঝে প্রকৃত বস্তুটী সম্মুখে স্থাপন করিলে উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে কাহাকেও কালক্ষেপ করিতে হয় না। মধ্য আফ্রিকার বর্ব্বরই হউক আর মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ বর্ব্বরই থাক—অথবা মধ্য ইয়োরোপের সুসভ্যই হউক—ঐ বস্তুটী উত্থাপনমাত্রই উপলব্ধি, জ্ঞান ও বাসনা সব একাধারে উপস্থিত হয়। যাহোক টাকার অর্থ তঙ্কা:—রৌপ্য, স্বর্ণ তাম্র মুদ্রা, অথবা রাজা বা তৎপ্রতিনিধি বস্তুক অনুমোদিত আধুনিক কুর্জ্জপত্র, যাই কেন না হোক—টাকার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা কি?

আপনি আমি আবালবৃদ্ধ বনিতা টাকার জন্য মরি কেন, মারি কেন? "যাহার টাকা আছে তার নাই কি" এই জন্য নয় কি? কিন্তু এ কথারই বা তাৎপর্য্য কি? টাকা বলিতে আমরা খাঁটি মুদ্রা বা রাজা বা তৎপ্রতিনিধির

নামাঙ্কিত কাগজ বা বৃদ্ধি—তার বিনিময়ে আমরা ঐ টাকার পরিমাণ মত যাবতীয় জিনিষেরই অধিপতি হইতে পারি। কাজেই টাকার প্রকৃত তাৎপর্য্য বিনিময়ের কথা। আরও সোজা কথায় টাকার টাকাত্ব টাকা দ্বারা অন্য যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর ক্রয় করিবার ক্ষমতায়। যদি একথা সহজ বলিয়া বোধ হয়, যদি একথার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে এখন হইতে টাকা অর্থে মুদ্রা বা নোট না বুঝিয়া টাকা অর্থে ক্রয় করিবার ক্ষমতা এই কথা বরাবর স্মরণ রাখিতে হইবে। ক্রমে উপলব্ধি হইবে যে, টাকা অর্থ "ক্রয় করিবার ক্ষমতা" এই প্রকৃত কথা সময় মত স্মরণ না রাখিলে ব্যাঙ্কিং নরকতুল্য হইয়া উঠিবে। তখন "অর্থমনর্থং" এই মোহমুদ্গর সাকারে আসিয়া উপনীত হইবে। কিন্তু এই পার্থক্যটী স্মরণ রাখিলে এবং যোগ্য স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করিলে "মানি মুইটার ভান্ হানি ব্রাইটার গান সান্ সাইন্" এই গান মনমক্ষিকা কাণে গুন্ গুন্ গাহিবে।

ব্যাঙ্কের কার্য্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা—আদান প্রদান। ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতা গচ্ছিত লয় এবং কখন কখনও এই ক্ষমতা লওয়ার বিনিময়ে সুদ দেয়। ব্যাঙ্ককে জামিন দিলে ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতা অন্যকেও দিতে প্রস্তুত হয়।

৪। ধন-শাস্ত্র

ধন-শাস্ত্রের বিশদ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় অন্ততঃ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে ধন-শাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাতও ভাল করিয়া হয় নাই বলিলেই চলে। সামান্য সংখ্যক যে কয়জন "ভারতীয় অর্থ শাস্ত্র" এই নামটীর উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য জগতের অবস্থাদৃষ্টে সংগঠিত কতিপয় নিয়মাবলী ভারতীয় অবস্থায় প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের নিয়মাবলী সামাজিক বাস্তব জীবনের অবস্থাদৃষ্টে গঠিত। আর পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের উপস্থিত অবস্থাদৃষ্টে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে উভয়ের যে কি বিভিন্নতা তাহা উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না। ক্রমে আলোচনা করা যাইবে ভারতীয় ধন-শাস্ত্র কেন পৃথক স্থানীয় মতে করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ধন-শাস্ত্র উপস্থিত পাশ্চাত্য ধন-শাস্ত্রের অনেকানেক নিয়মাবলীর অযথার্থ্য প্রমাণ করিবে অনেকানেক ভারতীয় ধন-শাস্ত্রের নিয়মাবলী পৃথিবীতে যুগান্তরের পথ প্রস্তুত করিবে। এস্থলে এই কথা বলা ভিন্ন প্রমাণের উপায় নাই। শুধু ধান হাতে করিয়া পোলাও জিনিষটী কি বুঝান সুকঠিন। ধান হইতে চাউল, চাউলের সঙ্গে মসলা ও মাংস এবং এতগুলি মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত উত্তাপ এতগুলি জিনিষ এবং এতগুলি শুদ্ধ একত্র হইলে পোলাও। ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্রের নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, যজ্ঞোপবীত এবং গুরুগৃহে বাস সমাধা হোক তখন ব্রহ্মতেজ কি বুঝা যাইবে। তারপর ব্রহ্মতেজ ও অব্রহ্মতেজ কি ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমানে একথা বুঝিলেই হইবে যে, যে শাস্ত্রই কেন হোক না, বা যেখানেই কেন ইহার উদ্ভব হোক না, শাস্ত্রের প্রকৃতি এবং

শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিধি সর্ব্বত্রই একরূপ। পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক বিধিমত ধন-শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। কাজেই অন্ততঃ সূত্রপাতে সেই বৈজ্ঞানিক বিধি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ধন-শাস্ত্রের আলোচনায় হিত ভিন্ন অহিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

প্রচলিত রীতি অনুসারে সূত্রপাতেই শাস্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং সম্যক উপলব্ধির অবসানেই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত হইতে পারে। কিন্তু নাম জপ করিবার আগে "রাম," "হরি," "পরব্রহ্ম" প্রভৃতির একটী নিরূপণ করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সাধারণের বিশ্বাস মতে কয়জন সেই নাম সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া রেলগাড়ী, এরোপ্লেনের যুগেও ত জপ করিবার লোকের তিরোভাব হয় নাই! কাজেই সংজ্ঞার সম্যক আয়ত্তীকরণ ভবিষ্যতের আশায় রাখিয়া সংজ্ঞার উদ্বোধন আরম্ভ করা যাউক।

ধন-শাস্ত্র ধনের উৎপত্তি, ব্যবহার এবং বিনাশবিষয়ক যাবতীয় ঘটনাবলী, ঐ ঘটনাবলীর পরস্পরের সম্পর্ক, ঐ ঘটনাবলীর সকল সমষ্টি আকার ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য ঘটনাবলীর কি সম্পর্ক তাহার আলোচনা করে। এখন একমাত্র ধন কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিলেই এ সংজ্ঞার মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে। ধন কি? কেহ বলিবেন টাকাই ধন কেন না টাকায় না মিলে কি? কেহ বলিবেন জমিই ধন কেননা টাকা থাকিলেও টাকা চিবাইয়া ক্ষুধা মিটে না। টাকা দিয়া অন্য কিছু লাভ করা প্রয়োজন, আর ঐ অন্য কিছু যাহাই কেন হোক না—সেই পক্ষে নিশ্চয়ই কোন জমি হইতে সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ মতে উৎপন্ন। কাজেই জমিই ধন। অন্য একজন হয়ত বলিবেন জমি বল, টাকা বল, সবারই পিছনে মানুষের হাত। জমি ত কতই পড়িয়া আছে! কিন্তু মানুষের হাত না লাগাইলে ধনের গন্ধ কোথায় পাওয়া যায়? আর টাকা ত মানুষ ভিন্ন সম্ভবেই না! এই রকম মত অনেকগুলিই প্রকাশ করা যায়। আর এর মধ্যে কোন মতই সম্পূর্ণরূপে সত্যতা বিহীন নয়। আবার এর মধ্যে কোন মতই একাকী পূর্ণ সত্যের অধিকারী নয়। উপরের তিনটী মত এবং উক্তবিধ যাবতীয় মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে অন্ততঃ দুইটী পৃথক জিনিষ পাওয়া যায়। মানুষ এবং পরিদৃষ্ট, অনুদৃষ্ট, অনুভূত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যরাজি। মানুষের সহিত সম্পর্কিত এই দ্রব্যরাজিই মানুষের ধন।

কিন্তু এই দ্রব্য-সম্ভার মানুষের সম্পর্কে আসে বলিয়াই যে ধনরূপে পরিগণিত হইতে পারে তা নয়। এই দ্রব্য গুলিতে মানুষের প্রয়োজন আছে। ক্ষুধা নিবৃত্তি, শীতোষ্ণ প্রভৃতির আতিশয্যের রক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে এই ধনরাজির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই মানুষের জীবন-ধারণ এবং যাবতীয় সদ্বৃত্তির প্রসারণে এই দ্রব্যরাজির উপযুক্ততাতেই ইহাদের ধন-গুণ নিহিত। অতএব মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল অনুকূল দ্রব্যরাজি সংগ্রহই হিতই ধনের স্বত্ব-প্রতিপাদক। এই জন্য দ্রব্য সম্ভারের মানবের মঙ্গলই মানবের ধন।

কথাটা শুনিতে বোধ হয় একটুকু কটমট লাগে। কাজেই আর একটুকু খুলিয়া বলা যাউক। বলা গেল ধন-অর্থে মানুষের দ্রব্য-

সম্বন্ধীয় মঙ্গল। অর্থাৎ দ্রব্য-সম্ভার মানুষের প্রয়োজনে আসিয়া মানুষের যে হিত বিধান করে সেই হিতই মানুষের ধন। এই হিত এক জন বা দুই জন, এক দেশের বা বিশেষ কোন দেশের হিত নয়। এই হিত যাবতীয় মনুষ্যের হিত। মানবজাতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্য-রাজির ব্যবহার করিয়া যে হিত লাভ করে সেই হিতই মানব-জাতির ধন।

এটা কি আমার মনগড়া অর্থ না কি? কোন মতেই নয়। কারণ, আয়ুষ্য বলুন, নিরোগ বলুন, পরিশ্রম বলুন, সবলেরই উদ্দেশ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানুষের হিত। পরিশ্রমের বলে উপায় সাহায্যে জমি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হয় কেবল উৎপাদনের জন্য নয়। শস্য উৎপাদন হয় মানবের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। ক্ষুধা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্য জীবন রক্ষণ এবং জীবনের যাবতীয় উদ্দেশ্যের যথাসম্ভব সাধন। কাজেই শস্য-উৎপাদন—অথবা সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে দ্রব্য সম্বন্ধীয় হিতই মানবের ধন।

কিন্তু শস্য-উৎপাদন হয় ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তি জীবন রক্ষার জন্য, জীবন-রক্ষা হইলে যাবতীয় হিতসাধন সম্ভব হইতে পারে। কাজেই একেবারে চরম উদ্দেশ্য হিতসাধনকে সার করিয়া ধনের এবং ধনশাস্ত্রের সংজ্ঞা কেন করা হইল? এর উত্তর এক কথায় চলে না। চলিতে পারে যদি লেখকের কথায় পাঠকের প্রত্যয় থাকে। তাহা এই—অর্থ শাস্ত্রের যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাদের ধারাবাহিক আলোচনায় দেখা যায় যে দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানবের হিত সাধন এই অর্থে না লইয়া ধন শাস্ত্রের সংজ্ঞা ধনের আংশিক প্রকৃতি উদ্ভূত কোন ধারণা হইতে লওয়ায় ধন-শাস্ত্রের বিস্তৃতি এবং এমন কি সামাজিক উন্নতিরও সঙ্গে বিগ্রহ ঘটিয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলে হয় ত ধারণা দেওয়ার অপরাধটা ঘুচিবে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং ফ্রান্সে তৎপূর্ব্ব এবং ঐ শতাব্দীতে ধন অর্থে যথাক্রমে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মুদ্রা এবং জমি-উৎপন্ন শস্য বুঝাইত। তাহার ফলে একশত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্রকে পুনর্জ্জন্ম লইয়া ভিন্নাবস্থায়ই কাটাইতে হইয়াছিল। সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে—ইংলণ্ডে কেবল স্বর্ণরৌপ্যাদির সঞ্চয়ই জাতীয় উন্নতি এবং ফ্রান্সে কেবল কৃষি কার্য্যেই জাতীয় উন্নতি এই বিশ্বাস যথেচ্ছাচার শাসন করিয়াছিল। তার ফলে ইংলণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক্যের সঙ্কীর্ণতা এবং ফ্রান্সে শিল্প কার্য্যের প্রতি অমনোযোগে যে কত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠেই বুঝা যাইবে। আমাদের যুগের ট্যারিফ রিফর্ম, সোসিয়ালিজম্ প্রভৃতি নানাবিধ ধন-সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক এবং উহাদের অমীমাংসা হেতু নানাবিধ বিগ্রহ ঘটিতেছে। স্থানান্তরে বিশদভাবে বলা যাইবে যে ধন অর্থ যে জন-সাধারণের দ্রব্য-সম্বন্ধীয় হিত এই কথার বিস্মরণই সমুদয় অমীমাংসা ও অনিষ্টের মূলীভূত কারণ।

কাজেই দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জন-সাধারণের হিতই জগতে মানবের ধন। আর জাগতিক ও দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জনসাধারণের হিতই ধনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

৫। ধনশাস্ত্রের আলোচনা

ধন অর্থে জনসাধারণের দ্রব্যরাজি-সম্বন্ধীয় হিত এবং ধন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এই জনসাধারণের দ্রব্যরাজি সম্বন্ধীয় হিত ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এবংবিধ অর্থ-

শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ ধরণের কয়েকটী বিষয় বলা প্রয়োজন। অবশ্যই এই প্রয়োজনীয়তা প্রথমে বুঝা কঠিন। কেননা ঐ সকল সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে যে কি কি অনিষ্ট হইতে পারে তা প্রকৃত অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবেশ না করিলে বোঝা যায় না। কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া ফেলিয়াই প্রকৃত শক্ত নারিকেল পাওয়া যায়, পরে শক্ত "মালা" ভাঙ্গিয়া শাঁস পাওয়া যায় একথা আমাদের দেশের ছেলেকেও বোধ হয় পাগলামি হইতে পারে। কিন্তু একথা ইয়োরোপের অশীতি বৎসর বয়স্ক অনেককেও বলিয়া বিশ্বাস করান সহজ না হইতে পারে এই সাধারণ কথাগুলির কি প্রয়োজনীয়তা এই অর্থশাস্ত্রের সারে ঢুকিলে বুঝা যাইবে।

* *
*

৬। ধন-শাস্ত্র এবং ধনসম্পর্কিত বাস্তব জীবনের বিভিন্নতা

ধন-শাস্ত্র এবং ধন-শাস্ত্রের আলোচনা এবং ধন লইয়া আমরা নিত্যনৈমিত্তিক যে রকম জীবন যাপন করি এই দুইটী কোনমতেই এক নয়। আপনি বা আমি প্রকৃতপক্ষে যেমন—আপনার বা আমার বিষয়ক আলোচনা ঠিক ঐ রকম নাও হইতে পারে। এমন কি আলোচনা যথাযথ হইলেও আলোচনা এবং আমাদের প্রকৃত আত্মত্ব এক নয়, একথা সহজে বোধ হইতে পারে। এখন অর্থ-শাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এবং আর্থিক জীবনের প্রতি একথা প্রয়োগ করিলে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের বিষয়মূলক প্রকৃত জীবন এক নয়। একটুকু তলাইয়া এ কথাটা বুঝিতে হইবে।

ধন-শাস্ত্র বা ধন-বিজ্ঞানকে যদি পদার্থ-শাস্ত্র বা পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে স্থান দিতে হয় তবে বলিতে হইবে পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি গণিতিক ভিত্তিমূলক বিজ্ঞানের ন্যায় ধন-বিজ্ঞান বা ধন-শাস্ত্রেরও প্রণালী এবং মীমাংসাকে সম্পূর্ণ যথাযথ করিতে হইবে। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের আলোচনা যদিও পদার্থ-বিজ্ঞানাদির গণিত-সম্মত সম্পূর্ণ ত্রুটী হীনতায় আনা বাঞ্ছনীয়—তবু মানবের প্রকৃতি এবং ধন-শাস্ত্রের মানবের প্রকৃতির সহিত অবশ্য সম্পর্ক থাকা হেতু, ঐ আদর্শ সম্যক কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় না। আর তা না যাওয়াতে ক্ষতিও যে বিশেষ কিছু আছে তা নয়।

কিন্তু গণিতিক বিধি অনুযায়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদার্থ-বিজ্ঞানেও প্রকৃত শাস্ত্র-গত আলোচনায় বরং বাস্তব পদার্থগত ঘটনার সর্ব্ব-সাকল্য ঐক্যতা সম্ভব তবে সর্ব্বযুগে সম্ভব নয়।

কিন্তু ধন-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ মানব। মানবের হিতের জন্য ধনের প্রয়োজন। কাজেই ধনশাস্ত্রের আলোচনায় মানবের হিত একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। কিন্তু ধনগত হিত মানবের একমাত্র বা সম্পূর্ণ হিত কোন মতেই নহে। মানুষের অর্থের প্রয়োজন কিন্তু অর্থ ব্যতিরেকে অন্যান্য বহু জিনিষেও মানুষের প্রয়োজন। কাজেই ধন-শাস্ত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ মানবীয় আলোচনার এক অংশ মাত্র। জড়পদার্থ এই যুগে সর্ব্বত্রই একরূপ এবং একবিধ পাদার্থিক নিয়মের বশীভূত। কিন্তু কোন দুইটী মানুষও সম্পূর্ণরূপে এক নয়। আবার একই মানুষ প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার ফলে যে যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞানে মানুষের সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থান—যেমন, মন-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান

এবং বর্ত্তমানে আলোচ্য অর্থ বিজ্ঞান—সেই সেই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমত দুইটী স্বীকার্য্য লইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

প্রথম স্বীকার্য্য এই—অর্থ-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান বা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই কেন আলোচনার বিষয় হোক না—ঐ ঐ সকলের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আংশিক বৈজ্ঞানিক। পূর্ণ মানবের এক অংশ হইতে ঐ বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু মানবের বিশেষ বিশেষ কামনার আবদ্ধ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বা বৃত্তি নাই। কার্য্যকালে ঘটনা সাপেক্ষে এক বা ততোধিক বৃত্তি একাকী বা মিশ্রণে, বিশেষ ঘটনায় প্রবল হইতে পারে এবং সাধারণ চক্ষে ঐ ঘটনা বৃত্তি বিশেষ বা প্রকৃতির অংশ বিশেষ হইতে উদ্ভূত মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বৃত্তি বা আংশিক প্রকৃতি যখন প্রবল ছিল তখন অন্যান্য বৃত্তি বা প্রকৃতির অন্যান্য অংশ মরিয়া ছিল না। কাজেই জীবনের ঘটনার আংশিক আভাস লইয়া মানবসম্বন্ধীয় যাবতীয় শাস্ত্রের বিধিগুলির উৎপত্তি হয়। এজন্য যাবতীয় মানবীয় শাস্ত্রের বিধিগুলিতে এই আংশিক আভাস স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

দ্বিতীয় স্বীকার্য্য—চিরপরিবর্ত্তনশীল মানব কোন বিশেষ মানবীয় বিজ্ঞানের চক্ষে পরিবর্ত্তনশীল নয়। অথবা পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলেও উহা এইভাবে করা হয়—মানবপরিবর্ত্তনশীল কিন্তু দেখা যায় বালক এই রকম, বালিকা ঐ রকম, যুবক এক রকম, এবং প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ অন্য ভাবে একই অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কাজেই মানবীয় কোন বিজ্ঞানে হয় প্রকাশ্যে নয় অপ্রকাশ্যে মানবের কোন অংশ বা কোন কোন অংশের সম্মিলিত অবস্থা উক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তা স্থির করিয়া লওয়া হয়। যেমন মনোবিজ্ঞানে শিশু ও বালক মন, প্রৌঢ় মন, নারী মন, সুস্থ মন, অসুস্থ মন প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগ। কিন্তু প্রত্যেক মানবীয় বিজ্ঞানেই এতগুলি ভাগ সম্ভব নাও হইতে পারে। যেমন ধন-বিজ্ঞানে শিশু এবং বালকের স্থান অতি সামান্য। কেন না ধন উৎপাদন, সংরক্ষণ প্রভৃতিতে তাহাদের অংশ অতি অল্প।

কিন্তু এই সব কথা স্বীকার করিলেও শেষে এই কথায় আমরা উপনীত হই—মানব যত শীঘ্র এবং যতদূর পরিবর্ত্তনশীল—ধনশাস্ত্রের নিয়মগুলি তত শীঘ্র বা ততদূর পরিবর্ত্তনশীল নয়। ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি মানবের এই পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু, বহুসংখ্যক ঘটনা দেখিয়া গঠন করিতে হয়। কাজেই মানবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-প্রযুক্ত নিয়মগুলি পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়।

এই স্বীকার্য্য দুইটির ফলে ধন-শাস্ত্র এবং ধন-সম্বন্ধীয় বাস্তব জীবন যে পৃথক এবং এই পার্থক্যের কথা স্মরণ না রাখিলে ভবিষ্যতে সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে একথা সহজে বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ ধন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মানবীয় সম্বন্ধে আবদ্ধীকৃত বরাবর দ্বিতীয়তঃ মানবের পরিবর্ত্তনশীলতাহেতু এবং ধন-বিজ্ঞানে মানবীয় অংশ প্রচুর থাকায়, ধনশাস্ত্রের নিয়ম কখনও মানবের পরিবর্ত্তনের সহগামী হইতে পারে না ও পারে। তার ফলে ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি ধন-সম্বন্ধীয় বাস্তব জীবনের প্রতি ঘটনার সহিত ঐক্য না রাখিতেও পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ধন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানবের হিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বিষয় নাও হইতে পারে। এ হেন বিজ্ঞানে তবে প্রয়োজন কি? আর ঐ নিয়মগুলির বৈজ্ঞানিকতাই বা সম্পূর্ণ কোথায়?

একেবারে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং নিষ্কলঙ্ক নিয়ম সীমাবদ্ধ মানবের ক্ষমতা বহির্ভূত। ধন-শাস্ত্রের পক্ষে বিশেষতঃ এ সম্পূর্ণতা সম্ভব নয় কেন বলা হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি যে অবান্তর ঘটনা লইয়া গঠিত ইহা বলা চলে না। আর অসম্পূর্ণতা স্বীকার্য্য হইলেও, পরিবর্ত্তনশীলতা অসুবিধার মধ্যে হইলেও, ধন-শাস্ত্রের কোন বিধিই প্রকৃত ঘটনার সাহায্য ভিন্ন গঠিত হইলে ঐ বিধির কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের ধন-শাস্ত্রজ্ঞগণ পরিশ্রম, মূলধন এবং ভূমির প্রাপ্য অংশ পূর্ব্ব বৎসর হইতে পর বৎসর পর্য্যন্ত স্থির নির্দ্দীষ্ট আছে ইহা বিশ্বাস করিতেন। ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া এ বিধি নিষ্কলিত হয় নাই। ধন-উৎপাদনে পরিশ্রম, ভূমি এবং মূলধনের প্রয়োজন—কাজেই উৎপাদনের অংশ প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। কাজেই উৎপাদ্য এক হইলে তিনে ভাগ করিয়া নিবে। ইহার ফলে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়া ছিল যদি পরিশ্রমের অংশ বেশী হয় তবে তাহা হইলে অন্য দুইটীর বা একটীর অংশ কমিবে। এ হেন ভুল ধারণার মূল প্রকৃত ঘটনার প্রতি অমনোযোগ এবং পুঁথিগত ভাবে নৈতিক ঘটনার আলোচনা হয়, ইহাই বুঝায়। আমাদের যুগে নানাবিধ ধন-শাস্ত্রীয় বিধি ঐইরূপ ভুলের বশবর্ত্তী। কাজেই ধন-শাস্ত্রের বিধিগুলি প্রকৃত ধন-সম্বন্ধীয় জীবনের ঘটনার সহগামী এবং সম্পূর্ণ সমসূত্রানুযায়ী না হইলেও, বাস্তব জীবনের ঘটনা ক্ষণকাল চক্ষুর অন্তরাল করিলে উপনীত বিধিতে দোষ ঘটিবে। অথচ ধন-শাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় ধন-শাস্ত্র বিষয়ক বিধিগুলির বাস্তব জীবন হইতে পার্থক্যও মানিয়া চলিতে হইবে।

ধন-শাস্ত্র ও তাহার আলোচনা এবং বাস্তব ধন-সম্পর্কিত জীবনের ঘটনার বিভিন্নতার উপলব্ধি এবং স্মরণ উক্ত উদ্দেশ্যেরই জন্য।

* *
*

৭। মানবের তন্ময়তা

মানুষ জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর অনেক কাজ করিতে আসিয়াছে। শুধু শয়ন, ভোজন, গল্প গুজব বা বৃথা আমোদের আসর তৈয়ার করিতে আসে নাই। তাহার ক্ষণজীবনে কীর্ত্তির দৃঢ় মন্দির রচনা করিতে হইবে, যাহা অনুপযোগী তাহা দূর করিয়া প্রয়োজনকে আহ্বান করিতে হইবে, সুতরাং নানা রকমের পরিবর্ত্তন তাহার কার্য্যকলাপে দৃষ্ট হইবেই তাই বলিয়া সে ভ্রান্ত এ কথা বলিলে চলিবে না। সে রক্ত মাংসের জীব তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। সে কর্ম্মের জন্য জীব জগতে আশ্রয় লইয়াছে, কর্ম্মই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, ফললাভ তাহার উদ্দেশ্য নয় তাই সে আপন ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহার ভ্রম-ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়া তাহার পদে পদে বিঘ্ন জন্মাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার কর্ম্মের সহায় হইয়া তাহার অনুষ্ঠিত পথে তাহাকে গন্তব্যের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। যদি তাহা না হয় জগৎখানি তোমার

অন্তও পড়িয়া রহিয়াছে তুমি তোমার ইচ্ছামত চালাইয়া লও, তোমাকে কেহই বাধা দিবে না। সে হৃদয়কে এক ভীষণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লয় তাই কাহারও দিকে দৃষ্টি দেয় না, আপন মনে শুধু কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেই আসিয়া থাকে তাই শতজনের শতভাবের নিন্দা সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, শত জনের শতভাবের নামকরণকেও সে কর্ণকুহরে স্থান দেয় না। সে অত্যাচারকে কর্ত্তব্য পথের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কণ্টক বলিয়া হীন মনে না করিয়া ভগবদ্দত্ত আশীর্ব্বাদ মনে করে, তাই অত্যাচার তাহাকে কিছুই করিতে পারে না বরং অত্যাচারকে সম্মানেরই নামান্তরমাত্র মনে করে। যেখানে যথেষ্ট সম্মান লুক্কায়িত থাকে সেখানে অত্যাচার অগ্নিমূর্ত্তিতে পরীক্ষাচ্ছলে দেখা দেয়। সাধারণ জীব সম্মানের দাবী করিতে পারে না তাই অত্যাচারকেও ভগবদ্দত্ত আশীর্বাদ মনে করিয়া লইতে পারে না। হৃদয়বান ধার্ম্মিক পুরুষগণ মানুষের হাতের কত দণ্ডই আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকলকে সম্মানের দান মনে করিয়াছেন, মানুষকে ভগবানেরই রূপান্তর মনে করিয়াছেন—তাই যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সম্মানের চূড়ান্ত হইতেই অত্যাচারের চরম দৃষ্টি হইয়া থাকে। অত্যাচারী মানুষকে সে ঘৃণা করে না বরং তাহাকে ভগবৎ প্রেমে দীক্ষিত করিয়া লইতে চায়। মানুষ মাত্রেই অত্যাচারী হইতে পারে না, যার তার ভাগ্যেও অত্যাচার জোটে না। নতুবা মানুষে মানুষের অত্যাচার গ্রহণ করিবে এ কি কখনও সম্ভব! উভয়েই সৃষ্টি কর্ত্রীর সমান আশীর্ব্বাদ লইয়া জন্মিয়াছে, জীবনের ও জীবনধারণের অন্যান্য ব্যাপারগুলিও প্রায় একই প্রকার তবে একজন শাস্তা আর একজন দণ্ডিত কেন? হিংসা, প্রতিশোধ-কাঙ্ক্ষা উভয়ের ভিতরেই ত আছে। একজন কে বড় করিয়া আদর্শ চরিত্র খাড়া করাইবার নিমিত্তই অত্যাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, অবনতির পর্য্যায় রহিয়াছে নতুবা সৃষ্টি কর্ত্রীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে কি করিয়া? তাই একজন রোষকষায়িতলোচনে দণ্ডের অভিনয় করেন অন্যজন উপাস্য দেবতার নামে প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে থাকেন।

আশীর্ব্বাদ সকল সময়ে মঙ্গলের সূচনা করিয়াই দেখা দেয় না, শাশ্বত আনন্দ লাভের পরিমাণ অনুসারে দুঃখও ততটা দেখা দেয়। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধার্ম্মিক পুরুষই তখন হৃদয় স্থির রাখিতে পারেন। তিনি সংসারে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—লৌকিক ভাবেই তাঁহার আসক্তি দেখা যায়, ভিতরে তিনি অনাসক্ত তাই পুত্র পরিবারের মমতা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাহাদের শোকে ম্রিয়মান হন না, তিনি উপলব্ধি করেন ইহারা শত্রু হইতেও পরম শত্রু এবং মিত্র হইতেও পরম মিত্রভাবে লোক বিশেষের কাছে দেখা দেয়। তিনি সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সুতরাং তিনি দুঃখিত, শোকাকুল হইলে চলিবে কেন!

ধীরে ধীরে আত্মাকে সর্ব্বদা অণু পরমাণুতে ভাগ করিয়া সমুদয় পদার্থের সঙ্গে মিশাইলে দেখিতে পাইবে, তুমি তাহাদেরই জন্য, তোমার নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যদি তুমিই একমাত্র পুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও তাহা হইলে অনাসক্ত ভোগের জন্য অসম্ভবে সম্ভব কর, আপন পথে চল—ভুল,

ভ্রান্তির জন্য অপেক্ষা করিও না, সম্মান ও অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা কর। দেখিতে পাইবে তুমি দৃপ্ত, উজ্জ্বল, অথচ স্নিগ্ধ এক পুরুষমূর্ত্তি। তখন ধ্বনিত হইবে,—সর্ব্বত্র অচল, অটল দেখিয়া তোমার ভিতর হইতে—আমিই সেই।

* *
*

৮। সাহিত্য বিস্তারে মুসলমান সম্প্রদায়

৭ই শত বৎসরের ভিতর ভারতীয় মুসলমান সমাজ যেন একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বিশাল রাজ্য দীর্ঘ সহস্র বৎসর কাল যাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে করতল ছিল তাঁহারা আজ অবসন্নতা হেতু নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। হয় তাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষের গুণাবলীকে কতকটা কল্পনা করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না অথবা ধরিবার চেষ্টাও আদৌ করেন না। আমরা আজ বার বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীকে দেখি নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য সত্য। ষষ্ঠ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের পর শিক্ষা প্রচারে রত ছিলেন এত বড় যাঁহাদের কাজ ছিল তাঁহারা আজ যেন মৃত। কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত মানব আজ নীরব, ধরাপৃষ্ঠে তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? জাতি ত লুপ্ত হয় নাই। যে জাতি সুধার ফল-জল, ভোগ-বিলাস সমভাবে উপভোগ করিতেছে পিতৃপিতামহের নাম স্মরণ করিয়া শিক্ষা প্রচারে, ধর্ম্ম-প্রচারে, রাষ্ট্রনীতিতে, রণোন্মত্ততায় গৌরব করিতেছে সে জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা কোথায়?

আজ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিকে আমরা ঐতিহাসিক দেখি নাই। ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাঁহার ইতিহাসের লুপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধার করা কি কাজ নয়? বিংশ শতাব্দীর নীরবতা শুধু নিজের দেশকেই কলঙ্কিত করিয়া ক্ষান্ত পথে টানিবে না পরন্তু, সমস্ত সভ্য জাতিকে কটাক্ষগ্রস্ত করিবে, রাজা, রাজ্য, প্রচারক-উপদেষ্টা সকলকেই কলঙ্কিত করিবে। আপনাদের জাতির নামে, ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনাইয়া শত শত বৎসর ভোগ করিতে হইবে।

মুসলমান সমাজকে আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই না। বিজ্ঞানালোচনায় সাহিত্য সম্মিলনে কোথাও তাঁহাদের ছায়ামাত্র দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা শুধু বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিলেই কি দেশ বড় হইবে? ভাবের রাজ্যে তাঁহারা কোন নূতন প্রভাব বা প্রস্তাবনা দ্বারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের গঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্ম্মক্ষেত্রের সংস্কার প্রভৃতি কোন কিছুই করিতেছেন না।

তাঁহারা হয়ত শিক্ষার সুবিধা নাই বলিয়াই অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু অপেক্ষা করার সময় আর আছে কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সময় কম, কাজ বহু সুতরাং পর পর শৃঙ্খলার অপেক্ষা করিলে জীবনটা পথে মারা যাইবে। অনেক কাজ এখন টানিতে হইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই, লক্ষ্য স্থির রাখিলে সব গুলিই আপনা হইতে শৃঙ্খলা ধরিয়া চলিবে। যাহার জীবন উন্নতি চায় সে কখনও মন্থর গতিতে চলিতে পারিবে না। মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেন মনে রাখেন তাঁহাদের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান জগৎ

এই ধর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষাকে যেন প্রাচীন পদ্ধতির ভিতর স্থান দেন। অন্ততঃ এশিয়াবাসীর মন বাদ্দুতে ধর্ম্মহীন শিক্ষা স্থায়ী হইবে না। তাঁহার সমাজ যতই কেন হীন হউক না ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তাঁহার স্থায়ীত্ব ধর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান সন্তানে যথেষ্ট প্রীতি থাকিলেও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে, নব নব কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহাদিগকে একত্র দেখা যায় না। তাহারা নিজের সমাজকে অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিলে এই দেশের কল্যাণ লাভের আর কোন উপায় থাকিবে কি? আমরা চাই আর কালবিলম্ব না করিয়া মুসলমান সমাজ প্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন। ইতিহাসালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দেরী করার সময় নাই কারণ জগৎখানি পলে পলে যে কত পরিবর্ত্তিত হইতেছে আর তার অনুপাতে স্থিতিশীল বস্তু মাত্রেই পিছনে পড়িতেছে। একবার পিছনে পড়িয়া থাকিলে আর উঠিবার ভরসা নাই। স্কুল প্রতিষ্ঠা। যারা শিক্ষাদান নানা রকমে অসম্ভব হইলে মকতবের ভিতর দিয়াই তাহার ধারা বহাইতে হইবে। তার জন্য যেন শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। টোল মকতব যে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্র সে দেশে শিক্ষাদানের কষ্ট কি?

* *
*

৯। প্রত্নতত্ত্ববিদের বৃহত্তর ক্ষেত্র

আমরা ভারতবাসিগণ বড় জোর ব্রহ্ম-দেশকেই বৃহত্তর ভারত পর্য্যন্ত একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। তাহার রাজ্যে তাহারা আমাদের অতি নিকটতর হইয়াছে, কিন্তু ভাব তেমন প্রবল হয় নাই যাহাতে ব্রহ্মদেশ ভারতের অতি নিকট হইতে পারে। অবশ্য তাহারাও খুব প্রবলপ্রকার ধারণ করে নাই। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কোন কোন শিল্পের নামেই পরিচয় পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশের মত কত বৃহত্তর ভারত পড়িবার স্থান রহিয়াছে তাহার খোঁজ রাখে কে? ভারত মহাসাগরের দ্বীপ উপদ্বীপ ভারতীয় দিগেরই উপনিবেশ। আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে "যবদ্বীপে হিন্দুটোলা" শীর্ষক প্রবন্ধে যবদ্বীপের কথা বলিয়াছিলাম। নব্য ভারতের ঐতিহাসিকগণ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে-ছেন কিন্তু সেই অনুসন্ধান আরও গভীরতর হওয়া উচিত, আরও ব্যাপকভাবে স্থান-বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা দেশকে বুঝিয়াছেন, বুঝাইতে চাহিতেছেন কিন্তু তাঁহারা আরও বসিয়া ভাবিলে অগ্রসর হইবার সময় কোথায়। তাঁহারা ঐতিহাসিক স্তরে উন্নাদনা আনিতে চাহিলে শুধু দেশে বসিয়া ভাবিলেই চলিবে না। চীন হইতে মিশরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। হিন্দু-বৌদ্ধ, শক-হূণ, গ্রীক এবং মুসলমানের অস্থির উহার পরতে পরতে মিশিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন এশিয়ার বুকের উপর কত শত তাণ্ডব নৃত্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ এশিয়া জীবন্মৃত আজ তাহার বুকের উপর ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মপ্রচার, কর্ম্মীর সেবাধর্ম্ম, প্রেমিকের প্রেমধর্ম্ম, যোদ্ধার ভৈরব হুঙ্কার তাহাকে আগ্রত করিতে উত্থিত হইতেছে না। তাই বলিতে চাই—দেশকে ভাল বাসিতে হইলে যখন যেমন প্রয়োজন হইবে তখন তেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু ঘরে বসিয়া আলোচনা করিবার দিন আর নাই। আমার যা তাকে বড় করিতে হইবে, পরের

মুখে জাল না খাইয়া নিজের রুচির মত করিতে হইবে, এই ভাব যদি থাকে তাহা হইলে জড়ীয় ভাব আর কি আটকাইয়া রাখিতে পারে? ২৪ জন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই এই দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় তারপর সমুদয় এশিয়া ব্যাপিয়া ভারতের সম্বন্ধ খুঁজিতে গেলে যথেষ্ট ঐতিহাসিকের প্রয়োজন। অনুসন্ধান সমিতি গুলি দেশের ভিতর ইহার একটা নেশা না দিলে দ্রুত কাজ হইবে না। ইংরাজ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকের ন্যায় অরণ্যানীতে, ভীষণ মরুভূ মধ্যে, বরফ সঙ্কুল পর্ব্বত-প্রদেশে ঘুরিতে ফিরিতে হইবে, কত জনের হয়ত প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতেও একটা আনন্দ আছে। ইহাতে রাজশক্তির সাহায্য লইবার বা সাহায্য প্রার্থনা করিবারও প্রয়োজন হইবে না। বহু বহু ইংরাজ নাবিকগণ এই ভারতবর্ষের অনুসন্ধানের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিয়াছেন, তাহাতে লাভ হইয়াছে এই, ইংরাজের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, হাজার হাজার নরনারীর ভিতর তাৎকালিক পুরুষরত্নদিগের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা এ সকল বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নামও এইরূপ অক্ষয় হইয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ন্যায় রোগে মরিয়া, শোকে পুড়িয়া, দুর্ভিক্ষে হাহা-কার করিয়া প্রাণ দেওয়ার চেয়ে ইহা শ্রীতিকর বোধ হইবে। নব্য ভারতের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদিগকে বুঝিবার সময়, তাই মাটী খুঁড়িয়া পাহাড় খুঁজিয়া আমাদের সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশের ইতিহাস ও সুখলাভ পুষ্টিলাভ করিবেই পরন্তু বিংশশতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার গভীর প্রেরণা। সমুদয় এশিয়াকে ভারতবাসীর পদতলে কম্পিত করিয়া দিবে। ঐ সকল অভিজ্ঞতার নানা ভাবের ফলে উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনীও পুষ্টিলাভ করিবে।

ইহাতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। প্রথমে দেশের অন্ন-সংস্থান করার প্রয়োজন বটে, কিন্তু আমরা খাইতে পাই না বলিয়া বিলাস বাসনা বিবাহ শ্রাদ্ধ কিছুই ত বাদ দিতে পারি নাই। সমাজে থাকিতে সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইবে, জগতে বাস করিতে হইলে তাহার বুকের উপর জীবিত ভাবেই বিচরণ করিতে হইবে, নতুবা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কিছু থাকুক আর না থাকুক সময় তাহা বুঝিবে না, সে সময় মত তাহার তাড়া দিবেই। সুতরাং ওলন্দাজ-যবদ্বীপ বলি-সুমাত্রা, ফরাসীর মাদাগাস্কার, ইয়াঙ্কি-আমেরিকা এবং ইংরেজের মিশর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাতে প্রাণপাত অর্থপাত দুইই হইবে। এদেশের সাপ-বেজের কাছেও সাত রাজার ধন থাকে, আমাদের কর্ত্তব্য, অবস্থা, সময়, বুঝিয়া মনকে স্থির করিলে কিছুরই অভাব হইবে না।

পল্লী-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

"পল্লীর মধ্য দিয়াই ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।" ইহা অতি খাঁটি কথা। "কাজেই যাহাতে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ পুরাতন আদর্শে আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠে, যাহাতে পল্লীর নরনারীগণ দুঃখ-দারিদ্র্য মুক্ত হইয়া আবার সনাতন জীবন ধারায় জীবন মিশাইতে পারে, (দরিদ্রের ক্রন্দন নামক পুস্তকের) লেখক তাহারই পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হইয়াছেন।" (মাঘ সংখ্যা, পৃঃ ২৯৭)। আমাদের জাতীয় চিন্তাস্রোত এই দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা অতি সুখের ও আশার কথা। সাত-সমুদ্র তের-নদীর পরপারে বাস করিতেছি বলিয়া "দরিদ্রের ক্রন্দনের" সহিত আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং বইখানাতে কি আছে তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি নিম্নে যে কয়েকটা কথার অবতারণা করিতে ইচ্ছুক তাহা উক্ত পুস্তকের অনভিজ্ঞতায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দরিদ্রের ক্রন্দন" সমালোচনা করিতে যাইয়া আপনারা ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— "পল্লীসমাজকে সভ্যতার কেন্দ্র করিতে হইলেই পল্লীতে যাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপনপূর্ব্বক দেশে নূতন নূতন চিন্তাজগত সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" কয়েক পংক্তি অন্তর আবার লিখিয়াছেন "কাজেই, আজকাল যাহারা চিন্তাবীর তাঁহাদিগকেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা গ্রাম কখনই সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না।" কথাগুলি খুবই সুন্দর। কিন্তু, কতদূর কার্য্যকরী?

যতই উক্ত কথাগুলি লইয়া আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছি ততই উহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িতেছি। গ্রামে কি "চিন্তাবীর"গণের "সন্তুষ্টচিত্তে" চিরবাস সম্ভবপর? আমাদের বাংলা দেশে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায় উভয়েই চিন্তাবীর। এই দুইজনকেই যদি আমরা পোটলা পুটলি বাঁধিয়া পল্লীতে পাঠাইয়া দেই তাহা হইলে ভারত-সমাজ ইঁহাদিগের নিকট হইতে কি আশা করিতে পারে? প্রতিকূল বিশ্ব-শক্তির সংস্পর্শে আসিয়াই মানব চিন্তাশীল হইয়াছে। ১৩২০ সালের মাঘের "গৃহস্থে" "প্রতিভা বিকাশের সুযোগ" নাম দিয়া এক প্রবন্ধে বঙ্গদেশেরই চিন্তাবীরগণের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গ্রামের পারিপার্শ্বিক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রণয়নের প্রতিকূল। ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যে এই মন্তব্য খাটিবে তৎসম্বন্ধে আমি যে সমস্ত কথার আলোচনা উক্ত প্রবন্ধে করিয়াছিলাম এস্থানে তাহার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতায় যখন জাতীয় বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয় তখন রব উঠিয়াছিল প্রফুল্ল বাবু উক্ত বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হইবেন। কিন্তু পরে শুনিতে পাইলাম প্রফুল্ল বাবুর জাতীয়

বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিছুতেই হইতে পারে না। প্রফুল্ল বাবু তখন যে সকল রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন তৎসাধনের সরঞ্জাম বঙ্গদেশে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের সে সরঞ্জাম ক্রয় করার শক্তি নাই। তাই নব্যবিজ্ঞানে বঙ্গদেশের, ভারতবাসীর, পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য রায় মহাশয়কে প্রেসিডেন্সি কলেজেই থাকিতে হইল। পল্লী কি তবে "চিন্তাবীর" প্রফুল্লের আবাসস্থান হইতে পারে? পল্লী কি শীল মহাশয়ের গবেষণারও কেন্দ্রস্থান হইতে পারে? পল্লীতে বিরাট পুস্তকাগার কোথায়? আর, পল্লীতে যদি তুমি লেবোরেটরী ও পুস্তকাগার স্থাপন করিতে চাও তাহা হইলে কি সে পল্লী পল্লী রহিল? না সহর হইয়া গেল! সকল দেশের চিন্তাবীরগণ সহরেই শিক্ষিত। ইহাতে সহর জিনিষটার মাহাত্ম্য কিছুই নাই। বিদ্যালাভ করিতে যে সকল সুপারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন তাহা কেবল সহরেই মিলিবে। গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর, লেবোরেটরী, কারখানা, পুস্তকাগার স্থাপন কর—তৎক্ষণাৎ গ্রাম সহর হইয়া যাইবে। নালন্দা, ওদন্তীপুরী, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ পরিশেষে সহরেই পরিণত হইয়াছিল না কি? চিন্তারশ্মি চিরদিন নগর হইতেই গ্রামে যাইবে, গ্রাম হইতে নগরে আসিবে না। গ্রাম স্থিতিশীল, নগর উন্নতিশীল। গ্রামের অনুপ্রেরণা নগর হইতে আসে; নগরের অনুপ্রেরণা পৃথিবী হইতে আসে। নগর পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত। গ্রাম তাহা নহে। গ্রাম প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না। তজ্জন্য গ্রাম সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না।

তাই বলে আমি গ্রামের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাই না। পল্লীশূন্য জাতির স্থায়িত্ব অল্পকাল। সমাজে পল্লীর কাজ অন্যরূপ। মানুষ যাহা অর্জ্জন করে তাহার উদ্বৃত্তাংশ সে অতি যত্নে এক নিরাপদ নিভৃত কোণে সঞ্চিত করিয়া রাখে। "ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম"ও সেইরূপ আমরা পল্লীর মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। সেই খানেই আজ হিন্দুজাতির জীবন। সেই পুরাকাল হইতে উৎপাতের পর উৎপাত আসিয়া ভারতের নগরসমূহ ধ্বংস করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ্বংস হয় নাই। পল্লী হিন্দুসভ্যতার রক্ষণ-গৃহ। পল্লীবাসী হিন্দুসভ্যতার প্রহরী। বিশ্বের ধ্বংসকারী শক্তি সেখানে পৌঁছাইতে পায় না। আজ ভারত পল্লীবহুল বলিয়াই সে জীবিত।

তাই পল্লীকে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবেই। "চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ"কে গ্রামে বাস করাইয়া কাজ সমাধা করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। এ আশা অযুক্তি-সঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ সম্বন্ধে আমার ক্ষীণবুদ্ধিতে আমি যে দুই একটা কথা ভাবিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আমার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিতে চাই। ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যার গৃহস্থের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "২।৩ বৎসর পূর্ব্বে মালদহের এক পল্লীতে মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জে বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মিলন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ পল্লীতে সাহিত্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বারা যত শীঘ্র মাতৃভাষার

উন্নতি এবং লোকের ধারণা ও মনোগতভাব উচ্চাকার ধারণ করিবে, সহরের সংখ্যা কয়া ২।৪টী সম্মিলনের দ্বারাও দেশের তেমন বিস্তর কাজ হইবে না।" ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ সভার উদ্দেশ্য ভিন্ন। ইহা একটি উচ্চাঙ্গের অনুসন্ধান সমিতি। পল্লী-সমস্যাসমূহের সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব কম। পল্লীতে যদি সাহিত্য-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে নূতন ভাব ও নূতন যন্ত্রপাতি লইয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এখন দেখা যাউক পল্লীর অভাব কি কি।

১। শিক্ষার অভাব
২। ক্রীড়ার "
৩। পরস্পর মিশ্রণের সুযোগাভাব
৪। সেনিটেশনের অভাব।

এইগুলির প্রত্যেকটীর সহিতই আমরা সুপরিচিত। কাজেই এইগুলি বুঝাইতে যাইয়া আমাদের সময় ও কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন দেখি না। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে এই অভাবগুলি দূর করা যায়। সাহিত্য-কেন্দ্র দ্বারা যে, একাজ করা যাইতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমাদিগকে অন্য এক সভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

আমাদের যাঁহারা দেশের বাহির হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই জগতের দুইটী অনুষ্ঠান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবেন। একটি কুক্ কোম্পানির আফিস; দ্বিতীয়টী ওয়াই, এম, সি, এর গৃহ। প্রথমটীর সহিত আমাদের এ ক্ষেত্রে কোনও সম্বন্ধ নাই। ওয়াই, এম, সি, এ লইয়া একটু আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান সহরেই এই কোম্পানির এক একটি আড্ডা আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত যদিও অন্য কেহ এই অনুষ্ঠানের প্রধান সভ্য হইতে পারে না, তথাপি পৃথিবীর যে কেহ ইহার অনুষ্ঠান গৃহে যাইয়া আড্ডা পাতিতে পারে। গল্প গুজব, হাসি, ঠাট্টা, বা তামাসা বা গভীর আলাপ করিবার ইহাই এক সাধারণ স্থান। নানা ক্রীড়া-সরঞ্জামও এখানে দেখিতে পাইবে। এই অনুষ্ঠান-গৃহের সাজ-সজ্জায় আকৃষ্ট হইয়া সকলেই একবার ভিতরে ঢুকিতে চায়। বন্ধুবান্ধবের মিলন ও আদর অভ্যর্থনা করিবার ইহা অতি চমৎকার স্থান। ভারতবর্ষে যদিও এই অনুষ্ঠানের ততটা আধিপত্য দৃষ্ট হয় না কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য স্থানে—বিশেষতঃ চীন দেশে ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার প্রভাব খুবই লক্ষিত হয়। এই অনুষ্ঠান গৃহে নিম্নলিখিত কাজগুলি অতি সুন্দরভাবে সাধিত হয়—

১। সাধারণ শিক্ষাপ্রচার
২। ক্রীড়ার সুযোগ
৩। পরস্পর মিশ্রণসুযোগ
৪। নানাপ্রকার উপদেশ ও নৈতিক শিক্ষা
৫। ধর্ম্ম শিক্ষা।

একই অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি এতগুলি কার্য্যের সমাধা হইতে পারে তবে আমরা কেন ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান স্থাপন করি না? আমাদের গ্রামে যাও দেখিবে অধিকাংশ গ্রামেই সাধারণের জন্য পাঠাগার নাই, ক্রীড়ার সুযোগ নাই; দিনান্তে পরিশ্রমের পর গ্রামবাসিগণের একত্র মিলিত হইয়া গল্প গুজব করিবার স্থান নাই। যেখানে সমাজ-জীবন (community life) তৈয়ার করিবার সরঞ্জামের অভাব সেখানে সমাজ-শক্তির (community spirit) স্ফুরণ হইবে কি করিয়া? আমরা মানিয়া লইয়াছি আমাদের জাতীয়-কেন্দ্র পল্লী।

সুতরাং যদি গ্রামাজীবন (*village life*) এর উৎকর্ষণেই আমরা অপারগ হই তাহা হইলে জাতীয় ভাবের মূলই কাঁচা রহিয়া গেল। পল্লীকে শত আবর্জ্জনা শত বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় প্রত্যেক পল্লীতে social centre বা মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পল্লী-গৃহ সাধারণের সম্পত্তি; কোন ব্যক্তি বিশেষের ইহাতে কোনই অধিকার নাই। পল্লীর কল্যাণসাধনের জন্যই এই মন্দিরের সৃষ্টি এবং তাহাতেই ইহা উৎসর্গীকৃত হইবে। নিজের কোন সম্পত্তি থাকিলে যেমন তাহার প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয় সমস্ত গ্রামবাসীও সেইরূপ এই সুলভ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া গৌরবান্বিত বোধ করিবে। কেবল স্বীয় পরিবারের উন্নতির কথা না ভাবিয়া পল্লীবাসিগণ পল্লীর উন্নতির কথাও ভাবিবে। ধীরে ধীরে তখন তাহারা বুঝিবে যে, পরিবার-ভুক্ত বলিয়া তাহাদের যেমন পরিবারের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, পল্লীবাসী বলিয়া পল্লীর প্রতিও তাহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। পল্লীর উন্নতিতে তাহাদেরই উন্নতি, অবনতিতে তাহাদেরই অবনতি। এই ভাবে ক্রমশঃ পল্লীতে community spirit, civic spirit ও rights and duties of citizenship এর অর্থ প্রতি পল্লীবাসীই বুঝিতে পারিবে। পাশ্চাত্য জগত যাহা লইয়া বড়াই করে তাহা আপনা আপনিই আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির হইবে।

বিষয়টা আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। পল্লীগৃহে একজন গৃহস্বামী থাকিবে। একটি পুস্তকাগার থাকিবে, পাঠাগার থাকিবে, বৃষ্টি বাদল হইলে ঘরের মধ্যে একটি খেলিবার ঘর থাকিবে, একটি গল্পগুজব করিবার ঘর থাকিবে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের জন্যও একটি খেলিবার ও মিলিবার—পৃথক ঘর থাকিবে। গৃহস্বামীর আবাসস্থান পল্লীগৃহে থাকিলেই ভাল। পাঠাগারে বিশেষ পুস্তক রাখিবার প্রয়োজন নাই। (অর্থ থাকিলে যত পুস্তক কেনা যায় ততই ভাল) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখাই বিশেষ প্রয়োজন। ভিতরে ও বাহিরে নানা প্রকার পুষ্টিকর খেলার সরঞ্জাম রাখিতে হইবে। গান বাজনার বন্দোবস্ত থাকাও একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রামে এইরূপ একটি কেন্দ্রস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারিলে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

প্রতি শনিবার বা রবিবারে গৃহস্বামী সমবেত পল্লীবাসী-সম্মুখে বক্তৃতা করিবেন। মহিলাগণকেও বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। বক্তৃতার বিষয় খুব সাধারণ হওয়া উচিত। ভারতের অতীত গৌরবের কথা বেশী না গাহিয়া বর্ত্তমানের উপরই নজর রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য দেশের কথাও ইহাদিগকে শুনাইতে হইবে। ভারতবর্ষ যে কেবল বঙ্গদেশ নয়—ও পৃথিবীটা যে কেবল ভারতবর্ষ নয় ইহাও শুনাইতে হইবে। পল্লীর বালকগণকে লইয়া গৃহস্বামীর সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যখনই সুবিধা হইবে তখনই উহাদের সহিত মিশিতে হইবে। নৈশ-বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। প্রতি রাত্রিতে বিদ্যালয় না বসাইলেও দোষ নাই। সপ্তাহে তিন রাত্রি হইলেই যথেষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। ছোট ছোট বালক বালিকারা তাহাদের গ্রামখানিকে যেন অতুলনীয় বস্তু বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে শিখে তাহারই বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এই মন্দির কোন ধর্ম্ম বিশেষের সঙ্গে লিপ্ত থাকিবে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই এই গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকারী। এ গৃহের মূলমন্ত্র—গ্রামের উন্নতি সাধন। ব্যক্তিগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থ সাধন নহে।

এইরূপ অনুষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে কি বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হইবে? খুব সম্ভবতঃ গৃহ নির্ম্মাণের স্থান বিনামূল্যেই মিলিবে। উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কিছু খরচ হইবে। মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন উপযুক্ত গৃহস্বামী মিলিবে আশা করা যাইতে পারে। অন্যান্য খরচ ও পুস্তকাগারের জন্য মাসিক আরও ২৫৲ টাকা খরচ দরকার। সুতরাং মাসিক খরচ ৭৫৲ টাকার উপরে উঠিবে না। আমার প্রাণভরা বিশ্বাস আছে যে, এত আশা ও উদ্যমের দিনে অনেক পল্লীই এইরূপ শুভানুষ্ঠানের জন্য মাসিক ৭৫৲ টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এ কাজের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিবে ইহার আন্দোলনকারীর উপর। যদি আমার এই কল্পনা সাধনোপযোগী হয় তাহা হইলে অনেকেই হয়ত ইহা সাধন করিতে অগ্রসর হইবেন।

পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট আমার এক নিবেদন আছে। জনসাধারণের মঙ্গল-কামনায় জন্যই আপনারা পত্রিকা ছাপাইতেছেন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, রীতি-নীতি সমাজ সমক্ষে প্রকাশ করা আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যতই সময় যাইতেছে আর একটি কর্ত্তব্য আপনাদের ঘাড়ে আসিতেছে। আপনাদের এখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। আপনারাই সকল কাজে আগুয়ান হইয়া চলিবেন। নূতন নূতন অনুষ্ঠান আপনাদিগকেই স্থাপন করিতে হইবে। পল্লীগৃহ স্থাপন যদি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আপনাদিগকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

অধ্যাপক ও শিক্ষক মহোদয়গণের নিকটও কয়েকটা কথা বলিবার আছে। এস্থানে তাহা সন্নিবদ্ধ করিলে বোধ হয় বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। আমাদের কলেজের অধ্যাপকগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল ছাত্র পড়ান। আমেরিকার এক আধুনিক শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতে পাই "জনসাধারণের সুশাসন বা অন্য কোন কার্য্য সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর সমস্যার উদয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।" আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উইস্কন্‌সিন্ প্রদেশেও এই নিয়মের প্রচলন দেখিতে পাই। উইস্কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কেবল ক্লাসে ছাত্র পড়াইয়া বা লেবোরেটরীতে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাহাদের আরও অনেক মহৎ কাজ করিবার আছে। অর্থনীতি (Economics), সমাজ-তত্ত্ব, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কোন সমস্যা উপস্থিত হয় গভর্ণমেণ্ট অমনি তৎসম্বন্ধে অধ্যাপকগণের নিকট উপদেশ লইবার জন্য অগ্রসর হন। অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে দেশবাসীর উন্নতি ও সুখ বৃদ্ধির জন্যই খাটিতেছেন মনে রাখিয়া বিনা বেতনেই গভর্ণমেণ্টের খাটুনি খাটিয়া দেন। ইহাই Community spirit (সমাজ-শক্তি)।

আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্ট ও অধ্যাপকগণে কোনও সম্বন্ধ দেখি না। আমাদের বা উইস্কন্‌সিনের মত Community spirit

দেখাইবার সুবিধা আমাদের অধ্যাপকগণের নাই। কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে যখন পল্লী-গৃহ স্থাপিত হইবে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তাহাদের স্বদেশ-হিতৈষণার ভারটা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইতে অনেক সুযোগ পাইবেন। শুনিতে পাই প্রফুল্ল বাবু নাকি গ্রীষ্মাবকাশে দুর্জ্জলিঙ্গ বা শিমলা শিখরে সুখান্বেষণে না যাইয়া নিজ গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে উচ্চভাব ঢুকাইবার চেষ্টা করেন। আশা করি বঙ্গদেশে আজ এ পথের পথিক প্রফুল্ল বাবু একা নহেন। পল্লী-গৃহ স্থাপিত হইলে গৃহস্বামী মাঝে মাঝে সহরের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণকে ডাকিয়া আনিয়া গ্রামবাসিগণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবেন। এরূপে আজ একজন ডাক্তার আসিয়া, কাল একজন ধনবিজ্ঞানবিদ্ আসিয়া তারপর দিন একজন আধুনিক চাষবাসে অভিজ্ঞ লোক আসিয়া গ্রামবাসিকে কিরকম ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, co-operative credit system কাহাকে বলে, ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ইত্যাদি সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বক্তৃতা দিবার আয়োজন করিতে হইবে। ইহার জন্য অধ্যাপকগণকে কিছু সময়ের জন্য সহরের সুখ সাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ের পঙ্কিল পথে আসিয়া বিদ্যাসাগরের মত মহয়ার দোকানে ছাতা পাতিয়া বসিতে হইবে। তবে যদি পল্লী আবার প্রাণ পাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

পল্লীগৃহ তখন কেবল পল্লীর মিলন-কেন্দ্র নয়; ইহা তখন সহর ও পল্লীর—উভয়েরই মিলন-মন্দির। কেবল সহর লইয়া দেশ হয় না; কেবল গ্রাম লইয়াও দেশ হয় না। সহর চিন্তাবীরের আবাসস্থান বটে, কিন্তু সহরের সাধারণ লোক চঞ্চল প্রাণ; প্রতিদিনই সহস্র প্রভাব আসিয়া তাহাদের মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। মৌমাছির মত তাহারা এ ফুলে ও ফুলে মধু আহরণ করিতে চায়। কোনও একটা জিনিষ মনে ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম। তাহাদের আশে পাশে যে সব জিনিষ ঘটিয়া যাইতেছে তাহা কেবল দেখিয়াই তাহারা সুখী। কিন্তু পল্লীবাসীর ধারণ করিবার শক্তি খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে ইহা তাহাদের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন জীবন যাপনের ফল। তাহাদের অন্তরে যাহা একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বলিতেছিলাম পল্লী জাতীয় সভ্যতার রক্ষাকর্ত্তা আর সহর তাহার উৎপাদক। এখানে হয়ত বলিতে পারেন যদি তাহাই হয় তবে ভারতীয় বা চীন সভ্যতার মূলে যে মুনিঋষিগণ রহিয়াছেন তাঁহারাও পাড়া গাঁয়েরই সন্তান। তাহা খাঁটি বটে। কিন্তু আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর হাওয়ায় মানুষ হইতেছি তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। আমাদের এখন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রথমাবধি যুগসমূহের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার হজম করিতে হইবে এবং যাহাতে হজমকার্য্য অল্পসময়ে ও অনায়াসে হইতে পারে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অর্থাৎ—পুস্তকাগার চাই; লেবোরেটরী চাই; কারখানা চাই, যন্ত্রাদয় চাই—এক কথায় একটি সহর চাই। বর্ত্তমান-কালের সমাজে সুখ-শান্তি আনিতে হইলে অনেক নূতন যোহাই দিতে হইবে। তাই আজ প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, প্রবর্ত্তন ও সংযোজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু পঞ্চনদের উপকূলে বসিয়া যে মহাত্মারা আমাদের জাতীয় মন্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিবার দরকার হয় নাই। কারণ তাহারা নিজেরাই মানব সভ্যতার সৃজন কর্ত্তা। সকলই তাহাদের সম্মুখে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সন্তান অগ্র পশ্চাৎ দুইদিকেই চোক বুলাইতে বাধ্য।

দেখা গেল, পল্লীবাসী ও সহরবাসীর মধ্যে বিভিন্ন। তজ্জন্যই উভয়ের মিলন আবশ্যক; নচেৎ সভ্যতা টিকিবে না এবং পল্লীগৃহই এই কাজ সাধন করিবার একমাত্র পন্থা। সহরের অধ্যাপক ও পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র কৃষক মুখোমুখি হইয়া যখন ভারতীয় সভ্যতার বিচার করিতে বসিবে তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে নূতন জীবন দেখা দিয়াছে।*

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

---

* "চেম্বর্স লাইব্রেরী" বা "রামমোহন লাইব্রেরী" প্রভৃতি যে সমস্ত লাইব্রেরী আছে তাহারাও পল্লী গৃহস্থের উন্নতি বিধানে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। এক সপ্তাহ কি এক মাসের জন্য অনায়াসেই তাহারা নানা প্রকার বই পল্লীবাসীর ব্যবহারের জন্য ডাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে তিনটী কাজ সাধিত হইবে—প্রথমতঃ. পুস্তক কিনিবার জন্য গৃহস্বামীকে বিশেষ অর্থব্যয় করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ—ডাকে সহরের "কর্ত্তাদের" নিকট হইতে পাড়াগেঁয়েদের পড়িবার জন্য বই আসিলে ঐ বই গুলির সম্বাদ বিপুল বাড়িয়া যাইবে এবং কৌতূহলবশতঃ বই পড়িবার আগ্রহ শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, সহরের বড় কর্ত্তারা যে গ্রামবাসী-দিগকে ভুলিয়া নাই, তাহারা ঘুরে বসিয়াও যে তাহাদের পাড়াগাঁয়ের ভাইদের কথা এক আধটু ভাবে তাহাও বেশ প্রতীয়মান হইবে। সহর ও গ্রামের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। সাহিত্য-পরিষৎও এই কাজে অগ্রসর হইতে পারে। এ সম্পর্কে বরদা রাজ্যের চলন্ত পুস্তকাগারের (circulation Library) কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয় চলন্ত-পুস্তকাগারের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে কিরূপে শিক্ষিত করা যাইতে পারে তাহা সুন্দর রূপে দেখাইয়াছে। উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি গ্রামে কেবল পুস্তক পাঠাইয়াই নিরস্ত থাকে না। অধ্যাপকগণ প্রতি বৎসরে গ্রামবাসীর নিকটে ৫০০ হইতে ৭০০ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। কয়েকটি গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা আমাকেও বক্তৃতা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তক ও বক্তৃতা পড়িয়া গ্রামবাসীরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অধ্যাপকগণকে অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকে। অনেক সময় তাঁহারা চিঠিতেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ১৯১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ ১৪০০ চিঠির উত্তর দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার ফেন্‌হাইস্ একদিন সভায় বলিয়াছিলেন "আমরা এই প্রদেশের ধনী নির্ধন ও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া এই জ্ঞান-মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছি। এখন যদি আমরা উইস্‌কন্‌সিনের প্রতি গৃহে জ্ঞানের মহিমা বিস্তার করিতে অপারগ হই তাহা হইলে আমরা জনসমাজে মুখ তুলিব কি করিয়া তাই আজ উইস্‌কন্‌সিনে জ্ঞানালোক বিস্তারে এত চেষ্টা। ইহাই "The spirit of the University of Wisconsin." "The University is by the people, of the people, for the people" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাণ যদি এইভাবে অনুপ্রাণিত না হয়ে থাকে, তবে পল্লীর মুখ "পল্লী গৃহ"কেই ঐ ভাবে গড়িয়া তোলা যাক্।

প্রকাশের আনন্দ

জগতের সকলেই প্রথমে স্বভাবকে সঙ্গী করিয়া জন্মগ্রহণ করে। জীবের সেই প্রথম সঙ্গী জীবকে পালন, বর্দ্ধন, উন্নতি, ও বিকাশের মধ্য দিয়া আবার জীবের চরম-সীমায় লইয়া যাইয়া উহারই ধ্বংস সাধন করে। যে স্বভাব জীবনধারণের প্রধান সহায় তাহাই আবার কালক্রমে জীবন ক্ষয়ের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, মানবেতর জীবের উহাই একমাত্র গতি ও পরিণতি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতির মধ্যে ইহা একটা প্রধান লক্ষ্যের বিষয় যে, মানব স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, স্বভাবের কোলে প্রতিপালিত হইলেও উহা হইতে ছুটিয়া যাইতে চাহে, এবং জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। আর সেই যুদ্ধের ফলেই মানবজাতির জন্য অভ্রভেদী প্রাসাদ, লোমহর্ষণ ভীষণ অস্ত্র, অসীম সমুদ্রবাহী অর্ণবপোত প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। স্বভাবের অনুগমন করিতে পারে না বলিয়াই মানুষের সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতির দরকার। যে স্বভাব কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, দর্শন প্রভৃতির জন্মদাতা সেই স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতেই উহাদের জন্ম।

আমি এই প্রবন্ধে মানবের সৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তির আলোচনা না করিয়া কিরূপে মানুষ প্রথমে স্বভাব হইতে ভাষার সৃজন করিয়াছে এবং সেই সৃজনের মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অতি সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব।

প্রকাশের আনন্দ হইতেই ভাষার সৃষ্টি। শব্দ নিত্য কিনা, শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে। তবে বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবের শব্দের সহিত ভাবের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভাব অর্থে reasoning বা logical thought আমার উদ্দেশ্য নহে, অন্তঃকরণের মধ্যে স্বভাবের প্রেরণায় কতকগুলি মানসিক বৃত্তি কার্য্য করিতে থাকে। সেই ভাবগুলি বা মানসিক বৃত্তিসমূহ যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন ঐ সমস্ত মানসিক ব্যাপারগুলির (mental processes) সহিত সাধারণ সংস্কার (বা instinct) এর পার্থক্য করা সুকঠিন; এমন কি অধিকাংশ স্থলে উহারা একই শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। পশুপক্ষী প্রভৃতি মানবেতর জাতির মানসিক কার্য্যাবলির সহিত মানব-শিশুর মানসিক কার্য্যের পার্থক্য প্রথমতঃ অতি সামান্যই অনুভূত হয়। মানব শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলি প্রথমতঃ আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে। মানবেতর জন্তুর কোন ভাষা আছে কিনা তাহা লইয়া পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা অনেক গবেষণা করিতেছেন এবং তাঁহারা যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা সকলে স্বীকার করিবেন কি না জানি না। সুতরাং ঐ সমস্ত জন্তুর ভাষা বাদ দিয়া মানবের ভাষা সম্বন্ধেই আলোচনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ কারণ মানবের ভাষা নাই একথা অন্ততঃ কোন মানুষেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন না।

প্রথমে বালক যখন অর্দ্ধস্ফুটভাবে শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন তাহার মনের

মধ্যে কতকগুলি মানসিক বৃত্তি কার্য্য করিতে থাকে। স্বভাবের প্রেরণায় বালক উহা প্রকাশ করিতে চাহে, প্রকাশ না করিলে বালক স্থির থাকিতে পারে না। উচ্চারণ-শক্তির অভাব ও স্বভাবের প্রেরণা এই দুয়ের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়; এবং শেষে বালকের উচ্চারণ শক্তি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করে। বালক এই জয়ের ফলে, এই মানসিক বৃত্তির প্রকাশের ফলে, স্বভাবের এই তীব্র প্রেরণার ফলে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। যতই সে প্রকাশ করিতে পারে ততই তাহার আনন্দ উছলিয়া উঠে। বালক উচ্চারণ শক্তি যতই বেশী লাভ করিতে সমর্থ হয় ততই একের পর আর একটী করিয়া ক্রমশঃ মানসিক বৃত্তি প্রকাশ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে থাকে এবং প্রকাশের আনন্দ যতই সে উপলব্ধি করিতে থাকে ততই তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে শেষে ইহাই তাহার ভাষার আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অনেক সময় আবেগের বশবর্ত্তী হইলে অজ্ঞাতসারে মানসিক বৃত্তি প্রকাশ করিয়া অনেকটা আশ্বস্তি (relief) অনুভব করে এবং অনেক সময় বিপুল আনন্দও উপভোগ করে। ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বোধ হয়।

প্রকাশের এই যে আনন্দ ইহা সামান্য বিষয় নহে। যে সমস্ত বিশ্বকবির পদতলে পড়িয়া কত পাপী তাপীর হৃদয় শীতল হইয়াছে, কত শত মুমূর্ষু জাতি জাতীয় পথ অনুসন্ধান করিয়া জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের কৃপায় কত শত নরপিশাচের হৃদয়-মরুতে প্রেমের পূত মন্দাকিনী বহিয়াছে, এক কথায় যাহাদের কৃপায় ধরা এখনও জ্ঞান ও প্রেমের হিল্লোলে বিভোর রহিয়াছে তাহাদের রচনার মূলেও ঐ প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। যদিও কবিগণ কখনও কখনও একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রচনা করিতে বসেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ঐ উদ্দেশ্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে, আনন্দই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, reason aestheticকেই উচ্চ আসন প্রদান করে। কবি মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান তাই তাহার কাব্য অথবা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না তাই তাঁহার কবিতা। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বালকের ঐ যে অস্ফুট শব্দ তাহাতেই কাব্যের বাজনা রহিয়াছে ভাষার এক একটী শব্দ বা কথা এক একটী খণ্ড কাব্য তাই মনীষী দার্শনিক পণ্ডিত Emerson বলিয়াছিলেন "Language is fossil poetry—Every word was once a poem." মানুষের ভাষা আছে তাই মানুষ মানুষ তাই অন্য জীব হইতে মানবের আসন এত উচ্চে, ভাব প্রকাশের এই উপায় আছে তাই মানুষের এত ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন কারণ "The man is only half himself the other half is his expression" তাই বুঝি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে শব্দের এত সম্মান তাই বুঝি "ফোটের" এত আদর তাই বুঝি পাশ্চাত্য জগতে Logosএর এত গৌরব। আবার একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় এই Logos সৃষ্টি-রহস্যের সহিত কিরূপ নিগূঢ়ভাবে জড়িত। বাইবেলে দেখিতে পাই in the beginning of the world

there was Logos আবার এই Logos শ্রীমদ্ভাগবতে "ব্রহ্মার নামে"র মূর্তিতে সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

একটু তলাইয়া দেখিলে ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, প্রকাশের এই আনন্দ হইতেই বিশ্বের এই সৃষ্টি। সচ্চিদানন্দের আনন্দের দিকটা এই ভাবে দেখিলে তাহার স্বরূপের বিকাশ অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। যাহার মূলে একদিন বালকের অর্দ্ধস্ফুট শব্দের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহার মূলেই আবার বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার আবার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাঁহার সৃষ্টির প্রয়োজন এই যে, তিনি নিত্য আনন্দস্বরূপ, তাঁহার আনন্দ অনন্ত, অফুরন্ত, এই আনন্দের উপলব্ধির নিমিত্তই তাহার সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন তিনি "রসোবৈসঃ" এই সৃষ্টিই God's realisation—God realises himself in through the world (Hegel) তাঁহার এই যে realisation তাহাই তাঁহার প্রকাশের আনন্দ, তাহাই তাঁহার সৃষ্টি—তাই বুঝি গোলোক রাধিকার প্রীতিময় বোধ হয় নাই, তাই যখন বৃন্দাবনের মোহন মুরলী বাজিয়া উঠিয়াছিল তখন তিনি গোলোক ছাড়িয়া বৃন্দাবনের মধুরলীলার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন —তাই বিষ্ণু কেবল বিষ্ণু হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও বৃন্দাবনে নিজ প্রকাশের আনন্দ জগতকে বিলাইয়াছেন তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্" আর সেই মধুর রস আবার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে স্বয়ং গৌরাঙ্গ বেশে আস্বাদন করাইয়া জগতে আনন্দের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সেই মধুর লীলার রহস্য জীবকে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী।

কর্ম্মের আহ্বান

(রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনার' ছন্দানুসরণে)

অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে!
হেথা নিশি-দিনমান, কাঁপাইয়া ভূ-বিমান,
গভীর আরাবে রণ-দামামা বাজে!
আজি বক্ষে আসি মম, খসিত কুসুম সম
জড়তা ভীরুতা যত মরিছে লাজে!
এস বীর-পদ-ভরে, বৃথা-শঙ্কা ফেলি দূরে,
নির্ভীক হৃদয়ে এস সমর-সাজে!
যদি অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে!

যদি　পঙ্কিল-সমাজ দেহ,　　ধুইয়া ফেলিতে চাহ
নীতির জলে ;
ম্রিয়মান স্বদেশেরে,　　যদি চাও তুলিবারে—
আপনে ধরমে জ্ঞানে আপন বলে ;—
এস বীর এস চলি,　　ক্ষুদ্র স্বার্থ পায়ে দলি,
মাতার নির্শ্বোক চাক দূরেতে ফেলে !
দাঁড়াবে হৃদয়ে মোর,　　মুছিয়া নয়ন-লোর,
স্বদেশ চাহিয়া দেখ আকাশ-তলে !
পঙ্কিল সমাজ-দেহ,　　ধুইয়া ফেলিতে চাহ
নীতির জলে !

মানবে দেখাতে চাহ,　　সত্যের নির্ম্মল পথ
ভুবন মাঝে ;
আভিজাত্য-গিরি ত্যজি, নীরবে এস গো আজি,
নিখিল মানব যাকে ভূতলে নেমে !
ছেদাভেদ যাও ভুলি,　　ভালবাস ভাই বলি,
ছোট বড় সকলেরে গভীর প্রেমে !
দেখিবে এ বসুধায়,　　আপন আলয় প্রায়,
সতত বহিবে সুখা তারকা-সোমে !
যদি　মানবে দেখাতে চাহ,　　সত্যের নির্ম্মল পথ
ভুবন-মাঝে !

যদি　অমর হইতে চাও,　　এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে !
গভীর মরম দেশে,　　দেখিবে করম শেষে
কি শীতল শান্তি-সুখা স্থির বিরাজে !
ধরার সন্তাপ নাশি,　　ছড়ায়ে বিমল হাসি
কি অমৃত গীত-গান সতত বাজে !
তাই বলি এস চলে,　　স্বার্থের বন্ধন-খুলে,
পায়ে দলি, বীরমণি, সঙ্কীর্ণ কাজে ।
যদি অমর হইতে চাও,　　এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে !

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী

ভারতীয় মুসলমানরাজগণের সাহিত্যসেবা
ও
শিক্ষা বিস্তার

(১০৪৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আকবর

চিত্রশিল্পের সহোদরা সঙ্গীতবিদ্যাও সম্রাটের দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহিত হইয়া এবং তাঁহার রাজত্বকালেই উন্নতির চরম সীমা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সভায় সঙ্গীতজ্ঞ হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী ও কাশ্মীরি পুরুষ ও রমণীগণ বাস করিতেন। এই সকল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন; প্রত্যেক ভাগের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দ্দিষ্ট ছিল।[1] জগদ্বিখ্যাত গায়ক মিঞা তানসেন আকবরের দরবারের গায়ক ছিলেন। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; গোয়ালিয়রে তাঁহার সমাধিস্থান ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে তানসেনের সঙ্গীত-গুরু হরিদাস এবং দ্বিতীয় তানসেন রামদাসও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে খাঁ খানের[2] নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা উপহার পাইয়াছিলেন। তানসেন এবং রামদাস সত্ত্বেও আকবরের সভায় নিম্নলিখিত গায়কগণও ছিলেন[3]:—

সুজান খাঁ,
শ্রীগান খাঁ,
মিঞা চাঁদ } গোয়ালিয়রের,

সুজান খাঁর ভ্রাতা বিচিত্র খাঁ,
মহম্মদ খাঁ ধারী,
দাউদ ধারী,
সুজন খাঁ
মিঞা লাল } গোয়ালিয়রের

তানসেনের পুত্র তানতরঙ্গ খাঁ,
বাদশাহ-নামাতে উল্লেখ আছে,
তানসেনের অন্যতম পুত্র বিলাস,
মুন্না ইসাক্ ধারী,
গোয়ালিয়রের নানক অরজু,
রামদাসের পুত্র সুরদাস,
গোয়ালিয়রের চাঁদ খাঁ
আগ্রার রঙ্গসেন,
মুন্না ইসাকের ভ্রাতা রহমতুল্লা এবং পীরজাদা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সঙ্গীত-যন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের বিখ্যাত বাদক ছিলেন;—

সরমণ্ডল যন্ত্রে—গোয়ালিয়রের বীরমণ্ডল খাঁ কৃতী ছিলেন;

---

1 *Aini-Akbari*, p. 612 (Blochmann).

2 *Tarikhi-Badauni*, Elliot v, p 482; and N. A. Willard's *Treatise on Hindu Music*, p. 214.

3 Willard, pp. 213 ff., and Blochmann's *Aini-Akbari*, pp. 612, 613.

4 *Badshah-Nama* by 'Abdul Hamid Lahauri, vol. ii, p. 5.

বীণ যন্ত্রে—শিহাব খাঁ ও পুরবীন খাঁ ;
ফুট (ভাই) যন্ত্রে—মসহদের উস্তা দোস্ত ;
করণা যন্ত্রে—সেখ দেওয়ান খাসী ;
তাম্বুরা যন্ত্রে { হিরাটের উস্তাই মুহম্মদ, মসহদের সুলতান হাসিম, উস্তা মহম্মদ আমীন এবং উস্তা, মহম্মদ হোসেন।
{ মসহদের মীর সৈয়দ আলী ও হিরাটের বৈরাম কুলী,
কুবুজ্ যন্ত্রে কিপচাকের তাস্ বেগ,
কাশিম, কুবুজ ও রুবাব যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্বরবিশিষ্ট এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন,
সুরণা যন্ত্রে উস্তা শা মহম্মদ এবং কানুন যন্ত্রে মীর আবদুল্লা সুপণ্ডিত ছিলেন।

আকবরের রাজত্বকালে সঙ্গীতশিল্পও উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে, স্বর-সঙ্গীতও তুল্যরূপে আদৃত হইয়া বিভিন্ন 'রাগ-রাগিণী'তে বিকাশ পাইয়াছিল ; কিন্তু চর্চ্চার অভাবে সেগুলি এখন বিস্মৃত প্রায়। ১

সঙ্গীতরাজ্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সঙ্গীত বিষয়ে যাহা কিছু দাতব্য ছিল তাহাই পরস্পরকে দান করিয়া বড় করিয়া তুলিতে ছিলেন। আকবরের রাজত্বেই এই অন্তরঙ্গ ভাব নূতন নহে বরং আরও অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই ভাব চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণের আগমনের পর হইতেই, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের ন্যায়, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় ও সৌহৃদ্যের এরূপ আর একটী অধ্যায় প্রস্তুত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ জৌনপুরের সুলতান হোসেন শরকী 'খেয়ালে'র আবিষ্কারক ; উহা হিন্দু সঙ্গীতের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে এবং এতৎসঙ্গে ধ্রুপদ দ্বারা মুসলমান সঙ্গীত বিভাগও যথেষ্ট সম্পত্তিশালী হইয়াছে। ২ প্রাচীন সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতের দ্বারা বর্ত্তমান যুগের সঙ্গীতের দ্বারা অপেক্ষা হীন ছিল না। দীর্ঘ শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে যথেষ্ট লাভেরই প্রমাণ দেয়।

এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশেই সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি মালবের বজ্‌বাহাদুর বিশেষভাবে ইহার উন্নতি ও উৎসাহের জন্য নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আবুল ফজলের মতে দেখা যায় কাশ্মীরে সে সময় অনেক উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ৩

কেবলমাত্র সম্রাট অথবা প্রাদেশিক প্রধান কর্ম্মচারিগণই যে এই কলার দিকে নজর দিয়াছিলেন এমন নহে বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহাদের পরিবারমাত্রেই এই আমোদে প্রীত হইতেছিলেন। ৪

মুসলমান রাজগণের দ্বারা কলাবিদ্যার শাখাবিশেষ চিত্রিত হস্তাক্ষর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আদৃত হইয়াছিল এবং আকবরের রাজত্বে নিম্নলিখিত লিখন প্রণালী প্রবল ছিল। ৫

---

1 *Vide* Willard. pp. 101 ff.
2 *Vide* Willard, pp. 101 ff.
3 Gladwin, p. 411.
4 Gladwin, p. 735.
5 Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 95.

সালস তৌকি মহক্ কক্ নস্‌খ রেইহান রিকা এবং ঘুবার, | ৯২০ খৃঃ অব্দে ইবনি-মুকলাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক কেহ কেহ ধারণা করেন ইহাকুট মুক্তাসমী নস্‌খ পদ্ধতির আবিষ্কারক। তালিক ভিন্ন পদ্ধতির অক্ষর, তাজি সলমানীতে উহার বিষয় লিখিত আছে। আব্দুল্ খাঁ সম্রাট আকবরের নিকট মীর মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি এই পদ্ধতির হস্তাক্ষর লেখার যথেষ্ট কৃতী ছিলেন। সুবিখ্যাত নষ্টালীক বর্ণমালার সমুদয়ই বক্রভাবের। এইরূপ উক্ত আছে যে তৈমুরের রাজত্ব সময়ে খাজা মীর আলি তব্রীজী, নস্‌খ ও তালিক উভয়ের কতকাংশ লইয়া উহা রচনা করেন। আবুল ফজল বলেন উক্ত সম্রাটের রাজত্বের পূর্ব্বেই ঐ লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল; সুতরাং মীর আলী উক্ত বর্ণমালার রচয়িতা নহেন।

আকবর সুলেখক বিশেষতঃ নষ্টালীক বর্ণমালার লেখকদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্ব্বে পরিষ্কার ও সুদৃশ্য হস্তাক্ষরের প্রয়োজন ছিল; সুতরাং এই শিল্পের উপর এত বেশী জোর দেওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ ছিল। আকবরের দরবারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন—

মহম্মদ হোসেন কাশ্মীরী জরিকলম,
মুল্লা মীর আলী এবং তৎপুত্র,
মৌলানা বাকির,
মহম্মদ আমীন মশ্‌হদী,
মীর হুসাইনী সুলঙ্কী,
মৌলানা আবদুলহায়ী
মৌলানা জৌরী,
মৌলানা আবদুল-রহীম,
মীর আবদুল্লা
নিজামী কাজবীনী
আলী চমন কাশ্মীরী
নূরুল্লা কাশিম আর্শলান। ১

সম্রাট আকবর তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদিগের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য সুখ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত নিয়োগ করেন। কুতবুদ্দীন খাঁ ও আবদুল রহীম মীরজা—সলীমের; কৈজী ও শরীফ খাঁ—মুরাদের এবং সৈয়দ খাঁ চাল্‌ডাই—দানিয়ালের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুরাদ খৃষ্ট-ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি কোন কোন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের নিকট বাইবেলের একাংশ (New Testament) পড়িয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার এক পৌত্রকে আবুল ফজল ও একজন ব্রাহ্মণের শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। ২

1 Blochmann, p. 103.
Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 247.
Faizi was once appointed Daniyal's tutor (*vide Muntakhabul-Tawarikh*, vol. ii, (Lowe), p. 297). "Akbar committed the education of his favourite son Murad to Father Manserrat to be instructed in the sciences and religion of Europe. One day the young prince began his lesson in the Emperor's presence with these words, 'In the name of Almighty God.' 'Add, my son,' said Akbar, 'and of Jesus Christ, the true Prophet.'—Hough's *Christianity in India*, p. 270.

আকবরের রাজত্বকাল নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রণালীর নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের এক নূতন যুগ। শিক্ষার যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন এবং উন্নতির পথা প্রদর্শিত হইয়াছিল ইহা সম্রাটের উদার হৃদয়ের কাজ; এবং তাহার চরিত্রবত্তা আরও অনেক দিকে বিকশিত হইয়াছিল। আমরা আকবরের চরিত্রে, খুব সম্ভবতঃ মুসলমান ইতিহাসে এই প্রথম দেখিতে পাই যে, একজন মুসলমান সম্রাট সরল অন্তঃকরণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য উৎসুক ছিলেন। আমরা এই প্রথম দেখিতেছি হিন্দু ও মুসলমান একই স্কুলে ও কলেজে পাঠ করিতেছিলেন। পাঠের এই রকম সংস্কার সত্ত্বেও সম্রাট পড়াইবার ধারা ও পাঠ্য তালিকা প্রভৃতির অনেক সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন। পাঠের সুফল বর্ণন করিয়া আবুল ফজল গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন "সমুদয় সভ্য জাতিরই যুবকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় আছে; কিন্তু হিন্দুস্থান তাহার বালকদিগের বিদ্যামন্দিরের জন্য বিখ্যাত।[১]

বালকদিগকে প্রথমেই উচ্চারণ ও ছেদ-ভেদে পারশী বর্ণমালা শিক্ষা করিতে হইত। এইরূপে এত দ্রুত উন্নতি হইতেছিল যে, দুই অক্ষরের বানান শিখা করিতে দুই দিনের বেশী আবশ্যক হইত না। এক সপ্তাহ পর ছাত্রগণ পদ্যে অথবা পদ্যে ধর্ম্ম কিংবা নীতিবিষয়ক ছোট ছোট লাইন পড়িতে পারিত, ঐ পাঠের মধ্যে সাধারণতঃ ঐ সকল বানান দেখিতে পাইত। যখনই তাহারা নিজে ঐ পাঠ শিক্ষা করিত তখনও শিক্ষকের নিকট হইতে সাহায্য পাইত। তারপর কিছুদিন শিক্ষক এক নূতন রকমের বর্ণযোজনা শিখা দেওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রগণ দ্রুত পড়িতে পারিত। শিক্ষক যুবক ছাত্রদিগকে দৈনিক চারিটী কাজ দিতেন যথ:—বর্ণমালা, শব্দ গঠন একটী নূতন শব্দের সন্ধি অথবা বিশ্লেষণ এবং পূর্ব্বে তাহারা যে পাঠ করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করা। এই প্রণালীদ্বারা যথেষ্ট উন্নতি হইতেছিল; পূর্ব্বে যাহা কয়েক বৎসরের নির্ব্বাচন ছিল এখন তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই প্রসিদ্ধির সহিত সম্পন্ন হইতেছিল। নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত:—নীতি, পাটীগণিত, হিসাব, কৃষি, জ্যামিতি, জরিপ, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, শাসন-প্রণালীর বিশ্লেষণ, পদার্থবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বাজার দর, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইতিহাস। হিন্দুগণ জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ, বেদান্ত এবং ও পতঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও অবস্থার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিক্ষা করিতেন। আবুল ফজল বলেন এই নিয়ম প্রণালীর দ্বারা বিদ্যালয়গুলি নূতন আকারে এবং কলেজগুলি প্রাণ পাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু হইয়াছে।[২]

সম্রাট এইরূপে শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত দুর্গ, প্রাসাদ, কলেজ এবং মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া ও সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন।

আকবর ফতেপুর সিক্রিতে একটী বড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "খুব কম পরিব্রাজকই এইরূপ বড় আর একটীর নাম

1 Gladwin, pp. 192, 193.
2 Blochmann's *Aini-Akbari*, pp. 278, 279; Gladwin, pp. 192, 193.
3 Gladwin, p. 146

করিতে পারিয়াছেন।" ১ লালা শীলচাঁদ খুব সম্ভব এই মাদ্রাসা সম্বন্ধেই বলিয়াছেন "আকবর আজমীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং মাদ্রাসা, ও থাঁকা সমন্বিত বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" ২ এই কলেজ ব্যতীত আকবরের রাজত্ব কালে নগরের মধ্যে আরও কতকগুলি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৩

আগ্রাতেও কতকগুলি মাদ্রাসা ছিল, সেখানে মুসলমান বিদ্যা-জগতের বিখ্যাত কেন্দ্র সিরাজ হইতে কয়েক জন অধ্যাপক আনয়ন করা হইয়াছিল। ৪ শীলচাঁদ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েও আগ্রাতে খুব বৃহৎ একটী মাদ্রাসা বর্ত্তমান ছিল। আকবর সিরাজের একজন দার্শনিককে এই বিদ্যালয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫

উল্লেখ করা উচিত যে, দীল্লির কলেজ মাত্রেই ছাত্রাবাস ছিল না। সুপণ্ডিত সেখ আব্দুল হক ২০ বৎসর বয়সে ব্যবহারিক জ্ঞানের অনেকগুলিতেই কৃতিত্বলাভ এবং কোরআনের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন ৬। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি দীল্লির কোন কলেজে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠার্থ উপস্থিত হইতেন। নিজের বাসায় ফিরিয়া আহারের জন্য খুব কম সময়ই পাইতেন, তাঁহার আবাস স্থান কলেজ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, সুতরাং তাঁহাকে দিবসে ৮ মাইল যাতায়াত করিতে হইত ইহাতে তাঁহার যথার্থ শিক্ষানুরাগ প্রমাণ করিতেছে। ৭

যখন আমরা সেই সময়ের স্কুল, কলেজের বিষয় আলোচনা করি তখন যেন খাতনামা পণ্ডিতগণের গৃহশিক্ষা দানের কথা ভুলিয়া না যাই। ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাহিত্য-সমিতিগুলি যে কাজ আরম্ভ করিতেন তাঁহারা সেই কাজ প্রচারিত করিতেন এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর কলেজ শ্রেণীর পাঠের বন্দোবস্তও করিতেন। এইরূপ জানা যায় যে, তারিখি বাদাউনীর প্রণেতা আব্দুল কাদির তাঁহার আগ্রার পাঠ শেষ করিয়া, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার বসোয়ারের বাড়ী ছাড়িয়া শিক্ষাগুরু মীর আলী বেগের গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং সেই খানেই

1 *Aini-Akbari*, vol. ii, (Jarrett), p. 180.

2 *Tafrihul-Imarat*, by Lala Silchand, MS. in ASB, leaf 243. The Persian MS. *'Imaratul-Akbar*, by Chahtar Mal, which gives a detailed account of the edifices built by Akbar, and which has been so highly spoken of by Mr. Beale in *J.A.S.B.* (1875) pp. 117, 118, very probably mentions the Sikri College. I regret I could not use this rare MS., as the one belonging to ASB procured by Prof. Blochmann is missing.

3 *Vide Khulasatul-Tawarikh*, as quoted in J. Sarkar's *Topography of the Mughal Empire*, p. 24, corresponding to *Khulasatul-Tawarikh*, MS. in ASB, leaf 25.

In Gujrat there was a madrasah built by Sadiq Khan. Shaikh Wajihuddin Ahmad used to teach here, and when he died he was buried within this college (1589 A.D.),—*Mirati-Ahmadi*, vol. ii, p. 45.

4 *Tafrihul-'Imarat*, MS. in ASB, leaves 39, 41.

5 *Ibid*, leaf 41.

6 *Badshah-Namah* of 'Abdul Hamid Lahauri, Elliot, vi, p. 176.

7 *Akhbarul-Akhyar*, 'Abdul Haqq, Elliot, vi, p. 176, corresponding to its lithographed ed. p. 357.

বাসা করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেছিলেন।১ এইরূপ শিক্ষাদানের রীতি সুদূর কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; বিশেষতঃ কলা ও বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগের জন্য স্কুল ও কলেজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই সব বিষয়ের কোন কৃতিত্বলাভই ঘটে নাই,—যেমন সঙ্গীত, চিত্র ও অন্যান্য কলা, নানাবিধ শিল্প, কোন এক বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা এবং এইরূপ আরও অন্যান্য বিষয়।

সম্রাট আকবর ফিরোজ শাহের ন্যায় সর্ব্বদাই কলা বিদ্যার উৎসাহ দান করিতে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাহারা কৌতূকাবহ কলকব্জার আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহাদিগকে পুরস্কার দিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যেসকল কলকব্জার কার্য্যের জন্য পুরস্কার দিয়াছেন উহা বিংশ শতাব্দীর কোন কারিগরের পক্ষেও যথেষ্ট সুখ্যাতির বিষয় হইত।২

আকবর এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালেও দেখিতে পাই কেবলমাত্র সম্রাট নহেন, মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষাবিস্তারে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৫৬১ খৃঃ অব্দে (৯৬৯ হিজিরাব্দে) আকবর ধাত্রী মাতা সম্রাট আকবরের স্তনদাত্রী ধাত্রী মাহম আনুগ কর্ত্তৃক একটী মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল।৩

ইহা নিশ্চয়ই সুখ্যাতির ও প্রশংসার কথা যে, তিনি এই প্রথাটীই শিক্ষোন্নতির একমাত্র কারণ ভাবিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে দেখা যায় যে, এই মাদ্রাসার সন্নিহিত মস্‌জিদটী অতিশয় সুদৃশ্য ছিল।

ইহা "লাল বর্ণের দ্বারা চিত্রিত প্রস্তর ও শ্বেতাইট এবং সুদৃঢ় প্রস্তর ও আস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; ফটকটী কতকাংশে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু এক সময়ে যথেষ্ট সুদৃশ্য ছিল। মসজিদের

1 *Tarikhi-Badauni*, Elliot v, 493.

2 "One of the wonders of art which was exhibited this year, 1003 A.H. (1594 A.D.), was the work of Sayyid Husain Shirazi. He used to stand with a box in his hand, and when any one gave him a rupee, he threw it into the box, and it kept on rolling until it fell to the bottom. Upon this a parrot which was chained to it, began to speak and two fowls began also to cackle at one another. Then a small window opened, a which a panther put out its head and let a small shell fall from its mouth into a dish which was placed on a lion's head and the shell then came out of the lion's mouth. A thort time elapsed when another window opened and another lion came forth, took the shell into its mouth and retired, and the windows again closed. Two elephants then appeared with perfect trunks, and there were also two figures of men who sounded drums. A rope then thrust itself forward and again retreated of its own accord. Two other men then advanced and made obeisance. Shortly after another window opened and a puppet came forth with an ode of Hafiz in its hand, and when the ode was taken away from the puppet, it retired and the window was closed. In short, whenever a piece of money was placed in the hands of Husain Shirazi, all these marvels wer eexhibited. The King first gave a gold *mohar* with his own hand and witnessed the sight. He then ordered his attendants to give a rupee each. The odes which were presented were given by the King to Naqib Khan, by whom they were read out. The exhibition lasted for several nights."—*Zubdatul-Tuwe-rikh* by Shaikh Nural Haqq, Elliot vi, p. 192.

3 C. Stephen's *Archæology of Delhi*. pp. 199 ff.; also *Asrarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad,. 3rd chap., p. 54.

ভিতরের অংশ রঙ্গিত আস্তর এবং মসৃণ টালি দ্বারা বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার অনেক স্থানেই দাগ পড়িয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখভাগ এবং ফটকটী রঙ্গিত রক্ত করা পাথর ও রক্ত পাথরে খোদিত ফুল দ্বারা সৌন্দর্য্যবিধান করা হইয়াছিল। ব্যবহৃত রংগুলি নীল, পীত, লাল, বেগুনে, শুভ্র, সবুজ, কাল এবং শ্বেত ছিল। মস্‌জিদের উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে খাটো রকমের একটী গম্বুজ ছিল এবং ঠিক কিলা কোণা মস্‌জিদেরই মত উপরিভাগে বিশিষ্ট ভাবের একটী সরু রকমের মন্দির ছিল। মস্‌জিদের দেওয়ালগুলি বরাবর খাড়া ও গম্বুজগুলি গড়ান রকমের ছিল এবং সম্মুখভাগ মা-কি মস্‌জিদের ন্যায় দেওয়াল পর্য্যন্ত হেলান ছিল। মাদ্রাসা গুলিই এই মস্‌জিদের বিশেষত্ব ছিল।" ১

সুরঞ্জিত মস্‌জিদের সহিত মাদ্রাসার যুক্ত কেমন সুন্দর দেখাইত কিন্তু দুরদৃষ্ট তাই কোন আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে ইহার নামটী চিরকাল যুক্ত থাকিয়া ইহার অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিবে। আকবরের রাজত্বের ৮ম বর্ষে, উক্ত কলেজের ছাদের উপর হইতে তাঁহার জীবননাশের জন্য একটী চেষ্টা করা হইয়াছিল। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তদ্‌কাতি আকবরীর ২ প্রণেতা লিখিয়াছেন।

"যখন শরফুদ্দিন হোসেন বরবার হইতে নাগোরে পলায়ন করেন সেই সময় হইতেই তাঁহার পিতার অন্যতম ক্রীতদাস কুকা ফুলদে সর্ব্বদাই সম্রাটের অনিষ্ট করার জন্য গোপনে নানা বিষয়ের কৌশল আঁটিতেছিল। এই দুরভাগ্য ব্যক্তি রাজ-শিবিরে আসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। যে সময় সম্রাট শিকার দ্বারা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দীলির রাজার পার হইয়া মাহম্ আনগের মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তী হইলেন ঠিক সেই সময়ে এই রক্তপিপাসু ব্যক্তি সম্রাটের উপর তীর নিক্ষেপ করে, কিন্তু যিনি সম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেই পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহাতে খুব গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও কর্ণের উপর আঁচড় কাটিয়াছিল। সম্রাটের ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ আততায়ীকে আক্রমণ করিল এবং তরবারি ও ছোরার আঘাতে তাহাকে কালগ্রাসে পাতিত করে।" ৩

এই ঘটনা হইতে স্মরণ হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট হুমায়ুনেরও এরূপ একটী বিপদ ঘটিয়াছিল। যে সময় অন্তঃপুরকালের জন্য ফতেপুর সিক্রির বাগানে বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন সেই সময় তিনিও আকবরের ন্যায় সঙ্কীর্ণাবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ৪

মাদ্রাসাটীর এখন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিক্ষুদিগের গৃহগুলি এখানে সেখানে পতিত দেখা যায়। ইহা পুরানা কিলার পশ্চিম-দিগের ফটকের প্রায় সম্মুখে অবস্থিত এবং সের সাহের দীলির পশ্চিম ফটকের নিকটেই অবস্থিত ছিল। ৫

---

1 Beglar, quoted in C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, pp. 199, 200.
2 *Tabaqati-Akbari*, MS. in ASB, pp. 260 ff.
3 C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 200 ; *Akbar-Namah*, vol. ii, (Beveridge) p. 312.
Khafi Khan, in his *Muntakhabul-Lubab (Bibl. Indica)* Pt. i, p. 164, mentions the incident, but not the madrasah.
4 See Jauhar's *Tazkiratul-Waqait*, transl. by Stewart, p. 24.
5 C. Stephen' *Archaeology of Delhi*, p. 199. The inscription on Muhammad, woh is great Akbar among the just kings, maham Begam, the root of purity, laid the foundation of this house for good men but the building of this gracious house was helped by Shahabuddin Ahmad Khan Bazil ; what blessing there are in this auspicious building that its date is found in the words, 'Blessed Among House' !"

মাহম বেগমের কলেজ ব্যতীত আমরা অনেক খাস মু'ইনের কলেজের কথাও জানি। এখানে ১৫৭১ খৃঃ অব্দ হইতে তিন বৎসর-কাল মীরজা মুক্রিম্ সমরকান্দী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১

আকবর পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার ও বৃত্তিদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। যখন তিনি কাশ্মীর জয় করেন সেই সময় কাশ্মীরের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই উদারতা দেখাইয়াছিলেন। ২ তাঁহার নানাপ্রকার সাহিত্যানুরাগের যশঃ-সৌরভ রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তিনি কেবলমাত্র মুসলমানদিগের নহেন, পরন্তু তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকদিগের শ্রদ্ধা-ভক্তিও লাভ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; সম্রাটের সমসাময়িক ত্রিবেণীর বাঙ্গালী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে' সম্রাটের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

সম্রাটের নিকট হইতে যাঁহারা উৎসাহ পাইতেছিলেন 'তব্‌কাতি আকবরী' তাঁহাদের কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতের নাম দিয়াছেন। নিম্নে কয়েকজনের মাত্র নাম দেওয়া হইতেছে :—

১। আমীর মীর তকি শয়ীকী,
২। মুল্লা সৈয়দ সমরকান্দী,
৩। শেখ আবুল ফজল,
৪। মুল্লা আলাউদ্দিন হিন্দী,
মুল্লা সাদিক্ হলবাই,
মীরজা মুক্রীম্,
হাফিজ তাশকান্দি,
মুল্লা আবদুল্লা সুলতানপুরী,
শেখ আব্দুল নবী-দিলাবী,
কাজী জালালুদ্দিন হিন্দী, প্রভৃতি।

তালিকাতে ২৫ জনের নাম আছে। তবকাত সেই সময়ের একটী নামের তালিকা দিয়াছেন উহাতে ১৩ জন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ, সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পার্শী, তুর্কী, আরবী ও হিন্দিভাষা অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তিনি কবিও ছিলেন এবং সাধারণের কাছে রহীম বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে বাবরের জীবনস্মৃতির পারস্যানুবাদ করিয়া উহা আকবরকে উৎসর্গ করেন। ৪ তিনি পারসী পণ্ডিতগণের শিক্ষাকেন্দ্র বাদ্‌খে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ৫ তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া মৌলানা সৈফুদ্দিন মহম্মদ কাসান্‌সরের শিক্ষাধীন গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট যুসুফ সুলেখা ও অন্যান্য পুস্তক সমাপ্ত করেন।

খাঁ খানান আব্দুল রহীমের পুত্র মীরজা ইরাজও সুশিক্ষিত ছিলেন। মীরজা খান-দিরাজীর অন্যতম ছাত্র মৌলানা খাইরুদ্দিন

---

1 *Muntakhab-tabaqati-Akbari* (bound up in the same volume with *Muntakhabul-Miratul-Alams*), MS. in the Both. Coll., p. 20. The work only mentions that the *madrasah* was in Hindustan.

2 *Tarikhi-Kashmir* (or *Gaukar-i-'Alim*), by Muhammad Aslam 5th Tabaqah.

3 Mr. Dinesh Ch. Sen's *Hist. of Bengali Literature*, pp. 335, 336 (newed.).

4 Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 89.

5 *Ibid.*, vol. i, p. 126.

কর্মী এক সময়ে তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি আমেদাবাদের কোন মাদ্রাসাতে অন্য একজন শিক্ষকের অধীনেও ২৩ বৎসর শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। ১

আব্দুল-রহীমের একটী পাঠাগার ছিল, সেখানে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি পাঠার্থ ও আত্মোন্নতির জন্য সমাগত হইতেন। ২ তাঁহার পাঠাগারটী কত বড় ছিল সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারতীয় এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রাচীন পাঠাগারগুলির চিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। আমি এইখানে পারস্যের হালবানের একটী প্রাচীন পাঠাগারের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, উহা রহীমের জন্মস্থান বদকশনের অতি নিকটবর্ত্তী একটী দেশ। পাঠাগারের অন্তর সাজসজ্জাবিধান কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

বহু ব্যক্তি খাঁ খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসিতেন। ৩ মা-আসিরি রহীমী বর্ণন করেন, ১৪ জন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার বিভিন্ন জ্ঞানের সাহায্য লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। ৪

আমরা পূর্ব্ববর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণ এবং বিবরণী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, একমাত্র আকবরই তাঁহার সময়ের ভারতীয় সাহিত্য-জগতে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের রাজত্বকালের সঙ্গে উদার নীতি ও উদার হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার রাজত্বকালের তুলনা করিলে দেখা যায়, শাসনবিভাগ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মবিষয় এবং সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই তাহাদের অপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে সুসংস্কার উপলব্ধি করিয়া হিন্দুদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মপন্থা আলোচনার ফলে যে পন্থা পাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা প্রজাসাধারণকে সরল ভাবে নূতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আমরা ফিরোজ শাহ তোগলকেই প্রথম দেখিতে পাই। ফিরোজ শাহ জালালুদ্দীন লাইব্রেরী এবং অশোকস্তম্ভ প্রভৃতি হিন্দু-সভ্যতার স্মৃতিস্তম্ভের মূলস্থান-চ্যুতির দ্বারা ঐ সকলের প্রতি যত্ন গ্রহণ করার কয়েকটী ঘটনার ফলে আলাউদ্দিনের সাহিত্যানুরাগকেও হার মানাইয়া ছিলেন। ৫ যাহা হউক, আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুসলমান বালকগণের সহিত হিন্দুবালকের একত্র অধ্যয়নে; ইবাদত খানাতে পৌড়া হিন্দু পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্কের ফলে ঐ মত গ্রহণ করেন, হিন্দুর জ্ঞানের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং হিন্দুসাহিত্য ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদির অনুবাদে ও প্রচারে তাঁহার উৎসাহ প্রদর্শন করেন; এবং সর্ব্বশেষ দেখা যায়, বিখ্যাত হিন্দুগণ তাঁহাদের সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সরকারী সাহায্য লাভ

1 *Ibid.*, leaf 487.
2 *Ibid.*, leaf. 480
3 'Abdul Baqi proposes, in the Table of contents of his *Maasiri-Rahimi* (MS. in ASB), to speak of Abdul Rahim Khan Khanan's Madrasahs in the third book but much to my disappointment, he omits the subject altogether.
4 *Maasiri-Rahimi*, MS. in ASB. leaf 486.
5 *Ibid.*, leaves 488 ff.

করিয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহার উদারতার পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছি হিন্দুসাহিত্যের জন্য ধীর ও ধারাবাহিক সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আমরা আরও দেখিয়াছি আকবর সাহিত্য-জগতে তাঁহার দৃঢ়োৎসাহ এবং সদিচ্ছাকে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালনা করিতে (তাঁহার সম্বন্ধে নিরক্ষর ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে,) দক্ষ হইয়াছিলেন। উক্ত বুদ্ধিমত্তার প্রেরণা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আবুল ফজল, ফয়জী আব্দুল কাদির প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের সঙ্গে, বিশেষতঃ এই রকম যাহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়া বাণী-কমলার মধ্যে কঠোর সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য সেই বুদ্ধি-বিকাশের চেষ্টাই, ইবাদত খানাতে দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিনিধি-গণকে একত্রিত করে এবং সাধারণ প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে তর্ক ও বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ধর্ম্মালোচনার একটী অরণীয় বৎসর রাখিতে ও দেশের জ্ঞানরাজ্যের দ্রুত উন্নতির এই চেষ্টাই আকবরের, নূতন কর্ম্মপ্রবর্ত্তন। আকবরের অন্যান্য বিখ্যাত কার্য্যাবলীর মধ্যে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পণ্ডিতদিগকে প্রচুর বৃত্তি ও পুরস্কার দান, নূতন নূতন শিক্ষালয় নির্ম্মাণ, শিক্ষার্থে প্রথম ভূ-সম্পত্তি দান এবং বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি জানা-লোচনার জন্য এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজধানীতে আনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং শাসন পরিষদগুলিও শিক্ষার ও জ্ঞান লাভের কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল।

আরঙ্গজেব

প্রধান ছয়জন মোগল সম্রাটের সর্ব্বশেষ সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্ব সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব। তাঁহার শিক্ষানীতি কালক্রমে সমধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ সাম্রাজ্য-শাসনের সাধারণ নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রজাসাধারণ অতি কৌশলে এবং নিশ্চয়তার সহিত পরা-ধীনতা ভোগ করিতে থাকিল। আকবরের মত, তিনি হিন্দু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। ১৬৬৯ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে হিন্দুদিগের স্কুল ও মন্দির ধ্বংস করিতে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদান ও ধর্ম্মালোচনা বন্ধ করিতে আদেশ দেন।১ যাহা হউক তিনি অতি সত্বরেই মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষো-ন্নতি এবং সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া ইসলামীয়-সাহিত্যের প্রচার জন্য যথেষ্ট যত্ন লইয়া-ছিলেন। মুসলমান যুবকদিগকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত, সাম্রাজ্যের, বিভিন্নাংশের বিদ্যালয় গুলিতে অধ্যাপক নিয়োগ করেন। ছাত্র-দিগের পাঠের উন্নতি অনুসারে তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইত।২

মিঃ কীন্ তাঁহার 'মোগল এম্পায়ার' (মোগল সাম্রাজ্য) নামক গ্রন্থে অন্যান্য সৎকর্ম্মের সঙ্গে

---

১ J. Sarkar's *Anecdotes of Aurungzib and Historical Essays*, p. 11.

২ *Miratul-'Alam*, by Bakhtawar Khan MS. in the Bob. Coll., leaf 257 ; *Alamgir-Namah*, by Maulawi Munshi Muhammad Kasim (*Bibl. Indica*), p. 1085 ; *Maasiri-Alamgiri* by Mahammad Saqi Musta'id Khan (*Bibl Indica*) p. 529 ; *Tabsiratul-Nasirin*, MS. in ASB, p. 158.

তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের বিষয়ও সংগ্রহ করিয়াছেন "আরঙ্গজেব কঠোর শাস্তি উঠাইয়া দেন, কৃষির উৎসাহ দেন, বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুশৃঙ্খলাযুক্ত রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করান।" ১ এই দীর্ঘকাল পরে সেই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলির কথাই জানা যায় না। কিন্তু একটী প্রমাণ পাওয়া যায়, লক্ষ্ণৌ নগরের যে অংশে ফিরিঙ্গি মহলে ওলন্দাজদিগের অট্টালিকাদি ছিল সেইগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানদিগের মাদ্রাসার জন্য ব্যবহার করেন।২ তিনি গুজরাটের দেওয়ান মক্রমৎখাঁকে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য দেওয়ানদিগকেও আদেশ দিয়াছিলেন, উচ্চ নীচ যে কোন বংশের, যে সকল ছেলেরা 'মীজান' ও 'কন্‌নক' পড়িবে তাহারা কলেজের অধ্যাপকগণের এবং স্থানীয় সর্দ্দারের অভিমতিতে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে। আরও আদেশ হইয়াছিল যে, ঐ সকল ছাত্রের নামের সঙ্গে আহম্মদাবাদ, পৈথান এবং সুরাটের তিনজন অধ্যাপকের এবং আহম্মদাবাদের ৪০ জন ছাত্রের নাম যুক্ত হইবে। ৩ ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটের মাদ্রাসাগুলির সংস্কার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়ার আদেশ করেন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে সর্দ্দার অক্রমুদ্দিন খাঁ ১,২৪০০০ হাজার টাকা নিজব্যয়ে আহম্মদাবাদে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাটের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদ্ধেতু আরঙ্গজেব তাঁহাকে ৩৩ গ্রাম (সানোলি পরগণাতে) এবং সিঁচিয়া গ্রাম (কড়ি পরগণাতে) জায়গীর দেন।৪

আরঙ্গজেব গুজরাটের ভদ্রদিগকে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইয়া তাহাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং মাসিক পরীক্ষার ফলাফল তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন। যাহা হউক উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঠে ত্রুটি থাকায় সম্রাট শাস্তিদানের জন্য আদেশ করেন যে, তাহাদের বাধ্যকরা শিক্ষার ব্যয় কমিটি হইতে প্রদত্ত হইবে।৫ সর্দ্দার অক্রমুদ্দিন খাঁর কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত অনেক মাদ্রাসা ছিল। বিদ্যানাথে কাজীউল-কি-মসজিদের সন্নিকটে কাজী রফিউদ্দিন মহম্মদ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৮০ হিজিরা (১৬৭০ খৃঃ অঃ) খোদিত-ফলক একখানি উহাতে দেখা যায়।৬

আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিয়ালকোট মুসলমানশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী এইখানেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই নগরে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক মৌলবী আবদুল হকীমের প্রতিষ্ঠিত কোন স্কুলে তৎপুত্র মৌলবী আবদুল্লা শিক্ষকতা করিতেছিলেন। এইখানে মনে রাখা উচিত, শিক্ষাকেন্দ্ররূপে শিয়ালকোটের

---

1 Keene's *Mughal Empire*, p. 23.
2 Constable's *Bernier*, p. 292 n.
3 *Mirati-Ahmddi* by Ali Muhammad Khan, vol. i, p. 272. "Aurangaib assisted students of Mizan received 1 anna, of Munshaib 2 annasand up to Sharhi Wiqayah Fiqh 8 annas per diem."—*Tarikhi-Fasrh-Bakhsh* of Muhammad Faiz Bakhsh, translated by W. Hoey, p. 104.
4 *Mirati-Ahmadi*, by Ali Muhammad khan, vol. i, p. 363, and vol. ii, p. 37.
5 *Mirati-Ahmadi*, vol. pp 377, 378.
6 *Archaelogical Survey Report*, vil. xx, pp. 76, 77.

খ্যাতি আকবরের সময় হইতেই লাভ হইয়াছিল। ১ সম্ভবতঃ, শিয়ালকোটে পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেন ও এখানে প্রচুর কাগজ ব্যবহৃত হইত এবং বিশেষতঃ মানসিংহও ভাল, স্থায়ী, পরিষ্কার রেশমী কাগজ প্রস্তুতীর জন্যই ইহার প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ঐ সকল বস্ত্র নগরের উপকণ্ঠে তিনটী গ্রামে তৈয়ারী হইয়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত এবং বেশীর ভাগই দীল্লির সম্রাটগণের দরবার সমূহে ব্যবহৃত হইত। ২

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেক মোগলসম্রাটই প্রজাদের শিক্ষা এবং সাহিত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন ইহা যে তাহারই ফল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিকোলাও মনাক্‌চি বলেন ইহা অভ্যাসের ফল, কারণ যখন যুবরাজগণ পাঁচ বৎসরের হইতেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা তাতার অথবা প্রাচীন তুর্কীদিগের ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখিতেন। তারপর তাহারা পণ্ডিতের শিক্ষাধীন থাকিতেন এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে, ঊষার ও সামরিক শিক্ষা দান করিতেন। যাহাতে তাঁহাদের আমোদের মধ্যেও জগতের জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ জন্মে এবং তাহাদের অভ্যাস ও রুচি সংস্কৃত হয় পণ্ডিতগণ সেইরূপ যত্নই লইতেন।৩ অন্যান্য যুবরাজদিগের ন্যায় আরঙ্গজেবও বাল্যেই শিক্ষালাভ করেন। তাহার সর্ব্ব প্রথম শিক্ষক সাদুল্লা খাঁ, পরে সাজাহানের অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মীর মহম্মদ হসিম তাঁহার অন্য এক শিক্ষক ছিলেন। যুবরাজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকায় যাহা পড়িতেন তাহা দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তিনি কোর-আন্ ও হদী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; আরবী ও পারসী দ্রুত লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন এবং তাঁহার বহু উদ্ধতন পুরুষদিগের ভাষা চঘতাই-তুর্কীর উপর যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। কোর-আন্ ও হদীর ভাষা, ব্যাকরণ নিয়ম এবং ইমাম্ মহম্মদ বক্সালির গ্রন্থ প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি গোঁড়া হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সের ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় রচনাদি পাঠের রুচি তাঁহাকে গোঁড়া মুসলমানদিগের মধ্যেও গোঁড়া এবং প্রাচীন রুচির পোষক করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে যাহাতে নৈতিক উন্নতির কোন ইঙ্গিত ছিল না এইরূপ চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি, এমন কি যাহাতে ইসলাম ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও ছিল না তাহাই তাঁহার ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়া ছিল।

যাহা হউক আরঙ্গজেব তাঁহার শিক্ষকের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাঁহাকে

---

1 *Khulasatul-Tawarikh*, MS. in ASB, leaf 47 ; see also J. Sarkar's *Topography of the Mughal Empire*, p. 96.

2 J. Sarkar's *Topography of the Mughal Empire*, p. 95. and *Imp. Gazetteer*, xii. As Siyalkut (Sealkot) was famous for paper manufacture, so was Kashmir for its ink (*ibid.*, 112).

3 *Storia do Mogor*, by Niccolao Manucci, vol. ii.346,347.

4 Both Bernier and Manucci give the name of this teacher as Mulla Salih (*Bernier's Travels*, Constables' ed., p. 154 ; Manucci's *Storia do Mogor* vol. ii. p. 30) ; but Prof. J. Sarkar denies that Mulla Salih was the teacher of Aurangzib (*Hist. of Aurangzib*, vol. i, p. 4.)

প্রসিদ্ধ তিরস্কারটী করিয়াছিলেন; রাজপরিবারের যুবরাজের কিরূপ শিক্ষা পাওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে বার্ণিয়ার তদুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন "পৃথিবীর প্রত্যেক বিখ্যাত জাতির সহিত আমাকে পরিচিত করিতে; ইহার অর্থাগম-নীতি এবং রাষ্ট্রশক্তি, যুদ্ধনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম, শাসনপদ্ধতি প্রধানতঃ কোন স্থানে ইহাদের স্বার্থ সংগঠিত; এবং ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠের দ্বারা ঐ সকল রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা, তাহাদের উত্থান পতনের কারণ। প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী, আকস্মিক ঘটনা ও ভ্রম-ভ্রান্তি যে সকল দ্বারা বিষম পরিবর্ত্তন ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া কি আমার শিক্ষকের উচিত ছিল না।" ১

আরঙ্গজেব তাঁহার পিতা সাজাহানের ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য সময় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত কোর-আন্ পাঠ করিতেন, এবং বৈকালে ২॥ টা হইতে ৩॥ টা পর্য্যন্ত কোর-আন্ পাঠও উহা দেখিয়া লিখিতেন এবং ইসলাম-ধর্ম্মের মহাপুরুষদিগের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিতেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাকাল ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ এবং প্রার্থনায় কাটাইতেন। ২ তাঁহার শেষ জীবনের উইল হইতে দেখা যায়, তিনি কোর-আনের নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং ঐ অর্থে নিজের খরচ চালাইতেন। তাঁর মৃত্যু সময়ে থলিতে ৩০৫ টাকা ছিল। ৩ মির-আতুল আলমে লিখিত আছে আলমগীর মহম্মদ কনৌজীর সহিত সপ্তাহে তিনদিন ইস্লাই উসুল ও অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। ৪ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্রাট খুব ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার রাজ্যের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদিগকে আহ্বান করিয়া, পরিমিত অর্থব্যয়ে মুল্লা নিজামের তত্ত্বাবধানে ফতাওয়াই আলমগীরি রচনা করিতে, আদেশ দেন। ৫

আরঙ্গজেবের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে তফসীর, হদীস ও ফিকে'র গ্রন্থাবলী সংগ্রহে প্রণোদিত করিয়াছিল। রাজকীয় লাইব্রেরীতে এইরূপে সংগৃহীত গ্রন্থাদি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৬

শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা।

---

1 Bernier's *Travels*, p. 156.

2 J. Sarkar's *Anecdotes Aurangzib and Historical Essays*, p. 177

3 J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, p. 52; *Annual Register*, vol. iii p 94

4 *Muntakhal. Miratul., Alam*, MS. in Boh. Cooll., p. 3

5 *Maasiri-'lAlamgiri* (*Bibl. Indica*), p. 520.

6 *Miratul-'Alam*, MS. Boh Coll., leaf 251

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(৯৯৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

বাঙ্গালী পুণ্ড্রজাতির ধর্ম্ম ও উৎসব

বর্ত্তমান পুণ্ড্রজাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মভাব অত্যধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়। দেখিলেই মনে হইবে এই জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ, ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় অধিকাংশ পুণ্ড্রগণই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুণ্ড্রজাতি মাত্রেই বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ভেক গ্রহণ দ্বারা 'বৈরাগী' হয় নাই। ইহারা সংসারী এবং বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত।

অনেক পুণ্ড্র নর-নারী ভেকাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগী হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে।

পুণ্ড্রজাতি কিছুদিন পূর্ব্বে ঘোর শাক্ত ছিল, প্রতি চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডী পূজা হইত। ছাগ, মহিষ, মেষ বলিদানের ধুম ছিল। মাংসাহার প্রচলিত ছিল। মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরি পূজায় ছাগবলি হইত। দুর্গোৎসবের ত কথাই ধুম ছিল।

শাক্তগণ প্রায়ই শৈব—শিবপূজা করা এবং শিবোৎসবে নৃত্যগীতাদি করা পুণ্ড্রজাতির বিশেষত্ব। গম্ভীরা উৎসব, ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন পুণ্ড্রগণের ধর্ম্মোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

মালদহে ধর্ম্মের গাজনের কোন আয়োজন উদ্যোগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মালদহের মধ্যে অনেকগুলি "ধর্ম্মপুর" নামক পল্লীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোড়গাঁ, মাধাইপুরে ধর্ম্মের উৎসব হইত অবগত হওয়া যায়। মাধাইপুরের বামুনী মন্দিরে গম্ভীরা উৎসব হইত, তথায় বহুবিধ পাষাণময়ী দেবদেবী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, ধর্ম্মমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেক স্থলে সূর্য্যমূর্ত্তিকে ধর্ম্মমূর্ত্তি বলা হয়।

শিবের গাজনে পুণ্ড্রগণ সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া পুণ্ড্রগণ শিবের গাজন ও গম্ভীরা করে। রাঢ় দেশে পুণ্ড্রগণ এখন ধর্ম্মের গাজন বা গম্ভীরা উৎসব করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মের সন্ন্যাসীও হয়।

সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুগণ যে সকল উৎসব ও পূজাদির অনুষ্ঠান করে, পুণ্ড্রগণ তাহাই করিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ইহারা আস্থাবান ছিল, বর্ত্তমান পুণ্ড্রগণকে দেখিয়া তাহা মনে হয় না। সাধারণ হিন্দু-বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম্মে যে প্রকার অনুরাগ ছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে হিন্দুগণ যেমন বুঝিতে পারেনা যে কখন তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল কিনা, ইহারাও তদ্রূপ বুঝিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্ড্রগণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব ও তান্ত্রিক-বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান ছিল,। তৎপরে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মে আস্থাবান হয়। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙ্গালী পুণ্ড্রজাতির সমাজ পরিচালন
ও
শাসন পদ্ধতি

পুণ্ড্র জাতির সহিত যাঁহার কোন প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, অথবা যাঁহারা কোন পুণ্ড্রপল্লীতে দিন কয়েক অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারাই এই জাতির সমাজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গালার পুণ্ড্রসমাজগুলি প্রায়ই একই প্রকার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। বিভিন্ন জেলায় বাস নিবন্ধন রীতি নীতির যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। তত্রাচ এই জাতির সমাজ-পরিচালন এবং সমাজ-শাসন পদ্ধতি যেন এক সূত্রে গ্রথিত।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি

"প্রত্যেক গ্রামে একাধিক 'মণ্ডল' থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। পূর্ব্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন। আদায় তহশীলাদি মণ্ডলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারিগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। ইহাতে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইত।"

পুণ্ড্র সমাজের সমাজপতি 'মণ্ডল'। তিনি সমাজ-পরিচালন ও সমাজ-শাসন ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন। পুণ্ড্রগণ তাঁহার শাসন মান্য করিয়া থাকে। সামাজিক কোন কার্য্য মণ্ডলের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ব্যক্তিগত ভাবে কেহই করিতে পারে না।

মণ্ডল সমাজপতি হইলেও একাকী তিনি কোন কার্য্য করেন না। সামাজিক যে কোন কার্য্যই হউক না মণ্ডলের তাহাতে প্রভুত্ব থাকিলেও, সমাজের জনগণকে আহ্বান করিয়া একটি 'বৈঠক' বা সভা করা হয়। সেই সভায় সভাপতি মণ্ডল, মন্ত্রী, বারিক, প্রামাণিক, প্রভৃতি পদবী বিশিষ্ট প্রধানগণ সভাপতির অঙ্গস্বরূপ বিদ্যমান থাকেন।

সভাপতি মণ্ডল, ঐ সকল সামাজিক শাসক কর্ম্মচারিগণের সহিত, সভার কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সভায় পল্লীর বা পল্লী সমাজের সকল পুরুষগণকে উপস্থিত থাকিতে হয়। সকলেই উপস্থিত হইতে বাধ্য, অন্ততঃ বাড়ী-প্রতি এক এক জনকে আসিতেই হয়। প্রস্তাবক, সমর্থক প্রভৃতি মণ্ডলের অবৈতনিক কর্ম্মিগণ, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।

সভার সভ্যগণ ও কর্ম্মিগণ আলোচিত

কার্য্য সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিতে পারে। এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা সভার কার্য্য সম্পাদন, মাণ্ডলিক পদ্ধতি।

শেষে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে আলোচিত বা প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে মণ্ডল তাহা প্রকাশ করেন। বারিক-পরামাণিক সেই কার্য্য যথাযথ সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হন।

কোন অপরাধের বিচার এই প্রকারে সামাজিক শাসন দ্বারা মীমাংসিত হইয়া যাইত। বিবাহ, অন্নপ্রাসন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে 'পকাইতি'র আবশ্যক হয় তাহাও এই প্রকার বৈঠকে শেষ মীমাংসিত হইয়া যায়। 'ঘটক' উপাধিক স্বজাতি বিবাহের ঘটকালি করিত।

সামাজিক প্রত্যেক কার্য্যের জন্য কর্ম্মী নিযুক্ত আছে, তাহারাই মণ্ডলের সামাজিক কর্ম্মচারী। দ্রব্যাদির সংগ্রহ, কার্য্যসম্পাদনের বিলি বন্দোবস্ত মণ্ডল ও কর্ম্মিগণ দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

কৃতী ব্যক্তিকে কার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না, কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ বারিক, মন্ত্রী, পরামাণিক প্রভৃতি মণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, এমন কি নিমন্ত্রণ করিবার ভারও বারিক বা পরামাণিকের উপর ন্যস্ত আছে। পুণ্ড্রগণের স্বজাতিগণই বংশপরম্পরায় মণ্ডল, বারিক, মন্ত্রী, পরামাণিক, দূত প্রভৃতির কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানও নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ম্ম-কর্ত্তাকে সেই 'মান' সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়।

সুপারির দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হয়—সুপারির সংখ্যা হিসাবে, নিমন্ত্রণের সঙ্কেত আছে।

কোন ব্যক্তি যদি দুই এক ঘর বা কোন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে তাহা হইলে মণ্ডলকে অবগত করাইতে হয় না সেটা সামাজিক ব্যাপার মধ্যে গণ্য নহে।

সমষ্টিগত ভাবে কোন কার্য্য করিতে হইলে বা একটি মণ্ডল-শাসনের অন্তর্গত সমাজ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হইলে—'মাণ্ডলিক বৈঠক' বসাইবার প্রয়োজন হয়।

সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

একাধিক মণ্ডলের শাসিত সমাজকে একত্রিত ভাবে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রত্যেক মণ্ডল ও মণ্ডলের কর্ম্মি-গণকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রের মণ্ডল একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে মীমাংসিত বিষয় অবলম্বনে কর্ম্মক্ষেত্রের মণ্ডল নিজ শাসনে বৈঠক বসাইয়া:—আপন বেষ্টনীর জনগণের মতগ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

এক গ্রামিণ সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

ঐ প্রকারে একই গ্রামের মণ্ডলগণ এক যোগে যে কর্ম্ম করেন তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মক্ষেত্র ও মণ্ডল সম্পূর্ণ দায়ী। কোন প্রকার কার্য্যের ত্রুটি হইলে সপারিষদ্ মণ্ডল তাহার জন্য দায়গ্রস্ত হন।

দশ গ্রামিণ সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

উপরোক্ত রীতি-নীতির ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের মণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় বৈঠক বসাইয়া উভয় গ্রামবাসী মণ্ডলগণের বেষ্টনগত পুণ্ড্রগণ একত্রে কার্য্য করিয়া থাকে।

দশগ্রাম, বিশগ্রাম বা সমগ্র জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ এই প্রকার মাণ্ডলিক শাসন দ্বারা সম্মিলিত হইয়া জাতীয় পকাইতি করিয়া

থাকে। যে কার্য্যের সহিত ভোজন ব্যাপারের সংস্রব আছে—সেই সম্বন্ধে বৈঠক এবং একত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন ব্যাপারকে 'পঙ্‌ক্তায়ত' এবং পঙ্‌ক্তায়ন্তি' বলে।

প্রত্যেক জেলায় পুণ্ড্র-সমাজ প্রায় উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য-প্রণালীর ধারা দৃষ্টে মনে হয় এই জাতি সমাজ-পরিচালনায় একান্ত পটু।

যখন কোন জাতীয় কর্ম্ম নাই তখন পুণ্ড্রগণ যেন একেবারে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ বহির্ভূত কার্য্য করিলে দণ্ডিত হইবার ভয়ে আদৌ তাহা ব্যক্তিগত ভাবেও করিতে পারে না।

সমাজ মধ্যে কর্ম্মের সূচনা হইবামাত্র মণ্ডলের নেতৃত্বে সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া যেন একটি হইয়া যায়। সকলের সম্মতি লইয়া মণ্ডল যে আদেশ প্রদান করেন তাহাই সকলে পালন করে। যদিও বিবাদ থাকিলেও তাহা উপস্থিত ভুলিতে হয়। ব্যক্তিগত যে, কি প্রকারে সমষ্টিগত হইয়া যায় ইহাই তাহার নিদর্শন।

এক মণ্ডলের সমাজ শত মণ্ডলের সমাজের সহিত কার্য্যোপলক্ষে কি প্রকারে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া এক বিরাট সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হয়—এই জাতি তাহা এখন অবগত আছে।

এই বিরাট জাতীয় সঙ্ঘ পরিচালনার্থ 'দশ গ্রামিণ মণ্ডল'ও আছেন কিন্তু প্রত্যেক মণ্ডল ও তাঁহার কর্ম্মিগণ আপন আপন সমাজটি পরিচালনের জন্য পূর্ণ মাত্রায় দায়ী।

প্রত্যেক মণ্ডলের নেতৃত্বে বিরাট জেলাগত জাতি পরিচালিত হইতে পারে। পূর্ব্বে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃষোৎসর্গ, শ্রাদ্ধ, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপদেশে এই প্রকার পুণ্ড্র জাতির বিরাট সম্মিলন হইত।

এই প্রকার পুণ্ড্র জাতীয় মাণ্ডলিক-প্রথা যেন রাজপুত-রাষ্ট্রনীতির অনুরূপ। যেন 'ফিউডেল সিষ্টেম'। পুণ্ড্র রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি যেন এখন এই জাতির মধ্যে বিদ্যমান। রাষ্ট্রশাসনের মূলনীতি এখন অব্যক্ত ভাবে এই জাতির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বাপর জাতীয় স্বভাব হইতে এই জাতি এখনও বিচ্যুত হয় নাই। এখনও কায়ক্লেশে তাহারা পৈতৃকধর্ম্ম, রীতি-নীতি রক্ষা করিয়াই চলিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব যথায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই স্থানবাসী পুণ্ড্রগণের মধ্যে এই সুন্দর নীতিটি কথঞ্চিৎ উপেক্ষিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহারা ভাবেন এ প্রথা অসভ্যতার চিহ্ন, কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনীতির রন্ধ্রপথে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন এই নীতিটিই একমাত্র প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ব্যক্ত করিতেছে। উহাকে বিসর্জ্জন না দিয়া রক্ষণই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ঐ মাণ্ডলিক সমাজ-নীতির উৎকর্ষবিধান দ্বারা জাতীয় সমাজ পরিচালন করিতে শিক্ষা করা ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়।

বাইশী বৈঠক বা ছত্রিশী বৈঠক

এই প্রকারে পুণ্ড্রগণ জাতীয় একতা সম্পাদন দ্বারা সমাজের উন্নতি বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহা হইলে ভিন্ন জাতির মণ্ডল বা প্রধান সমাজপতির সহিত মিলিত হইয়া সকল জাতীয় জনগণে মিলিত ভাবে একটি বৈঠক বসে।

এই প্রকার মিলিত বৈঠককে সকল জাতিই সম্মান করিতে বাধ্য। দুই জাতির মধ্যে একত্র ভাবে যে বৈঠক বসে তাহা 'বাইশী' বৈঠক। ছত্রিশ জাতি একত্রে যে

বৈঠক করে তাহা 'ছত্রিশী বৈঠক'। ছত্রিশী বৈঠকে মাস্ত ও ভয় করিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য।

বৈঠকের ছত্রিশ জাতি বলিয়া থাকিলেও প্রত্যেক জাতিকে বৈঠককে মাস্ত করিতে হয়।

"পঞ্চ নারায়ণ"

কারণ দশজন যথায় একতা দ্বারা সম্মিলিত হয়েন তথায় এই দশ শক্তি "নারায়ণী শক্তি" বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণ নারায়ণ বলিয়া সম্মান পাইবে না, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে 'নারায়ণ' রূপে মাস্ত পাইবে। নারায়ণী শক্তি, আদ্যা শক্তি (দুর্গাচণ্ডী ইত্যাদি) সম্বন্ধে যে প্রকৃত জ্ঞান তাহা ইহাদের যদ্রূপ আছে শিক্ষিত সমাজে তাহা নহে, তথায় এই মিলিত শক্তি উপেক্ষিত বলিতে হয়।

জাতি বিজাতি একত্রিতভাবে দলবদ্ধ হইয়া কি নিয়মে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা এই বাইশী ও ছত্রিশী বৈঠকই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালের সভাসমিতি প্রাচীন বাঙ্গালী পদ্ধতির বাহিরের বলিয়াই মনে হয়। তথায় সমবেত শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট না। দশজনে মিলিত হইলেই যে একটা শক্তির আবির্ভাব হয়, এবং তদ্দ্বারা যে নব-ভাবের বিকাশ হয় তাহা আদৌ উপলব্ধি হয় না।

মিলন হয় বটে—হাট বাজারের, কেনা-বেচার মত—আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অভিনয় সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। যেন এ এক জাতীয় "থিয়েটার"। আপন আপন বক্তৃতার অংশটুকু বলিতে পারিলেই সম্পর্ক ফুরাইল—এখানে পুতুলের নাচ হয়—প্রাণময় জীবের সমাবেশ হয় না। মনে হয় হইল—কার্য্য-প্রণালী দৃষ্টে মনে হয় দলের ভিতর হইতে একটা একপ্রাণতা শক্তি বাহির হইয়াছে কিন্তু সকলি 'সংশক্তি বিহীন'—প্রাণহীন।

সম্মেলনী বা সম্মিলনী যাহাই হউক উহা যতকাল পর্য্যন্ত 'ছত্রিশী' ধরণে না হইতেছে ততদিন ইহার মধ্য হইতে সমষ্টিগত শক্তির স্ফুরণ হইবে না। ব্যক্তিগত শক্তির ক্ষণিক চমক্ দৃষ্ট হইয়া অনন্তাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে।

"No member of any subcaste can gain admission to another, and each subcaste has its own Pradhan or headman, who deals with all social and ceremonial matters."

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙ্গালী পুণ্ড্রের দশকর্ম্ম ও সংস্কার

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অপরাপর শ্রেষ্ঠ হিন্দুসমাজের ন্যায় বঙ্গদেশের পুণ্ড্র সমাজও ব্রাহ্মণ-শাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধানগুলির মধ্যে যেগুলির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে তাহাই এই জাতি যত্নসহকারে পালন করে।

তত্রাচ দেখা যায় বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে দেশাচার, সমাজনীতি ও কুলাচার প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। পুণ্ড্র জাতি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া—দেশাচার, সমাজনীতি ও কুলাচার-গুলি পালন করিয়া থাকে।

এক এক জাতির সামাজিক প্রথা, কুলাচার, দেশাচার যেমন অন্য জাতির সহিত কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন এই পুণ্ড্র জাতির মধ্যেও দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতি আচার, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্নতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক শুভ কার্য্যে রমণীগণ জাতীয় মঙ্গল গীত গাহিয়া থাকে। বিবাহ, কর্ণবেধ, পুন-বিবাহ, অন্নপ্রাসন প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দু-সংস্কার এই জাতি পূর্ণমাত্রায় সম্পাদন করে।

বাঙ্গালীর বাস্ত দেবতা, ষষ্ঠী, ও মনসা পূজা হইতে ষোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত সকলই এই জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিবাহাদি শুভকার্য্য এবং শ্রাদ্ধাদি পার-লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রবিধিমত প্রতি-পালিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার অঙ্গহানি বা ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য উহার সহিত দেশাচার, কুলাচার ও জাতীয় সমাজনীতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এই জাতি পরস্পরের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে না, যাহাদের সহিত যাহাদের তুল্যকুল আছে তাহাদের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে। জল গ্রহণের বাধা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। পক্কান্ন ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজনীন ভাবে আদৃত রহিয়াছে। কুলীনগণ মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু মৌলিকের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে না। চিড়া দৈ 'ফলাহার' প্রচলিত আছে।

চিড়া দধি যারা যে খাদ্যানুষ্ঠান হয় তাহা 'ফলাহার' নামে খ্যাত রহিয়াছে। এই প্রকার ফলাহার বাঙ্গালীর সকল স্তরেই পূর্ব্বে বিদ্য-মান ছিল—বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে এই প্রকার চিড়া দৈ ফলাহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ইহা অবাধ প্রচলিত ছিল।

কেবল পুণ্ড্র জাতির মধ্যেই যে এই ফলাহার প্রচলিত তাহা নহে ইহা বাঙ্গালীর প্রাচীন পদ্ধতি।

"No inter-marriage can take place among the different subcastes. The uttar Rarhi and the dakshin Rarhi sections of the Basudeb Pundras do not eat cooked rice each other house, but may take pakhi food to gether." (1901 A. D. Census Report—Pods)

১৯০১ খৃঃ অব্দের আদম সুমারির বিবরণে পদ্যজাতির (বাসুদেব পুণ্ড্রী) মধ্যে বিভিন্ন থাকের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই এবং সিদ্ধান্ন গ্রহণেরও নিয়ম পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান নাই কিন্তু পক্কান্ন গ্রহণে কোন বাধাই নাই।

এই প্রথা সকল পুণ্ড্রসমাজেই বিদ্যমান দেখা যায়। ইহা যে কেবল বাসুদেব পুণ্ড্রী সমাজে আবদ্ধ তাহাও নহে। এই হিসাবে ইহাদের জাতীয় একতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

"The oriya' sections of the Santa-parhs will take cooked rice in the house of the uttar Rarhi or Dakshin Rarhi Pods, but not vice varsa." (Ibid)

উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় পদ্য জাতির সিদ্ধান্ন সান্তপর নামক উড়িষ্যাশ্রেণী গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ন উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ী বাসুদেব পুণ্ড্রগণ গ্রহণ করে না।

অপরাপর পুণ্ড্র জাতির মধ্যে এ নীতি বিদ্যমান নাই। বঙ্গীয় পুণ্ড্রগণ বিভিন্ন সমাজান্তর্গত পুণ্ড্রগণের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে

না কিন্তু পক্ষায় গ্রহণে বিশেষ কোন আপত্তি দৃষ্ট হয় না। এই প্রকারে বাঙ্গালী পুত্রগণ সমাজ-শাসনে আপন আপন জাতীয় সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান রহিয়াছে।

সকল জাতীয় পুত্রগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ আদৌ প্রচলিত নাই। অপরাপর ব্রাহ্মণেতর হিন্দুগণের ন্যায় পুত্রজাতি বিধবা বিবাহ দোষাবহ নিন্দনীয় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত।

আত্ম-তত্ত্ব

(Mind, Self.)

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে জড় ও শক্তির সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখ্যতঃ আত্মতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আত্মতত্ত্বই বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

আত্মা পদার্থটা কি? প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে। ইহার মোটামুটি উত্তর—যাহার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহাই আত্মা। যাহা জানে, ভোগ করে ও ইচ্ছা করে তাহাই মোটা কথায় আত্মাশব্দবাচ্য (১) দ্বিতীয় প্রশ্ন,—কে জানে, কে ভোগ করে, কে ইচ্ছা করে? এই প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ জড়বাদীর বা দেহাত্মবাদীর উত্তর। ইহার মতে জড় বস্তুই পারমার্থিক সত্য; উহাই দেহাকারে পরিণত হইলে জানে, ভোগ করে ও ইচ্ছা করে। জীব-দেহে যে চৈতন্য বা জ্ঞানের এবং ইচ্ছাদির অনুভব হয়, তাহা জড়েরই ধর্ম্ম বা দেহেরই গুণ। দেহাতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া কিছু নাই। চার্ব্বাক বলেন—

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো
মদশক্তিবৎ॥

অর্থাৎ মাদকাদির হেতুভূত দ্রব্যাদির মিশ্রণ বিশেষে যেমন মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়, কিণ্বাদিসমেতেভ্যঃ এই ভূত চতুষ্টয়ের মিশ্রণ বিশেষে তেমনি চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক ভূতে পৃথক পৃথক ভাবে চৈতন্য না থাকিলেও মিশ্রণ বিশেষের ফলে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। সেই মিশ্রণ বিশেষ কি, না ভূত চতুষ্টয়ের সুষ্ঠু দেহাকারে পরিণতি। এই দেহেই 'অহং' প্রত্যয় জন্মে; ইহা দেহ মাত্র নয়। লোক ব্যবহার তাহার দৃষ্টান্ত। আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি সুস্থ, আমি গতিশীল প্রভৃতি ব্যবহার হইতে দেহই যে অহং শব্দ বাচ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

(১) যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাতি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সততং ভাবঃ তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে।

নাই। পুনশ্চ দেহের ক্ষেত্রে আমার হৈর্ঘ, দেহের স্থায়ে আমার স্থায়ী, দেহের বিনাশে আমার বিনাশ দেহের সত্তায় আমার সত্তা যখন নিরন্তর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন আমি ও আমার দেহে পার্থক্য কোথায় ?

অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাকের মত উক্ত প্রকার। অন্যান্য দেশে চার্ব্বাকের জ্ঞাতি বন্ধু যাঁহারা আছেন তাঁহারাও চার্ব্বাক মতাবলম্বী। মহাত্মা Clifford তন্মধ্যে একজন। ইনি বলেন—"Reason, intelligence and volition are properties of a complex made up of elements themselves not rational, not intelligent, not conscious." (১)

ধীমান Huxley বলেন, ইতর জীবের চৈতন্য তাহাদের মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ আণবিক স্পন্দনের পরিণতি বা ফল। ইতর জীবের পক্ষে যদি ইহা সত্য হয় তবে উচ্চ শ্রেণীর জীবের পক্ষেই বা তাহা সত্য না হইবে কেন। আমাদের চৈতন্য আমাদের মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দন সমূহুত—স্পন্দন ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে যথা—

"It is quite true that to the best of any judgment, the argumentation which applies to the brutes, holds equally good of men ; and therefore that all states of consciousness in us, as in them, are immediately caused by the molecular changes of the brain substance. It seems to me that in man, as in brutes, there is no proof that any state of consciousness is the cause of changes the motion of the matter of the organism".

মনস্বী পণ্ডিত Lewes বলেন—জীবন্ত শরীরের দুই প্রকার ক্রিয়া ; এক প্রকার স্নায়বিক স্পন্দন ; অন্য প্রকার চেতনা। এ উভয়ের মধ্যে প্রথমটি যে শরীরসম্ভূত, সে বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। বিবাদ কেবল দ্বিতীয়টি লইয়া। অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের ক্রিয়া কি না আমাদের এই বিষয়েই মত বৈষম্য। কিন্তু তাঁহার মতে এ তর্কের মীমাংসা অতি সহজ। সে মীমাংসাটা কি প্রকার তাহা তিনি দেখাইতেছেন। তিনি বলেন—শরীরের যে স্পন্দনাদি ক্রিয়ার ক্ষমতা আছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অর্থাৎ শরীর যে কতকগুলি ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা অবিসংবাদিত। এক্ষণে দেখিতে হইবে যাহাকে চেতনা বলিতেছি তাহার কর্তৃত্ব শরীরের বা অপর কোন বস্তুর। ঐ কর্তৃত্ব অপর কোন বস্তুর—এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে শরীর অতিরিক্ত অন্যকর্ত্তার অস্তিত্ব আমাদের পরিজ্ঞাত কি না। তাঁহার মতে,—উহা পরিজ্ঞাত নহে। শরীর ব্যতীত আর কোন বস্তুর কর্তৃত্ব আমরা বিদিত নহি। অন্য কর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া কেবল কল্পনার রাজ্যে উপনীত হইতে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিকতা বিরুদ্ধ। অতএব চেতনার কর্তৃত্বও শরীরের—ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। শরীরই উভয়বিধ কার্য্যের সাধারণ কর্ত্তা।

পণ্ডিত Lewes তাঁহার "study of psychology" নামক গ্রন্থে এই মর্ম্মে নিজের মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন যথা :—" What

(১) On the Nature of things themselves, Mind, vol III p. 67.

we know, that the living organism has among its manifestations the class called sentient .....and states of consciousness.... It is not known, nor is there any evidence to suggest that one of these classes is due to the activity of the organism, the other to the activity of another agent. The only agent is the organism. The organism. e. g., is not only the bearer of neural tremors, but it feels, thinks and wills. Thus the organism has two sets of functions broadly contrasted as subjective and objective."

অন্য একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, মস্তিষ্ক হইতে সেইপ্রকার চিন্তা নিঃসৃত হয় (the brain secrets thought as the liver secrets bile)। অতএব চেতনা বা জ্ঞান মস্তিষ্কেরই কার্য্য।

এই প্রকারে চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন নাস্তিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই জড়ের সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করিয়া চৈতন্য, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতিত্বকে তাহারই দেহাকারে পরিণতির ফল বলিয়া স্থির করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁদের মতে অহংএর সত্তাটা কাল্পনিক, জড়ের সত্তাই বাস্তব। অথবা অহংএর সত্তা পরোক্ষ, জড়ের সত্তা অপরোক্ষানুভূতির বিষয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে জড়তত্ত্বের যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা গিয়াছে উহার সত্তাই অহংএর একটা কল্পনা। উপরি উক্ত জড়বাদিগণ প্রকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝিয়াই জড়ের সত্তার এত আদর ও মর্য্যাদা করিয়াছেন। জ্ঞানের ও বিষয়াবগতির প্রকরণ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ইহাঁদের মতবাদ কতদূর ভ্রান্ত—বিপর্য্যস্ত, তাহা ইহাঁরা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহাঁরা সে সম্বন্ধে একেবারেই খেয়াল করেন নাই। যাহা হউক আমি বিষয়াবগতির প্রকরণ সম্বন্ধে আপাততঃ কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া জড়তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই এ মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। ফলাফল সুধীগণের বিচার্য্য।

১। আমরা জড় জগতে দেখিতে পাই কার্য্যগুণ কারণগুণ পূর্ব্বক ; কারণে যে গুণ, ধর্ম্ম বা শক্তি পূর্ব্বসিদ্ধ নাই, কার্য্যে তাহার আবির্ভাব হইতে পারে না। অবশ্য এ সত্যের আপাত ব্যভিচার অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণে অনেক সময়ে অনেক শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হয় না, যাহা কার্য্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেখানে ঐ শক্তির বা গুণের অনস্তিত্ব কল্পনা করা উচিত নহে ; কারণ সমবায়ের অভাবই এখানে ঐ শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। এক্ষণে জড় পরমাণুতে যদি জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য পূর্ব্বসিদ্ধ—প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক বা প্রকাশতঃ হউক—না থাকে, তাহা হইলে, উহাদের সংঘাতে জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্যের আবির্ভাব সর্ব্বথা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? কারণ, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অবিরোধী, কার্য্যকারণ প্রস্তাবে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। চার্ব্বাকের উদাহৃত মাদকতা শক্তির কথাই ধরা যাউক। যে সকল দ্রব্যের সমবায়ে মাদকতার উৎপত্তি হয়, ঐ সকল দ্রব্যে মাদকতা-শক্তি পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়াই, উহাদের সমবায়ে

উহার বিকাশ হয়, অন্যথা হয় না; সিকতা হইতে কখন মদ্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না কেন? এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত; কিন্তু কেহই ইহার সঙ্গত উত্তর দানে সমর্থ নহেন। কেবল মিশ্রন বিশেষ দ্বারা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। সিকতাকে যে প্রকারেই মিশ্রণ কর না কেন, মদ্যের উৎপত্তি হইবে না। অতএব পরমাণুর চৈতন্য না থাকায়, তৎসংহতির চৈতন্য জন্মিতে পারে না। তাই সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন—

"মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সৌক্ষ্যাৎ সাংহত্যেতদুদ্ভবঃ।"

"অর্থাৎ চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় নহে। মদশক্তি প্রত্যেক মদ্যবীজে সূক্ষ্মরূপে থাকে সুতরাং সংহত হইলে তাহার উদ্ভব অর্থাৎ বিস্পষ্ট বিকাশ হয়। ভূতে সূক্ষ্ম চৈতন্য থাকা সপ্রমাণ হয় না; সুতরাং তাহার সংঘাতে চৈতন্যোদ্ভব দৃষ্ট হয় না এবং তাহা স্বীকার করাও যায় না।" * পুনশ্চ :—

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।"

অর্থাৎ দেহাবয়বগুলিকে পৃথক করিলে যখন ঐ সকল অবয়বে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, তখন দৈহিক দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক নহে উহা আগন্তুক—আত্মার অধিষ্ঠান নিমিত্তক।

২। চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধিকে ভূতসূক্ষ্মের ধর্ম্মও বলা সঙ্গত নহে। কেন না, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যে দ্রব্যের স্নায়বিক বিধান নাই—বা মস্তিষ্ক নাই তাহার চৈতন্য নাই। পরমাণ্বাদির স্নায়ুবিধান বা মস্তিষ্ক নাই সুতরাং তাহা চৈতন্যের আধার হইতে পারে না। কেননা চৈতন্য স্নায়ুবিধানেরই পরিণতি। আর যদি স্নায়ুবিধান নিরপেক্ষ চৈতন্য সম্ভবপর হয়, এবং সেইজন্য পরমাণ্বাদির চৈতন্য কল্পিত হয়, তাহা হইলে এক দেহে অনেক চেতনার সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। ইহা প্রথমতঃ অনুভব বিরুদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যুক্তিবিরুদ্ধ। অনুভব বিরুদ্ধ এইজন্য যে, আমরা অহংকে বা আত্মাকে দর্শন স্পর্শনের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি। দর্শন চাক্ষুষ ব্যাপার, স্পর্শন ত্বকের ব্যাপার, শ্রবণ কর্ণের ব্যাপার; কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কর্ত্তা কেবল অহং বা আত্মা। অতএব দর্শন স্পর্শনে এক কর্ত্তৃত্বেরই প্রতিসন্ধান অনুভব সিদ্ধ। কিন্তু অনেক চৈতন্যের ঐকমত্য সম্ভবপর নহে; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্থ চৈতন্যের অনুভবাদি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং এক দেশের চৈতন্য যাহা অনুভব করে, অপরদেশস্থ চৈতন্য তাহার কিছুই জানে না। পদের বেদনা পদস্থ চৈতন্যবেদ্য; হস্তের বেদনা হস্তস্থ চৈতন্যের অনুভূত। এই প্রকার যখন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তখন সকল জ্ঞানের একই জ্ঞাতা, সকল দৃশ্যের একই দ্রষ্টা, এ প্রকার অনুভবই অসম্ভব। অথচ সকলের অনুভবই এই এক কর্ত্তৃত্বের সাক্ষ্য দেয়; অতএব জ্ঞাতা, দ্রষ্টা একই চৈতন্য। দ্বিতীয়তঃ চেতনদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে শরীর উন্মথিত বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে।

৩। দেহাত্মবাদে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব। আমাদের যত কিছু জ্ঞান, অতীতকে জড়াইয়া। সমস্ত জ্ঞানই অতীতকে টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমানের সহিত মিশাইয়া নিষ্পন্ন হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান সর্ব্বস্থলেই কতকটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার, আর কতকটা অতীতের উদ্বোধন। স্মৃতি বা স্মরণ এই

* সাংখ্যদর্শন—৩।২০, ৩।১৮; ৫।১০০

অতীতকে বর্ত্তমানে উপস্থাপিত করা। শরীরাবয়বের স্থিরতা নাই। বাল্য শরীরের অবয়বগুলি বৃদ্ধ শরীরের অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং বৃদ্ধদশায় বাল্যানুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব। একের অনুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। "মস্তিষ্ক কতকগুলি অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই অণুপরমাণুগুলি অবিরত স্পন্দনশীল। বিষয় অনুভব ঘটিলে এই স্পন্দনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা পরিবর্ত্তন (modification) সাধিত হয়; এবং অনুভূত বিষয়ের একটা প্রতিমুদ্রা বা ছাপ (impression) উহার উপর অঙ্কিত হয়। সময়ান্তরে যখন কোন কারণ বশতঃ ঐ প্রতিমুদ্রাগুলি উত্তেজিত (excited) হয়, তখনই অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়"—ইহাই দেহাত্মবাদীর সিদ্ধান্ত। এ প্রকার ভৌতিক উপায়ে (mechanically) স্মৃতি ব্যাখ্যাত হইতে পারে কি না, বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের যাহা উপাদান তাহা অতি কোমল ও তরল পদার্থ। এই কোমল ও তরল পদার্থে আবার চিরকম্পিত-চিরস্পন্দিত। এমত অবস্থায় তাহাতে একটা ছাপ অঙ্কিত হইলেও উহার স্থায়িত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কিরূপে? বিচিত্র জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের আণবিক সংস্থান পরিবর্ত্তিত, বিপর্য্যস্ত হইতেছে। মস্তিষ্কের পরিধিও সসীম। সুতরাং যদি কোন চিহ্ন বা ছাপ উহার উপর অঙ্কিতও হয়, তাহা যে ক্ষণস্থায়ী হইবে না তাহারই বা প্রমাণ কি? এবং ক্রমান্বয়ে একটি ছাপের উপর উপর্য্যুপরি অসংখ্য ছাপ পড়িলে পূর্ব্বাঙ্কিত ছাপগুলির সংরক্ষণ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? সকল ছাপগুলি মিলিয়া মিলিয়া একটা বিকৃত কিম্বা বীভৎস ছাপে পরিণত হইবে না কি?

দ্বিতীয়তঃ, ধরুন ঐ ছাপগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই মস্তিষ্ক-উপাদানে অঙ্কিত থাকে; কিন্তু তথাপি গ্রন্থনযন্ত্র বিস্তৃত বর্ণমালার ন্যায় মস্তিষ্ক-উপাদান বিস্তৃত ছাপগুলির কেহ বোদ্ধা না থাকিলে উহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ কে করিবে? ছাপগুলি অক্ষর বা বর্ণের ন্যায় কতকগুলি সঙ্কেত মাত্র। যে ঐ সঙ্কেতের তাৎপর্য্য বুঝে না, তাহার নিকট উহাদের কোন অর্থ নাই। বিশেষতঃ ঐ ছাপগুলির বৈষয়িক একটা সম্বন্ধ থাকিলেও অতীত-বর্ত্তমান-রূপ কালগত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝা যায়। উহাদের উত্তেজনা বর্ত্তমানে ঘটনা, কিন্তু তাহা অতীতের পরিচায়ক হইবে কি প্রকারে? অতীতকে ধরিব কেমন করিয়া? ঐ ছাপগুলিতে সন তারিখ অঙ্কিত থাকে না; সুতরাং উত্তেজিত হইলে উহারা বর্ত্তমান ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইবে। অতীতের কোন পরিচয় প্রদান করিবে না। বর্ত্তমান ও অতীতকে ধরিয়া রাখিতে হইলে কালিক সম্বন্ধকে অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু যাহা কালোৎপন্ন তাহা কালকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? আরও একটি কথা। এই যে ছাপগুলির কথা বলা হইল, ইহাদের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সপ্রমাণ নহে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে মস্তিষ্কে ঐ প্রকার কোন ছাপ বা দাগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ গুলিকে দেহাত্মবাদীর মনঃকল্পিত বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৭। আত্মার ও শরীরে একটা সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু দেহাত্মবাদী ঐ সম্বন্ধের যে প্রকার কল্পনা করেন, তাহা অতীব অশ্রদ্ধেয়। আত্মা কোন শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া নহে। শরীর অনেকগুলি যন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত (the

body composed of many organs)। প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্য (function) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দ্দিষ্ট। চরণের কার্য্য চলন ; পক্ষের কার্য্য উড্ডয়ন ; পাকস্থলীর কার্য্য খাদ্যের সংরক্ষণ ও আংশিক সমীকরণ ; যকৃতের কার্য্য পিত্ত নিঃসারণ। এই প্রকার প্রত্যেক শারীর যন্ত্রের কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। দেহাত্মবাদী মনে করেন মস্তিষ্কেরও ঐ প্রকার একটা কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই কার্য্যই চৈতন্য, বুদ্ধি প্রভৃতির নিঃসারণ। অর্থাৎ চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি মস্তিষ্ক যন্ত্রের ক্রিয়া বা কার্য্য। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ—শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রের কার্য্যই আমাদের পরিচিত ;—ইহারা ভৌতিক ব্যাপার—কোন না কোন প্রকার গতি। যন্ত্রগুলিকে এবং যন্ত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে আমরা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহাদের জ্ঞান হয়। অন্যান্য ভৌতিক পদার্থ যেমন পরীক্ষার যোগ্য, দেহস্থ যন্ত্রগুলিও সেই ভাবে পরীক্ষা যোগ্য। মস্তিষ্ক যন্ত্র-সম্বন্ধেও সেই কথা। অন্যান্য ভৌতিক যন্ত্রের ন্যায় ইহা সমীক্ষা ও পরীক্ষার যোগ্য। যদি ইহাকে আমরা পেশী-সঙ্কোচনকারী স্নায়বিক বলের কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া ধরি—তাহা হইলে ইহার কার্য্যটা কি তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। এই কার্য্য পৈশিক গতি (muscular motion) ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মানসিক ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়—ভৌতিক যন্ত্রের গতি আত্মক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। ভৌতিক গতিরূপে আমাদের চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধির অপরোক্ষানুভূতি নাই। বরং আত্মা পরিচালক—মস্তিষ্ক পরিচালিত—আত্মা নিয়ন্তা, মস্তিষ্ক উহারই আজ্ঞাবহ এইরূপেই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। লৌকিক প্রত্যয় অধ্যাসমূলক তাই আত্মধর্ম্ম দেহে, দেহের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত দেখা যায়। সেই জন্য আমি স্থূল, আমি গৌর, আমি দুঃখ, আমি গমনশীল ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবহারকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

৫। সমগ্র চিন্তা বা চিন্তাসমষ্টি অবয়বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার সমষ্টি হইলেও, ঐ চিন্তার মূলীভূত অহং বুদ্ধি অবশ্যই প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন, কেননা ঐ অহং বোধটি মিশ্র বোধ নহে, পরন্তু সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ। কিন্তু তাহা হইলেই এক দেহে বহু অহংএর সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়, এবং জ্ঞানের একত্ব প্রতিসন্ধান অসম্ভব হয়। সাদৃশ্য নিবন্ধন এই একত্বানুভব সম্ভবপর,—একথাও বলিতে পারা যায় না। সাদৃশ্য জ্ঞাতৃবেদ্য এবং সদৃশ বিষয়দ্বয়ের সম্বন্ধ বোধমূলক। যেখানে প্রহিতা ভিন্ন ভিন্ন সেখানে সাদৃশ্য বোধ অসম্ভব। "ইহা উহার সদৃশ"—এই প্রকার জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভবপর যে ইহা এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং পরে স্মরণ করিতে পারিতেছে। দেহাবয়ব অবশ্যম্ভাবী আসিতেছে যাইতেছে। সুতরাং উহাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহার জ্ঞান কাহার হইবে ? এবং এই প্রকার একটা সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহাত্মবাদীর মতে দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে একত্ব প্রতিসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৬। অনেকে চৈতন্যকে এক প্রকার গতি ((a mode of motion) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। দেখা যাউক এ কথা সত্য হইতে পারে কি না। আমি যদি তাহা

পারে না। কেন পারে না তাহা বলিতেছি। শরীরের যে স্নায়ুবিধান আছে, তদ্দ্বারা দেহের দূরতর অঙ্গ হইতে একটা গতি-তরঙ্গ স্নায়ু-বিধানের কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কে নীত হয়; তাহার ফলে মস্তিষ্কগত পরমাণুর গতি বা স্পন্দন উত্তেজিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের শেষ প্রান্ত হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গতিপরম্পরা—স্নায়বিক কম্পন—সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার; সমগ্র মার্গটার মধ্যে কোথাওও গতি বিবর্ত্তিত হইয়া চৈতন্যাকার লাভ করে না; কিন্তু দেহাত্মবাদী মনে করেন, ঐ গতি মস্তিষ্কে নীত হওয়া মাত্রই মস্তিষ্কের যে কম্পন আরব্ধ হয়, সেই কম্পনই চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এটি একটি বিতণ্ড কল্পনা। কেননা, মস্তিষ্কের উপাদান ও স্নায়বিক পরমাণুতেও সেই প্রকার স্পন্দন; উভয়ের উপাদানগত কোন বৈলক্ষণ্যও নাই; সুতরাং এক স্থানে ঐ স্পন্দন স্পন্দনই রহিয়া যায়, অন্যত্র উহা চৈতন্যাকারে বিবর্ত্তিত হয় এ কথার কোন প্রমাণ নাই। জড় জগতের কুত্রাপি স্নায়বিক স্পন্দনকে স্পন্দনাতিরিক্ত পদার্থে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মস্তিষ্কাণুর যে স্পন্দন তাহাও একটা অজ্ঞাত, অদ্ভুত রকমের স্পন্দন নহে; জড়-জগতের সর্ব্বত্র যে স্পন্দন পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও তজ্জাতীয়, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং একই জাতীয় স্পন্দন এক স্থানে চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত, অন্যত্র, স্পন্দনরূপেই অবস্থিত কেন, বিজ্ঞানে ইহার উত্তর নাই। অধ্যাপক Tyndall দেহাত্মবাদের প্রতি এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেন:—"The passage from the physics of the brain to the corresponding facts of consciousness is unthinkable. Granted that a definite thought and a definite molecular action in the brain occur simultaneously; we do not possess the intellectual organ, nor apparently any rudiment of the organ which would enable us to pass, by a process of reasoning, from the one phenomena to the other. They appear together, but we do not know why. Were our minds and senses so expanded, strengthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain; were we capable of following all their motions, all their groupings; all their electrical discharges, if such there be; and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling,—we should probably be as far as ever from the solution of the problem. How are these physical processes connected with the facts of consciousness? The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable." অধ্যাপক Tyndall তাঁহার Birmingham বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন "It is no explanation to say that the objective and subjective effects are two sides ofone and the same phenomenon. Why should the phenomenon have two sides? This is the

very, core of the difficulty. There are plenty of molecular motions which do not exhibit their two sidedness. Does water think or feel when it forms into frost-forms upon a window-pane? if not, why should the molecular motion of the brain be yoked to this mysterious companion—consciousness?"

উক্ত মতবাদের যে কেবল ইহাই একমাত্র দোষ—তাহা নহে; অন্যান্য দোষও আছে। যদি ভৌতিক জগৎ স্বয়ংপূর্ণ (self-complete) হয়, এবং ইহার গণ্ডীর অন্তর্গত শক্তির সমাবর্ত্তন (correlation of forces) বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত মতবাদে ঐ সত্য সম্যক্ বাধিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শক্তির যে অন্যোন্য-পরিবর্ত্তন নিয়ম, তাহার একটা বাঁধা ধার আছে; সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ঐ ধার নির্দ্দিষ্ট আছে। একণে ঐ শক্তির কতকটা যদি চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ভৌতিক জগতে (মস্তিষ্কে) সমপরিমাণে উহার লাঘব অবশ্যম্ভাবী। ভৌতিক জগতে একস্থানে কোন শক্তির অভাব হইলে, অন্যত্র সমপরিমাণে অন্য শক্তির আবির্ভাব হয়; কিন্তু ভৌতিক জগৎ হইতে কোন শক্তি অভৌতিক জগতে প্রবেশ করিলে, ভৌতিক জগতে উহার ন্যূনতা অনিবার্য্য। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয় না, ভৌতিক জগতের শক্তির পরিমাণ অক্ষুণ্ণই থাকে। ভৌতিক জগতে শক্তির এই যে আদান প্রদান, ইহা মানসিক জগতের আদান প্রদান হইতে ভিন্ন ধরণের। ভৌতিক জগতে যে বস্তু শক্তি দান করে, তাহার শক্তি বাধিত হয়, যে শক্তি গ্রহণ করে তাহার শক্তি উপচিত হয়। এইরূপ আদান প্রদানই ভৌতিক জগতের নিয়ম। কিন্তু মানসিক জগতে, ভাব, জ্ঞান, বুদ্ধির বিনিময়ে দাতার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাণ অল্প হয় না, গ্রহিতার ভাব, জ্ঞান, বুদ্ধির পরিমাণ (?) উপচিত হয় বটে; সুতরাং ভৌতিক জগতের গতি বা শক্তি চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত হয়—এ মতবাদটি সম্পূর্ণ অসার ও অশ্রদ্ধেয়। (১)

৬। দেহাত্মবাদী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বৈপরীত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। শক্তি, জড় প্রভৃতি সমস্তই বিষয়—জ্ঞেয় স্থানীয়। দেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয়—প্রকৃতিও বিষয়—জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়। ইহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই। ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা সংবেদনসমূহ একত্র, সঞ্জিত, ব্যবস্থিত করিয়া ইহাদের একটা ধারণা করা হয়। সুতরাং Lewes মহামতি যে ইহাদিগকে, কল্পনার সাহায্য না লইয়া, একেবারে কি প্রকারে পাইলেন তাহাও বুঝা যায় না। সংবেদনই (sensations) আগে, না দেহটাই (organism) আগে? Lewes এ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলে দেখিতে পাইতেন তাঁহার দেহটা কতকগুলি সংবেদনের একটা পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র।

(১) "The master generalisation of the physical world, that of the conservation of energy, would be violated by the assumption that energy could appear or disappear in one form without at once disappearing or reappearing to a precisely equivalent amount in another. Brain changes could not then be transformed into sensations or volitions be transformed into brain changes without a breach of physical continuity and of such a breach there is supposed to be no evidence" Ward.

অনবধানতা বশতই তিনি দেহটাকে সংবেদনের পূর্ব্বে পাইতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদি দেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, জড় প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সত্তা ও কার্য্য-প্রণালীদ্বারা আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে পারিত বটে; কিন্তু Lewes 'খোড়া কেটে আগায় জল' ঢালিয়াছেন। পণ্ডিত Reihl এ মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক বলিতেছেন—"As for the assertion of the physiologist it is impossible to understand as meaning that we are conscious of sensations originally as stimulations of our nerves, since we possess no innate knowledge of the nerves and the brain.···Even the physiologist does not know sensations immediately as stimulations of nerves, they are given for him as elements of perception; and it is only by perception, i.e., on the basis of sensations that he arrives at the knowledge of the existence of nerves. †

শরীর সুতরাং অপরোক্ষানুভূতিসিদ্ধ বস্তু নহে; সংবেদনসমূহকে আত্মার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াই আমরা শরীরের সত্তা কল্পনা করি, কেবল শরীর নহে; অন্যান্য সকল ভৌতিক বস্তুই এই প্রকারে বহির্নিক্ষিপ্ত সংবেদন সমষ্টি (Projection of sensations)। আত্মা কিন্তু এই সংবেদনসমূহেরও আত্মা; কাজে কাজেই ইহা জ্ঞেয় উৎপাদ্য নহে। আত্মা নিজেই আপনাকে জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয়কেও প্রকাশ করে। তাহাকে নিশ্চয়ীর পদ হইতে কদাচ বিষয়ের পদে বসাইতে পারা যায় না। যদি শরীর এই প্রকারে জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তাহা হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহা হইলে শরীর ও আত্মার কেবল নাম মাত্রে পার্থক্য থাকিতেছে। আর শরীরকে সেই জন্য জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতেছে না। উহা অবশ্যই আত্মার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু শরীরকে জড়াবয়ব সমষ্টি বলিয়া তদ্ভিন্ন শক্তির দ্বারা চৈতন্যোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত Watson, Lewesএর প্রতিবাদে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—"Now an organism that separates between its own subjective and objective aspects, apprehending two distinct sets of functions as in essential relation to each other, must be self-conscious—conscious of itself as a unity combining these opposite states. The organism thus becomes a term for a self-conscious being, comprehending at once subject and object.···We have seen that, taken by themselves they (subjective and objective states) cannot be regarded as either objective or subjective but are both equally indifferent to such a distinction. Objective and subjective exist only for that which is

† Science and metaphysics by Reihl.

conscious of the of object and subject. ‡

পুনশ্চ। দেহাদি সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় দেহাদি সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ; তখন দেহাদি সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হইতে পারে না। আর দেহাদি সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত. অথচ তাহা কখনই হয় না—শঙ্কর বলেন—"নন্থ দেহাদি সঙ্ঘাতস্যাপি শব্দাদি স্বরূপত্বাবিশেষাদ্ বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বং। যদি হি দেহাদি সঙ্ঘাতো রূপাদ্যাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ,তর্হি বাহ্য-অপি রূপাদয়োঽন্যোন্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়ুঃ, ন চৈতদস্তি। তস্মাৎ দেহাদি লক্ষণাঃ রূপাদীন্ এতেনৈব দেহাদি ব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজ্ঞায়ন্তি লোকঃ।" (২)

৭। পাঠককে একবার Huxleyর মত শুনাইয়াছি। অন্য একস্থল হইতে আরও কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, সেখানে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সমর্থন ত করেই না, বরং তাহার বিরুদ্ধমতই প্রমাণিত করে। Huxleyর সেই উক্তিটি এই :—"The arguments used by Descartes and Berkeley, to show that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness appear to me as irrefragable now as they did when I first became acquainted with them half a century ago. All the materialistic writers I know of who have tried to bite that file have simply broken their teeth." (৩)

পাঠক এখানে দেখিলেন Huxley জড়বাদীকে কি প্রকারে ক্ষেপ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে এই সকল মনস্বিগণের চিন্তার এত বৈসাদৃশ্য—অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, যে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যখন জড়বাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ইঁহারা বাদ নিষ্পত্তি করেন, তখন ইঁহাদিগকে 'থাম থাম' বলিয়াও নিবৃত্ত করা দুষ্কর। আবার যখন মতান্তরের সমর্থন করেন, তখনও সেই দশা। যাহা হউক।

৮। দেহাত্মবাদী হটিবার পাত্র নহেন। উপরি উক্ত যুক্তি-প্রণালী পাঠ করিয়া তিনি হয়ত বলিবেন—"জ্ঞাতার একত্ব প্রতিসন্ধান (reference of phenomena to an identical self) এত দুর্ব্যাখ্যেয় কেন হইবে? তোমরা তিনকে তাল করিয়া বৃথা চীৎকার করিয়া মরিতেছ। দেহাকারে পরিণত জড়ভূতই আত্মা, আত্মা বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই; শরীরস্থ ভূতনিচয়ের স্থায়িত্ব না থাকিলেও শরীরের একত্ব প্রতীতির বাধ হয় না। কেন হয় না বলিতেছি।

---

‡ Kant and his English critics by J. Watson

(২) কঠোপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় শ্লোকভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩) Fortnightly Review—Decr. 1886.

তোমরা কি কোন সভা সমিতিতে বহু মতের বা ব্যক্তির ঐকমত্য লক্ষ্য কর নাই? শরীরস্থ ভূতসমূহ মিলিত হইয়া—একমত হইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়াই আত্মগত ভাবনিচয়ের এককর্তৃত্বের প্রতিসন্ধান সম্ভবপর হয়। ঐ ভূতসমষ্টি সমবেত হইয়াই চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, জানে, শারীর ক্রিয়া পরিচালনা করে, তাই উহাদের সমষ্টিকৃত ক্রিয়া শক্তিকেই আত্মা নাম দেওয়া হয় যখন কোন ভূতসূক্ষ্ম ঐ দেহ সভা হইতে অপসৃত হয়, তখনও শারীরিক মানসিক ক্রিয়াগুলি একভাবেই চলিতে থাকে। কেবল সভ্যের 'অদলবদল' মাত্র;—সভার কার্য্য সমানই চলে। নূতন সভ্য পুরাতন সভ্যের স্থান অধিকার করিয়া সভার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করেন; সেই জন্য সভার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দেহ সভার সম্বন্ধেও ঐ যুক্তি। পূর্ব্বোত্তরকালীন কার্য্যের সাদৃশ্য দর্শনে সভাকে যেমন এক সভা বলা হয়; শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার একত্ব দর্শনে, উহার নির্ব্বাহক বস্তুকে এক বলিয়াই মনে হয়। এতক্ষণে বুঝিলে ব্যাপারটা কি?"

এতদুত্তরে বক্তব্য—কিছুই বুঝিলাম না; বরং যেটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহাও গুলিয়া গেল। প্রথমতঃ এ উক্তিটি একটা উপমামূলক। উপমা প্রমাণের পদাঙ্কঢ় হইবার যোগ্য নহে। প্রমাণ দ্বারা বস্তুসিদ্ধ হইলে উপমা দ্বারা উহার অর্থ পরিস্ফুট—বিস্পষ্ট হইতে পারে বটে; কিন্তু যুক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে ইহার কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ; এখানে পরোক্ষজ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অতি উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে। সভাসমিতির জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান; আর আমাদের জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান—একত্বের জ্ঞান—অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়াই পরোক্ষ জ্ঞানের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তদ্বিপরীতে, পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিচার চলে না। বাচস্পতি মহাশয় কিন্তু করিতেছেন তাহাই। তৃতীয়তঃ সভার সভ্য মহোদয়েরা সভা হইতে আপনাদিগকে ভিন্ন ব্যক্তিরূপেই জানেন। কোন বিষয়ে ঐকমত্য থাকিলেও, সকলেই স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধিমত বিচার করিয়া ঐ মতে উপনীত হয়েন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অহংবোধ ভিন্ন ভিন্ন। দেহাবয়বের সম্বন্ধে কিন্তু সেটি দেখা যায় না। তাহার অর্থ কি! সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁহার কথায় সায় দিতে পারিলাম না। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের অস্ত্রাগারে অস্ত্রের অভাব নাই। এবার তিনি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া হয়ত বলিবেন—

৯। "দীপশিখাবচ্চেৎ" অর্থাৎ আত্মার একত্ববোধটা দীপশিখার ন্যায় একত্ববোধ মাত্র। যেমন দীপশিখা অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভার সমষ্টি মাত্র, অথচ অতিক্রত উৎগমনহেতু অগ্রজাত প্রভা পশ্চাজ্জাত প্রভার সহিত মিশিয়া একীকৃত হইয়া যায়, এবং উহাই বস্তুর প্রকাশক হয় সেই প্রভার ভূতাণুগুলি, মস্তিষ্কাকারে পরিণত হইলে উহাদের সমষ্টিকৃত স্পন্দন চৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয় এবং স্পন্দনের অতিক্রততা নিবন্ধন ঐ চৈতন্য একীকৃত বলিয়া বোধ হয়। এ প্রকার বলিলে উপায় কি? এতদুত্তরে বক্তব্য—বাচস্পতি মহাশয় ভ্রান্তি বশতঃ যাহাকে বজ্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা বজ্র নহে, কোমল কমলদলাগ্র মাত্র। দীপশিখার যে একত্ববোধ ঐ বোধটা কাহার, বাচস্পতি মহাশয়ের না দীপশিখার?

যদি বাচস্পতি মহাশয়ের হয়, তাহা হইলে প্রভার সাদৃশ্য ও ক্রতত্বনিবন্ধন ঐ প্রকার ভ্রান্তিবোধ সম্ভবপর বটে। যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেই প্রকার বলিয়া বোধ করাই ভ্রান্তি। দীপশিখা বাস্তবিকপক্ষে একটিমাত্র প্রভা নহে, বহু প্রভার সমষ্টি, তাহাকে এক বলিয়া বোধ করাই ভুল। বাচস্পতি মহাশয় নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন। দ্রষ্টা বা বোদ্ধার পক্ষে বিষয় সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভ্রান্তি সম্ভবপর হইলেও, দীপশিখার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধ হইতেছে না। উহা যে বেদ্য—যে জ্ঞেয় সেই জ্ঞেয়ই থাকিতেছে। পক্ষান্তরে আত্মার অস্তিত্বের যদি নিত্যসাক্ষাৎকারত্ব না থাকে, তবে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মার অস্তিত্বেও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে অর্থাৎ আমি আছি কি না এইরূপ সংশয় হইতে পারে, পরন্তু তাহা কখনও হয় না; এবং এই অহংএর উপরই অন্যান্য যাবতীয় বিষয়জ্ঞান নির্ভর করে। বাহ্যবিষয়ে যে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) তাহা সাদৃশ্যনিবন্ধন (due to similarity); কিন্তু অহং বা বেত্তা বিষয়ক যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা স্বরূপনিবন্ধন (due to identity)। ইহা অনুভবসিদ্ধ, অপরোক্ষ জ্ঞান। সুতরাং দীপশিখার দৃষ্টান্ত অসৎ দৃষ্টান্ত মনে করিতে হইবে।

আর যদি দীপশিখাকেই একত্ববোধের আশ্রয়, অর্থাৎ ঐ দীপশিখাই 'অহংএব:' এই বলিয়া বোধ করে, একথা বলা হয়, তাহা হইলে বক্তব্য অগ্রে দীপশিখার বোদ্ধৃত্ব প্রমাণিত হউক, পরে উহার একত্ববোধ-বিষয়ে মীমাংসা করা যাইবে। দীপশিখা যে বেত্তা, দ্রষ্টা, কর্ত্তা বা চেতন এ প্রতিজ্ঞা ত এখনও সপ্রমাণ হয় নাই। বেত্তার সমগ্র বিষয়কে আপনা হইতে পৃথক করিয়া উহাকে আপনার প্রকাশে প্রকাশিত করা। তাই পুরাতন ঋষি মহামতি কপিল বলিয়াছেন—

"জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং
প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ।" (১)

অতএব দীপপ্রভার চৈতন্য অনুপপন্ন হওয়ায়, তাহার একত্বপ্রতীতিও অনুপপন্ন হইতেছে।

১০। বুদ্ধোপম অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন Herbert spencer এখানে উপস্থিত হইয়া হয়ত বলিবেন—আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলি একটা অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন (symbol) মাত্র। ভৌতিক ব্যাপার যেমন একটা চির-অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন, আধ্যাত্মিক ব্যাপারও তাহাই। সুতরাং হয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারকেই ভৌতিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত কর, বা ভৌতিক ব্যাপারকেই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত কর, কথা একই। উভয় ব্যবস্থাই সমত। তিনি বলেন—

"We see that the whole question is whether these symbols should be expressed in terms of those or those in terms of these—"question scarcely worth deciding, since either answer leaves us as completely outside of the reality as we were at first."

কিন্তু এ কথা সত্য কি? ভৌতিক ব্যাপারকে আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা চলে; কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে ভৌতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা চলে কি? তাহা চলে না? জড়ই-জ্ঞানের ভাষায় জ্ঞাত ও পরিব্যক্ত! কিন্তু জ্ঞানকে জড়ের ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; এবং যাহাকে তিনি অজ্ঞেয়

(১) সাংখ্যদর্শন ৬।৫১

সত্য বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, তাহা যে বিশুদ্ধ কল্পনা নহে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। আত্মার সম্বন্ধে একটা অস্ফুট জ্ঞান—আত্মা যে অপরিণামী—নিত্যবর্ত্তমান স্বভাব—এ প্রকার একটা জ্ঞান তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন না, আত্মবোধের মধ্যেই ঐ জ্ঞান নিত্য নিহিত বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। সুতরাং তাহাকে কেবল একটা চিহ্ন মাত্র বলার তাঁহার বাক্যের সঙ্গতি রক্ষায় থাকে না। তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"Besides that definite consciousness of which Logic formulates the laws, there is also an idefinite consciousness which cannot be formulated. To say that we cannot know the absolute, is by implication to affirm that there is an absolute. In the very denial of our power to learn what the absolute is, there lies hidden the assumption that it is; and the making of this assumption proves that the absolute has been present to the mind not as a nothing, but as a something." পুনশ্চ As we can in successive mental acts get rid of all particular conditions and replace them by others, but cannot get rid of that undifferentiated substance of consciousness which is conditioned anew in every thought; there ever remains with us a sense of that which exists persistently and independently of conditions.——And since the only possible measure of relative validity among our beliefs is the degree of their persistence in opposition to the efforts made to change them, it follows that this, which persists at all times, under all circumstances, and cannot cease until consciousness ceases, has the highest validity of any."

পাঠক, ইহা হইতে কি বুঝিতে পারিতেছেন? এই 'নিরুপাধিক চৈতন্য' কি একটা অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন (symbol) মাত্র? তাহা নহে; ইহা প্রতিবোধবিদিত—প্রতি জ্ঞানের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। তবে তাঁহার পূর্ব্ব বাক্যকে সত্য বলিয়া মনে করিব কি প্রকারে? তখন তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে আর কি বলিয়াছেন—

"Of the two it seems easier to translate so-called matter into so-called spirit than to translate so-called spirit into so-called matter (which latter is, indeed, wholly impossible)." Spencerএর কথা হইতে কি বুঝা যায়? জড়কে মনোবৃত্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর, কিন্তু মনকে জড়ের গতিতে পরিণত করা সর্ব্বথা অসম্ভব।

১১। জড়বাদীরা জড়কে প্রাপ্ত বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন; দেখা গিয়াছে সেটা ঠিক নহে; যাহাকে জড় বলা হয় তাহা কতিপয় ধ্যান চিত্তবৃত্তির বর্ণে রচিত; ঐ রচিত মূর্ত্তির অনুরূপ বাহিরে একটা কিছু আছে এ কল্পনা স্বাভাবিক হইতে পারে বটে কিন্তু উহা নিতান্ত আবশ্যকও নহে, যুক্তিযুক্তও

নহে। চিত্তবৃত্তি ও আণবিক গতি এতদুভয়ের মধ্যে যদি একটিকে বাস্তব, অপরটিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞানকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত এবং পরমাণু ও তাহার গতিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা, জড় জগতের তুলনায় চৈত্য বিষয়গুলিই অব্যবহিতরূপে জ্ঞাত; জড় জগৎ উহাদের হেতুরূপে পরিকল্পিত মাত্র। এই কল্পিত সত্তাই বিজ্ঞানের অবলম্বন,—এ কথা বলায় কার্য্যতঃ বা ব্যবহারতঃ কোন ক্ষতি নাই। বৈজ্ঞানিকের কষ্ট হইবারও কোন হেতু নাই। পূর্ব্বে এ কথা একবার বলিয়াছি; কিন্তু এ কথাটা এত সহজেই লোকে ভুলিয়া যায় যে, ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই লেখকের পুনরুক্তি বোধ হয় মার্জ্জনীয়। কোন প্রসিদ্ধ চিন্তক বলিয়াছেন—"The sensation is *actual* and given but in the atoms nothing is at bottom given except the remains of faded sensations by means of which we create the image of them. The idea that something extended absolutely independent of our subject, corresponds to the image may be very natural but not absolutely necessary and conclusive. If therefore, of the two objects—sensations and atomic movement one must be taken as reality, the other as mere appearance, there would be much more reason to take sensation and consciousness as real and the atoms and their movements as mere appearance. That we construct natural science upon this appearance cannot make any difference." (২)

মহামতি Dr. Brain এই জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ সম্বন্ধে কি বলেন পাঠক শ্রবণ করুন। তিনি বলেন—

"There is no possible knowledge of a world except in reference to our minds. knowledge means a state of mind: the notion of material things is a mental fact. We are incapable even of discussing the existence of an independent material world; the very act is a contradiction. We can speak only of a world presented to our minds."

দেখা যাইতেছে, আত্মানিরপেক্ষ বাহ্য জগতের ধারণাই যখন স্ববিরোধী তখন নিরপেক্ষ জড়ের গতিবশতঃ মস্তিষ্কে চেতনার উদ্রেক হয়, এ প্রকার ধারণাও স্ববিরোধী। আমরা কেবল জ্ঞানোপস্থাপিত জড়জগতের ধারণাই করিতে পারি, তদতিরিক্ত জগতের ধারণা করিতে পারি না। অতএব জড়তত্ত্ব দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিব্যাখ্যানের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে জড়তত্ত্বের দশা এই প্রকারই দাঁড়ায়। আবার জড়তত্ত্বের দিক হইতে আত্মতত্ত্বের সারিধ্যেই উপনীত হওয়া যায় না। এ কথা আর বিশদ করিয়া না বলিলেও বুঝা যাইতেছে। তথাপি জড়তত্ত্বের দিক হইতে আর দুই একটি কথা বলিব।

(২) Lange's History of materialism.

১২। জড়বাদী বলেন—আত্মা শরীরেরই ক্রিয়া, কেননা যেখানে শরীর নাই, সেখানে আত্মার মস্তিষ্ক উৎপন্ন হয় না শরীর সুস্থ থাকিলে আত্মা সুস্থ থাকে, শরীরের ক্লেশে আত্মা ক্লিষ্ট হয়, শরীর পাতে আত্মা বিনষ্ট হয়। অতএব শরীর ব্যাপক, আত্মা ব্যাপ্য। ব্যাপক দর্শনে ব্যাপ্যের অনুমান হয় না, পরন্তু ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয় সুতরাং যেখানে যেখানে আত্মা, সেখানে সেখানে শরীর, কিন্তু যেখানে যেখানে শরীর সেখানে সেখানে আত্মার অনুমান হয় না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য, জড়ের ক্রিয়া অবয়বগত ক্রিয়ার সমষ্টি এবং ঐ ক্রিয়া গতি-আত্মক। অবয়বের গতি কল্পনা না করিয়া জড়বস্তুর গতিশীলতা কল্পনা করা যায় না; এবং এই গতি-আত্মক ক্রিয়া অপরোক্ষবোধসিদ্ধ নহে। কিন্তু আত্মার ক্রিয়া ইচ্ছা, চিন্তাদি অবয়ব—গতি নিরপেক্ষ অনুভবসিদ্ধ। যাহার ক্রিয়া অবয়ব-গতি নিরপেক্ষ-অনুভবসিদ্ধ, তাহার ক্রিয়া অবয়বক্রিয়াসাপেক্ষ নহে। যাহার ক্রিয়া অবয়বক্রিয়াসাপেক্ষ নহে, তাহার ক্রিয়া গতি-আত্মক নহে, কেননা গতি-আত্মক ক্রিয়া অবয়ব ক্রিয়ার সমষ্টি। যাহার ক্রিয়া গতি আত্মক নহে, তাহা ভৌতিক বস্তু নহে; অতএব আত্মা ভৌতিক বস্তু নহে, বা ভৌতিক বস্তুর ক্রিয়া নহে, ইহা বিশ্লিষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। শরীর ভৌতিক বস্তু সুতরাং আত্মা শরীরের ক্রিয়া নহে। তবে ভৌতিক ক্রিয়ার অর্থাৎ মস্তিষ্কগত স্নায়ুমণ্ডলীর গতি-আত্মক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সমান্তরাল ভাবে ভৌতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, জড়বাদে এইটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই দুই শ্রেণীর বিপরীত ক্রিয়া কেন এ প্রকার সমান্তরাল ভাবে নিষ্পন্ন হয়, জড়বাদী তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। জড় ও আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকারে এই সমস্যা অমীমাংসা। জড়বাদী তাই আত্মাকে জড়ের গতিতে পর্য্যবসিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই জন্য জড়কে আত্মক্রিয়া সমুদ্ভূত বলিয়া মীমাংসা করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

দধিয়া বৈরিগীতলার মেলা

পুণ্যভূমি ভারতের গৌড়দেশে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় দধিয়া বৈরিগীতলা অবস্থিত। বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট বোধ হয় এ গ্রামের অধিক পরিচয় দিতে হইবে না, কারণ বহুকাল হইতেই এই স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী মহামহোৎসব হইয়া আসিতেছে। তবে সাধারণ পাঠক পাঠিকার জন্য গ্রাম খানির একটু পরিচয় আবশ্যক

ধরিয়া বৈরিগীতলা একখানি অতি ক্ষুদ্র পল্লী। নবনির্ম্মিত কাটোয়া-আমাদপুর রেল-পথে কাঁদরা ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে মেলার স্থান। স্থানটী বেশ মনোরম। গ্রামের চারি মাইল দক্ষিণে ভৈরবমূর্ত্তি অজয় নদ প্রবাহিত।

মেলার স্থানের চারিদিকে আম্রকানন। নিদাঘকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত রাখাল বালকগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদে কালাতিবাহিত করে। তাহাদিগের হাবভাব দেখিলে ব্রজরাখালগণের কথা মনে পড়ে। আম্রবৃক্ষগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সূর্য্যদেবও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। সন্ধ্যাকালে নানা দিগ্দেশ হইতে পক্ষিগণ তথায় আগমন করিয়া মধুরস্বরে আম্রকানন মুখরিত করে; দেখিলে মনে হয় সেই শান্তিময় আম্রকানন এবং পক্ষিগণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে বিভোর! আম্রকাননের পার্শ্বে সাঁওতা নামে একটী সরোবর। সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মসৌরভে আমোদিত স্নিগ্ধ বায়ুরাশি স্থানটীকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। স্থানটীতে গমন করিলে মনে স্বভাবতঃই পবিত্র ভাবের উদয় হয়, মনে হয় যে, শান্তিদেবী তথায় চিরবিরাজমানা। স্থানটীর এমনই স্বর্গীয়ভাব যে, তথায় উপস্থিত হইলেই ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মনেও সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

সন ১১৬০ সালের কিছু পূর্ব্বে গোপাল দাস নামক জনৈক কনৌজ ব্রাহ্মণ শ্রীরঘুনাথ-জী নামক একটী বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হন। গোপালদাস সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ঐ স্থানটী নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে কেহ বসবাস করিত না; কেবল স্থানীয় দুই চারিজন মৃত বৈষ্ণবের সমাধি হইত। গোপালদাস আসিয়া সেই জনশূন্য নিবিড় জঙ্গল মধ্যে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার উপাস্য ৺রঘুনাথ জীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকগণ তথায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গোপালদাস ধর্ম্মালোচনায় পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ভগবান্ ৺রঘুনাথ জীর উপাসক ভক্ত গোপালদাস সেই সকল লোক লইয়া একটী "ধর্ম্মপরিষদ্" গঠন করিলেন। এই পুণ্য পরিষদ গ্রামে গ্রামে যাইয়া মহোৎসব দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসের মকরী সপ্তমীর দিন ৺রঘুনাথজীর নিকট যাইয়া সকলে মহোৎসব করিবে। গোপালদাস গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ—মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। সকল লোকেই তাঁহাকে একজন পরম যোগী ও সাধুপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন দলে দলে লোক তাঁহার নিকট ব্যাধি উপশম বা অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় আসিতে লাগিল, তিনিও যোগবলে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। গোপালদাসের পসার জমিয়া গেল; আর তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইল না, জনসাধারণ মহোৎসবের সমস্ত ব্যয় সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিল।

অপরিমেয় অলৌকিক শক্তির আকর হইলেও

আত্মমহিমা ঢাকিয়া রাখাই প্রকৃত সাধুর স্বভাব। তবে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন সাধু তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির দুই একটী পরিচয় প্রদান করেন, তাহা অন্যান্য প্রকৃতির লোকের অজ্ঞান চক্ষু উন্মোচনের জন্য মাত্র। গোপালদাসও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ লোকদিগের জন্য তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, তিনি যখন প্রথম প্রথম মহোৎসব দিতে আরম্ভ করেন, তখন জাত্যাভিমানী দুই চারিজন ব্রাহ্মণ মহোৎসবের অন্ন গ্রহণ করিলে জাতি নষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরনিবাসী প্যারীমোহন চট্টোরাজ মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গোপালদাসের মহোৎসবের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন এবং তাঁহাদের গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও উক্ত মহোৎসবের নিমন্ত্রণে যাইতে দেন নাই। গোপাল দাস কিন্তু তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া মহা সমারোহে মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন, তাঁহার "ধর্ম্ম পরিষদ্‌"ভুক্ত অন্যান্য গ্রামের ব্রাহ্মণসজ্জনগণ মহোৎসবে যোগ দিয়া পরমানন্দে মহোৎসবের অন্নগ্রহণ করিলেন। সেইজন্য শ্রীপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ উক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত পাক্তি ভোজন বন্ধ করিলেন। এদিকে গোপালদাস তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন তোমাদের কোন ভয় নাই, শীঘ্র দেখিবে শ্রীপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আসিয়া মহোৎসবের অবশিষ্টান্ন, যাহা আমি মৃত্তিকা গর্ত্তে গর্ত্ত করিয়াপুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিবেন। তোমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের জাতিমারে কে? মহাপ্রসাদ গ্রহণে জাতি বিচার নাই। যাহারা মহাপ্রসাদ গ্রহণে জাতিবিচার করে তাহারা শাস্ত্র জ্ঞানহীন মূর্খ! তাহারা মহাপাপী, তাহাদের সংসর্গে থাকা তোমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য নহে।

এই ঘটনার অল্প দিবস পরেই শ্রীপুর গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সাংক্রামিক ব্যাধি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইল। তখন গ্রামের অনেকেই 'কাণাঘুষা' করিতে লাগিল যে, গোপালদাসের মহোৎসবে না যাওয়াতেই বোধ হয় আমাদের এই প্রকার অমঙ্গল ঘটিল। ঠিক সেই সময়ে একদিন গোপালদাস শ্রীপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ গোপালদাসকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেন অকূলে কূল পাইল! গ্রামস্থ সকলে আসিয়া গোপালদাসের পদ প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। গোপাল দাস বলিলেন "মহাপ্রসাদে অবহেলা করাতেই আপনাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, আপনারা সকলে যাইয়া সেই মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেই আপনাদের সকল অমঙ্গল দূর হইবে। সেই মহোৎসবের অন্ন আমি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছি, আসুন, সকলে আমার সহিত যাইয়া ভক্তিভরে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ধন্য হইবেন, আপনাদের সকল আপদ বিপদ দূরে যাইবে।" গ্রামের প্রত্যেক গৃহ হইতে দুই একজন করিয়া গোপালদাসের সহিত তথায় গমন করিলেন। গোপাল দাস মৃত্তিকা নিম্ন হইতে সেই সমস্ত মহোৎসবের অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বহুদিনের অন্নব্যঞ্জন সমস্তই অবিকৃত ছিল।

শ্রীপুরবাসিগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন এবং ভোজনাবশেষ মস্তকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহলক্ষ্মীগণকে ও উত্থানশক্তি রহিত পীড়িত ব্যক্তিগণকে ভোজন

করাইলেন। সেই দিন হইতে শ্রীপুরের আপদ বালাই দূর হইল।

হরিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে মাণিক হালদার নামে একজন কৃষক বাস করিত। গোপালদাস কোন সময়ে কিছু দেবোত্তর জমী কর্ষণ করাইবার জন্য মাণিক হালদারকে ডাকিয়া আনিলেন। গোপালদাসের কথা শুনিয়া মাণিক বলিল "প্রভু, আমার ভগিনী আজ প্রায় এক বৎসর হইল বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়, তাঁহার একটু 'আরাম' না হইলে কি করিয়া আপনার ভূমি কর্ষণ করিতে আসি।" এই কথা শুনিয়া গোপালদাস বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার ভগিনীকে আগামী কল্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে, আমি তাহার রোগ ভাল করিয়া দিব।" মাণিক কহিল "প্রভু, তিনি পঙ্গু হইয়াছেন, কিরূপে এতদূর আসিবেন, তাই ভাবিতেছি।" গোপালদাস বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই, আমি বলিতেছি, তাহাকে আমার নিকট আসিতে বলিলেই সে আসিতে পারিবে।" তখন মাণিক বলিল "প্রভু, আপনার জমি কোথায় আমি চিনি না, জমী চিনাইয়া দিন।"

গোপালদাস বলিলেন "জমী আর কি দেখাইয়া দিব, তুমি আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীর নাম করিয়া যে জমী কর্ষণ করিবে, সেই জমীই আমার।" পরদিন মাণিক তাহার ভগিনীকে গোপালদাসের আশ্রমে যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহার ভগিনী "উঠিতে পারিব না" বলায় মাণিক একটী ঝুড়িতে তাহার ভগিনীকে বসাইয়া মাথায় লইয়া গোপালদাসের আখড়ায় উপস্থিত হইল। তখন গোপালদাস নিম্ন উপাস্য দেবের পূজা করিতেছিলেন। পূজা শেষ হইলে তিনি খড়ম পায়ে দিয়া ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে হাঁটিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম,—হাঁটিয়া না আসিয়া মাণিককে কষ্ট দিলি কেন? উঠ্, নহিলে তোকে 'খড়ম পিটে' করব।" তখন স্ত্রীলোকটী অতিশয় কাতর কণ্ঠে বলিল "মের না বাবা, আমার উঠিবার শক্তি থাকিলে কি আর আমি উঠি না।" তখন গোপালদাস খড়মের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, দুইচারি ঘা মা'র খাইয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া বসিল। তাহার পর তিনি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন—"উঠিয়া দাঁড়া, নতুবা আবার মারিব।" স্ত্রীলোকটী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "না বাবা, আমি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না।" তখন তিনি আবার তাহাকে খড়মের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। দুই চারি ঘা প্রহার খাইয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন গোপালদাস তাহাকে একরাশি গোময় দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "ঐখানে যা, যাইয়া ঘুঁটে প্রস্তুত কর।" স্ত্রীলোকটী বলিল "বাবা, হাতে পায়ে একটুও বল নাই, আমি ওখানে গিয়া কিছুতেই ঘুঁটে প্রস্তুত করিতে পারিব না।" তখন তিনি তাহাকে আবার খড়মদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। দুই চারি ঘা প্রহার খাইয়াই স্ত্রীলোকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া 'নেদি' * দিতে—লাগিল। তখন গোপাল দাস তাহাকে আদেশ করিলেন "গোবর দেওয়া শেষ করিয়া, সাঁওতা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিবি এবং ভগবান শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীর প্রসাদ খাইয়া বাড়ী যাইবি, তোর পীড়া

* গোময়দ্বারা ঘুঁটে প্রস্তুত করা

আরোগ্য হইয়াছে।" মহাপুরুষের আদেশানুযায়ী প্রসাদ পাইয়া স্ত্রীলোকটী পরদিবস বাটী গিয়াছিল। তৎপর দিন মাণিক হালদার লাঙ্গল লইয়া আসিয়া একখানি বৃহৎ জমীতে "জয় রঘুনাথ জীউ" বলিয়া লাঙ্গল দিতে লাগিল এবং পরে জানিতে পারিল যে, সেই জমীখানি গোপালদাসের দেবোত্তর জমীই বটে।

গোপালদাস প্রত্যহ হবিষ্যান্ন করিতেন। গোপনে কুটীর মধ্যে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ করিতেন, তৎপরে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া গৃহমধ্যেই ভোজন করিতেন, কেহ কখন তাঁহার ভোজন দেখিতে পাইত না। ভোজনান্তে স্বয়ং গৃহ পরিষ্কার করিয়া পাকপাত্র জলে ফেলাইয়া দিতেন। তাঁহার ভোজনাবশেষ বা প্রসাদ কখন কেহ পাইত না। বৈষ্ণবপদাবলী লেখক অমর কবি চণ্ডীদাসের সাধনভূমি বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অনেক লোক তাঁহার প্রসাদ পাইবার আশায় তাঁহাকে কোন সময়ে নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং তাঁহার আহারের জন্য এক'পাতন' চিঁড়ে প্রদান করেন, ইচ্ছা অন্য চিঁড়ে তিনি খাইতে পারিবেন না, সুতরাং কিছু প্রসাদ থাকিবেই থাকিবে। তৎপরে তিনি গোপালদাসকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি নিয়মমত একখানি গৃহমধ্যে গোপনে ভোজন করিতে বসিলেন; সে ব্যক্তিও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন, ইচ্ছা ভোজনাবশেষ গোপালদাস যেন কোন প্রকারে ফেলাইয়া দিতে না পারেন। প্রহরাধিক কাল ঐ ভাবে দ্বারে বসিয়া থাকিবার পরও যখন গোপাল দাস ভোজনান্তে গৃহ হইতে বাহির হইলেন না, তখন সেই ব্যক্তি অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং দ্বার খুলিয়া দেখিলেন গৃহমধ্যে গোপালদাসও নাই, কণামাত্র চিঁড়াও নাই। এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লোকটী অবাক হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখেন গোপালদাস স্নান করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত!

এইরূপে গোপালদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মাত্র দুই চারিজন অবিশ্বাসীর মনে কেমন একটা 'খট্‌কা' লাগিল। তাঁহারা গোপালদাসের 'বুজরুকি' নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেরাওী গ্রামনিবাসী কয়েকজন গোপালদাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা আশ্বিন মাসে গোপালদাসের আখড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন? এবং গোপাল দাসকে বলিলেন "বাবাজি! আমরা আম দিয়া সল মাছের ঝোল খাইতে ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" তাঁহাদের ধারণা আশ্বিন মাসে বাবাজী আমের সহিত সল মাছের ঝোল কখনই দিতে পারিবেন না, তখন সেই বুজরুকে বেশ করিয়া 'উত্তম মধ্যম' প্রদান করিয়া চলিয়া যাইব। গোপালদাস যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং অনেক শিষ্যকে বলিলেন "বাপু হে, সাঁওতা পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারের একটা খালে একটা সল মাছ আছে ধরিয়া আন তো" তৎপরে অপর একজন শিষ্যকে বলিলেন "বাপু, অদূরে ঐ যে আম গাছ দেখিতেছ ঐ গাছের দক্ষিণ দিকের ডালে এক থলা আম দেখিয়াছি বোধ হইতেছে, আম থলাটি পাড়িয়া আন তো।" তাঁহার আদেশানুযায়ী উভয়েই অল্পকাল মধ্যে আম ও সল মাছ লইয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে উক্ত ভদ্রলোক

দিগকে আম ও সল মাছ রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভদ্রলোক কয়েকজন গোপালদাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তখন তখনই আম-সল রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন এবং ভোজনান্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোপালদাস বলিলেন "আপনারা তো কোন অপরাধ করেন নাই, তবে আর ক্ষমা করিব কাহাকে, আম ও সল মাছ না পাইলে আমাকে প্রহার করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, ইচ্ছা করেন তো প্রহার করুন।" তখন ভদ্রলোক কয়েকজন লজ্জিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গোপাল দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কোন এক সময়ে বর্ষাকালে ভৈরবমূর্ত্তি অজয় নদের তীরে খেয়া না পাইয়া মাধব নামে জনৈক কৃষক গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে গোপালদাস তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বিপন্ন কৃষকের হাত ধরিয়া নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ধনিয়ার বহুলোক বৃন্দাবন যাত্রা করেন; তাঁহাদের বৃন্দাবন গমনের পর উক্ত গ্রামের জনৈক পরামাণিকের শ্রীধাম দর্শনে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল, কিন্তু তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় বৃন্দাবন যাওয়া সোজা কাজ ছিল না। একাকী বৃন্দাবন যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং পরামাণিক আসিয়া গোপালদাসের শরণাপন্ন হইল। গোপালদাস তাহার ব্যাকুলতা ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যেদিন গ্রামের অন্যান্য লোক বৃন্দাবন পৌঁছিবে, সেইদিন তোমাকেও বৃন্দাবন পৌঁছাইয়া দিব।" বাবাজীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরামাণিক বাড়ী ফিরিল এবং যে সময়ে গ্রামের বৃন্দাবন যাত্রী বৃন্দাবন পৌঁছিবার সম্ভব, সেই সময়ে পুনর্ব্বার পরামাণিক গোপালদাসের নিকটে আসিয়া তাহাকে বৃন্দাবন পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তখন গোপাল দাস তাহাকে চক্ষু মুদিয়া বৃন্দাবন যাইতেছি মনে করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী পরামাণিক একাগ্রচিত্তে "বৃন্দাবন যাইতেছি" চিন্তা করিতে করিতে মানসনেত্রে দেখিল যেন সে রাধাহৃদিরঞ্জন পীতবসন বনমালীর বিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে গোপালদাসের চরণে ধরিয়া তাঁহার নিকট থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু গোপালদাস তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন "বৎস, তোমার এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই, গৃহে যাও। তোমার যখনই শ্রীবৃন্দাবন দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তখনই ৺রঘুনাথজীকে স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিবে এবং শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছি একাগ্রচিত্তে এই চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই তোমার হৃদয়-দর্পণে শ্রীধামের চিত্র প্রতিফলিত হইবে। তবে একথা কাহাকেও বলিবে না, বলিলেই তোমার মৃত্যু হইবে।" কিন্তু পরামাণিক এতই তন্ময় হইয়াছিল যে, এ ঘটনা অপ্রকাশ রাখিতে পারিল না। এই অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ হইবার অল্প দিন পরেই সে ইহলোক ত্যাগ করিল।

এই প্রকারে গোপালদাস নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া ১১৬০ সালের ২৭শে পৌষ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কনৌজ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহার

সৎকার করাইতে আদেশ দিয়া যান। ভক্তগণ তো ভাবিয়া অস্থির, কি করিয়া মহাপুরুষের আদেশ রক্ষা করিবেন! হঠাৎ বঙ্গদেশে কনৌজ ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘটনা, গোপালদাস যেদিন ইহলোক ত্যাগ করিবেন, ঠিক সেই দিন কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া গোপালদাসের আখড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং গোপালদাসের পরলোকগমনের পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে তিনি চিতায় বালক বেশ ধারণ করিয়া চিতাগ্নির সহিত খেলা করিয়াছিলেন।

গোপালদাসের ইহলোক ত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ ধনিয়া শিঙ্গ বাড়ী আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে গোপালদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "বাবাজী, কোথায় যাইতেছেন? আমি আশা করিয়া আসিতেছি ধনিয়া গিয়া দুই একদিন আপনার সহবাসে জীবন সার্থক করিব।" বাবাজী বলিলেন "আমি অযোধ্যা যাইতেছি, অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা আছে।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বড়ই ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং গোপালদাসকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলে বাবাজী বলিলেন "আপনি যখন ধনিয়া যাইতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটী কাজ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।" ব্রাহ্মণ আগ্রহের সহিত বলিলেন "কি কাজ আদেশ করুন, সানন্দে সম্পন্ন করিব।" বাবাজী বলিলেন "আমার আশ্রমে যে শিঙ্গ আছে, তাহাকে বলিবেন, আমার কুটীরের উত্তরদিকে যে বেদী আছে সেই বেদীর নিম্নে কিছু টাকা আছে, সেই টাকা তুলিয়া মহোৎসবের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যেন খরিদ করা হয়।" ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে ধনিয়ায় গিয়া শুনিলেন, যেদিন তাঁহার সহিত গোপালদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে দিন উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত গোপালদাসের সাক্ষাৎ হয়, ঠিক সেই দিনই আইওপুরনিবাসী সিউড়ী প্রবাসী বিশ্বম্ভর গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোপালদাস বলেন "আপনাকে আমার ঠাকুরের নাটমন্দির নির্ম্মাণ জন্য কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে হইবে।" গোস্বামীজী কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় গোপালদাস তাঁহাকে কাষ্ঠের মূল্য এবং ধনিয়া কাষ্ঠ পাঠাইবার জন্য গাড়ী ভাড়া মিটাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। দুই এক দিন পরে বিশ্বম্ভর গোস্বামী কাষ্ঠ খরিদ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠের গাড়ীর সহিত ধনিয়া গমন করেন, এবং গোপালদাস পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

গোপালদাসের দেহ রক্ষার পর ব্রজবাসী দাস ধনিয়ার আখড়ার অধিকারী হন। ইনিও কনৌজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধনিয়ার মেলা তলায় ইঁহার দুইটী কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে,—একটী বাগান এবং দ্বিতীয়টী সাওতার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত একটী পুষ্করিণী। ইনিই এই আখড়ায় ৺রঘুনাথজীর পার্শ্বে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রজবাসী দাসের মৃত্যুর পর গোপীপ্রসাদ, তৎপরে কল্যাণদাস, তৎপরে মোহনদাস এবং মোহন দাসের মৃত্যুর পর লছমনদাস উক্ত আখড়ার মোহান্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই কনৌজ-ব্রাহ্মণ ছিলেন। লছমনদাসের মৃত্যুর পর কোন মোহান্ত না থাকায় উক্ত আখড়ার অনুভূত টাকা কড়ি যাহা ছিল সমস্তই

গবর্ণমেণ্ট আটক করেন। এই ঘটনা সন ১৩০৭ সালে সংঘটিত হয়।

কাটোয়ার তাৎকালিক সব্‌ডিভিসনাল অফিসার সারদা বাবু স্বয়ং আখড়ায় আসিয়া ৯০০০ টাকা লইয়া যান। কথিত আছে সারদা বাবু আখড়া হইতে টাকা লইয়া যাইবার পরক্ষণেই ৺রঘুনাথ জীর পাঁচ চূড়া মন্দিরটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। সারদা বাবুও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। তখন তিনি সেই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কোনরূপ চিকিৎসা না করাইয়া গোপাল দাসকে মানস করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। তারপরে সারদা বাবু বধিয়া ও বধিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকদিগকে উক্ত আখড়ার নূতন মোহান্ত নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পণ করেন। তদনুসারে একজন অযোধ্যাবাসীকে মোহান্ত করিবার জন্য অযোধ্যায় লোক পাঠাইয়া জনৈক কনৌজ ব্রাহ্মণ আনান হয়। তাঁহার নাম রামপদদাস। এক্ষণে ৺রঘুনাথজীর যে সকল মন্দির আছে তাহা ইঁহারই নির্ম্মিত।

সন ১৩০৮ সালে রামপদদাস কাটোয়া কালেক্টরী হইতে পূর্ব্বোক্ত ৯০০০৲ টাকা বাহির করিয়া আনিয়া রামপদদাস লছমন দাসের তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ১৩০৮ সালের ৬ই মাঘ উক্ত মহোৎসব হইয়াছিল। মহোৎসবে ১৮/০ মণ ময়দা ও ৪০/ মণ চাউল পাক হয়। বধিয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিকেই এই মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বহু অভ্যাগত বৈষ্ণব ও দীন দরিদ্রকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। ভারত বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ৺রসিকদাসের কীর্ত্তন গান হইয়াছিল। মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তাহাতে ৺রঘুনাথ জীর মন্দির ও নাটমন্দির এবং গোপালদাসের পরিত্রাজির সমাধি মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

সাঁওতা পুষ্করিণীর ঈশান কোণে ৺রঘুনাথ জীর দক্ষিণ দুয়ারী মন্দির। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে নাটমন্দির, তাঁহার দক্ষিণে গোপাল দাসের সমাধিমন্দির, সমাধি স্তম্ভের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও দুই খানি শ্রীচরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই সমাধি মন্দিরের দক্ষিণে গোপালদাসের পরবর্ত্তী মোহান্তগণের সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। গোপাল দাসের পরবর্ত্তী মোহান্তগণও উক্ত আখড়ায় অনেক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই আশ্রমে ৺রঘুনাথ জীউ, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, নল, নীল, সুগ্রীব, জাম্বুবান, বালী, চারিটী চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বাসুদেব মূর্ত্তি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, তিনটী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, বটকৃষ্ণ (গোপাল) মূর্ত্তি একটী, লালাজী (গোপাল) মূর্ত্তি একটী, নাড়ুয়া গোপাল মূর্ত্তি ছয়টী এবং শালগ্রাম শিলা ষাটটী সর্ব্বসমেত ৮৯টি বিগ্রহ আছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১০০ একশত বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর জমী রামপদদাস মোহান্তের দখলে আছে। মেলার সময় পাঁচ সাতশত টাকা প্রণামী—জমা হইয়া থাকে। নৈমিক পূজার ব্যবস্থা তত ভাল নহে, পূজার সময় একবার ও সন্ধ্যাকালে শীতলের সময় একবার আরতি হইয়া থাকে। পূজার সময় কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে, মধ্যাহ্নে অন্ন—ভোগ হয় এবং সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ বা মিষ্টান্নের শীতলভোগ হইয়া থাকে। গোপালদাস বাবাজীর সমাধি মন্দিরে গোপাল দাসের গোলকপ্রাপ্ত আত্মার উদ্দেশেও পূজা এবং

প্রত্যহ ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। গোপাল দাসের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে বিরাট মহোৎসব ও তিনবার মেলা হইয়া থাকে, মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীর দিন মেলা আরম্ভ হয়। সেইদিন চিড়া মহোৎসব হয়। তৎপর দিন বিরাট অন্ন মহোৎসব হইয়া থাকে। অন্নমহোৎসবের দিন পাঁচশত মণের উপর চাউল পাক হইয়া থাকে। অন্ন মহোৎসবের পরদিন ধুলোট হইয়া থাকে। মহোৎসবের সময় দুইশতেরও অধিক আখড়া স্থাপিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক আখড়াতেই মহোৎসব হইয়া থাকে। অন্ন মহোৎসবের ব্যয় দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে করিতে হয় না। ধধিয়া বৈরিগীতলার চতুষ্পার্শবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে লোক—চাউল, দাইল, তরিতরকারী প্রভৃতি লইয়া মহোৎসব দিতে আগমন করিয়া থাকেন। আহুত, অনাহুত, রবাহুত, আউল, বাউল, সাঁই, ধরবেশ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শূদ্র, ভদ্র যে কেহ মেলা স্থলে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছামত প্রসাদান্ন পাইয়া থাকেন। মেলা দেখিতে আসিয়া কাহাকেও আহারের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে বা বেগ পাইতে হয় না। মহোৎসবের সময় ভাল ভাল কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন গান হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ধুলোটের সময় নগরসংকীর্ত্তনের এত ধুম হয় যে, হরিনামধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠে, পথে এরূপ জনতা হয় যে কাহারও ইচ্ছা হইলে একপদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হয় না। বাংলা দেশে আর কোথাও এত বড় মেলা হয় কিনা—সন্দেহ। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নবদ্বীপ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান হইতেও সকল প্রকার দ্রব্যের বড় বড় দোকান এই মেলায় আসিয়া থাকে। ছয় সাতশত মিষ্টান্নের দোকান, দুইশতের উপর মনোহারী-দোকান, প্রায় একশত কাটা পোষাকের দোকান, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন খানি পিতল কাঁসার বাসনের দোকান, বহু লৌহ, জাঁতা, পাথর, লাঙ্গল, জোয়াল, প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রের দোকান, দশ বার খানি জুতার দোকান, অসংখ্য ফল মূলের দোকান উপস্থিত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, বাংলা দেশের যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যায় ধধিয়া বৈরিগীতলার মেলায় তৎসমুদায়ই পাওয়া যায়। ধধিয়া বৈরিগীতলার আম্র কানন ঐ সময় একটী বড় সহরে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতিও আসিয়া থাকে। মহোৎসবের পর এক মাসের অধিককাল মেলা থাকে। মেলায় সকল প্রকার দ্রব্যেরই বেশ ধরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

অন্যান্য স্থানের মেলার ন্যায় এখানকার মেলাতেও মাতাল ও বেশ্যার উপদ্রব হইয়া থাকে তবে কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত থাকায় দর্শকগণের তত বেশী কষ্ট হয় না।

ধধিয়া বৈরিগীতলা এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার পাইহাটনিবাসী ধার্ম্মিক জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। তবে যেখানে মেলা বসে তাহার কতকাংশ গোপালদাসের দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত।

এখনও এই অঞ্চলের বহুলোক কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গোপাল দাসের মানস করিয়া থাকে এবং ব্যাধি আরোগ্য হইলে মেলার সময় ক্ষমতানুসারে একটী মহোৎসব দিয়া থাকে। ঈপিত বস্তু সাধনার পথে ভীমকল বোলতার

ন্যায় যন্ত্রণাপ্রদ এবং প্রকৃত সাধকের নিকট ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও অতীব বিরক্তিকর হইলেও সাধক গোপালদাসকে দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বিবেচনায় সময়ে সময়ে ঐ সকল অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ না করিলে বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি এত শীঘ্র আত্ম-মহিমা প্রচার করিতে পারিতেন না, কারণ ঐ সময়ে বঙ্গদেশের সাধারণ লোকের বড়ই অধঃপতন হইয়াছিল!

উপসংহারে বর্দ্ধমান জেলার নিশননিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট, এই মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

মঙ্গলদূত

গ্রামের প্রান্তে বেঁধেছিল বাসা বেদে দুই ভাই আসি
দিনের বেলায় নাচাত ভালুক রাত্রে বাজাত বাঁশী
গভীর রাত্রে সহসা ধরিল ওলাউঠা এক ভায়
সাথী ভাই গেল ডাক্তার বাড়ী একেলা ফেলিয়া তায়
ডাক্তার কহে রাত্রি দুপুরে কিছুতে পারি না যেতে
"কত টাকা দিবে অগ্রিম দাও" বলে সে হাতটী পেতে
বেদে কহে কাঁদি "দিতে না পারিব এক টাকা ছাড়া কিছু"
দুয়ারের পাশে রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নীচু।
ডাক্তার কহে রাত্রি দুপুরে জ্বালাতে আসিলি হেন
অনেক হাতুড়ে রয়েছে বাজারে ডাক দিয়ে নেয়া কেন?

সাত দিন গত। গোখুরা সর্পে সেদিন গভীর রাতে
ঐ ডাক্তার বাবুর ছেলেরে দংশিল বাম হাতে
পিতার বিদ্যা সবি হ'লো সারা সবার চেষ্টা শেষ
দেশের রোজায় ঘুচাতে নারিল কালের গরল লেশ
নীল হ'য়ে গেল দেহটি তাহার শায়িত তুলসি তলে
নাড়ির স্পন্দ হইল বন্ধ কাণে হরিনাম বলে।
হেন কালে সেই বেদে দুইজন উপজিল সেই ঠাঁয়ে
শেষ চেষ্টাটি করিবে তাহারা কহিল ছেলের মায়ে
মন্ত্র পড়িল জল পড়া দিল আরো কি করিল কত
ফিরিল জীবন মেলিল নয়ন বিষ দোষ হ'ল গত
ডাক্তার কেঁদে যোড় হাতে কয় "যাহা চাও তাই দিব"
সন্তানে মোর দিয়াছ ফিরায়ে চরণের ধূলি নিব।

বেদে কহে বাবু সব মঙ্গল সুমতি তোমার হোক্
কিছুই নিবনা এমনি করিয়া পুরি মোরা সাত লোক
মোরা বিধাতার মঙ্গলদূত বেদে বেশে ফিরি দোঁহে
ভ্রান্ত অন্ধে দেখারে স্বপথ চেতনা বিতরি মোহে
বিপদে পড়িয়া ছল করে ডাকি না ডাকিতে ত্রাণ করি
জীব জগতের ধ্রুব মঙ্গল যাচি মোহ ঘোর হরি
এত কহি সেই অলোক মূর্ত্তি আঁধারে মিলাল ছলি
পুনর্জীবিত বালকে ঘেরিয়া সবে নাচে হরি বলি।

শ্রীকালিদাস রায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

(১০১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

সমাজসেবক গান্ধির জেল

১১ই নভেম্বর জাতির ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গান্ধির নামে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। মিঃ গান্ধি আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করেন। মিঃ গোডফ্রে (সরকারী উকিল) আইন অনুযায়ী কঠিনদণ্ড প্রদান করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন। মিঃ গান্ধি আপনার জবানবন্দীতে বলেন যে, আপনার পক্ষ সমর্থনের ও ভারতীয় প্রজার জন্য আমার বলা উচিত যে, যে অপরাধ আমার উপর আনীত হইয়াছে, উহার দায়িত্ব আমি নেটালের এক পুরাতন জমীদারের মস্তক হইতে নিজের মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। আমি ইহা স্বীকার করি যে, এই সকল লোককে এক উপনিবেশ হইতে অন্য উপনিবেশে বাস করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি ইহাও বলিতেছি যে কয়লার খনির মালিকের ক্ষতি করা আমার আদবেই ইচ্ছা নয়। ধর্ম্মঘটের জন্য ব্যবসায়িগণের অনেক লোকসান হইতেছে ইহা অবগত হইয়া আমি অতিশয় দুঃখিত। যে সকল শ্বেতাঙ্গ স্বামীর অধীনে মজুরগণ কাজ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এই তিন পাউণ্ড কর আমার স্বদেশ বন্ধুর উপর ভয়ানক বোঝা স্বরূপ; ইহা রহিত করিবার প্রযত্ন তাঁহাদেরই করা উচিত। মাননীয় গোখলের নিকট জেনেরল স্মটস্ এই কর রহিত করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে এই বাক্য পূর্ণ করা উচিত। যে পর্য্যন্ত না এই কর রহিত করা হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বজায় রাখিয়া ভিক্ষা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবার পরামর্শ আমার স্বদেশবাসীকে প্রদান করা অতিশয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

বিনা কষ্ট স্বীকারে এই অন্যায় কখনও সমাপ্ত হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেন যে, "মিঃ গান্ধি অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি একজন সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও সম্বংশজ হইয়াও জানিয়া শুনিয়া সরকারী আইন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মঘট শান্ত হয়, সে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট তিন পাউণ্ড কর রহিত করিবার পরামর্শ করিবেন, ইহা অসম্ভব। মিঃ গান্ধি আপনার উপদেশ দ্বারা ভারতীয় প্রজাকে কষ্টে পাতিত করিতেছেন। আমি ভারতীয় মজুরগণকে পরামর্শ দিতেছি যে তাহারা গান্ধির কথা না শুনিয়া যেন কার্য্যে পুনঃ প্রবেশ করে। আইন ভঙ্গ করার অপরাধে মিঃ গান্ধির মত উচ্চ বংশীয়কে দণ্ড প্রদান করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইতেছে, ইহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমার কর্ত্তব্যের খাতিরে মিঃ গান্ধিকে ৬০ পাউণ্ড জরিমানা (৯০০ টাকা) অথবা ৯ মাসের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করিলাম।" মিঃ গান্ধি স্পষ্ট ও শান্ত স্বরে বলিলেন আমি জেলে গমন পছন্দ করিতেছি। গান্ধিকে দর্শন করিবার জন্য আদালতের বাহিরে ভারতীয়গণের একটি বৃহৎ দল একত্রিত হয়। সিপাহী অতিশয় চতুরতার সহিত তাঁহাকে জেলের মধ্যে লইয়া যায়। মিঃ গোডফ্রে জেলের মধ্যে গিয়া গান্ধিকে দর্শন করেন। তিনি আসিয়া বলেন যে গান্ধি অতিশয় আনন্দে রহিয়াছেন আর ধর্ম্মঘটকারী ভ্রাতাগণকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত না ৩ পাউণ্ড কর রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বজায় রাখিবে। ১৩ই নভেম্বর তারিখে মিঃ গান্ধিকে ভাণ্ডী হইতে বাল্‌করষ্টে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহার উপর অনধিকারী লোকগণকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনীত হয়। মিঃ গান্ধিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তিন মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেন। সর্ব্বসমেত এক বৎসরের জন্য তাঁহার কারাবাস ধার্য্য হয়।

মিঃ হেনরী পোলকের জেল

মিঃ গান্ধি যখন বাল্‌করষ্টে গ্রেপ্তার হন তখন মিঃ পোলক কিছু আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। তিনি গান্ধির সেনার পরিচালনের ভার নিজে গ্রহণ করেন। এসিয়াটিক রেজিষ্ট্রার মিঃ চিমনী গ্রেলীংষ্টাডের নিকট ভারতীয় দলকে গ্রেপ্তার করিয়া নেটালে প্রেরণ করিতে চাহেন। তিনি দো-ভাষীর দ্বারা ভারতীয়গণকে জিজ্ঞাসা করেন যে "তোমাদের নিকট ট্রান্সভালের সনন্দ আছে কি না? তাহারা উত্তর দেয় যে আমাদের নিকট সনন্দ নাই। মিঃ চিমনী সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া নেটালের সীমানা পার করিবার আদেশ দেন। ভারতীয় মজুরগণ বলে যে, আমাদের নেতা গান্ধি আমাদিগকে ট্রান্সভালে যাইবার আদেশ করিয়াছেন, আমরা অন্য কাহারও আদেশের অপেক্ষা রাখিনা, এই বলিয়া মজুরগণ চলিতে আরম্ভ করে। মিঃ পোলক দৌড়িয়া উক্ত দলের সামনে যান এবং তাহাদিগকে বলেন যে, মিঃ গান্ধি তোমাদিগকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। গান্ধির আদেশ অবগত হইয়া সকলে শান্তির সহিত রেল গাড়ীতে বসিয়া চার্লিষ্টনে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে গভর্ণমেণ্টের সেনা ও খনির শ্বেতাঙ্গ মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিগণের পাহারার অধীনে মজুরগণ খনিতে কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হয়।

ইহার পূর্ব্বে তাহারা কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ভারতীয়গণের পূর্ণহিতৈষী ইউরোপীয়ান মিঃ পোলকও গ্রেপ্তার হন। তাঁহার উপর আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হয়। মিঃ পোলক, মিঃ গান্ধি ও কেলনবেককে সাক্ষী মানেন। মিঃ গান্ধি সাক্ষীতে বলেন যে, মিঃ পোলক ভারতবর্ষ যাইবার সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার জন্য আসিয়াছিলেন এবং তিনি শীঘ্রই দরবন হইতে ভারতবর্ষ রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যদি আমাকে গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার না করিতেন, তাহা হইলে মিঃ পোলক শীঘ্রই দরবনে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু আমি গ্রেপ্তার হওয়াতে তিনি ভারতীয় দলকে পরিচালিত করিবার ভারগ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্টের উকীল মিঃ পোলককে কঠোর কারাদণ্ড দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করেন। মিঃ পোলক আপনার দোষ স্বীকার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, যদি তুমি ভারতীয়গণের গণ্ডগোলে যোগ প্রদান না কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। মিঃ পোলক উত্তর করেন, 'আমি সত্যের পক্ষপাতী ও অন্যায়ের পরম শত্রু; এজন্য ইউরোপীয়ান হইয়াও ভারতবাসীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে।' ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পোলককে তিন মাসের সহজ কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মিঃ কেলনবেকের জেল

সত্যাগ্রহিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়ান বন্ধু মিঃ কেলনবেককেও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন। তাঁহার উপর অনধিকারী ব্যক্তি ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। মিঃ কেলনবেক আপনার জবানবন্দীতে বলেন, "বহুদিন হইতে আমি লোকনায়ক গান্ধির বন্ধু; এজন্য ভারতীয়গণের কষ্ট আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। গভর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, ইহাও আমি জানি। ভারতীয় জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য এক সত্যাগ্রহের সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। মহাত্মা টলষ্টয়ের অনুগামী হওয়াতে, সত্যাগ্রহের উপর আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিয়াছে। আমি বিচারপতিকে জানাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের আইনের প্রতিকূলে সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে আমি নিরন্তর যোগ প্রদান করিতে থাকিব। এইরূপ করিয়া অতিশয় ভীতিজনক একটি প্রশ্নের নির্ণয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রজার সাহায্য করিতেছি, ইহাই আমার ধারণা।" গভর্ণমেণ্টের উকিল, মিঃ কেলনবেককে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেলনবেককে ৩ মাসের সহজ কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মেরিৎসবর্গের জেলে উপবাস

সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে মেরিৎসবর্গের সুবৃহৎ জেলে রাখা হয়। তথায় তাঁহারা বিশেষ জন্য জেল কর্ম্মচারীর নিকট বারম্বার প্রার্থনা করেন। প্রাতঃকালে আট আউন্স মকয়ের ছাতুয়া, (যাহা কাফিরিদিগকে দেওয়া হয়) দ্বিপ্রহরে ৮ আউন্স চাউলের ভাত, চারি আউন্স বিনের দাল, দুই আউন্স তরকারি ও সন্ধ্যার সময় ৬আউন্স ওজন রুটি এবং ৩ আউন্স মকয়ের ছাতুয়া খাইতে দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কয়েদিগণের পক্ষে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে ভারতীয়গণের এই খোরাক। যে

সময় সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ ঘিয়ের জন্য বলেন, তখন তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বলা হয় যে, ছয় মাস কিম্বা তদধিক সময়ের কয়েদীকে সপ্তাহে তিন দিন মাত্র ঘি দিবার নিয়ম আছে। অতএব তোমাদের ঘি পাওয়া তো কঠিনই বরং একেবারে অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন। ১০ই নভেম্বর সোমবার হইতে সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া উপবাস আরম্ভ করেন যে, যে পর্য্যন্ত না ঘি দেওয়া হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা আহার করিবেন না। সোমবারে আর ৪০ জন সত্যাগ্রহী কয়েদী উপবাস করেন। ঐ দিন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমুদয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে পাথর ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরণ করেন। ক্ষুধার জ্বালায় ইহারা নিশ্চয় ভোজন করিবেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে এই রূপ ধারণা হয়। সারাদিন ধরিয়া সকলে পাথর ভাঙ্গেন। সন্ধ্যার সময় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোকুলদাস গান্ধি মিঃ মণিলাল গান্ধি, মিঃ প্রাজজীদেশাই, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মেঢ়, মিঃ রাওজী ভাই পটেল ও ভবানীদয়াল এই ছয় জন সত্যাগ্রহীকে আন্দোলনের নেতা বলিয়া আলাদা একটি গৃহে বন্ধ করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট সকলকে নানারূপ তিরস্কার করা হয়। তিরস্কার ও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপবাস রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় দিন সমস্ত উপবাসী সত্যাগ্রহীকে পুনরায় পাথর ভাঙ্গাইতে পাঠান হয়। উপরোক্ত ছয়জনকে পৃথক পৃথক পিঞ্জরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে লাগান হয়। ইতিমধ্যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেকবার তথায় আসিয়া এই ছয় জন নেতাকে ধমকাইয়া বলেন যে তোমাদের কু-মতলবপূর্ণ উপদেশের জন্য ছোট ছোট ছেলেরা না খাইয়া মরিয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সত্যাগ্রহিগণ বলেন যে, আমরা আপনাকে কোন কষ্ট প্রদান করিতেছি না, নিজেরাই কষ্ট ভোগ করিতেছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া এ ছয় জন সত্যাগ্রহীকে ডাকিয়া খুব তিরস্কার করেন এবং বলেন যে যদি তোমরা এই আন্দোলন পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমাদের কয়েদের মিয়াদ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। আজ তোমরা ঘি চাহিতেছ, কাল হয় তো দুধ চাহিবে, পরশু ফল চাহিবে, তারপর হয় তো অন্য কোন জিনিস চাহিবে; তোমাদিগকে এই সব জিনিস প্রদান করিতে গভর্ণমেণ্ট অসমর্থ। যদি তোমাদের ঘি, দুধ খাইবার ইচ্ছা ছিল তবে ঘরে থাক নাই কেন? জেলে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? সত্যাগ্রহীরা বলেন, যখন কাফ্রিরি কয়েদিগণকে প্রত্যহ এক আউন্স করিয়া চর্ব্বি দেওয়া হয়, তখন সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে কেন ঘি দেওয়া হইবে না? যদি আপনি কয়েদের মিয়াদ বাড়াইবার অনুকম্পা করেন তাহা হইলে আপনার প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইব। আমরা যে রোজ রোজ নূতন জিনিস প্রার্থনা করিব ইহা একেবারে মিথ্যা। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে ঘি দেওয়া হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা উপবাস করিব। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যদি তোমরা সব মরিয়া যাও তবে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার জন্য জমির অভাব হইবে না। এই কথা বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া যান। এ দিকে উপবাসীরা আপনাদের উপবাস বজায় রাখেন।

আজ বুধবার দিন। সত্যাগ্রহীদিগের

মুখের উপর অনশনের কাতরতা-কালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, জেলের কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। ভবানীদয়াল আপনার কুঠরীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েকদিবস তাঁহার চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে; অন্য কয়েকজন সত্যাগ্রহীও উপবাসের জন্য কাতর হওয়াতে হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছে। মিঃ রামদাস গান্ধি, রেঙ্গাসামর নোচা, শিবপূজন, বক্সি প্রভৃতি অনেক যুবক হাঁসপাতালে আসিয়াছেন, জেলের দৃশ্য ভয়ঙ্কর হইয়াছে! এই সংবাদ বাহিরে প্রচার হইবামাত্র মেরিৎসবর্গের ভারতীয়গণ একটি সভা করিয়া রাজস্ব সচিবের নিকট এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করেন যে, সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে ঘি প্রদান করিবার আদেশ করা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কারাগারের কর্ম্মচারিগণ গভর্ণমেণ্টকে এই ভয়ানক আন্দোলনের খবর প্রদান করেন। বুধবার সন্ধ্যার সময় সমস্ত উপবাসী কয়েদিগণকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া রাজস্ব সচিবের তার পড়িয়া শুনান হয়, "যদিও তিন মাসের কয়েদিগণকে ঘি দিবার নিয়ম নাই এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতি অনুসারেই ভারতীয় কয়েদিগণের আহার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথাপি গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া কেবল সত্যাগ্রহী কয়েদীর জন্য প্রত্যহ এক আউন্স করিয়া ঘি দিতে স্বীকৃত হইতেছেন। আশা করি ইহাতেই সত্যাগ্রহিগণ সন্তুষ্ট হইবেন। অবশেষে সত্যাগ্রহিগণ আহার করিতে আরম্ভ করেন।

নর্থকোটে ধর্ম্মঘট

ধর্ম্মঘটের প্রভাব ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। নর্থকোটে ধর্ম্মঘট ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৩ই নভেম্বরের "নেটাল এডভার্টাইজার" পত্রে লিখিত হয় যে, জার্মণী ও বেকলেম এই উভয় স্থানের ধর্ম্মঘটকারীদের উপর, বন্দুক, পিস্তল ও বড়লাঠিধারী সিপাহিগণ আক্রমণ করে ও খুব প্রহার করে। তাহাদিগকে জোর করিয়া কার্য্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য সিপাহীরা চেষ্টা করে। "নেটাল এডভার্টাইজার" এই লড়াইকে "ফ্রেঞ্চ ফলেটের" ময়দানের লড়াই নামে অভিহিত করেন। ইহাদের এই অপরাধ যে, বেকলমে যাইয়া ইহারা আপনার স্বদেশবাসীকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছিল। ইহাদের হাত হইতে আগেই লাঠি কাড়িয়া লওয়া হয়। ১১ই নভেম্বর চিনির কারখানার প্রায় দুই হাজার মজুর ধর্ম্মঘট করে। যে সকল শ্বেতাঙ্গের অধীনে ২০।৫০ জন মজুর কাজ করিত তাহারাও কাজ ছাড়িয়া দেয়। হোটেল ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কার্য্যালয়ের ভারতীয় মজুরগণও ধর্ম্মঘট করে। অনেকে 'চাক সক্কাল ও টেঙ্গরের' মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করে। ১১ টার সময় অশ্বারোহী কাফির সিপাহীদল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা গ্রামে গ্রামে ও কুঠিতে কুঠিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মজুরগণের মধ্যে অতিশয় ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১৪ই নভেম্বর টোংগাটের ধর্ম্মঘট অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে। মারপিট চলিতে থাকে, তাহাতে কয়েকজন লোকও আহত হয়। ছয় জন ভারতীয়কে কাফির সিপাহিগণ তাদেঁ। (কাফিরি চন্দ্রাস্ত্র বিশেষ) দ্বারা আঘাত করে। ভফ্‌সরোড শহরের কুঠির মজুরগণ কাজ ছাড়িয়া দেয়, যে দুই চারিজন বেশশক্র কাজ করিতেছিল তাহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ দ্বারা

কেবল ১ দিনের খোরাক দিতে চাহে, কিন্তু উহা লইতে তাহারা অস্বীকার করে। তখন নিরুপায় হইয়া সাহেবকে এক সপ্তাহের খোরাক দিতে হয়। বেরুলমে দলবদ্ধ মজুর গণকে কুঠির স্বত্বাধিকারী কুঠিতে ফিরাইয়া লইতে চাহিতেছিলেন, এজন্য তিনি ভারতীয় নেতাগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে"র পক্ষ হইতে মিঃ সোরাবজী পারসী প্রভৃতি মহোদয়গণ আসিয়া মজুরদিগকে বুঝান যে, তোমরা আপন আপন গৃহে যাও, তোমাদিগকে কাজ করিতে হইবে না। খেতাঙ্গ মালিকের নিকট হইতে তোমরা খোরাক পাইবে। সিপাহিগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তামাসা দেখিতেছিল, তাহাদের পক্ষে ভারতীয় নেতাগণের সাহায্য ব্যতিরেকে মজুরগণকে কুঠিতে ফিরাইয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তারমোও হোটেলের সাম্নে ভারতীয় মজুর ও সিপাহীদের মধ্যে মারপিট হয়। এই লড়ায়ে ৮ জন আহত ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। এই দুর্ঘটনার জন্য সকলে খুব আন্দোলন করে। খেতাঙ্গগণ নানা প্রকার বুঝাইলেও মজুরগণ বলে যে, যে পর্য্যন্ত আমাদের নেতাগণকে জেল হইতে মুক্ত না করা হয় এবং ৩ পাউণ্ড কর রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা কখনই কার্য্যে যোগ দিব না। ১৪ই নভেম্বর তারিখে মাউণ্টএজকোম্বে প্রায় ২০০০ মজুর ধর্ম্মঘট করে। মিঃ কেম্পবল বলেন যে, এই সকল লোক শান্ত ও সরল স্বভাব আর ইহাদের ব্যবহার অতি শয় সত্যতাব্যঞ্জক। তাহারা বলে যে, আমরা মালিকের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কাজ ছাড়িয়া দিই নাই; প্রত্যুত আপনার জননী জন্মভূমির গৌরবের জন্য এই আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করিয়াছি। টোংগাটের চারিধারে প্রায় সমস্ত কুঠিই বন্ধ হয়। মিঃ এই ধর্ম্মঘট-কারী মজুরদিগকে কার্য্যে যোগ দিবার জন্য নানারূপ সমস্যান কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই।

ধর্ম্মঘটের দৃঢ়তা

এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় যে, ভারতীয় মজুরগণকে ভয় দেখাইয়া কাজ পরিত্যাগ করান হইতেছে। ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা জেনেরল স্মাট্‌সের একটি বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যাইবে। লমর্সীর চারিধারে কতিপয় মজুর আপনার স্বদেশবাসীর ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে, এই খবর পাইয়া জেনেরল স্মাট্‌স তথায় গমন করেন ও দো-ভাষীর দ্বারা মজুরগণকে বুঝান যে, যদি তোমরা কাজ করিতে রাজী হও, তবে গভর্ণমেণ্ট তোমাদের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার লইবেন। কিছুক্ষণ পরে মজুরগণ উত্তর দেয় যে, আমাদের নেতা গান্ধী আমাদিগকে নিজের প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যদি পুলিশের ইচ্ছা হয়, তো আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা কখনই কার্য্যে যোগদান করিব না। তাহাদের এই সকল বাক্য শুনিয়া জেনেরল স্মাট্‌স ফিরিয়া আসেন। ১৫ই নভেম্বর সংবাদ প্রচারিত হয় যে, খেতাঙ্গ মালিকগণ আপনাদের মজুর-গণকে খোরাক দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা জানিবার জন্য "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে"র একজন প্রতিনিধি বেরুলমে গমন করিয়া এই খবরের সত্যতা অবগত হন। সিপাহী-গণ মজুরদিগকে বাহিরে যাইতে না দেওয়ায় তাহারা অনশনে দিনাতিপাত করিতে থাকে। "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন"

ঔপ্ত গভর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাম করেন যে, আমাদের স্বদেশবাসী ইক্ষুর কুঠিতে না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছে, এজন্য তাহাদিগকে খোরাক প্রদান করা এসোসিয়েসন আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহার উত্তরে গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, জেনেরল স্মাটসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনারা ইহার বন্দোবস্ত করুন। এই খবর পাইয়াই মিঃ অধীনারডু, মিঃ দালবাহাদুর সিংহ, মিঃ সোরাবজী, মিঃ সরাফ, মিঃ মুনা, মিঃ উধব কাবজী প্রভৃতি, কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবককে সঙ্গে লইয়া কুঠিতে গমন করেন ও খোরাক দিতে আরম্ভ করেন। স্বেচ্ছা সেবকগণ মজুরগণের সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাদের দৃঢ়তা ও আনন্দের ভাব প্রশংসার বিষয়। ১৬ই নভেম্বর মাউণ্ট এডকোম্বে সিপাহী ও মজুরগণের মধ্যে পরস্পর বাধা হয়। ইহার কারণ এই যে, কয়েকজন ভারতবাসী ষ্টেট ম্যানেজারের গৃহে যাইয়া মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে থাকেন। এই হেতু সিপাহিগণকে তথায় আনয়ন করা হয়। সিপাহী ও ভারতীয়গণের মধ্যে বচসা হইতে হইতে বাধা আরম্ভ হয়। ইহাতে কয়েকজন ভারতবাসী ও কয়েকজন সিপাহী আহত হয়। ঐ দিন মাউণ্ট এডকোম্বের ইক্ষুর জমিতে আগুন লাগে। মিঃ কেম্বল ভারতীয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সময় প্রায় ২০০০ ভারতবাসী যাইয়া আগুন নিবাইয়া দেয়। জেনেরল স্মাটস তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ভারতীয় নেতাগণকে কুঠিতে যাইবার জন্য আদেশ করেন। ১৭ই নভেম্বর দরবনে অসাধারণ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভারতীয় ইক্ষুর কাজ ছাড়িয়া দেয়, দলে দলে মজুরগণ রাস্তায় বেড়াইতে থাকে রেলওয়ে কর্পোরেশন ও চিনির কারখানার মজুরগণ ধর্ম্মঘট করে। মেথরগণ কাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে কর্ম্মচারীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়েন। কাহাকেও কার্য্যে ফিরাইয়া লইবার আশা ছিল না। হাঁসপাতালের অন্যান্য "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে"র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক মজুরকে কার্য্যে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহারা কাজ করিতে রাজী হয় না, বরং আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর সুদৃঢ় করিতে থাকে। রেল, দিয়াশলাই, কারখানা ও ছাপাখানার চাকরগণ সকলেই ধর্ম্মঘট করে। ঐ দিন দরবনে একটি বৃহৎ সভা হয়, মিঃ পারথ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাতে প্রায় ৫০০০ ভারতবাসী সম্মিলিত হয়। মাননীয় গোখলের তার পাঠ করিয়া শুনান হয়। তারে লিখিত হইয়াছিল—সমুদায় ভারতবাসী, প্রবাসী ভ্রাতৃগণের কষ্টদায়ক সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন এবং আপনাদের আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ রামঅবতার লরবর্তী হিন্দিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ ক্রীষ্টোফর, মোটোর প্রধান লাইন হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ভারতীয় মজুরগণের দশা সম্বন্ধে হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইনি বলেন চাবুকের দ্বারা প্রহার করিয়া এক্ষণে মজুরগণকে কার্য্যে পাঠান হইতেছে। পরিশেষে উপযুক্ত ভারত সন্তান মিঃ গান্ধিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই প্রকার মেরিৎসবর্গ, জোহান্সবর্গ, কিম্বর্লী ডেল গোয়াবে প্রভৃতি নগরে ভারতবাসিগণের সার্ব্বজনিক সভা হয়।

ধর্ম্মঘটকারীর উপর অত্যাচার

ভারতীয় ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে পাটনী নাম্নী একজন স্ত্রীলোক আপনার দুঃখের কথা ১৪ই নভেম্বর তারিখে এইরূপ প্রকাশ করে—"আমার স্বামী দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে দ্বিতীয়বার সর্ত্তবদ্ধ মজুরীর পাট্টা লিখিয়া দিয়া কাজ করিতে থাকেন। তিনিও অপর ধর্ম্মঘটকারীদের মত কাজ ছাড়িয়া দেন। ১১ই তারিখে আমার স্বামীকে পুনরায় কার্য্যে লইয়া আসা হয়। কম্পাউণ্ড ম্যানেজার বলেন, যে পর্য্যন্ত না কার্য্যে যোগদান কর সে পর্য্যন্ত খোরাক বন্ধ থাকিবে। দ্বিতীয় দিন আমার সামনে খনির ম্যানেজার, আমার স্বামী ও অন্যান্য মজুরকে চাবুক দ্বারা প্রহার করেন এবং জোর করিয়া কার্য্যে লইয়া যান। ঐ দিন তাঁহাদিগকে সামান্য রুটি ছাড়া আর কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই। ১৩ই তারিখে আমার স্বামী কাজ করিতে অস্বীকার করেন, এজন্য তাঁহাকে রীতিমত চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। অন্যান্য মজুরগণও জুতা, লাথি ও বেতের দ্বারা প্রহৃত হয়। সকলকে জোর করিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে পাঠান হয়। কয়েকজনকে হাতকড়ি দিয়া কাজে লইয়া যাওয়া হয়। রবিবার পর্য্যন্ত মজুরগণকে আধপেটা খাইতে দেওয়া হয়। খনির চারিধারে গোরা সিপাহিগণ বন্দুক লইয়া পাহারা দিতে থাকে। উহারা মজুরগণকে ধমক দিয়া বলে যে, যদি তোমরা কাজ ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে যাও তবে তোমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।

সন্ন্যাসী নামক একজন ভারতীয় মজুর ১৫ই নভেম্বর তারিখে আপনার দুঃখ পূর্ণ কাহিনী এইরূপ বর্ণন করেন। "ভাণ্ডা কোল কোম্পানীতে আমি দ্বিতীয়বার সর্ত্তবদ্ধ মজুরী করিবার পাট্টা লিখিয়া দিই। কিছুদিন আগেই এই পাট্টার মিয়াদ শেষ হইয়া যায়। এই সময় আমি 'ধরনদারত' কলিয়ারীতে কাজ করিতাম। ৩ পাউণ্ড করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আমি কুচের লাম্বিল হই। ১০ই তারিখে আমাকে ও আর কয়েকজন সঙ্গীকে ডেন হাউজারের সামনে গ্রেপ্তার করা হয়। কোন রকমে তথায় রাত্রি অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয় দিন কাহাকেও খাইতে দেওয়া হয় না। আমরা কম্পাউণ্ড ম্যানেজারের নিকট খাবার প্রার্থনা করি, তিনি বলেন, যে পর্য্যন্ত না তোমরা কার্য্যে যোগদান করিবে সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইবে না। তিনি আমাদিগকে ভাণ্ডা যাইবার জন্য আদেশ করায়, আমরা ভাণ্ডাদিকে অগ্রসর হইতে থাকি; এমন সময় কয়েকজন সিপাহী, শ্বেতাঙ্গ মজুর ও কাফিরিকে সঙ্গে লইয়া, ম্যানেজার আমাদের সামনে হাজির হন। ও চাবুকের দ্বারা মারিতে মারিতে পশ্চাতে হটাইয়া লইয়া যান। চেম্পানী নাম্নী একজন ভারতীয় মহিলা চাবুকের প্রহারে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয়। বিহারী নামক একজন মজুরের স্ত্রীকে অতিরিক্ত প্রহার করা হয়। ১২ই নভেম্বর ভাণ্ডার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্রোশ, সে-তাথীকে সঙ্গে লইয়া খনিতে উপস্থিত হন। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হয়। বিহারীর স্ত্রীও ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলেন, যদি তোমরা কাজ করিতে গররাজি হও, তাহা হইলে এই স্ত্রীলোকগণকে যেরূপ মারা হইয়াছে, সেইরূপ

তোমাদের সকলকে মারা হইবে। আমি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করি, যে পর্য্যন্ত না ৩ পাউণ্ড কর রহিত হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা কাজ করিতে পারিব না। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা শুনিয়া রাগিয়া উঠেন এবং বলেন যে, কম্পাউণ্ডকে জেলে পরিণত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদি তোমরা কাজ না কর তাহা হইলে কয়েদ করিয়া এই খনিতে কাজ করিবার জন্য পাঠান হইবে। কাজ না করিলে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে ও চাবুকের প্রহার খাইবে। যদি কম্পাউণ্ড ছাড়িয়া বাহিরে যাও তবে গুলি করিয়া মারা হইবে। আমরা কয়েকজন সঙ্গী আপনাদের শরীরের প্রহার চিহ্ন দেখাইয়া বলেন যে, কাফির সিপাহী, লাঠি, ডাণ্ডা, গদা ও তীর লইয়া এবং গোরা সিপাহী বন্দুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহারা আমাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিতেছে, আমাদের জন্য আদালতের দরজা বন্ধ রহিয়াছে, খনির মালিকের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেবাভিক্ষু জীবন।

ষোড়শ শতাব্দীর পোল-সাহিত্যিকমণ্ডল

তখনও পোলাণ্ডের পূর্ব্বাকাশে ভবিষ্যতের গৌরব সূর্য্যের প্রথম কিরণ দেখা যায় নাই, তখনও জিয়েনায় উষ্ণীয় বা তুর্কীদিগের পশ্চাদ্ধাবনের কোন ইঙ্গিতই উপলব্ধি হয় নাই। কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিগণের বিলাসিতায় পোল সমাজ ক্রমেই বিনাশের পঙ্কে ডুবিতেছিল।

আমরা এইখানে পোলাণ্ডের সাহিত্য চর্চ্চার প্রথম সময় হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব পোলাণ্ড বিশেষভাবে সাহিত্য জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মাতৃভাষার সেবকগণ কতটা প্রাণ দিয়া পোলাণ্ডকে তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আজকার দিনে সভ্যজগতের সাহিত্যিকদিগের বৈঠকে পোলাণ্ডের নাম গন্ধ বেশী রকম না থাকিতে পারে, আজ হয়ত সে রুশ-জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ভয়ে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখাইতে পারিতেছে না, প্রাণ দিয়া দান করার শক্তি তাহার নাই কিন্তু যে জাতি আজও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার শক্তি কোথায়, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। সাহিত্য জাতিমাত্রেরই ভাব ও ভাষার অবিনশ্বর প্রহরী। তাই জাতীয় সাহিত্যের ছেঁড়া পাতাও জাতীয় পতাকার চেয়ে অধিকতর আদরণীয়। বিভিন্ন সময়ের জাতীয় চরিত্র, শিক্ষাপ্রচার, সাহিত্য-সেবা প্রভৃতির উজ্জ্বল ও ক্ষীণালোক সাহিত্যের বুকেই অঙ্কিত থাকিয়া যায়।

প্রত্যেক জাতির পক্ষেই একটা সময় আসে যখন সাহিত্যের উদারতা, ভাষার গাম্ভীর্য্য শিল্প-বিজ্ঞানের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনকে হিল্লোলিত করিতে থাকে। তখন প্রত্যেক পদে পদে আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই উৎসাহ-উদ্দীপনার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ক্ষণিক অসারতার পরিচয়েই জাতির অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া ধারণা জন্মে, জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়; এবং

এইরূপ ভাবের প্রেরণা আসে বলিয়াই জাতি জাতি বলিয়া সমগ্রে পরিচিত হয় তাহার মহিমা ইতিহাসকে চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখে।

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১৫৪১-১৬০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পোল-সাহিত্যের গৌরব যুগ। এই সময়ের আমাদের দেশের অবস্থাটাও একটু জানিয়া লওয়া ভাল, নতুবা ইতিহাস আলোচনা স্পষ্ট হইবে না। সম্রাট আকবর ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং নানা-প্রকারে শিক্ষাপ্রচার এই যুগের বিশেষত্ব। এক কথায়, রাষ্ট্রনীতি, শাসনপদ্ধতি, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে যে কোন দেশকে অতিক্রম করিতে পারিত। সাহিত্যে সংরক্ষণ-নীতি এই যুগেই বিশেষ বলবতী হয়। বাঙ্গলা দেশ তখন চৈতন্যপ্রেমে ভরপুর। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি ভক্ত ও ভাবুক কবিগণ তখন বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন সাহিত্য-মন্দির গড়িতে ছিলেন। আর পোল-সাহিত্য মন্দিরে দেখিতে পাই—কোপারনিকাস্, সাইমোনোইচ জোমার, অরজেচোস্কি, ক্যারগা, গোরনিস্কি এবং আরও অনেক সাহিত্যসেবী ছিলেন। ইহাদের দ্বারা পোল-সাহিত্য উন্নত হইলেও নিকোলাস রেজ ও জান কোচানোস্কির নামও উল্লেখ-যোগ্য।

কোপারনিকাস

১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোপার নিকাসের যুগ বা পোল-সাহিত্যের অভ্যুদয় কাল। তিনি রোমনগরীতে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তৎরচিত বিখ্যাত গ্রন্থে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির জ্যোতিষ-চর্চ্চার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। কোপার-নিকাস্ পোলাণ্ডের সন্তান হইলেও, সাধারণের কাছে রোমের অধিবাসী বলিয়াই পরিচিত। অসময়ে পোল-সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল তাই পোলগণ তাঁহার প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সমাধির উপর কয়েক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়াছে।

নিকোলাস রেজ

১৫০৫—১৫৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ইনি পোল কবিমণ্ডলের আদি। এই সকল সাহিত্যিকদিগের মধ্যে রেণাসাঁসের (নব-জীবনের) পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। পোল-বাল্মীকির গন্ধে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ খানির নাম "মহাপুরুষগণের জীবনী।" তিনি "কোমেডি ইন্ ইজিপ্ট" নামক নাট্য-গ্রন্থের রচয়িতা।

জান কোচানোস্কি

১৫৩০-১৫৮৪খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। তিনি পোল-কবি-জগতের যুবরাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া সহোদর ভ্রাতা, পিতৃব্য পুত্র (cousin) ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কবিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা সকলেই কোন না কোন গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর মধ্যে, বিদার "গেম অব চেচ" এর স্বাধীন অনুবাদ প্রসিদ্ধ এবং "ট্র্যাভার্ড অব্ প্রুশিয়," নামক গ্রন্থে, পোলরাজের নিকট ব্রাসডেন্‌বার্গের আলবার্টের বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। "The despatch of the greek Ambassador" (গ্রীক রাজদূতের প্রত্যাবর্ত্তন) নাম দিয়া ১২টী দৃশ্যের একখানি নাটক রচনা করেন। উহা পঞ্চপদী কবিতায় রচিত। নাটকখানির

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী নাটকের অনুরূপ কোরাসে রচিত বলিয়া ধারণা হয়। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বজন বিদিত রচনা "Treny" (ট্রেনি), তাঁহার কন্যা উৎসুলার মৃত্যু উপলক্ষে শোক কবিতা। তাঁহার পোল ভাষার রচনা ব্যতীত লাটিন ভাষায়ও অনেক শোক কাব্য আছে।

সাইমোনোইচ্

১৫৩৭-১৬২৯। গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতার রচয়িতা। সেইগুলি গ্রাম্য পোলচরিত্রের বিশুদ্ধির ইঙ্গিত করে বলিয়াই অধিক আদরণীয়। তাঁহার মেষপালক সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

বাইলোস্কি

প্রসিদ্ধ সমালোচক ছিলেন।

কাশিমির সারবিউস্কি

বিখ্যাত লাটিন কবি। পোপ তাঁহাকে লরেট (রাজকবি) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের পণ্ডিত সমাজে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট আদর আছে।

মার্টিন ক্রোমার

১৪১২-১৪৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। লাটিন ভাষায় পোলাণ্ডের ইতিহাস রচয়িতা। তিনি পোল ঐতিহাসিক মণ্ডলের যুবরাজ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইহার ধর্ম্মশিক্ষা ইটালীতেই লাভ হয়। ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুবরাজ সিগিস্মণ্ড অগাষ্টাসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন এবং যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করেন। ১৫৫২ অব্দে তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। সম্রাটের অনুমতিতে রাষ্ট্রের পূর্ব্ব লিখিত বিবরণী দেখিয়া একখানি বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে ১৫০৬ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ রাজা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্য্যন্ত পোল রাজকার্য্যের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। ক্রোমার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অপেক্ষা অনেকটা কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে একটা উচ্চ নামার ভাব ছিল এবং রচনা অতি সুন্দর ছিল। নিকটবর্ত্তী রাজ্য সমূহের রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কতকটা ঐতিহাসিক সমালোচকের ভাব ছিল। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের রচনা বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের রচনার উন্নতি সাধন করেন। ইহাকে বৃহদাকার ইতিহাস প্রণয়নের মূল বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের হোলিনশেড, বোহিমিয়ার হাজেক এবং পোলাণ্ডের ক্রোমার সমশ্রেণীভুক্ত। ইতিহাস ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য রচনাও আছে। পোলভাষায় তাঁহার সাহিত্যের কোনই আদর হয় নাই। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে ক্রোমারের দেহান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুইশত বৎসর পরে এক নূতন ভাবের ধর্ম্মপ্রচারক সুপণ্ডিত ক্রাসিস্কি সেইস্থল পূরণ করেন।

এণ্ড্রু মোদরজিউস্কি

১৬০৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও যুবরাজ সিগিসমণ্ডের সময়ের লোক। তিনি স্পষ্ট দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের আবশ্যক পরিবর্ত্তন বোধ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্তর দৃশ্য দেখাইলেন। হুসের পূর্ব্ব স্বাধীন ভাবের সঙ্গে শাসন প্রণালীর বিভিন্ন দিক, পোলসমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। রোমের ধর্ম্মযাজকের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া এংগ্লিকানদিগের মন্দিরের আদর্শে জাতীয় ধর্ম্মমন্দির স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পোলাণ্ডের দুর্দ্দিন লক্ষ্য করিয়া অসীম

ক্ষমতাপরায়ণ পোল কৃষকদিগের উপর প্রথম দৃষ্টি দেন, এবং ফৌজদারী আইনের উন্নতি করেন। তাঁহার সময়ে একজন কৃষককে স্বেচ্ছায় হত্যার জন্য কোন ভদ্রলোকের ১০ গ্রস্চেন (পোল-মুদ্রা) এবং একজন ইহুদীকে হত্যার জন্য দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হয়।

ষ্টেইনল ওরজেচোস্কি

উইটেনবার্গে শিক্ষালাভ করেন এবং সংস্কারের প্রণালী আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি লুথার ও মেলাঙ্কথনের শিষ্য হইয়াছিলেন।

তিনিও পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষার সংস্কারে ব্রতী ছিলেন।

এব্রাহাম বাউস্কি

লাটিন ভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৬০৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ৯ খণ্ডে ধর্ম্মযাজকদিগের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন।

ক্লোনোইচ্

পোল ও লাটিন ভাষায় কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। পোলাণ্ডের রাজধানী ক্রাকো ও ওয়ারসর মধ্যবর্ত্তী প্রবাহিতা বিষ্টুলা নদীর তীরদ্বয়ের একটী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন করিয়াছেন। ক্লোনোইচ্ এইরূপে খাল বিলের দৃশ্য লইয়া তাহার জন্মভূমির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সক্ষম ছিলেন। পোল কবিতার বিষয়গুলি সাধারণতঃ বৈদেশিক ভাব হইতেই গৃহীত।

পিটারস্কারগা

সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব এবং ভাবের আধিপত্য দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ার ধারা পোলাণ্ডে প্রথম প্রচার করেন। ঐক্যের একতার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন স্কারগা তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তাদিগের অন্যতম ছিলেন এবং একতা গঠনের জন্য ১৫৭৭ অব্দে পোলভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে তাহার ধর্ম্মোপদেশগুলিই বিশেষ আদরণীয়। তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্মীতা দ্বারাই বিচ্ছিন্ন পোল-সমাজ ভীষণ ধ্বংসের মুখ হইতে একত্রিত হইয়া প্রকৃত জাতীয়তার স্বর তুলিয়াছিল।

এই সময়ে ওসাসোস্কি এবং অন্যান্য কয়েকজন লাটিন ভাষায় ইতিহাস রচনা করেন। আলেকজাণ্ডার গগ্‌নিন্ যে ইতিহাস রচনা করেন তাহা রুশ ও পোল উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ষোড়শ শতাব্দীর পোলাণ্ড তাহার নিজের ভাষার লেখক দুই জন ঐতিহাসিকের জন্য গৌরবান্বিত। সুপণ্ডিত ষ্ট্রাইকোস্কি এবং মার্টিন বায়েলস্কি উক্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদ্বয়। মার্টিন বায়েলস্কি ১৪৯৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ষ্ট্রাইকোস্কি

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ধ্বংসাবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই শোক করিয়া বলিতেন পোলাণ্ড তাঁহার পোল-সভ্যতার নিম্নে সমাহিত রহিয়াছে। তিনি দ্রুত অবনতিশীল প্রাচীন পোল জাতীয়তার ধ্বংসাবশেষ আবার মহিমামণ্ডিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনাটী অতি উপাদেয় ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। হৃদয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিজ্ঞান শিক্ষাতে তাঁহার বড়ই অভাব ছিল, এবং তাঁহার সময়ের প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই এই অভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অতি প্রয়োজনীয় দুইটী গুণ ছিল—জ্ঞানানুরাগ ও শ্রমসুখবোধ। তিনি রুশ ও লিথুনিয়ান ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। লিথুনিয়া ও

লিভোনিয়া প্রদেশে ঘটিত যুদ্ধের ইতিহাস ও সমাধিভূমি বর্ণন করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিতেন। অধিকন্তু তিনি বহুসংখ্যক নগর ও ধর্ম্মমন্দির পরিভ্রমণ করেন। এক কথায় তিনিই প্রথম লিথুনিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদ্। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে উহা ১৫৮২ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেহত্যাগ করেন।

মার্টিন বায়েলস্কি

পোল ভাষায় প্রথম দেশীয় ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র জোয়াচিম ১৫৯৯ অব্দে দেহত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের ইতিহাস রচনায় পিতার সাহায্য করিতেন।

লিউক গোরনিস্কি

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি সিজিসমণ্ড অগাষ্টাসের দরবারের কার্য্যাবলীর বিবরণ পোল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি "পোল সম্রান্ত-পুরুষ" সম্বন্ধে যে উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন উহাই তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে, অবশ্য গ্রন্থখানি সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত একখানি ইটালীয় গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।—গোরনিস্কি নিম্ন লিখিত বিষয় তাঁহার রচনায় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ক্রাকোর নিকটে স্যামুয়েল ম্যাসিইয়োস্কির গ্রাম্যগৃহ, ক্রাকোর ধর্ম্মযাজক ও সভাপতির নিকট যে সকল সম্রান্ত ব্যক্তিসমাগত হইতেন তাঁহারা সকলেই উক্ত গৃহে একত্রিত হইতেন এবং ঐরূপ মিলিত হওয়া সেই সময়ের রীতি ছিল। তাঁহারা সময় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত একটী বিষয় ধরিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। যেমন, দরবারের প্রধান কর্ত্তার কি কি গুণে ভূষিত হওয়া উচিত? পালামত সকলেই অভিমত দিতেন এবং তাঁহাদের কথোপকথন পুস্তকের সূচির আকারে গঠিত হইত।

বারটোমন্ (বারথলোমিউ) প্যাপ্রোস্কি এই সময়ের একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ উহা পোল বীরত্বের ইতিহাস। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। ডুরোস্কি কর্ত্তৃক তাঁহার পোল ভাষার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়।

নিকোলাস সেপ জারজিনস্কি

১২৮১ খৃঃ অব্দে কিক্কিদবিদ্ ২০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পোলসাহিত্যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রচলনের জন্য প্রথম চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীকালে মিকাইউইস্ এবং স্যাসজিনস্কি কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করে।

জাতীয় ভাষায় অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির নামোল্লেখ না করিলেও সম্রাট তৃতীয় সিজিসমণ্ডের চিকিৎসক, ডাক্তার পেট্রিসি আরিষ্টটলের যে বিস্তীর্ণ কর্ম্মবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির অনুবাদ করেন উহা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে পোলাণ্ডে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পোল ভাষায় যথেষ্ট আলোচনার ফলে উহা ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষানিচয়ের সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর পোলাণ্ডে লাটিন ভাষার আলোচনা হইতে থাকিলেও পোলাণ্ডের হিতৈষী সন্তানগণ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া দেশকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রথমে পোলাণ্ডের সাহিত্য-সম্পদ লাটিন-ভাষার আবরণের ভিতরে ছিল কিন্তু ক্রমেই একটা জাতীয় প্রেরণা আসিয়া মাতৃভাষার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

জন্মভূমি-স্তোত্র

(১)

ওগো আমার জন্মভূমি,
কেগো জননী তুমি ?
পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে,
তীর্থময়ী দিঠে দিঠে,
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি,
পুরিত একার পিঠে,
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ শুধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

(২)

গঙ্গা যমুনা, সিন্ধু কাবেরী,
সরস্বতী গোদাবরী,
নর্ম্মদা আদি তীর্থ সলিলে,
পিতৃতর্পণ করি।
অন্তর বাহির শুদ্ধ মোদের
পূতবারিধারা পানে,
কোটী কলুষ, বিধৌত বিগত,
একদিন যে সন্ধানে।
পুণ্যময়ী তুমি জননী।
নহ শুধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

(৩)

তোমারি বক্ষে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে,
না করিলে পিণ্ডদান,
সুতের হয়না সার্থক জনম,
পিতার হয় না ত্রাণ,
কোন্ জাতি বল এমন করিয়া
মাটিরে করেছে পাঁটি,
মাটি নও মাগো, মাটি নও তুমি,
সত্যই তুমি মা—টী।
ওগো আমার জন্মভূমি,
কেগো জননী তুমি ?

(৪)

ইংরাজ ফরাসী ওলন্দাজ রুষ,
লাটিন্ মার্কিন্ গ্রীক্,
সুখের লালসে স্বদেশ ছাড়িয়া,
ছুটে যায় দশদিক্,
বিহরে চিরকালভরে,
যেথা পায় সুখভোগ,
যেখানে তাদের তৃপ্ত বাসনা,
সেখানে মনের যোগ ;
তোমারে ছাড়িয়া জননি মোদের
কোথাও ঘুচেনা শোক্,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা আমাদের
ইহলোক পরলোক ;
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ শুধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

(৫)

কোন্ দেশে আছে এমন জননী,
আমার যেমন তুমি,
ভুক্তি মুক্তি ভক্তিদায়িনী
ওগো মা জন্মভূমি,
যে দেশে আমার হউক জনম,
যে দেশেই আমি থাকি,
তুমিই আমার ত্রিবর্গদায়িনী,
তোমারে মা বলে ডাকি।
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ শুধু ধান্যময়ী-ভূমি ধরণী।

(৬)

সুখময়ী তুমি চিন্ময়ী তুমি,
ব্রহ্মময়ী তুমি মাগো,
জাগাযে সন্তানে অন্নে দৃষ্টিদানে,
অন্তরে বাহিরে জাগো,
হওমা স্বাধীনা, হওমা অধীনা,
দীনহীনা কিম্বা রাণী,
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
তোমারে মা ব'লে জানি।
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ শুধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

দেশীয় ভৈষজ্য গুণাবলী

তুলসীর উপকারিতা

পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবান মানবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য রোগনাশার্থে, মৃতসঞ্জীবনীতুল্য যে কত প্রকার উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু ইবানিং অনুসন্ধিৎসা ও যথারীতি পরীক্ষার অভাবে আমরা ঐ সকল মহোপকারী ভেষজ সমূহের গুণাবলীর অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন এখন আমাদের সামান্য একটু পীড়া হইলেই ডাক্তারের সহায়তার জন্য ব্যাকুল হইয়া রাশি রাশি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমাদের গৃহের পশ্চাদ্ভাগে বনে জঙ্গলে যে কত প্রকার অশেষ গুণশালী উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া স্বভাবে আবার আপনিই শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, দুঃখের বিষয় কেহই তাহার সন্ধান রাখেন না। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালি গৃহস্থের গৃহপীঠে যখন লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীগণ বিরাজ করিতেন তখন বাঙ্গালি এ চিরপ্রথমা উদ্ভিজ্জাদির গুণাবলী সম্যক্ অবগত ছিল। তখন কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হইত না। সংসারের শান্তিবিধায়িনী যোষিদ্বর্গ একটী সামান্য মুষ্টিযোগ বিনিয়োগবলে অনায়াসে সুকঠিন রোগ নিরাময় করিতেন।

"সে কালের বুড়োবুড়ি
জান্তো যত ওষুধ পাতা।
ষোল টাকা ভিজিটওলা
ডাক্তার সাহেব লাগেন কোথা॥"

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যাহাতে ভবিষ্যতে শিশু কোন প্রকার শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় আক্রান্ত না হয় তজ্জন্য একটু তুলসীপাতার রস ও মধু খাওয়াইয়া সাবধান হইতেন। শিশুর একমাস বয়ঃক্রম হইতেই সপ্তাহে দুইদিন মাতৃস্তন্যসহ "আসুই" সেবন করাইয়া নিদারুণ যকৃত রোগের (Infantile Fever) মূলোৎপাটন করিতেন। ফলে তখন এইরূপে বাঙ্গালির বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইত ও অপাপবিদ্ধ ভবিষ্যতে পিতামাতার আশা ভরসার স্থল শিশুকুল শ্বাসকাশ, যকৃত প্রদাহ বিকৃত বর্দ্ধন (Rickets) প্রভৃতি কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কৃতান্তকবলে নিক্ষিপ্ত হইত না। এখন আর বাঙ্গালির সে দিন নাই, এখন পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে শিক্ষিতা বাঙ্গালি গৃহস্থ কন্যা দৈহিক পরিশ্রম ও সাজসজ্জার অন্তরায় ঘটিবার আশঙ্কায় দেশীয় ভৈষজ্য সমূহের গুণাবলীর তরাসে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। তাহাতে আমাদের অশেষ কষ্টোপার্জ্জিত যে কত অর্থ নিরর্থক ব্যয়িত হয় তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না বা চিন্তা করিবার অবকাশ পান না। হিন্দু রমণীদিগকে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য-ঋষি প্রণীত সুবিহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষা না হওয়ার ফল ব্যতীত ইহাকে আর কি মনে করিতে পারি? নব্য সমাজ সংস্কারকগণ! এই অভাব প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি

পাইলেই শিক্ষিতা হয় না। সে শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিলেও অথবা তদ্দেশে শিক্ষিতার গর্ব্বিতা হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আধ্যাত্মিক সংস্কার সম্পন্ন এই হিন্দুর দেশে সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, পক্ষান্তরে তাহাতে সমাজের নানাবিধ অনিষ্টই ঘটাইয়া থাকে। অবশ্য আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি তবে যে হিন্দুর শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কর্ম্মই ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন করিতে হয়, সেই হিন্দুর দেশে তাহাদের কুলকন্যাগণের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ফলতঃ হিন্দু নারীর শিক্ষা দীক্ষাগুলি পাশ্চাত্য রীত্যানুযায়ী সম্পন্ন হওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। পাশ্চাত্য রীত্যানুযায়ী শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমাদের শান্তিময় সোণার সংসার যে চির অশান্তির একাধিপত্য দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে দেখিয়াও যে আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না ইহাই নিতান্ত বিস্ময় ও দুঃখের বিষয়।

যে সময়ে আমাদের মাতৃস্বরূপিণী গৃহলক্ষ্মীগণ আধুনিক দৃষ্টিতে অশিক্ষিতা ছিলেন, যখন তাঁহারা স্কুল কলেজে গিয়া পাশ্চাত্য রীতিতে গৃহিণীপনা শিক্ষা করিতে আদৌ অনভ্যস্ত ছিলেন তখন তাঁহারা স্কুল-কলেজে না গিয়াও গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও আদর্শ গৃহিণীরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেন—কি রূপে এই জ্বালাময় সংসার চিরশান্তির আগারে পরিণত হইতে পারে শত অভাব অনটন সত্ত্বেও প্রকৃত শান্তি সদাই সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদানে সমর্থ হইতে পারে তজ্জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। আর এখন আমাদের সুশিক্ষিতা গৃহিণীগণ কিরূপ সুখশান্তি প্রদানে সমর্থা, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যে দক্ষয়া" একথা এখন আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে।

যাউক যাহা বলিতে ছিলাম তাহাই বলি। এখন আমাদের যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে সকলকেই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। আমাদের চিকিৎসাকল্পে এখন যত অধিক টাকা ব্যয় হয় বোধ হয় আর কিছুতেই তত ব্যয় হয় না। এপক্ষে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দেশীয় গাছ গাছড়ার গুণাবলী জানিয়া রাখেন ও একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া, নভেল পড়া ও পরচর্চ্চার সময় একটু কমাইয়া স্থিরচিত্তে সেগুলি উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন ও স্বহস্তে সন্তানের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের অশেষ ক্লেশার্জ্জিত প্রচুর অর্থ বাঁচিয়া যায় ও শিশুসন্তানগণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে। কারণ এখন আমরা "আয়ার" প্রতি শিশু পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই। সুতরাং এখন সন্তান যে কতটুকু মাতৃস্নেহের অধিকারী তাহাই বিবেচ্য। এই জন্যই যে মাতা এখন সন্তানের পক্ষে ভার বোঝা রূপে প্রতীয়মান হয় বোধ হয় একথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ এখন আমাদের দেশে সুচিকিৎসকের যেরূপ অভাব তাহাতে প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীর দেশীয় গাছ গাছড়ার গুণাগুণ শিক্ষা করাই বিশেষ আবশ্যক। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, প্রত্যেক বিশ সহস্র নরনারীর চিকিৎসার জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তুলসীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। যদি একটীও বঙ্গ-

মহিলা এগুলি পরীক্ষা করেন এবং তাহার ফলাফল 'মুকুলে' প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে এবং শ্রম সফল জ্ঞান করিব ও বারান্তরে এইরূপ বহুতর মহাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ধন্য হইব।

তুলসীর পরিচয় বোধ হয় বঙ্গবাসীকে আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। যে গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ নাই সে গৃহ শ্মশান তুল্য ইহাই হিন্দুর ধারণা। তাই পুণ্যবতী হিন্দু রমণীগণ প্রাতঃকালে তুলসীমঞ্চ পরিমার্জ্জন দ্বারা ও সায়ংকালে ধূপ দীপ দানে তুলসীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সচন্দন তুলসীপত্র ব্যতিরেকে দেবতার পূজা হয় না, অশুচি শরীরে তুলসীবৃক্ষ স্পর্শে মহা পাপ হয় ইত্যাদি আমাদের শাস্ত্রে তুলসীর এইরূপ অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর নিকট তুলসীর স্বরূপ বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্‌গণও তুলসীর অশেষ গুণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধার্থে সিন্‌কোনা বৃক্ষ রোপণাপেক্ষা তুলসী রোপণ যে বিজ্ঞানসম্মত, একথা বিলাতী ডাক্তারগণও অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন।

এদেশে সাধারণতঃ চারি প্রকার তুলসী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণতুলসী, শ্বেততুলসী, বাবুই বা রামতুলসী ও গন্ধ বা দুলাল তুলসী। দুলাল তুলসী মরুবক নামেও প্রসিদ্ধ। চারি প্রকার তুলসীর মধ্যে দুলাল তুলসীর গন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। সাধারণতঃ শ্বেত, কৃষ্ণ ও বাবুই তুলসী ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাবুই তুলসীর বীজ ডোকমারি নামে অভিহিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তুলসী সম্বন্ধে বিবিধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ সকল তুলসীই কফ নিঃসারক, মূত্রকারক, পরাঙ্গপুষ্ট কীট নাশক, (Bacteria) বিষনাশক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মানাশক কফ, শ্বাস, কাস, কৃমি, বমি, কুষ্ঠ, মূত্রবিকার, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জীর্ণজ্বর, নাসারোগ, পার্শ্ব ও বক্ষোবেদনা, প্রভৃতি পীড়ায় তুলসীপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বা কফ রোগে তুলসীর সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুগণের সর্দ্দি কাসিতে তুলসী অমোঘ মহৌষধ। রোগের প্রথমাবস্থায় শ্বেত বা কৃষ্ণ তুলসীর রস ও আদার রস ১০-১৫ ফোঁটা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে সর্দ্দি কাসি তরল হইয়া যন্ত্রণার উপশম হয় এবং ভবিষ্যতের ঘুংড়ি কাসি, ব্রন্‌কাইটিস প্রভৃতি প্রাণান্তকর পীড়ার কবল হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

শিশুর ঘুংড়ি কাসিতে তুলসী পাতার রস, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম (শামুকের খোলে ময়ূরপুচ্ছ রাখিয়া শামুকটী প্রদীপের শিখায় ধরিলেই ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম হইয়া যায়) মধু সহ অল্পে অল্পে লেহন করাইলে এবং শিশুর কণ্ঠে, বক্ষে, পার্শ্বদেশে এবং হস্ত ও পদতলে ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈল মালিস করিয়া দিতে হয়।

শিশুর বাসী অন্নে তুলসী পাতার রস কালমেঘের রস একত্র সেবনীয়।

শিশুর কর্ণশূলে তুলসী পাতার রস, কার্পাস ফলের রস, অথবা পানের রস সহ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া ২।৩ ফোঁটা দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

বৃশ্চিক, তীমরুল, বোলতা বা কোন প্রকার বৈষিক পতঙ্গদষ্টস্থলে তুলসী পাতার রস লবণের সহিত লাগাইলে দংশন জ্বালার নিবৃত্তি হয়।

নৈষ্ঠিক নাসারোগে শ্বেত বা কৃষ্ণ তুলসীর রস ও বাসক পাতার রসের নস্য লইলে আরোগ্য হয়।

পীনসে (ozaena) শুষ্ক তুলসী পত্র চূর্ণ নস্যরূপে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

বাবুই তুলসীর রস আমাতিসার, কফরোগ প্রসবের পরবর্ত্তী তেদাল বেদনা ও ম্যালেরিয়া বা জীর্ণজ্বরে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

সর্দ্দির জন্য নাসারন্ধ্র ক্ষত ও নিঃশ্বাস রোধে বাবুই তুলসীর রস বা শীত কষায় নাসিকা মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা দিলে আরোগ্য হয়। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাই লাল দে মহাশয় এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখিয়াছি।

শুঁঠ, মরিচ, কৃষ্ণ তুলসী পত্র, কাল মেঘপত্র ও গুলঞ্চের চিনি সমভাগ একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক গুটিকাকারে সেবনে সবিরাম (Intermittant) ও অবিরাম (Remittant) জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

পেষিত তুলসী পত্র সহ পক্ক তৈলের নস্য গ্রহণে পূতিনাসাস্রাব (Elaistaxis) আরোগ্য হয় এবং কর্ণশূলে এই তৈল কয়েক বিন্দু দিলে কর্ণশূল তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

হক্করোগে কৃষ্ণ তুলসী পত্র লেবুর রস বা চূণের জল সহ মর্দ্দনে আরোগ্য হয়।

বাতরোগে (হস্তপদ স্ফীতিতে) রাম-তুলসীর রস "গুলে আরমানি" সহ প্রলেপ বিশেষ হিতকর।

রামতুলসী বীজ (তোকমারি) ভিজাইয়া সদ্যঃ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে (Gonorrhea) সেবনে যন্ত্রণার আশু শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রণ (ফোঁড়া) পাকাইবার জন্য তোকমারি পুলটিস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুলসী পাতার রস সেবনের ব্যবস্থা করিলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন ও ইহার গুণ-পনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন বলিয়া আমি তুলসীর সকল (Succus) প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। (তিনভাগ তুলসীপাতার রস ও একভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট একত্রে মিশাইয়া সপ্তাহ কাল রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে সকল প্রস্তুত হয়।) শিশুগণের সর্দ্দি কাসি ঘুংড়ি ও বাল্‌সা জ্বরে এই তুলসীর সকল ব্যবহার করিয়া আমি যে উপকার পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আমার বিশ্বাস কফ সংযুক্ত রোগে হোমিওপ্যাথিক ব্রাণ্ডিনিয়ার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের বাটীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে জানিয়া পল্লীর অনেকেই ঔষধ লইতে আসিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াই নিরাময় করিতাম। কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে আমার প্রস্তুতী টিকার ও সকল ব্যবহার করিয়া থাকি এবং কোন কোন স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধাপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দর্শনে আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি।

প্রায় দুই মাস কাল গত হইল পল্লীর কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোক ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় (Pneumonic) পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আইসে। রোগিণী প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। কিন্তু রোগ আরোগ্য না হইতেই অর্থাভাব বশতঃ তাহার আত্মীয়গণ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়েন। তাহার রোগ বিবরণ এইরূপ;—রোগিণীর বয়স ২০।২১ বর্ষ, জ্বর ১০২, দক্ষিণ বক্ষঃ ও পঞ্জরে তীব্রানক বেদনা। রোগিণী উঠিতে বসিতে এমন কি নিঃশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট বোধ করিতেছিল। রোগ কঠিন দেখিয়া আমি প্রথম দুইদিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলাম

কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তৃতীয় দিনে তুলসীর রস ১০ ফোঁটা জল মিশাইয়া ৬ বার করিয়া দিলাম ও প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার আত্মীয় ঔষধ লইতে আসিলে শুনিলাম, বেদনা এখন অনেক কম পড়িয়াছে, রোগিণী এখন উঠিয়া বসিতে পারে, নিঃশ্বাস ফেলিতে তাহার আর কষ্ট হইতেছে না এবং জ্বরও কম পড়িয়াছে। ইহার সহিত ২ ফোঁটা বাসার টিকার যোগ করিয়া ক্রমাগত তিন দিন ঐ ঔষধ দিলাম। দেখিলাম রোগিণী নিজের গৃহকর্ম করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় বিগত দুই মাস কালের মধ্যে তাহার আর কোন পীড়া হয় নাই। এক্ষণে মাতৃস্বরূপিণী বঙ্গললনাগণ একবার তুলসীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাহিত্য-পরিচয়

কাশীর কিম্বদন্তী—শ্রীনন্দীশর্ম্মা প্রণীত, দক্ষিণা—পাঁচ আনা।

নন্দীশর্ম্মা তাঁহার প্রভুর বিহারস্থলীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপনে সকলকে নীরব থাকিতে আদেশ করিতেছেন না—এবার তিনি পথ-প্রদর্শকরূপে স্থানবর্ণনে নিযুক্ত। তিনি পুরাকালের হাবভাব পরিত্যাগ করিয়া মডার্ণযুগের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভুর পুণ্যনিকেতন কাশীধামের মডার্ণ অবস্থা জানাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কাশীর তুচ্ছতম জিনিষটিও বাদ পড়ে নাই। এমন রসাল বর্ণনা, এমন 'রঙ্গদার গাইড' আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্ণনাটী ছড়ার আকারে ঢালা হইয়াছে। ছড়াগুলি সমস্তই ব্যঙ্গরসে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া আমরা নন্দীশর্ম্মার বুকফাটা চোখের জল দেখিতে পাইয়াছি। তিনি পুরাতন ভৃত্য, তাই তাঁহার পুরাণো মনিবের স্বাস্থ্যস্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুতে ক্ষুণ্ণ হইলে তাঁহার ব্যথা লাগিবারই কথা। তবে শিবসহবাসে সংযমের শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তিনি নিজের ব্যথা রহস্যের মধ্যে চাপা দিতে গিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। পাঠক নন্দীশর্ম্মাকে 'গাইড' করিবেন না কি?

কুল-পুরোহিত ও অন্যান্য গল্প—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। প্রকাশক গৃহস্থ পাব্‌লিশিং হাউস। ২৪ নং মিডিল রোড,—ইটালি।

নারায়ণ বাবুর এ গল্পগুলি পূর্ব্বে অনেকগুলি মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার গল্পপাঠক তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। গল্পের বিষয়-নির্ব্বাচনে তিনি বেশ পটু—চরিত্রাঙ্কনেও তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার ষ্টাইলটা একটু সাবেকী। যাঁহারা পুরাদস্তুর মডার্ণ, তাঁহারা তাঁহার ষ্টাইলকে তত ভাল চোখে দেখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে অন্যান্য দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহারা যে

বিশেষ হতাশ হইবেন এরূপ আমাদের মনে হয় না। পুস্তকখানিতে সর্ব্বসমেত পনেরটি গল্প আছে।

রোগ বিজ্ঞানম্—" কবিরাজ শ্রীনিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।"

রোগোৎপত্তির মূল কারণ কি, কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা সেই সেই কারণ নিশ্চিতরূপে ধরা যায় ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। বৈদ্যাচার্য্য মাধবকর কৃত "রোগ বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থের পঞ্চনিদান অংশের মূল, মূলের সাধু বাঙ্গলা ব্যাখ্যা এবং তাহার উপর মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত কৃত 'মধুকোষ' টীকার বঙ্গানুবাদ দিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীদিগের নিকটে অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এবম্বিধ পুস্তক প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী।

মফঃস্বলের বাণী

বিসর্জ্জন

যৌবনের বাঁশি বাজিতে বাজিতেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশ-প্রেম, সমাজের সেবা, আর্ত্তের শুশ্রূষা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি বিবিধ কুসুম একে একে বিকসিত হইতেছিল আশার অলি গুন্ গুন্ গান ধরিয়াছিল, প্রতি পবনহিল্লোলে একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছিল—কিন্তু নন্দীর ইঙ্গিতে অকাল বসন্তের মত আজ সব নীরব নিস্পন্দ! "স্বদেশী"র প্রাণমাতানো উৎসাহ ঢালিয়া পড়িয়াছে, নিঃস্ব নরনারায়ণের সেবা-উদ্দীপনা নিভিয়া গিয়াছে প্রাবনে যাহার বিকাস দুর্দ্দিনে তাহার অবসান, রণাঙ্গনে আর্ত্তের শুশ্রূষা, পরার্থে আত্মোৎসর্গেরও আর অবকাশ নাই, স্বাধীন কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মশক্তি আজ ভুলিবেহারার পরিচ্ছদে পুরস্কৃত!

যাহা অস্বাভাবিক তাহার এই পরিণাম! ব্যষ্টিকে বাদ দিয়া সমষ্টির সেবা এদেশে ছিল না, হইলও না! জননীর প্রতি দৃকপাতশূন্য হইয়া দেশ-জননীর সেবায় অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তিনি গ্রহণ করিলেন না; ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া দেশ-ভ্রাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলে, তোমাদের আশার এইখানেই সমাধি হইল। এসো এদেশের আশা-ভরসাস্থল, এসো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো। চাহিয়া দেখ তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে অনন্ত কর্ত্তব্য তোমাদের মুখের পানে তাকাইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তোলো; আপনার কর্ত্তব্য আপনি গ্রহণ কর, দেশের কর্ত্তব্য দেশ গ্রহণ করিবে; পয়সার হিসাব লও, টাকার হিসাব আপনি থাকিয়া যাইবে। আশ্রমচতুষ্টয়ের দেশে আশ্রম ধর্ম্মপ্রতিপালন কর। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সময়ে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণ কর দেশের ভাবনা, সংসারের ভাবনা বিসর্জ্জন দেও, কেন্দ্রীভূত রবিরশ্মির ন্যায় আপনার অখণ্ড মনোযোগ সাধ্য বিষয়ে অধ্যয়ন-তপস্যায় নিযুক্ত কর, তোমাদের কায তোমরা করিয়া যাও—ভবিষ্যৎ-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কর। যাহাদের কায তাহারা তাহা করিতেছে না, তাই দেশের দুর্গতি। ছাত্রগণ দেশের কার্য্য করিতেছে, আর গৃহস্থগণ পঞ্চমহাযজ্ঞ বিস্মৃত হইয়া স্বার্থের

হোমশিখায় সকল কর্ত্তব্যের আহুতি প্রদান করিতেছে। আমরা পিতৃতর্পণ, পূর্ব্ব পুরুষদিগের, দূরাত্মীয় নিরাত্মীয়ের শ্রাদ্ধ, অতীতের স্বপ্ন বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানের আসব পান (হেলথ ড্রিঙ্ক) করিতেছি, সমুদায় জগতের তৃপ্তির ভার বালকদের উপরে সমর্পণ করিয়া আত্ম-তৃপ্তির মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদনুসরণ করিতেছি, আজ আমরা পরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সর্ব্বদা "আপনারে লয়ে বিব্রত" রহিয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি না হইলে আত্মতৃপ্তি হয় না তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। আজ আমরা অতিথি, নিরন্ন উপোষিতের অনুসন্ধান না করিয়া অজ্ঞান-বদনে মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছি; অনাথাশ্রমের সেবকগণ তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, আমরা কেহ কেহ তাহাতে অর্থ প্রদান করিয়াই আমাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি—সেবা, পরিচর্য্যা আমাদের পারিবারিক গণ্ডী হইতে দূরে সুদূরে সরিয়া যাইতেছে। আমরা জনসাধারণের শিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের উপর তুলিয়া দিয়া কর্ণশূল চীৎকারে কণ্ঠ নিয়োগ করিয়াছি অথচ যিনি ধনবান্ তিনি একটি নিধনেরও মুখে অন্নদান করিতে স্বীকৃত নহেন। জীবে দয়া নামেকচি যে দেশের ধর্ম্ম সে দেশে কাকেরও অন্ন পাইবার উপায় নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ যে দেশের নীতি, সেদেশে বালক ও যুবকগণ দলে দলে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হইতেছে, স্বদেশ উদ্ধারের দল পুষ্ট করিতেছে, আর যাঁহারা পঞ্চাশ পার হইয়াছেন তাঁহারাও দেশের কায, ধর্ম্মের কায বালকদের উপরে সমর্পণ করিয়া "চোক বাঁধা বলদের মত" সংসারাশ্রমের ঘানি ঘুরাইতেছেন।

আমাদের সাধের স্বপন ভাঙিয়া গিয়াছে—যাও বেদনা বিস্মৃত হও, "স্বপন অমন ভেঙেই থাকে"। বঙ্গ জলের স্রোতস্বিনীর অনুকরণ বিড়ম্বনারই জন্য। "হোমফল" আয়ার্লণ্ডে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভারতের জন্য নহে এখানে বেশাস্তের প্রতিভা-রশ্মি সম্পূর্ণ বিফল। মরীচিকার অনুসরণ পরিত্যাগ কর যাহা সত্য, যাহা বাস্তব তাহারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আবার ভারতের প্রাচীন কর্ম্ম স্রোত, জাতীয় জীবন ফিরিয়া আসিবে।

রংপুর দিক্‌প্রকাশ।

খাইব কি ?

আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল দেখি আমরা খাইব কি ? সমস্ত জিনিষ দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে, বাঙ্গালার তোলা ভক্ষ্য—তেকালে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে—বল দেখি আমরা খাইব কি। যুগ যুগ ধরিয়া নকলনবিশী করিয়া আত্মগৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছি, এখন আমরা খাইব কি ?

ভাবিয়াছিলাম—সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যা চর্চ্চায় আমরা মানুষ হইয়াছি, আমাদের উন্নতি হইবে, কিন্তু তাহা হইল কই ? দেশে অন্নকষ্ট, রোগকষ্ট,—দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে • • • গাভীর স্তনে দুগ্ধ নাই, গোলার ধান্যের সঞ্চয় নাই,—তবে আমরা খাইব কি ?

জীবনের এ যে মহা সমস্যা ! উদরে অন্ন নাই—তবুও বিলাসিতার প্রসার—কমিতেছে না। এই যে শতকরা ৩৪ জন বাঙ্গালী—যক্ষ্মা রোগে যমের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে, এই যে ম্যালেরিয়ার ক্রব্যাদি বহ্নি—গ্রামে গ্রামে জ্বলিয়া উঠিতেছে,—তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ ইহার কারণ—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। কিন্তু ইহার উপায় করিতেছ কি ? কি খাইয়া এই তের কোটী বাঙ্গালী জীবন

ধারণ করিবে? সভ্য সাজিয়া শত সুরঞ্জিত-অঙ্কিত পল্লীবাস উঠাইয়া দিয়াছ, তোমার পিতৃপুরুষের পুণ্য ভিটায় সাঝা প্রদীপ জন্মের মত নিবিয়া গিয়াছে, তোমার সাধের জন্মভূমি—জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, তোমার শ্যাম-সরসীর স্নিগ্ধ সলিলে—মশককুল ম্যালেরিয়া অভ্র প্রসব করিতেছে, এখনও তুমি ভাবিতেছ না—তুমি খাইবে কি? ভাবিয়া ছিলে, স্ত্রী-শিক্ষায়, বিদ্যাচর্চ্চায়, বিজ্ঞান প্রসারে, তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে, মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা হইল কৈ? তুমি বাবু—বরফপানি না হইলে তোমার শুষ্ক কণ্ঠে তৃষা শান্তি হয় না, প্রস্তাভী চা নহিলে তোমার আলস্য জড়তা দূর হয় না, আন্ধির জামা, সিল্কের চাদর, বার্নিশ জুতা—এ সব না হইলে তোমার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় না, তোমার বাহিরে এত চাকচিক্য—কিন্তু ভিতরটা যে দিন দিন বিগড়াইয়া যাইতেছে! একটু খাঁটী দুধের অভাবে—তোমার চিত্তরঞ্জন শিশু পুত্র ইন্‌ফেণ্টাইল ডিসাবে—জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই কি তোমার বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি?

শুধু বিজ্ঞান শিক্ষায় কি দেশের উন্নতি হয়? জাতির মনুষ্যত্ব উন্মেষিত হয়? জগৎ জাতিটার কথাই কেন ভাবিয়া দেখ না? বিজ্ঞান বলে তারা কত কলকব্জা গড়িয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যের অসময় বিস্তার ঘটাইয়াছে, শিক্ষা দীক্ষা জগতের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আজ ত্রিসংসার দেখিতেছে—তাহাদের জাতির কোনই উন্নতি হয় নাই। তা'রা মানুষের মত মানুষ হইতে পারে নাই।—তা'রা মানবত্বের বিনিময়ে দানবত্ব লাভ করিয়াছে। তা'দের বিজ্ঞান—বিধির সৃষ্টিতে সৃষ্টিছাড়া পাপ দৃশ্যের গর্ভাঙ্ক রচনা করিয়াছে! নরহত্যা, ব্যভিচার,—পররাষ্ট্র-লোলুপতা, হিংসা, বিদ্বেষ,—তা'দের মেদ মজ্জায় নরক প্রবাহ মিশাইয়া দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—শুধু বিজ্ঞান চর্চ্চায়—মানুষ, মানুষ হয় না।

শিক্ষার বিস্তারেই কি জাতির উন্নতি হয়? তোমার দেশের কলু, ধোপা, কামার, কুমার, চাঁড়াল চুড়েল—কলেজের ডিগ্রী লাভ করিয়াছে তোমার দেশের মেয়ে মর্দ্দে—সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছে, তবুও দেশে অন্নাভাব কেন? এই শিক্ষাই কি তাহার প্রধান কারণ নয়? কলু—বই পড়িতে শিখিয়াছে, সে আর ঘানী ঘুরাইতে স্বীকৃত নয়, কলের তেলে এখন তোমার স্বাস্থ্যের স্নেহ ক্রিয়ার প্রয়োজন মিটিতেছে! দেশের লোক জাতীয় বৃত্তির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে,—কাজেই বিনিময়পত্র মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। ইহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? এ অন্নাভাব—দুর্ভিক্ষ-জাত নহে। দুর্ভিক্ষ ত বরাবরই ছিল; তখন দুর্ভিক্ষ হইত, দুদিন পরেই আবার থামিয়া যাইত। এখন তাহা চিরস্থায়ী হইতেছে কেন? এখনও তুমি তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছ না,—চাষার ছেলে চাকুরীর উমেদার হইয়াছে—তুমি খাইবে কি? এখনও বলিতেছি—জীবন সমস্যার সমাধান কর, ছেলেদের জাতীয় বৃত্তি শিখাও,—নাস্তিক্য ভুলিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার প্রসার কর, নকলনবিশী ছাড়,—পল্লীলক্ষ্মীর সম্মান রক্ষা কর—তোমার মঙ্গল হইবে। এখনও বলিতেছি—একবার দেশের দিকে চাহিয়া ভাবিয়া দেখ—আমরা খাইব কি? নহিলে ঐ শোন—অদৃষ্টদেব—আকাশবাণীর ছলে বলিতেছেন—

ভস্ম খাও দন্তানন!

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

"আর ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা"

অহর্নিশি যখন নিজের ভাবনা সমুদ্রে হাবুডুবু খাই তখন মনের কোণে সময়ে সময়ে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়া পড়ে "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা"। পরের ভাবনা না ভাবিলে নিজের ভাবনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় না একথা তখন ভুলে যাই। নিজের ভাবনা কমাইবার এক মাত্র উপায় পরের ভাবনা ভাবা তাহা তখন মনে আসে না। আমরা বহুকাল এই নীতি, এই সুনীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি; ফলে নিজের ভাবনা ভাবিতে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি; নিজের ভাবিবার যে কত বিষয় আছে তাহা অনেক সময়ে মনেই আসে না। আমরা খুব রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখিয়াছি; আমেরিকার কখন কে কি কথা বলিল আগ্রহ সহকারে তাহের সংবাদে তাহা অবগত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করি; চীন রাজা ইয়াংসিকাই কিরূপ পদ বিক্ষেপে অবসর হইয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন তাহা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অনুধাবন করি, অষ্ট্রিয়াতে কিরূপ শস্য উৎপাদন হইল তাহার তথ্য অবগত হইবার জন্য বিদেশীয় সংবাদ পত্রের স্তম্ভ গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করি; পানামা সংযোজক কাটান হইলে দেশের কি উপকার হইল তাহার আলোচনা করি, এডিসন সাহেবের শেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা উৎসুক্য প্রদর্শন করি, কিন্তু হায় নিজের কি অধঃপতন দিন দিন হইতেছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। দেশের অবস্থা কি ছিল আর কি হইয়াছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখি না, অন্নাভাবে কত শত স্বদেশবাসী জীর্ণ শীর্ণ মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছে, জলাভাবে কত শত নরনারী তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পাইতেছে না; নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপে, কতশত হাস্যময়, নন্দনকানন কল্প ভবন শ্মশানে পরিণত হইতেছে; গবাদি পশুর কিরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে; ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাণ ধারণের যাবতীয় দ্রব্য কিরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ভেজাল দ্রব্যে কিরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতেছে—এই সব যে শত সহস্র ভাবনার বিষয় রহিয়াছে, সেগুলি কেমন মোহের বশে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছি, তাই বলি পরের ভাবনা ভাবিয়া নিজের ভাবিবার বিষয়গুলির প্রতি মুদিতনেত্র হইয়া রহিয়াছি।

এমন আত্মহারা হইলে ত চলিবে না; লোকে স্বার্থপর বলে বলুক, "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিবার কি সময় আসে নাই! কি সে আত্মরক্ষা হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার কি সময় আসে নাই! এখনও যদি না আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর কবে আসিবে? আমরা দিন দিন উন্নতির সোপানাবলীর উচ্চতম ধাপে পৌঁছিতেছি এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুখনিদ্রাভিভূত হইয়া থাকিলে ত চলিবে না। ছিল বটে এমন দিন যখন আমাদের কিছুই ভাবনা ছিল না। আমাদের কিছুই ভাবনা ছিল না। আমাদের ক্ষেতভরা শস্য থাকিত, গোলাভরা ধান থাকিত, গোয়াল ভরা গরু থাকিত, পুকুর ভরা মাছ থাকিত। আমাদের তখন ছিল "পেটভরা ক্ষুধা আর মুখ ভরা হাসি" হৃদয় ভরা আনন্দ, বুক ভরা সাহস। আহা সে দিন, সে সুখের দিন ফেরৎ আসিলে নিজের ভাবনা ভাবিবার কিছু থাকিবে না, কিন্তু যত দিন না সে দিন আসিতেছে পাপিয়া যেমন

বারংবার "চোখ গেল" বলিয়া ডাকিয়া থাকে, আমাদিগকেও সেই রূপ "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিয়া মনের খেদ জানাইতে হইবে।

আত্মরক্ষার উপায় ভাবিতে হইবে "উন্নতি" "উন্নতি" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? দারুণ সত্য যে চোখের উপর জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; কি দিয়া ঢাকিবে? আজ একবার নিজেদের অবস্থা দেখার মত দেখ দেখি; দারুণ ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যে প্রকম্পিত মুহ্যমান; স্বাস্থ্য নিকেতন আমাদের দেশ এখন ম্যালেরিয়া আবাস, ওলাউঠা বসন্ত প্লেগ হাত ধরাধরি করিয়া বার মাস বেড়াইতেছে। আমাদের শিল্প বাণিজ্য রূপ কথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; আজ বস্ত্রের জন্য লবণের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী,—এমন দিন যে কখনও আসিবে তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্বপ্নের অগোচর ছিল। শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হওয়াতে আমরা আরও দারিদ্র্য যাঁতায় নিষ্পিষ্ট হইতেছি। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ; কিন্তু আমরা কৃষির উন্নতির জন্য কি করিতেছি? কৃষির উন্নতির সহিত গো জাতির উন্নতির সম্বন্ধ খুব নিকট; কিন্তু আমরা গো জাতির হীনাবস্থা দেখিয়াও প্রতিবিধানের জন্য কি করিতেছি? কিছু না; আমাদের সহৃদয় শাসন কর্ত্তৃগণ এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিলে তাহার সমালোচনা করিয়া মনে করি আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইল।

সম্মুখে কাজ রহিয়াছে বিস্তর। স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য দেশে সুপেয় জলের সংস্থান করিতে হইবে, জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বন জঙ্গল আবর্জ্জনার অপসারণ করিতে হইবে, দেশের ধনাগমের পথ পরিষ্কারের জন্য শিল্প বাণিজ্যকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে; অন্নের সংস্থানের জন্য কৃষির উন্নতি করিতে হইবে; স্বাস্থ্যোন্নতি ও কৃষির উন্নতির জন্য গো জাতির হীনাবস্থা যাহাতে দূর হয় তাহা করিতে হইবে; দেশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার উপায় বাহির করিতে হইবে। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমাদের ইংরাজ-রাজ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেবল রাজার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়! নিজের চেষ্টা উদ্যোগ উদ্যম আবশ্যক, God helps those who help themselves' ইহা বিস্মরণ হইলে চলিবে না। ভগবানের কৃপায় আমরা প্রজাবৎসল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়াও যদি আমাদের অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতে থাকে তাহা হইলে ত বলিতেই হইবে দোষ আমাদেরই। আমরা স্বাবলম্বন নীতি ভুলিয়া যাইতেছি, তাহাতেই আমাদের এত কষ্ট। তাই বলি, "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিয়া নিজের ভাবনা ভাবিতে শিখিবার সময় আসিয়াছে।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

আর কত বাকী?

কি মানুষ, কি জাতি আনন্দব্যতীত কেহই এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, আনন্দই জীবনীশক্তির উৎস, আনন্দের রবিরশ্মিতেই মানুষ শৈশবতাপ্তমের ন্যায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে প্রাণ নাই, সেখানে সকল শক্তি স্ফূর্ত্তিহীন ও নিস্তব্ধ। যে

সময়ে ভারতের আর্য্যজাতি "জীবন্ত জাতি" বলিয়া পরিচিত ছিল, সে সময়ে আনন্দের মন্দাকিনী সহস্রমুখী হইয়া এ জাতির প্রতি অঙ্গ রসসিক্ত করিত, কি লোকালয়, কি বনভূমি সকল স্থান আনন্দের বীণা-নিক্কণে মুখরিত হইত। ভূপতিগণ বৈতালিকের সঙ্গীত-ধারায় নয়ন উন্মীলন করিতেন, "প্রভাতী নহবৎ" মধুর সুরে বাজিতে থাকিত, বিহঙ্গগণ সেই সুরে সুর মিশাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইত, গন্ধবাহী মন্দ পবন তালে তালে তরঙ্গে-তরঙ্গে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইত। বনভূমিও সামগানে নিনাদিত হইয়া উঠিত। আজ আর সে দিন নাই, এ দেশে এখনও রাজা জমিদার আছেন, কিন্তু কাহারই গৃহদ্বারে নহবৎ বাজে না, সানাইয়ের মধুর সুরে কাহারও প্রাণে নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়া দেয় না, সঙ্গীতের অমৃত রসাঞ্জনে কাহারও নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত হয় না, আনন্দে অম্বুদে আমাদের কণ্ঠের উদ্বোধন হয় না।

সে কালে রাজা বাদশাহের সভায় পণ্ডিতের ন্যায় সঙ্গীতাচার্য্য সভাসদ্ থাকিতেন, মাঝে মাঝেই সঙ্গীতের আলোচনায় নীরস ও শুষ্ক প্রাণ সরস হইয়া উঠিত। আজকালও রাজা-জমিদার না আছেন তাহা নহে, কিন্তু সে সভা নাই, সে সভাপণ্ডিত নাই, সে সঙ্গীতাচার্য্যও নাই। কালিদাস তানসেন আজ অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত!

আমাদের জীবনের সকল মঙ্গলময় আরম্ভ সঙ্গীতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইত। অন্নে, অন্নপ্রাশনে, উদ্বাহে নৃত্যগীতবাদ্যে চারিদিক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিত। আজকালও আমরা ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করি বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহে, না করিলে নয় বলিয়া। তাই চুলিগণ যা তা সানাইয়ে সে সম্মোহন সুর নাই, সানাইয়ে সে সম্মোহন গুণ নাই, প্রাণে সে হর্ষোচ্ছ্বাস নাই। কেহ শ্রোতা নাই, কেহ উৎসাহদাতা নাই, এ দেশের চুলিসম্প্রদায় অতীতের কোন্ এক স্মৃতিহীন যুগে সঙ্গীতের যে এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজও অতি-অনুজাত বিস্ময়ের মত নতশিরঃ হইয়া দণ্ডায়মান্!

ধর্ম্মোদ্দীপনাকে বেগবতী করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায় "কীর্ত্তনে"র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী সুরলয়ে গীত হইয়া কীর্ত্তনের বৈদ্যুতিকশক্তি ঘোষণা করিত। বর্ত্তমানযুগ পর্য্যন্তও সেই কীর্ত্তন বাঁচিয়া আছে, কিন্তু লোকের সে আগ্রহ, সে উৎসাহ নাই—তাই রূপাজীব-বারবিলাসিনিগণ সেই মহাজন গীত সুড়াইয়া লইয়া বিলাস ও হাবভাবের মসলা দিয়া তাহা লোকের রুচিকর করিয়া রাখিয়াছে।

আজ শীতল পবনস্পর্শে কৃষকের গীত, নাবিকের গীত, মাঝীর গীত নীরব হইয়া পড়িতেছে। কৃষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে প্রাণের উৎসাহে আর সে গান ধরে না, সমীর ও নীরস্রোতে মাঝির হৃদয় তরঙ্গায়িত হয় না, আনন্দের স্রোত বহে না—নদীর ইঙ্গিতে যেন ভারতের আনন্দ-বসন্ত নিশ্চল ও স্তম্ভিত!

পাশ্চাত্য দেশের কর্কশস্বর হার্ম্মোনিয়াম ও পিয়ানোর নবীনত্বে এ দেশের পুরাতন সেতারের কোমলতন্ত্রী নিশীথ-নিস্তব্ধতায় বেহাগের সুরে বাজিয়া উঠে না, মোহিনীর নিদ্রালস সুরে ঘুমন্ত আঁখি জাগরিত হয় না, এসরাজ, বীণা "সভ্যসমাজে"র সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত দোকান-

নারের অপরিষ্কৃত গৃহে স্থান পাইয়াছে— তবলা, পাখোয়াজ ঝাড়পিটের ও গৃহ ত্যাগ করিতেছে, নন্দনের মন্দার তরু আজ ইন্ধন কাষ্ঠে পরিণত। আর শ্যামের বাঁশরী বাজে না, বহুনা উজান বহে না হেথা "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী!" আনন্দ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, শান্তি নাই, লক্ষ্মী নাই—এ জাতির জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। মরিয়া পড়িবার আর কত বাকী?

রংপুর দিক প্রকাশ।